খেলাধুলার বিশ্বকোষ

১. ক্রিকেট

পরিবেশক

বিদ্যাসাগর পুস্তক মন্দির

৭বি কলেজ রো,

কলিকাতা—৭০০০০৯

প্রকাশিকা
আভা দাস
চারুপ্রকাশ
৭এ কলেজ রো,
কলিকাতা—৭০০০০৯

Kheladhular Visvakosha
[Encyclopædia of Sports & Games]
Volume I : Cricket

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭০—৮০

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা
দ্বিজদাস সেন

মুদ্রাকর
প্রণতি ঘোষ
জুবিলী প্রিণ্টার্স
১২৪ অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৯

সূচীপত্র

ক্রিকেটের পরিভাষা ৬
ক্রিকেটের বিবর্তন : কালপঞ্জী ১৭
নিয়মকানুন ৩৩
রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ানশিপের নিয়মকানুন ৬০
পদ্ধতি ও প্রকরণ ৭২
আক্রমণের ভিত্তি : ফাস্ট বোলিং—শুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪০
ব্যাটিং-এর গোড়াপত্তন—পঙ্কজ রায় ১৪৬
প্রসঙ্গ : আম্পায়ারিং ও অন্যান্য—সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায় ১৫১

ক্রিকেট ও ক্রিকেটার

ইংল্যাণ্ড ১৭৮
অস্ট্রেলিয়া ২৩৮
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৭৮
ভারত ৩০৫
পাকিস্তান ৩৯৪
নিউজিল্যাণ্ড ৪০১
দক্ষিণ আফ্রিকা ৪০৮
বিশ্ব-ক্রিকেটে অপ্রধান দেশসমূহ ৪২০
স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ওয়েলস, নেদারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, আমেরিকা, কানাডা, বারমুডা, পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম আফ্রিকা, হংকং
মহিলা ক্রিকেট ৪২৪
বিশ্বকাপ ৪২৭
স্মরণীয় ক্রিকেটার ৪৩৩
বাঙলার স্মরণীয় খেলা—অজয় বসু ৪৫৯
টাইটেস্ট : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্টেলিয়া—শঙ্করীপ্রসাদ বসু ৪৬৫
স্মরণীয় রেকর্ড ৪৮১
ভারতীয় টেস্ট ম্যাচের সম্পূর্ণ স্কোর ১

দু-চার কথা

খেলাধুলার ব্যাপারে ভারতে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে খেলা নিয়ে ভারতবাসীর উৎসাহ প্রচুর কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এমন পিছিয়ে-পড়া দেশও খুব কম আছে! অন্তত ওলিম্পিকে পদক সংগ্রহের তালিকার দিকে তাকালেও একথা স্পষ্ট হবে। হয়ত বলা যায়, পুরস্কার সংগ্রহ নয়, প্রতিযোগিতায় যোগদানই মূল কথা। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ভাবের ঘরে চুরি ছাড়া কিছু নয়। যখন দেখা যায় ভারতের চাইতে আয়তনে ও লোকসংখ্যায় কনিষ্ঠ কত দেশ পদকের ঝুড়ি ঘরে তুলছে, তখন এসব আপ্তবাক্য অর্থহীন মনে হয়। আসলে খেলাধুলার ভেতর দিয়ে কোন দেশের জাতীয় চরিত্র প্রকাশ পায়। সামগ্রিকভাবে জাতীয় চরিত্রে ঘুণ ধরলে অন্য সব ক্ষেত্রের মত খেলাধুলার আসরেও পিছিয়ে পড়তে বাধ্য।

জাতীয় চরিত্র একদিনে একজনের চেষ্টায় গড়ে ওঠে না। তার জন্যে চাই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনুকূল পরিবেশ। আমাদের দেশের অস্থির ও অনিশ্চিত আবহাওয়ায় এমন পরিবেশ পাওয়া শক্ত। আমাদের বিরাট দেশ। বহু ভাষা, বহু জাতি। এক প্রদেশবাসীর সঙ্গে অপরের পার্থক্য অনেক। কাজেই সব প্রদেশবাসীর পক্ষে সমানভাবে প্রযোজ্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় পক্ষপাতিত্বের জন্য কোন বিশেষ বিশেষ অঞ্চল কিছুতেই আত্মবিকাশের সুযোগ পায় না। তার ফলে জাতীয়তাবোধের মনোভাবও গড়ে উঠতে বাধা পায়।

পরিমিতিবোধের অভাবও আমাদের খেলাধুলাকে বেশ দুর্বল করে দেয়। সামান্য গুটিকত খেলা নিয়ে এ দেশে হুল্লোড় হয় বেশি। বাকি খেলাগুলো দুয়োরানীর সন্তানের মত মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। জাতীয় কারণেই এ পরিস্থিতির পরিবর্তন দরকার। যাই হোক, স্বল্প পরিসরে এত বড় বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ কম। বাঙালী পাঠক যাতে খেলাধুলার প্রতি ঘনিষ্ঠ মনোযোগ দিতে পারে তার জন্য বইটি হাজির করা হল। বিশ্বক্রীড়ার পটভূমিতে আমাদের সঠিক অবস্থান কি তা বইটি পড়লে জানা যাবে। এ ধরনের চেষ্টা বাংলা ভাষায় এটাই প্রথম।

বইটি চার খণ্ডে সাজানোর ইচ্ছে আছে। প্রথম খণ্ডে রয়েছে ক্রিকেট। পরবর্তী খণ্ডগুলোতে যথাক্রমে থাকবে [২য়] ওলিম্পিক ও অন্যান্য, [৩য়] ফুটবল ছাড়া অন্য খেলা, এবং [৪র্থ] ফুটবল। খেলাধুলা বিষয়ে এত জানার আছে যাতে মনে হয় চার খণ্ডেও সব বিষয়ের প্রতি সমান নজর দেওয়া কঠিন।

কিছু প্রয়োজনীয় পরিভাষা

আর্মার: বাঁ-হাতি স্পিন বোলার ব্যাটসম্যানকে ঠকাবার জন্য মাঝে মাঝে কোন কোন বল জোরের উপর বাইরে থেকে ভেতরে ঢোকান। এ ধরনের বলকে বলে আর্মার।

ইয়র্কার: ব্যাটসম্যান ক্রিজে দাঁড়িয়ে স্টান্স নিলে পর ব্যাট যেখানে মাটি স্পর্শ করে বল ঠিক সেখানে পিচ খেলে তা ইয়র্কার হয়।

গুডলেংথ: ব্যাটসম্যান সামনের দিকে যথাযথ পা বাড়িয়ে ব্যাট পেতে দিলে বল যদি ঠিক তার আগে পড়ে তাহলে তাকে গুডলেংথ বল বলে।

গুগলি: বোলার লেগ ব্রেকের মত করে বলটিকে ছাড়েন, কিন্তু বল মাটিতে পড়ে অফ ব্রেক করে। আসলে বলটাকে অফ ব্রেকের জন্যই ছাড়া হয় কিন্তু বোলার তা এমন কৌশলে ছাড়েন যাতে ব্যাটসম্যান তাকে লেগব্রেক বলে ভুল করেন। লেগব্রেক বোলাররাই এমন ধরনের বল সাধারণত ছাড়তে পারেন। গুগলিকে 'বসি' বলও বলা হয়। বিখ্যাত খেলোয়াড় বসাঙ্কোয়েট এ-ধরনের বল করার কায়দা উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর নাম অনুসারে 'বসি' বল নামকরণ হয়েছে।

চায়নাম্যান: বাঁ-হাতি স্পিনারদের লেগব্রেক বলকে চায়নাম্যান বলে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চীনা খেলোয়াড ই আচঙের নাম থেকে এ নাম হয়েছে।

চ্যাকার: বল করার সময় কনুই ভেঙে হাতটিতে ঝাঁকুনি দিয়ে বল করা হলে তাকে চ্যাকার বলা হয়।

টপ্‌স্পিন: অফব্রেক বা লেগব্রেকের মত করে ছাড়া হলেও বলটি যদি মাটিতে পড়ে সোজা যায় তাহলে তাকে টপস্পিন বলে। পাক খাইয়ে ছাড়া হলেও মাটিতে পড়ার পর এ ধরনের বলের গতি সাধারণত দ্রুত হয়। ফলে ব্যাটসম্যান অফ ব্রেক বা লেগ ব্রেক বলে ভুল করতে পারেন।

ডলি ক্যাচ: উঁচু করে তোলা সহজ ক্যাচকে ডলিক্যাচ বলা হয়।

ডাক: শূন্য রানে ব্যাটসম্যান আউট হলে রান-সংখ্যাকে ডাক বা গোল্লা বলে।

ডাকলিং: বল খাটো-লেংথে পডে যখন লাফিয়ে উপর দিকে উঠে যায়, ব্যাটসম্যান তখন সে বলটিকে খেলার চেষ্টা না করে মাথা নিচু করে বলটিকে অনেক সময় চলে যেতে দেন। এই মাথা নিচু করে নেওয়াকে 'ডাক' বা ডাকলিং বলা হয়।

নাইট ওয়াচম্যান : দিনের শেষে কোন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেলে অধিনায়ক যদি পড়ন্ত বেলায় ব্যাট করার জন্য কোন স্বীকৃত ব্যাটসম্যান না পাঠান তাহলে সে ব্যাটসম্যানকে নাইট ওয়াচম্যান বা নৈশপ্রহরী বলা হয়। সাধারণত ঝুঁকি না নেবার জন্যই এমন পন্থা অবলম্বন করা হয়।

ফাস্ট বল : দ্রুতগতির বোলারদের সাধারণত দু শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বলের গতি খুব দ্রুত হলে তাদের বলা হয় ফাস্ট বল। অপেক্ষাকৃত কম গতি সম্পন্ন হলে মিডিয়াম ফাস্ট বল বলা হয়।

ফুল টস : বোলার বল ছাড়ার পর এক পিচে তা যদি ব্যাটসম্যানের ব্যাটের উপর পড়ে তাহলে সে বলকে ফুলটস বলে।

ফ্লিক গ্রিপ : এই গ্রিপে বল করলে সহজে বোঝা যায় না বলটি অফ ব্রেক না লেগ ব্রেক হবে। ফলে ব্যাটসম্যান ধন্দের মধ্যে পড়ে যান। এ-ধরনের গ্রিপের আরেকটি সুবিধেও আছে। হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বল বেশ জোরের উপর ছুটে আসে বলে ব্যাটসম্যান বিচার করবার বিশেষ সুযোগ পান না।

ফ্লিপার : অফ ব্রেক ধরনের বল, কিন্তু ছাড়ার সময় আঙুলের ডগার সাহায্যে বলের গতি দ্রুত করে দেওয়া হয়। তার ফলে বল মাটিতে পড়ে ব্রেক করার বদলে বেশ জোরে সোজা হয়ে ব্যাটসম্যানের দিকে যায়। একে ফ্লিপার বলে।

বার্ন ডোর গেম : কোন ব্যাটসম্যান রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে ব্যাট করে রান তোলার গতি মন্থর করে দিলে তাকে বার্ন ডোর গেম বলা হয়।

বিমার : ফাস্ট বল মাটিতে পিচ না পড়ে প্রচণ্ড জোরে ব্যাটসম্যানের শরীরের দিকে ছুটে এলে তাকে বিমার বলে।

রাউণ্ড দ্য উইকেট এবং **ওভার দ্য উইকেট :** বোলার যে হাতে বল করেন সে হাতের পাশে যদি উইকেট থাকে তাহলে বোঝা যায় তিনি ওভার দ্য উইকেট বল করছেন। আবার বল করবার সময় উইকেট তাঁর অন্য হাতের পাশে থাকলে বোঝা যায় তিনি রাউণ্ড দ্য উইকেট বল করছেন। অর্থাৎ, একজন ডানহাতি বোলারের ক্ষেত্রে উইকেট ডানদিকে থাকলে হবে ওভার দ্য উইকেট বোলিং, এবং বাঁদিকে উইকেট থাকলে হবে রাউণ্ড দ্য উইকেট বোলিং।

রাবার : কোন টেস্ট সিরিজে যে দল বেশি-সংখ্যক টেস্টে জয়লাভ করে তারা রাবার লাভ করে। যদি সিরিজ ড্র হয় তাহলে আগের সিরিজের ফল অনুযায়ী রাবার পূর্ববর্তী বিজয়ী দলের অধিকারে থাকে।

র‍্যাবিট : শেষের দিকের দুর্বল ব্যাটসম্যানদের র‍্যাবিট বলে। এঁরা সাধারণত বোলার হন। এঁদের টেল-এণ্ডারও বলা হয়।

শর্ট পিচ বা লং হপ্ : বল গুড লেংথের অনেকটা আগে পড়লে শর্ট পিচ বা লং হ্পে বলা হয়।

স্টিকি ডগ : বৃষ্টিতে ভেজা নরম পিচে বল হঠাৎ কখনো লাফিয়ে ওঠে, কখনো বা নিচু হয়ে ছোটে। কখনো স্পিন করে, কখনো বা করে না। অর্থাৎ বলের গতি খুব স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়ে। এ-ধরনের পিচকে স্টিকি ডগ বলে।

স্ট্রোক প্লেয়ার : কোন ব্যাটসম্যান যদি বিশেষ পরোয়া না করে উইকেটের চারদিকে মেরে খেলে দ্রুত রান তোলেন তাহলে তাঁকে স্ট্রোক প্লেয়ার বলা হয়।

স্লিক : ব্যাটের কানায় বল লেগে উইকেটের কাছে বা পিছনে ক্যাচ গেলে সে মারকে বলা হয় স্লিক। একই ধরনের মারকে অস্ট্রেলিয়ানরা বলে ‘নিক’।

স্পেক্টাকলস (চশমা) : কোন ব্যাটসম্যান দু ইনিংসে শূন্য করলে ব্যঙ্গ করে বলা হয় ব্যাটসম্যান স্পেক্টাকলস বা চশমা পড়েছেন।

হাফ ভলি : বল পিচ পড়ার সময় ব্যাট সামনে বাড়িয়ে বলে লাগানো গেলে তাকে বলা হয় হাফ ভলি।

বোলিং-ফিল্ডিং-আম্পায়ারিং-এর ব্যাখ্যাসহ চিত্র
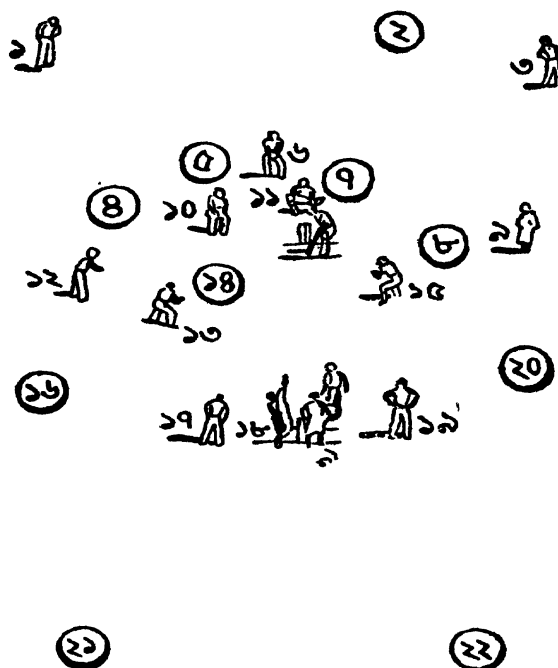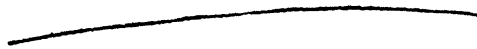
ফিল্ডিং-এর বিভিন্ন অবস্থান

১. থার্ডম্যান ২. ডীপ ফাইন লেগ ৪. ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট ৫. ২য় শ্লিপ ৬. ১ম শ্লিপ ৭. শর্ট ফাইন লেগ ৮. স্কোয়ার লেগ ৯. দু'জন আম্পায়ার ১০. গালি ১১. উইকেট-রক্ষক ১২. কভার পয়েন্ট ১৩. সর্ট একস্ট্রা কভার ১৪. সিলি মিড অফ ১৫. সিলি মিড অন ১৬. একস্ট্রা কভার ১৭. মিড অফ ১৮. বোলার ১৯. মিড অন ২০. মিড উইকেট ২১. লং অফ ২২. লং অন
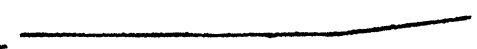
উপরের ছবিতে যেখানে মানুষের অবস্থান আছে সেভাবেই সাধারণত ফিল্ডিং সাজানো হয়। তবে প্রয়োজন বোধ হলে বোলারের পরামর্শমতো অধিনায়ক ফিল্ডিং-এর পরিবর্তন করেন।
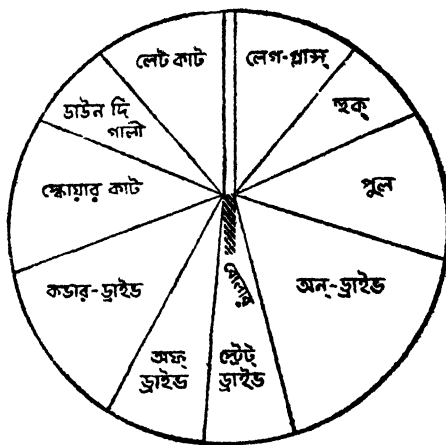
বিভিন্ন ধরনের মারে বলের গতিপথ

ফিল্ডিং :: বাউণ্ডারি থেকে বল ছুঁড়ে দেওয়া [পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫]

বাউণ্ডারি লাইনের কাছাকাছি যাঁরা ফিল্ড করবেন তাঁদের সব সময় লক্ষ্য থাকবে কত তাড়াতাড়ি সেটা উইকেটে পাঠানো যায়। সমান্তরালভাবে বল ছোঁড়া দরকার, তাতে কালক্ষেপ কম হয়। উপরের ছবিটি বল ছোঁড়ার আদর্শ। হাওয়ায় উঁচু করে তুলে না দিয়ে (মাঝের ছবির মতো) মোটামুটি উইকেটের উচ্চতায় বল ছোঁড়া (ডাইরেক্ট থ্রো) প্রয়োজন। এভাবে বল ছুঁড়লে কদাচিৎ রান আউট হয়। নিচের ছবির মত বল ছুঁড়লে বাহুর উপর কম ধকল পড়ে এবং বল দ্রুত পৌঁছে যায়।

বিভিন্ন প্রকার বলের পিচ পড়ার অবস্থান

প্রথম ছবি : ইয়র্কার—এখানে বল পড়ে ব্যাটসম্যানের গার্ড বা ব্লক হোলের পিছনে।

দ্বিতীয় ছবি : লং হফ—এখানে গার্ডের অনেক আগে পিচ পড়ে, ব্যাটসম্যান পুল বা হুক করার যথেষ্ট সময় পান।

তৃতীয় ছবি : ফুলটস—বল কোথাও পিচ না পড়ে সোজা ব্যাটে এসে লাগে।

চতুর্থ ছবি : হাফ ভলি—বল পিচ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটে এসে লাগে।

পঞ্চম ছবি : গুড লেংথ—বল এমন জায়গায় পিচ পড়ে যাতে ব্যাটসম্যান এগিয়ে বা পিছিয়ে খেলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না।
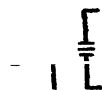
স্যুয়িং বলের কয়েকটি গতিপথ

প্রথম ছবি : কার্ট হুইল স্যুয়িং—এ-ধরনের স্যুয়িং বিলম্বিত হওয়ার দরুন ব্যাটসম্যান বল লক্ষ্য করার যথেষ্ট সময় পান, ফলে এ বল সাধারণত কার্যকর হয় না।

দ্বিতীয় ছবি : লেট আউট স্যুয়িং—এ-ধরনের বল বিপজ্জনক ; ব্যাটসম্যান খেলতে যাবার সময়েই বল স্যুয়িং করে, ফলে তিনি বিপদে পড়েন।

তৃতীয় ছবি : লেট ইন স্যুয়িং—এ-ধরনের বলও বিপজ্জনক ; এতে ব্যাটসম্যান বোল্ড বা এল. বি. ডব্লু-র ফাঁদে পড়েন।

ইন-স্যুয়িং গ্রিপ [পৃষ্ঠা ৮৭]

আউট-স্যুয়িং গ্রিপ [পৃষ্ঠা ৮৭]
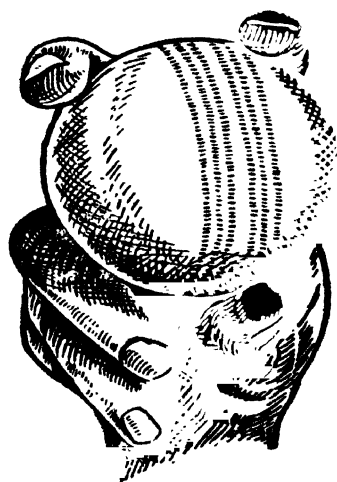
টপ স্পিনের গ্রিপ [পৃষ্ঠা ৯৮]

অফ-স্পিন গ্রিপ [পৃষ্ঠা ১০১.]

লেগ-স্পিন গ্রিপ [পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭]
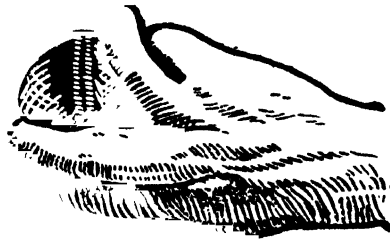
গুগলি স্পিন-এর গ্রিপ [পৃষ্ঠা ৯৭]
লেগ ব্রেক ভঙ্গীতে ছোঁড়া অফ-ব্রেক
বলকে গুগলি বলে।
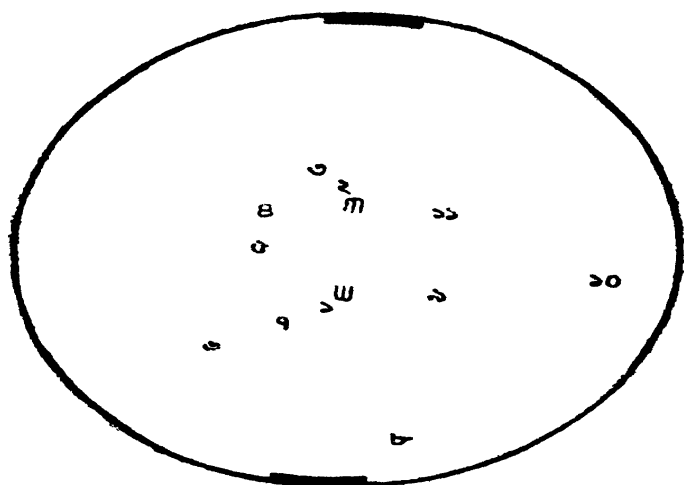
লেগ-ব্রেক বোলিং-এ ফিল্ডারদের অবস্থান [পৃষ্ঠা ৯৬]
১. বোলার ২. উইকেট-রক্ষক ৩. ১ম স্লিপ ৪. পয়েণ্ট ৫. কভার ৬. ডীপ একস্ট্রা-কভার ৭. মিড-অফ ৮। লং-অন ৯. মিড উইকেট ১০. আউট ফিল্ড মিড উইকেট ১১. স্কোয়ার লেগ
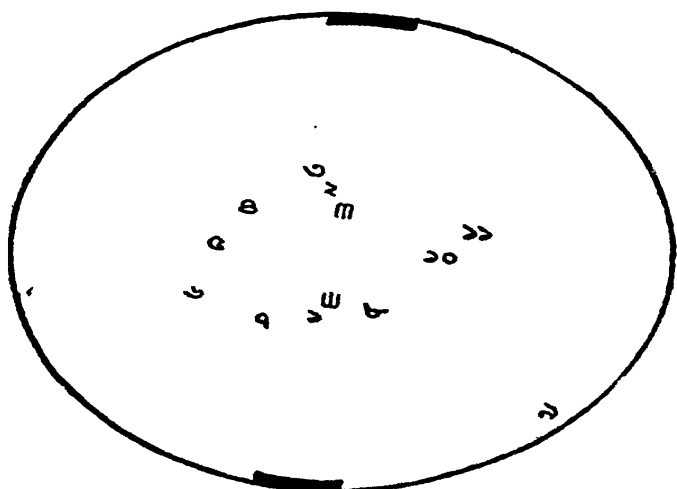
অফ-স্পিন বোলিং-এ ফিল্ডারদের অবস্থান [পৃষ্ঠা ১০০]
১. বোলার ২. উইকেট-রক্ষক ৩. ১ম স্লিপ ৪. পয়েণ্ট ৫. কভার ৬. একস্ট্রা কভার ৭. মিড-অফ ৮। মিড-অন ৯. আউট ফিল্ড ১০. শর্ট মিড উইকেট ১১. স্কোয়ার লেগ।
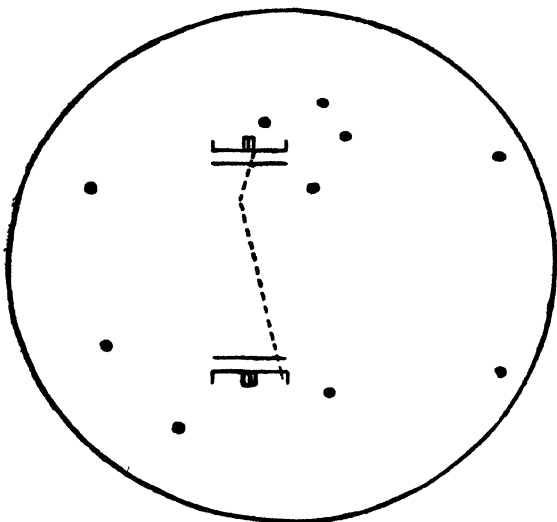
অফ স্পিন বোলিং-এর আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং

[পৃষ্ঠা ১০০]

আম্পায়ার খেলা পরিচালনা করে থাকেন। তাঁকে নির্দেশসমূহ সংকেতের মাধ্যমে জানাতে হয়। নিম্নবর্ণিত সংকেত থেকে তাঁর নির্দেশ বুঝতে হবে।

প্রথম সারি : ১. আউট ২. লেগ-বাই ৩. বাই ৪. ওয়াইড
দ্বিতীয় সারি : ১. নো বল ২. ওয়ান শর্ট বাউণ্ডারি
৪. ওভার বাউণ্ডারি

এই খণ্ডে যাঁরা লিখেছেন

মুস্তাক আলি

পঙ্কজ রায়

খুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

রাখাল ভট্টাচার্য

অজয় বসু

মুকুল দত্ত

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

মনোজিৎ লাহিড়ী

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈলশেখর মিত্র

অশোককুমার মিত্র

বিষ্ণু বসু

ভারতীয় ক্রিকেটের জনক
কুমার রণজিৎ সিংজী

ক্রিকেটের সবকালের নমস্য
ডন ব্র্যাডম্যান

ইডেন চিত্র : মুস্তাক আলি, মানকর ও ধীরেন দে

ক্রিকেট আদর্শের প্রতিমূর্তি স্যর ফ্রাঙ্ক ওরেল

রাজ্যপালের সঙ্গে করমর্দনরত ভারতের তিন স্পিনার

চন্দ্রশেখর • প্রসন্ন • বেদী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভিভিয়ান রিচার্ডস

প্রথম উইকেটের সর্বোচ্চ রানের বিশ্ব-রেকর্ডকারী
পঙ্কজ রায়

ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তী হয়ে রইলেন
সুনীল গাভাসকার

এবার (১৯৮০) ইডেনে অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক নিলেন

গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ

১৯৬৭ সালে ইডেনে তোলা সর্বকালের চৌকশ ক্রিকেটার সোবার্স
এবং বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়কের রেকর্ড সৃষ্টিকারী
মনসুর আলি খান পতৌদি

ক্রিকেটের বিবর্তন: কালপঞ্জী

ক্রিকেটের জন্ম হয়েছিল কোথায়? এবং কবে? এ-ব্যাপারে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা বহুকাল ধরে ক্রিকেটের উদ্ভব ও বিবর্তন নিয়ে অনুসন্ধান করছেন কিন্তু সন্ধানীদের চেষ্টা এখন পর্যন্ত যে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। কবে এবং কোথায় এর উদ্ভব হয়েছিল তা এখনও নির্দিষ্টভাবে কেউ বলতে পারেন না। অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, এ খেলা কোন ব্যক্তিবিশেষের আবিষ্কার নয়। নিক্ষেপ ও আঘাত মানুষের সহজাত ধর্ম। মানুষের এ সহজাত ধর্মটি থেকেই সম্ভবত ক্রিকেটের উদ্ভব হয়েছিল। এই নিক্ষেপ ও আঘাতের আদিমরূপ থেকে নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে ক্রিকেট ক্রমে বিবর্তিত হয়েছে।

তবে এগুলো সবই সাধারণ মন্তব্য। বর্তমানে আমরা ক্রিকেট বলতে যা বুঝি, তার আদিম রূপের সন্ধান পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে। ত্রয়োদশ শতকের শেষাংশে ও চতুর্দশ শতকের প্রথমাংশে এমন দুটি খেলার বিবরণ পাওয়া গেছে, যাদের আমরা ক্রিকেটের আদিম চেহারা বলে বর্ণনা করতে পারি। এই দুটি খেলার নাম যথাক্রমে 'ক্রোসি' (Crosse) এবং 'ক্রিগ' (Creag)।

র‍্যাণ্ডেল কোটগ্র্যাভারের 'ফ্রেঞ্চ-ইংলিশ' (ফরাসী-ইংরেজী) অভিধানের মত অনুযায়ী ক্রোসি হল লাঠি এবং বলের সাহায্যে কোন এক ধরনের খেলা। এ বর্ণনা ক্রিকেটের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। আর 'ক্রিগ' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালের ২৮তম বর্ষের হিসেব নিকেশের এক অনুলিপিতে। লণ্ডন সোসাইটি অব্ অ্যান্টিকোয়ারিস (London Society of Antiquaries) ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এ অনুলিপিটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেছিলেন। বিখ্যাত ক্রিকেট গবেষক এইচ. এস. অ্যালথাম (H S. Altham) এ অনুলিপিটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন 'ক্রিগ' ক্রিকেট ছাড়া অন্য কোন খেলা হ'তে পারে না। এর আগে অ্যাস্‌লে কুপার (Ashley Cooper) এবং অন্যান্য কিছু বিশেষজ্ঞ একই মত পোষণ করেছেন। অ্যালথাম আরও বলেছেন ক্রিগ্ শব্দটি যদি ক্রিগেটের (Creaget) সংক্ষিপ্ত রূপ হয় তাহলে ধ্বনি বা উচ্চারণের দিক থেকে ক্রিকেটের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এছাড়াও ক্রিকেটের ঐতিহাসিকগণ ক্রিকেটের উৎস নির্ণয়ে আরও বহু খেলার

উল্লেখ করেছেন। ক্লাব-বল, স্টল-বল, হ্যাণ্ড ইন-হ্যাণ্ড আউট, ক্যাট অ্যাণ্ড ডগ, ট্র্যাপক্যাট (Club-ball, Stall-ball, Hand in-handout, Cat and dog, Trapcat) প্রভৃতি খেলার কথা বিভিন্ন সময়ে এ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। উল্লিখিত খেলাগুলি চতুর্দশ শতকে ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত ছিল। বিশেষত ক্লাব-বল খেলাটি এ-বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। অনেকেই ক্লাব-বলকে ক্রিকেটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে মনে করেন। অবশ্য 'ক্লাব-বল' কিভাবে খেলা হত তার কোন বিশদ বিবরণ কেউ দিতে পারেননি। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত স্পোর্টস্ অ্যাণ্ড পাস্‌টাইম অব্ দ্য পিপ্‌ল অব্ ইংল্যাণ্ড (Sports and Pastime of the People of England) নামক বইটিতে দুটি ছবি মুদ্রিত হয়েছে। এদের 'ক্লাব-বল' খেলার ছবি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একটি ছবিতে রয়েছে একজন নারী ও একজন পুরুষ। নারীর হাতে ব্যাট ও বল দুটিই রয়েছে। অনুমান করা হয়েছে, নারীটি হয়ত বলটি ব্যাট দিয়ে মারবে এবং পুরুষটি তা ধরবে। অপর চিত্রটিতে আরও বিশদ অনুমান করার সুযোগ আছে। চিত্রটিতে রয়েছে, জনৈকা নারীর হাতে ব্যাট, একজন পুরুষের হাতে বল। মাঠে আরও কিছু পুরুষ ও নারী আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনুমান করা যায়, পুরুষটি ব্যাটধারিণী নারীর দিকে বল ছুড়বে এবং নারী ব্যাট দিয়ে সেটা মারবে। উপস্থিত অন্যান্য পুরুষ ও নারী তা ধরবে।

উপরোক্ত ছবিখানি ব্যাখ্যা করার পর জেসপ স্টার্ট এ খেলাটিকে 'ক্লাব-বল' নামে অভিহিত করেছেন। অবশ্য সেই সঙ্গে এ-মন্তব্যও যোগ করেছেন 'খেলাটি কিভাবে অনুষ্ঠিত হত, জানা যায় নি।'

যাই হোক, ঐতিহাসিকগণ কিন্তু ক্রিকেটের উৎস হিসেবে 'ক্রোসি', 'ক্রিগ্' এবং 'ক্লাব-বল' খেলা তিনটিকেই সব চাইতে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। তাছাড়া 'ক্রিক্' শব্দটি এসেছে নাকি এমন একটি শব্দ থেকে যার অর্থ মাথা-বাঁকা লাঠি। অতীতকালে ক্রিকেটের ব্যাট ছিল হকি-স্টিকের মত বাঁকা।

ক্রিকেট খেলার উৎপত্তিস্থল নিয়েও নানা বিতর্ক আছে। আপাতত ধরে নেওয়া হয়েছে ইংল্যাণ্ডের নিউনিটন্ (অথবা নিউনিডন) নামক স্থানটি হল ক্রিকেটের উৎপত্তিস্থল। নিউনিটন্ ইংল্যাণ্ডের উইণ্ডে অবস্থিত। উইণ্ডের উপকূলে ঘন বন ছিল। সেখানে মেষচারণ করা হত। এক সময় জাহাজ নির্মাণের জন্য এসব গাছ ব্যাপকভাবে কাটা হয়েছিল। গাছ কাটা হয়ে গেলে, গাছের মূলের যে অংশটুকু মাটির সঙ্গে লেগে থাকত, ইংরেজীতে তাদের স্টাফ

বা স্টাম্প বলা হয়। মেষপালকদের কেউ কেউ অবসর বিনোদনের জন্য কাঠের টুকরো দিয়ে স্টাম্পগুলোকে মারত এবং একজন লাঠি দিয়ে স্টাম্পরক্ষক হিসেবে দাঁড়াত। এর থেকে এক মজার খেলার উদ্ভব হয়েছিল। এ খেলাকেও অনেকে ক্রিকেটের আদিমরূপ বলে অভিহিত করেন।

বহুক্ষেত্রে দুটি স্টাম্প পাশাপাশি থাকত। মেষপালকরা পাশাপাশি একটি কাঠকে আড়াআড়িভাবে স্টাম্প দুটির উপরে রাখত। এর ফলে এটিকে দেখতে অনেকটা ফটক বা দরজার মত হত। ইংরেজীতে ফটককে 'উইকেট' এবং উপরের কাঠটিকে 'বেল' বলা হয়।

গোল্ডউইনের কবিতা থেকে জানা যায়, উইকেটের পাশে একটি গর্ত থাকত, সেই গর্তে বল ফেলে ব্যাটস্ম্যানকে রান আউট করা হত। এ গর্তটিকে বলা হত 'পপিং হোল্'। সম্ভবত এ থেকেই 'পপিং ক্রিজ' শব্দটি এসেছে।

এবার ক্রিকেটের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সময় অনুসারে সাজিয়ে দেওয়া হল :

১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ ক্রিকেট খেলার সম্ভাব্য উল্লেখ রাজা প্রথম এডওয়ার্ডয়ের আমলে একটি হিসেব বইতে ; কেণ্ট-এর নিউয়েনডেন অঞ্চলে।

১৫৫০ খ্রী গিল্ডফোর্ড-এর 'দ্য ফ্রি স্কুল'-এ (The Free School) ক্রিকেট খেলা হয়েছিল।

১৫৯৫ খ্রী ফ্লোরিও-সংকলিত ইতালী-ইংরেজী অভিধানে 'ক্রিকেট' শব্দটির উল্লেখ।

১৬১১ খ্রী জন বুলোকার-রচিত 'ইংল্যাণ্ড এক্স্পোজিটার' (England Expositor) গ্রন্থে ক্রিকেটের উল্লেখ।

১৬২২ খ্রী সাসেক্স-এর বক্সমুর অঞ্চলে রবিবার গির্জার অঙ্গনে ক্রিকেট খেলবার অপরাধে ছয়জন যাজকের শাস্তি হয়।

১৬২৪ খ্রী ব্যাটস্ম্যানের ব্যাটের আঘাতে ভিনালের মৃত্যু।

১৬৪৭ খ্রী রবার্ট ম্যাথুর লেখা একটি লাটিন কবিতায় উল্লেখ করা হয়েছে সেণ্ট ক্যাথারিন হিল-এ উইচেস্টারস্ স্কলারদের ক্রিকেট খেলা।

১৬৫৪ খ্রী এল্‌থাম-এর সাতজন যাজক লর্ডস্ ডে তে ক্রিকেট খেলার জন্য দণ্ডিত।

১৬৫৪ খ্রী ক্রমওয়েল-এর কমিশনারগণ কর্তৃক সমগ্র আয়ার্ল্যাণ্ডে ক্রিকেট (Krickett) নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা ; সব লাঠি (Stick) ও বল পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ।

১৬৬৫ খ্রী মার্লবরোর ডিউক জন চার্চিল পুরানো সেন্টপল বিদ্যালয়ে ক্রিকেট খেলেন।

১৬৭৬ খ্রী ইংল্যাণ্ডের বাইরে প্রথম ক্রিকেট খেলার উল্লেখ। খেলাটি আলেপ্পো-তে নাবিকরা খেলেছিল।

১৬৭৭ খ্রী সাসেক্স-এ ক্রিকেট খেলার নির্দিষ্ট উল্লেখ।

১৭০৬ খ্রী ইটন বিদ্যালয়ের উইলিয়ম গোল্ডউইন একটি ল্যাটিন কবিতায় সর্বপ্রথম একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছিলেন।

১৭১০ খ্রী কেম্ব্রিজ-এ ক্রিকেট খেলা। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ খেলার উল্লেখ এই প্রথম।

১৭১৯ খ্রী প্রথম কাউন্টি ম্যাচ-এর (County Match) উল্লেখ; কেণ্ট বনাম লণ্ডনের মধ্যে খেলা।

১৭২৭ খ্রী রিচমণ্ডের দ্বিতীয় ডিউক এবং পেপেরহ্যারোর মিঃ ব্রোড্রিক-এর দুটি দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান হবার সময়ে উভয়ের সম্মতিক্রমে খেলা পরিচালনার জন্য কিছু নিয়ম নির্ধারিত হয়।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ক্রিকেট খেলার উল্লেখ।

১৭২৯ খ্রী এ বছরের একটি ব্যাট J. C. নামাঙ্কিত পাওয়া গেছে। J.C. জনৈক John Chitty-র নামের আদ্যক্ষর। ব্যাটটি ওভাল মাঠের সংগ্রহ-শালায় আছে।

১৭৪৩ খ্রী ফ্রান্সিস হেম্যান অঙ্কিত ক্রিকেট খেলার চিত্র। লর্ডসের সংগ্রহশালায় রয়েছে।

১৭৪৪ খ্রী কেণ্ট বনাম সমগ্র ইংল্যাণ্ডের খেলা ১৮ই জুন আর্টিলারি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ খেলার সম্পূর্ণ স্কোরকার্ড রক্ষিত হয়েছে। কোন বড় খেলার পূর্ণ বিবরণ এই প্রথম পাওয়া গেল। কেণ্ট এ খেলায় এক উইকেটে জয়লাভ করেছিল।

এই বছরেই প্রথম ক্রিকেটের নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। এটি লণ্ডন ক্লাব দ্বারা প্রচারিত হয়েছিল।

১৭৫০ খ্রী হাম্বলডন ক্লাব প্রতিষ্ঠা। এখানকার খেলোয়াড়গণ খেলার পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

১৭৬০ খ্রী বোর্ডহাপপেনিতে ক্রিকেট সরঞ্জামের দোকান উদ্বোধন।

১৭৭২ খ্রী হ্যারো বিদ্যালয়ে ছেলেদের ক্রিকেট খেলার চিত্র।

১৭৭৫ খ্রী প্রথম শতরানের উল্লেখ। হাম্বলডন ক্লাব বনাম সারের খেলায় প্রথম দলের খেলোয়াড় জন স্মল ১৩৬ রান করেছিলেন।

১৭৭৭ খ্রী বোলার নিজের বলে ক্যাচ ধরার কৃতিত্ব পায়।

১৭৮৭ খ্রী টমাস লর্ড-এর মাঠে প্রথম ম্যাচের উল্লেখ: মিডলসেক্স বনাম এসেক্স।

হোয়াইট কনডুইট ক্লাবের সভ্যদের দ্বারা এম. সি. সি. প্রতিষ্ঠা।

১৭৮৮ খ্রী জুন মাসের ২৭ তারিখে লর্ডস্ মাঠে এম. সি. সি. প্রথম ম্যাচ খেলে।

১৭৯১ খ্রী স্যামুয়েল ব্রিচার কর্তৃক প্রতিযোগিতার রেকর্ড বই প্রকাশ। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি ছয় প্রধান খেলাগুলোর পূর্ণ স্কোর প্রকাশিত হতে থাকে।

১৭৯৬ খ্রী ইটন বনাম ওয়েস্টমিনিস্টারের খেলা হয়েছিল হাউনস্লো-তে। এটিই হল প্রথম কোন বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতা যা রেকর্ড করা হয়েছে। ইটন ৬৬ রানে হেরেছিল। ইটনের হেডমাস্টার ড. হীথ এগারজন খেলোয়াড়কেই বেত মেরেছিলেন।

হামবার্গ-এ ক্রিকেট বিবরণীর বই প্রকাশিত।

১৮০০ খ্রী টমাস বকসাল প্রথম ক্রিকেট খেলার পদ্ধতি (technique) নিয়ে বই প্রকাশ করেন।

ইটন ও হ্যারোর মধ্যে প্রথম ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।

১৮০৩ খ্রী প্রতিরক্ষা আইন (Defence Act) চালু করবার সময় উইলিয়ম পিট ক্রিকেটের উল্লেখ করেন।

১৮০৫ খ্রী লর্ডস্ মাঠে ইটন্ হ্যারোর বিরুদ্ধে খেলে ইনিংসে জয়লাভ করেছিল। কবি লর্ড বায়রন হ্যারো একাদশে খেলেছিলেন।

১৮০৭ খ্রী রাউণ্ড আর্ম বা হাত ঘুরিয়ে বল করার প্রথম উল্লেখ। কেন্টের জন উইলেস এভাবে বল করেছিলেন।

১৮০৬ খ্রী প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে এতাবৎ কালের মধ্যে সর্বনিম্ন রান ৬ রান করেছিল The R S দল। লর্ডস্ মাঠে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলায়।

১৮০৯ খ্রী নর্থ ব্যাঙ্ক-এ লর্ডসের দ্বিতীয় মাঠের উদ্বোধন।

১৮১৪ খ্রী বর্তমান স্থানে লর্ডসের তৃতীয় মাঠের উদ্বোধন।

১৮১৭ খ্রী একই খেলায় দুটি শতরানের প্রথম উল্লেখ। উইলিয়াম ল্যাম্বার্ট

সাসেকস দলের পক্ষে খেলে এপসম-এর বিরুদ্ধে ১০৭ ও ১৫৭ রান করেছিলেন লর্ডস্ মাঠে।

১৮২০ খ্রী প্রথম দ্বিশত রান করার প্রথম উল্লেখ। ব্যাটস্‌ম্যান উইলিয়ম ওয়ার্ড। লর্ডস্ মাঠে এম. সি. সি-র পক্ষে নরফোকের বিরুদ্ধে খেলে তিনি ২৭৮ রান করেছিলেন।

১৮২২ খ্রী রাউণ্ড আর্ম বোলিং করার জন্য জন উইলিসকে নো-বল ডাকা হয়েছিল।

১৮২৮ খ্রী এম সি. সি. কোন বোলারকে বল করবার সময় কনুই পর্যন্ত উচ্চতায় হাত তুলবার অনুমতি দিল।

১৮৩৩ খ্রী জন নাইরেন লিখলেন Young Cricketers Tutor এবং The Cricketers of My Time। সে যুগের ক্রিকেটের ইতিহাস এবং বিখ্যাত খেলোয়াড়দের কথা রচনা দুটিতে পাওয়া যায়। রচনা দুটি আদিযুগের ক্রিকেট সাহিত্যে ক্ল্যাসিক বলে গণ্য করা হয়।

১৮৩৫ খ্রী ২০শে মে এম. সি. সি. ক্রিকেটের পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নিয়মাবলী গ্রহণ করল।

১৮৩৬ খ্রী সাসেকস কাউন্টি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল। নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী কোন কাউন্টি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা এই প্রথম।

১৮৩৮ খ্রী উইলিয়ম ক্লার্ক কর্তৃক নাটিংহামে ট্রেন্ট ব্রিজ গ্রাউণ্ডের উদ্বোধন হল।

জেণ্টলম্যান বনাম প্লেয়ার্সদের খেলার স্কোরকার্ড প্রথম ছাপা হল।

১৮৪৫ খ্রী ক্রিকেট খেলার ওপর থেকে সবধরনের বিধিনিষেধ উঠে গেল। সারে কাউন্টি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল। ওভাল মাঠে তাদের প্রথম খেলা হল।

১৮৪৬ খ্রী একটি 'সমগ্র ইংল্যাণ্ড একাদশ' দল উইলিয়ম ক্লার্ক দ্বারা গঠিত হয়ে সারা দেশে প্রতিযোগিতায় খেলতে লাগল। কেণ্টয়ের ব্যাটস্‌ম্যান এন. ফেলিক্স-এর আঁকা এ দলের লিথোগ্রাফ ছবি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

কেম্বিজের ফেনার মাঠের উদ্বোধন হল।

লর্ডস্ মাঠে টেলিগ্রাফ স্কোরবোর্ড চালু হল।

লর্ডস্ মাঠে প্রথম স্কোরবোর্ড বিক্রয় হতে লাগল।

১৮৪৮ খ্রী জুলাই মাসের ১৮ তারিখে ইংল্যাণ্ড ক্রিকেটের জনক উইলিয়ম গিলবার্ট গ্রেস জন্ম গ্রহণ করলেন।

১৮৫০ খ্রী উত্তর বনাম দক্ষিণের খেলায় জে. উইসডেন এক ইনিংসে দশ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করলেন ।

১৮৫০-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে ক্রিকেট মাঠে ছেদক যন্ত্র (moving machine) ব্যবহৃত হতে থাকে ।

১৮৫৭ খ্রী The Cricketers Fund Friendly Society গঠিত হল ।

১৮৫৮ খ্রী পর পর তিনটি বলে তিনজন ব্যাটসম্যানকে আউট করার জন্য বোলারকে টুপি দেবার প্রথম উল্লেখ ।

১৮৬২ খ্রী ওভাল মাঠে ইংল্যাণ্ড বনাম সারে দলের খেলায় কেন্ট-এর খেলোয়াড় এডগার উইলসার বল করতে গিয়ে কাঁধের থেকে উঁচুতে হাত তুলেছিলেন । এ অপরাধে জন লিলি হোয়াইট তাকে নো-বল ডেকেছিলেন। প্রতিবাদে উইলসার মাঠ ছেড়ে চলে যান এবং খেলাটি সেদিনের মত স্থগিত থাকে। পরের দিন অন্য আম্পায়ার নিযুক্ত করা হয়, কিন্তু তিনিও পূর্বজনের মত বহাল রাখেন। এতে প্রচুর বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়।

১৮৬৪ খ্রী ১০ই জুন 'ওভার আর্ম' বোলিং আইনানুমোদিত হল।

মিডলসেক্স ও ল্যাঙ্কাসায়ার ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল।

গ্রেস প্রথম শ্রেণীর খেলায় আবির্ভূত হলেন। ষোল বছরের জন্মদিনের দুদিন আগে তিনি একটি খেলায় যোগদান করে ১৭০ এবং ৫৬ নট আউট রান করেন।

'উইসডেন ক্রিকেটারস্' বর্ষপঞ্জী প্রথম প্রকাশিত।

১৮৬৫ খ্রী নেট-এ অভ্যাস প্রথম স্থরু হল লর্ডস্ মাঠে।

১৮৬৮ খ্রী চার্লস্ লরেন্স-এর তত্ত্বাবধানে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের একটি ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ড সফরে এল।

১৮৭০ খ্রী লর্ডস্ মাঠে প্রথম ভারী রোলার ব্যবহৃত হল। এর ফলে পিচ্ উন্নত হতে স্থরু করল।

১৮৭১ খ্রী ডব্‌লু. জি. গ্রেস এর শ্রেষ্ঠ মরশুম। তিনি প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে মরশুমে দ্বিসহস্রাধিক রান করেছিলেন। তাঁর মোট রান হয়েছিল ২৭৩৯।

১৮৭২ খ্রী ম্যাচ শুরুর আগে পিচ ঢেকে রাখা নিয়ে প্রথম পরীক্ষা করা হল লর্ডস্ মাঠে।

১৮৭৩ খ্রী কাউন্টি চাম্পিয়নশিপের জন্য প্রতিযোগিতা এ বছর থেকেই

অনুমোদিত হয়। এ বছরই প্রথম এজন্য নীতিনির্ধারণ করা হয়। নটস দল প্রথম চাম্পিয়নশিপ লাভ করে।

গ্রেস এক মরশুমে ১০০০ রান ও ১০০উইকেট সংগ্রহ করেন। কোন মরশুমে ক্রিকেটে ডাবল্ এই প্রথম কোন খেলোয়াড় অর্জন করলেন বলে জানা যায়।

১৮৭৮ খ্রী অস্ট্রেলীয় দলের প্রথম ইংল্যাণ্ড সফর। অধিনায়ক ছিলেন ডি ডবলু. গ্রেগরি। এই দল শক্তিশালী এম. সি. সি. একাদশকে একদিনের প্রতিযোগিতায় নয় উইকেটে পরাজিত করে।

১৮৮০ খ্রী ইংল্যাণ্ডে প্রথম টেস্ট ম্যাচ। ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়াকে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছিল। গ্রেস ১৫২ রান করেছিলেন।

১৮৮২ খ্রী ওভালে ইংল্যাণ্ডকে অস্ট্রেলিয়া সাত রানে হারায়। উত্তেজনায় একজন দর্শক প্রাণ হারান। স্পোর্টিং টাইম পত্রিকায় ব্যঙ্গ করে এ বিষয়ে একটি শোকসংবাদ বেরোয়, তার থেকে 'দ্য অ্যাসেজ' (The Ashes) কথাটির উদ্ভব হয়। স্পফোর্থ দুর্ধর্ষ বোলিং করেছিলেন।

১৮৮৪ খ্রী ২১ শে এপ্রিল এম সি সি কর্তৃক সম্পূর্ণ সংশোধিত নিয়মাবলী গ্রহণ।

১৮৮৪-৫ খ্রী অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম পাঁচটি ম্যাচের টেস্টসিরিজ শুরু। ইংল্যাণ্ড তিনটি টেস্টে জয়লাভ করেছিল

১৮৮৮-৯ খ্রী লর্ডস্ মাঠের বর্তমান প্যাভিলিয়ন তৈরি হল।

১৮৯০ খ্রী দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হল।

১৮৯২ খ্রী এম. সি সি. আম্পায়ারদের প্রতি নির্দেশাবলী প্রকাশ করল।

১৮৯৫ খ্রী গ্রেস মে মাসের মধ্যে মাত্র বাইশ দিন খেলে হাজার রান করলেন। তাঁর বয়স তখন সাতচল্লিশ। এ বছরেই তিনি জীবনের শততম শতরান করলেন।

১৮৯৮ খ্রী ইংল্যাণ্ডে টেস্ট খেলা পরিকল্পনার জন্য বোর্ড অব কণ্ট্রোল প্রতিষ্ঠিত হল।

১৮৯৯ খ্রী টেস্ট ম্যাচের জন্য এই প্রথম একটি সিলেকশন কমিটি (Selection Committee) গঠিত হল। এর আগে লর্ডস্ মাঠে টেস্ট খেলার জন্য দল বাছাই করত এম. সি. সি. এবং অন্যান্য মাঠে টেস্ট খেলার জন্য দল বাছাই করত সেইসব মাঠের সঙ্গে যুক্ত কাউন্টিগুলো।

ভিক্টর ট্রাম্পার কোন সফরকারী দলের পক্ষে প্রথম ত্রিশতাধিক রান করেন।

১৯০৩ খ্রী সময়বন্ধনহীন টেস্ট (Timeless Test) ও প্রশস্ত উইকেটের জন্য একটি ব্যর্থ আন্দোলন হল।

১৯০৮ খ্রী অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত।

১৯০৯ খ্রী ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স (Imperial Cricket Conference) প্রথম অনুষ্ঠিত হল। প্রাথমিক সদস্য ছিল ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা।

১৯১২ খ্রী ইংল্যাণ্ডে প্রথম এবং একমাত্র ত্রিমুখী প্রতিযোগিতা (Triangular Tournament) অনুষ্ঠিত হল।

টেস্ট ম্যাচের জন্য ট্রায়াল ম্যাচের প্রথম প্রবর্তন হল।

ওভাল মাঠে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসার জন্য প্রথম তিন দিনের বেশী সময় মঞ্জুর করা হল। খেলাটি চারদিন পর্যন্ত গড়াল এবং ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করল।

১৯২৬ খ্রী ভারতবর্ষ, নিউজিল্যাণ্ড এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সভ্যপদ লাভ করল।

১৯৩০ খ্রী চারদিনের টেস্টম্যাচ স্বীকৃত হল। ব্র্যাডম্যানের গৌরবজনক আত্মপ্রকাশ। এ সিরিজে ব্র্যাডম্যান টেস্ট খেলায় যে মোটরান সংগ্রহ করেছিলেন এটি এখনও রেকর্ড হয়ে আছে।

১৯৩২-৩৩ খ্রী কুখ্যাত 'বডিলাইন' বিতর্ক। ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সম্পর্ক তিক্ততম। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ছিলেন জার্ডিন। হ্যারেল্ড লারউডের বোলিং পদ্ধতি নিয়ে ঝড় বয়ে যায়। ব্র্যাডম্যানের ব্যাটিংকে দমন করবার জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল।

১৯৩৫ খ্রী এম. সি. সি. বডিলাইন পদ্ধতিকে নিন্দা করল এবং এ বিষয়ে আম্পায়ারদের নির্দেশ দেওয়া হল।

১৯৩৭ খ্রী এম. সি. সি. একটি কাউন্টি ক্রিকেট কমিশন (County Cricket Commission) নিযুক্ত করল। উদ্দেশ্য ছিল কাউন্টি ক্রিকেট অবস্থা পরীক্ষা করে বিবরণ দেওয়া।

১৯৩৮ খ্রী লর্ডস্ মাঠের টেস্ট ম্যাচ টেলিভিশনে দেখানো হল। টেলিভিশনে ক্রিকেট দেখানো এই প্রথম।

১৯৪৭ খ্রী ক্রিকেটের নিয়মাবলীর ব্যাপক পরিবর্তন।

১৯৪৮ খ্রী ইংল্যাণ্ডে প্রথম পাঁচদিনের টেস্ট ম্যাচ প্রবর্তিত হল।

১৯৪৯ খ্রী ছাব্বিশ জন পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়কে এম. সি. সি-র আজীবন সম্মানিত সদস্য রূপে গ্রহণ করা হল।

১৯৫২ খ্রী পাকিস্তান ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সভ্য হল।

১৯৫৭ খ্রী এম সি. সি. একটি বিশেষ কমিটি (Special Committee) নিযুক্ত করে ক্রিকেট খেলার তদানীন্তন অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা পরীক্ষা করতে চেষ্টা করল।

১৯৬০-৬১ খ্রী অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়ার যুগান্তকারী সিরিজ। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্টে উভয় দল দু ইনিংস মিলিয়ে সমান সংখ্যক রান করেছিল। ফলে টেস্ট ম্যাচে প্রথম টাই হয়েছিল।

সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পরাজিত হলেও বিজয়ী দেশের কাছ থেকে অসাধারণ অভিনন্দন লাভ করেছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে বিদায় জানাতে যত লোক উপস্থিত হয়েছিল তা নাকি অস্ট্রেলিয়ায় খুব বেশি দেখা যায় নি।

পরাজিত দলের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেলকে উদ্দেশ করে অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড একটি ট্রফির প্রবর্তন করেন, তার নাম হয় 'ওরেল ট্রফি'। টেস্ট খেলায় কোন ব্যক্তির নামে উৎসর্গিত ট্রফি এই প্রথম। বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে কোন বিজয়ী দল বিজিত দলের অধিনায়ককে এভাবে সম্মান জানাল। স্থির হল, অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট সিরিজে যে দল জিতবে তারা 'ওরেল ট্রফি' পাবে। সিরিজ জয়ের সুবাদে প্রথম 'ওরেল ট্রফি' লাভ করল অস্ট্রেলিয়া।

১৯৭৫ খ্রী ক্রিকেটের প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ইংল্যাণ্ডে। 'নক আউট' পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতা হল। ফাইনালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রথম বিশ্বকাপ লাভ করল। বিশ্বকাপের নাম 'প্রুডেন শিয়াল কাপ'।

১৯৭৭-৭৮ খ্রী ক্রিকেট রঙ্গমঞ্চে কেরি প্যাকারের আবির্ভাব। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পাকিস্তানের বহু শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় প্যাকারের দলে যোগ দিলেন। ফলে টেস্ট ক্রিকেটে সংকট ঘনিয়ে এল। এ আঘাত টেস্ট ক্রিকেট এখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

১৯৭৯ খ্রী বিশ্বকাপ বা প্রুডেনশিয়াল কাপ প্রতিযোগিতা দ্বিতীয় বার অনুষ্ঠিত হল ইংল্যাণ্ডে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে দ্বিতীয় বার প্রুডেনশিয়াল কাপ লাভ করেন। ভারতের লজ্জাজনক পরাজয়। প্রতিযোগিতায় সকলের কাছে এমন কি শ্রীলঙ্কার কাছেও ভারত হেরে গেল।

ক্রিকেটের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য বিষয়ের বিবর্তন

পিচ্ (The Pitch): ক্রিকেটের উদ্ভবকাল হতে বহু বিষয়ে পরিবর্তন হলেও পিচ্ সম্পর্কিত রীতিনীতি বিশেষ পাল্টায় নি। ক্রিকেটের প্রাচীনতম আইন লিপিবদ্ধ হয়েছিল ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। সখানেই পিচ-এর আয়তন নির্দিষ্ট হয়েছিল ২২ গজ। এখনও ২২ গজই বহাল আছে।

পিচ-এর আয়তন না পাল্টালেও কোন্ ধরনের পিচ্-এ খেলা হবে তা নিয়ে কিন্তু বার বার নিয়ম পাল্টানো হয়েছে। একেবারে প্রাচীনকালে যে দল টসে জয়লাভ করত তারাই ঠিক করবার অধিকারী ছিল কোন্ পিচ-এ খেলা হবে। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঠিক হল অতিথি বা ভ্রমণকারী দল নির্দিষ্ট মাঠ থেকে পিচ্ নির্বাচন করবে। অবশ্য সেই পিচ্ কোনমতেই যাদের মাঠ (অর্থাৎ Home team) তাদের নির্দিষ্ট পিচের থেকে ৩০ গজের বেশি দূরত্ব রাখবে না। কোন নিরপেক্ষ মাঠে (neutral ground) খেলা হলে যে দল টসে জয়লাভ করবে তারাই পিচ নির্বাচন করবার অধিকারী হবে।

উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকে পিচ নির্বাচনের ভার আম্পায়ারদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হল। অবশ্য সেই পিচ্ কখনই প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় দলের নির্ধারিত স্থানের থেকে ৩০ গজ বেশি দূরত্বে থাকবে না। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রতিযোগী দলগুলো এ-ব্যাপারে কিছু বলার অধিকার হারাল। স্থির হল যাদের মাঠে খেলা হবে তারাই পিচ্ নির্বাচন করবে।

সাধারণ ভাবে প্রতিদিন খেলা সুরু হবার আগে এবং প্রতিটি ইনিংস সুরু হবার আগে পিচে রোলার দেওয়া হয়। কতক্ষণ রোলার চালানো হবে তার ধরা-বাঁধা নিয়ম ছিল না। পরে অবশ্য ঠিক হয় সাত মিনিট ধরে রোলার চালানো হবে।

পিচে রোলার দেওয়া এবং জলসেচ করার নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়েছিল ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের আইনে।

উনিশ শতকের প্রথমদিকে যে পিচে খেলা হচ্ছে তা বৃষ্টিতে বিনষ্ট হলে অন্য পিচে খেলার বন্দোবস্ত করা হত। ১৮৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংল্যাণ্ড দল সিডনি মাঠে প্রতি ইনিংস পৃথক পিচে খেলেছিল। এখন অবশ্য এ নিয়ম রদ হয়ে গেছে।

পপিং ক্রিজ (The Popping Crease): ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের আইনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল পপিং ক্রিজের আয়তন ৪৬ ইঞ্চি হবে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এর আয়তন আর দু-ইঞ্চি বাড়িয়ে ৪৮ ইঞ্চি করা করা হয়।

বোলিং ক্রিজ (The Bowling Crease): ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আইনে উইকেটের উভয় পার্শ্বে ৩ ফুট করে স্থান বোলিং ক্রিজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তা বাড়িয়ে ৪ ফুট করা হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে উইকেটের প্রস্থ ৮ ইঞ্চি থেকে বাড়িয়ে ৯ ইঞ্চি করা হয় এবং তখন থেকেই বোলিং ক্রিজের আয়তন ৩ ফুট ১১½ ইঞ্চি করে নির্দিষ্ট হয়।

পিচে ঝাঁট দেওয়া ও রোল করা (Sweeping and Rolling): ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত কোন ম্যাচ চলার সময় পিচ্ খেলোয়াড় ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করতে পারত না। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নিয়ম হল উভয় দলের সম্মতিক্রমে পিচে রোলিং করা ও ঝাঁট দেওয়া চলবে। পিচ্ ঢেকে রাখার বন্দোবস্তও এ-সময় থেকে করা হয়।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিযোগী যে কোন দলের অনুরোধে প্রতি ইনিংস সুরু হবার আগে পিচে ঝাঁট দেওয়া ও রোলিং করা নির্ধারিত হল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিয়ম হল যে-দল ব্যাটিং করতে যাবে সেই দল ঠিক করবে সেই ইনিংসের আগে রোলিং করতে হবে কিনা। অর্থাৎ বোলিং করবার অধিকার ব্যাটিং দল লাভ করল।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঠিক হল প্রতিদিন খেলা সুরু হবার আগে ১০ মিনিট ধরে রোলিং হবে। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বোলিং করবার সময় ৭ মিনিট নির্দিষ্ট হল।

উইকেট (Wicket)

খ্রীষ্টাব্দ	স্ট্যাম্পের সংখ্যা	স্ট্যাম্পের উচ্চতা	বেলের সংখ্যা	বেলের দৈর্ঘ্য
আনুঃ ১৭০০	২টি	২২ ইঞ্চি	১	৬ ইঞ্চি
আনুঃ ১৭৭৬	৩টি	২২ ইঞ্চি	১	৬ ইঞ্চি
১৭৮৫	৩টি	২২ ইঞ্চি	২টি অথবা ১টি	৬ ইঞ্চি
১৭৯৮	৩টি	২৪ ইঞ্চি	২টি অথবা ১টি	৭ ইঞ্চি
আনুঃ ১৮১৯	৩টি	২৬ ইঞ্চি	২টি	৭ ইঞ্চি
আনুঃ ১৮২৩	৩টি	২৭ ইঞ্চি	২টি	৮ ইঞ্চি
১৯৩১	৩টি	২৮ ইঞ্চি	২টি	৯ ইঞ্চি

ব্যাট (The Bat) : ক্রিকেটে আদিযুগে ব্যাটের আকার ছিল নীচের দিকটি ভারী, প্রশস্ত এবং বাঁকানো। তখন বোলিং আণ্ডার আর্মে করা হত অর্থাৎ হাত নীচের দিকে রেখেই বল ছুঁড়ে দেওয়া হত। তার ফলে এ ধরনের বলের মোকাবিলার জন্য হকিস্টিকের মত বাঁকানো ভারী ও প্রশস্ত ব্যাট দরকারী ছিল। ক্রিকেটের পুরোনো চিত্রে এমন ব্যাট আঁকা আছে।

বাঁকানো থেকে সোজা ব্যাটে পরিবর্তন ক্রিয়াটি সম্ভবত ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছিল। কথিত আছে, ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হ্যামশায়ারের অন্তর্গত পিটারস্‌ফিল্ডের জনৈক জন স্মল প্রথম সোজা ব্যাট ব্যবহার করেছিলেন।

বহুদিন ধরে ব্যাট সাধারণত একটি মাত্র কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি করা হত। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ব্যাটের হাতল হোয়েল বোন (তিমিমাছের চোয়ালের নমনীয় অস্থি) দিয়ে তৈরি হত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাটে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হল। ব্যাটে বেত দিয়ে তৈরি হাতল ব্যবহৃত হতে লাগল।

আগেকার দিনে খেলোয়াড়দের মর্জিমত বিভিন্ন আকার ও আয়তনের ব্যাট ব্যবহৃত হত। কিন্তু জনৈক টমাস হোয়াইট হাম্বলডনে উইকেটের চাইতেও বেশি চওড়া ব্যাট ব্যবহার করায় কর্মকর্তাদের টনক নড়েছিল। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর এই ব্যাপারটি ঘটেছিল। এর দু'দিন পর হাম্বলডন ক্লাব থেকে নিয়ম জারি করা হল কোন ব্যাট ৪১/৪ ইঞ্চির বেশি প্রশস্ত হবে না। ব্যাট মেপে নেবার জন্য একটি ধাতুনির্মিত মাপকাঠি রাখা হত। এ মাপ আজ-অব্দি একই আছে।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যাটের দৈর্ঘ্যের কোন ধরা-বাঁধা সীমা ছিল না। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই প্রথম ব্যাটের দৈর্ঘ্য বেঁধে দেওয়া হল। হাতল সহ এর দৈর্ঘ্য স্থির হল ৩৮ ইঞ্চি।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্যাটসম্যানেরা লাল উইলো কাঠে তৈরি ব্যাট পছন্দ করতেন। আজকাল অবশ্য সাদা উইলো কাঠের ব্যাট ব্যবহৃত হয়।

ব্যাটের ওজন সাধারণত ২ পাউণ্ড ৩ আউন্সের মত হয়। দীর্ঘকায় ও শক্তিমান মানুষ আরও ভারী ব্যাট ব্যবহার করেন। গ্রেস নাকি খেলতেন ২ পাউণ্ড ৫ আউন্স ওজনের ব্যাট নিয়ে।

বল (The Ball) : আদি যুগে বল সাদা রঙের হত। কর্ক ও চামড়া

দিয়ে বল তৈরি প্রথম থেকেই হত। সম্ভবত একশ বছর আগে বলের রঙ লাল করা হয়েছে।

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের আইনে বলের ওজন ৫ থেকে ৬ আউন্স নির্ধারিত ছিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এ আইনকে কিছু পরিবর্তিত করে বলের ওজন নির্ধারিত হল ৫$\frac{১}{২}$ থেকে ৫$\frac{৩}{৪}$ আউন্স। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে পর্যন্ত বলের আকার নিয়ে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম জানা যায় না। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বলের বেড় ৯ থেকে ৯$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি বেঁধে দেওয়া হল। বলের ওজন সম্পর্কিত নিয়ম তারপর থেকে আর পাল্টায় নি। কিন্তু ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বলের বেড় ৮$\frac{১৩}{১৬}$ ইঞ্চি থেকে ৯ ইঞ্চির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হল।

প্যাড (The Pads): কথিত আছে সারে (Surrey) অঞ্চলের ফার্নহামের রবার্ট রবিনসন বলের আঘাত থেকে পা বাঁচাবার জন্য প্রথম প্যাড পরার পরিকল্পনা করেন। ঘটনাটি ঘটেছিল আঠারো শতকের শেষদিকে অথবা উনিশ শতকের প্রথম দিকে। কিন্তু প্রবল ব্যঙ্গের ধাক্কায় এ প্রচেষ্টা তিনি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ছোট একটি কাঠের টুকরো তিনি একটিমাত্র পায়ে বেঁধে নিয়েছিলেন।

অবশ্য ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ পা বাঁচাবার জন্য কোন আবরণী পরা নির্দিষ্ট হল। কিন্তু এ আবরণী কিছুতেই হাঁটু ঢাকতে পারবে না বলে স্থির ছিল। ফলে হাঁটুর নীচের অংশ পর্যন্ত আবৃত হত।

নটিংহামশায়ারের বোলার টমাস নিক্সন প্যাড ব্যবহারে বিপুল পরিবর্তন আনলেন। তিনি কর্ক দিয়ে তৈরি প্যাড ব্যবহার করার বিধি চালু করলেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্যাড পরার প্রচলন বিধিবদ্ধ হয়।

গ্লোভ্স (The Gloves): ব্যাটিং গ্লোভ কে আবিষ্কার করেছিলেন তা নিয়ে স্থির করে কিছু বলা যাবে না। গোড়ার দিকেও ব্যাটসম্যান সম্ভবত গ্লোভ ব্যবহার করতেন। অবশ্য গ্লোভ ব্যবহারের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ-বছরেই জনৈক ওয়ানোস্ট্রসট্ গ্লোভ ব্যবহার করেছিলেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রবার্ট ডার্ক ইণ্ডিয়া রাবারে তৈরি টিউবাকৃতি ব্যাটিং গ্লোভ ব্যবহার করেছিলেন।

উইকেট কীপারের জন্য গ্লোভ ব্যবহারের রীতি প্রচলন করেন বিখ্যাত ক্রিকেট সরঞ্জাম নির্মাতা ডিউক অ্যাণ্ড সন কোম্পানি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। অবশ্য এখনকার মত এ গ্লোভ আরামদায়ক ছিল না।

একটি ওভারে কবার বল করা হবে :

১৭৪৪ খ্রী ৪টি করে বল স্বীকৃত ছিল।

১৮৮৭ খ্রী অস্ট্রেলিয়ায় ৬ বলের ওভার গৃহীত হল।

১৮৮৯ খ্রী ৫ বল।

১৯০০ খ্রী ৬ বল।

১৯১৮ খ্রী অস্ট্রেলিয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে ৮ বলের ওভার সুরু হল।

১৯২২ খ্রী অস্ট্রেলিয়ায় ৮ বলের ওভার বাধ্যতামূলক হল। এর পরবর্তী কালে অস্ট্রেলিয়ায় ৮ বলের বরাবর চালু আছে। কেবলমাত্র ১৯২৮-২৯ এবং ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সঙ্গে টেস্ট-সিরিজে ৬ বলের ওভার নির্দেশিত হয়েছিল। অন্যত্র ৬ বলের ওভার চালু আছে।

১৯৩৯ খ্রী থেকে ইংল্যাণ্ডে ৮-বলের ওভার প্রবর্তিত করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ডস মাঠের খেলায় ৬ বলের ওভার আবার গ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯৪৭ খ্রী উভয় দলের যে কোন একজন অধিনায়কের অনুরোধে আম্পায়ার খেলার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলেও ওভারটি সমাপ্ত করার নির্দেশ দিতে পারেন।

নো বল (No Ball)

১৮০৯ খ্রী একমাত্র বোলারের পা ক্রিজে চলে এলে নো-বল ডাকা হত। [Foot over Crease]।

১৮১৬ খ্রী ছুঁড়ে বল করাকে বেআইনী করার চেষ্টা হল, হাত কনুইয়ের নীচে থাকা বাধ্যতামূলক ছিল।

১৮৩৫ খ্রী হাত কাঁধের ওপর তোলা নিষিদ্ধ হল।

১৮৬৪ খ্রী বর্তমান কালে প্রচলিত নিয়মটি চালু হল।

১৮৯৯ খ্রী উভয় আম্পায়ারের যে-কোন একজন নো-বল ডাকার অধিকারী হলেন।

১৯৪৭ খ্রী বল নিক্ষেপের সময় বোলারের পেছনের পা মাটি না ছুলেও চলবে। তবে পেছনের পা সর্বদাই বোলিং ক্রিজের থেকে বেরিয়ে আসবে না।

ইনিংস ডিক্লারেশন (Declaration)

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম স্বীকৃত হয়েছিল তবে কেবলমাত্র খেলার তৃতীয় দিনে ডিক্লেয়ার করা চলত।

১৯০০ খ্রী দ্বিতীয় দিনের খেলার মধ্যাহ্নভোজের পর যে কোন সময়ে স্বীকৃত হল।

খেলার দ্বিতীয় দিনের যে-কোন সময়ে স্বীকৃত হল।

১৯৫৭ খ্রী খেলা চলাকালীন যে-কোন সময়ে নির্দেশিত হল।

ফলো-অন (Follow on)

১৭৮৭ খ্রী ফলো-অনের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৮৩৫ খ্রী একশ রানের তফাত থাকলে ফলো-অন বাধ্যতামূলক বলে স্বীকৃত হল।

১৮৫৪-১৮৯৪ খ্রী ৮০ রানের ব্যবধানে ফলো-অন করানো যেত।

১৮৯৪ খ্রী ১২০ রানের ব্যবধানে ফলো-অন বাধ্যতামূলক হল।

১৯০০ খ্রী ১৫০ রানের ব্যবধান থাকলে ফলো-অন করানো যেতে পারে। তবে তা বাধ্যতামূলক নয়।

টস (Toss)

১৭৪৪ খ্রী পিচ্ এবং ইনিংস বেছে নেবার জন্য টস প্রবর্তিত হল।

১৭৭৪ খ্রী অতিথি দল পিচ ও ইনিংস বেছে নেবার অধিকারী হল।

আঃ ১৮০৯ খ্রী আম্পায়ারের ওপর পিচ নির্বাচনের ভার পড়ল। টস করে ইনিংস বেছে নেবার অধিকার বর্তাল।

লেগ বিফোর উইকেট (L. B. W)

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আইনে এ-বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই।

১৭৪৪ খ্রী ব্যাটসম্যান ইচ্ছে করে বল উইকেটে লাগতে না দিলে এল. বি. ডব্লিউ আউট হবে স্থির হয়েছিল।

১৭৮৮ খ্রী ইচ্ছে করে শব্দটি পরিত্যক্ত হল। বল সোজা পিচ পড়লে আউট হবে স্থির হল।

আঃ ১৮২১ খ্রী বল সোজা পিচ না পড়লেও চলবে, বলটি সোজা নিক্ষিপ্ত হতে হবে (delivered straight)।

১৮৩৯ খ্রী ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নিয়ম আবার প্রবর্তিত হল।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমান নিয়মটি চালু হয়েছে।

স্ট্যাম্প আউট (Stamped)

১৭৪৪ খ্রী প্রথম উল্লিখিত।

নিয়মকানুন

ক্রিকেট খেলার আইনকানুন সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছিল ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। এর আগে সম্ভবত কোন গুরুত্বপূর্ণ খেলার আগে প্রতিযোগী দল দুটি নিজেদের সুবিধে মতো কিছু নীতি ও নিয়ম ঠিক করে নিত। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে দ্য নিউ ইউ-নিভার্সাল ম্যাগাজিনের (The New Universal Magazine) নভেম্বর সংখ্যায় ক্রিকেটের আইনকানুনের প্রাচীনতম খসড়াটি মুদ্রিত হয়েছিল। এ আইনকানুন নির্ধারণ করেছিল লণ্ডন ক্লাব। ফিন্সবারির আর্টিলারি মাঠে কেণ্ট বনাম সমগ্র ইংল্যাণ্ড দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা হয়েছিল ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন। এ খেলাটি পরিচালনার জন্য এ আইনকানুন লিপিবদ্ধ হয়েছিল। অবশ্য এটিই ক্রিকেটের প্রাচীনতম আইনের দলিল নয়। এ দলিল তৈরি হয়েছিল সম্ভবত এরও পূর্বে প্রচলিত কোন আইনের খসড়া থেকে। কেননা, এর আগে সংঘটিত খেলা পরিচালনার কিছু বিধিনির্দেশ (Articles of Agreement) ঐতি-হাসিকদের হস্তগত হয়েছে।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে আইনকানুন সর্বপ্রথম একটি পুস্তিকা হিসেবে ছাপা হয়েছিল। লণ্ডনের ফ্লিট স্ট্রীটের জনৈক মিঃ রীভ এটি বিক্রয় করতেন। এটি ছাপিয়েছিলেন মিঃ রীড।

পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে ক্রিকেটের আইনকানুনে বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত আইনকানুন এখানে উদ্ধৃত হল।

১ : দল

খেলা হবে দু দলের মধ্যে। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রতি দলে এগারোজন করে খেলোয়াড় খেলবেন। প্রতি দলে একজন অধিনায়ক থাকবেন। টস করার আগেই অধিনায়ক খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করবেন; অতঃপর এদের মধ্যে কাউকেই আর বিপক্ষ অধিনায়কের সম্মতি ছাড়া বদলানো যাবে না।

ব্যাখ্যা: (ক) অধিনায়কের অনুপস্থিতিতে মাঠে একজন সহকারী তাঁর জায়গায় অধিনায়কত্ব করবেন।

(খ) কোন খেলায় এগারোজনের বেশি খেলোয়াড় একই সঙ্গে মাঠে ফিল্ড করতে নামতে পারবেন না— যদি নামে তবে সে খেলাটি প্রথম শ্রেণীর বলে গণ্য হবে না।

২: পরিবর্ত

খেলার সময় কেউ অসুস্থ বা আহত হলে তাঁর জায়গায় একজন ফিল্ড করতে বা ব্যাটসম্যানের পক্ষে রানার হিসাবে দৌড়তে পারবেন অবশ্য বিপক্ষ অধিনায়কের সম্মতিক্রমে। কিন্তু এছাড়া অন্য কারণে কোন বদলি খেলোয়াড়ের প্রয়োজন হলে বিপক্ষ দলের অধিনায়কের সম্মতি নিতে হবে। কোন বদলি খেলোয়াড়ই ব্যাট বা বল করার সুযোগ পাবেন না। বদলি খেলোয়াড়কে ফিল্ডিং করতে কোন্‌খানে দাঁড় করানো হবে সে-সম্পর্কে আপত্তি করার অধিকার বিপক্ষ অধিনায়কের। রানার হিসাবেও যে কোন খেলোয়াড় নেওয়া চলবে না, বিপক্ষ অধিনায়কের সম্মতি নিয়েই রানার নিয়োগ করতে হবে।

ব্যাখ্যা: (ক) কোন খেলোয়াড়ের হয়ে কেউ বদলি হিসাবে মাঠে ফিল্ডিং করতে নামলেও নির্বাচিত খেলোয়াড়টি যখনই সক্ষম হবেন তখনই তিনি খেলায় যথানির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করতে পারবেন। বদলি রানার নিয়মানুযায়ী রান আউট হলে আউট হবেন মূল ব্যাটসম্যান।

(খ) কোন খেলোয়াড় আহত বা অক্ষম হলে তখনই বদলি খেলোয়াড় চাওয়ার অধিকার বিবেচিত হয়। ইনিংসে বদলি খেলোয়াড় সারাক্ষণ ফিল্ড করলেও নির্বাচিত খেলোয়াড়ের ব্যাট করার অধিকার থাকবে।

(গ) আহত ব্যাটসম্যান আউট হবেন যদি তাঁর রানার ৩৬, ৪০ ও ৪১ নম্বর নিয়ম ভঙ্গ করে থাকেন। স্ট্রাইকার হিসাবে এইসব নিয়মের অধীনে তাঁকে থাকতে হবে। তিনি যদি পপিং ক্রিজের বাইরে থাকেন তবে ৪১ ও ৪২ নিয়ম অনুযায়ী তিনি শুধু উইকেট কীপারের দিকে আউট হবেন, তখন অন্য ব্যাটসম্যান বা বদলি খেলোয়াড় যেখানেই থাকুন না কেন। আহত খেলোয়াড় যখন স্ট্রাইকার নন তখন তিনি এমন জায়গায় (সাধারণত স্কয়ার লেগ—আম্পায়ারের পাশে) দাঁড়াবেন যাতে খেলার কোন বিঘ্ন না ঘটে।

৩: আম্পায়ার নিয়োগ

টস করার আগেই পরিচালনার জন্য দুজন আম্পায়ার নিয়োগ করতে হবে। উইকেটের উভয় প্রান্তে দুজন আম্পায়ার নিরপেক্ষভাবে নিয়ম অনুযায়ী খেলা পরিচালনা করবেন। দু দলের অধিনায়কের বিনা অনুমতিতে কোন আম্পায়ার পরিবর্তন করা চলবে না।

খেলা শুরুর ৩০ মিনিট আগে আম্পায়াররা তাঁদের উপস্থিতি মাঠের কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

৪: স্কোরার

খেলায় যত রান হবে সেই খেলার জন্য নিযুক্ত স্কোরার তা রেকর্ড বুকে লিখবেন এবং আম্পায়ারের নির্দেশ ও ইশারার দিকে দৃষ্টি রেখে তার যথাযথ প্রত্যুত্তর দেবেন।

আম্পায়ার যতক্ষণ না স্কোরারের কাছ থেকে সংকেতের প্রত্যুত্তর পাবেন ততক্ষণ তিনি খেলা শুরু না করে অপেক্ষা করবেন। কোন বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে আম্পায়ার ও স্কোরারের মধ্যে আলোচনা করে তা নিরসন করতে হবে।

৫: বল

খেলায় ব্যবহৃত বলের ওজন ৫$\frac{১}{২}$ আউন্সের কম ও ৫$\frac{৩}{৪}$ আউন্সের বেশি হওয়া চলবে না। পরিধিতে ৮$\frac{১৩}{১৬}$ ইঞ্চির কম ও ৯ ইঞ্চির বেশিও হবে না। পূর্বেই অন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা যদি করা না থাকে তবে প্রতি অধিনায়কের যে কেউই ইনিংসের শুরুতে নতুন বল দাবি করতে পারবেন। বল হারালে বা খেলার অযোগ্য হয়ে পড়লে আম্পায়ার অন্য বল দেবেন। বল পরিবর্তন হলে তা অবশ্যই ব্যাটসম্যানকে জানাতে হবে।

ব্যাখ্যা: ক। প্রথম শ্রেণীর কোন খেলা শুরু হবার আগে আম্পায়ার ও অধিনায়করা বল পরীক্ষা করে নেবেন। ইনিংস শুরু হবার আগে অধিনায়ক নতুন বল চাইতে পারেন।

(খ) নির্দিষ্ট সংখ্যক ওভার শেষ হয়ে গেলে প্রথম শ্রেণীর খেলায় ফিল্ডিং দলের অধিনায়কই ইচ্ছা করলে নতুন বল চাইতে পারেন। কত ওভারে নতুন বল নেওয়া হবে তা যেখানে খেলা হচ্ছে সেখানকার ক্রিকেট-সংস্থাই নির্দিষ্ট করে দেবে। অবশ্য এই সংখ্যা ৭৫ ওভারের কম বা ৮৫ ওভারের বেশি হবে না। ৮-বলে ওভার (অস্ট্রেলিয়া) হলে ৫৫ থেকে ৬৫ ওভারের মধ্যে হবে।

(গ) কোন বল হারিয়ে গেলে বা খেলার অনুপযুক্ত হয়ে পড়লে বদলি হিসাবে যে বলটি ব্যবহার করা হবে তা পূর্বের বলটি বাতিল হবার সময়ে ব্যবহারের ফলে যতখানি ক্ষয়ে গিয়েছিল সেই পরিমাণ ব্যবহৃত বা ক্ষয়ে-যাওয়া হতে হবে।

৬: ব্যাট

ব্যাট অবশ্যই ৪$\frac{১}{২}$ ইঞ্চির বেশি চওড়া এবং ৩৮ ইঞ্চির বেশি লম্বা হবে না।

৭: পিচ

দুই প্রান্তের বোলিং ক্রিজের মধ্যের জায়গার নাম পিচ। দুই উইকেটের

কেন্দ্রবিন্দুর সংযোগরেখার দু দিকই পাঁচ ফুট করে চওড়া হবে। টস করার আগে পর্যন্ত পিচ নির্বাচন ও পরিচালনার ভার মাঠ-কর্তৃপক্ষের হাতে থাকবে। টসের পর আম্পায়াররা পিচের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করবেন। খেলার সময় পিচ বদল করা চলবে না। অবশ্য পিচ যদি একেবারেই খেলার অনুপযোগী হয়ে পড়ে তবে উভয় অধিনায়কের মত নিয়ে পিচ পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৮: উইকেট

পিচের দৈর্ঘ্য হবে ২২ গজ। উইকেট প্রস্তুতের জন্য পিচের উভয় প্রান্তে তিনটি করে স্টাম্প সোজাসুজি এবং সমান্তরালভাবে পুঁততে হবে। প্রত্যেক উইকেট চওড়ায় হবে ৯ ইঞ্চি। প্রতি উইকেটে থাকবে তিনটি স্টাম্প আর স্টাম্প তিনটির উপর থাকবে দুটি বেল। স্টাম্পগুলির গঠন সমান মাপের থাকবে, আর মাটিতে এমনভাবে পুঁততে হবে যাতে স্টাম্পের ফাঁক দিয়ে বল গলে না যেতে পারে। মাটি থেকে স্টাম্পের উচ্চতা হবে ২৮ ইঞ্চি। বেলগুলি লম্বায় হবে ৪$\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি এবং উইকেটের উপর বসিয়ে দেওয়ার পর $\frac{১}{২}$ ইঞ্চির বেশি উঁচু হতে পারবে না।

অতিরিক্ত বাতাস বইলে আম্পায়ারের মত নিয়ে অধিনায়করা উইকেটের উপর বেল ব্যবহার না করায় রাজি হতে পারেন।

৯: বোলিং ও পপিং ক্রিজ

৮ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা বোলিং ক্রিজ স্টাম্পের সঙ্গে এক লাইনে থাকবে। স্টাম্প-গুলি ঠিক মাঝখানে থাকবে। বোলিং ক্রিজের ৪ ফুট সামনে সমান্তরালভাবে থাকবে পপিং ক্রিজ। বোলিং ক্রিজের শেষ দুই প্রান্তে সমকোণ করে দুটি রিটার্ন ক্রিজ করে দিতে হবে। রিটার্ন ক্রিজ ও পপিং ক্রিজের দৈর্ঘ্য ইচ্ছেমতো বাড়ানো যেতে পারে।

ব্যাখ্যা: (ক) ব্যাটসম্যানকে পপিং ক্রিজের মধ্যে থাকতে হবে কিংবা তাঁর ব্যাট পপিং ক্রিজের ভিতর ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

(খ) বিরতির সময় পপিং ক্রিজ আর রিটার্ন ক্রিজের দাগ পুনরায় টানতে হবে।

১০: রোল করা, ঘাস ছাঁটা ও জল দেওয়া

বিশেষ অনুমতি ছাড়া প্রতিদিন প্রতি ইনিংসের খেলা শুরুর আগে ছাড়া পিচ রোল করা যাবে না। এই সময় ব্যাটিং দলের অধিনায়ক চাইলে মাত্র ৭

মিনিট পিচে রোল করা বা ঝাঁট দেওয়া হবে—তার বেশি নয়। খেলাটি তিন বা তার বে'শ দিনের হ'লে, খেলা শুরুর পর থেকে একদিন অন্তর আম্পায়ারদের তত্ত্বাবধানে পিচের ঘাস ছাঁটাই করতে হবে। কোন কারণে যদি খেলা বন্ধ থাকে তাহলে পিচের ঘাস ছাঁটা বন্ধ হবে না। খেলা আবার শুরু হলে সেদিন পিচের ঘাস ছাঁটা হবে (বিরতির দিন:ক খেলার দিন হিসাবে ধরা হবে) তারপর ছাঁটা হবে একদিন অন্তর। খেলা চলার সময় ঘাসে জল দেওয়া চলবে না।

ব্যাখ্যা : (ক) ব্যাটিং দলের অধিনায়কের অনুরোধে আম্পায়ার নিয়মসংগতভাবে পিচে রোলিং করতে পারেন। তবে রোলিং-এর জন্য যেন খেলা দেরিতে না শুরু হয়।

(খ) অধিনায়ক ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে পিচ বোলিং-এর সময়কে খেলার সময়ের মধ্যে ধরতে হবে।

(গ) যুক্তরাজ্য ছাড়া অন্যদেশে যদি বৃষ্টি-ভেজা পিচে ক্ষতি হয় তাহলে সেদিনের খেলার শেষ থেকে পরের দিনের খেলা শুরুর মধ্যে যে কোন সময় আম্পায়াররা একমত হলে পিচ ঝাঁট দেবার ও রোল করার নির্দেশ দেবেন। সব সময়েই এই রোলিং আম্পায়ারদের তত্ত্বাবধানে হবে। সময় ও রোলার সম্পর্কে গ্রাউণ্ডসম্যানের মতামত বিবেচ্য। বৃষ্টির জন্যে একই দিনে একবারের বেশি রোলিং মঞ্জুর করা হবে না।

(ঘ) ব্যাটিং দলের অধিনায়ক ইচ্ছা অনুযায়ী খেলা শুরুর ১০ মিনিট আগে পর্যন্ত রোলিং মুলতুবি রাখতে পারেন।

১১ : পিচ ঢাকা

আগে থেকে ঠিক করা না থাকলে খেলার দিনগুলিতে সম্পূর্ণভাবে পিচকে ঢেকে রাখা চলবে না। বোলারদের রান আপ ঢাকার জন্যে যে আচ্ছাদন ব্যবহার করা হয়, তা পপিং ক্রিজ থেকে ৩½ ফুটের বেশি সামনে যাবে না।

খেলার আগে, কিংবা দরকার হলে খেলার মধ্যেও রান-আপ ঢাকা চলবে। তবে বৃষ্টি না হলে সকালবেলায় ঢাকা তুলে ফেলতে হবে।

১২ : পিচ মেরামত

ব্যাটসম্যানরা ব্যাট দিয়ে পিচ ঠুকতে পারেন। আর খেলোয়াড়েরা দৃঢ় পদক্ষেপের জন্য কাঠের গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন, অবশ্য এতে যদি ৪৬ নম্বর নিয়ম লঙ্ঘিত না হয়। ভিজে আবহাওয়ায় ব্যাটসম্যান বা বোলারদের দ্বারা

সৃষ্ট গর্ত খেলার সুবিধার জন্য প্রয়োজন হলে সমান করার এবং শুকিয়ে নেওয়ার দিকে আম্পায়াররা নজর রাখবেন।

১৩ : ইনিংস

প্রতি দল দুটো করে ইনিংস খেলবে। কোন্ দল প্রথম ব্যাটিং বা বোলিং করবে তা মাঠে টসের দ্বারা নির্ধারিত হবে।

ব্যাখ্যা : (ক) খেলা শুরুর ১৫ মিনিট আগে অধিনায়করা টস করবেন। টস জিতে ব্যাট করা বা ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত অপরপক্ষের অধিনায়ককে একবার জানিয়ে দেওয়ার পর আর তা পরিবর্তন করা চলবে না।

(খ) একদিনের খেলায় যেখানে এক ইনিংসে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় সেখানেও এই নিয়মই চালু থাকবে।

১৪ : ফলো অন

যে দল প্রথম ব্যাট করে তারা অপর দল থেকে পাঁচ বা তার বেশি দিনের খেলায় ২০০ রানে, তিন বা চার দিনের খেলায় ১৫০ রানে, দুদিনের খেলায় ১০০ রানে ব' একদিনের খেলায় ৭৫ রানে এগিয়ে থাকলে, সেই দলের অধিনায়ক ইচ্ছা করলে প্রতিপক্ষের ইনিংস শেষ হবার পরে নিজের দলকে ব্যাটিং করতে না পাঠিয়ে প্রতিপক্ষ দলকেই আবার ব্যাটিং করতে বাধ্য করতে পারেন। একে বলা হয় ফলো-অন করানো।

১৫ : ডিক্লারেশন

খেলাটি যত দিনেরই হোক না কেন ব্যাটিং দলের অধিনায়ক খেলার মধ্যে যে-কোন সময় তার দলের ব্যাটিং-এর সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারেন। একে বলা হয় ডিক্লেয়ার করা।

১৬ :

আবহাওয়ার জন্যে খেলা দেরিতে শুরু হলে, পরে আর যত সময়ে খেলা যাবে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৪ নম্বর নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

১৭ : খেলা শুরু, সমাপ্তি ও বিরতি

মধ্যাহ্নভোজ ও চা-পানের জন্যে নির্ধারিত সময় ছাড়া প্রত্যেক ইনিংস শেষ হলে অপর ইনিংস শুরু করার জন্যে আম্পায়ার ১০ মিনিট সময় দেবেন। প্রতি নতুন ব্যাটসম্যানকে মাঠে নামার জন্যে অন্তত দু-মিনিট সময় দিতে হবে। প্রতি ইনিংসের এবং প্রতিদিনের খেলার শুরুতে বা যে-কোন বিরতির পর বোলারের প্রান্তের আম্পায়ার প্লে ডাকবেন, তখন কোন দল যদি খেলতে

অস্বীকার করে তবে সেই দল পরাজিত দল হিসাবে গণ্য হবে। প্লে ডাকার পর ট্রায়াল বল দেওয়া যাবে না। একজন ব্যাটসম্যান আউট হলে অপরজন না আসা পর্যন্ত কেউ ব্যাট করতে পারবেন না।

ব্যাখ্যা: (ক) এমনভাবে আম্পায়ার 'প্লে' ডাকবেন যাতে দু-দলই ভালো করে শুনতে পায়। ফলে তাঁরা বুঝতে পারবেন খেলা শুরু করার আবেদন জানানো হয়েছে এবং এর ফলে অপর দল খেলতে রাজি কিনা সে বিষয়েও সুনিশ্চিত হতে পারবেন।

(খ) আউট-হয়ে-যাওয়া ব্যাটসম্যান মাঠ ত্যাগ করার আগেই বা সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যাটসম্যান যাতে আসেন অধিনায়করা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

(গ) যদি আগে থেকে কোন চুক্তি না থাকে তবে মধ্যাহ্নভোজের বিরতি ৪৫ মিনিটের বেশি হবে না। মধ্যাহ্ন বা চা-বিরতির যদি দু-মিনিট বাকি থাকার মধ্যে কোন উইকেট পড়ে তাহলে খেলা বিরতির পর শুরু হবে।

(ঘ খেলার সময় পিচে বোলিং প্র্যাকটিস করা চলবে না।

১৮:

প্রতিদিন খেলার বিরতির সময় বা খেলার শেষে আম্পায়ার 'টাইম' ডাকবেন আর সেই সঙ্গে উভয় উইকেট থেকে বেল তুলে নেবেন। যদি বিরতি বা খেলা শেষ হবার আগে অল্পসময় থাকে তাহলে নতুন ওভার শুরু হবে এবং ওভারের মধ্যে যদি কোন ব্যাটসম্যান আউট বা আহত হয়ে মাঠ ত্যাগ করেন তাহলে খেলাও সেদিনের মতো শেষ হবে। কিন্তু খেলার শেষ দিনে অধিনায়কদের যে-কোন একজনের অনুরোধ থাকলে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও সে ওভার বোলারকে শেষ করতে হবে।

ব্যাখ্যা: (ক) কোন কারণে দিনের শেষ ওভারে যদি খেলোয়াড়রা মাঠ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন তাহলে আম্পায়ার টাইম ঘোষণা করবেন। খেলার শেষ দিনের শেষ ওভারেও যদি এইরূপ ঘটে তাহলেও খেলা পুনরায় শুরু হবে না এবং খেলা সমাপ্ত বলে ঘোষিত হবে

(খ কোন বিরতির ঠিক আগে বা দিনের শেষ ওভারটি শুরু করতেই হবে যদি স্কোয়ার লেগের দিকের আম্পায়ার এসে বোলারদের প্রান্তের উইকেটের পিছনে নিজের জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারেন।

(গ) খেলা শেষ হবার এক ঘণ্টা বাকি থাকার মধ্যে যদি কোন বোলার

বল করতে অসমর্থ হয়ে পড়েন তবে বাকি বলগুলিও সেই দিক থেকে অন্য কোন বোলারকে করতে হবে।

(ঘ) খেলার শেষ দিকে খেলা শেষ হতে যখন এক ঘণ্টা বাকি তখন আম্পায়ার তা নির্দেশ করবেন, আর সেই মুহূর্ত থেকে (যদি না খেলার ফল আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকে) খেলা কমপক্ষে কুড়ি (৬-বলে) ওভার বা পনেরো (৮-বল) ওভার চলবে।

(ঙ) খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সর্বনিম্ন যত ওভার বল করার কথা তা যদি করা হয়ে যায় তবুও (মীমাংসা না হলে) খেলা চলবে খেলা শেষ হবার নির্ধারিত সময় অবধি।

১৯: স্কোরিং

রানের দ্বারাই স্কোর গোনা হবে। ব্যাটসম্যানরা বল মেরে অথবা বল যখন ডেড নয় তখন একদিকের পপিং ক্রিজ থেকে অন্যদিকের পপিং ক্রিজে দৌড়ে গেলে এক রান হয়। কিন্তু কোন এক ব্যাটসম্যান যদি একটি শর্ট রান নেন, অর্থাৎ অপর প্রান্তে না পৌছেই ফিরে আসেন তখন আম্পায়ার ওয়ান শর্ট ডাকবেন এবং সংকেত জানাবেন সেই রানটি স্কোর হিসাবে না লেখার জন্য। যদি স্ট্রাইকার কট আউট হন তাহলে কোন রান হবে না। কোন ব্যাটসম্যান রান আউট হলে যে-রানটি নেবার চেষ্টায় তাকে রান আউট করা হয়েছে, সেই রানটি যোগ হবে না।

ব্যাখ্যা: (ক) ব্যাটসম্যান যদি বল খেলার জন্যে ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে বল মেরে রান নিতে শুরু করেন তাহলেও আম্পায়ার সেই রান দেবেন।

(খ) যে কোন ব্যাটসম্যান যদি শর্ট রান নেন তবে তা বাতিল হয়ে যাবে। তিন বা তার চেয়ে বেশি রান নেবার সময় একাধিক শর্ট রান হতে পারে। তবে যতগুলি শর্ট রান হবে সবগুলিই রান হিসাবে বাতিল হয়ে যাবে।

(গ) আম্পায়ার হাত ভেঙে আঙুলের গোড়া কাঁধে ঠেকিয়ে ওয়ান শর্ট রানের ইশারা দেবেন। একাধিক শর্ট রান হলে বিশেষ নির্দেশের প্রয়োজন হয়।

২০: বাউণ্ডারি

টস করার আগেই আম্পায়াররা বাউণ্ডারি লাইন পরিদর্শন করবেন এবং উভয় পক্ষের সঙ্গে বাউণ্ডারি সীমানা সম্পর্কে সহমত হবেন। কোন দ্বিমত থাকলে তাও মিটিয়ে ফেলতে হবে টসের আগেই। স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান

খেলার পর, বলটির কার্যকরী অবস্থার মেয়াদ থাকাকালে যদি বলটি বাউণ্ডারি লাইন পার হয়ে যায় বা স্পর্শ করে কিংবা বল নিয়ে কোন ফিল্ডার লাইন পার হয়ে যায় বা স্পর্শ করে তাহলে আম্পায়ার বাউণ্ডারি ডাকবেন এবং সংকেত জানাবেন। বাউণ্ডারি হবার আগে যদি ব্যাটসম্যানরা দৌড়ে বাউণ্ডারির জন্য প্রদেয় রানসংখ্যার চেয়ে বেশি রান করতে পারেন তবে সেই বেশি রানই স্কোর হিসাবে গোনা হবে। ব্যাটসম্যান রান করার পর যদি ফিল্ডারের বল ছোড়ার দোষে (ওভার-থ্রোতে) বা ইচ্ছাকৃত অপচেষ্টায় বল বাউণ্ডারি লাইন অতিক্রম করে তাহলে যে কটি রান হয়েছে তার সঙ্গে বাউণ্ডারির চার রানও যোগ হবে। বাউণ্ডারি লাইনের দূরত্ব পিচ থেকে ৭৫ গজের বেশি হওয়া চলবে না।

ব্যাখ্যা : (ক) বাউণ্ডারি লাইন কোথায় হবে তা আম্পায়াররা স্থির করবেন। যদি খুঁটি পুঁতে বা পতাকা দিয়ে বাউণ্ডারি চিহ্নিত করা হয় তবে এইসব খুঁটি বা পতাকার মধ্যে কাল্পনিক রেখা টেনে বাউণ্ডারি নির্ণয় করা হবে। বাউণ্ডারি সাদা দাগ দিয়ে চিহ্নিত করাই শ্রেয়।

(খ) সাধারণত বাউণ্ডারি হলে রান হয়। কিন্তু বল যদি মাটিতে পিচ না খেয়ে (ফিল্ডারের গায়ে লেগে গেলেও ক্ষতি নেই) বাউণ্ডারি সীমানা পার হয়ে যায় তবে ৬ রান হবে। যদি সাইট-স্ক্রীন সীমানার মধ্যে থাকে তাহলে বল উঁচু হয়ে মাটি না ছুঁয়েও স্ক্রীনে লাগলে ওভার বাউণ্ডারি দেওয়া হবে না—বাউণ্ডারি হিসাবে ৪ রানই হবে।

মাঠের ভেতরের সাইট-স্ক্রীন বাউণ্ডারি হিসাবে গণ্য হবে—অবশ্য আম্পায়াররা বাউণ্ডারি হিসাবে গণ্য হবেন না। অর্থাৎ আম্পায়ারের গায়ে বল লাগলে তাতে বাউণ্ডারির ৪ রান পাওয়া যাবে না। সেইরকম যদি আম্পায়াররা আগে থেকে স্থির না করে রাখেন তবে কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তির গায়ে লেগে কোনভাবে বাধা পেয়ে বল থেমে গেলে তা বাউণ্ডারি হিসাবে গণ্য হবে না।

(গ) আম্পায়ার একটি হাত সামনে তুলে এপাশ থেকে ওপাশে নাড়িয়ে বাউণ্ডারির সংকেত জানাবেন আর ওভার-বাউণ্ডারির সংকেত জানাতে দু'হাত তুলে নাড়াবেন মাথার ওপর।

২১ : লস্ট বল

খেলা চলার সময় যদি বল হারিয়ে যায় বা বলকে উদ্ধার করবার সম্ভাবনা না থাকে তবে যে কোন ফিল্ডার লস্ট বল ডাকতে পারেন। লস্ট বল হলে

স্কোরের সঙ্গে ৬ রান যোগ হবে। লস্ট বল হবার আগে ব্যাটসম্যানরা ছুটে ৬ রানের বেশি করলে, সবকটিই স্কোরের মধ্যে গোনা হবে।

ব্যাখ্যা : ব্যাটসম্যান ছুটে ৬ রান করার আগেই ফিল্ডার লস্ট বল ডাকতে পারেন। কিন্তু বলটি সঙ্গে সঙ্গে পুনরুদ্ধার হলেও লস্ট বল ডাকার প্রাপ্য হিসাবে ৬ রান দিতেই হবে। বলটি না পাওয়া গেলে পরিবর্তে যে বলটি দিয়ে খেলা হবে সে সম্পর্কে ৫ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

২২ : ফলাফল

যে পক্ষের মোট রান (এক বা দুই ইনিংস) বিপক্ষের এক বা দু ইনিংসে সংগৃহীত মোট রানের চেয়ে বেশি হবে সেই পক্ষই জয়লাভ করবে। এক দিনের অসম্পূর্ণ খেলায়, প্রথম ইনিংসের ফলাফলে খেলার মীমাংসা হবে। কোন পক্ষ যদি হার স্বীকার করে নেয় বা ১৭ নম্বর নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্রেও খেলার মীমাংসা হতে পারে। জয়-পরাজয় নির্ধারিত না হলে খেলাটি অমীমাংসিত বলে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা : (ক) খেলা শেষে নির্ভুল স্কোর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার দায়িত্ব অধিনায়কদের।

(খ) খেলার মীমাংসা হয়ে গেলে আর খেলা চালাতে বাধা করা যাবে না। সময় থাকলে বাকি সময়ে খেলার ফলাফলের হেরফের ঘটতে পারে মনে করলে আম্পায়াররা একদিনের খেলায় প্রথম ইনিংসের ভিত্তিতে ফলাফল বিচার না করে খেলা চালিয়ে যেতে পারেন।

(গ) রানের দ্বারাই খেলার ফলাফল নির্ধারিত হবে। অবশ্য বিজয়ী দল যদি শেষে ব্যাট করে অপর দলের রান সংখ্যা অতিক্রম করে যায় তবে যে কটি উইকেট অবশিষ্ট থাকবে—সে ক্ষেত্রে অপর দল সেই কটি উইকেটে পরাজিত হয়েছে বলা হবে।

(ঙ) খেলা শেষে যদি দু দলের রান সংখ্যা সমান-সমান হয় তবে এই অমীমাংসিত খেলাকে টাই বলা হবে। একদিনের খেলাতেও প্রথম ইনিংসে দু দলের রান সংখ্যা সমান-সমান হলে খেলা টাই হয়ে যাবে। অবশ্য যদি পর্যাপ্ত সময় থাকে তবে ফলাফল নির্ধারণের জন্যে অধিনায়ক ও আম্পায়াররা বাকি সময় ভাগাভাগি করে নিতে পারেন।

২৩ : ওভার (বোলিং)

পর্যায়ক্রমে প্রতি উইকেট প্রান্ত থেকে এক ওভার করে বল করা হবে। স্থিরীকৃত

শর্তাদি অনুসারে ৮ বা ৬ বলে একটি ওভার সম্পূর্ণ হবে। নির্দিষ্ট-সংখ্যক বল করা শেষ হলে আম্পায়ার ওভার ডাকবেন। যতগুলি নো বা ওয়াইড বল হবে, আম্পায়ার বোলারকে ততগুলি বাড়তি বল করতে দেবেন।

ব্যাখ্যা : কোন রকম চুক্তি না হয়ে থাকলে কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত দেশে ৬-বলে একটি করে ওভার হবে। যদি ভুল করে আম্পায়ার বোলারকে বেশি বল করতে দিয়ে থাকেন, তাহলে বাড়তি বলগুলিও নিয়মসিদ্ধরূপে গণ্য হবে।

২৪ :

যদি না অসুস্থ হয়ে পড়েন বা বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেন তবে বোলারকে চলতি ওভার শেষ করতে দেওয়া হবে। একই বোলারকে যতবার ইচ্ছা প্রান্ত বদলের সুযোগ দেয়া হবে তবে কখনোই উপর্যুপরি দু-ওভার বোলিং করতে দেওয়া হবে না। বোলার যেদিকের উইকেট থেকে বল করবেন, সেই দিকের উইকেটের ব্যাটসম্যানকে উইকেটের যে কোন পাশে দাঁড় করাবার অধিকার বোলাবের থাকবে।

ব্যাখ্যা : (ক) নতুন ওভারের প্রথম বল করার জন্যে দৌড় শুরু করে বোলার যদি অক্ষম হয়ে পড়েন তাহলে আম্পায়ার তার প্রথম বলকে ডেড বল ঘোষণা করে অন্য কোন বোলারকে সেই প্রান্ত থেকেই বল করার জন্যে অধিনায়ককে জানাবেন। কিন্তু একটি মাত্র বল করে যদি অক্ষম হয়ে পড়েন তবে আম্পায়ার ওভার ডাকবেন এবং অপর প্রান্তে বোলিং শুরু করতে হবে। এবং সেই একটি বল যদি নো বা ওয়াইড হয় তবে তাতেও কিছু যায় আসে না।

(খ) যদি বৃষ্টি বা উইকেট পতন বা অন্য কোন কারণে সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আবার খেলা শুরু করার সময় ওই অসমাপ্ত ওভার প্রথমেই শেষ করতে হবে।

২৫ : ডেড বল

আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তের ওপর বল ডেড কিনা তা নির্ভর করবে। যখন পাকাপোক্তভাবে বলটি উইকেট কিপার বা বোলারদের হাতে চলে যাবে, কিংবা বাউণ্ডারি লাইন পার হয়ে গেলে বা স্পর্শ করলে, কিংবা আম্পায়ার ওভার বা বাউণ্ডারি ডাকলে, কিংবা কোন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেলে, কিংবা কোন আম্পায়ার বা খেলায়াড়ের পোশাকের মধ্যে বল ঢুকে গেলে কিংবা লস্ট বল হলে বা ফিল্ডার টুপি বা পোশাক দিয়ে বল আটকালে (যার জন্যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আছে) বল 'ডেড' হয়ে যাবে।

বোলারের দৌড়ের সময় বা বল করার আগে পর্যন্ত বল 'ডেড' থাকবে। ব্যাটসম্যান যদি না খেলে উইকেট থেকে সরে আসেন তাহলেও বলটি ডেড হিসাবে গণ্য হবে। কোন ব্যাটসম্যান আহত হলে কিংবা ৪৬ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী পরিস্থিতির উদ্ভব হলে বল ডেড হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা: (ক) বল পাকাপোক্তভাবে বোলার কিংবা উইকেট কিপারের হাতে জমা পড়েছে কিনা সে বিষয়ে আম্পায়ারকে বিচার করে দেখতে হবে।

(খ) কোন সঙ্গত কারণে ব্যাটসম্যান যদি প্রস্তুত না থাকেন এবং বল মারার চেষ্টা না করেন তবে বল ডেড হয়ে যাবে।

(গ) যদি বল ডেলিভারি করার আগে বোলারের হাত থেকে ফসকে যায় বা কোন কারণে তাঁর হাত থেকে না বের হয় তাহলে বল ডেড হয়ে যাবে।

(ঘ) একটি বা দুটি বেলই যদি ব্যাটসম্যান বল মারার আগে মাটিতে পড়ে যায় তবে বল ডেড হয়ে যাবে।

যদি বলটি আম্পায়াবের পোশাকে না ঢুকে কেবল মাত্র তাঁর গায়ে লাগে বা উইকেট ভেঙে গেলে বা উপড়ে পড়লে (অবশ্য ব্যাটসম্যান আউট না হলে) অথবা ভ্রান্ত আপীল করা হলে বল ডেড হবে না।

২৬: নো বল

বল যদি ছুড়ে বা ঝাঁকানি দিয়ে না করা হয় তবে তা বিধিসম্মত ডেলিভারি হবে। ডেলিভারি সম্পর্কে যদি কোন আম্পায়ারের সন্দেহ থাকে তবে তিনি সঙ্গে সঙ্গে নো ডাকবেন। ডেলিভারির সময় সামনের পা পপিং ক্রিজের মধ্যে মাটি ছুঁয়ে থাকুক বা নাই থাকুক কিন্তু পিছনের পা রিটার্ন ক্রিজে বা তার প্রসারিত অংশ ছুঁয়ে কাছে কিনা দেখতে হবে। না থাকলে নো বল হবে।

ব্যাখ্যা: (ক) কোন আম্পায়ারের মতে বোলার যদি বল ডেলিভারি করার আগে হাত আংশিক বা পু'রাপুরি সিধে করে বল করেন তবে (থ্রো) ছোড়া হয়েছে বলে গণ্য হবে।

(খ) বোলার ওভার দি উইকেট না রাউণ্ড দি উইকেট, আণ্ডার আর্ম না ওভার আর্ম বা বাঁ হাত না ডান হাতে বল করবেন সে কথা স্ট্রাইকার ব্যাটস-ম্যানকে জানিয়ে দিতে হবে। বোলার না জানিয়ে ডেলিভারি করলে আম্পায়ার নো ডাকবেন।

(গ) বোলার ডেলিভারির আগে স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের উইকেট লক্ষ্য করে বল ছুড়লে রান আউট করার উদ্দেশ্যেও যদি হয়) আম্পায়ার নো ডাকবেন।

(ঘ) কোন কারণে যদি বল করার সময় বোলারের দিকের উইকেট ভেঙে যায় তা হলে নো বল হবে না।

(গ) একটি হাত কাঁধ বরাবর সমান্তরালভাবে তুলে আম্পায়ার নো বলের সংকেত জানাবেন।

(ঙ) যদি কোন বল বোলারের হাত থেকে ডেলিভারি না হয়, তবে আম্পায়ার নো-বল প্রত্যাহার করে নেবেন।

দ্রষ্টব্য: নো-বল বোলারের পিছনের পায়ের ওপর নির্ভর করে। বল করার সময় যদি পিছনের পা বোলিং এবং রিটার্ন ক্রিজের মধ্যে থাকে তবে সে বলটি নো-বল হবে না। পা মাটিতে লেগে থাকার প্রয়োজন নেই কেবলমাত্র বোলিং ক্রিজ ও রিটার্ন ক্রিজের মধ্যে থাকলেই চলবে।

২৮: ওয়াইড বল

যদি বোলারের বল উইকেটের এত ওপর দিয়ে আসে কিংবা উইকেটের কোন পাশে এত বেশি দূর দিয়ে যায়, যে আম্পায়ার যদি মনে করেন এ রকম বল ব্যাটসম্যানদের পক্ষে খেলা কষ্টসাধ্য বা সম্ভব নয় তবে তিনি ওয়াইড-বলের সংকেত দিতে পারেন।

ব্যাখ্যা: (ক) বোলারের কোন বল যদি ব্যাটসম্যানের সামনে এসে থেমে যায় তা হলে সেটি ওয়াইড-বল হবে না এবং তার জন্য কোন রান পাওয়া যাবে না। ব্যাটসম্যান ইচ্ছা করলে সেই বলটি মেরে রান করতে পারেন।

(খ) আম্পায়ার দুটি হাত কাঁধের সঙ্গে সমান্তরালভাবে তুলে ওয়াইড-বলের সংকেত জানাবেন।

(গ) ব্যাটসম্যান যদি ওয়াইড-বলের ডাকা বল মারেন আম্পায়ার ওয়াইড প্রত্যাহার করে নেবেন।

২৯: নিয়ম

ওয়াইড-বল ডাকা হলে সে বল ডেড হয় না। তাই ওয়াইড-বল থেকে যত রান নেওয়া হয় তা ওয়াইড-বল হিসাবে রান সংখ্যার সঙ্গে যোগ হয়। ওয়াইড-বলে দৌড়ে কোন রান না নিলে ওয়াইড-বলের রান অতিরিক্ত সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হবে। ব্যাটসম্যান ৩৮ বা ৪২ নং নিয়ম ভঙ্গ করলে এবং উভয় ব্যাটসম্যানই ৩৬ বা ৪০ নং নিয়ম ভঙ্গ করলে ওয়াইড-বলে আউট হবেন। তাঁরা ওয়াইড বলেও রান আউটের কবলে পড়তে পারেন।

ব্যাখ্যা : (ক) যদি কোন ওয়াইড-বলে বাই বাউণ্ডারি হয় তবে তা অতিরিক্ত খাতে যুক্ত হবে ওয়াইড-বলের রান হিসাবে, বাই হিসাবে নয়।

(খ) ওয়াইড বল মারা হলে তবে তা আর ওয়াইড থাকবে না – আম্পায়ার তখন তাঁর ওয়াইড ডাক প্রত্যাহার করে নেবেন।

(গ) ব্যাটসম্যান ওয়াইড-বলে মারতে গিয়ে আউট হয়ে গেলেও, ওয়াইড-বলের একটি রান ব্যাটিং পক্ষের রানের সঙ্গে যুক্ত হবে।

৩০ : বাই ও লেগবাই

ওয়াইড বা নো-বল না হয়ে বল যদি স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের ব্যাটের বা দেহের কোন অংশ না ছুঁয়ে বাউণ্ডারি লাইন পার হয়ে যায় বা স্পর্শ করে তবে বাই-বাউণ্ডারি হবে। বলটি বাউণ্ডারি যদি না হয় কিন্তু ব্যাটসম্যানরা যদি ছুটে রান করেন তবে যে কটি রান ছুটে করা হবে সেই কটি রান বাই হিসাবে স্কোরের সঙ্গে লেখা হবে। আম্পায়ার তখন বাই রানের সংকেত দেবেন। বলটি যদি ব্যাটসম্যানের ব্যাট বা ব্যাট-ধরা হাত বাদে অন্য কোথাও লেগে দূরে চলে যাওয়ার ফলে যদি রান বা বাউণ্ডারি হয় তবে তা লেগবাই হয়ে স্কোরে লেখা হবে এবং আম্পায়ার লেগবাই-এর সংকেত জানাবেন।

ব্যাখ্যা : (ক) কোন ব্যাটসম্যান যদি ব্যাট ধরা-হাত বাদে বলকে ইচ্ছে করে শরীরের অন্য কোন অংশ দিয়ে স্পর্শ করেন বা লাথি মেরে ঠেলে দেন তবে কোন রান পাওয়া যাবে না।

(খ) লেগবাই থেকে রান হবে যদি আম্পায়াররা মনে করেন ব্যাটসম্যান ব্যাট দিয়ে বলটি খেলার চেষ্টা করেছে বা আঘাত বাঁচাতে চেয়েছে। ইচ্ছে করে শরীর অথবা পা দিয়ে বল মারেন নি।

(গ) আম্পায়ার মুঠো খুলে হাত মাথার পাশ দিয়ে সোজা ওপর দিকে তুলে বাই রানের সংকেত জানাবেন। লেগবাই হলে এক পা তুলে হাঁটুতে হাত ছুঁইয়ে সংকেত জানাতে হবে।

দ্রষ্টব্য : যদি ব্যাটসম্যান বাম্পার বল থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ব্যাট-ধরা অংশ বাদে হাতের অন্য কোন অংশে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং সে বল দূরে গিয়ে রানের সৃষ্টি করলে বা বাউণ্ডারিতে পৌঁছলে তাতে কোন লেগবাই রান হবে না।

৩১ : উইকেট পতন

বল লেগে বা ব্যাটসম্যানের ব্যাটে বা গায়ে লেগে উইকেটের বেল পড়ে

গেলে বা উইকেট উপড়ে পড়লে বলা হয় উইকেটের পতন ঘটেছে। উইকেটের পতন ঘটাতে যে কোন খেলোয়াড়ই হাত বা বাহু ব্যবহার করতে পারেন। কোন কারণে বেল যদি পড়ে গিয়ে থাকে তবে একটি স্টাম্প উপড়ে উইকেটের পতন ঘটাতে হবে। তবে এই রকম বিশেষ ক্ষেত্রে উভয় হাতের তালুর মধ্যে বল রেখে দেওয়া চাই।

ব্যাখ্যা: (ক) উইকেটের ওপর একটি বেল যদি নড়ে ওঠে তাহলেই উইকেটের পতন ঘটবে না। কিন্তু যদি দুটি স্টাম্পের মধ্যে একটি বেল পড়ে আটকে যায় তাহলেও উইকেটের পতন ঘটবে।

(খ) খেলা চলতি অবস্থায় যদি উইকেট ভেঙে যায় তাহলে বল ডেড না হওয়া পর্যন্ত আম্পায়ার উইকেট ঠিক করে দেবেন না। তবে এই ক্ষেত্রে কোন ফিল্ডসম্যান উইকেট সাজিয়ে নিতে পারেন।

(গ) বেশি হাওয়ার জন্য যদি অধিনায়করা বেল বাদ দিয়েই খেলা চালাতে রাজি থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে উইকেট পতন ঘটেছে কি না তা আম্পায়ারের মতের ওপর নির্ভর করবে। এইক্ষেত্রে আঘাতের ফলে যদি স্টাম্প মাটিতে নাও পড়ে তা হলেও উইকেটের পতন ঘটতে পারে।

(ঘ) খেলা চলার মধ্যে যদি একটি বেল মাটিতে পড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে উইকেটের পতন ঘটাতে অপর বেলটি অনুমোদিত পদ্ধতিতে ফেলে দিলেই চলবে না, একটি স্টাম্পকেও উপড়ে ফেলতে হবে।

৩২: আউট অব হিজ গ্রাউণ্ড

ব্যাটসম্যানের ব্যাট এবং দেহের সব অংশ যদি পপিং ক্রিজের বাইরে চলে যায় তখন তাকে আউট অব হিজ গ্রাউণ্ড বলে।

দ্রষ্টব্য: ব্যাটসম্যান ব্যাট যদি মাটিতে না ঠেকিয়ে পপিং ক্রিজের ওপর শূন্যে রাখেন তাহলেও তিনি আউট অফ হিজ গ্রাউণ্ড হবেন। অর্থাৎ ব্যাট বা শরীরের অংশ দিয়ে পপিং ক্রিজ স্পর্শ করা চাই।

৩৩: ব্যাটসম্যান রিটায়ারিং বা অবসর গ্রহণ

যে-কোন ব্যাটসম্যান যখন ইচ্ছে তখন অবসর গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কোন উইকেটের পতন না হলে এবং বিপক্ষ অধিনায়কের বিনা অনুমতিতে আবার খেলা শুরু করার জন্যে নামতে পারবেন না।

ব্যাখ্যা: আঘাত, অসুস্থতা বা অন্য কোন বিশেষ কারণে ব্যাটসম্যান

অবসর নিলে তাঁর নামের পাশে 'রিটায়ার্ড নট আউট' লেখা হবে। কিন্তু অন্যান্য অবস্থায় অবসর নিলে তাঁর নামের পাশে 'রিটায়ার্ড আউট' লেখা হবে।

৩৪: বোল্ড

বোলারের বল লেগে উইকেট ভেঙে গেলে বোল্ড আউট হয়। বল যদি ব্যাটে লেগে বা ব্যাটসম্যানের গায়ে লেগেও উইকেটে লাগে তাহলেও বোল্ড আউট হবে।

ব্যাখ্যা: ব্যাটসম্যান যদি তাঁর স্ট্রোক শেষ করার আগেই ব্যাট দিয়ে বা পা দিয়ে বলটি নিজের উইকেটে লাগান তবে তিনি বোল্ড আউট হবেন।

৩৫: কট

ব্যাটসম্যান কট হবেন—বলটি খেলার পর ব্যাটে বা ব্যাট-ধরা-হাতে (কব্জির ওপরে নয়) লেগে মাটিতে পড়ার আগে যদি কোন ফিল্ডসম্যান লুফে নেন, বলটিকে যদি দেহের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেন বা তাঁর পোশাকের মধ্যে কোন ভাবে আটকে যায় তাহলে। ক্যাচ ধরে ফিল্ডসম্যানকে মাঠের বাউণ্ডারি লাইনের ভেতর থাকতে হবে। ক্যাচ ধরার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যিনি ক্যাচ ধরেছেন শরীরের কোন অংশই সীমানার বাইরে যেতে পারবে না।

ব্যাখ্যা: (ক) যদি বলটি মাটিতে স্পর্শ না করে তাহলে ক্যাচ লোফার পর হাত মাটিতে ঠেকে গেলেও বা ক্যাচ লোফার সময় হাত মাটির ওপর থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না।

(খ) ক্যাচ লোফা তখনই শুরু হচ্ছে যখন ফিল্ডার বলটি ধরতে শুরু করছেন অর্থাৎ বল তাঁর আয়ত্তে আসছে।

(গ) ব্যাটে লেগে বল যদি ব্যাটসম্যানের গায়ে বা পোশাকে লেগে ক্যাচ হয় তাহলেও ব্যাটসম্যান আউট।

(ঘ) হাতে না ধরলেও ব্যাটসম্যান ক্যাচ আউট হবেন যেমন উইকেট-রক্ষকের প্যাডে যদি বল আটকিয়ে যায়।

(ঙ) বাউণ্ডারি লাইনের ভেতর দাঁড়িয়ে বেড়ায় বা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বাউণ্ডারি অতিক্রান্ত করা বল ক্যাচ হলেও ব্যাটসম্যান আউট হবেন।

(চ) প্রথমবার খেলার পর মাটিতে পড়ার আগে ব্যাটসম্যান যদি বলটি দ্বিতীয়বার খেলেন তা হলেও এই নিয়মে আউট হবেন।

(ছ) বাউণ্ডারি সীমানার মধ্যে যদি বল কোন প্রতিবন্ধকে আটকে যায় বা প্রতিবন্ধকে লাগার পর কোন ফিল্ডসম্যান ক্যাচ ধরেন তবে ব্যাটসম্যান

আউট হবেন যদি না পূর্বেই ওই প্রতিবন্ধককে বাউণ্ডারি বলে স্থির করা হয়ে থাকে।

৩৬: বলে হাত দেওয়া (হ্যাণ্ডেল দি বল)

দুজন ব্যাটসম্যানের মধ্যে কেউ যদি খেলা চলার সময় বল হাত দিয়ে ধরেন তবে তিনি আউট হবেন। অবশ্য প্রতিপক্ষ দলের অনুরোধে তিনি যদি বলে হাত লাগান তা হলে কিছু হবে না।

ব্যাখ্যা: (ক) এইভাবে আউট হলে স্কোর বুকে হবে—হ্যাণ্ডেল দি বল আউট। এতে বোলারের কোন কৃতিত্ব থাকবে না।

(খ) যে হাতে ব্যাট ধরা হয় সে হাতে বল লাগলে হ্যাণ্ডেল দি বল আউট নয়, কারণ ৩৬, ৩৭ ও ৩৯ নিয়মে ওই হাতকে ব্যাটের অংশ ধরা হয়।

৩৭: ব্যাট দিয়ে বল দুবার মারা (হিট দ্য বল টোয়াইজ)

যে ভাবেই হোক ব্যাটে লেগে বা ব্যাটসম্যানের শরীরে লেগে থেমে যাওয়া বলকে ব্যাটসম্যান ইচ্ছাকৃতভাবে দুবার আঘাত করলে আউট হবেন। কিন্তু ব্যাটসম্যান যদি উইকেট বাঁচানোর জন্যে ব্যাট দিয়ে বা দেহ দিয়ে (হাত বাদ) বলটি মারতে বা থামাতে পারেন। অবশ্য এই বল মারলে একমাত্র ওভার থ্রো ছাড়া রান পাওয়া যাবে না।

ব্যাখ্যা: (ক) বলটি ইচ্ছা করে মারা হয়েছে কি উইকেট বাঁচাতে মারা হয়েছে তার বিচার আম্পায়ারই করবেন।

(খ) প্রতিপক্ষের অনুরোধ ছাড়া, ব্যাট দিয়ে বল ফেরত দিলে এই নিয়মে ব্যাটসম্যান আউট হবেন।

(গ) এইভাবে আউট হলে স্কোর বুকে লেখা হবে হিট দ্য বল টোয়াইজ। এতে বোলারের কৃতিত্ব নেই।

(ঘ) ব্যাটসম্যান কখনোই দুবার বল মারতে পারবেন না যার ফলে উইকেট রক্ষক বা ফিল্ডারের ক্যাচ লোফাটি বাধা হতে পারে।

৩৮: হিট উইকেট

বল মারতে গিয়ে ব্যাটসম্যান যদি ব্যাট দিয়ে শরীরের কোন অংশ বা পোশাক লাগিয়ে উইকেট ভেঙে ফেলেন তাহলে হিট উইকেট হয়ে আউট হবেন।

ব্যাখ্যা: (ক) বলটি মারার পর যদি উইকেটের দিকে গড়িয়ে আসে, উইকেট বাঁচাতে গিয়ে সেই বলটি দ্বিতীয়বার মারার সময় ব্যাটে লেগে উইকেট ভেঙে গেলে ব্যাটসম্যান আউট হবেন।

(খ) বলটি খেলার সময় টুপি পড়ে গিয়ে বা পোশাকের অংশ লেগে উইকেট ভেঙে গেলে ব্যাটসম্যান হিট উইকেট হবেন।

(গ) কিন্তু রান নেবার সময় ব্যাট লেগে বা পোশাক লেগে বেল পড়ে গেলে ব্যাটসম্যান আউট হবেন না।

(ঘ) রান আউট বা স্ট্যাম্প আউট বাঁচানোর জন্যে যদি ব্যাটসম্যান উইকেট ভেঙে ফেলেন তাহলে আউট হবেন না।

৩৯ : এল. বি. ডব্‌ল্যু (লেগ বিফোর উইকেট)

হাত ছাড়া দেহের অন্য অংশ যদি উইকেটের সমান্তরাল থাকে অর্থাৎ ব্যাটসম্যান যদি উইকেটের বেল পর্যন্ত আড়াল করে থাকেন, এবং এইরূপ অবস্থায় বলটি যদি তাঁর হাত বা ব্যাট স্পর্শ না করে দেহের কোন অংশে লাগে তাহলে তিনি এল. বি. ডবল্যু আউট হবেন। আম্পায়ারকে দেখতে হবে বলটি বোলারের দিককার উইকেটে এবং ব্যাটসম্যানের দিককার উইকেটে সোজাসুজি পড়ত বা পড়বে কিনা, কিংবা স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যানের অফের দিকে পড়ত বা পড়বে কিনা – তবে সব সময়ই দেখতে হবে বলটি দেহের অন্য কোন অংশে আঘাত না করলে উইকেটে লাগত কিনা।

ব্যাখ্যা : (ক) এ আইনে হাত অর্থে ব্যাট-ধরা হাতকেই বোঝায়।

(খ) এল. বি. ডবল্যু আউট দিতে হলে আম্পায়ারকে নিম্নলিখিত চারটি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে—

১. পায়ে কিংবা শরীরে কোথাও না লাগলে বলটি উইকেটে লাগত কি না।

২. বলটি দুটি উইকেটের সোজাসুজি কিংবা স্ট্রাইকারের অফের দিকে পড়েছে কিনা।

৩. হাত ছাড়া দেহের অন্য কোথাও প্রথমে বলটি লেগেছে কিনা।

৪. বলটি দেহের যেখানেই লাগুক, লাগার সময় দু দিকের উইকেটের সোজাসুজি অর্থাৎ সমান্তরালভাবে ছিল কিনা, উচ্চতা যাই হোক না কেন।

দ্রষ্টব্য : (ক) বল যদি লেগ স্টাম্পের বাইরে পড়ে তাতে এল. বি. ডব্‌ল্যু আউট হবে না। লেগ বা অফ স্টাম্প কিংবা উইকেটের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বলে কখনো এল. বি. ডবল্যু আউট হবে না।

(খ) কোন সন্দেহের অবকাশ থাকলে আম্পায়ার ব্যাটসম্যানের পক্ষেই রায় দেবেন অর্থাৎ আউট দেবেন না।

(গ) রাউণ্ড-দি-উইকেট বল করেও এল. বি. ডব্‌ল্যু আউট পাওয়া যেতে পারে।

(ঙ) বলটি যদি আগেই ব্যাট স্পর্শ করে তবে এল. বি. ডব্‌ল্যু হবে না।

(চ) এগিয়ে খেলতে গিয়ে বল যদি সামনের পায়ে লাগে তবে এল. বি. ডবল্যু আউট দিতে হলে আম্পায়ারকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। যেহেতু এগিয়ে খেললে সামনের পা উইকেটের অনেক দূরে থাকে সে অবস্থায় বলটি পিচ পড়ে উইকেটের ওপর দিয়ে যেত কিনা কিংবা বেঁকে উইকেটের পাশ দিয়ে চলে যেত কিনা সেটি আম্পায়ারকে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৪০ : অবস্ট্রাক্‌টিং দি ফিল্ড

ব্যাটসম্যানদ্বয়ের যে-কেউ ইচ্ছে করে যদি বিপক্ষ দলকে বাধা দেবার চেষ্টা করেন তা হলে তিনি অবস্ট্রাকটিং দি ফিল্ড আউট হবেন। যদি এর ফলে কোন একজন ব্যাটসম্যান অপরপক্ষকে ক্যাচ ধরতে না দেন, তবে যিনি বলটি মেরেছেন তিনিই আউট হবেন।

ব্যাখ্যা : (ক) আম্পায়ারই বিবেচনা করবেন ব্যাটসম্যান ইচ্ছে করে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে কিনা।

(খ) এ আউটে বোলারের কোন কৃতিত্ব নেই। স্কোর বুকে লেখা হবে অবস্ট্রাকটিং দি ফিল্ড।

(গ) রান নিতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যাটসম্যান থ্রোর সামনে এলে তিনি রান আউট হবেন না।

৪১ : রান আউট

দুজন ব্যাটসম্যানের যে-কেউ রান আউট হবেন, যদি খেলা চলার মধ্যে দৌড়ে রান নিতে গিয়ে কিংবা অন্য কারণে নিজের ক্রিজের অর্থাৎ পপিং ক্রিজের বাইরে থাকেন এবং সেই সময় অপরপক্ষ যদি উইকেট ভেঙে দেয়। ব্যাটসম্যানদ্বয় যদি পরস্পরকে অতিক্রম করে থাকেন, তা হলে যে উইকেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে সেই উইকেটের উদ্দেশে যিনি দৌড়চ্ছিলেন তিনিই আউট হবেন। যদি তাঁরা অতিক্রম না করেন তা হলে ফেলে দেওয়া উইকেট ছেড়ে যিনি বেরিয়েছেন তিনি আউট হবেন। ব্যাটসম্যান রান নেবার চেষ্টা না করলে ৪২নং নিয়ম অনুযায়ী আউট হবেন না। নো-বলের বেলাতেও এই নিয়ম কার্যকরী।

ব্যাখ্যা : বলটি যদি ব্যাট দিয়ে মারার ফলে অপর প্রান্তের উইকেট ভেঙে

যায় কিন্তু যদি বলটি উইকেট ভাঙার আগে কোন ফিল্ডস্‌ম্যান ওটি ছুঁতে না পারেন তাহলে দুজনের মধ্যে কোন ব্যাটসম্যানই রান আউট হবেন না।

দ্রষ্টব্য: নো-বলে স্টাম্পড আউট করা যাবে না। ব্যাটসম্যান যদি রান নেবার জন্যে ছুটতে আরম্ভ না করেন তবে উইকেট-রক্ষক অপর ফিল্ডারের ছোঁয়া ব্যতিরেকে রান আউটের জন্যে উইকেট ভাঙতে পারবেন না।

যদি ব্যাটসম্যান নিজের ক্রিজে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে অন্য দিককার ব্যাটসম্যান দণ্ডায়মান ব্যাটসম্যানের কাছে চলে এলেও অপর প্রান্তের উইকেট ভেঙে গেলে ক্রিজ-ছেড়ে-আসা-ব্যাটসম্যানই আউট হবেন।

৪১ নং নিয়ম ভঙ্গ করলে তবেই ব্যাটসম্যানের বিপক্ষে রান আউটের আবেদন জানানো যেতে পারে, নয়তো নয়।

৪২: স্টাম্পড

একমাত্র নো-বল ছাড়া স্ট্রাইকার ব্যাটসম্যান খেলতে গিয়ে যদি তাঁর পপিং ক্রিজের বাইরে চলে আসেন এবং তাঁর রান নেবার উদ্দেশ্য না থাকলেও উইকেট-রক্ষক যদি অন্য কোন খেলোয়াড় ছোঁয়ার আগেই উইকেট ভেঙে দেন তবে ব্যাটসম্যান স্টাম্পড আউট হবেন। উইকেট-রক্ষক উইকেটের সামনে থেকে এই উদ্দেশ্যে বলটি ধরতে পারেন কেবলমাত্র যদি বলটি ব্যাটসম্যানের শরীরে লেগে গিয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা: উইকেট-রক্ষকের প্যাডে লেগে ছিটকে এসে বলটি যদি উইকেট ভেঙে দেয় তা হলেও ব্যাটসম্যান স্টাম্পড আউট হবেন যদি তিনি পপিং ক্রিজের বাইরে থাকেন।

৪৩: স্টাম্পড

বোলারের বল যতক্ষণ না স্ট্রাইকারের ব্যাট বা দেহ স্পর্শ করছে, বা উইকেট অতিক্রম করছে ততক্ষণ পর্যন্ত উইকেট-রক্ষকের উইকেটের পিছনে থাকতে হবে। উইকেট-রক্ষক যদি এ নিয়ম লঙ্ঘন করেন তবে স্ট্রাইকার আউট হবেন না অবশ্য কেবলমাত্র ৩৬, ৩৭, ৪০ ও ৪১ নং নিয়মের বেলায় ব্যতিক্রম; তাও আবার ৪৬ নং নিয়ম সাপেক্ষে।

ব্যাখ্যা: (ক) এই নিয়মের ফলে স্ট্রাইকারের উইকেট-রক্ষকের কাছ থেকে বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে বল মারা ও উইকেট গার্ড করার অধিকার আছে। ৩০নং নিয়মের (খ) ব্যাখ্যায় ব্যবস্থিত ক্ষেত্র ছাড়া, স্ট্রাইকার যদি আইন

অনুযায়ী তাঁর উইকেট বাঁচানোর জন্যে উইকেট-রক্ষকের কাজের বাধার কারণ হন তাহলে সে জন্য তাঁকে দণ্ডিত করা যাবে না।

(খ) আম্পায়ারের মতে যদি উইকেট-রক্ষক উইকেটের সামনে এগিয়ে আসায় ফিল্ডিং পক্ষের কোন সুবিধা না হয় কিংবা স্ট্রাইকারের অবাধে বল খেলার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে অথবা স্ট্রাইকারকে আউট করায় এর কোন প্রভাব না পড়ে তা হলে তিনি উইকেট-রক্ষকের এই এগিয়ে আসাকে উপেক্ষা করবেন।

৪৪ : দি ফিল্ডসম্যান

ফিল্ডসম্যান তাঁর দেহের যে কোন অংশ দিয়ে বল থামাতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি ইচ্ছে করে অন্য কোন ভাবে বল থামান তাহলে রান-সংখ্যার সঙ্গে আরো ৫ রান যোগ হবে। ব্যাটসম্যানরা কোন রান না নিয়ে থাকলে শুধু ৫ রানই যোগ হবে। স্ট্রাইকার যদি বলটি মেরে থাকেন তাহলে তাঁর রানের সঙ্গে এই রান যোগ হবে। তা না হলে ক্ষেত্রবিশেষে বাই, লেগবাই, নো-বল বা ওয়াইডের সঙ্গে যুক্ত হবে।

ব্যাখ্যা : (ক) বল ধরার জন্যে ফিল্ডসম্যান তাঁর টুপি প্রভৃতি ব্যবহার করতে পারবেন না।

(খ) ৫ রান যোগ হলেও ব্যাটসম্যানরা দিক পরিবর্তন করতে পারবেন না কারণ এ রান ফিল্ডারের দণ্ডস্বরূপ প্রাপ্ত রান।

(গ) বোলারের ডেলিভারির পপিং ক্রিজের পিছনে অনসাইডে ফিল্ডার-সংখ্যা দুই-এর বেশি থাকবে না। এই নিয়ম না মানলে স্কোয়ার আম্পায়ার নো বল ডাকবেন।

৪৫ : আম্পায়ারের কাজ

টস করার আগেই আম্পায়াররা বিশেষ শর্তগুলি (যদি থাকে) জেনে নেবেন এবং খেলার নিয়মের প্রসঙ্গে দলের অধিনায়কদের সঙ্গে একমত হবেন। উইকেট ঠিক পোঁতা হয়েছে কিনা, পিচ ঠিক আছে কিনা, এবং ঘড়ি অনুসরণ করার বিষয়ে নিজেদের মধ্যে সহমত হবেন।

ব্যাখ্যা : (ক) বিশেষ শর্ত বলতে বিরতির সময় অর্থাৎ খেলার সময়, মধ্যাহ্ন ভোজ কিংবা চা-পানের বিরতি প্রভৃতি বোঝায়। অবশ্য শর্তগুলি নিয়মের আওতার মধ্যে থাকা চাই।

(খ) খেলার সময় কোন্ ঘড়ি অনুসরণ করা হবে অধিনায়কদের তা জানায় অধিকার আছে।

৪৬ :

খেলার আগে এবং খেলা চলার সময় আম্পায়াররা লক্ষ্য রাখবেন যে খেলার ধারা এবং ব্যাট, বল প্রভৃতি খেলার সরঞ্জামাদি নিয়মসম্মতভাবে কোন্‌টি ঠিক বা কোন্‌টি ঠিক নয়। বিধিবহির্ভূত বা বিধিসঙ্গত খেলার আম্পায়াররাই একমাত্র বিচারক। আম্পায়ারদের ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হলে মাঠের উপযুক্ততা আবহাওয়া এবং খেলার জন্যে আলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তাঁদের ওপর অর্পিত হলে তাঁরাই হবেন চূড়ান্ত বিচারক। এমনকি খেলার ফলাফল ঠিক করাও আম্পায়ারদের ওপর নির্ভর করবে। আম্পায়াররাই খেলার সবকিছুর সন্দেহের অবসান ঘটাবেন। প্রতিটি ওভারের পর আম্পায়াররা দিক পরিবর্তন করবেন। আম্পায়াররা যদি ভিন্ন মত পোষণ করেন তাহলে প্রকৃত অবস্থা যেমন রয়েছে সেইভাবেই চলবে।

ব্যাখ্যা : (ক) ভালোভাবে দেখার জন্যে আম্পায়াররা নিজেদের সুবিধে মতো স্থানে দাঁড়াবেন। বোলারের দিকের আম্পায়ার বোলারের দৌড়ে আসার অসুবিধা করে দাঁড়াবেন না কিংবা ব্যাটসম্যানের দৃষ্টি যাতে তাঁর ওপর পড়ে সে রকম ভাবেও দাঁড়াবেন না। লেগের দিকে না দাঁড়িয়ে যদি লেগ-আম্পায়ার অফের দিকে দাঁড়ান তবে তাঁকে ফিল্ডিং পক্ষের অধিনায়কের মত গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যাটসম্যানকেও সে বিষয়ে জানিয়ে দিতে হবে।

(খ) কোন ক্ষেত্রেই আম্পায়াররা নির্দেশ দেবার জন্যে খেলোয়াড় বা দর্শকদের মতামতের ওপর নির্ভর করবেন না।

(গ) আম্পায়াররা নির্দেশ দেবেন সংকেত দিয়ে। প্রয়োজনবোধে খেলোয়াড়দের দেখানোর জন্যে সংকেত দেবার সময় সংকেতের কথাটিও ঘোষণা করবেন।

(ঘ) ফেয়ার এবং আনফেয়ার খেলা

১. আম্পায়াররা মনে করলে আবেদন ছাড়াই আনফেয়ার খেলায় হস্তক্ষেপ করতে পারেন। নিয়ম অনুযায়ী খেলায় হস্তক্ষেপ করার কারণ না ঘটলে তাঁরা হস্তক্ষেপ কোনমতেই করবেন না।

২. খেলার সময় যদি কোন খেলোয়াড় আম্পায়ারের মত নিয়ে টিটকিরি কাটেন বা তাঁর সমালোচনা করেন বা তাঁর নির্দেশ অমান্য করেন তবে তিনি

সেই দলের অধিনায়ককে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাবেন এবং তাতেও যদি কোন ফল না হয় তবে দুই দলের অধিনায়ককে সতর্ক করে দিয়ে কর্মকর্তাদের কাছে ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট করবেন।

৩. বল ধরার জন্যে বোলার মাটিতে বল ঠুকে বলের সেলাই তুলে ফেলতে পারবেন না। যদি সেলাই তোলেন তবে আম্পায়ার বলটি পালটিয়ে দেবেন এবং এই আনফেয়ার পন্থা অনুসরণের জন্য অধিনায়ককে সতর্ক করে দেবেন। বোলার যদি বলের পালিশ বাড়াবার জন্যে রজন, মোম, তেল প্রভৃতি ব্যবহার করেন তবে তাও আনফেয়ার পন্থা হবে। তবে বল ভিজে গেলে বোলার তোয়ালে বা কাঠের গুঁড়ো দিয়ে শুকিয়ে নিতে পারেন।

৪. কোন ফিল্ডার যাতে স্ট্রাইকারকে বিরক্ত করার জন্যে কোন শব্দ বা নড়াচড়া না করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

৫. বোলারের সাহায্য হতে পারে এই জন্য যদি কোন ফিল্ডার পিচ খারাপ করার চেষ্টা করেন তবে আম্পায়ার হস্তক্ষেপ করবেন যাতে পিচ খারাপ না হতে পারে।

৬. যদি ফাস্ট বোলার বারবার ইচ্ছে করে ব্যাটসম্যানকে লক্ষ্য করে খাটো মাপের (শর্ট পিচ) বল দিতে থাকেন তাহলে এটি ফেয়ার গেম হবে না। তখন বোলারের দিকের আম্পায়ার নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন—

(অ) বোলারকে এ বিষয়ে সতর্ক করতে পারেন।

(আ) বোলার কথা না শুনলে সে দলের অধিনায়ক এবং আম্পায়ারকে ব্যাপারটি জানাবেন।

(ই) তাতেও কোন কাজ না হলে প্রথমে ডেড বল ডাকবেন এবং অধিনায়ককে নির্দেশ দেবেন যাতে ওই ইনিংসে ওই বোলার আর বল না করতে পারেন এবং বিরতির সময় ব্যাটিং পক্ষের অধিনায়ককে জানাবেন যে ওই বোলারকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি এই ইনিংসে আর বল করতে পারবেন না।

৭. বোলার রান-আপে ফিরে যাবার সময় ব্যাটসম্যানরা রান চুরি করার চেষ্টা করলে তবে সেটা আনফেয়ার – কারণ বলটা তখন ডেড-বল। বোলার বলটি কোন এক দিকের উইকেটে না ছুড়লে তবে ব্যাটসম্যানরা পরস্পরকে অতিক্রম করলেই আম্পায়ার ডেড বল ঘোষণা করবেন এবং ব্যাটসম্যানদের নিজেদের ক্রিজে ফিরে আসতে হবে।

৮. ফিল্ডিং পক্ষের কোন খেলোয়াড় স্নান বা মালিশের জন্য মাঠ ত্যাগ করতে পারবেন না।

(ঙ) মাঠ, আবহাওয়া এবং আলো

১. খেলা শুরুর আগে যদি কোন চুক্তি না হয়ে থাকে তবে খেলা চলার সময় (খেলার মধ্যে উইকেটে অবস্থানকারী ব্যাটসম্যানদ্বয় তাঁদের অধিনায়কের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন) মাঠের উপযুক্ততা, আবহাওয়া অথবা আলোর ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মতানৈক্য দেখা দিলে আম্পায়ারের মতামত মেনে নিতে হবে এবং আম্পায়াররা এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচারক হবেন

২. খেলা চালিয়ে যাওয়া যুক্তিহীন বা বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হলেই খেলা বন্ধ রাখা হবে। মাঠের উপরে যখন জল দাঁড়িয়ে গেছে, ব্যাটসম্যানদের ও বোলারদের পা হড়কে যাচ্ছে বা ফিল্ডারদের চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটছে তখনই মাঠ খেলার অনুপযুক্ত বলে গণ্য করা হবে। শুধু ঘাস ভিজে বা বলটি পিছল হলেই খেলা বন্ধ হবে না।

অবস্থার উন্নতি ঘটলে অধিনায়ক বা আম্পায়াররা (যদি তাদের ওপর দায়িত্ব থাকে) সঙ্গে কোন খেলোয়াড়কে না নিয়ে মাঠ পর্যবেক্ষণে আসবেন। এই পর্যবেক্ষণের সময় তাঁরা পরবর্তী কোন নির্দেশ ছাড়াই আসবেন। এবং মাঝে মাঝেই তা চালিয়ে যাবেন। খেলা চালানো সম্ভব বলে যে মুহূর্তে সকল পক্ষ ঐকমত্য হবেন সেই মুহূর্তে তাঁরা খেলোয়াড়দের আহ্বান জানাবেন।

দ্রষ্টব্য : ১. নতুন ব্যাটসম্যান খেলতে এলে সেই ওভারে আর কটা বল বাকি আছে আম্পায়ারের সে কথা তাঁকে জানাবার প্রয়োজন নেই। অবশ্য ব্যাটসম্যান জিজ্ঞাসা করলে তা জানাতে হবে।

২. খেলা শেষ হবার বা কোন বিরতি শেষ হবার আগের ওভারকে আম্পায়ার লাস্ট ওভার ডাকতে পারবেন না।

৩. প্রতিটি ইনিংস শেষ না হওয়া পর্যন্ত একদিনের খেলায় আম্পায়াররা দিক পরিবর্তন করতে পারবেন না।

৪ উইকেট রক্ষক বাদে অপর কোন খেলোয়াড় হাতে গ্লাভস, ব্যাণ্ডেজ বা প্লাস্টার জড়াতে পারবেন না। অবশ্য যদি বিশেষ কোন প্রয়োজনে অধিনায়ক এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন তা হলে আম্পায়ার সে বিষয়ে কিছু বলবেন না।

৪৭: আপীল

প্রতিপক্ষ দলের আবেদন ছাড়া আম্পায়ার কোন খেলোয়াড়কে আউট দিতে পারবেন না। আবেদন জানাতে হবে পরবর্তী বলের ডেলিভারির বা ১৮নং নিয়মানুযায়ী টাইম ডাকার আগে। কেবলমাত্র ৩৮ বা ৪২ নং নিয়মের আউটগুলি এবং ৪১ নিয়মে স্ট্রাইকারের উইকেটের রান আউট ছাড়া অন্য সব আবেদন লেগ আম্পায়ারের পূর্বে বোলারের দিকের আম্পায়ারই নির্দেশ দেবেন। যে ক্ষেত্রে একজন আম্পায়ার কোন বিষয়ে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অক্ষম হয়ে অ'র আম্পায়ারের কাছে সেটি তাঁর মতামতের জন্য পেশ করবেন সেক্ষেত্রে পরবর্তী আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হবে।

ব্যাখ্যা: (১) কোন বিশেষ আউটের আবেদন ছাড়া, সব রকম আউটের ক্ষেত্রেই হাউজ-দ্যাট আবেদন জানাতে হবে। একজন আম্পায়ার আউট অগ্রাহ্য করলেও বিষয়টি অন্য আম্পায়ারের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকলে এবং সময়মতো কোন আবেদন হলে তিনিও নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) ব্যাটসম্যান আউট হলে আম্পায়ার মাথার ওপর আঙুল তুলে আউটের নির্দেশ দেবেন আর আউট না হলে নট-আউট বলবেন।

(৩) আম্পায়ার নিজের সিদ্ধান্ত বদলাতে পারেন অবশ্য তা তৎক্ষণাৎ করতে হবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে অপর আম্পায়ার আরো ভালোভাবে লক্ষ্য করার মতো অবস্থায় রয়েছেন সে ক্ষেত্রে আম্পায়ার প্রয়োজন হলে অপর আম্পায়ারের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আম্পায়ার নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিন্তু সিদ্ধান্ত জানাতে চান না সেক্ষেত্রে বিষয়টি অপর আম্পায়ারের কাছে পেশ করতে পারবেন না। পরামর্শের পরেও যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে তবে নির্দেশ ৪৬ নং নিয়ম অনুযায়ী হবে কিংবা ব্যাটসম্যানের পক্ষে যাবে।

(৫) ভুল বোঝার ফলে ব্যাটসম্যান যদি আউট হয়ে গেছেন ভেবে উইকেট ছেড়ে চলে যেতে থাকেন সেক্ষেত্রে আম্পায়ার হস্তক্ষেপ করবেন।

(৬) ২৭ নং নিয়ম অনুযায়ী ওভার ডাকা হলে বলটি ডেড হয়ে যায় কিন্তু তা হলেও পরবর্তী ওভারের প্রথম বলটি যতক্ষণ না ডেলিভারি হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আবেদন করা চলতে পারে। অবশ্য টাইম ডেকে আম্পায়ার বল তুলে নিলে তারপর আর কোন আবেদন গ্রাহ্য হবে না।

ক্রিকেটের নিয়মকানুন পরিবর্তন, পরিবর্তনের নতুন খসড়া

১৮৮৭ খ্রী অব্দে ক্রিকেটের নিয়মকানুন সরকারীভাবে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়। তারপর থেকে সেই নিয়মকানুনের বহুবার পরিবর্তন ও সংশোধন হয়েছে। এইসব সংশোধন ও পরিবর্তন চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবার আগে প্রস্তাবিত সংশোধনগুলি একত্র সংকলিত করা হয় এবং পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।

সম্প্রতি কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি নতুন খসড়া তৈরি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মতামত সংগ্রহের জন্যে বিশ্বের ক্রিকেট প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে নতুন খসড়াটি পাঠানো হয়েছে। ক্রিকেটের নিয়মকানুন শেষবারের মতো পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়েছে ১৯৪৭ খ্রী।

এই নতুন খসড়ার প্রতিটি নিয়মকানুন নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা এক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য নিয়মকানুনগুলির কথাই তুলে ধরা হল।

পরিবর্ত খেলোয়াড়: (১) বদলী খেলোয়াড় তখনই গ্রহণ করা যাবে যখন খেলা চলাকালীন কোন খেলোয়াড় আহত হয়ে পড়বে। (২) ফিল্ডসম্যান যখন মাঠ পরিত্যাগ করবে তখন বা যখন প্রবেশ করবে তখন বোলারের দিকের আম্পায়ারের মত নিতে হবে। (৩) পরিবর্ত ফিল্ডার মাঠের যে কোন জায়গায় ফিল্ড করার অধিকার পাবে। (৪) একজন বোলার যতক্ষণ মাঠের বাইরে কাটাবেন পুনরায় বল করার আগে তাঁকে তত সময় মাঠে ফিল্ডিং করতে হবে এবং তারপরই তিনি বোলিং করার সুযোগ পাবেন। (৫) বর্তমান নিয়মে কোন অবসরগ্রহণকারী ব্যাটসম্যান যতক্ষণ না একটি উইকেটের পতন ঘটছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাট করতে আসতে পারবেন না—কিন্তু নতুন খসড়ায় কোন ব্যাটসম্যান অবসর গ্রহণ করলে পূর্বের অবসরগ্রহণকারী ব্যাটসম্যান পুনরায় ব্যাট হাতে নামতে পারবেন।

মাঠের উপযুক্ততা, আবহাওয়া এবং আলো: বর্তমানে এসব ব্যাপারে অধিনায়কদের অভিমতই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয়। নতুন খসড়ায় এ ব্যাপারটি বিবেচনা করার ভার আম্পায়ারদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমানে খেলা চলবে কি চলবে না, এ ব্যাপারটি বিবেচনা করে আম্পায়াররা অধিনায়কদের জানিয়ে দেবেন। অবশ্য খেলা না চলার বিরুদ্ধে আম্পায়ারের

সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অধিনায়করা আবেদন জানালে খেলা চলবে। কিন্তু সেই অবস্থায় কিছুক্ষণ পরে অধিনায়করা আবেদন করলেও খেলা আর বন্ধ হবে না যদি না মাঠের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে পড়ে।

রোলিং: বর্তমান খসড়ায় প্রথম দিনেই পিচ রোলিং করা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে (১) ধরে নেয়া যেতে পারে পিচ উপযুক্তভাবেই তৈরি করা হয়েছে এবং সেই পিচেই খেলা শুরু হয়। (২) অতীতে এই রোলিং করার দাবি নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

বাড়তি রোলিং: নতুন খসড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত বর্ষণসিক্ত পিচে সমস্ত দেশে বাড়তি রোলিং করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ১০ নং নিয়মের ৩ নং কানুন অনুযায়ী যুক্তরাজ্য ছাড়া আর সব দেশে এই নিয়ম চালু আছে।

উইকেট আবরিত রাখা: খেলা শুরু হবার আগে এবং খেলা চলার সময় বৃষ্টির ব্যাপারে পিচে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন ব্যবহারই কাম্য।

সময়ের দেরীতে ব্যাটসম্যান আউট: বর্তমানে একটি উইকেট পতনের পর পরবর্তী ব্যাটসম্যান যদি ক্রীজে ২ মিনিটের বেশি দেরী করে আসেন তাহলে ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে শাস্তি ভোগ করতে হয় না, কেউ আবেদন করলে নতুন খসড়ায় তাঁকে আম্পায়ার নিশ্চিত হলে আউট দেবার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

নতুন খসড়ায় আরো কিছু অদলবদল করা হয়েছে। যেমন এল. বি. ডব্লিউ.-তে, হিট উইকেটে, খেলায় অসাধু উপায় অবলম্বন করা, পিচ নষ্ট করার চেষ্টা করা, সময় নষ্ট করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

এই নতুন খসড়ায় নিয়মকানুনের অদলবদল যে সব ক্ষেত্রেই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে এ কথা বলা যায় না—তাই এই নতুন খসড়ার সবটাই শেষ অবধি পুরোপুরি গৃহীত হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে সময়ে নানা কারণে নিয়মকানুনের পরিবর্তন ও পরিবর্জন দরকার হয়ে পড়ে। তাই আমরা এই নতুন খসড়াকে ক্রিকেটের উন্নতির ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ হিসাবেই গ্রহণ করতে পারি।

রঞ্জি ট্রফি চাম্পিয়ানশিপের নিয়মকানুন

১। ব্যাখ্যা

(ক) নিয়মাবলীতে পরবর্তী ক্ষেত্রে বোর্ড বলতে বোঝাবে ভারতের ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড।

(খ) 'সভাপতি' বলতে বোঝাবে ভারতের ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি।

(গ) 'সম্পাদক' বলতে ভারতের ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের অবৈতনিক সম্পাদক এবং যদি কোন অবৈতনিক যুগ্ম সম্পাদক থাকেন তবে তাঁকেও বোঝাবে।

২। জাতীয় চাম্পিয়ানশিপ বলতে বোঝাবে রঞ্জি ট্রফি লাভের জন্য ভারতের জাতীয় চাম্পিয়ানশিপ।

৩। এই প্রতিযোগিতা আন্তঃ-রাজ্য কিংবা আঞ্চলিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং বোর্ডের সেই সকল সদস্য অংশ গ্রহণ করতে পারবে যারা কুচবিহার ট্রফির জন্য স্কুল টুর্নামেণ্টে অথবা সার্ভিসেস স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ড এবং রেলওয়ে কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিচালনাধীন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

৪। জাতীয় চাম্পিয়ানশিপের জন্য এই প্রতিযোগিতা (পরে শুধুমাত্র প্রতিযোগিতা বলা হবে) রীতি হিসাবে প্রতি বছর অগস্ট মাস থেকে পরবর্তী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। প্রোগ্রাম ও ফিক্সচার কমিটি যথার্থ প্রয়োজনবোধে সময়সীমা এপ্রিল মাস পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারেন।

৫। পরবর্তী ক্ষেত্রে এই নিয়মাবলীতে পাঁচটি অঞ্চল বলতে (ক) উত্তর, (খ) পূর্ব, (গ) পশ্চিম, (ঘ) দক্ষিণ ও (ঙ মধ্য অঞ্চল বোঝাবে।

৬। প্রতিযোগিতার জন্য

(ক) উত্তরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে দিল্লি ও জেলা ক্রিকেট এসোসিয়েশন, পাঞ্জাব ক্রিকেট এসোসিয়েশন, হরিয়ানা ক্রিকেট এসোসিয়েশন, সার্ভিসেস স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ড, এবং জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট এসোসিয়েশন।

(খ) পূর্বাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ক্রিকেট এসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল, বিহার ক্রিকেট এসোসিয়েশন, ওড়িশা ক্রিকেট এসোসিয়েশন এবং আসাম ক্রিকেট এসোসিয়েশন।

(গ) পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে—বোম্বে ক্রিকেট এসোসিয়েশন, মহারাষ্ট্র ক্রিকেট এসোসিয়েশন, গুজরাট ক্রিকেট এসোসিয়েশন, বরদা ক্রিকেট এসোসিয়েশন, এবং সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট এসোসিয়েশন।

(ঘ) দক্ষিণাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে তামিলনাড়ু ক্রিকেট এসোসিয়েশন, কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন, হায়দরাবাদ ক্রিকেট এসোসিয়েশন, কেরালা ক্রিকেট এসোসিয়েশন এবং অন্ধ্র ক্রিকেট এসোসিয়েশন।

(ঙ) মধ্যাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন, মধ্য প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন, বিদর্ভ ক্রিকেট এসোসিয়েশন, রাজস্থান ক্রিকেট এসোসিয়েশন, রেলওয়ে স্পোর্টস কণ্ট্রোল বোর্ড।

৭। (ক) উপরিলিখিত পাঁচটি অঞ্চলের প্রতিটি পৃথক অঞ্চলের সদস্যের পরস্পরের মধ্যে লীগ প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলবে। কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের যে কোন দলই অঞ্চলের বাকী সবগুলি দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

(খ) পাঁচটি অঞ্চলের বিজয়ী ও রানার্স-আপ পরে নক আউট প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

৮। (ক) প্রতি বছরেই ১৫ই এপ্রিলের আগে 'সম্পাদক' প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অধিকারী সকল সদস্যকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের আবেদন সম্বলিত পত্র পাঠাবেন, তাতে আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এবং সেই তারিখ উক্ত বছরের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে হবে।

(খ) প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের উপযোগী সকল সদস্য আবেদনপত্রটি সম্পূর্ণ করে স্বাক্ষর দান করবে এবং ৩০শে জুনের ভিতরে ১০০ টাকা এণ্ট্রি ফী সহ সম্পাদকের কাছে ৩০শে জুনের মধ্যে পাঠাবে কিংবা পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। এণ্ট্রি ফর্মের সঙ্গে ১০০ টাকার ফী না থাকলে তা গ্রাহ্য হবে না।

(গ) যে সদস্য ৩০শে জুনের মধ্যে বোর্ডের বাৎসরিক চাঁদা দেবে না তার এণ্ট্রি ফর্ম গ্রাহ্য হবে না, এবং সেই সদস্য দলও উক্ত বৎসরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অধিকারী থাকবে না।

৯। প্রতিটি অঞ্চল থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে রঞ্জি ট্রফি কমিটি গঠিত হবে এবং এই প্রতিনিধি নির্বাচন চক্রাকারে প্রতিটি সদস্যদল থেকে গ্রহণ করা হবে। বোর্ডের সভাপতি ঐ কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হবেন।

১০। (ক) প্রতি বছরে জুলাই মাস শেষ হবার আগে প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিরা সভায় মিলিত হয়ে প্রতিটি আঞ্চলিক খেলার তারিখ ও স্থান

নির্বাচন করবেন। এইসব সভা আহ্বান করবার জন্য রঞ্জি ট্রফি কমিটি একজন সদস্যকে মনোনীত করবে। যদি সেই সদস্য ৩০শে জুনের মধ্যে উক্ত সভা আহ্বান করতে সক্ষম না হন তবে বোর্ডের অবৈতনিক সম্পাদক ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে সভা আহ্বান করবেন এবং সদস্যদের সেইমতো জানাবেন। সদস্যদের এই বাবদ রাহা খরচ সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন বহন করবে। ঐ সভায় স্থিরীকৃত খেলার তারিখ ও স্থান চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং সকলে তা মানতে বাধ্য থাকবে।

(খ) সেই সভায় যে স্থান ও তারিখ নির্ধারিত হবে কোনক্রমেই তার পরিবর্তন ঘটানো চলবে না। অবশ্য অচিন্তিতপূর্ব কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে বোর্ডের অবৈতনিক সম্পাদকই স্থান ও তারিখের পরিবর্তন করতে পারেন। এই পরিবর্তনের কথা এবং তার কারণ অবশ্যই বোর্ডকে জানাতে হবে।

(গ) অন্য কোনও বিশেষ কারণ না ঘটলে খেলার স্থানগুলি চক্রাকারে পরিবর্তিত হবে।

(ঘ) স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতিটি অঞ্চলের লীগ প্রতিযোগিতা প্রতি বছর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

(ঙ) যখন একই অঞ্চলের দুটি সদস্যদলের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় যে-দল ঘাসে ঢাকা উইকেটের ব্যবস্থা করতে পারবে সে-দলের মাঠেই অনুষ্ঠিত হবে।

(চ) এক অঞ্চলের প্রথম সাক্ষাৎকারী দুটি সদস্য-দলেরই যদি ঘাসে ঢাকা কিংবা ম্যাট উইকেট থাকে তবে দুদলের মধ্যে প্রবীণ সদস্য-দলের মাঠেই খেলাটি অনুষ্ঠিত হবে। প্রবীণত্ব বিচার হবে বোর্ডের অনুমোদন পাবার তারিখের ভিত্তিতে। যদি আলোচ্য দুটি দলই একই তারিখে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে থাকে তবে সভাপতি লটারীর ভিত্তিতে বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবে।

(ছ) সাধারণ অবস্থায় কোয়ার্টার ফাইনাল স্তরের খেলা প্রতি বছর ২০শে ফেব্রুয়ারি, সেমি-ফাইনাল স্তরের খেলা ১৫ই মার্চ ও ফাইনাল খেলা মার্চ মাসের মধ্যেই শেষ করতে হবে। কোন দলের খেলোয়ার আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় কিংবা কোন সফররত দলের বিরুদ্ধে বা টেস্ট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করেছে এই কারণে রঞ্জি ট্রফির খেলার প্রাতিযোগিতা কমিটির পূর্ব নির্ধারিত তারিখের পরিবর্তন করা যাবে না। অবশ্য যদি প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দলের খেলোয়াড় সরকারীভাবে আমন্ত্রিত সফরকারী দলের বিরুদ্ধে খেলায় অংশ গ্রহণ

করে তবে বোর্ডের সম্পাদক ইচ্ছা করলে রঞ্জি ট্রফির খেলার তারিখ পরিবর্তন করতে পারেন।

পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটি খেলার মাঠের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যে সদস্য এবারে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে তার সুযোগ ছেড়ে দেবেন পরবর্তী বছরে উভয় দলের খেলার সময়ে সে আবার সেই সুযোগ ফিরে পাবেন না।

১১। পাঁচটি অঞ্চলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ম্যাচগুলি তিন দিনের হবে এবং প্রতিদিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা খেলা হবে।

১২। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল, কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমি ফাইনাল ম্যাচগুলি চারদিনের হবে। প্রতিদিন ৫½ ঘণ্টা খেলা হবে এবং দু ইনিংসের ফলাফলের ভিত্তিতে খেলার ফলাফল নির্ধারিত হবে। যদি দু ইনিংসের খেলা শেষ না হয় তবে প্রথম ইনিংসের ফলাফলই খেলার চূড়ান্ত ফল বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু প্রথম ইনিংসের খেলাই যদি শেষ না হয়, অথবা প্রথম ইনিংসে কিংবা মোট খেলায় রানের সংখ্যা সমান সমান হয় তবে মুদ্রাক্ষেপণের (toss) মাধ্যমে খেলার ফলাফল নির্ধারিত হবে। খেলা শেষ হওয়া মাত্র উভয় আম্পায়ারের উপস্থিতিতে মুদ্রাক্ষেপণ করা হবে।

ফাইনাল ম্যাচ পাঁচদিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে। মধ্যে একদিনের বিরতি থাকবে। প্রতিদিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা খেলা হবে এবং দু ইনিংসের মোট রানের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হবে। দু ইনিংসের খেলা শেষ না হলে প্রথম ইনিংসে অধিক রান যে দল সংগ্রহ করেছে সে দলই বিজয়ী হবে। পাঁচ দিনে যদি প্রথম ইনিংসের নিষ্পত্তি না হয় তবে প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করা পর্যন্ত ম্যাচটি চালাতে হবে। দু ইনিংস মিলিয়ে কিংবা দু ইনিংস শেষ না হলে শুধু প্রথম ইনিংসে দুদলের রান সংখ্যা যদি সমান হয় তবে উভয় দলকে বিজয়ী ঘোষণা করতে হবে; অর্থাৎ তারা যুগ্ম বিজয়ী হবে। দুদলই সমান সময়ের জন্য ট্রফি তাদের কাছে রাখবে।

১৩। (ক) নিচের হিসাবমত প্রতিটি সদস্য-দল পয়েণ্ট লাভ করবে:

সরাসরি জয়লাভের দরুন—৮। খেলা শেষ না হলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে অধিক রান সংগ্রহের দরুন—৫। খেলা শেষ না হলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে পেছিয়ে থাকার দরুন—৩। খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হলে অর্থাৎ দু ইনিংসের ফলাফলে কিংবা অসমাপ্ত খেলায় প্রথম ইনিংসের

ফলাফলে দুদলের সমান রান হলে প্রতি দলই পাবে—৪। যদি একটি বল না খেলেই ম্যাচ বাতিল হয়ে যায় তবে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলই পাবে—২।

যখন কোন দল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের চেয়ে প্রথম ইনিংসে দ্রুত রান সংগ্রহ করে এবং সেই সংগ্রহের গতি ওভার পিছু গড়ে ৪ রান হয় তবে সেই দল বোনাস পয়েন্ট হিসাবে পাবে অতিরিক্ত ১। বোনাস পয়েন্টের হিসাবে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা বিচার করার প্রয়োজন নেই।

১. প্রথম ইনিংসে পরবর্তী ব্যাটধারী দল যখন পূর্ববর্তী দলের রানসংখ্যা অতিক্রম করে যাবে তখনই ওভার পিছু রানের হিসাব প্রয়োজন হয়।

২. পূর্ববর্তী দলের রান সংগ্রহের গড়ের হিসাব তখনই প্রয়োজন হয় যখন তাদের রানের চাইতে কমে পরবর্তী দল আউট হয়ে যায় অথবা ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

(খ) যখন একই অঞ্চলের দুই বা ততোধিক সদস্য-দল সমান পয়েন্ট সংগ্রহ করে তখন সংশ্লিষ্ট দলগুলির পয়েন্ট সংগ্রহের গড় হিসাব করা হয়। গড় বিচারের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়।

মোট সংগৃহীত রানকে, যে কটি উইকেটের বিনিময়ে তা সংগৃহীত হয়েছে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে কোন দলের ব্যাটিং-এর গড় পাওয়া যাবে। কোন দলের বিপক্ষের ব্যাটিং-এর গড় নির্ধারণের জন্য তার বিরুদ্ধে যে রান সংগৃহীত হয়েছে এবং যে কটি উইকেটের বিনিময়ে তা পাওয়া গেছে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। পূর্বের সংখ্যাকে তাদের পরবর্তী সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। এইভাবে গৃহীত সর্বাধিক পয়েন্ট যে দলের পক্ষে থাকবে সেই দলই আঞ্চলিক বিজয়ী বলে পরিগণিত হবে। যখন কোন দল ইনিংস ডিক্লেয়ার করবে তখন গড় নির্ধারণের জন্য প্রকৃত যে কটি উইকেটের পতন হয়েছে সে কটিই ধরতে হবে।

১৪। (ক) প্রতিটি খেলায় দিনে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা খেলার জন্য নির্ধারিত থাকবে। যদি কোন ইনিংস চা পানের বিরতির জন্য নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয় অথবা ডিক্লেয়ার্ড হয় তবে আর কোন পৃথক বিরতি দেওয়া হবে না। চা পানের বিরতির ২০ মিনিট সময় (দু ইনিংসের মধ্যবর্তী বিরতির সময়টুকু ধরে) নিয়ে নেওয়া হবে। খেলায় প্রতিদিনে তিনবার জলপানের বিরতি হবে। প্রথমবার খেলা শুরু থেকে মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির মাঝে,

দ্বিতীয় মধ্যাহ্ন ভোজ ও চা পানের বিরতির মধ্যে এবং শেষটি চা পানের ৪৫ মিনিট পরে। এই বিরতিসমূহের সঠিক সময় দু পক্ষের অধিনায়কেরা স্থির করে খেলা শুরুর আগেই আম্পায়ারদের জানিয়ে দেবে।

(খ) প্রতিটি ওভার ৬-বলের হবে।

(গ) প্রতি দলের অধিনায়কই বিপক্ষ অধিনায়ককে মুদ্রা ক্ষেপণের পূর্বেই এগারো জন নির্বাচিত খেলোয়াড়ের তালিকা দেবেন। তাতে দ্বাদশ খেলোয়াড়ের নামও থাকবে। বিপক্ষ অধিনায়কের সম্মতি ছাড়া এ তালিকায় কোন পরিবর্তন করা যাবে না।

১৫। বিজয়ী পক্ষ রঞ্জি ট্রফি স্মারকটি নিজেদের অধিকারে রাখতে পারবেন। পরবর্তী বৎসরের ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে তা বোর্ডের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে। রানার্স দল ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোং ট্রফি পাবে। তবে তাদেরও ট্রফিটি পরবর্তী বৎসরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বোর্ডের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে।

বোর্ড বিজয়ী দলকে স্মারক ট্রফির অনুরূপ একটি স্মারক চিরতরে দিয়ে দেবে।

১৬। চ্যাম্পিয়ানশিপ নির্ধারণের জন্য বোর্ড মাঝে মাঝে সদস্য-দলের সীমানা অনুমোদন করবে এবং তা দ্বারা যে কোন খেলোয়াড়ের বসবাসের যোগ্যতা স্থির হবে।

১৭। **যোগ্যতা**

যে কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় নিম্নলিখিত যোগ্যতার ভিত্তিতে খেলবার অধিকারী হবে—

(ক) জন্মসূত্রে—সদস্য-দলের সীমানার মধ্যে যদি সে জন্মগ্রহণ করে।

(খ) বসবাস/চাকুরী ক্ষেত্রের সূত্রে—চ্যাম্পিয়ানশিপের পূর্ববর্তী বৎসরের ১লা অগস্ট থেকে যদি সে কোন অঞ্চলে বসবাস করে।

(গ) প্রকৃত বাসস্থান পরিবর্তনের সূত্রে—যদি বসবাসের জন্য অথবা পড়াশুনার জন্য কোন খেলোয়াড় প্রতিযোগিতার বছরের ১লা জুলাইয়ের আগে একটি অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রকৃতই স্থান পরিবর্তন করেন। তবে তার জন্য যথার্থ প্রমাণ দাখিল করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বোর্ডের অবৈতনিক সম্পাদকের কাছে ১লা অগস্টের পূর্বে আবেদন করতে হবে।

(ঘ) চাকুরী পরিবর্তনের সূত্রে—যদি কোন খেলোয়াড় প্রকৃতই তার চাকুরীর জন্য অথবা নতুন কোন চাকুরীতে যোগদানের জন্য অঞ্চল পরিবর্তন করে তবেই ঐ বৎসরে নূতন অঞ্চলের পক্ষে খেলার সুযোগ থাকবে। এক্ষেত্রেও

১লা জুলাইয়ের মধ্যে তা নিষ্পন্ন হলে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সহ ১লা অগস্টের মধ্যে বোর্ডের অবৈতনিক সম্পাদকের কাছে ঐ খেলোয়াড়দের দল পরিবর্তনের আবেদন করতে হবে।

(ঙ) বিশেষ ক্ষেত্র—বাসস্থান পরিবর্তন, চাকুরী ক্ষেত্রে পরিবর্তন যদি ১লা জানুয়ারির পরে অথচ প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগেই সংঘটিত হয়, তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা বিচার করবার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হবে। ঐ কমিটিতে বোর্ডের সভাপতি, প্রবীণ সহ-সভাপতি ও সম্পাদক থাকবেন। তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৮। অযোগ্যতা

(ক) একই বৎসরের চাম্পিয়ানশিপের প্রতিযোগিতায় কোন খেলোয়াড় একটির বেশি দলের পক্ষে খেলতে পারবে না।

(খ) কোন খেলোয়াড়ের উপর যদি অনুমোদিত কোন সদস্য-দল বাধা-নিষেধ আরোপ করে তবে সেই খেলোয়াড় এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

(গ) যদি কোন খেলোয়াড় বিধিসঙ্গতভাবে খেলবার অধিকারী না হয়েও কোন সদস্য-দলের পক্ষে খেলায় অংশ গ্রহণ করে তবে সে সেই বৎসরে প্রতিযোগিতায় অবশিষ্ট পর্বের কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না; এবং সেই বৎসরের মত পরবর্তী এক বৎসরে ঐ প্রতিযোগিতা ছাড়াও বোর্ড-পরিচালিত কোন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। যে দলের পক্ষে উক্ত খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করবে, সে দলও উক্ত বৎসরের মত প্রতি-যোগিতার অবশিষ্ট পর্বে খেলার যোগ্যতা হারাবে। তাদের অর্জিত পয়েন্টগুলি বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। পরবর্তী এক বৎসরের জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

(ঘ) যদি কোন সদস্য-দল সমাপ্তির পূর্বেই ম্যাচ ত্যাগ করে চলে যায় তবে সে দল অবশিষ্ট প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না, তাদের সংগৃহীত পয়েন্টগুলিও বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। এমন সদস্য পরবর্তী এক বৎসরের জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের যোগ্যতা হারাবে।

(ঙ) ব্যাটিং পক্ষের অধিনায়ক কোন সময়সীমা না মেনেই তার ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারে।

এই সুযোগ অবশ্য কেবলমাত্র ব্যাটিংপক্ষের অধিনায়কেরই থাকবে, এবং

এর উদ্দেশ্য এই নয় যে সমাপ্তি ঘোষণা। দুপক্ষের অধিনায়কের মধ্যে চুক্তির কোন বিষয় হবে। কোন আম্পায়ারের যদি এমন বিশ্বাস জন্মাবার কোন সঙ্গত কারণ থাকে যে এধরনের কোন চুক্তি সম্পর্কিত হয়েছে তবে তাঁরা বিষয়টি তৎক্ষণাৎ সম্পাদকের দৃষ্টিতে আনবেন, তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রঞ্জি ট্রফি কমিটির কাছে পেশ করবেন। ঐ কমিটি যদি উক্ত অভিযোগ যথার্থ বিবেচনা করেন তবে উক্ত দলের সংগৃহীত পয়েন্ট চাম্পিয়ানশিপের জন্য গণ্য হবে না।

যদি এমন অভিযোগ উক্ত অঞ্চলের অধীন কোন সদস্য-দলের তরফে আনীত হয় তবে সম্পাদক অবিলম্বে আম্পায়ারদের নিকট একটি রিপোর্ট আহ্বান করবেন। পরে সেই রিপোর্ট রঞ্জি ট্রফি কমিটির কাছে পেশ করবেন। ঐ কমিটি যদি চুক্তি সম্পাদনের অভিযোগটি প্রমাণিত বলে সাব্যস্ত করেন তবে উক্ত দলের সংগৃহীত পয়েন্ট চাম্পিয়ানশিপের জন্য গণ্য হবে না।

রঞ্জি ট্রফি কমিটি উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতার লীগ পর্যায় শেষ হবার আগেই তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাবেন।

১৯. নক আউট পর্যায়ে সকল খেলাই ঘাসে-ঢাকা উইকেটে অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে ঘাসে-ঢাকা উইকেট পাওয়া যাবে না সেখানে ম্যাটিং উইকেটে খেলা হবে। তবে নক আউট পর্যায়ের সকল খেলাই ঘাসে-ঢাকা উইকেটে হবে। যদি কোন সদস্য-দল ঘাসে-ঢাকা উইকেটের ব্যবস্থা করতে না পারে তবে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ঘাসে-ঢাকা উইকেটে খেলা হবে।

২০. ম্যাটিং উইকেট সম্পর্কে নিয়মাবলী: (ক) ঐ ম্যাচ পরিচালনার জন্য যাঁরা আম্পায়ার নিযুক্ত হবেন, তাঁরা খেলা শুরুর পূর্ব দিনেই মাঠের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

(খ) পীচ অন্ততঃ ১০ ফুট চওড়া হবে। ম্যাটিং হবে ন্যূনপক্ষে ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া এবং তা এক প্রান্তের উইকেট থেকে অন্য প্রান্তের উইকেট পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।

(গ) পীচে বিছাবার আগেই আম্পায়ারের দ্বারা ম্যাটিং-এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

যদি কোন দল নিয়মানুসারে ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি ম্যাটিং-এর ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হয় তবে তারা ম্যাচ ত্যাগ করেছে বলে বিবেচিত হবে।

(ঘ) ব্যাটসম্যান আবেদন করলে অথবা আম্পায়ার মনে করলে ম্যাটিং-এর উপর ঝাড়ু দিতে হবে, তাছাড়া প্রতিটি বিরতির সময়ে তা করতে হবে।

প্রতিদিনের খেলার শেষে ম্যাটিং সরিয়ে ফেলা হবে এবং উইকেটে জল দেওয়া হবে। পরবর্তী দিনের খেলা শুরুর আগে উইকেটে রোলার টানা হবে। কিন্তু কতট জল দেওয়া হবে বা কত সময় রোলার টানা হবে তা ঐ মাঠের প্রচলিত রীতি অনুয়ায়ী হবে, যার ফলে প্রতিদিনই খেলা শুরুর সময় মাঠের অবস্থা যতদূর সম্ভব একই রকম থাকে। প্রতিদিন ম্যাটিং বিছাবার আগে অধিনায়কেরা পীচ পরিদর্শন করতে পারে। এই নিয়মের ব্যাখ্যায় যদি কোন বিরোধ উপস্থিতি হয় তবে সে সম্পর্কে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে যে ম্যাটিং ব্যবহৃত হবে তা বোর্ডই সরবরাহ করবে। তবে তার খরচ বহন করবে যে দলের ব্যবস্থাপনায় খেলাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই দল।

(ঙ) ৬-বলের ৫০ ওভার শেষ হলে ফিল্ডিং পক্ষের অধিনায়ক একটি নতুন বল চাইতে পারেন।

২১. উইকেটের আচ্ছাদন: ঘাসে-ঢাকা কিংবা ম্যাটিং উইকেট যাই হোক না কেন যদি উভয় অধিনায়ক ঐকমত্য হয় তবে উইকেট এমন কি বোলারের রান-আপ পর্যন্ত বৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য ঢেকে দেওয়া যেতে পারে। খেলার পূর্বে ও পরে যখনই প্রয়োজনবোধ হবে তখনই। যদি বৃষ্টি না হয় তবে সকালে ঢাকা অপসারণ করা হবে।

২১. (ক) ঘাসে-ঢাকা উইকেট: মুদ্রাক্ষেপণ (toss) পর্যন্ত উইকেট ঢেকে রাখা মাঠ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন। টসের পরে উইকেটের আচ্ছাদন সম্পর্কে কী করা হবে তা দুপক্ষের অধিনায়ক টসের আগেই স্থির করবে যদি এবিষয়ে ঐকমত্য না হয় তবে উইকেটে কোন আচ্ছাদন রাখা চলবে না।

২১ (খ) ম্যাটিং উইকেট: পীচ এবং বোলারের রান-আপ খেলার আগে ও খেলা চলাকালীন ঢাকা যেতে পারে যদি উভয় ব্যাটসম্যান একমত হন। ঐকমত্য না হলে আচ্ছাদন দেওয়া যাবে না।

২২. স্কোর-সংক্রান্ত রিপোর্ট: প্রতি সদস্য-দল খেলা শেষের ১৫ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত স্কোরের একটি কপি সহকারী সম্পাদকের কাছে পাঠাবে।

২৩. গোপন রিপোর্ট: ম্যাচ খেলার ১০ দিনের মধ্যে প্রতিটি সদস্য দল তাদের অধিনায়কদের কাছ থেকে আম্পায়ারিং সম্পর্কে গোপন রিপোর্ট সংগ্রহ করে সম্পাদকের কাছে পাঠাবে।

২৪. আম্পায়ার নিয়োগ: এই ম্যাচগুলির জন্য আম্পায়ার নিয়োগ

বোর্ডের দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত একটি কমিটি করবে। তারা আম্পায়ারের প্যানেল থেকে নিরপেক্ষ আম্পায়ার নির্বাচন করবে।

২৫. (ক) আম্পায়ার নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন বিরোধ আম্পায়ার সাব-কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে পাঠাতে হবে।

(খ) আম্পায়ারিং সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ আম্পায়ার সাব-কমিটির কাছে পাঠাতে হবে। এ সম্পর্কে তাদের রায়ই চূড়ান্ত হবে।

২৬. আম্পায়ার সম্পর্কে খরচের তফশিল :

(ক) তাঁর বাসস্থান থেকে যেখানে খেলা হবে যে পর্যন্ত আসা-যাওয়ার প্রথম শ্রেণীর টিকিটের ভাড়া (কনশেসন মূল্যে)

(খ) প্রতি ১২ ঘণ্টায় ভ্রমণের জন্য ১৫ টাকা হারে রাহাখরচ।

(গ) তিনদিনের ম্যাচের জন্য ১৫০˙০০, চার দিনের ম্যাচের জন্য ২৫০˙০০ ও পাঁচদিনের ম্যাচের জন্য ৪০০˙০০ টাকা আম্পায়ার প্রতি ফী।

(ঘ) খেলার পূর্ব দিন থেকে চলাকালীন দিনগুলি সহ পরবর্তী দিনটি পর্যন্ত প্রতিদিন ১০ হারে দৈনিক ভাতা।

(ঙ) ম্যাচের ব্যবস্থাপকেরাই বাসস্থানের আয়োজন করবে।

(চ) স্থানীয় আম্পায়ার হলে খেলার পূর্বদিন সহ দৈনিক ১৫ টাকা হারে ভাতা পাবেন।

(ক) থেকে (চ) পর্যন্ত প্রতিটি আম্পায়ার সংক্রান্ত ব্যয় অংশগ্রহণকারী দুটি দলের পক্ষে বহন করতে হবে।

২৭. খরচ সম্পর্কিত তফশিল :

(ক) নক আউট পর্যায় পর্যন্ত খেলায়—

বহিরাগত সদস্য দল তাদের ভ্রমণের, চিকিৎসার, থাকা-খাওয়ার, যাতায়াতের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবে।

(খ) নক আউট পর্যায়ের খেলায়—

(১) স্থানীয় সদস্য-দল বহিরাগত সদস্য-দলের ১৪ জন সদস্য, ২ জন ম্যানেজার ও ৭ জন ব্যাগেজম্যানের থাকা-খাওয়ার খরচ বহন করবে। ৪ দিনের খেলার জন্যে সর্বাধিক ৬ দিন ও ফাইনাল খেলায় সর্বাধিক ৮ দিনের জন্য এই ব্যয় বহন করতে হবে। তাছাড়া স্টেশন থেকে হোটেল ও হোটেল থেকে মাঠ পর্যন্ত যাতায়াত ও কুলির খরচ তাঁরাই বহন করবে। থাকা-খাওয়ার তালিকা

থেকে ধোবা, মদ্যপান, ট্রাঙ্ককল ইত্যাদি ব্যয় বাদ যাবে। খেলোয়াড় ও ম্যানেজারের অতিথিদের আপ্যায়ন ব্যয়ও ধরা হবে না।

(২) বহিরাগত দল তাদের যাতায়াতের খরচ নিজেরা বহন করবে।

(গ) সব পর্যায়ের খেলার জন্য :

সকল পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠানের জন্য মাঠের ভাড়া, এনক্লোজার, লাঞ্চ, চা-পান, বিরতিকালীন ড্রিঙ্ক, মেডিক্যাল, খেলার জন্য ব্যবহৃত বল ইত্যাদির খরচ আয়োজক দল নির্বাহ করবে।

গেটের আদায় থেকে এই সকল ব্যয় সর্বপ্রথম মেটাতে হবে।

২৮. সকল ম্যাচই ঘেরা মাঠে খেলা হবে।

নক আউট পর্যন্ত খেলায় ২৭ (গ) ধারা মত ব্যয় নির্বাহের পর যে অর্থ অতিরিক্ত থাকবে তা নিম্নলিখিত হারে বাঁটোয়ারা হবে—

৫০% স্থানীয় সদস্য-দল, যারা খেলার আয়োজন করবে।

৪০% বহিরাগত সদস্য-দল।

১০% বোর্ড।

নক আউট পর্যায় থেকে ২৭ (খ) (১) ও (গ) ধারা মত ব্যয় নির্বাহের পর যে অর্থ অতিরিক্ত থাকবে তা নিম্নলিখিত হারে বাঁটোয়ারা হবে—

৫০% স্থানীয় সদস্য-দল, যারা খেলার আয়োজন করবে।

৩০% বহিরাগত সদস্য-দল।

২০% বোর্ড।

খেলা শেষ হবার দুমাসের মধ্যে আয়ব্যয়ের হিসাব স্থানীয় সদস্য-দলের অবৈতনিক সম্পাদক এবং অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষের সার্টিফিকেট সহ বোর্ডের সম্পাদকের কাছে পাঠাতে হবে। পরে এই খরচ সদস্য এসোসিয়েসনের নিজস্ব আয়ব্যয়ের হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২৯. খেলায় ক্ষতি হলে তা স্থানীয় সদস্য-দলকেই বহন করতে হবে।

৩০. ইচ্ছা করলে বহিরাগত সদস্য-দলের ম্যানেজার টিকিট বিক্রির আদায় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

৩১. হিসাবপত্র পেশ : খেলা শেষের দু'মাসের ভিতরে নিরীক্ষিত হিসাব বোর্ডের কাছে পাঠাতে হবে। তার একটি নকল বহিরাগত সদস্য দলকেও দিতে হবে।

৩২. কমপ্লিমেণ্টারি পাস : (ক) বহিরাগত সদস্য দল তার খেলোয়াড়,

ম্যানেজার ও ব্যাগেজম্যানের ব্যাজ ছাড়াও ৬০টি কমপ্লিমেণ্টারি পাস পাবেন।

(খ) প্রতিটি আম্পায়ার তাঁর নিজস্ব ব্যাজ ছাড়াও ৪টি করে কমপ্লিমেণ্টারি পাস পাবেন।

৩৩. এখানে উল্লেখিত নিয়মকানুন পরিবর্তিত, সংশোধিত কিংবা সংযুক্ত হলে এবং মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব যেভাবে নিয়মকানুন করবে সেই নিয়মানুসারে খেলা পরিচালিত হবে।

৩৪. খেলা শেষের ১০ দিনের মধ্যে সকল অভিযোগই রঞ্জি ট্রফি কমিটির কাছে দায়ের করতে হবে।

উক্ত কমিটি তাদের কোন সিদ্ধান্তের জন্য কারো কাছে কারণ দর্শাতে বাধ্য থাকবে না।

পদ্ধতি ও প্রকরণ

প্রস্তাবনা

ক্রিকেটের আসল লড়াইটা হল ব্যাটে-বলে। বোলিং-এর আক্রমণ ঠেকাতে হবে ব্যাটের চওড়া বুকে, প্রতি-আক্রমণ হানতে হবে কব্জির মোচড়ে। এ-লড়াইয়ে বোলারের সাকরেদ হল ফিল্ডাররা। আক্রমণের মূল নেতার নির্দেশে তারা বিভিন্ন ফ্রন্টে মোতায়েন থাকে; আর বোলারের তৈরি ফাঁদে ব্যাটসম্যান পড়লে ক্যাচ কি স্ট্যাম্প করে তাকে প্যাভেলিয়ানে ফেরত পাঠাতে সহায়তা করে। কার্যত রান আউটের কবলে ব্যাটসম্যান পড়ে যায় এদেরই দক্ষতায়। আর এই সেনাবাহিনীর নাগাল টপকে টুকটুক করে খুচরো রান নিয়ে, কিংবা পিটিয়ে সীমানার ওপারে বল পাঠিয়ে চার কি ছয় রান এক দফায় আদায় করতে ব্যাটসম্যানের হাতিয়ার শুধু ব্যাটটাই নয়, তার কব্জির ব্যবহারও। বোলিংয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, যেমন ড্রাইভ, হুক, পুল, কাট, ব্লক ইত্যাদি। আবার ড্রাইভ কি কাটেরও রকমফের রয়েছে। প্রথমে নানা ধরনের মার সম্পর্কে একে একে আলোচনা করা হবে; তারপর বোলিংয়েরও রকমসকম চেনানো যাবে।

ব্যাটিং (Batting)

ক্রিকেট খেলাটাই আক্রমণাত্মক। এ খেলায় দু'পক্ষকেই ষোলোআনা চেষ্টা চালাতে হবে খেলা তাদের অনুকূলে আনার জন্যে। অবশ্য ড্র করার প্রবণতাও আছে কিছু কিছু দলের। ট্রুম্যানের মতে যে সমস্ত অধিনায়ক ড্রয়ের পক্ষে তাঁদের সবাইকে একসঙ্গে করে কোনো নির্জন দ্বীপে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, সেখানে নিজেদের মধ্যে খেলতে পারবেন তাঁরা। তবে তাঁদের খেলা হবে ক্ষণস্থায়ী, মরশুমের শুরুতেই বিরক্তিতে ছেড়ে দেবেন খেলা।

কোনো দল গোড়া থেকেই জয়ের লক্ষ্য না নিয়ে খেললে তাদের নিয়ে খেলতে নামাই বিপদের। তবে সুখের কথা, আজকাল ক্রিকেট খেলাটা পুরোপুরি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই হচ্ছে। তবে ট্রুম্যান বলছেন, 'আমি তাড়ু খেলাতে আগ্রহী নই, তবে ডেক্সটার, মে, কাউড্রে আর গ্রেভনির মত স্ট্রোক খেলোয়াড়দের দিন আসাতে আমি খুশি।'

ব্যাটিং আক্রমণাত্মক হলেই বোলিংও তাই হতে বাধ্য, কারণ বোলার সব সময়েই উইকেট নেবার চেষ্টায় ব্রতী থাকবে। সেক্ষেত্রে দুপক্ষই জঙ্গী মনোভাব নিয়েই নামছে মাঠে এবং তাতে খেলার উত্তেজনা বাড়ছে। সেই কারণে সব ব্যাটসম্যানেরই সব ধরনের মার অনুশীলন করা ভাল। ওটা ছাড়া খেলা হয় না। কখনো কখনো এ ধরনের উক্তি শোনা যায় দর্শকদের মধ্যে, 'ভাল ডিফেনসিভ খেলোয়াড়, কিন্তু হাতে মার নেই লোকটার,' তাহলে সে পুরোপুরি খেলোয়াড় নয়। অবশ্যই আপনাকে শুধু আক্রমণাত্মক নয়, রক্ষণাত্মক খেলোয়াড়ও হতে হবে—নইলে ক্রিজে বেশীক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব হবে না। কিন্তু শুধু রক্ষণাত্মক খেলেও কোনো খেলোয়াড় খ্যাতিমান হতে পারেন নি। স্যার লিওনার্ড (লেন) হাটন (সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান), ডেনিস কম্পটন, কলিন কাউড্রে, পিটার মে, টেড ডেক্সটার, নীল হার্ভে, ফ্রাঙ্ক ওয়েল থেকে শুরু করে আরও অনেকেই এ দলের। এদের যে কোনো একজনকে বল দিন (খখন মুড়ে থাকবেন) আর পরক্ষণেই হাত কামড়াতে হবে—বল ফিরে মুখে হাতে লাগার সম্ভাবনাই বেশি।

কোনো ব্যাটসম্যানের শারীরিক মেকআপ এর বৈশিষ্ট্যের দরকার নেই। হাটন মাঝারী দৈর্ঘ্যের মানুষ ছিলেন। স্যর ডন ব্র্যাডম্যান, সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান, দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মানুষ। গাভাসকার ও বিশ্বনাথও লম্বা মানুষ নয়।

গোপনতা হচ্ছে মার আর সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্য। ডেক্সটারের মতো খেলোয়াড় প্রচণ্ড শব্দ করে বল হাঁকড়াতেন। এ দৃশ্য দেখে টম গ্রেভনি বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'যতবারই ওকে ব্যাট চালাতে দেখি মনে হয় এবার বুঝি ব্যাটটা ভাঙলো।' কিন্তু এই বুলেট মারও বুঝি কাউড্রের নরম মারের চেয়ে দ্রুততর নয়। ব্যাটসম্যানদের অনেকেই জীবনের প্রারম্ভেই খ্যাতি কুড়িয়েছেন। অন্যেরা যথেষ্ট প্রবীণ হয়ে।

হাটন মাত্র একুশেই তাঁর ঐতিহাসিক টেস্ট ইনিংস খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ওভালে—রানের সংখ্যা ৩৬৪। আবার টম গ্রেভনিকে ১৯৬২ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে, বয়স তখন তাঁর ৩৫।

যে কোনো ব্যাটসম্যানের খেলার সরঞ্জাম পুরো দরকার। বেশ মজবুত, অথচ নমনীয় প্যাড, ব্যাটিং গ্লাভ, প্রোটেকটার আর তার নিজের শরীরের ওজন আর ভারসাম্য অনুযায়ী ব্যাট। বাল্যাবস্থায়, ট্রুম্যান বলেন—বাপের ব্যাট দিয়েই কাজ চালাতো হয়েছে তাঁকে। সেটা মাটি থেকে শূন্যে তোলা যথেষ্ট

অস্বস্তিকর ছিল, বিপদেরও। আজকালকার ছেলেরা তাদের পছন্দমাফিক ব্যাট পেয়ে যাচ্ছে। যদি কোনো ব্যাট সহজে তোলা যায়, আর সেটা খেলার উপযোগী বলে মনে হয় তা দিয়েই খেলা যায়। ব্যাটের হাতল লম্বা বা খাটো তা নিয়ে মাথা ঘামানো উচিত নয়—পছন্দই শেষ কথা। গ্লাভ ছাড়া খেলা উচিত নয়, তাতে হাসপাতালের পথই প্রশস্ত করা হয়।

ট্রুম্যান প্রোটেকটার-পরা দু'একজন ব্যাটসম্যানকে মেরেছেন, যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন তাঁরা। তাঁর আশঙ্কা, প্রোটেকটার ছাড়া কোনো ব্যাটসম্যানের গায়ে বল লাগলে অবস্থাটা কি দাঁড়াতো। তাছাড়া, কোনো ব্যাটসম্যান প্রোটেকটার ছাড়া মাঠে নামলে ফাস্ট বোলারের মোকাবিলার আগেই ভয়ে মরবে।

এবার আসবে ব্যাট ধরার কায়দা। কোনো দুজন ব্যাটসম্যানকে একই রকম ভঙ্গিতে ব্যাট ধরতে দেখবেন না। কেউ হাতল ধরেন, কারও ডান হাত থাকে অনেক নিচে। অনেকে দুটো হাতই কাছাকাছি রাখেন।

মোদ্দা কথা, ব্যাটটাকে ইচ্ছেমতো যেদিকে খুশি ঘোরানোর মতো করে নিতে হবে।

ব্যাটের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে গেলে ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাতের ওপরই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে (এটা ডান-হাতে খেলেন যাঁরা তাঁদের উদ্দেশে বলা)। ন্যাটাদের শুধু উল্টো ব্যাপারটা চিন্তা করতে হবে। ব্যাটিংয়ে বাঁ হাতেরই দায়িত্ব বেশি। রক্ষণাত্মক মারে এর কাজই বেশি; কারণ এ হাত পারতপক্ষে সরে না। দেখা গেছে, ডান হাত জখম হলেও শুধু বাঁ হাতের জোরেই খেলে গেছেন টেস্ট খেলোয়াড়রা।

এবার পায়ের ব্যাপারটা। কেউ কেউ পা জোড়া রাখেন, কেউ বা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করে। এতে কিছু যায় আসে না যখন আপনি নিজে যতক্ষণ স্বচ্ছন্দে দাঁড়াতে পারছেন।

ডান পা ক্রিজের পেছনে ইঞ্চি দুই-তিন থাকা দরকার। লাইনে পা রাখা ঠিক নয় কারণ ওটা উইকেট-কিপারের এক্তিয়ার, এবং ভেতরে না থাকলে স্টাম্পড্ হয়ে যেতে পারেন।

এই ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রেও কোচরা অনেক সময়ে ভুল করেন, যে সমস্ত খেলোয়াড় নিজস্ব স্টাইলে খেলতে অভ্যস্ত তাদের অন্যভাবে খেলতে প্ররোচিত করা হয়। এটা ভাল নয়। কনস্ট্যান্টাইনকে আস্তে ব্যাট চালাতে বলা,—(ফ্র্যাঙ্ক উলির স্টাইলে) বাতুলতা।

শুধু একটা ব্যাপারে কোচ তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে কড়াকড়ি করতে পারেন—সেটা হচ্ছে খেলোয়াড় যেন তাঁর ব্যাট সামনের পায়ের কাছাকাছিই রাখেন।

খেলোয়াড়কে ব্যাটের ওপর হাতের নিয়ন্ত্রণ রাখতে নির্দেশ দেওয়াও সঠিক নয়। এইভাবে খেলার জন্য পীড়াপীড়ি করলে ডেনিস কম্পটনকে আজ কেউ মনে রাখত না। আবার এই জন্যেই স্যর লিওনার্ড (লেন) হাটনকে মনে রেখেছে মানুষ। কারণ তাঁর পক্ষে সহায়ক হয়েছে এটা।

এই টপ হ্যাণ্ড বা ওপর হাতের খেলা অত্যন্ত গুরুত্বের ফরোয়ার্ড ডিফেনসভ মার খেলায়। কিন্তু নিটোল পুল (pull) এর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ায়।

সমস্ত নামী ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রেই পায়ের কাজ (foot-work) অপরিহার্য। এ কাজ যত স্বচ্ছন্দ হবে, ব্যাটিং তত খুলবে।

এবার গ্রিপ (grip) বা ব্যাট ধরার প্রকৃত রীতি সম্পর্কে আলোচনা। যে কোনো ব্যাটসম্যানের এ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত।

এক কোচকে কিভাবে ব্যাট ধরতে হবে প্রশ্ন করেছিল তাঁর শিক্ষার্থী। উত্তরে কোচ ব্যাট-এর মুখ মাটিমুখো করে হাতল নিজের দিকে মুখ করে ধরতে বলেন ছেলেটিকে। এবং এইটাই ব্যাট ধরার প্রকৃত রীতি বলা হয় তাকে। এটা যে কেউ করে দেখতে পারেন কি ফল পান!

ইংরেজ খেলোয়াড়েরা প্রায় প্রত্যেকেই হবস-এর অনুকরণে ব্যাট ধরেন। ব্যাটিংয়ের নানান ভঙ্গিমার নানান নাম - ড্রাইভ, ব্যাক-ফুট ড্রাইভ, লেট কাট, স্কোয়ার কাট লেগ গ্লাইড, সুইপ, হুক ও পুল।

ফরোয়ার্ড ও ব্যাক স্ট্রোক (forward and backward strokes)

ক্রিকেটে ব্যাটিং সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলা যায়, এর ভিত্তি রচিত হয়েছে উপরোক্ত দুই পদ্ধতির মাঝে। আক্রমণাত্মকই হোক আর রক্ষণাত্মক হোক—এর একটাকে গ্রহণ করতে অথবা প্রভাবিত হতে হবে।

বিগত ষাট বছরের ক্রিকেট ইতিহাসে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে তার মধ্যে ব্যাক-প্লের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ক্রিকেটের পীচের ওপর নির্ভর করে খেলা প্রধানত, তাই উইকেট যত মন্দ হতে থাকে বল ঘোরে তত বেশি। ফলে ব্যাক-প্লের ওপর তত বেশি নির্ভরশীল হতে হয় ব্যাটসম্যানকে। অবশ্য আজকের দিনে অধিকাংশ ব্যাটসম্যানই দুই পায়ের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

কোচ কিন্তু কথনোই শুধুমাত্র ব্যাক-প্লের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে নির্দেশ দেবেন না কোনো ব্যাটসম্যানকে। এবং আক্রমণ বা রক্ষণমূলক উভয় খেলাতেই কিন্তু দুই পায়ের কাজ দরকার হচ্ছে।

এক্ষেত্রে গ্রিপ (grip)-এর প্রসঙ্গ আবার এসে যাচ্ছে। খেলার প্রতিটি মার-এর সমস্ত কলাকৌশলের মূলে এই গ্রিপ, স্টান্স আর ব্যাক লিফট। কোচদের এর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কারণ এর ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে খেলোয়াড়।

ব্যাট নিয়ে উইকেটে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে নিচের নিয়মগুলো মাথায় রাখতে হবে :

১. হাত দুটি যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকতে হবে,

২. ডান হাতটি হাতলের বেশ খানিকটা নিচের দিকেই ধরতে হবে,

৩. বাঁ হাতের উল্টোপিঠ, ব্যাট যদি সোজা ধরা থাকে– তা মিড-অফ একস্ট্রা কভাবের মধ্যে কোনদিকে ঘোরানো থাকবে,

৪. দুই হাতেরই বুড়ো আঙুল আর অন্যান্য আঙুলে হাতলটা বেশ ভাল করে ধরা থাকবে।

স্টান্স (stance) : স্টানসের ক্ষেত্রে নির্দেশ : স্বাভাবিক, ঢিলেঢালা ও সাম্য বজায় রাখা অবস্থায় দাঁড়ানো। কারণ লিফট এবং অন্যান্য মার সবই এ থেকেই আসছে।

ব্যাটসম্যানদের স্টান্স-এ কিন্তু একের থেকে অন্যের যথেষ্ট তফাত, এবং কাউকেই এমনভাবে দাঁড়াতে দেওয়া উচিত নয় যাতে সে অস্বস্তি বোধ করে। তবে, অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যানই নিচের রীতির অনুমোদন করেন :

পা : ১. দুই গোড়ালির মধ্যে ফাঁক থাকবে তিন ইঞ্চি মত। ডান পা ক্রিজের সমান্তরাল ও বাঁ পা কভারের দিকে ঘোরানো।

২. দুই পায়ের ওপর শরীরের ভার প্রায় সমান সমান হলেও, ডান পায়ের ওপর সামান্য বেশি হবে।

৩. হাঁটু দুটো সামান্য ঢিলে থাকবে, যাতে নড়াচড়া দ্রুত এবং সহজ হয়।

৪. বলের লেংথ না মাপা পর্যন্ত পায়ের কোনোরকম নড়াচড়া চলবে না, আসল মারের সঙ্গেই হবে এটা।

শরীর : খেলোয়াড়ের শরীর পয়েন্টের সামনাসামনি থাকবে, অর্থাৎ বাঁ

দিককার কাঁধ উল্টোদিকের উইকেট-এর যতটা সম্ভব সোজা থাকবে। এবং তাতে ব্যাক-লিফট নির্ভুল হবে। তবে,এর কোনো রকম অতিরঞ্জন হলে স্টানস অস্বাভাবিক হবে, মনে হবে কৃত্রিম।

মাথা : মাথা উঁচু করা থাকবে, বোলারের দিকে ফেরানো। চোখদুটো থাকবে যতটা সম্ভব সুসমঞ্জস এবং একমাত্র এইভাবেই ব্যাটসম্যানের পক্ষে দুই চোখের কাজ একসঙ্গে করা সম্ভব—তাতে বলের গতি বিচার করার ক্ষমতা থাকে। চোখ অনড় থাকবে যতটা সম্ভব।

'দুই চোখের স্টান্স' কথাটার কোনো মানে হয় না ; কারণ প্রত্যেক দক্ষ ব্যাটসম্যানেরই বলের ওপর নজর পরিষ্কার রাখতে হবে। 'দুই কাঁধের স্টান্স', যেখানে পা আর কাঁধ দুই-ই বোলারের দিকে মেলা—ত্রুটিযুক্ত ব্যাক লিফটের অবস্থার সৃষ্টি করে, ফলে ক্রস ব্যাট এসে যায়।

ব্যাট : অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ব্যাটটাকে ডান পায়ের পাতার ইঞ্চি দুয়েক পেছনে পেছনে রাখেন কারণ এটা তাঁদের কাছে খানিকটা আরামদায়ক, স্বাভাবিকও মনে হয়। ব্যাটের ব্লেড বাঁ পায়ের মুখোমুখি থাকছে, হাতদুটো ছাড়া বাঁ উরুর থেকে খানিকটা দূরে। কিন্তু এখানে সেই একই রীতি খাটে, ব্যাটসম্যানের সুবিধে এবং 'মারার জন্য প্রস্তুত' অবস্থা অনুযায়ী দাঁড়ানো।

ব্যাক-লিফট (back lift) সঠিক ব্যাক লিফট কখনো স্বাভাবিক হয় না, তবে অনায়াসে তা আয়ত্ত করা যায়, যদিও খুব বেশি মনোযোগ না দেওয়াই ভাল।

একথা অবশ্যই ঠিক যে সেরা ব্যাটসম্যানদের অনেকেই ব্যাট সোজাসুজি তোলেন নি বা তোলেন না—তবে, তাঁদের তোলার মূল কায়দা যাই হোক না কেন, পরবর্তী কোনো সময়ে তা তাঁরা মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নেন।

তাহলে কথাটা এই দাঁড়ালো, ব্যাক লিফট যত বেশি সোজা হবে, ততই সোজা স্ট্রোক শেখার সুযোগ হবে। পূর্ণাঙ্গ মার হবে। এতে বাঁ হাতের কাজই বেশি প্রাধান্য পায়। আর, দুটি হাতকেই যদি শরীর থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে বাঁ কাঁধ পীচ বরাবর থাকবে—যেটা সোজা বা স্ট্রেট স্ট্রোক ব্যাটসম্যানদের নির্ভুল প্রাথমিক অবস্থান।

ফরোয়ার্ড স্ট্রোক (forward stroke)

এ ধরনের সব মারেই বাঁ পা ও কাঁধ বেরিয়ে বলের লাইনে থাকবে। শিক্ষার্থীদের এটা মাথায় ঢুকিয়ে দিলে তারা পরে খেলতে খেলতে নিজেরাই

ব্যাপারটা ঠিক করে নিতে পারবে। বাঁ পা আর কাঁধ শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

বাঁ পা : বাঁ পা বলের পীচের দিকে যতটা সম্ভব বেরিয়ে যেতে পারে আর পীচের যত কাছাকাছি হবে, বলের গতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে, কারণ পা ও ব্যাট-এর মধ্যেকার ফাঁক কমছে।

শরীরটাকে ঠিক মত মারের কাজে লাগাবার প্রয়োজনে বাঁ দিকের হাঁটুটা সামান্য বাঁকিয়ে নিতে হবে। সোজা বলের ক্ষেত্রে বাঁ পায়ের পাতা একস্ট্রা কভারের দিকে ফেরানো থাকবে। অফ-এ বল যতটা ওয়াইড হবে বাঁ পায়ের পাতা তত বেরোবে।

ডান পা : ডান পায়ের গোড়ালি শরীরের ভার যাতে অনায়াসে বাঁ পায়ের ওপর পড়ে তাতে সাহায্য করবে; মার-এর পর ডান পায়ের পাতাই শুধু মাটিতে থাকবে।

বাঁ কাঁধ আর বাঁ কোমরের নিচের অংশ : শরীরের এই দুই অংশের অবস্থান সব ফরোয়ার্ড মার-এর প্রাথমিক শর্ত। প্রস্তাবিত মার-এর লাইনের মুখোমুখি থাকবে এই দুই অংশ।

অফ-এর দিকে স্ট্রোক বা মার যত ব্যাপক (wider) হবে কাঁধের পেছনের অংশ বোলারের দিকে তত ফেরানো থাকবে।

দুই হাত : বাঁ হাতে ব্যাট অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সঙ্গে ধরতে হবে, এবং সমস্ত মারটাই নিয়ন্ত্রণ করবে।

ডান হাতের চেটোতে (palm) যদি ব্যাট ধরা থাকে তাহলে রক্ষণাত্মক ফরোয়ার্ড মার খেলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ব্যাট : বলের পথে ব্যাট এর পুরো মুখ যত বেশিক্ষণ থাকবে, স্ট্রোক বা মার তত বেশি নিশ্চিত হবে। যখন রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে বল মারা হচ্ছে, অর্থাৎ গুড লেংথের বলে, ব্যাট আর বলের ব্যবধান ন্যূনতম হয়ে যাবে। পীচে পা যতট বাড়ানো যাবে ব্যাটসম্যান সুবিধে পাবেন।

কাট (cut)

সাধারণত ফিল্ডিং সাজাতে গিয়ে বোলার বা ফিল্ডিং সাইডের অধিনায়ক অফের দিকে বেশি ফিল্ডসম্যান রাখেন। এমনও দেখা যায় লেগের দিকে মাত্র একজন বা দুজনকে রেখে ছয় সাত জনকে অফের দিকে প্রায় ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি জায়গায় সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বোলাররাও সাধারণত এমন বল

বেশি দিয়ে থাকেন যা ব্যাটসম্যান মারতে পারলে যেন অফের দিকে যায়। কেননা লেগের দিকে বল পেলে ব্যাটসম্যানদের পোয়াবারো। তাই বোলাররা চেষ্টা করেন যাতে বল লেগস্টাম্পের বাইরে পিচ না পড়ে।

অফের দিকে বল বেশি আসে বলেই ব্যাটসম্যানকে এমনভাবে বল মারতে হয় যাতে স্লিপ থেকে মিড অফ অঞ্চলের ভেতর দিয়ে বল বাউণ্ডারিতে পৌছোয়। অবশ্য ড্রাইভ মেরেও ব্যাটসম্যান রান তুলতে পারেন। কিন্তু ড্রাইভ মারার উপযোগী বল ব্যাটসম্যান বেশি পান না। তাছাড়া ড্রাইভ মারার দিকে ব্যাটসম্যান আগ্রহ দেখালে মিড-অফ আর একস্ট্রা কভারের মাঝে ফিল্ডার দাঁড়িয়ে সেই বল থামিয়ে দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানের প্রধান অস্ত্র হল কাট (cut)। বাঙলায় একে আমরা বলতে পারি কোপ দেওয়া।

মিডিয়ম পেস বলে কাট করলে সবচাইতে দ্রুত কাঙ্ক্ষিত ফলটি পাওয়া যায়। কেননা স্লো বা স্পিন বলে কাট করলে বল তত জোরে নাও ছুটতে পারে এবং তার ফলে রান পেতে অসুবিধে হতে পারে। অফ স্টাম্পের বাইরে দ্রুত ছুটে আসা বলকে কাট করা যায়। পাকা ব্যাটসম্যান অবশ্য গুড লেংথ বলেও কাট মারতে পারেন। তবে এ মারে বেশ ঝুঁকি আছে। মারের টাইমিংয়ে একটু গোলমাল হলেই অফের দিকে ঘিরে থাকা ফিল্ডসম্যানদের মধ্যে যে কেউ তা লুফে নিতে পারেন।

কাট মারার সময় ব্যাটসম্যান ব্যাটটিকে ব্যাক লিফট থেকে এনে ছুটে আসা বলের মাথায় ঠুকে দিতে হয়। অবশ্য একেবারে বলেব পুরোপুরি ওপরে না, কেননা ওপরে মারলে বল ব্যাটের আঘাত পেয়ে সোজাসুজি মাটিতে পড়বে, দূরে যাবে না। তাই বলের মাথা বা ওপর দিকের একটু পাশে ঠুকে দিতে হবে। মারার সময় অবশ্য ব্যাটসম্যানকে লক্ষ্য রাখতে হবে বল বাউন্স (bounce) খেয়ে উপযুক্তভাবে লাফিয়ে উঠেছে কিনা। তার আগে কাট মারলে স্লিপ বা গালির হাতে ক্যাচ আউট হতে পারে। গায়ের পুরো জোর দিয়ে কাট মারতে হয়। জোরে মারলে দ্রুত ছুটে আসে বল চোখের পলকে বাউণ্ডারিতে ছুটে যাবে। আর যদি হঠাৎ বল ব্যাটের মাঝখানে নাও লাগে তাহলে অন্তত বলটি অফসাইডের ফিল্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাতে ফিল্ডার সহজে ক্যাচ ধরতে পারবেন না।

দু ধরনের কাট আছে—লেট কাট (late cut) এবং স্কোয়ার কাট (square cut)।

লেট কাট (late cut)

লেট কাট অতি চমৎকার মার। অত্যন্ত বিপজ্জনক মারও বটে। ঠিকমত মারতে পারলে স্লিপ আর গালির মাঝখান দিয়ে বলটি চোখের পলকে বাউণ্ডারিতে পৌছে যায়। অনেক সময় ফিল্ডারদের নড়ার সুযোগ থাকে না। কিন্তু ব্যাটসম্যান টাইমিংয়ে ভুল করলেই মুশকিল, কেননা মার ঠিকমতো না হলেই খোঁচা লেগে বল স্লিপ, গালি বা উইকেটকিপারের হাতে গিয়ে পড়বে। পাকা ব্যাটসম্যান না হলে লেট কাট ভালভাবে মারতে পারেন না। ইংল্যাণ্ডের হ্যাক হবস্ এবং ভারতের বিজয় মার্চেণ্ট লেট কাট মারায় পারঙ্গম ছিলেন।

লেট কাট মারায় বিশেষত্ব আছে। লেট কাট মারার উপযোগী বলটিকে ব্যাটসম্যান প্রায় উইকেটের লাইনে পৌছোতে দেবেন, তারপর ডান পা পিছিয়ে উইকেটের সামনে আড়াআড়িভাবে রাখবেন। বাঁ পা-টিকেও পপিং ক্রিজের একটু ভেতরে আনতে হবে যাতে শরীরের ব্যালেন্স ঠিক থাকে। ডান পায়ের বুটের ডগা থাকবে গালির দিকে। শরীরের অবস্থান ঠিক রেখে ছুটে যাওয়া বলে কোপ মারতে হবে। ইংরেজী late শব্দটির অর্থ দেরী। যে কাট একটু দেরীতে অর্থাৎ পপিং ক্রিজের লাইন থেকে উইকেটের লাইনে আসার সুযোগ দিয়ে বলটিকে মারলে তা লেট কাট হবে। মারটি একটু দেরীতে পড়ে বলে একে লেট কাট বলা হয়।

যথার্থ ফাস্ট বলে লেট কাট মারা কঠিন। কেননা তাতে বল পড়ে দ্রুত আসার সময় ব্যাটসম্যান দেরী করার ঝুঁকি নিতে পারেন না। আবার স্পিন বলেও এ মার মারা যায় না। অফ স্পিনারের বলে লেট কাট মারা বিপজ্জনক। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের স্পিনার জিম লেকার ম্যাঞ্চেস্টারের টেস্ট ম্যাচে উনিশটি অস্ট্রেলীয় উইকেট নিয়েছিলেন। অনেক ব্যাটসম্যান বিপজ্জনক বলে লেট কাট মারার লোভ ছাড়তে পারেন নি বলে আউট হন।

স্কোয়ার কাট (square cut)

বোলার বল করলে বলটি যখন ড্রপ পড়ে পপিং ক্রিজের লাইনের ওপরে কিংবা আরেকটু ভেতরে ব্লকের লাইনে চলে আসে তখন কাট মারলে সেই মারকে স্কোয়ার কাট বলা হয়। স্কোয়ার কাট মারলে বল পয়েণ্টের পাশ দিয়ে বাউণ্ডারির দিকে ছুটবে। এ মার মারবার সময় ব্যাটসম্যান ব্যাটে বলে সংযোগের সময় ডান কবজি বাঁ কবজির ওপর একটু চালিয়ে দেবেন (অবশ্য

ন্যাটা ব্যাটসম্যান হলে বিপরীত হবে), তাতে ক্যাচ ওঠবার ভয় কমে যায়। সাধারণত পেছনের পায়ের ওপর ভর দিয়ে মারা হয় স্কোয়ার কাট। কাঁধ ঠিক রাখা দরকার এ মারে। কাঁধ নেমে গেলেই উইকেটরক্ষকের হাতে ক্যাচ উঠবার সম্ভাবনা। ডন ব্র্যাডম্যানের মতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্লাইভ ওয়ালকট সর্বকালের সেরা স্কোয়ার কাট মারনেওয়ালা খেলোয়াড়।

ফরোয়ার্ড: ড্রাইভ

জোরের সঙ্গে সামনের দিকে মারাকে ড্রাইভ বলা হয়। ড্রাইভ মার চার ধরনের হতে পারে :

ক. কভার ড্রাইভ। খ অফ ড্রাইভ। গ. স্ট্রেট ড্রাইভ। ঘ. অন ড্রাইভ

চারটি মারেই মূলত একই ধরনের বৈশিষ্ট্য আছে। মারার পর বলটি মাঠের যে অঞ্চল দিয়ে ছুটে গেল, সেই অঞ্চলের নামানুসারে ড্রাইভের পার্থক্য বোঝা যায়। অর্থাৎ কভার অঞ্চল দিয়ে বল গেলে কভার ড্রাইভ, অফ দিয়ে বল গেলে অফ ড্রাইভ, সোজাসুজি গেলে স্ট্রেট ড্রাইভ এবং অন দিয়ে গেলে অন ড্রাইভ বলে গণ্য করা হয়।

ওভার পীচ বলে ড্রাইভ মারা ব্যাটসম্যানের পক্ষে সব চাইতে নিরাপদ। কেননা তাতে বল ব্রেক বা সুইং করার সুযোগ পায় না।

সব ধরনের ড্রাইভ মারার জন্যই ব্যাটসম্যানের বাঁ কাঁধ সামনের দিকে বাড়ানো থাকবে। অবশ্য অন ড্রাইভের সময় অন্য ড্রাইভের তুলনায় তাড়াতাড়ি কাঁধ টেনে আনতে হয়। ডানপায়ের ওপর বেশি জোর পড়ার দরুন বাঁ পা কেও যথাযথ স্থানে রাখতে হয়।

ব্যাটসম্যান বাঁ পা কতটা বাড়াবেন তা নির্ভর করবে বলটা কতদূরে পড়ছে। কভার ড্রাইভ মারার সময় বাঁ পায়ের ডগা কভারের দিকে ঘোরানো থাকবে। অন্য ড্রাইভগুলো মারার সময় বাঁ পায়ের ডগা মোটামুটি বোলারের দিকেই ঘোরানো থাকবে।

বলটি মারার মুহূর্তে বাঁ পা শরীরের ভার বহন করবে। কিন্তু পা-টি এমনভাবে হাঁটুর কাছে ভেঙে রাখতে হবে যাতে শরীরের ভারসাম্য বজায় থাকে। প্রতিটি ড্রাইভ মারের ক্ষেত্রে ডান পায়ের গোড়ালি ঠিকমতো তুলতে হবে এবং আঙুলের ডগার ওপর ডানপায়ের ভারসাম্য রাখতে হবে। এই সঙ্গে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ডান পা পপিং ক্রিজের মধ্যে থাকে।

ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভে ব্যাক লিফট সামান্য উঁচু হওয়া প্রয়োজন। ব্যাট লম্ব অবস্থায় আসবার আগেই বলটি মারতে হবে। না হলে বল উঠে যেতে পারে।

যে-বল লেগস্টাম্পের দিকে ধেয়ে আসবে সেই বলে অন ড্রাইভ, মিডল ও অফ স্টাম্পের দিকে ধেয়ে আসা বলকে স্ট্রেট ড্রাইভ, অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরের বলকে কভার ড্রাইভ মারা যেতে পারে।

কভার ড্রাইভ মারবার সময় ব্যাটসম্যান ব্যাটের ব্লেড সামান্য দেখাবেন, স্ট্রেট ড্রাইভ মারার সময় ব্লেড পুরোপুরি দেখাবেন।

সাধারণত ড্রাইভ মারে বিশেষ বিপদ না থাকলেও কভার ড্রাইভ মারার সময় ব্লেডের পুরোটা ব্যবহার না করলে ব্যাটের বাইরের কানায় বল লেগে স্লিপে ক্যাচ উঠতে পারে। আবার ব্যাটের ভেতর দিকে লেগে বল স্টাম্পে চলে আসতে পারে।

ফাস্ট ও মিডিয়ম-পেস বলে যথাসম্ভব ক্রিজের ভেতরে থেকে ড্রাইভ মারা উচিত। স্লো-বোলারের বিরুদ্ধে অবশ্য ব্যাটসম্যান প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত ফুটওয়ার্কের সাহায্যে ক্রিজের বাইরে বেরিয়ে এসে বলটিকে হাফ ভলি করে মারতে পারেন। অফ স্পিনারের বলে ক্রিজের ভেতরে না থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে মারাই সুবিধে এবং তাতে বিপদ কম হয়।

ড্রাইভ মারার সময় ব্যাটসম্যানেরা অনেক সময় দুটি ভুল করেন। এক, বলের ফ্লাইটের লাইনে সামনের পা যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ করেন না এবং দুই, বলের গতি যথাযথ অনুধাবন করেন না। ব্র্যাডম্যানের মতে আউট-স্যুইং বলে অফ ড্রাইভ এবং ইন-সুইং বলে অন ড্রাইভ মারা উচিত।

পুল (pull)

ব্র্যাডম্যান কংক্রীট পিচে খেলতে বাধ্য হয়েছেন অনেক দিন। এবং এ-ধরনের পিচের সঙ্গে যাঁদের পরিচিতি আছে তাঁরা জানেন ঘাসের পিচের চেয়ে বল অনেক বেশি লাফায় (bounce) এতে। তিনি বলেন :

'আমার শারীরিক দৈর্ঘ্য খুব বেশি না হওয়াতে এ ধরনের বলে খেলতে অসুবিধে হয়েছে আমার। এজন্যে একটা চিহ্নিত পর্যায়ে পুল বল মারা অভ্যেস করেছি। অর্থাৎ মিড-অন আর স্কোয়ার লেগ-এর মাঝামাঝি কোথাও পুলের কাজটা করতে চেষ্টা করেছি।'

সিডনিতে পৌঁছে ব্র্যাডম্যান সাহেব ঘাসের সন্ধান পেলেন কিন্তু এই মাঠেও একই কায়দায় খেলে চললেন। এখন, ঘাসের পিচ কংক্রীটের চেয়ে অনেক বেশি অনিশ্চিত, ফলে বলের গতি দ্রুততর হয়েছে, পরিণামে এল.বি. ডব্লিউ বা ক্লীন বোলড হয়েছেন। কোনো ব্যাটসম্যানেরই বল পুল করা উচিত নয়, বিশেষ করে যে বল ওভার পিচের বা গুড লেংথের, এতে বিপদই ডেকে আনা হবে।

পুল মারের তিনটি অন্যতম শর্ত হল: ভারসাম্য (balance), নিয়ন্ত্রণ (control) ও শক্তি (power)। এ-ধরনের মার স্লো লেগ-ব্রেক বোলারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী। ক্লোজ লেগ ফিল্ডে অফ-স্পিনারের ক্ষেত্রেও সমান মূল্যবান।

অফ-স্টাম্পের বাইরে পুল মারতে কোনো ব্যাটসম্যানের দ্বিধা হওয়া উচিত নয়।

বৃষ্টিতে ভেজা পেছল ক্রীজে পুল মারার চেষ্টা না করাই ভাল, তাতে বিপদ আছে।

হুক

এই মার সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার দরকার আছে। এই মার নিরাপদে খেলতে হলে, ব্যাটসম্যানের ডান পা সরিয়ে নিতে হবে, সেই সঙ্গে শারীরিক ভারসাম্য—শুধু পেছন দিকে নয়—অফ-এর দিকেও অনেকখানি সরিয়ে নিতে হবে। ফাস্ট উইকেটে, যত শর্টই হোক বল—হুক-এর মার কিন্তু বিপদজনক। যথেষ্ট পোক্ত না হলে এ মার-এর সুযোগ না নেওয়াই ভাল। এবং তা সত্ত্বেও চোখ, পা ও কবজির ক্ষিপ্রতা প্রয়োজন—যদি সার্থকভাবে এই মার-এর সদ্ব্যবহার করতে হয়। মামুলি খেলোয়াড়ের নিরাপদে হুক করার জন্যে সহজ পেস-এর বা শ্লথ উইকেটেও বল শর্ট হওয়া দরকার। লং-হপ (long-hop) বলই সম্ভবত সবচেয়ে খেলা সহজ। অন্যদিকে লেগ-ব্রেক (leg-break) বিপদের। এই মারকে ঠিকভাবে আয়ত্তে রাখতে পারলে তা থেকে ফসল কুড়োনো গেলেও তাতে বিপদের ঝোঁক থেকেই যায়।

লেগ-গ্লানস

এবার আসে লেগ-গ্লানসের কথা। ব্যাটিংয়ের বিশোধন বলা যেতে পারে একে। এই মার-এ খেলতে পারাটা অনেক কাজের হয়, অবশ্যই, ব্যাটসম্যান

যদি মনে করেন এর কোনো বিকল্প নেই। ফাস্ট পিচ-এ পেস বোলিংই এই ধরনের মারের উপযোগী।

লেগ-গ্লানস আসলে ফরোয়ার্ড বা ব্যাক স্ট্রোকের বিশোধনও বলা যেতে পারে, এবং বলের লেংথ অনুযায়ী সামনের বা পেছনের পায়ে খেলা যায়। দুই ক্ষেত্রেই সোজা ব্যাটেই খেলা হয়, যদিও অনিবার্য অবস্থায় ব্যাট বলের লাইনে এসে যাচ্ছে, সুতরাং সোজা বলে এই স্ট্রোক্ না মারাই শ্রেয়।

ব্যাটসম্যান যদি বলটিকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে চান তাহলে শুধুমাত্র বাঁ পায়ের সামনে এবং মাথার ঠিক পিছনেই তার মোকাবিলা করতে হবে। আর বলটিকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নজরে রাখতে হবে।

আবার, পেছনের পায়ে এ বল খেলতে হলে শর্ট লেংথের বল খেলতে হবে এবং ব্যাটসম্যানের বাঁ পায়ের ঠিক সামনে। যে বল নিঃসন্দেহে শর্ট বল সে বল গ্লানস করা উচিত নয় বরং তা হুক করা বা উইকেটের সামনে আসার পরে মারাই উচিত।

বস্তুত, যাঁরা এই মার-এর পথপ্রদর্শক বা প্রবক্তা, তাঁরা এই বল অত্যন্ত কাছে—বলা যায় নাকের ডগায় এলে তবে খেলেন।

উইকেটের মধ্যে দৌড়নো (running between wickets)

রান তোলার প্রয়োজনে উইকেট এর মধ্যে দৌড়নোর ব্যাপারটাও যথেষ্ট গুরুত্বের—শুধু ব্যাটসম্যানদের কাছেই নয়, যদিও প্রাথমিক ও প্রধানত তাদেরই—বোলার ও ফিল্ডারদের ক্ষেত্রেও। স্কুল ও কলেজের ক্রিকেট-এর মান এখনো অত্যন্ত খারাপ কিন্তু দ্রুত শিক্ষণ ও অনুশীলনে উন্নত হতে পারে। ডাকা (calling), দ্রুত দৌড়নো এবং সবার ওপরে সঠিক ঘোরা, ব্যাটসম্যানদের মার-এর চেয়ে কম গুরুত্বের নয়। দৌড়নোর ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপারটা দরকারী—কারণ ফিল্ডারদের বিভ্রান্ত করতে এর চেয়ে ভাল পন্থা আর নেই।

দৌড়নোর মুহূর্তে ডাকা বা কল-এর ব্যাপারটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ; যেমন—

(১) উইকেট-এর পেছনে বল না গেলে স্ট্রাইকার বা ব্যাটসম্যান সবসময়েই ডাকবেন,

(২) ডাক সুস্পষ্ট আর চূড়ান্ত হওয়া দরকার: 'হ্যাঁ' 'না' অথবা 'অপেক্ষা কর',

(৩) বল মারার পর কিছু দূর গেলে দৌড় শুরু করে দিয়ে ব্যাটসম্যান তার সঙ্গীকে অতিক্রম করার সময় 'দুই হতে পারে' বা 'তিন হোক' বলে দিতে পারে। তবে এসব নেহাতই সতর্কীকরণ এবং পরবর্তী কোনো ডাকে তার অনুমোদন প্রয়োজন। সতর্কীকরণ খুব জোরালো বা সোচ্চার না হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ সংশ্লিষ্ট ফিল্ডসম্যান সতর্ক হয়ে সজাগ হতে পারে।

(৪) দ্বিতীয় বা পরবর্তী ডাক সবসময়েই উইকেট-এর দিকে ধাবমান ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে আসবে।

(৫) কোনো ডাককে অগ্রাহ্য করা হলে, তা সুস্পষ্ট 'না' দিয়ে করা দরকার, কারণ দৌড় শুরু করার পর যে কোন প্রকারে অপর প্রান্তে পৌঁছতে হবে ব্যাটসম্যানদের।

দৌড়নো :

(ক) যে ব্যাটসম্যান বলটি মারছেন না (non-striker), তিনি উল্টোদিকের ক্রিজের থেকে যথেষ্ট ফাঁক দিয়ে দাঁড়াবেন, বাঁ হাতে ধরা থাকবে ব্যাট। বল ছাড়ার পরই শুধু এক গজ থেকে দেড় গজের মত দূরত্ব এগিয়ে পড়তে পারেন। তাঁকে সব সময়েই মনে রাখতে হবে স্ট্রাইকারের দৌড় এবং তাঁর দৌড় দুই-ই সমান গুরুত্বের।

(খ) বোলার যে দিক থেকে বল করছেন সেই দিকেই দৌড়বেন স্ট্রাইকার। ডান হাতেই ব্যাট থাকবে।

(গ) রান আউটের আশঙ্কা এড়াতে স্ট্রাইকার সব সময়েই নিজের অন্তত দু গজ দূর থেকেই ব্যাট মাটিতে ছুঁইয়ে দৌড়বেন। শেষ মুহূর্তে ব্যাট নামানোতে 'রান আউট' হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

(ঘ) কোনো মারে একের বেশি রানের সম্ভাবনা থাকুক আর নাই থাকুক, প্রতিটি ব্যাটসম্যানের লক্ষ্য হবে প্রথম রান শেষ করেই ঘুরে যাওয়া—পরবর্তী রানের জন্যে। এই ঘোরার ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বের।

সব খেলাতেই যেমন একাগ্রতাই প্রথম ও শেষ কথা, ক্রিকেট-এও এর প্রয়োজন প্রতি মুহূর্তে।

বোলিং (bowling)

ক্রিকেটের একটি বিরাট উত্তেজনাকর ব্যাপার হল—বল করা বা বোলিং (bowling)। উল্কাবেগে বল ছোটা, পাক ধরিয়ে ব্যাটসম্যানকে বোকা

বানিয়ে উইকেটের পতন ঘটানো একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়। ব্যাটসম্যানের যেমন সাহস আর নার্ভের দরকার, তেমনি বোলারেরও চাই নার্ভ আর কলজের জোর।

বোলিংয়ের প্রথম ও প্রধান শর্ত হল দিকনির্ণয় আর লেংথ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা। বোলার ফাস্ট, স্লো অথবা মিডিয়ম যাই হোন না কেন, এ দুটি গুণ ছাড়া সার্থক হতে পারবেন না। বলটিকে ঠিক জায়গায় ফেলতে হবে এবং তা বোলারের পছন্দসই হবে। এটি সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

বোলিংকে সাধারণভাবে দুভাগে ভাগ করা হয়—স্লো বল এবং ফাস্ট বল। এ দু-ধরনের বলের আচার নানা রকমের হতে পারে। স্পিন বোলারদের চলতি কথায় স্লো বোলার বলা হয়। স্পিন বোলিং অনেক ধরনের হতে পারে। ফাস্ট বোলিংকেও দুভাগে ভাগ করা হয়—মিডিয়ম ফাস্ট এবং ফাস্ট। এ শ্রেণীর বোলিংয়েরও বিভিন্ন ধরন আছে।

সুইং :

সুইং করানো বা বাতাসে ঝুলিয়ে বল বাঁকিয়ে দেওয়া এক ধরনের বোলিং পদ্ধতি। অনুকূল ও ভারী বাতাসে এ ধরনের বল বেশ কার্যকরী হয়। তাতে দরকার বলের সাইন নতুন অবস্থায় থাকা। এক দিকের চামড়ায় সাইন থাকলেও চলে। সাধারণত মিডিয়ম ফাস্ট বোলাররা বেশ সফলভাবেই বল সুইং করাতে পারেন। ফাস্ট বোলাররাও পারেন, তবে হাত ঘুরিয়ে তাঁরা বলে তত বেশি মোচড় দিতে পারেন না; তাঁদের হাতে সুইং তত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে না। না, স্পিনাররাও সাধারণভাবে সুইং করান না।

যে বলগুলো মিডল স্ট্যাম্পের দিকে যেতে যেতে অফের দিকে বাঁক নেয় সেগুলো আউট-সুইং। আর মিডল স্ট্যাম্প থেকে শূন্যেই ঘুরে লেগের দিকে বেঁকে গেলে হল ইন সুইং।

কী করে বল সুইং করাতে হবে? বল শূন্যে ঘোরাতে হলে তাকে যথা-সম্ভব শূন্যে রাখতে হবে এবং এ বল ব্যাটসম্যানকে ফরওয়ার্ড খেলতে বাধ্য করবে। সুইং বলে শর্ট পীচ কখনো চলবে না কেননা সে বল ব্যাটসম্যানের কাছে বাঘের মুখে ছাগলছানা। নতুন বলে কতক্ষণ সুইং করানো সম্ভব তা নির্ভর করে মাঠের অবস্থার উপর। বলের সীম (সেলাইয়ের জোড়) নষ্ট না হলে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে বা যে মাঠে ঘাস আছে সেখানে সারাদিন বল সুইং করানো চলে। কিন্তু যে মাঠে ঘাস নেই, আউট ফিল্ডও ন্যাড়া সেখানে

আবহাওয়া অনুকূল হলেও বলের সাইন ও সীম নষ্ট হলে স্যুইং করানো অসম্ভব। কারণ নৌকার হালের মত বলের সীম স্যুইংয়ের দিক নির্ণয় করে। সীম ছাড়া বল সোয়ার্ভ করানো শক্ত, তবে বলের একপাশে সাইন থাকলেও স্যুইং করানো চলে।

ইন-স্যুইং বল করতে হলে বল ধরতে হবে যাতে সীম খাড়া, কিন্তু ফাইন লেগের দিকে সামান্য কাত, বুড়ো আঙুল সীমের তলায়, মাঝের আঙুল সীমের উপরে, তর্জনী বাঁ পাশে আর অন্য দু আঙুল ডান পাশে থাকে। এভাবে ধরে বল ছাড়বার সময়ে বলের ডিরেকশনে আঙুল সামনে ঠেলে দিয়ে মাটির দিকে টেনে নিলে এবং কব্জি সামান্য ঘুরিয়ে যাতে হাত ফাইন লেগের দিকে থাকে, তবে ইন-স্যুইং হবে। বল ছোড়ার আগে হাত একদম সোজা না হয়ে সামান্য বাঁয়ে ডান কান ঘেঁসে বল করলে ইন-স্যুইং বেশি হবে।

আউট-স্যুইং বলেও সীম খাড়া থার্ডম্যানের দিকে সামান্য বেঁকে বুড়ো আঙুল সীমের নিচে, তর্জনী ও মধ্যমা সীমের দুপাশে এবং আর দু আঙুল ডান দিকে থাকবে। ডেলিভারির আগে হাত সামান্য ডাইনে এবং ডেলিভারির সময়ে হাত স্লিপের দিকে করলে আউট-স্যুইং বেশি হবে। স্ট্যাম্প ঘেঁসে আউট-স্যুইং বোলার এবং রিটার্ন-ক্রীজের কাছ থেকে ইন-স্যুইং বোলার বল দিলে স্যুইং আরও বেশি হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে স্যুইং করাবার সময়ে যেন কোন কারণে বোলারের আঙুলে বল স্পিন না করে। বোলিং-এর শেষে আউট-স্যুইং বোলারের হাত আসবে বাঁ কোমর ঘেঁসে আর ইন-স্যুইংয়ের ডান কোমর। ফাইন লেগ থেকে সামান্য হাওয়া থাকলে আউট স্যুইং এবং থার্ডম্যান থেকে তা থাকলে ইন-স্যুইং করা চলে।

এবারে আলোচনা করা যাক কোথায় বল স্যুইং করবে? স্যুইং বোলারের লক্ষ্য হবে ডেলিভারির পর উইকেটের চার ভাগের তিন ভাগ সোজা গিয়ে, ব্যাটসম্যান খেলতে যাবার মুখে যেন বল স্যুইং করে। একে বলে লেট স্যুইং, এবং এ ধরনের বলেই বিপদের গন্ধ থাকে।

কাট হুইল স্যুইং—যেখানে বোলারের হাত থেকেই অর্থাৎ ডেলিভারির পর থেকেই বল স্যুইং করতে থাকে সেখানে ব্যাটসম্যান অনেকক্ষণ বল দেখতে পায়, ফলে তার পক্ষে খেলা কোন অসুবিধার হয় না। এ ধরনের বলকে কাট-হুইল-স্যুইং বলে।

কর্ক-স্ক্রু বল : আউট-স্যুইং বোলার সাধারণত অফ-ব্রেক করাতে পারেন আর ইন-স্যুইং বোলার লেগ ব্রেক। যে ক্ষেত্রে বল স্যুইং করবার পর ব্রেকড করে সেটা হল কর্ক-স্ক্রু বল অবশ্য কর্ক-স্ক্রু দেওয়া সহজসাধ্য নয়, এবং এ জিনিস ঘটে বোলারের অজান্তেই। আউট-স্যুইং হয়ে অফ ব্রেক কিংবা ইন-স্যুইং হয়ে লেগ-ব্রেক হলে বিপদ থাকে।

উদীয়মান ফাস্ট বোলারের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো দৌড়নোর পরিধি ঠিক করা, অর্থাৎ বল ছাড়ার আগে কতটা দৌড়তে হবে তা স্থির করে নেওয়া। ট্রুম্যান বলেন, 'এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত—মানে, বোলারের নিজস্ব ব্যাপার'। ট্রুম্যান নিজে অবশ্য অনেকখানি দৌড়তেন বল দেবার আগে। এলোমেলো দৌড়নো চলবে না—দৌড় হবে ছন্দায়িত, ঢিলেঢালা ভঙ্গিতে। শেষ ক'গজে মোটামুটি প্রস্তুতি হয়ে যাচ্ছে। একটা লাফ অথবা বড় করে পা ফেলা চলতে পারে (লিণ্ডওয়াল বা ট্রুম্যানের মতো)।

বোলারের দুটো হাতই সমান গুরুত্বের। ডান হাত যতটা সম্ভব উঁচুতে রাখতে হবে। হাত যত উঁচুতে উঠবে বল তত লাফাবে আর ব্যাটসম্যানের পক্ষে ততই দুরূহ হবে খেলার। এর একমাত্র ব্যতিক্রম লিণ্ডওয়াল। যে কোনো দলের ঝটিকা আক্রমণকারী তার ফাস্ট বোলার। এবং এখনো সেরকম ব্যাটধারী কমই আছেন যিনি ফাস্ট বোলারের বলে খেলতে ভালবাসেন! ফাস্ট বোলারের প্রধান কাজ হলো যতটা সম্ভব কম সময়ে বেশিসংখ্যক ব্যাটসম্যানকে বসিয়ে দেওয়া।

বোলারের প্রধান হাতিয়ার 'লাফানো' (bouncer) বল। আজকালকার পিচ যেহেতু অনেকটাই ব্যাটসম্যানদের অনুকূলে তাদের চমকাবার উপায় গোড়া থেকে কিছু বাউনসার ছেড়ে দেওয়া। তবে ক্রমাগত এ ধরনের বল দেওয়া নিশ্চয়ই সুস্থতার পরিচায়ক নয়, এবং যে-কোনো আম্পায়ারের কাছেই তা নিন্দনীয়। তিনি এমতাবস্থায় বোলারকে সতর্ক করে দিতে পারেন। সরিয়ে দিতেও বলতে পারেন।

এর পরের অস্ত্র ইয়র্কার। এর দ্রুততা অবিশ্বাস্য। ব্যাটসম্যান যদি এ বল হাফ ভলি বলে ভুল করেন এবং ড্রাইভ করেন তাহলে বুঝতেই পারছেন। ইয়র্কার বল যদি খেলতে অসুবিধে হয়, তাহলে এ বল দেওয়া তো যথেষ্ট অস্বস্তিকর বোলারের কাছে। সামান্য কম শর্ট হলেই হাফ-ভলি হবে, আর এর মানে চার চারটে রান। ওভার পিচ হলে ফুল টস।

মিডিয়ম-পেস বোলিং :

যদি কোনো বোলারকে দিয়ে ওভাবের পর ওভার বল করাতে চান তাহলে মিডিয়ম পেস-এর বোলার তৈরি করুন। এরাও এক অর্থে ফাস্ট বোলার, তাদের বলও স্যুয়িং করে (swinger) আসছে। কিন্তু যেখানে ফাস্ট বোলাররা ছোটার (pace) ওপর নির্ভর করছে, নির্ভর করছে ঝটিতি উইকেটের ওপর, মিডিয়ম পেস-এর বোলারদের নির্ভর করতে হবে লেংথের ওপর, হাত হবে নির্ভুল। এদের একমাত্র কাজ হবে ব্যাটসম্যানদের বিরক্ত করা, উত্যক্ত কথাটা বোধহয় বেশি অর্থবহ। প্রতিটি বলই হতে হবে নির্ভুল-মাপা। এটা প্রমাণ করতে একটা নামই করতে হয়—অ্যালেক বেডসার।

মিডিয়ম পেস-এর বোলারকে শুধু বল স্যুইং করলেই হবে না, কাটতেও (cut) হবে বল।

অফ-স্পিন বল :

যদি কোনো ধরনের বল করার যথেষ্ট সুযোগ থাকে তা হচ্ছে অফ-স্পিন বল করার সুযোগ। এ ধরনের বল করার সুবিধে বেশি বলেই বোধহয় মারাত্মকভাবে ফলোৎপাদক। আগেই বলেছি এই বলে জিম লেকার ম্যানচেস্টার টেস্ট-এ উনিশটি উইকেট নিয়েছিলেন। আবার এমন বলও আছে যা আপাতদৃষ্টিতে অফ স্পিনার মনে হলেও, শেষ পর্যন্ত স্কোয়ার লেগ-এর দেখা দেয়। ব্যাটসম্যান সেই বল যদি স্পিন ভেবে খেলেন, তাহলে ক্রিজ ছাড়তে হবে তাঁকে অচিরাৎ।

টম গ্রেভনির অভিযোগ : বাষট্টি সালে এ ধরনের বলের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে বারবার। এসেকসের উইকেট সাধারণত সুশ্যামল, ঘাসে ভর্তি—ফলে স্পিনারদের চেয়ে ফাস্ট বোলারদের কাছে বেশি প্রিয়।

মজার কথা এই যে লেকার প্রকৃতিপুষ্ট বোলার। যেহেতু লণ্ডনে ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হতো তাঁকে, অনুশীলনের ব্যাপারটা অত্যন্ত অনিয়মিত তাঁর কাছে। এসেকসের হয়ে নিয়মিত খেলতে কখনোই দেখা যায়নি লেকারকে।

স্লো হ্যাণ্ড বোলিং (ন্যাটা) :

এ ধরনের বোলারের সংখ্যা সীমিত। অফ-স্পিনারের জায়গায় বল দেওয়া হলেও লেগ স্টাম্পে বল স্পিন না করে অফ-এ স্পিন করবে। তফাত এখানে

ব্যাট থেকে বলের দূরত্ব যত বেশি সেই বল খেলা তত কঠিন কাজেই এ ধরনের বোলারের বল খেলা যথেষ্ট বেগের ব্যাপার।

ইদানীং কালে স্লো ন্যাটা বোলারের অভাব বড্ড বেশি। ইয়র্কশায়ার কিন্তু বছরের পর বছর এই জাতের বোলার তৈরি করছে—রোডস্, ভেরিটি, কিলনার কজনার নাম বলব! ওরস্টারের জন দুই ছিলেন, নরম্যান গিফোর্ড আর ডাউন প্লেভ। কিন্তু ইয়র্কশায়ারের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ডন উইলসন।

ট্রুম্যানের মতে শ্রেষ্ঠ স্লো ন্যাটা জনি ওয়ার্ডল। বল করার ভঙ্গি মনোরম। ওয়ার্ডল যে কোনো দলের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খেলোয়াড়, ভাল ব্যাট আর ফিল্ডিংও অসাধারণ ভদ্রলোকের। আজকাল অবশ্য সব দলই খেলোয়াড়-দের অল-রাউণ্ডার, অর্থাৎ ক্রিকেটের সমস্ত দিকেই রপ্ত করার চেষ্টা করেন। ফলে যিনি ব্যাটসম্যান, গুটিকয়েক রান করেই তাঁর কর্তব্য শেষ হয় না।

রিস্ট স্পিন (wrist spin) :

এই কায়দার বোলাররাই দলকে জয়ী করে। আক্রমণাত্মক বল করায় যত রকমের বিপজ্জনক রীতি আছে ক্রিকেটে, এরাই সম্ভবত সবাইকে টেক্কা দেবে। রিচি বেনোর খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এর সত্যতা স্বীকার করবেন। যদি খেলার মীমাংসা করার ইচ্ছে না থাকে তাহলে বেনোকে দরকার নেই সে দলের, জিতবার প্রশ্নে তিনি অপরিহার্য। এ-বোলিংয়ের আর এক নাম লেগ স্পিন। শুধু আঙুলের সাহায্যেও করা যায় বল, কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত বলের পূর্ণ বেগ থাকে না। এরিক হার্লস (ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে খেলতেন) কাউন্টি ক্রিকেটের সার্থকতম লেগ স্পিনার হিসেবে গণ্য হয়ে থাকবেন। গুগ্‌লিও (googlie) এই পর্যায়ে পড়ে। গুগলি করার ব্যাপারটাও দীর্ঘ অনুশীলন-সাপেক্ষ। ফলও পাওয়া যাবে।

ফাস্ট বোলারদের মতোই লেগ-স্পিনার বা গুগলি বোলারদের বেশি সময় বল করতে দেওয়া উচিত নয়, তাতে তাদের আকস্মিক আক্রমণের (shock) তীব্রতা হ্রাস পায়। অনেক সময় দেখা গেছে গুগ্‌লি বল করতে করতে বোলার তাঁর অন্যভাবে বল করার ক্ষমতা (বিশেষ লেগ-ব্রেক) হারিয়েছেন।

একথা মনে রাখা দরকার, বল করেন অনেকেই, কিন্তু স্মরণীয় হন কজন?

বোলিং সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় গেলে বলতে হয়, ব্যাটিংয়ের ব্যাপারে যেমন স্টাইলের আধিক্য আছে, বোলিংয়ে আছে অ্যাকশন। কিন্তু

দুই ক্ষেত্রেই প্রাথমিক ব্যাপারগুলো সার্থকতার মাপকাঠি। কিছু-সংখ্যক বোলার অবশ্য প্রাথমিক ব্যাপারগুলো তেমন মানেন না। তবু নিচে উল্লেখিত নীতিগুলোই ভাল বোলিংয়ের প্রাথমিক শর্ত বলে ধরা উচিত :

(১) সঠিক ধরা (grip),

(২) মসৃণ আর প্রয়োজনমতো দৌড় (run up),

(৩) সোজা, ছন্দোময় ও সুসংবদ্ধ (well balanced) ছোঁড়া (delivery)।

গ্রিপ (grip) :

গ্রিপ নানা ধরনের এবং বোলার কি ধরনের বল দিচ্ছেন তার ওপর তা নির্ভর করছে। তবু, যে ধরনের বলই দিন না কেন বোলার, একটা কথা মনে রাখতে হবে—বল আঙুলের ফাঁকে ধরা থাকবে, হাতের তালু বা তেলোয় না।

রান-আপ (run-up) :

বল দেবার আগে বোলারকে খানিকটা দৌড়ে আসতে হয় ক্রিজে—এটা তার শারীরিক সাম্য বজায় রাখতে এবং গতি আনতে সাহায্য করে। কোনোরকম লাফালাফি করে বা পদক্ষেপ না পালটে দৌড়নোই শ্রেয়।

বোলার দৌড় শুরু করবেন ধীর গতিতে। দু-এক পা হেঁটে—পরে ক্রমে গতি বাড়াবেন। শেষ পর্যায়ে বেগ বাড়িয়ে দিতে হবে। অধিকাংশ বোলার বাঁ পা আগে বাড়িয়ে দৌড় শুরু করার পক্ষপাতী। শরীরের পেশীগুলো যথাসম্ভব ঢিলে থাকবে, মাথা থাকবে স্থির। দৌড়ের মধ্যেই বোলারকে মনে মনে ঠিক করতে হবে বল কোথায় ফেলবেন (pitch) তিনি। এজন্যে সেই নির্দিষ্ট জায়গাটির প্রতি তাঁর মন আর চোখ দুই-ই ধরা থাকবে।

বল ছোঁড়া (delivery) :

মোটামুটি চারটি প্রধান (key) অবস্থার মধ্যে দিয়ে একজন বোলারকে ছুটে আসতে হয়। বস্তুত, প্রথম দুটি পর্যায় শারীরিক মোচড় (winding) বা শরীর কিভাবে বেঁকাবেন বোলার, পরবর্তী দুটি স্তরে এর উল্টো ক্রিয়া—অর্থাৎ বলটা ছোঁড়া হবার মুহূর্ত। কোনো বোলার হয়তো প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় পর্যায়ের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ালেন, আর চতুর্থ পর্য্যায় ছেঁটে দিলেন। সবটাই বোলারের দায়িত্ব।

এখন বোলারের যে কাজের ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তা হচ্ছে ডান হাতে বল করা মিডিয়ম পেস-এর বোলারের।

দৌড়নোর শেষ পদক্ষেপকে (ছোঁড়ার পূর্ব মুহূর্তে) মোটামুটি বাঁ পায়ের একটা ছোট্ট লাফও বলা যায়। বোলারের ডান পা ও শরীরের অংশবিশেষ ডানদিকে ঘুরে যায়। ডান হাত মুখের কাছাকাছি উঠে আসে, বাঁ হাতও উর্ধ্বমুখী—এটাই আসলে শারীরিক মোচড়ের প্রাথমিক পর্যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে বোলারের ডান পা ক্রিজের ঠিক পেছনেই সমান্তরাল অবস্থায় পড়ছে। শরীরটাকে এমনভাবে পাশে ঘোরানো হয়েছে যাতে বোলারের বাঁ কাঁধ ব্যাটসম্যানের দিকে ফেরানো। বাঁ বাহু, যদিও ততটা শক্ত (rigid) নয়—ওপরদিকে প্রসারিত। বোলার এর পেছন থেকে পুরো পিচে চোখ রাখছেন। শরীরের ভার ডান পায়ের ওপর, এবং শরীর ব্যাটসম্যানের দিক থেকে সামান্য সরে আছে—পেছন দিকটা একটু বাঁকানো, ডান হাত বল ছুঁড়তে চলেছে। এই পর্যায়ে কোনো ত্রুটি ঘটে গেলে পরে কখনোই তার ক্ষতিপূরণ হয় না।

দৌড়নোর দূরত্ব (length of stride) নির্ভর করে বোলারের শারীরিক গঠনের ওপর অর্থাৎ ছোঁড়ার উপযোগী দৃঢ় অথচ পর্যাপ্ত অক্ষ (axis) তৈরি করা। অল্প দৌড়ে বোলার তাঁর শরীরটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেন না। অপরদিকে অনেক বেশি দৌড়ে উচ্চতা ও ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে বল দেবার মুহূর্তে। দৌড়ের পুরো সময়টাতেই মাথা যতটা সম্ভব অনড় (still) রাখা দরকার।

এবার বল দেওয়ার মুহূর্ত। শরীরের সমস্ত ওজন এখন পুরোপুরি বাঁ পায়ের ওপর, কাঁধ ও উরুদেশ আধ-ঘোরা; ডান বাহু সোজা, মাথার অনেক ওপরে।

বল তো দেওয়া হলো। বোলারের ডান কাঁধ এখন ব্যাটসম্যানের দিকে সোজা ফেরানো। শরীর ঝুঁকছে সামনে, বাঁ পায়ের ওপর দিয়ে ওজন চলে গেছে। ডান পা এবার বাড়ানোর অপেক্ষায়, অর্থাৎ হাঁটুর কাছটায় সামান্য বাঁকাতে হবে, নইলে বিক্ষিপ্ত হতে পারে তার আন্দোলন। মাথা কোনোদিকে হেলবে না। এবং চোখ থাকবে পিচ-এ।

শেষ পদক্ষেপগুলোতে সতর্ক হতে হবে বোলারকে, হঠাৎ দৌড় শেষ করাতে ছন্দহানি হবে যেমন, আবার পিচ-এ চলে আসাটাও বিপদের। এ অভ্যেস গোড়া থেকেই করা দরকার, না হলে পরে শোধরানো অসুবিধে হয়।

সোয়ার্ভ (swerve):

যদিও ক্রিকেটে স্পিন-এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব সোয়ার্ভ-এর, এবং প্রায় সব

ধরনের বোলাররা ; তা তিনি ফাস্ট, মিডিয়ম বা স্লো হন বল সোয়ার্ভ করতে পারেন। বস্তুত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা সোয়ার্ভ না করে পারেন না। কিন্তু কোচ এটা শিক্ষার্থীদের অবশ্যই জানাবেন, যে শুধুমাত্র বলটাকে 'হাওয়ায় খানিক ভাসিয়ে' দিলেই সোয়ার্ভ করা হল না, যদি না তা নির্ভুল লেংথের দিক দিয়ে হয়। অনেক বোলার শুধু এই বল দেওয়ার রীতিকে মূলধন করে বসে থাকেন, কিন্তু তাদের অন্য পন্থার আশ্রয় নেওয়ার জন্যেও তৈরি থাকা দরকার। ক্রিকেটে বল কেন সোয়ার্ভ করে সেজন্যে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় না গেলেও চলে। তার কতকগুলো অবস্থা নিঃসন্দেহে এর অনুকূলে কাজ করে, যেমন :

(১) ভারী আবহাওয়া,

(২) সঠিক দিক থেকে হাওয়া,

(৩) অপেক্ষাকৃত নতুন বল, অথবা সেলাইয়ের রেখা স্পষ্ট থাকা অবস্থায়।

এই রেখা স্পষ্ট রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে বোলার, কিন্তু ফিল্ডারদেরও সহযোগিতা দরকার। সোয়ার্ভ দু রকমের—ইন্ আর আউট সোয়ার্ভ। এবং এটা মোটামুটি গ্রাহ্য হয়েছে যে আউট-এর চেয়ে ইন-এ বল করা সহজ, কারণ পরের ক্রিয়ায় শরীরের পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হয়। গ্রিপ বা বল ধরার ব্যাপারেও বোলার তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে চলবেন, অর্থাৎ কিভাবে বল ধরলে সবচেয়ে সুবিধে হয় তাঁর, এটা তাঁকেই দেখতে হবে। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে তাঁকে এই অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হচ্ছে :

(এক) বলের রেখা ফাস্ট স্লিপ-এর দিকে ফেরানো থাকছে ;

(দুই) প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুল দুটো বলের ওপরে থাকবে—রেখার দুই দিকে বলা যায়। বুড়ো আঙুল ঠিক থাকবে নিচে।

তরুণ বোলারদের কোনো এক-ধরনের সোয়ার্ভ এর ওপর নির্ভরশীল হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এবং সেই অনুযায়ীই সাজাবেন তাঁর ফিল্ড, আর অন্য সোয়ার্ভের ওপর একেবারে নির্ভর না করতে পারলেই ভাল।

ফাস্ট বোলিং (fast bowling)

তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে জোরে বল দেবার প্রবণতা দেখা যায়—বল 'উড়ে' চলেছে দেখতে প্রবল উত্তেজনার শিকার হয় তারা। কিন্তু বড় খেলায় অংশ নেবার সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণদের স্বপ্ন ভেঙে যায়। যে কোনো দক্ষ ব্যাটসম্যানের

কাছে ফাস্ট বল অত্যন্ত প্রিয় যদি সে বল লেংথে নির্ভুল না হয়, গতিহীন হয়। যদি কোনো তরুণকে জীবনে ফাস্ট বোলার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়, তাহলে কোচকে তার বয়স আর শারীরিক যোগ্যতানুযায়ী বল করার কথা ভাবতে হবে। কারণ, এই বোলিংয়ে পায়ের জোর লাগে, লাগে শিরদাঁড়া ও নিতম্বের জোর। লাগে মেজাজ।

কোনো তরুণ বোলারেরই যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়া দ্রুত বল দেবার চেষ্টা করা উচিত নয়, সে পেস-এই হোক, সময়ের ব্যবধানেই হোক—যথেষ্ট শক্তি ও মনের জোর সংগ্রহ করেই নামা উচিত তার এই কাজে। কোনো একজন বোলারকে দীর্ঘ সময় ধরে বল করতে দেওয়া উচিত নয়—পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ছে মনে হলেই তাকে সরিয়ে আনতে হবে। এটা খেলাতেই নয়, অনুশীলনেও প্রযোজ্য।

প্রত্যেক ফাস্ট বোলারই তাঁর পায়ের ওপর নজর রাখবে, কাটাকুটি বা ক্ষত থাকলে বল করার অসুবিধে হয়; মোটা মোজা পরা উচিত এক্ষেত্রে। অনেকে ডবল মোজাও পরে থাকেন।

অ্যাকশন (action):

সত্যিকার পেস-এ কিন্তু সময় আর ছন্দের সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। শরীরের সমস্ত অঙ্গের কাজ হবে—এটা দেখবেন কোচ। বল দেবার আগে অনেকটা দৌড়নো দরকার। সোজা বল করা দরকার যাতে ব্যাটসম্যান বলটা খেলতে পারেন, এবং এইজন্যে তার সব সময়েই ডীপ ফাইন লেগ থাকা দরকার। ফাস্ট বোলিংয়ে যথেষ্ট পরিমাণ সাধারণ ও পেশীর উপযুক্ততা (fitness) থাকা দরকার। চাই নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর পরিশ্রম। ভালোমন্দ বোঝবার ক্ষমতা নিজেরই থাকা দরকার তার।

মিডিয়ম পেস (medium pace)

সব ধরনের ক্রিকেটেই মিডিয়ম পেস বোলাররাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এবং এটা অপরিহার্য শর্ত, যে এই পেস-এর বোলারকে যে কোনো উইকেটে খেলানো যায়। অনুকূল অবস্থায় এই বোলাররা মারাত্মক হতে পারেন। যদি পেস আর মেজাজ ফাস্ট বোলারদের সত্যিকারের বৈশিষ্ট্য হয়, স্লো বোলারদের ক্ষেত্রে স্পিন আর ধূর্ততা—তাহলে শুধু এই যথার্থই মিডিয়াম পেস বোলারকে সবার ওপরে দরকার। বোলার শুধু তার শরীরকেই নিয়ন্ত্রিত করবেন না, মনকেও বশে আনতে হবে বল লেংথে পাঠাতে সঠিক লক্ষ্যে। কিন্তু এই নির্ভুল

মাপের বল দেওয়ার ব্যাপারটা খারাপ উইকেটে অদক্ষ ব্যাটসম্যানদের পক্ষে কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু ভালো উইকেটে ঝানু ব্যাটসম্যানদের কাছে তেমন সুবিধে নাও হতে পারে। লেংথে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টায় ব্রতী হতে হবে তাকে, স্পিন আর সোয়ার্ভ-এর আবরণে সেই বৈশিষ্ট্য ঢেকে বল করতে হবে। কিন্তু লেগ ব্রেক-এর বল দেওয়ার প্রবণতা থাকা উচিত নয় তার, যদি দেয়ও তাহলে সেগুলো নিঃসন্দেহেই অত্যন্ত দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক, ফলে তার অ্যাকশনের ছন্দ আর সময় হারিয়ে যেতে পারে। আঙুলের 'কাট' (cut)-এ কিছু বোলার লেংথ থেকে বল অন্য অবস্থায় আনতে পারেন হয়তো, কিন্তু এটা উন্নত ও শক্ত রীতি বলে স্বীকৃত। অন্যদিকে যদি তার অ্যাকশন সত্যিই ভাল হয় তো এটা তাকে অফ থেকে বল স্পিন করতে সাহায্য করবে।

পেস পালটে ব্যাটসম্যানকে ধোঁকা দেওয়ার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা পিচ-এর অবস্থার ওপরে অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই পেস পাল্টানোর উদ্দেশ্য ব্যাটসম্যানকে বলে ভুল মার দেওয়ানো, অথবা সঠিক মারের সময়ের হের-ফের করা।

গোড়া থেকেই ব্যাটসম্যানের মেজাজ, খেলার কায়দাকানুন মাথায় নিতে হবে বোলারকে—তার গ্রিপ, স্টানস, তার শারীরিক গঠন। লম্বা চেহারার ব্যাট হয়তো ড্রাইভের পথ খুঁজছেন, বা অল্প উচ্চতার ব্যাটসম্যান হয়তো ব্যাক-প্লের পক্ষপাতী হুক বা কাট-এর ফিকির খুঁজছেন।

পিচ-এর অবস্থাও নিশ্চয়ই প্রভাবিত করবে পেস বোলারকে। হয়তো এ ধারণা তাঁর হতে পারে যে মাঠের অবস্থা তাঁকে কোনোভাবেই সাহায্য করবে না।

পিচ আর ব্যাটসম্যানের ক্রীড়াকৌশলই বোলারকে খেলাবে অর্থাৎ কী মাঠে কাকে বল করছে এটা মাথায় নিয়ে নিতে হবে মিডিয়ম পেস-এর বোলারকে। কিন্তু একটা কথা সবসময়েই মনে রাখতে হবে তাকে, উইকেট যতই খেলার পক্ষে প্রতিকূল হবে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ তত কমে যাচ্ছে বোলারের। সেক্ষেত্রে তার লেংথ, স্পিন প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল হতে হবে।

কোনো কোনো সময়ে হয়তো তাকে খেলার অবস্থা বুঝে অধিনায়কের নির্দেশে রক্ষণাত্মক খেলা খেলতে হতে পারে এবং সেই সময়েই আসে গতি নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, লেংথেরও। প্রথম সারির ক্রিকেটে আজ বোলাররা রক্ষণাত্মক বোলিংয়ের দিকেই ঝুঁকছেন, অথবা লেগ স্টাম্পের কাছাকাছি খেলবার। কিন্তু

এতেও যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন আছে, এবং এ ক্ষেত্রেও তরুণ বোলারদের অফ স্টাম্পের ওপরই নজর দেওয়াই শ্রেয়।

স্পিন বোলিং (spin bowling)

স্পিন না বলে স্লো বোলিং বললে বোধহয় ভাল হয়। কারণ অধিকাংশ স্লো পেস বোলারই স্পিনকে তাঁদের আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার বলেই মনে করেন। তাঁদের অবশ্য ব্যাটসম্যানকে ফাঁকি দিতে গেলে 'হাওয়ার' সাহায্য নিতে হবে, অর্থাৎ বল যখন শূন্যে তখনই কাজ স্পিন-এর কাছে কৃতজ্ঞ। কোনো উঠতি বোলার যদি মনস্থির করে সে স্পিন বোলার হবে, তাহলে সে ওই অবস্থায় না যাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না।

বলকে যদি সত্যিই স্পিন করাতে হয়, তাহলে আঙুল আর কবজির কাজই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীদের প্রথম থেকেই এর অনুশীলন চালানো দরকার। সেই সঙ্গে তাকে ঠিক করে নিতে হবে সে অফ-স্পিনার হবে না লেগ-স্পিনার হবে। দুটোর একত্রীকরণ বিবেচনার কাজ হবে না, কারণ যদি সত্যিই তাকে স্পিনার হতে হয় তো দুরকম ব্রেক দেওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। বাছাই করার সময়ে তাকে বুঝতে হবে—লেগ ব্রেক-এর চেয়ে অফ-ব্রেক স্বাভাবিক, কম আয়াসে বল করা যায়, সেই সঙ্গে লেংথ ও গতির সামঞ্জস্য আনা যায়। অন্যদিকে অফ স্পিনার কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিজের অজ্ঞাতেই মিডিয়ম পেস-এ চলে যান, ফাস্ট বোলার হিসেবেও খ্যাতিমান হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যেটা লেগ স্পিন বোলারের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধের কারণ।

অফ-স্পিন বোলিংয়ে যদি নিরাপত্তার আশ্বাস মেলে, লেগ-স্পিন-এ আছে বড় পুরস্কারের হাতছানি। যদিও নির্ভুল বল দেওয়া প্রায় অসম্ভব, তবুও এর কাজ অত্যন্ত মারাত্মক ও অধিকাংশ ব্যাটসম্যানই এর শিকার হন। স্কুল ক্রিকেটে লেগ-স্পিনার, তা সে যে স্তরের খেলোয়াড়ই হোক না কেন, মর্যাদার আসন দখল করে থাকে। স্কুলের অল্পই ব্যাটসম্যান প্রত্যয়ের সঙ্গে এ বল খেলে।

একথা ক্রিকেটের আইনে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে বোলারকে লেংথে বল করা শিখতে হবে, স্পিন বা সোয়ার্ভ করার অনুশীলনের আগে। তবে ক্রিকেটের জনাকয়েক বড় তাত্ত্বিক বলেন, যে তরুণ লেক-ব্রেক করবে বলে মনস্থির করেছে, তার উচিত প্রথমেই স্পিন করার ওপর জোর দেওয়া। আর, পরে লেংথ

নিয়ন্ত্রণের অভ্যেস করা। এর অনুকূলে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে—সত্যিকারের ভাল স্পিনার হতে গেলে প্রাথমিক বোলিংয়ে কিছু কিছু আপোসের ব্যাপার থাকা দরকার, যেটা পরবর্তী সময়ে করার অসুবিধে ঘটবে। দুনিয়ার অধিকাংশ স্পিন বোলাররাই স্বীকার করেছেন, বড় খেলায় স্পিন করার আগে এই পদ্ধতিতে বলের অনুশীলন দীর্ঘসময় ধরে করেছেন তাঁরা।

টপ-স্পিন : গুগলি (Top Spin : Googly)

লেগ-ব্রেক-এর উন্নতাবস্থা এবং প্রতিপূরক বলা যায় টপ-স্পিন বা গুগলিকে। এই দুই রকমের বলই নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত—বিশেষ করে গুগলি। কারণ এতে কাঁধ ও বাহুর পেশীর ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ে।

তরুণ শিক্ষার্থীদের এই বল বেশি দেওয়া থেকে নিরস্ত করা দরকার। কেউ বেশি করে গুগলি দেওয়ার পর একদিন আবিষ্কার করবে সে এতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, এবং লেগ-ব্রেক স্পিন করার অভ্যেস হারিয়েছে। ফল, যে-বল খেলা সহজতর ছিল, চমক ছিল যে-বলে, সে আর কখনোই সে-বল দিতে পারবে না।

অ্যাকশন :

অন্য সব ধরনের বোলারের মতই বল দেওয়ার আগে লেগ ব্রেক বোলারের সেই ছন্দোময়, নিয়মিত দৌড় দরকার। উইকেটের ওপরে বল করবে সে কারণ যদি পাশে (round) বল দেয়, তাহলে বল স্টাম্প পাবে না, ফলে লেগ-প কোনো বল পিচ করলেও এল-বি-ডব্লিউ পাবে না সে। শুধু তাই নয়, উইকেটের ওপর দিয়ে বল করার পরিবর্তে পাশ থেকে লেগেই বল করার সম্ভাবনা বেশি তার।

গ্রিপ ও কবজি (Grip and wrist) :

প্রথম তিনটি আঙুলে বেশ স্বচ্ছন্দে ধরা থাকবে বল, প্রথম দুই আঙুল রেখার (সেলাই) ওপর দিয়ে, ওপরের অংশ বলটার বেশির ভাগ নিচ্ছে, বাকি দুই আঙুল এদের তলায় এমন ভাবে গুটিয়ে রাখা থাকছে যাতে অনামিকার ওপরের অংশ চাপ সৃষ্টি করবে—স্পিনে এই আঙুলই কিন্তু আক্রমণের প্রধান উৎস। বুড়ো আঙুল স্বাভাবিকভাবে থাকবে।

বল ছাড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত কবজি কিন্তু বাঁকানোই থাকছে এবং হাত পুরো ঘুরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের চেটো বা তালু ব্যাটসম্যানের মুখোমুখি

এতেও যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন আছে, এবং এ ক্ষেত্রেও তরুণ বোলারদের অফ স্টাম্পের ওপরই নজর দেওয়াই শ্রেয়।

স্পিন বোলিং (spin bowling)

স্পিন না বলে স্লো বোলিং বললে বোধহয় ভাল হয়। কারণ অধিকাংশ স্লো পেস বোলারই স্পিনকে তাঁদের আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার বলেই মনে করেন। তাঁদের অবশ্য ব্যাটসম্যানকে ফাঁকি দিতে গেলে 'হাওয়ার' সাহায্য নিতে হবে, অর্থাৎ বল যখন শূন্যে তখনই কাজ স্পিন-এর কাছে কৃতজ্ঞ। কোনো উঠতি বোলার যদি মনস্থির করে সে স্পিন বোলার হবে, তাহলে সে ওই অবস্থায় না যাওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না।

বলকে যদি সত্যিই স্পিন করাতে হয়, তাহলে আঙুল আর কবজির কাজই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীদের প্রথম থেকেই এর অনুশীলন চালানো দরকার। সেই সঙ্গে তাকে ঠিক করে নিতে হবে সে অফ-স্পিনার হবে না লেগ-স্পিনার হবে। দুটোর একত্রীকরণ বিবেচনার কাজ হবে না, কারণ যদি সত্যিই তাকে স্পিনার হতে হয় তো দুরকম ব্রেক দেওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। বাছাই করার সময়ে তাকে বুঝতে হবে—লেগ ব্রেক-এর চেয়ে অফ-ব্রেক স্বাভাবিক, কম আয়াসে বল করা যায়, সেই সঙ্গে লেংথ ও গতির সামঞ্জস্য আনা যায়। অন্যদিকে অফ স্পিনার কিন্তু পরবর্তী সময়ে নিজের অজ্ঞাতেই মিডিয়ম পেস-এ চলে যান, ফাস্ট বোলার হিসেবেও খ্যাতিমান হওয়া অস্বাভাবিক নয়, যেটা লেগ স্পিন বোলারের পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধের কারণ।

অফ-স্পিন বোলিংয়ে যদি নিরাপত্তার আশ্বাস মেলে, লেগ-স্পিন-এ আছে বড় পুরস্কারের হাতছানি। যদিও নির্ভুল বল দেওয়া প্রায় অসম্ভব, তবুও এর কাজ অত্যন্ত মারাত্মক ও অধিকাংশ ব্যাটসম্যানই এর শিকার হন। স্কুল ক্রিকেটে লেগ-স্পিনার, তা সে যে স্তরের খেলোয়াড়ই হোক না কেন, মর্যাদার আসন দখল করে থাকে। স্কুলের অল্পই ব্যাটসম্যান প্রত্যয়ের সঙ্গে এ বল খেলে।

একথা ক্রিকেটের আইনে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ যে বোলারকে লেংথে বল করা শিখতে হবে, স্পিন বা সোয়ার্ভ করার অনুশীলনের আগে। তবে ক্রিকেটের জনাকয়েক বড় তাত্ত্বিক বলেন, যে তরুণ লেক-ব্রেক করবে বলে মনস্থির করেছে, তার উচিত প্রথমেই স্পিন করার ওপর জোর দেওয়া। আর, পরে লেংথ

নিয়ন্ত্রণের অভ্যেস করা। এর অনুকূলে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে—সত্যিকারের ভাল স্পিনার হতে গেলে প্রাথমিক বোলিংয়ে কিছু কিছু আপোসের ব্যাপার থাকা দরকার, যেটা পরবর্তী সময়ে করার অসুবিধে ঘটবে। দুনিয়ার অধিকাংশ স্পিন বোলাররাই স্বীকার করেছেন, বড় খেলায় স্পিন করার আগে এই পদ্ধতিতে বলের অনুশীলন দীর্ঘসময় ধরে করেছেন তাঁরা।

টপ-স্পিন : গুগলি (Top Spin : Googly)

লেগ-ব্রেক-এর উন্নতাবস্থা এবং প্রতিপূরক বলা যায় টপ-স্পিন বা গুগলিকে। এই দুই রকমের বলই নিয়ন্ত্রণ করা শক্ত—বিশেষ করে গুগলি। কারণ এতে কাঁধ ও বাহুর পেশীর ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ে।

তরুণ শিক্ষার্থীদের এই বল বেশি দেওয়া থেকে নিরস্ত করা দরকার। কেউ বেশি করে গুগলি দেওয়ার পর একদিন আবিষ্কার করবে সে এতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, এবং লেগ-ব্রেক স্পিন করার অভ্যেস হারিয়েছে। ফল, যে-বল খেলা সহজতর ছিল, চমক ছিল যে-বলে, সে আর কখনোই সে-বল দিতে পারবে না।

অ্যাকশন :

অন্য সব ধরনের বোলারের মতই বল দেওয়ার আগে লেগ ব্রেক বোলারের সেই ছন্দোময়, নিয়মিত দৌড় দরকার। উইকেটের ওপরে বল করবে সে কারণ যদি পাশে (round) বল দেয়, তাহলে বল স্টাম্প পাবে না, ফলে লেগ-স্টাম্পে কোনো বল পিচ করলেও এল-বি-ডব্লিউ পাবে না সে। শুধু তাই নয়, উইকেটের ওপর দিয়ে বল করার পরিবর্তে পাশ থেকে লেগেই বল করার সম্ভাবনা বেশি তার।

গ্রিপ ও কবজি (Grip and wrist) :

প্রথম তিনটি আঙুলে বেশ স্বচ্ছন্দে ধরা থাকবে বল, প্রথম দুই আঙুল রেখার (সেলাই) ওপর দিয়ে, ওপরের অংশ বলটার বেশির ভাগ নিচ্ছে, বাকি দুই আঙুল এদের তলায় এমন ভাবে গুটিয়ে রাখা থাকছে যাতে অনামিকার ওপরের অংশ চাপ সৃষ্টি করবে—স্পিনে এই আঙুলই কিন্তু আক্রমণের প্রধান উৎস। বুড়ো আঙুল স্বাভাবিকভাবে থাকবে।

বল ছাড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত কবজি কিন্তু বাঁকানোই থাকছে এবং হাত পুরো ঘুরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাতের চেটো বা তালু ব্যাটসম্যানের মুখোমুখি

থাকবে অথবা ফাইন লেগ-এর দিকে, সম্ভবত। বল ছাড়া মাত্রই অনামিকা চট করে বেরিয়ে আসবে বাইরে—ব্যাটসম্যানের দিকেই নির্দিষ্ট, বুড়ো আঙুল নিম্নমুখী, ব্যাটসম্যানের থেকে দূরে—একই সময়ে, কবজিও সামনে এগিয়ে আসছে, হাত ও বুড়ো আঙুল শরীর ছাড়িয়ে খুলছে—সোজা উইকেট-এর দিকে মুখ।

টপ-স্পিনার (Top spinner) :

লেগ-ব্রেক-এর মতই ধরার কায়দা, কিন্তু কবজির আগায় আন্দোলন একটু আগে শুরু হচ্ছে, ফলে অনামিকার সাহায্যে যে স্পিন হচ্ছে তা এবার বলের উড়ে যাওয়া বরাবর, এবং স্লিপ-এর দিকে নয়। বল ছাড়া মাত্রই হাতের তেলো বা তালু মিড-এন-এর মুখোমুখি হবে, আর শেষে তা (বাহু আর হাত) থাকবে উইকেটমুখী।

গুগ্‌লি (Googly) :

গ্রিপ বা ধরা একই থাকছে, কিন্তু কবজির কাজ আরও আগে হচ্ছে এবং তা পেছনে হেলানো বা বাঁকানো যাতে বল ছাড়ার মুহূর্তে হাতের উল্টো পিঠ ব্যাটসম্যানের দিকে ফেরানো থাকছে। বল আসছে অনামিকার এবং কনিষ্ঠ আঙুলের ওপর থেকে। বাঁ পা পড়ছে, পায়ের পাতা ব্যাটসম্যানের দিকে ধরা। সেই সঙ্গে ডান পায়ের্র সমান্তরালও, এতে বাঁ কাঁধ সামান্য সামনে ঝুঁকে আসবে।

স্পিন-বোলারের কৌশল :

খুব অল্প স্পিন বোলারেরই লেংথ আর দিক সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা আছে, যাতে তাঁদের অধিনায়কেরা রক্ষণাত্মক খেলায় তাঁদের কাজে লাগাবেন। কারণ এ ধরনের খেলায় মূলত মিডিয়ম পেস বা স্লো অফ-স্পিন বোলারই পছন্দ তাঁদের। লেগ স্পিনারের ভূমিকা হচ্ছে আক্রমণাত্মক। সোজা বল করবে সে—লেগ স্টাম্পে, সম্ভব হলে প্যাড-এর ঠিক ভেতরের দিকে।

মাঠও এর সঙ্গে সংগতি রেখেই সাজাতে হবে। ইনফিল্ডাররা কাছাকাছি থাকবেন একক রান ঠেকাতে। কারণ অন্যথায় কোনো ব্যাটসম্যানকে উপর্যুপরি বলের আক্রমণে বিপর্যস্ত করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। অন্যদিকে, ব্যাটসম্যানকে তার বল খেলার জন্যে আকৃষ্ট করতে হবে, এবং তা করার জন্যে সত্যিকারের চেষ্টা চালাতে হবে, আর এই কাজটুকু আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সমাধা করতে হবে।

'চার'-এর মার বাঁচাতে লোক রাখতে হবে দূরে। ডীপ ফিল্ডের অন্তত একজন তার ঠিক পেছনে হওয়া দরকার। আর একজন ডীপ-এ থাকতে পারে, বেশি ডীপ-এ নয় কিছুতেই, এক্সটা কভারে—ক্যাচ ধরার জন্য। ডীপ স্কোয়ার লেগেও একজন থাকতে পারে।

পিচ যত ফাস্ট আর নির্জেজাল হবে, ততই বলকে হাওয়ায় বেশি ঘোরাবার জায়গা দেওয়া চাই। ব্যাটসম্যানকে সামান্য পেস-এ ধোঁকা দিতে পারে বলের পেছনে দৌড় করিয়ে। এ পরীক্ষা রানের বিনিময়েও করতে হবে বোলারকে।

পিচ-এর অবস্থা খারাপ হলে 'বল ঠেলে' (push through) রান করতে হবে ব্যাটসম্যানকে অর্থাৎ একটু বাড়বে বলের গতি তাই ব্যাটসম্যান যাতে পেছনের পায়ে না খেলতে পারে তাও লক্ষ্য করতে হবে।

সত্যিকারের শক্ত পিচ-এ শেষ কথা হলো নির্ভুল (accurate) বল দেওয়া। লেংথ আর দিক সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগ দরকার, বাকিটুকু করবে তার স্বাভাবিক স্পিন বল আর উইকেট।

বোলার যদি গুগলি দিতে পারেন তাহলে তা নতুন ব্যাটসম্যানের ওপর প্রথম থেকেই পরীক্ষা করতে পারেন। যদি তাতে ব্যাটসম্যানকে আউট করতে না পারেন তাহলে অন্য রাস্তা খুঁজতে হবে—সেটা লেগ-ব্রেক দিয়েওহতে পারে। তবে রেখে-ঢেকেই এই বল করতে হবে। বেশি করলে উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে পারে, লেংথ নষ্ট হতে পারে।

টপ স্পিনও একইভাবে ব্যবহার করা যায়, শুধুমাত্র চমক দেবার জন্যে। যে মাঠে বল তাড়াতাড়ি ঘোরে সেইসব মাঠে এর গুরুত্ব অপরিসীম। যে ব্যাট ব্যাক-প্লের ওপর বেশি মনোযোগী তার বেলায়ও এই বল কার্যকরী। যে ব্যাট হুক-এর সন্ধানী বা লেগ-স্টাম্পে বল খেলতে চান যাঁরা তাঁদের ক্ষেত্রেও এ বল কাজ দেবে।

বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সতর্ক সজাগ হতে হবে লেগ-ব্রেকারদের। দমমনোভাবের মানুষও হবেন তিনি। ব্যাটসম্যানের সঙ্গে চলবে অনন্ত কালের বুদ্ধির লড়াই। সবসময়ে সচেষ্ট থাকতে হবে ব্যাটসম্যানের দুর্বলতা ধরার জন্যে, সেই সঙ্গে ব্যাটসম্যানের শক্তিপরীক্ষাও চলবে, হুক বা ড্রাইভ-এ।

মনে রাখতে হবে যে লেগ-স্পিনার হওয়াতে বোলার অনেক সময় ভুল-টির সম্মুখীন হতে পারেন হতে পারেন বেশি 'খরুচে'-ও (expensive)।

রূঢ়তাকে গ্রহণ করতে হবে কোমলতার সঙ্গে, আঘাত নিতে পারার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে—হাল ছেড়ে দিলে হবে না, চঞ্চল হলে চলবে না। স্মরণ রাখতে হবে যে তার বল দেওয়ার পদ্ধতি যদি দুনিয়ার সব চাইতে শক্ত ব্যাপার হয়, তবুও তা সব চাইতে আকর্ষক ও উত্তেজনাকর—পুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনাময়।

অফ-স্পিন (Off spin) :

সব ধরনের বোলারেরই কিছু অফ-স্পিন-এর অভিজ্ঞতা থাকে। যুদ্ধের পর থেকে সংখ্যায় বেড়েছে এই ধরনের বোলার। যেহেতু সব ধরনের উইকেটে এঁরা কাজ চালাতে পারেন, আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক দুই রীতিতে বল করতে পারেন ; কিন্তু তাঁদের এই নামকরণ হয়েছে যেহেতু তাঁরা সামঞ্জস্য করে, আরও বেশি কার্যকরী উপায়ে অফ স্পিন করতে পারেন, আর এটাই তাঁদের আক্রমণের মূল উৎস ধরে নেন। পেস-এ অবশ্য কিছু এদিক-ওদিক হয়, তবে ভাল উইকেটে এঁদের স্পিন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়।

অফ-ব্রেক-এর যেসব গ্রিপ-এর ছবি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তা শিক্ষার্থীদের পক্ষে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর কারণ যে গ্রিপ-এর উল্লেখ থাকে তাতে ; তা পরিণত ক্রিকেট খেলোয়াড়দের উপযোগী, এবং অসাধারণ লম্বা আঙুলের পক্ষে সুবিধেজনক। লেংথ ও শক্তি (আঙুলের) বল স্পিন করার পক্ষে নিঃসন্দেহে সম্পদ বিশেষ, কিন্তু যদি কোনো কিশোরের হাত সাধারণ হাতের চেয়ে আকারে ছোটও হয়—তবু, তার মনে হওয়া উচিত নয় যে সে বল স্পিন করতে পারবে না, আর এখানে যে আলোচনার অংশ দেওয়া হচ্ছে গ্রিপ সম্পর্কে, তা তার কাছে অসম্ভব মনে হওয়া উচিত নয়।

যেহেতু লেগ-স্পিন আর গুগলির ক্ষেত্রে অনামিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বের, আর অফ-স্পিন-এর ক্ষেত্রে প্রথম দুটি আঙুলের (তর্জনী ও মধ্যমা)। প্রথম আঙুল (তর্জনী) থাকবে রেখা (সেলাই) বরাবর, ওপরের অংশ সামান্য দ্বিতীয় আঙুল (মধ্যমা) স্বচ্ছন্দভাবে নয় প্রথম থেকে বেশ দূরেই, সেই সঙ্গে অন্য দুই আঙুলের নীচে জড়োসড়ো করা বুড়ো আঙুলও তার নিজস্ব অবস্থায় (বলের অপর দিকে)।

অফ-ব্রেকে ঘুরবে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, সোজা কথায় দরজার হাতল খোলার সময়ে হাত যেভাবে ঘোরে, সেইভাবে।

অ্যাকশন :

ডান বাহুর অনেকটাই থাকবে উরুর পেছনে, ঘোরার আগে কবজি এই সময়ে যথাসম্ভব খোলা থাকবে, বুড়ো-আঙুল বোলারের আম্পায়ারের অফ-এ থাকবে, ফলে তালুর মুখ থাকবে উর্ধ্বপানে। ডেলিভারির (বল ছোঁড়ার) সময়ে বাঁ পা'টা সামান্য উইকেট ছাড়িয়ে যাবে। শরীর একটু ঘুরে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে, যাতে বল ছাড়ার সময়ে সমস্ত শরীরটা যথাসম্ভব টান (drag) থাকে। অফ-স্পিনারদের পক্ষে উঁচু থাকাই শ্রেয় ভঙ্গি, কারণ বাহু যত নামবে ততই স্পিন-এর কাজ ব্যাহত হবে।

অফ স্পিনারদের কৌশল :

ফাস্ট উইকেটে খুব কম সংখ্যক তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়ই বল ঘোরাতে পারে, বা লেংথের ব্যাপারে নির্ভুল কাজ করে—বিশেষ করে লেগ-সাইড মাঠে। অন্যদিকে ব্যাটসম্যান যত বেশি অদক্ষ হবেন, লেগ-স্টাম্পের বাইরে থেকে বা তা থেকে রান পাওয়ার আশা বেশি তাঁর।

অতএব এই পরিবেশে, বোলারকে ঠিক লেগ-স্টাম্পের বাইরেই তার আক্রমণের লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করে নিতে হবে। আর, ঠিক সেই সঙ্গে মাঠও সাজাতে হবে এর সঙ্গে সমতা রেখে।

ব্যাটসম্যানকে তার নির্ভুল খেলায় বিপর্যস্ত করতে চেষ্টা করবে অথবা অন্য কোনো উপায়ে তাকে প্রতারিত করার উপায় ভাববে সে বল স্পিন করার চেষ্টা আদৌ করবে কি না। এবং বল সোজা অথবা পেস-এর পরিবর্তন, বা ফ্লাইট-এর হেরফের ঘটবে কিনা।

পেস-এর পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো বল ব্যাটসম্যানের কাছাকাছি হবে, তাকে ধোঁকা দিতে পারবে - ফ্লাইটের বল দিয়ে ঠকানো তাকে, অর্থাৎ বল কোথায় পড়বে সে সম্পর্কে তাকে ভ্রান্ত করে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলটা আসলে যেখানে পড়বে সেখান থেকে অনেকটা এগিয়ে পড়ার মত দেখাবে। এটা করতে হলে বল দেবার সবচেয়ে সহজ প্রক্রিয়া হলো—স্বাভাবিক পেস-এ বল দেওয়া, সামান্য উঁচু করে—বোলিং ক্রিজের দু ফুট বা গজ খানিক দূর থেকে। আর একটা কৌশল হলো, বলটাকে স্বাভাবিকভাবে ছাড়ার কিছু আগে ছেড়ে দেওয়া, অর্থাৎ তার হাত খাড়া অবস্থায় ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, বা যে হাতে বল ধরা তার বাহু সামান্য নামিয়ে দেওয়া, এবং এই দুই অবস্থাতেই শূন্যে ওড়ার

অতিরিক্ত দূরত্বটুকু পাবে। স্লো বোলারদের এক দিকপাল প্রায়ই বলতেন যে বলটা ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা উপলব্ধি হতো, তাঁর তর্জনী যেন বলের নিচের দিক থেকে সরে আসছে।

তরুণ শিক্ষার্থীদের এক্ষেত্রে ব্যাপারটাকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে—এসবের কোন্‌গুলো তার পক্ষে সুবিধেজনক, তবে তাকে বুঝতে হবে—যে এসবগুলোই, প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত কষ্টদায়ক। নিয়মিত অনুশীলনেরও দরকার এবং 'ফ্লাইটের' ব্যাপারটা কখনোই লেংথের বিনিময়ে চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

সাধারণত বলা হয় যে পিচ যত ভাল হয় ততই বোলারের মাটির চেয়ে শূন্যে ব্যাটসম্যানকে ঘায়েল করার ওপর নির্ভর করতে হয়, আর এটা করতে হলে তাকে একটু আস্তেই বল করতে হবে, তার স্বাভাবিক পেস-এর চেয়ে কম দ্রুতগতিতে।

যদি সে দেখে যে রক্ষণাত্মক বল খেলতে বাধ্য হয়েছে সে, সেক্ষেত্রে বল বাইরে (wider) খেলবে। ফিল্ডিংয়ের সামঞ্জস্য রেখে। বস্তুত, তার ক্রীড়া-কৌশল মিডিয়ম-পেস বোলারের পক্ষে যা নির্দিষ্ট তার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, তা সে আক্রমণাত্মক বা রক্ষণাত্মক যাই হোক।

ভাল পিচ-এ শুধু অ্যাটা ব্যাটসম্যানদেরই সে উইকেট-এর পাশ থেকে বল দেবে। একমাত্র ভাঙা বা আঠালো পিচ এ অফ-স্পিনার নিজের সুবিধে মতন খেলতে পারে। তার স্পিন এবার সত্যিই কামড় দেওয়ার মত হবে, বল ঘুরবে দ্রুত, সময়ে উঠবে। এই অবস্থায় সে উইকেট-এর পাশ দিয়ে বল করতে পারবে। এই ভাবেই ব্যাটসম্যানকে এল. বি. ডব্লিউতে পেতে পারে, স্ট্যাম্প নাও পেতে পারে—তবে উইকেট-এর পাশ দিয়ে বল দিতে পারলে স্ট্যাম্প-এ লাগাতে পারে।

মাঠের সাজানোটা অনেকটা অন্যরকম হবে, লেগ-এর দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে হবে। কিন্তু এটা তার মনে করলে চলবে না যে তার আক্রমণের ধারা হবে মিড্‌ল্ বা লেগ-স্টাম্প। তাকে বল করতে হবে (সে অফ-স্টাম্পের দিকে বা একটু বাইরেই), একথা মনে রেখে যে পিচ যত বেশিই স্পিন নেবে, ততই সোজা কোনো বল উইকেট থেকে দূরে থাকবে।

একটু জোরেই বল দিতে হবে তাকে, ভাল পিচ এ যেমনটা দিত তার থেকে সামান্য দ্রুতই এবং তার লক্ষ্যই হবে ব্যাটসম্যানকে তাঁর সামনের পায়ে এগিয়ে আসতে। লেংথের মাপই সবচেয়ে গুরুত্বের এখানে, কারণ তার লেংথের

বলগুলোকে লং-হপ বা ফুল পিচ-এ বিক্ষিপ্তভাবে পড়তে দিতে পারে না।

এই দক্ষতার প্রমাণস্বরূপ অপেক্ষাকৃত কম অভিজ্ঞতার বোলারকে দ্রুততর বল দেওয়া বা বেশি স্পিন দেওয়ার প্রলোভন থেকে মুক্ত হতে হবে, কারণ এ ধরনের কোনো প্রচেষ্টা তার বল শর্ট করে দিতে পারে, এবং সেইক্ষেত্রে আঠালো মাঠে এর চেয়ে বড় অভিশাপ আর কিছুতেই নেই। এই অবস্থায় শুধু লেংথই নয়, গতি বা দিক নির্ণয়ের ব্যাপারটাও কম গুরুত্বের নয়। ব্যাটসম্যানকে খেলাতে হবে, বল তার লেগ-এ বা তার বাইরে থাকুক তা উপেক্ষা করলে চলবে না—বিশেষ করে রক্ষণাত্মক খেলায়। আক্রমণাত্মকহলে ক্রশ-ব্যাট হিট হবে ডিপ স্কোয়ারে ডিপ-লং লেগ-এর ক্যাচ উইকেট পাবার একমাত্র সম্ভাবনা বহনকারী। উইকেট যত শ্লথগতি হবে, বোলারকে পিচ-এর তত দূরে বল ফেলতে হবে; কাদা যত বেশি হবে, বল পরিষ্কার রাখতে (সিম) তত বেশি পরিশ্রম করতে হবে তাকে।

ন্যাটা বোলিং (left-hand bowling):

ন্যাটা বোলার দুটি প্রাথমিক ব্যাপারে তাঁদের ডান-হাতি বোলারদের থেকে আলাদা। তাঁদের 'স্বাভাবিক' সোয়ার্ভ ডান-হাতি ব্যাটসম্যানদের উদ্দেশ্যেই ছোঁড়া হলেও 'স্বাভাবিক' ব্রেক কিন্তু তাঁদের থেকে দূরে দেওয়া হচ্ছে, প্রথমটিকে অন্তরায় ধরলেও, দ্বিতীয়টিকে সম্পদ বলেই ধরতে হবে।

প্রাথমিক অ্যাকশনের রীতিগুলো ডান-হাতিদের অবিকল অনুরূপ। স্পিন আর 'উড়ে যাওয়ার' (flight) কৌশলও একই। কিন্তু ডান-হাতি বোলার উইকেট-এর ওপর দিয়ে বল করবেন, ন্যাটা বোলার, দুটি দুর্লভ ব্যতিক্রমসহ, উইকেট-এর পাশে বল করবেন। যে ন্যাটা বোলার মাঝে মাঝে আউট সোয়ার্ভ বল দিনে চান; এবং যে ন্যাটা বোলার 'চীনাম্যান' বল দেন, তাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বিপরীত হবে।

সত্যিকার মিডিয়ম পেস-এর ন্যাটা বোলার অত্যন্ত দুর্লভ হলেও তাদের সাধারণ ক্রীড়াকৌশলাদি ডান-হাতিদেরই মতো। কিন্তু ফিল্ড সাজানোর ক্ষেত্রে তা নির্ভর করবে সোয়ার্ভ বা স্পিন-এর বল দেওয়ার ওপর; প্রথম ক্ষেত্রে অন-এর দিকে মাঠ জোরদার হবে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অফ-এর দিক।

ফিল্ডিং (Fielding)

ফিল্ডিংয়ের ব্যাপারটা দর্শকদের কাছে তেমন গুরুত্বের না হলেও ফিল্ডারের কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম। সবাই ভাল ফিল্ডার না হতে পারেন, কিন্তু ফিল্ড করতে হলে চাই অফুরন্ত উৎসাহ, সেই সঙ্গে দমও। তবুও সবাই টনি লক হতে পারবেন না। তা না পারুন, ফিল্ডিং ব্যাটিং বা বোলিংয়ের চেয়ে কখনোই কম গুরুত্বের হবে না ক্রিকেটে, কারণ ফিল্ডারের তৎপরতার ওপর একজন ব্যাটসম্যানের ক্রীজের আয়ু নির্ভর করে।

দর্শকদের মনে হতে পারে ব্যাটসম্যানদের কাছাকাছি ফিল্ডাররাই বুঝি বেশি বিপদের। তা অবশ্য নয়—কারণ যাঁরা বাউণ্ডারির কাছাকাছি নরম্যান ও' নীল বা নীল হার্ভের মত খেলোয়াড়কে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন তাঁরা জানেন এঁরা ব্যাটসম্যানের যম।

আরও চলে যান, থার্ড ম্যানে বা ডীপ ফাইন লেগ-এ। এদের দেখে ধারণা হবে রিটায়ার করা মানুষ সব, সদ্য পেনসনের লাইন থেকে এসেছেন। কিন্তু বল কাছাকাছি পড়লে···

ডীপে ব্রায়ান স্ট্র্যাথামের মত কাউকে কল্পনা করা যাক—বাউণ্ডারি ধরে দৌড়তেন ব্রায়ান যেন জীবন বিপন্ন তাঁর! বল ধরা এবং ছোড়া একই মুভমেণ্টে হচ্ছে নির্ভুলভাবে, কেন না সময় নষ্ট করা চলবে না। আর, বিশ গজের মধ্যে লোফার মত আসে যদি ব্রায়ান তা নেবেনই।

মাঠের কোনো কোনো অংশে বল কম যায়, কিন্তু সেখানকার লোককে সজাগ থাকতেই হচ্ছে, তৎপরও। শুধুমাত্র ফিল্ডিংয়ে খাঁকতি আছে বলে অনেক ভাল বোলারকে বাদ পড়তে হয়েছে টেস্ট ক্রিকেটে। ব্যাটসম্যানের ক্ষেত্রেও ঘটেছে এটা, এই কারণে যে অনেকগুলো রান হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু অনেক রান মাঠেও মারা যাবে।

কে কোথায় ফিল্ড করছেন মাঠে, এটা সর্বপ্রথমে দেখা দরকার। যুদ্ধের পর এই নিয়ে চলেছে অনেক গবেষণা—মাঠে লোক কোথায় দাঁড়াবে।

কভার পয়েণ্টে অবশ্যই পাকা লোক রাখা দরকার। থার্ডম্যান, মিড-অফ আর মিড-অনে অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ লোক থাকতে পারে। এঁরা কিন্তু অনভিজ্ঞ সত্যিই নন, আর কিছু অনুশীলনের অপেক্ষায় রত শুধু।

ফিল্ডারের একমাত্র লক্ষ্য হবে বলটা কিভাবে কত তাড়াতাড়ি বোলারের কাছে ফিরিয়ে দেবে। এর মানে, বাউণ্ডারিতে যে ফিল্ডসম্যান আছে তাকে

ভাল 'ছুড়িয়ে' (thrower) হবে। প্রচণ্ড বেগে ছুড়তে হবে বলটাকে। টেস্ট ক্রিকেটে এমন ফিল্ডার আছেন যিনি খুব উঁচু করে বল ছুঁড়তেন, অবশ্যই উইকেট-রক্ষক বা বোলারের হাতেই পড়তো বল, একেবারে স্বস্থানে দাঁড়িয়েই! কিন্তু তাতে যে সময় লাগতো তাতে ব্যাটসম্যান বাড়তি রান নেবার জন্যে একটুও দ্বিধাগ্রস্ত হতে হতো না। তবু, দর্শকদের সে কি উল্লাস, ওর ওই নিখুঁত ছোঁড়ার জন্যে!

দুভাবে বল ধরা যায়, আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক উপায়ে। কোনো ব্যাটস-ম্যান যদি পঁচিশ গজ দূর থেকে সোজা ড্রাইভ করে ফিল্ডারের দিকে, সে বল ধরতে যাওয়াটা মোটামুটি আক্রমণাত্মক, কারণ রান নেওয়া থেকে বিরত করার চেষ্টা করছেন ফিল্ডার।

বল তোলার মুহূর্তে সমস্ত দেহের চাপ থাকবে ডান পায়ের ওপর এবং পরমুহূর্তেই বাঁ পায়ের ওপর চাপ সরে যাচ্ছে বল ছেড়ে দেওয়ার সময়ে। বলটা ছুড়তে হবে প্রায় বোলিংয়ের কায়দায়, কারণ তাতে গতি পাওয়া যাবে, নির্ভুলও হবে ছোড়া।

এখন প্রশ্ন—বলটা কিজন্যে ছোঁড়া হলো! স্ট্যাম্পে লাগাবার জন্যে, না উইকেট-রক্ষকের হাতে পৌঁছে দেবার জন্যে?

যদি রান আউট নেবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে স্টাম্পস থাকবে লক্ষ্য, কারণ মুহূর্তের মধ্যে উইকেট রক্ষক বেল-এর মাথায় বল ঠেকিয়ে দিতে পারবেন। ব্যাটসম্যান সাধারণত কয়েক ইঞ্চির (গজ নয় কিন্তু) ব্যবধানে রান আউট হন।

আর, যদি ব্যাটসম্যানকে রান নেওয়া থেকে বিরত করার জন্যে বল ছোড়েন তাহলে উইকেট-রক্ষকের হাতে তুলে দিল বল।

ভালো ফিল্ডিংয়ের গোপন কথা হলো—কত তাড়াতাড়ি বল তোলা যায়।

ক্যাচ ধরার সময়ে নজর রাখতে হবে বলটা সোজা কী করে হাতের মধ্যে আসে। আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে ঝুড়ির মত করে হাত দুটো মেলে দিতে হবে, এতে বল হাত থেকে বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। উঁচু ক্যাচ ধরতে হলে থুতনির উচ্চতায় ধরা শ্রেয়, তাতে চোখ, হাত আর বল একই লেভেলে থাকে।

বোলার বল করার সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ডার এগোতে শুরু করবেন, যাতে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় যে অসুবিধে হয় সেটা কাটানো যায়।

বল যদি ডীপ থেকে আসে তাহলে নিকটতম ফিল্ডার উইকেট-রক্ষকের কয়েক গজ পেছনে চলে আসবেন, তাঁকে 'কভার' করতে। অন্তপ্রান্তে বোলারের পেছনে পজিশন নেবেন মিড-অফ বা মিড অন এর ফিল্ডার দাঁড়িয়ে যাবেন যদি বোলারের ফিরে আসতে দেরি হয় স্বস্থানে। অন্য আর-এক ফিল্ডার তাঁর জায়গায় চলে যাবেন।

আর একটা কথা। বোলারের কাছে বলটা ফেরত যাবে মোটামুটি ধরার সুবিধে থাকে এমন উচ্চতায়। তাঁকে যদি ঝুকতে হয় তা হবে অপরাধের সামিল। কারণ তাঁর যা দেবার তা তো দিচ্ছেনই। সুবিধে বুঝলে বলটা অন্যান্য ফিল্ডারের মাধ্যমে পাঠান।

ফিল্ডিং সাজানো হয় পিচের বাউন্স আর পেস-এর ওপর ভিত্তি করে। স্লো উইকেটে অবশ্য দূরত্ব কমবে, আর আঠালো (stiky) উইকেটে যেখানে ব্যাটসম্যানেরা মরণপণ লড়াই চালিয়ে চলেছেন এবং সম্পূর্ণভাবে রক্ষণাত্মক পদ্ধতিতে খেলেছে, গালি আর শর্ট স্কোয়ার-লেগ কাজে লাগবে।

কিন্তু উইকেট-এর অবস্থা যাই হোক না কেন, স্লিপগুলো একই গভীরতায় না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যাট-এর সঙ্গে সংস্পর্শ যত কম হবে, বল তত জোর ছুটবে। অতএব প্রথম স্লিপ, যার ঘাড়ে পয়লা কাট পড়বে একটু বেশি গভীরে থাকলে ভাল হয়।

শেষ কথা, অধিনায়কের ওপর নজর রাখুন। কোনো ব্যাটসম্যানের শক্তি অথবা দুর্বলতার সন্ধান পেয়ে থাকবেন হয়তো তিনি এবং সেক্ষেত্রে ফিল্ডারের দু-এক গজ এদিক-ওদিক সরে যাওয়াটা চাইবেন। এ ব্যাপারটা অত্যন্ত নিঃশব্দে হওয়া উচিত কারণ, অধিনায়ককে যদি এই কারণে খেলা বন্ধ করে নির্দেশ জারি করতে হয়, তাহলে ব্যাপারটার মজাই নষ্ট হয়ে যায়।

আর একটা ব্যাপার প্রায়ই চোখে পড়ে এক হাতে ক্যাচ ধরার প্রবণতা। অনেক সময়ে অবশ্য গত্যন্তর থাকে না, কারণ মাঠে শুয়ে পড়ে অনেক সময়ে ক্যাচ ধরার সময়ে অন্য হাত মাটিতে থাকে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেও এক হাতে ক্যাচ ধরতে দেখা গেছে অনেককে, এবং তার মাসুলও দিতে হয়েছে—ক্যাচ পড়ে গেছে।

ছোট রান নেওয়ার ব্যাপারে অনেকে উদারতা দেখান, তাঁরা হয়তো ভুলে যান যে রানের বা উইকেটের ব্যবধানে দল হারে।

ক্লোজ-ইন-এ যে সব ফিল্ডার থাকেন, তাঁদের নজর রাখা উচিত বোলারের

ওপর। বল না ছাড়া পর্যন্ত নড়াচড়া চলবে না। শর্ট লেগ আর সিলি পয়েন্টের ফিল্ডারদের বেলায় এটা অবশ্য প্রযোজ্য। কিন্তু মিড-অফ, কভার আর আউট-ফিল্ডারদের আগে থেকেই এগোনো উচিত।

আসলে ফিল্ডিং যে ভাবেই সাজানো হোক না কেন, ফিল্ডারদের দাঁড়ানোটা সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার, তাঁদেরই মাথা খাটিয়ে দাঁড়াতে হবে।

ব্যাটসম্যানের বলের গতির ওপর কোনো ফিল্ডারের নিয়ন্ত্রণ নেই, কাজেই আনুমানিক ব্যাপারই কাজ করে বেশি। বল ছোড়ার বেলাতেও হাত ঘুরিয়ে বল ছোড়াই বেশি সুবিধাজনক। বল ছোড়ার সময়ে এক পা এগোনোও যেতে পারে। আনাড়ি বল ছোড়াতে অনেক রান আউটের সম্ভাবনার কবর হয়েছে।

গ্রীষ্মের দিকে মাথায় টুপি থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদিও আমাদের দেশে খেলাটা শীতের মুখেই হয়। চোখকেও বাঁচায় টুপি। বল দেখতে সুবিধে হয়। বড় খেলাতে অনেক সময়ে মানুষের ভীড়ে অনেক উঁচুতে উড়ে আসা বল ধরার অসুবিধে হয়।

বল শূন্যে থাকা অবস্থাতে অবশ্যই তার থেকে চোখ সরিয়ে নেওয়া চলবে না। অনুশীলনে কাউকে ব্যাট করে উঁচুতে ক্যাচ তুলতে বলুন—খুব জোরে বা খুব উঁচুতে না হওয়াই বাঞ্ছনীয় মারগুলো। ফসকালে দৌড়ে কূল পাওয়া যাবে না।

খেলায় পরিশ্রমী খেলোয়াড় যেমন থাকে, অলস লোকের সংখ্যাও নগণ্য নয়। এরাই দলকে ডোবায়। মাঠে এমনও হয়—একটা ক্যাচ দুই ফিল্ডার ধরতে চলেছেন, হয়তো দুজনই ধরতে পারেন ক্যাচ, কিন্তু বোঝাপড়ার অভাবে ক্যাচটা আর ধরাই হলো না।

যদি এমন হয়, উইকেট রক্ষকই ক্যাচটা নিতে পারছেন, তাঁকেই নিতে দিন এটা। আর, অন্য অবস্থায় ফিল্ডারদের ক্ষেত্রে, যার পক্ষে সেটা নেওয়া সামান্য বেশি সুবিধাজনকও, তাকেই নিতে দিন ক্যাচ।

ফিল্ডাররা সব সময়েই সজাগ থাকবেন, ইসারায় কথা বলা বা পাবলিকের সঙ্গে গল্প করা অপরাধ, বিশেষ বড় খেলায়।

স্লিপ-এর কাজ যাঁর ভাল তাকে স্লিপেই রাখুন। মাঠে (এক উইকেট-রক্ষকের ছাড়া) এতো ক্যাচ নেওয়ার সুযোগ নেই, আর সহজও না।

ফার্স্ট স্লিপে হ্যামণ্ডের মত কাউকে পাবেন না। পাবেন না জ্যাক গ্রেগরির মত লোককেও। ই. এম গ্রিস ব্যাটস্ম্যানের প্রায় নাকের গোড়া থেকে বল ধরতেন। সে দিন কি আর আসবে! কিংবা শর্টলেগে সোলকার!

এবার ফিল্ডিং'য়ের আসল কৌশল, শিক্ষার্থীদের যেটা কাজে লাগে তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। বল থামানো, ধরা বা ছোড়াটা ক্রিকেট-এর সবচেয়ে সোজা কাজ বলে মনে হতে পারে আপাতদৃষ্টিতে। কোনো খেলোয়াড়ই – তা সে যে বয়সেরই হোক না কেন নিজেকে পূর্ণাঙ্গ ক্রিকেট খেলোয়াড় বলে দাবি করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে ফিল্ডিং আয়ত্ত করতে পারছে। কারণ, ফিল্ডার হিসাবে, বোলার বা ব্যাট-এর বেশি দলের প্রয়োজনীয় মানুষ সে। একথা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবুন তো— একটা ক্যাচ ফেলে দিয়ে, রান আউট না করতে পেরে, বা বাউণ্ডারির হাত থেকে বল বাঁচানো এসবই কি যথেষ্ট গুরুত্বের নয়, খেলার গতি পালটে দেবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয় কি? ভাল ফিল্ডিং শুধু বোলারের নয়, গোটা দলের আস্থা আনে। ব্যাটসম্যানকে যথেষ্ট বিপর্যস্ত করার ক্ষমতা রাখেন এমন অনেক ফিল্ডার আছেন।

প্রাথমিক কৌশল :

দৈহিক গঠনে অবশ্যই একজন আর একজনের চেয়ে অন্য মাপের হয় এবং যা একজনের কাছে অত্যন্ত সহজ, তা অন্যের কাছে যথেষ্ট বেগের। কিন্তু যে কোনো দলই পর্যাপ্ত অনুশীলনে নিশ্চয়ই এ কাজে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

ভাল ফিল্ডার হতে গেলে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া, নিজেকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া নিচের দিকে আর শারীরিক ভারসাম্য বজায় রাখা ভীষণ দরকারী। এগুলো সবই দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় লাভ করা যায়।

তবে সমস্ত ব্যাপারটাই খোলা জায়গায় এবং একটা বলের সাহায্যে হওয়া দরকার।

দ্রুত এগিয়ে যাওয়া :

বল থামাতে ফিল্ডারকে সর্বপ্রথম তার কাছাকাছি হতে হবে, অর্থাৎ বল ব্যাট থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সে এগোবে—এটাও অভিজ্ঞতা থেকে আসবে, মানে বল কোন্‌দিকে আসছে।

এজন্যে দরকার ;

১। ব্যাটসম্যানকে লক্ষ্য করা (ফার্স্ট স্লিপ বা লেগ স্লিপ-এর লোক হলে সে বোলারের হাতের ওপর নজর রাখবে)।

২। দুপায়ে সামঞ্জস্য করে শরীরটাকে খাড়া রাখা। সামান্য ঝুঁকে—হাত দুটো সামনের দিকে আলগা ভাবে ঝুলতে থাকবে।

৩। মনের একাগ্রতা থাকবে—ভাবতে হবে বল যেন তার দিকেই আসতে পারে।

বল থামানো :

তার অবশ্য করণীয় হলো :

১। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি বলের লাইনে চলে আসা,

২। যতটা সম্ভব দ্রুত নিজেকে নিচের দিকে নামিয়ে নিতে হবে, হাঁটু মুড়ে হাতের আঙুল মাটি ছুঁয়ে থাকবে—ত্রিভুজ তৈরি হবে, মাথা হাঁটুর ওপরে ফুট খানিক তফাতে থাকবে, চোখ আঠার মত অগ্রসরমান বলের দিকে নিবদ্ধ।

৩। বল দেখতেই থাকবে যতক্ষণ না সেটা নিরাপদে তার হাতে আসছে। আর, বল হাতের মুঠোয় না আসা পর্যন্ত কোথাও সেই চোখ তুলবে না বা শরীরটাকে ওপরদিকে ওঠাবার চেষ্টা করবে না।

নিরাপদ ফিলডিংয়ের প্রথম শর্ত হলো বল যে হাতের মুঠোয় আসবে তা সঠিক অবস্থায় রাখা। দেরি করে ঝোঁকা, তাড়াতাড়ি হাতাবার চেষ্টা করা বা আগেভাগে চোখ তোলা অমার্জনীয় অপরাধ।

সুস্পষ্ট ছবি তুলতে যেমন ক্যামেরাকে নিশ্চল রাখা দরকার, নির্ভুল চোখে একটা বল লক্ষ্য করতে হলে, মাথা আর চোখ ফোকাস-এর লাইনে আসতে হবে এবং শেষে একেবারে অনড় হয়ে যাবে।

বল ধরা :

পজিশন নেওয়া বা ভারসাম্য ঠিক না থাকার দরুনই বেশির ভাগ ক্যাচই ফসকে যায়, সেজন্য ফিল্ডার অবশ্যই

১। দ্রুত জায়গায় উপস্থিত হবে,

২। শরীরের সাম্য বজায় রেখে, মাথাটা সোজা নিশ্চল রাখবে,

৩। আঙুলগুলো খুলে যাবে, হাতের তেলোই হল বল ধরার আদর্শ স্থান,

৪। বল নজরে রাখা,

৫। চোখ বরাবর বল ধরার চেষ্টা করা, অন্যথায় বল ধরা অসম্ভব,

৬। হাতদুটোকে বলের মধ্যে সমর্পণ (give) করা।

আক্রমণাত্মক ফিল্ডিং :

এতক্ষণ রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং-এর রীতিনীতি আলোচিত হলো। কিন্তু ফিলডিংয়েও আক্রমণাত্মক একটা রীতি প্রচলিত, এবং এই রীতি আয়ত্তাধীন করায় সচেষ্ট হওয়া দরকার সার্থক ফিল্ডারদের, অর্থাৎ বলটাকে এমন জায়গায় কুড়োতে হবে যেখান থেকে ছোঁড়াটাও তাৎক্ষণিক হয়।

সুতরাং ফিল্ডারকে

১। যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি বল আটকাতে হবে।

২। বাঁ পা ডান পায়ের পেছনে রেখে বলের লাইনে আসতে হবে।

৩। হাঁটু আর উরু দুই-ই বাঁকাতে হবে, যাতে মাথাটাও নেমে আসতে পারে ডান হাঁটুর ওপরে।

৪। দু'হাতে বল ধরা, ডান পায়ের ঠিক সামনেই—আর, শরীরের ভার সেই পায়ের ওপর রেখেই।

দ্রুততম গতি আসার প্রয়োজনে একহাতেই বল তুলতে হবে।

তবে এ সবেরই অবিরাম অনুশীলন দরকার এবং অপরিহার্য কৌশলগুলো আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে ব্যবহার না করাই ভাল।

ছোড়া :

আক্রমণাত্মক ফিলডিংয়ের প্রথম ও শেষ কথা হলো দ্রুত অথচ নির্ভুল ছোঁড়া। এতে অনেক ব্যাটসম্যানকেই শুধু ঘায়েল করা যাবে তাই নয়, রান তোলার ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক হয়ে যাবে সেই দল।

যদিও নির্ভুল ছোড়ার ব্যাপারে কবজির কাজ অত্যন্ত গুরুত্বের, অর্থাৎ নমনীয়তা থাকবে কবজির, সেই সঙ্গে কাঁধ ও বগলেরও। বস্তুত যে কোনো কিশোর ভাল ছুড়তে পারবে, যদি অবিরাম অনুশীলন চালাতে পারে সে, সেই সঙ্গে গতি আসবে, আসবে নির্ভুল ছোড়ার ক্ষমতা।

বল ছোড়ার প্রধান কৌশল হলো : (১) বলটি হাতের মধ্যে পুরো নিয়ন্ত্রণে থাকবে, ছোড়ার পূর্ব পর্যন্ত, তাড়াতাড়ি মুখ তোলা সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে,

(২) পা থাকবে যেমনটি আক্রমণাত্মক ফিলডিংয়ের, সম্পর্কে পূর্বাহ্ণেই উল্লিখিত হয়েছে। ডান পা থাকবে, সমকোণী ভঙ্গীতে—ছোড়ার সম্ভাব্য লাইনে, হাঁটু সামান্য বাঁকানো—শরীরের পুরো ওজনই এই পায়ের ওপর,

(৩) ডান বাহু, কনুই বাঁকানো; কবজি ঝোলানো ডান কাঁধের পেছন দিক থেকে সোজা ছুটবে এবং একই সঙ্গে বাঁ বাহু আর হাত এগিয়ে যাবে লক্ষ্যের দিকে।

(৪) শরীর আর মাথা যে কোনো উপায়েই হোক একই স্তরে (plane) রাখতে হবে। চোখ আর মন থাকবে উইকেট-এর মাথায়।

(৫) বল ছেড়ে দেওয়া: ডান বাহু যেই ছোড়ার অবস্থায় আসছে, শরীর প্রধানাবস্থায় আসে. ফলে বল ছেড়ে দেবার মুহূর্তে বুক লক্ষ্যের মুখোমুখি হয়, শরীরের সমস্ত ভারটুকুই বাঁ পায়ের ওপর, বাঁ উরু ঘেঁষে।

(৬) ছাড়া: ডান বাহু আস্তে ছোড়ার লাইন বরাবর নেমে আসে, ডান পাও সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে। ধড়ের কাজ শেষ হবার সময় ডান কাঁধ লক্ষ্যের মুখোমুখি থাকবে।

একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়, যে ছোড়া যত সোজা, অর্থাৎ খাড়া হবে ততই দিক সম্পর্কে নির্ভুল হওয়া যাবে। শুধু ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে, বিশেষ করে কভার পয়েন্ট বা থার্ড ম্যান-এর কাছ থেকে, একটু পাশ হয়ে—কাঁধের তলা থেকে বল ছোড়াটাই বেশি কাজের হয়। কিন্তু দিকনির্ণয়ে এটা অত্যন্ত শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

ফিল্ডিং-এর অনুশীলন:

কোচ-এর নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রিত অনুশীলন ছাড়াও শিক্ষার্থীরা নিজেদের উপকার নিজেরাই করতে পারে যদি তারা যথেষ্ট আগ্রহী হয়—বল নিয়ে যদি খেলতে থাকে সব সময়ে এবং এভাবে বল-সেন্স শিখতে পারে। যে কোনো অল্পবয়সী ছেলেও নিজে নিজে বল থামিয়ে ধরা শিখতে পারে—দেয়ালে সেটাকে ছুঁড়ে এবং দেওয়ালে মার্কা করে দিয়ে চিহ্নিত করে। একইভাবে, কোচ কিন্তু তার শিক্ষার্থীদের প্রেরণা যোগাবেন যাতে নিজেদের মধ্যে অনুশীলন চালাতে পারে তাঁর অন্য কাজের ফাঁকে।

ফিল্ডিংয়ে আত্মবিশ্বাস অনেকটা কাজ করে। আবার প্রথমাবস্থায় হাত পা ছড়ে গেলে ক্ষতিও হয়, আর ক্রিকেট বল আনন্দের উৎস না হয়ে ভীতির বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সেইজন্য, বিশেষ করে মরশুমের গোড়ায়—হাত শক্ত হয়ে যাবার আগে বা ঠাণ্ডার দিনে, কোচ সম্ভব হলে পুরনো বল ব্যবহার করবেন, সতর্ক থাকতে হবে যাতে জোরে না লাগে। খুব কম বয়সের ক্ষেত্রে টেনিস

বল বা অন্ত কোন নরম বলও চলতে পারে—কারণ লক্ষ্য করা বা জায়গা নেওয়ার ব্যাপারটা ম্যাচ বলের মতই এই বলেও শেখা যায়।

প্রাথমিক 'গা গরম' করার পর্যায়ের অনুশীলনে তার শিক্ষার্থীদের ছ' ভাগে ভাগ করতে পারেন কোচ—আট থেকে দশ গজের ব্যবধানে, এবং কয়েক মিনিট ধরে নিজের হাতে পরস্পরকে দ্রুত হাতে বল ধরার অনুশীলন করাতে পারেন, নিজে খুঁত ধরার জন্তে ঘুরবেন তাদের আশেপাশে, যেমন অনাবশুক মাথার আন্দোলন, দুষ্ট ভারসাম্য (শারীরিক), হাতের ভুল অবস্থান দেখবার জন্য। এর পর শুরু হবে তাঁর কাজ।

'পুরো পোশাকী' ফিল্ডিং অনুশীলনে ছয় থেকে আটটি ছেলে প্রয়োজন। এর দ্বিগুণ শিক্ষার্থী নিয়েও কাজ করা যায়। অর্ধগোলাকার অবস্থায় সূর্যের দিকে পেছন করে দাঁড়াবে তারা, সামনে থাকবে নরম ঘাসের আস্তরণ। একটি স্টাম্প আর একজন উইকেট-রক্ষক থাকবে প্যাড আর দস্তানা পরা।

অনুশীলনের প্রথম পর্যায়ে কোচ ক্যাচ ধরার সঠিক পদ্ধতি নিজে ধরে দেখাবেন, আক্রমণাত্মক ও রক্ষণাত্মক দুই-ই। এর ব্যাখ্যাও দেবেন তিনি। গোড়ার দিকে রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং অনুশীলনই বিবেচনার কাজ হবে, ক্রমে আক্রমণের পর্যায়ে। সবশেষে ক্যাচ ধরা। এই ক্রমিক অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের উপকার হবে।

প্রতিটি বল আঘাত করার সময়ে ফিল্ডারের নাম ধরে ডাকবেন কোচ, অবশ্যই সংশ্লিষ্ট জনের। এর অন্যথা মানেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যর্থতা, নৈরাশ্য অথবা এমনকি সংঘাতও আসতে পারে!

প্রতিটি বল, তা ক্যাচ ধরাই হোক বা ফিল্ড করাই হোক ফেরত পাঠাতে হবে, যখনই সম্ভব হবে—উইকেট-রক্ষকের কাছে, ফুল পিচ-এ। কোচ একথা শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দেবেন, যে বল ফেরত পাঠানোর ব্যাপারটা, বল ধরা বা তোলার মতই গুরুত্বের।

প্রথম পর্যায়ে প্রতিটি মাঠই কিন্তু হবে ফিল্ডারদের ঘনিষ্ঠ পরিসরের মধ্যে, ক্রমে তাদের পেস-এর, উচ্চতার ও দিক নির্ণয়ের প্রতিবন্ধকতা বাড়াতে হবে, অর্থাৎ নিচু, ফাস্ট, হিট বা কাট, কভার, একস্ট্রা কভার বা থার্ড ম্যান-এর কাছে পাঠাতে হবে, এবং অন্যদিকে প্রতিটি মরশুমের শেষে ডিপ-ফিল্ডও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এ সবই প্রতিকূল বা অনুকূল আবহাওয়ায় করতে হবে, কখনো 'সূর্যাস্তের' সময়েও। দ্রুত অবলোকন এবং ক্যাচ বিচার

করার ব্যাপারে কোচ শিক্ষার্থীদের তাঁর দিকে পেছন করে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন, আর বল না মারা পর্যন্ত তাকাতে পারবে না তারা।

ক্লোজ ফিল্ড এ শর্ট-লেগ, সিলি মিড-অন আর সিলি-পয়েন্টের সবিশেষ অনুশীলনের প্রয়োজন; তাদের কাছে শ্রেষ্ঠতম পরিকল্পনা হবে—কোচ এদের কাউকে বল করতে বলবেন—ধরা যাক বার গজ দূর থেকে। তিনি সেই বল তাদের দিকেই খেলবেন, যেমনটি কোন ম্যাচ-এ খেলতেন। এক্ষেত্রে অবশ্য নাম ডাকার কোনো দরকার নেই, এটা হবে যে পার লোফো।

কোচ যে মুহূর্তে বুঝবেন তাঁর দল ফিল্ডিংয়ের মুখ্য শর্তাদির সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, তিনি ম্যাচ হলে যা করতেন, সেইভাবে অনুশীলন শুরু করবেন—একে ম্যাচ প্র্যাকটিস বলা যায়। মাঠের মাঝেই হবে এটা, কোচ নিজে ব্যাট ধরবেন, আর কাউকে দিয়ে 'ফরমান মত' বল করিয়ে ব্যাট চালাবেন। মোটামুটি ম্যাচ-এর মতই ব্যাপারটা মনে করতে হবে; এবং কোচ ও তাঁর বোলার ভাল খেলোয়াড় না হলে, স্লিপ আর ফাইন-লেগ-এর ব্যাপারগুলো বাদ দেওয়া যায়।

শুরু করার আগে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন থাকবেন :

(১) বল দেওয়ার পর, মাঠের সবাই (ক্লোজ-ফিল্ড-এর লোক ছাড়া) এগোবে ব্যাটসম্যানের দিকে তাদের শারীরিক সাম্য বজায় রেখে। তাদের এগিয়ে যাওয়ার গতি বল যদি শ্লথগতির হয় তাহলে বাড়বে, যদি দ্রুতগতি হয় তাহলে সংযত হবে;

(২) প্রতিটি ফিল্ডারের (ফার্স্ট স্লিপ বা লেগ স্লিপ ছাড়া) চোখ থাকবে ব্যাটসম্যানদের দিকে আর এই দেখার মধ্যেই থাকবে মাঠের গতি নির্ণয় করার প্রয়াস;

(৩) তারা যথেষ্ট আগেই শরীর নামাবে, আর বল হাতে আসার পর মুখ তুলবে;

(৪) ফেরত পাঠানোর সময়ে ফুল পিচ হওয়া দরকার আর এটা করতে হলে লক্ষ্য থাকবে উইকেট রক্ষকের হাত;

(৫) প্রত্যেকটি ছোড়াই উইকেট থেকে অন্তত দশ গজের বেশি দূরত্বের হওয়া দরকার;

(৬) বল তাড়া করার সময়ে, ফিল্ডারকে প্রচণ্ডতম গতিতে দৌড়তে হবে এবং বলটা তোলার আগে সেটা অতিক্রম করতে হবে;

(৭) খেলার সময়ে প্রতিটি ফিল্ডারের সব সময়ে চোখ থাকবে অধিনায়ক

আর বোলারের দিকে। যে কোনো সংকেতের জন্যে (জায়গা বদলের) প্রস্তুত থাকতে হবে ;

(৮) বোলারকে বল ধরার প্রয়োজনে শরীর নামাতে বাধ্য করা অপরাধ, অবশ্য রান আউট-এর সম্ভাবনা থাকলে অন্য কথা। বলটা তার কাছে ফেরত যাবে, সম্ভব হলে 'রিলে করে' অর্থাৎ হাতে হাতে ঘুরে।

কোচ মাঝে মাঝে শর্ট (একক) রানও নিতে পারেন, এতে মজা বাড়বে, উৎসাহও। 'দুটো নাও' 'তিনটে' হাঁকে ফিল্ডারদের ব্যতিব্যস্ত করা যেতে পারে। কোচ সর্বক্ষণ কিন্তু শিক্ষার্থীদের উৎসাহ জোগাবেন, নির্দেশ দেবেন ; এবং ভুলত্রুটিতে নিশ্চয়ই তিরস্কার করবেন। তবে একটা ভাল ক্যাচ নিতে পারলে বা একটা বল ভাল আটকাতে পারলে বা দ্রুত, নির্ভুল বল ফেরত পাঠানোতে উচ্ছ্বসিত হতে হবে তাঁকে, হওয়া উচিতও।

ডিপ ফিল্ড : (Deep field)

ইদানীং কালে ডিপ স্কোয়ার আর লং লেগ এর জনপ্রিয়তা বেড়েছে, অন্যদিকে কমেছে লং অফ, লং অন আর ডিপ মিড উইকেট-এর।

অবশ্যই কোনো অধিনায়কই তার দলকে দুর্বল করবেন না তাদের ডিপ-এ দাঁড় করিয়ে যদি না ব্যাটসম্যান তাঁকে বাধ্য করেন। কিন্তু এমন সময়ও আসতে পারে যখন তাঁর বিকল্প কিছু পাওয়া যাচ্ছে না – বিশেষ করে রান বাঁচাবার জন্যে জান লড়িয়ে দিয়েছেন তিনি, এমতাবস্থায় লেগ-ব্রেক বা স্লো-অফ স্পিনারদের, একেবারে শীর্ষস্থানীয় না হলে, অন-এ এক বা একাধিক লোকের প্রয়োজন হবে তাদের।

ডিপ ফিল্ড-এ যাঁরা থাকবেন তাঁদের প্রধান যোগ্যতা হবে :

(ক) দৌড়ে চারের মার ব্যর্থ করে দেওয়া বা দু' রানের বদলে এক রান করতে দেওয়া ;

(খ) উঁচু আর তাড়ু মার ধরার জন্যে পাকা হাত ;

(গ) নির্ভুল অথচ শক্ত হাতে ছোঁড়ার ক্ষমতা।

কোনো ডিপ ফিল্ড-এর লোককে দৌড়তে, বা একটা শক্ত ড্রাইভ রুখতে, বা শেষ কয়েক পা দৌড়নোর পর হঠাৎ বাজপাখির মত ঝুঁকে বল তোলা এবং সেটাকে তীরের বেগে ফিরিয়ে দেওয়ার দৃশ্য দেখাটা কম আনন্দের নয়।

ডিপ ফিল্ডারের পক্ষে নিচের কথাগুলো অনেকটা সহায়ক হতে পারে :

(১) পেছনে দৌড়নোর চেয়ে সামনে দৌড়নো অনেক সহজ, সুতরাং বেশি ডিপ-এ না থাকাই ভাল ; কিন্তু বড় মাঠে বাউণ্ডারিতে দাঁড়ানো অনেক সময়ে ব্যর্থ হয়, ফলে পাঁচ থেকে দশ গজ ভেতরে থাকাই শ্রেয়। ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে তার দূরত্ব নির্ভর করবে ব্যাট-এর পূর্ণাঙ্গ মারের দূরত্বের ওপর। এবং এই প্রসঙ্গে মারের জোর আর হাওয়ার গতি অনেকটা কার্যকরী।

(২) বল দেওয়ার পর থেকেই সামনে এগোবে সে, নজর থাকবে প্রথমটায় বলের ওপর, পরে ব্যাটসম্যানের ওপর। বুদ্ধিবৃত্তি আর অভিজ্ঞতা থেকে সে মারের দিক নির্ণয়ে খানিকটা আন্দাজ পাবে, তার এগোনোটাও তার ওপরই নির্ভর করবে।

(৩) তার দিকেই লক্ষ্য করে একটা উঁচু মার দেখেই তার তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়। অপেক্ষায় থাকবে সে বলের লাইন আর লেংথ বিচার করার জন্যে। এটা হলে, যত তাড়াতাড়ি ক্যাচ-এর অবস্থায় আসতে পারবে ততই সুবিধে তার।

(৪) বুকের উচ্চতায় বল ধরার চেষ্টা করা উচিত তার।

(৫) বল ছোঁড়ার সময়ে হাত ঘুরিয়ে বল দেওয়াই শ্রেয়, কারণ পা ফেলা বা শারীরিক চাতুর্য এখানে গুরুত্বের।

(৬) সত্যিকারের ভাল ফিল্ডার ব্যাটসম্যানকে আউট করতে পারে, যখন দ্বিতীয় রান সংগ্রহ করতে চলেছে সে। এটা করতে হলে প্রথমাবস্থায় দ্রুতগতিতে এগোবে না ফিল্ডার। এতে ব্যাটসম্যানের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হবে এবং সে ঝুঁকি নেবে।

মিড-অফ (Mid-off) :

বোলার যেই হোক আর উইকেট-এর অবস্থা যাই হোক না কেন—মিড অফ একজন ফিল্ডার থাকতেই হবে। মাঠে হয়তো তার অবস্থান ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তন হতে পারে।

মিড-অফ-এর ফিল্ডারের মোটামুটি যোগ্যতা হচ্ছে :

(১) শক্ত হাতে বল থামাতে এবং প্রয়োজনবোধে শক্ত মার ধরার মত হাত।

(২) অত্যন্ত দ্রুত এগোবার ক্ষমতা, দুধারের ড্রাইভ থামিয়ে দেবার জন্যে। পুশ থেকে চোরা সিঙ্গল বা একক রান সম্পর্কে অনুমান ক্ষমতা থাকা উচিত।

(৩) সাহস—তা সে মাটিতেই হোক বা শূন্যে ভেসে আসা যে কোনো কিছুর মোকাবিলা করার ক্ষমতা, এবং সেক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তর হিসেবে হাত ও পায়ের সহায়তা।

(৪) নির্ভুল শক্ত হাতের নিচু বল ছোঁড়া, তার অবস্থান নিচের অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

(ক) মাঠের পেস, (খ) বোলার, (গ) ব্যাটসম্যান, (ঘ) অন্য অফসাইড ফিল্ডারদের অবস্থান।

ব্যাটসম্যানকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করে প্রায়ই অনুমান করা যায় মারের প্রকৃতি।

মিড-অন (Mid on) :

বছর পঞ্চাশ আগে দলের সব চাইতে দুর্বল ফিল্ডারকে রাখা হতো মিড অন-এ। বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট আক্রমণে লেগ স্টাম্পে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে অনের খেলা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মিড-অফ সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, তা মিড-অন সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য। তার অবস্থানও ব্যাপক সীমায় তারতম্য ঘটে—বিশেষ করে বোলারের আক্রমণের প্রকৃতি অনুযায়ী ও ফরোয়ার্ড স্কোয়ার লেগ-এর অবস্থানের ওপর। বস্তুত নিয়মিত অন্য কোনো জায়গাই মিড-অন-এর চেয়ে স্থিতিস্থাপক (elastic) নয়।

মিড অফ-এর মতোই এঁরও দরকার ভাল হাত, তাড়াতাড়ি এগোনোর আর দ্রুত বল ফেরত পাঠানোর ক্ষমতা।

কভার (Cover) :

ফাস্ট উইকেটে এবং অফস্টাম্প-এর দিকে অথবা বাইরে যে বল দেওয়া হচ্ছে, সেখানে কভারের গুরুত্ব অপরিসীম। স্পিন-এর ভুল মার অথবা দ্রুতগামী কাট-এর মার (slash) থেকে ক্যাচ ওঠার সম্ভাবনাও প্রায়ই দেখা দেয়।

শারীরিক গঠন, পায়ের গতি, বল ফেরত দেবার নির্ভুল ও শক্ত হাত—এগুলো সবই কভার ফিল্ডারের মুখ্য যোগ্যতা। কভার আর একস্ট্রা কভারের অবস্থান ব্যাপক হওয়া দরকার মাঠের পেস অনুযায়ী, সেই সঙ্গে বল দেওয়া আর ব্যাটসম্যানের স্বাভাবিক মার।

ফাস্ট মাঠে তারা অনেকটা ডিপ-এ দাঁড়াতে পারে। এই মাঠের বল ব্যাট থেকে আসে 'স্কোয়ার' মার হয়ে, লেগ-স্পিন আর আউট সোয়ার্ভ বোলিংয়েরই ক্ষেত্রে বেশি বাস্তব। স্লো মাঠে অফ-স্পিনারদের জন্যে তারা উইকেট-এর আরও সামনে দাঁড়াবে।

সাধারণ নীতি অনুযায়ী ফিল্ডার যতটা সম্ভব ডিপ-এ দাঁড়াবে, সিঙ্গল বা একক রান ঠেকাতে।

কভার থেকে বল ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে গতি আর নির্ভুল ছোঁড়া অপরিহার্য। যদিও হাত ঘুরিয়ে (over-hand) বল ছোড়া সহজতর, তবুও খ্যাতনামা প্রায় সব কভার ফিল্ডারই নিচু হাতের (flat) বা ঠিক কাঁধের নিচের অংশ বরাবর থেকে বল ছোড়ার পক্ষপাতী।

বল ফেরত পাঠানো নিয়মানুযায়ী ফুল পিচ-এর হওয়া দরকার উইকেট এর দিকে, অর্থাৎ স্টাম্পের ফুটখানেক ওপরে। বোলারের দিকের স্টাম্পে সোজা ছোড়াটা রান-আউটের সম্ভাবনা থাকলে সমর্থনযোগ্য। এটা মনে রাখা দরকার যে ব্যাটসম্যানকে অনেক বেশি পথ যেতে হয় এবং প্রতিপক্ষের পরে শুরু করে তার যাত্রা, কিন্তু এই ফেরার ব্যাপারটা অনেক অনুশীলনসাপেক্ষ।

কোনো কোনো খ্যাতনামা কভার ফিল্ডার ব্যাটসম্যানকে বিভ্রান্ত করে বোলারের উইকেট লক্ষ্য করেও শেষ মুহূর্তে উইকেট-রক্ষকের দিকে বল ছুঁড়ে দেন। অভিজ্ঞ কভার ফিল্ডার সহসা কেরামতি দেখান না, এবং সত্যিকারের 'মার' না হলে প্রচণ্ডতম গতি (top gear) আনার প্রয়োজন মনে করেন না।

থার্ড ম্যান : (Third man)

অপেক্ষাকৃত দুর্বল ফিল্ডারকেই থার্ড ম্যান হিসেবে মাঠে দেখা যায়। খুব কমসংখ্যক ক্যাচই সেদিকে যায়। কিন্তু ফাস্ট মাঠে আর অফ সাইড বল দেওয়া হচ্ছে যে মাঠে শুধু দক্ষ ফিল্ডারই সেখানে হরদম মারা সিঙ্গল বা একক রান ঠেকাতে পারেন, অথবা তিনি যদি ফাস্ট বোলারের থেকে ডিপ-এ ফিল্ড করেন, সেক্ষেত্রে 'দুই' ঠেকাতে পারেন।

এই জায়গার ফিল্ডারেরও পায়ের গতি আর নির্ভুল পেস-এর জ্ঞান অপরিহার্য।

বোলিং আর মাঠ যত ফাস্ট হবে, থার্ড ম্যান তত ডীপ-এ দাঁড়াবেন;

কিন্তু উইকেট-এর দিকে থেকে তার দৃষ্টি কেমন নির্ভর করে ব্যাটসম্যানের মার-এর ওপর, আর যদি সে নির্ভেজাল 'কাটতে' (cutter) পারে, বা স্কোয়ার মারতে পারে।

টেকনিক বা কৌশলের দিক থেকে থার্ড ম্যান আর কভার একই রীতিতে খেলেন।

ক্লোজ-ইন ফিল্ড (Close in field) :

ইদানীংকালে মাঠে উইকেট-এর কাছাকাছি হওয়ার ব্যাপারটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, এবং এখন প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য যে এই জায়গার ফিল্ডারের নিজস্ব কৌশল দরকার এবং সেক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার নিঃসন্দেহেই এক বিরাট ভূমিকা আছে।

এদের যে যোগ্যতা প্রয়োজন, তার মধ্যে শারীরিক গঠন আর দ্রুত প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের ; বড় হাত আর এক সম্পদ, সেই সঙ্গে নাগাল (reach)।

দ্রুত প্রতিক্রয়ার ক্ষেত্রে সঠিক 'পর্যবেক্ষণ' (stance) আবশ্যক ।

(১) শারীরিক ভারসাম্য সামান্যভাবে দুই পায়ের ওপর থাকবে, পর্যাপ্ত পার্থক্যে। কিন্তু পা ফাঁক করে নয় ;

(২) দুই হাঁটুই সমকোণী ভঙ্গিতে ভাঙবে, এবং হাঁটুর উপর অনাবশ্যক চাপ এড়াতে 'সিট' (seat) বেশ খানিকটা নিচুতে ;

(৩) কোনো কোনো ক্লোজ-ইন-এর ফিল্ডার হাঁটুর ওপর বাহু (forearm) রেখে থাকেন, কিন্তু বল দেবার আগেই হাত এগিয়ে আনতে হবে স্বস্থানে। শরীরের ভার এখন দুই পায়ের গুলির ওপর এবং যে কোনো মুহূর্তে পাশে অথবা সামনে ঠেলে এগোতে পারে। শরীর নামানোর চেয়ে ওঠা সহজ এবং সাম্যের অংশ যত নিচে থাকবে, যতই ক্লোজ-ইন ফিল্ডারের চোখ বরাবর বল আসবে তত দেখার সুবিধে হবে ;

(৪) এঁরা অনেক তাড়াতাড়ি ওঠার চেষ্টা করেন, এদের কাছে প্রধান নিয়ম হচ্ছে ; নিচু হয়ে থাকুন এবং যতক্ষণ ব্যাট থেকে বল না বেরোচ্ছে নড়বেন না ;

(৫) সবশেষে, মাথা কিন্তু অনড় থাকবে, যাতে চোখের কাজে কোনো ব্যাঘাত না হয়—অর্থাৎ বল 'নজর' করার অনুকূলে থাকে। ফিল্ডারকে এই প্রত্যাশায় থাকতে হবে যে প্রতিটি বলই যেন তার দিকেই আসছে।

শর্ট-লেগ (Short leg):

ক্রিকেট-এ শর্ট-লেগ-এর অবস্থান নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। পেস-এর ওপরই নির্ভর করবে তা, বোলিং-এর প্রকৃতির ওপরও এবং ক্লোজ-ইন ফিল্ডারদের দ্বারা শক্তিশালী হচ্ছে কিনা। কিন্তু ডেপ্‌থে এক কথায় বলে দেওয়া যায় যে কাউকেই উইকেট-এর এত কাছে রাখা উচিত নয় যাতে পূর্ণাঙ্গ মার সে দেখতে না পায়। নিরাপত্তার এই যুক্তিসংগত ব্যবধান পাওয়ার পর, শর্ট লেগ এর কোনো খেলোয়াড়ই পেছনে ফিরবে না বা পেছোবে না।

শর্ট লেগ-এর ফিল্ডার, অন্য যে কোনো অবস্থানের ফিল্ডারের চেয়ে বল তাড়া করার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাড়াতাড়ি শুরু করে দৌড়তে হবে, বল ফেরত দিতে হবে দ্রুত, নির্ভুল ছোড়ায়। এই সঙ্গে তোলা ও ছোড়া হলে ভাল হয়। এতে রান-আউট নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ ব্যাটসম্যানরা লেগ-এর দিকে ছোট রান নেওয়ায় ভুল করেন। একইভাবে, দ্বিতীয় রান থেকেও বঞ্চিত করতে পারে।

কভার থেকে ফেরতের জন্যে উইকেটরক্ষককে সহায়তা করবে সে, এবং এটা সুসম্পন্ন করার জন্যে তাকে উইকেট-এর থেকে অন্তত দশ গজের মধ্যে থাকতে হবে।

পিছিয়ে-পড়া শর্ট লেগ আর লেগ স্লিপ-এর বেলায়ও ওই একই নীতি খাটে। আরও কঠিন জায়গা আছে, কারণ বল যেন 'মোড় ঘুরে' আসে—ফলে বলের লাইন অনুমান করা প্রায় অসম্ভব।

স্লিপ বা গালি (Slip or gully):

ক্লোজ লেগ-ফিল্ডারদের মতো এদের একটা বিশেষ স্থান আছে এবং এদের অনুশীলনে অভিজ্ঞতার কোনো বিকল্প নেই।

এদের যোগ্যতাও ওই একই– যেমনটি দরকার ক্লোজ-ইন লেগে।

স্লিপ এর সংখ্যা আর অবস্থান ব্যাপক হওয়া দরকার—উইকেট-এর পেস অনুযায়ী, বোলিং এবং বোলারের অবস্থানানুযায়ী।

গালির অবস্থান নির্ভর করবে সে প্রধানত ধারালো মার অথবা নির্ভেজাল 'কাট'-এর মোকাবিলা করতে চায়, যদি ব্যাটসম্যান সত্যিকার 'কাটার' (cutter) হয়, তাকে এক কি দু গজ ডিপ-এ দাঁড়াতে হবে।

বোঝাপড়া আছে, ফার্স্ট স্লিপ-এর লোক বল নজর করবে, সেকেণ্ড স্লিপ তা করবে কিনা নির্ভর করবে কতটা ফাইন (fine)-এ দাঁড়িয়ে আছে সে। যদি সে একেবারে বাইরে (wide) থাকে—তাহলে ব্যাট-এর বাইরের কোণ (edge) লক্ষ্য করতে হবে তাকে।

যদিও এটা এখন সর্বগ্রাহ্য যে দু'হাতেই ক্যাচ ধরতে হয়, কিন্তু এমন সময় আসে, স্লিপ আর গালির ফিল্ডারদের—একহাতে ডাইভ করতে হয় পাশে বা সামনে, ঠিকসময়ে বল ধরা বা থামানোর ক্ষেত্রে।

উইকেট-রক্ষণ (Wicket-keeping)

ক্রিকেট-এর মাঠে উইকেট রক্ষকের কাজটা অন্যান্য খেলোয়াড়দের তুলনায় দায়িত্বের দিক থেকে যেমন বেশি, তেমনই দুরূহও। অন্য যে কোনো ফিল্ডারের তুলনায় তার সুযোগ অনেক বেশি—ক্যাচ ধরা, রান-আউট বা স্টাম্প-আউট করা। ইনিংসের প্রতিটি বলই তার সুযোগ এনে দেবে—এই মনোভাব নিয়ে তাকে থাকতে হবে সর্বক্ষণ। এ ছাড়া উইকেট-এর পেছনে দাঁড়ানো মানুষটি তার দলের, তথা বোলারদের মনোবল জুগিয়ে চলেছে। তাই দল নির্বাচনে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব না করে সর্বশ্রেষ্ঠ উইকেট রক্ষককেই নির্বাচিত করা দরকার। উইকেটরক্ষকের যোগ্যতা মোটামুটি কাছাকাছি (near-in) ফিল্ডারদের মতই—চোখের তীক্ষ্ণতা ও প্রতিক্রিয়া, স্বাভাবিক সমন্বয় ক্ষমতা, এছাড়া শক্ত সবল হাত, সাহসিকতা—তাছাড়া মানসিক, শারীরিক স্থৈর্যও দরকার।

এটা মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছে ক্রিকেটে উইকেটরক্ষকেরা জন্মগত বৈশিষ্ট্য নিয়েই আসেন, তাদের তৈরি করা হয় না, খেলার অন্যান্যদের মত। কিন্তু এটা নিশ্চয় করে বলা যায়—এদের অনেক মহারথীই কৈশোর বয়সে উইকেট-রক্ষা করেন নি। তাই কোচ-এর উচিত উঠতি বয়সেই কোনো তরুণকে উইকেট-এ দাঁড় করানো। কোন তরুণ শিক্ষার্থী উইকেট-রক্ষক হিসেবে কাজ চালাতে পারবে কিনা তা জানতে বেশি সময় লাগে না, কিন্তু এই জায়গায় খেলতে গেলে যথেষ্ট দৃঢ়তা, অনুশীলন আর শিক্ষণ দরকার।

উইকেট-রক্ষকের প্রথম কাজ হলো ভালভাবে বল ধরা, ব্যাটসম্যান যেই থাকুক না কেন সামনে। এটা রপ্ত করতে সে কাউকে বল ছুঁড়ে দিতে বলতে পারে অনুশীলনে, ধরা যাক দশ থেকে পনেরো গজ দূর থেকে। কিন্তু প্রতিটি

বলের ওপরই তার সমান নজর থাকবে, হাত ও পায়ের যথাযথ ব্যবহার দরকার। একজন ব্যাটসম্যান থাকলে ভাল হয়, এ থেকে শিক্ষাটা ভাল হবে।

সরঞ্জাম (equipment) :

উইকেট-রক্ষকের কাছে প্যাড শুধু আত্মরক্ষার গৌণ উপায়। প্রাথমিক উপায়—তার হাতদুটির কাজ। এবং একথাও সত্যি প্রতিটি বল ধরা, ফিল্ডারের ছোড়া, বল নেওয়া, যত এলোমেলোই হোক, উইকেট-রক্ষকের কাজ। সেই কারণে হাতের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বের। গুরুতর জখম থেকে বাঁচতে একটা প্রোটেকটর বা অন্তর্বাস পরা উচিত তার।

গ্লাভ-এর ব্যাপারে খুব বেশি ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়, কারণ এই বস্তুটির গুরুত্ব অপরিসীম তার কাছে। 'শ্যাময়' চামড়ার একজোড়া অন্তর্দস্তানা পরা উচিত, যেটা খুব আঁটসাঁট হবে না, কিন্তু আরামপ্রদ হবে। অনেকে তাঁদের আঙুলে কাপড় বা ফিতে জড়িয়ে দেন, অন্তত ডান হাতের আঙুলে। অনেকে তাদের গ্লাভ-এর ওপরে কিছু ড্রেসিং করেন, অর্থাৎ কিছু মাখান সেগুলোকে আঠালো আর নরম রাখার জন্যে। নার্টস ঘুট তেল এসবে আদর্শ—গ্লাভ বা দস্তানাকে পিছল করে না।

অবস্থান (position) :

হয় একেবারে সামনে না হয় একেবারে পেছনে, মাঝামাঝি কোথাও দাঁড়াবেন না উইকেট-রক্ষক। মিডিয়ম পেস-এর বেশি গতির বা মিডিয়ম পেস-এর বলে পিছিয়ে দাঁড়াতে ইতস্তত করা উচিত নয় তাঁর, বিশেষ করে ফাস্ট পিচ-এ কোনোরকম কপট গর্ব বা লোক-দেখানো কায়দাও মুহূর্তের জন্যও তার মাথায় ঢোকা উচিত নয়।

কতটা পেছনে দাঁড়াবে সে নির্ভর করবে বোলারের পেস-এর ওপর, আর মাঠের পিচ-এর ওপরও। পিচ যত জীবন্ত হবে, বোলার যত ক্ষিপ্র হবে—ততই পেছনে সরবে উইকেট-রক্ষক।

স্টান্স (stance) :

উইকেট-রক্ষকের স্টান্স বা অবলোকনপর্ব মোটামুটি নিচের অবস্থানুযায়ী হবে। তাকে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যাতে বোঝা যায় :

(১) সে মোটামুটি আরামপ্রদ অবস্থায় আছে, এবং পরিশ্রমের ব্যাপারে আদৌ মাথা ঘামাচ্ছে না,

(২) সে বলটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে,

(৩) সামান্যতম শারীরিক আন্দোলনে বলটা সে নিতে পারবে,

(৪) উইকেট এর এত কাছে আছে সে, যে বল হাতে আসার পর, বিনা আয়াসে উইকেট নিতে পারে।

অধিকাংশ উইকেট রক্ষকই 'উবু' হয়ে বসার পক্ষপাতী, মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি হয়ে, দু'পায়ের ওপর সমান করে শরীরের ভার দিয়ে। পায়ের ফাঁকে দুই হাত থাকে, হাতের পেছন দিক মাটি ছুঁয়ে এইভাবে বসার সুবিধে এই যে পেশীর ওপর চাপ কমিয়ে দেয়, আর এই অবস্থায় বল দেখার সুযোগ সবচেয়ে বেশি।

বাঁ পা থাকবে মাঝের আর অফ স্টাম্পের পেছনে, ডান পা তার দু ফুট তফাতে সমান্তরাল। দুই পা-ই পিচ-এর মুখী হবে সরাসরি।

শরীর আর মাথা থাকবে অনড়, আর যতক্ষণ নামানো থাকে ততই সুবিধে, শুধু বল পিচ থেকে ওঠার মুহূর্তে উঠতে হবে। নামী উইকেট রক্ষকেরা তাঁদের খেলাকে সাদাসিধে দেখাবার চেষ্টা করেছেন, কখনো নিজেকে জাহির করার মত হঠকারিতা করেন নি।

শারীরিক আন্দোলনের স্বল্পতার দুটি কারণ: (১) তা বল পরিষ্কার দেখার কাজে সাহায্য করে, (২) পরিশ্রম লাঘব করে,

পা:

পা খুব কম নড়বে। আর একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে—শরীর, বলের যতটা সম্ভব ঠিক পেছনে আছে। অফ-এর বল ধরার সময়ে এটা মনে রাখতে হবে, ডান পা সব সময়েই এদের সমান্তরাল ঘুরবে, পেছন দিকে কখনোই নয়।

লেগ-এ বল নেওয়া উইকেট-রক্ষকের সবচেয়ে শক্ত কাজ, কারণ এজন্যে শুধু তাকে যে লাইনে আসার জন্যে এগোতে হয় তাই নয়, বলটাকে আবারও দেখতে হয় তাকে, বল ব্যাটসম্যানের শরীরের ফাঁকে অদৃশ্য হবার পর আত্মপ্রকাশ করলে পর। পেছোনোর প্রবণতা এবং পেরোনো অফ-এর চেয়ে লেগ-এর দিকটায় অনেকটা জোরালো, কিন্তু দুই-ই সমানভাবে রোখা দরকার। বল যদি 'বাইরে' (wide) যায় তাহলে দুই পা-ই নড়াতে হবে।

শরীর :

শরীরটাকে যতটা সম্ভব বলের লাইনে আনতে হবে। এর দুটো কারণ: (১) এতে বোঝা যাবে মাথা আর চোখ দুই-ই বল দেখার অবস্থায় আছে, আর (২) হাত দিয়ে যদি বল ধরা না যায়, তো শরীর দিয়ে তা আটকাতে হবে, আর, তা থেকে ওঠায় ক্যাচও ধরা যেতে পারে।

হাত :

দুটি ব্যাপারে হাতদুটো সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে; (১) বল যতক্ষণ না অত্যন্ত 'বাইরে' আসছে বা উঁচুতে উড়ে আসছে, তা ধরার জন্যে আঙুল সবসময়ে নিম্নমুখী থাকবে। কখনোই বলের দিকে করা থাকবে না আঙুল। খুব শক্ত থাকবে না, আলগা মুঠোয় থাকবে—যাতে বল না পড়ে যেতে পারে।

(২) বল-এর সঙ্গে হাতদুটো 'চলবে' অর্থাৎ বল হাতে পড়ার পর বেশ কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে আনতে হবে টেনে, এতে বল বাইরে লাফিয়ে পড়ার সম্ভাবনা যেমন কমে যায়, হাত জখম হবার ঝুঁকিও কম।

তরুণ শিক্ষার্থীকে এই বল 'চলার' পর সঙ্গে সঙ্গে উইকেট-এর ওপর আনার অভ্যেস করতে হবে, বল নিরাপদ এটাও দেখতে হবে তাকে। বল ব্যাটসম্যান খেললেও তাকে এই অভ্যেসটা রাখতে হবে।

মনোযোগ :

বিরামহীন মনোযোগই হলো উইকেট-রক্ষকের প্রথম ও প্রধান কাজ। এই সঙ্গে 'নজর' রাখা। এটাকে অভ্যেসে দাঁড় করাতে হবে, কিন্তু এজন্যে তাকে অহরহ পরিশ্রম চালাতে হবে।

উইকেট-রক্ষকের ভাবনা হবে একটাই—সব বলই তার কাছে আসতে পারে। এমন কি অত্যন্ত মনোরম ফুল পিচ-এর বল, যেটা ব্যাটসম্যানের ব্যাট এড়ায় না কখনো, তাও।

ব্যাটসম্যানের মতোই, তাকে বোলারের হাতের ওপর নজর রাখতে হবে, শুধু শূন্যেই নয়, পিচ থেকে ওঠার পরও। এটা করতে হলে তার মাথা থেকে আর সব কিছুই বের করে দিতে হবে। কোনো বাধাকেই বাধা বলে মনে করবে না। অন্যান্য ফিল্ডারদের চেয়ে ক্যাচ সে অনেক বেশি ফসকাবে, কারণ সে পাবেও বেশি; যা নিয়ে সমস্যা—তা হলো যুক্তিসংগত সুযোগের অনুপাত কতখানি গ্রাহ্য তার কাছে।

স্টাম্পিং (Stumping) :

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্টাম্প করার সুযোগ হারাতে হয় নিচের এক বা একাধিক কারণে :—

(১) ব্যাটের দিকে তাকিয়ে থাকার দরুন, বল ব্যাট-এ লাগবে ভেবে,

(২) বল নেওয়ার আগেই চোখ তুলে,

(৩) বল কেড়ে নেওয়ার জন্যে এগোনোতে।

বল স্টাম্পে লাগবেই না এমন কোনো প্রত্যাশা থেকে শিক্ষার্থীর মন মুক্ত হওয়া উচিত নইলে উপরোক্ত শেষ দুটি দোষে দুষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। বল যদি সঠিকভাবে নিতে পারে তাহলে উইকেট নেওয়াও গতানুগতিক হয়।

একইসঙ্গে ব্যাটসম্যান আর বল নজর করা অসম্ভব, বলটাই আসলে দেখার।

অভিজ্ঞতাই বলে দেবে কি বলে আর কি মার-এ স্টাম্প করার সুযোগ আসবে, কখনো দেখা যাবে যে রক্ষক উইকেট বল ছুঁইয়েছে, অথচ ব্যাটসম্যান এক-চুল নড়ে নি! এক্ষেত্রে কিন্তু আবেদন করার চেষ্টা না করাই ভাল।

ফিল্ডারদের কাছ থেকে বল ফেরত নেওয়ার দক্ষতা আর ক্ষিপ্রতাই শেষ কথা নয়। রান আউট নেবার ক্ষেত্রে, দলের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং ব্যাটসম্যানকে ছোট রান নেওয়া থেকেও বিরত করবে উইকেট-রক্ষক।

স্টাম্পের ঠিক পেছনে, অত্যন্ত কাছেই থাকবে উইকেট-রক্ষক বল যে পথে আসবে সেই দিকে তাকিয়ে এটা করতে হলে, যদি সে পিছিয়ে দাঁড়ায়, অত্যন্ত দ্রুত বেরোতে হবে তাকে নিজের জায়গা থেকে।

ফিল্ডারের কাছ থেকে বল নেওয়ার ধরণটা বোলারের কাছ থেকে আসার মতই হবে। ছোঁড়া যত অপটুই হোক না কেন, বল হাতে নেওয়ার চেষ্টাই করতে হবে রক্ষককে—প্যাডে না থামাবার চেষ্টা করে।

স্টাম্পিংয়ের মতই, রান আউট-এর বেলায়ও, বলের ওপরই থাকবে মনোযোগ তার, ছুটন্ত ব্যাটসম্যানের ওপর নয়।

উইকেট-এর পেছনে তার উপস্থিতি হবে জীবন্ত, অর্থাৎ গোটা দলটাই যেন সহযোগিতা করে তার সঙ্গে। ফিল্ডারদের নির্ভুলভাবে বল ছুঁড়তে উৎসাহ জোগাবে সে, আশাও করবে। এতে ক্ষিপ্রতাও বজায় থাকবে তার, ফিল্ডার-দের নাগাল দেবে—ব্যাটসম্যানকে ভাবাবে।

উইকেট-এর কাছাকাছি যদি কোনো বল শূন্যে ওঠে -উইকেট-রক্ষক

কোনো দ্বিধা না করেই 'আমার' বলে চিৎকার করে ক্যাচ নেবার চেষ্টা করবে, অবশ্যই অধিনায়ক যদি নাও নাম ধরে ডাকেন তার। এভাবেই চলবে তার এই অভ্যেস।

বোলার নির্ভুলভাবে বল ছুঁড়ে দিতে শিখতে হবে তাকে, বা হাত ঘুরিয়ে (relay) কোনো নির্ভরশীল ফিল্ডারের মারফত। বোলারকে ঝুঁকতে দেওয়া অপরাধ।

যদি কোনো সময়ে তার শরীরে সত্যি ক্ষতের সৃষ্টি হয়, অনাবশ্যক জায়গা জুড়ে থাকার চেষ্টা না করে উইকেট থেকে সরে আসতে হবে তাকে।

সবশেষে, উইকেট-রক্ষকের শারীরিক যোগ্যতা অটুট থাকতে হবে, না হলে সারাটা দিন মাঠে একাগ্রতার সঙ্গে নজর রাখতে বা মনোযোগ দিতে পারবে না, যেটা তার দলের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

অধিনায়কত্ব (Captaincy)

ক্রিকেট সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে অধিনায়কত্বের কথা আসবেই। ভালো অধিনায়ক পাওয়া ভাগ্যের কথা ক্রিকেটে। খুব কম দলের ক্ষেত্রেই তা জোটে। তবে উপযুক্ত নায়ক না পেলেও দল ভালো ফল করতে পারে। সেটা নির্ভর করে খেলোয়ারদের ক্রীড়াদক্ষতায়। একথাগুলো বলতে হচ্ছে এই কারণে, যে ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে গেলে আগেই প্রশ্ন আসে—কে অধিনায়কত্ব করেছে দলের, কোচ (coach) কে? শুধু ক্রিকেট কেন সব খেলাতেই নায়ক ক্যাপটেন বা অধিনায়ক। অধিনায়কদের ক্ষেত্রে তিনটে ব্যাপার দরকার :

১। খেলা সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান,

২। ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ তার দলের লোকেরা প্রয়োজনে তার সব কথা শুনবে,

৩। আক্রমণ-পদ্ধতিতে খেলা চালাবার ক্ষমতা।

খেলা শুরুর, অর্থাৎ প্রথম বলটি বোলারের হাত থেকে ছোড়ার অনেক আগেই শুরু তার দায়িত্বের। যারা মাঠ রক্ষা করবে তাদের নিয়ে শুরু তার কাজের। এরপর কারা ক্রমানুযায়ী ব্যাট ধরবে তাদের উপদেশ দান। অনেকের ধারণা, প্রথম জুটি বিপরীত কম্বিকেশনের হওয়া দরকার—অর্থাৎ একজন হবেন ন্যাটা, অন্যজন স্বাভাবিক ব্যাটস্‌ম্যান। এতে নাকি বোলারদের

বিপর্যস্ত করা অনেক সহজ হয়। ফিল্ডারদেরও দৌড়াদৌড়ি বাড়ে। কিন্তু এখানেও বিবেচনার প্রশ্ন ওঠে, শুধুমাত্র ন্যাটা বলেই কাউকে প্রথমে ব্যাট করতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা।

এরপর টসে জেতার ব্যাপার আছে। টসে জেতার পর মাঠের পিচ দেখে নেন না এমন অধিনায়ক বিরল। কিন্তু তাতে ভুলও হয়েছে অনেকের। এমন দৃষ্টান্ত ঘটেছে অনেকগুলো টেস্ট পর্যায়ের খেলায়। বেশির ভাগ মানুষই পিচের অবস্থা খারাপ দেখে তাদের আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন, ব্যতিক্রম শুধু লিণ্ডওয়াল, যিনি বলেছেন—'আমি অপেক্ষা করে দেখবো, কারণ এর আগে যে সব পিচ আমার ধারণায় অত্যন্ত অনুপযোগী মনে হয়েছে, সেগুলোই সর্বোৎকৃষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছে।'

খেলা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে অধিনায়কের একমাত্র দায়িত্ব—তার দলের লোকগুলোকে মাঠের বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করানো। বোলার পরিবর্তন করা। ব্যাটসম্যানদের খেলার ত্রুটি দেখা। উইকেটেও চোখ রাখা—তার চরিত্রের (character) পরিবর্তন হচ্ছে কি না বোঝা। দলে অভিজ্ঞ বোলার থাকলে অধিনায়কের দুশ্চিন্তা অনেকাংশে কমে। কারণ তারা অধিনায়কের আগেই ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা ধরে ফেলে। মাঠে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজনে সর্বদা বোলারদের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। নবীন কোনো বোলার দিয়ে ইনিংস শুরু করলে তার দুশ্চিন্তা বাড়বে, কারণ সে চায় ম্যাচ কবজা করতে, প্রচণ্ড উৎসাহে শুরু করে খেলা। এ অবস্থায় অধিনায়কের দায়িত্ব নবীন খেলোয়াড়টির মনোকষ্ট না বাড়িয়ে তাকে কৌশলে সরিয়ে নেওয়া। এরপরও আছে, কোনো অভিজ্ঞ বোলারকে তার সাধ্যের বাইরে বল দিতে না দেওয়া।

ফাস্ট বোলারদের নিয়ে হঠাৎ উইকেট নেওয়া যায়—ম্যাচ সব সময় জেতা যায় না। সেক্ষেত্রে চাই স্লো বোলার।

অবশ্য, আন্তর্জাতিক কোনো দলের অধিনায়কত্ব করার সৌভাগ্য কম মানুষের ভাগ্যেই জোটে।

যে সমস্ত গুণের অধিকারী হলে একজন দক্ষ অধিনায়ক হওয়া যায় তাহলে তাকে শুধু অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধিকারী হলেই চলবে না, তার ব্যক্তিগত জীবনের খতিয়ানও গুরুত্বের। অধিনায়ক নিজে নানান দোষের শিকার জানলে দলের খেলোয়াড়রা সুযোগ নেন। অধিনায়কের নির্দেশ কানে তোলা প্রয়োজন মনে করেন না দলের ছেলেরা। দক্ষ অধিনায়ককে যোদ্ধাও হতে হবে।

আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, কিন্তু উদ্ধত নয়। দৃঢ়চেতা কিন্তু অনমনীয় নয়—শান্তভাবে সমালোচনার মুখোমুখি হবার মত মানসিকতা থাকা দরকার।

কোনো ক্রিকেট দল নির্বাচনের ব্যাপারটা ব্যক্তিবিশেষের ওপর ছেড়ে না দিয়ে নির্বাচনী কমিটির মাধ্যমে আসার দরকার। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়দের মনের পরিবর্তনও ঘটেছে—টেলিভিশনের আনুকূল্যে তাদের আত্মবোধও বেড়ে থাকতে পারে, কেননা সে পরে নিজের খেলা দেখতে পারে।

কোনো খ্যাতিমান অধিনায়কের যে তার দলের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হতে হবে তার কোনো মানে নেই। তবে, দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষমতা অবশ্যই থাকা চাই তাঁর। ইংল্যাণ্ডের এক কাউন্টি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক একথা বলেছেন—'যে দল এক নম্বরে থাকবে না সে দলের সম্পর্কে পাবলিকের কোনো উৎসাহ নেই'। কথাটা পুরোপুরি না হলেও অংশত সত্যি—কারণ যে কোনো দলের উদ্দেশ্য থাকবে সর্বজয়ী হওয়া, ড্র করে মুখরক্ষা না করা। ব্র্যাডম্যান সব সময়েই জেতার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামতেন এবং কদাচিত তার ব্যতিক্রম হয়েছে। ক্রিকেটে প্রথম জুটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলেন। ব্র্যাডম্যানের ধারণা এ খেলা সব সময়ে কার্যকরী হয় না—বরং ওদের একজন তাড়ু ব্যাটের হলে খেলার গতি বাড়ে।

অধিনায়ক তাঁর দলের সকলের সঙ্গে খেলার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করবেন, ব্যাপক আলোচনা। তবে সেটা খেলার দিন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হলেও খেলার বেগ কিছুটা আসে। নেট প্র্যাকটিসেই এর সুযোগ পর্যাপ্ত। ব্যাডম্যানের পরামর্শ হলো—অধিনায়কের পক্ষে ক্রিকেটের নিয়মকানুন কণ্ঠস্থ রাখা দরকার। তিনি নিজে আম্পায়ারশিপ পরীক্ষা দেন ও পাস করেন। শুধু আইনকানুনই নয়, অধিনায়ককে উৎসাহী পাঠকও হতে হবে। দেশ বিদেশের লেখা পড়তে হবে—অবশ্যই ক্রিকেট সম্বন্ধীয়।

দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ নায়কেরা এটাকে অবশ্যকর্তব্য মনে করেন না, ফলে তাঁরা পরাজিতের দলেই থেকে যান। অনেককেই বলতে শোনা যায়—'ক্রিকেটের আইনকানুন নিয়ে মাথা ঘামানোর লোক তো রয়েছেই—আমরা মাথা খুঁড়ে মরি কেন তা নিয়ে!'

এবার টসের ব্যাপারে আসা যাক। টসে জিতলেই কি ব্যাট করতে হবে? করলেই ভাল হয়, বিশেষ টেস্ট খেলাতে। কারণ প্রথম দিনের পিচ ভাল অবস্থাতে থাকে। কাউন্টি খেলাতে কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে, যেহেতু পয়েন্টের প্রশ্ন থাকে।

ধরা যাক যে দল টসে জিতেছে তাদের বোলিংয়ের দিকটা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং জেতার সম্ভাবনাও বেশি। সেক্ষেত্রে অধিনায়ক তার বিপক্ষ দলকে একটা সুযোগ দিতে পারেন ব্যাটিংয়ের। তবে, উইকেটের অবস্থা কি থাকবে ক'দিন, আগে থেকে বোঝা মুস্কিল, তাই মাটির অবস্থা বিচার করা দরকার সবার আগে। ঘাসের অবস্থাও বিবেচ্য। পিচের আর্দ্রতাও দেখা দরকার। দিনের অবস্থাও বিবেচ্য (দিনটা গরম নাকি মেঘাচ্ছন্ন বা স্যাঁতসেঁতে)। প্রকৃতির তো আবার ঘন ঘন মন বদলানোর দুর্নাম আছে।

এরকম নজিরও আছে যে এক অধিনায়ক টসে জিতে বিপক্ষকে ব্যাট করার সুযোগ দিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। অবশ্য অপরিণত বয়সের ছিলেন এই নায়ক। পরবর্তীকালে এটা শুধরে নিয়েছেন তিনি। ইংল্যাণ্ডের সেই দুর্ভাগা অধিনায়কের কথা মনে আছে কি পাঠকের? লীডসের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে ব্যাট করতে দিয়েছিলেন তিনি টসে জিতে। ফল কি হলো? বার্ডসলে প্রথম বলেই গেলেন। ম্যাকার্টনি পঞ্চম বলে ক্যাচ তুলে দিলেও সেটা পড়ে যায় এবং লাঞ্চের আগে প্রায় সেঞ্চুরি করার অবস্থা করে তুললেন তিনি। অধিনায়ক পড়লেন মহা ফাঁপড়ে।

কিন্তু ক্যাচটা যদি না ফসকাতো? তাহলে কি হিরো হয়ে যেতেন না অধিনায়কটি? দেখা গেল, সিদ্ধান্ততে কিছু যায় আসে না—ফলাফলের ওপরই নির্ভর করে সব।

এবার বলের কথা। নতুন বল নেওয়া হবে কখন? অধিনায়কের অন্যতম সমস্যা এটা। বিকেলে, খেলার শেষ অবস্থায় ফাস্ট বোলাররা ক্লান্ত ও দুটি খেলোয়াড়ের হাত জমে গেছে। কি করবেন নায়ক? পরের দিনের অপেক্ষা করবেন কি, নাকি করা উচিত?

ব্যাটিংয়ের কথা বলতে গেলে তারও একটা সুষ্ঠু ক্রম থাকা উচিত। অর্থাৎ যাঁরা প্রথম জুটি হিসেবে নামবেন তাঁদের সবসময়েই ওপেনার হিসেবেই নামানো দরকার। তারপর তিন নম্বর, চার নম্বর···ইত্যাদি। এর ব্যতিক্রম আর কারু পক্ষে ক্ষতিকর কি না জানি না—খেলোয়াড়ের কাছে অস্বস্তিকর নিশ্চয়ই। কারণ জুটি হিসেবে যাঁরা নামেন তাঁদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যায়। রান তোলার ব্যাপারে কে কিভাবে দৌড়বেন তারও সমঝোতা হয়ে থাকে—সেটা নষ্ট হয়। ক্রমানুযায়ী দল সাজানোতে আর একটা সুবিধে হয়, পঞ্চম খেলোয়াড়টি ন্যাটা হতে পারেন।

প্রথম জুটি বা ওপনাররা দুজনই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলবেন কি না সেটা তর্কসাপেক্ষ, কিন্তু ওঁদের একজন অন্তত তাড়ু খেলোয়াড় হতে পারেন। ব্র্যাডম্যান সাহেবের মত হচ্ছে তিন নম্বর খেলোয়াড়টি আক্রমণাত্মক হোক। কিন্তু এত আগে থেকে রক্ষণাত্মক খেলাও কাজের নয়। ড্র করার দিকেই যায় গোটা ব্যাপারটা। এরপর আছে সময়ের অপচয়। একজন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে ক্রীজ ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত পরবর্তী ব্যাটসম্যান মাঠে ঢোকেন না। সময় অবশ্য নির্দিষ্ট আছে এর জন্যে, কিন্তু বিচক্ষণ কোনো অধিনায়ক অবশ্যই এই সময়ের অপচয় চাইবেন না। এতে দর্শকদের বিরক্তিরও লাঘব হয়।

এখন আলোচ্য, কোনো অধিনায়ক কি ম্যাচ দীর্ঘায়িত করবেন? এতে ফল ভাল হয় কি? একটা ফল পাওয়া যায়—অভিজ্ঞ বোলারদের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেওয়া যায়।

ইনিংস শেষ করার প্রশ্নটাও যথেষ্ট সমস্যার। এক্ষেত্রে দুটি দলের দক্ষতার প্রশ্ন আছে, সময়ের তালের সঙ্গে উইকেটের অবস্থা কি দাঁড়াবে তাও বিবেচ্য।

অন্তত একটি ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারে খেলা শেষ করতে দেরি করায়। ইংল্যাণ্ডের রান তোলার প্রচণ্ড প্রয়োজন ছিল এবং অধিনায়ক খেলা শেষ করতে দেওয়ার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু যে কটা অতিরিক্ত রান সংগৃহীত হলো শেষ আধ ঘণ্টায় তা কোনো কাজে লাগলো না।

বেশির ভাগ অধিনায়কই তাঁদের ফাস্ট বোলারদের অতি মাত্রায় খাটান খেলার গোড়া থেকেই, এবং তাঁদের বাকি দিনের জন্যে বসে যেতে হয়। চতুর অধিনায়ক কিন্তু ঘড়ি ধরে তাঁদের বদলি করেন, দ্রুত উইকেট নেওয়া সত্ত্বেও। বোলার বদল করা যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচায়ক—কারণ এতে ব্যাটসম্যানের অস্বস্তি বাড়ে। নতুন বোলারের পেস, ফ্লাইট ইত্যাদির সঙ্গে রপ্ত হতে সময় চলে যায়।

অধিনায়কত্বের আর এক বড় গুণ হচ্ছে ব্যাটসম্যানের দুর্বলতা ধরা। কোনো কোনো ব্যাটসম্যানের একটা নির্দিষ্ট দিকে বল মারার প্রবণতা থাকে, ফলে সেখানে ফিল্ডিং জোরদার করতে হয়।

নতুন বোলারের ভবিষ্যৎও নির্ভর করে ব্যাটসম্যানের ব্যাটিংয়ের ওপর। ক্রমাগত ছক্কা আর চারের মার চললে বোলার স্বভাবতই নিরাশ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে অধিনায়কের দায়িত্ব আছে—সঙ্গে সঙ্গে বোলারটিকে তুলে নেওয়া।

খেলা চলাকালীন অধিনায়ক তার দলের ছেলেদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

চালাতে পারেন, তাতে উপকারই হবে। বোলার আর উইকেট রক্ষকের প্রস্তাবাবলী কার্যকর হতে পারে এক্ষেত্রে।

স্যার ফেডরিক টুলের উক্তি উদ্ধৃত করলে জানা যায়, ক্রিকেট হল একধরনের বিজ্ঞান, সারা জীবনের শিক্ষার ব্যাপার—যাতে তুমি শেষ হয়ে যেতে পার, কিন্তু তোমার জানার বিষয় থাকবে অশেষ।

ব্র্যাডম্যানের অভিমতও এই যে, এমন কোনো খেলা আর নেই দুনিয়ায়, যাতে অধিনায়কের মনের ওপর এত চাপ সৃষ্টি করে, জাহাজের ক্যাপটেনের মতই তাকেও হাল ধরতে হবে—নিতে হবে দায়িত্ব।

কোচিং (Coaching)

উনিশশো বাহান্ন-তিপ্পান্নতে এডিলেডে দক্ষিণ আফ্রিকার দলটি যখন অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম খেলতে আসে, ডন ব্র্যাডম্যানকে তাদের ব্যাটিং সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এরা দক্ষিণ আফ্রিকার দল যদি না জানতাম, তাহলে নির্দ্বিধায় বলে দিতাম এরা ইংল্যাণ্ডের কোনো দল, এদের স্টাইলগুলোর এতো মিল।'

এর কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজ কোচদের প্রভাব। সেই সঙ্গে ব্র্যাডম্যান এ মন্তব্য করতেও ভোলেন নি অস্ট্রেলীয়দের ব্যাটিংয়ের কায়দা কৌশলে মৌলিকতা আছে।

তবু, ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কোনো খেলায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ দর্শকও বলে দিতে পারবেন না কারা কোন দল, বলে না দিলে।

হয়তো খেলার পরিবেশে মিল থাকতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে কোচিংয়ের। বেশিরভাগ ইংরেজই খুবই কম বয়স থেকে কোচিং পায়। এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যায় ইংরেজ কোচরা প্রাক্তন-পেশাদার মানুষ এবং পেশার প্রথম স্তরে কোচিং পেয়েছেন।

অস্ট্রেলীয়রা কিন্তু সে সৌভাগ্য থেকে তুলনামূলকভাবে বঞ্চিত আর কোচিংয়ের সুযোগ যদি পেয়েও থাকে কেউ তা সে দলেরই কারো কাছ থেকে।

এতে ফল এই হয় যে খেলোয়াড়দের সহজাত প্রবণতা দেখা যায় খেলায়, গোঁড়ামির ব্যাপারটা কম।

অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ক্রীড়া-শিক্ষক নেই, বা যাঁরা আছেন তাঁদেরও অসাধারণ কোনো জ্ঞান নেয় এই খেলায়।

ইদানীং অনেকগুলো অস্ট্রেলীয় সংস্থা অবশ্য এর উন্নতিবিধানে কৃতসংকল্প হয়েছেন। যেমন, ফিল্মের মাধ্যমে শিক্ষণ, স্কুলের ছেলেদের জন্যে ক্লিনিক স্থাপন, বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রচলন, ইত্যাদি।

ইংল্যাণ্ডের মত পেশাদারী ক্রিকেটের অনুশীলন অস্ট্রেলিয়াতে কখনোই দেখা যায় না।

দু-একজন ছাড়া অধিকাংশ অস্ট্রেলীয় খেলোয়াড় পেশাগত দিক দিয়ে কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত, কেউ ব্যাঙ্কের করণিক, কেউ বা এজেন্ট, কেউ আবার ইলেক্‌ট্রিসিয়ান। ইংরেজদের ক্ষেত্রে এর সংখ্যা অনেক কম। তাছাড়া, যেহেতু খেলোয়াড়ের চাকরিতে বেশি সময় দিচ্ছেন, বা কাজে নিষ্ঠা অনেক বেশি তাঁদের, উন্নতির ব্যাপারেও তাদের অগ্রাধিকার।

ব্রাডম্যান বাল্যাবস্থায় কোনো কোচিং পান নি। তাকে শেখাবার কেউ ছিল না, সুযোগ-সুবিধেও ছিল না তেমন। কাজেই কেউ আন্তর্জাতিক খ্যাতির খেলোয়াড় হতেও পারে কোচিং ছাড়াই। স্বাভাবিক দক্ষতা, সেই সঙ্গে সুযোগ যে কোনো মানুষকে খ্যাতিমান করতে পারে।

তবু ব্র্যাডম্যান বলেছেন—কোচিংয়ের প্রয়োজন আছে, যদি তা অবশ্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে চলে। কোনো কোনো কোচ খেলোয়াড়ের স্বাভাবিক প্রবণতার রূপান্তর ঘটাতে চেষ্টা করেন, যেমন—কোনো বোলার তার নিজস্ব ভঙ্গিতে যদি লেগ-ব্রেক দিতে পারেন, তাঁকে তাঁর ভঙ্গি পাণ্টাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করার মধ্যে কোনো যুক্তি নেই। মৌলিকতা দাবিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় সর্বনাশ ডেকে আন্‌তে পারে। ব্র্যাডম্যানের মতে সেরা বোলার ও'রিলী। তাঁর বল ধরার কায়দা নিঃসন্দেহেই কোনো কোচের মনঃপুত হতো না, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—ও'রিলীকে তাঁর ভঙ্গিতেই খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

কোচদের বোঝা উচিত কোথায় খেলোয়াড়দের সংশোধনের প্রয়োজন আছে, কখন নেই। তবে বাড়াবাড়ি একেবারে চলবে না। ডেনিস কম্পটন এই প্রসঙ্গে বলেছেন—কোনো তরুণের ভাল চোখ আছে অথচ তার মারগুলো আধুনিক নয়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তাকে তার নিজস্ব ভঙ্গি থেকে বিরত করা ভুল। এতে তার স্বাভাবিক খেলা নষ্ট হবে, দর্শকেরাও আনন্দ পাবেন না।

ব্র্যাডম্যান আরও বলেছেন—আক্রমণাত্মক খেলারই পক্ষপাতী তিনি। যদি সোজা ব্যাটের প্রাথমিক ভিত্তি রক্ষণাত্মক খেলা। খ্যাতিমান ব্যাটসম্যান যাঁরা তাঁদের নিজস্ব ভঙ্গিতেই খেলে গেছেন তাঁদের কথা ভাবুন; স্টাইলের

প্রতীক স্যার লেন (লিওনার্ড) হাটন আর স্যর জ্যাক হবস-এর কথা ভাবুন (অথচ শুনে অবাক হবেন জ্যাক হবস কোচ ছাড়াই খেলা শিখেছেন)। কিন্তু ডেনিস কম্পটন, বিল পন্সফোর্ড বা ওই গোত্রীয়দের কথা ধরুন ; তাঁরা তাঁদের বিচারবুদ্ধি আর আনুষঙ্গিকের পরিবর্তনের জন্যে সদা প্রস্তুত ছিলেন।

তাহলে, কোনো বাঁধাধরা নিয়ম করা সম্ভব নয়। ব্র্যাডম্যানের কথা পুনরাবৃত্ত করি—দক্ষ কোচিং হলে কাজ হবে।

খারাপ মাঠ (উইকেট) কোচিংয়ের অন্তরায়। অনেক খেলোয়াড়েরই মুখ চোখ ভেঙেছে অসমান পিচে অনুশীলন করতে গিয়ে।

ক্রিকেটের জনক ডবলিউ জে গ্রেসের মত : খারাপ পিচে কখনো ভাল খেলোয়াড় তৈরি করা যায় না।

ব্র্যাডম্যান নিজে অনুশীলন করেছেন কংক্রীটের পিচে। ছোবড়া বা মাদুরের (mat) আবরণে। ভাল পিচের কোনো বিকল্প নেই। তবে অল্প-বয়সী ছেলেদের মার সেখানোর প্রয়োজনে বলের গতিতে সমতা থাকা দরকার।

কোনো কোনো পিচে আবার রবার বা বিটুমেন (বা অনুরূপ কিছু) বেশ খানিকটা কার্যকরী। কারণ জল দেওয়ার দরকার নেই, নেই রোলারের। রক্ষণাবেক্ষণের খরচ নামমাত্র।

ভিজে উইকেটে নাকি অস্ট্রেলীয়রা সুবিধে করতে পারে না, ফলে অস্ট্রেলিয়াতে ভিজে উইকেটে অনুশীলন দরকার বলে অনেকে সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু এই ধারণার প্রবক্তা যিনিই হোন না, এই ধরনের পিচে ব্যাট করার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই তার। ইংল্যাণ্ডে ভিজে উইকেট মানেই অচল মাঠ নয়। বস্তুত, এমন উইকেট কিছু বৃষ্টির পর যথেষ্ট উন্নতমানের হয়।

বিপত্তি ঘটে ইংল্যাণ্ডের পিচে, বল ঘোরে, কিন্তু আস্তে। উঠবেও, কিন্তু তেমন বিপদজনকভাবে নয়। এ ধরনের ব্যাপার অস্ট্রেলিয়ায় চলবে না। ওখানে ঠিক এর উল্টোটা হবে, বল দ্রুত ঘুরবে এবং আচমকা উঠে যাবে।

বিচক্ষণ কোচদের আর একটা ব্যাপার সম্পর্কে সজাগ থাকা দরকার, সেটা হচ্ছে নেট প্র্যাকটিসের সময় অহেতুক নেটের বাইরে বল মারার প্রবণতা। অধিকাংশ খেলোয়াড়ই এটা করেন। তাঁদের স্মরণ থাকা দরকার অনুশীলনের ব্যাপাবটা বল পেটানোর জায়গা নয়, নিজেকে তৈরি করার জায়গা।

কোচের আর এক কাজ কিশোর খেলোয়াড়দের সহজাত প্রবৃত্তিকে দাবিয়ে না দেওয়া। তাদের যান্ত্রিক করে তোলা উচিত নয়।

ব্র্যাডম্যান নেট প্র্যাকটিসে এমন খারাপ কিছু ঘটনার দর্শক হয়েছেন। একটা মনোরম পুল (pull) মার মারার পরপরই কোচের নির্দেশ আসে নিষেধের। কারণ ছেলেটি অফ স্টাম্পের বাইরের বল অন-এ খেলেছিল। এতে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তরুণটির মনে?

আর একটি কিশোর হয়তো পা ফাঁক করে দাঁড়ানো অভ্যেস করেছে উইকেটে, তাকে পা জোড় করে দাঁড়াবার নির্দেশ দেওয়া হলো! আরও আছে—এমন কোচও আছেন, যাঁর নির্দেশ হচ্ছে বল সামনের পা পার হলেই তবে ব্যাট চলবে। ব্যাডম্যান বলছেন কোনো কোচ নিজে এটা করে দেখিয়ে দেন তো ভাল হয়, কারণ উনি নিজে তা পারবেন না।

একগাদা নির্দেশাবলীর ভারে কোনো তরুণ খেলোয়াড়ের মাথা ভারী করা উচিত নয়। ফল, গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশ মাথায় না নিয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের নির্দেশগুলো মাথায় ঢুকে যায়। শিক্ষার্থীদেরও কর্তব্য আছে কিছু—তা হচ্ছে একজন মানুষ যাই বলুক তা বেদবাক্য বলে মেনে না নিয়ে, খেলার মধ্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

নিজেই আপনি নিজের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। সবকিছু ভাল করে বিশ্লেষণ করুন—কি করলে সুবিধে হয় বুঝুন, অনুশীলন করুন, দেখুন।

দুনিয়ার কোনো কোচই আপনাকে দক্ষতা বা বিচার ক্ষমতা দিতে পারবেন না, শুধু কি করতে হবে বা কেমন করে তা করা দরকার বলে দেবেন তিনি। বাস্তবে তা রূপায়িত করার মালিক আপনি স্বয়ং।

নিউজিল্যাণ্ডের প্রখ্যাত ন্যাটা ব্যাটসম্যান মার্টিন ডোনেলি প্রথম ইংল্যাণ্ডে গেলেন সদলবলে, বোটে বসেই তাঁরা আগামী খেলার ছক আঁকলেন বারবার।

খেলা শুরু হলো, দলের অবস্থা সুবিধের নয় দেখে ওদের কোচ খেলার ফাঁকে খেলোয়াড়দের ডেকে বললেন, 'আমি সবই শুনেছি, বাড়ি ছাড়ার পর থেকেই তোমাদের পরিকল্পনার সবই—এখন নাও তো, নেটে যাও সব—আর দোহাই তোমাদের বলটা দেখে মার শুধু—'।

অস্ট্রেলিয়ায়, ভাল কোচের অভাব আজও আছে। আছে আর্থিক অসচ্ছলতা। এই প্রসঙ্গে ব্র্যাডম্যান জানাচ্ছেন, ত্রিনিদাদ সরকারের একটা ঘোষণার কথায় বড় আনন্দ পেয়েছি, সরকার একটা খেলার প্রাঙ্গণ ও ক্রিকেট কোচের জন্যে সাধারণ রাজস্ব থেকে মোটামুটি টাকা সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত

নিয়েছেন। কোনো ইংরেজীভাষী সম্প্রদায়ের কাছে ক্রিকেট খেলার গুরুত্ব কতখানি এতেই বোঝা যায়। হয়তো, সিরিল মেরী ও লিয়ারি কন্স্ট্যানণ্টাইন-এর মত মানুষের সরকারে উপস্থিতি এর ব্যাখ্যা দিতে পারে।

ত্রিনিদাদের এই আদর্শ অন্যান্য দেশের নেওয়াতে আপত্তি থাকতে পারে না।

আম্পায়ার (Umpireship)

যে সমস্ত কাজে প্রশংসা কমই জোটে আম্পায়ারের কাজ তাদের অন্যতম। এঁদের জন্যে আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে—কথাগুলো এককালের—সর্বকালেরই সেরা ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যানের।

অর্থপ্রাপ্তি প্রায় শূন্যের কোঠায়। গৌরব কদাচিত, কিন্তু কোনো ভুল সিদ্ধান্তে—দুনিয়া তোলপাড়। সিদ্ধান্ত ভুলভ্রান্তি না হলেও চলবে—ঘোষণায় তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে—কাদের ঘোষণায়? অনুমান করে নিন বাকিটুকু ...

'এক টেস্ট খেলায় আম্পায়ার এল. বি. ডব্লিউ দেন এক ব্যাটসম্যানকে। ব্যাপারটা আমার চোখের ওপরই ঘটেছে—কারণ মিড-অন-এ ফিল্ড করছি আমি।' ব্র্যাডম্যানেরই বক্তব্য। এক সাংবাদিক 'নট আউট' দিয়ে বসলেন! কিন্তু যে কোনো মানুষই—যারা ক্রিকেট খেলে, বা তার নিয়মকানুন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তারা এটাকে নির্ভেজাল 'আউট' বলে মেনে নেবে।

যে সমস্ত অবস্থার মুখোমুখি হতে হয় মানুষগুলোর, তাতে মেজাজ ঠিক রাখা সত্যিই যথেষ্ট সংযমের পরিচায়ক। নানান ধরনের বায়নাক্কা আর ছোট খাটো বিরক্তিকর পরিস্থিতিতেও ওঁরা ভাবলেশহীন।

অথচ প্রতিটি বলের ওপর নজর রাখতে হচ্ছে আম্পায়ারকে—কি নিদারুণ একাগ্রতার নিদর্শন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রিকেটের মাঠে থাকা খেলোয়াড়দের পক্ষে অবশ্যই ক্লান্তিকর, কিন্তু ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখাও কম কষ্টকর নয়।

গলফ-এর লিঙ্ক-এ ঘণ্টা দুয়েক ঘুরলেই পিঠে ব্যথা শুরু হয়ে যাবে। না হলেই বিস্ময়।

কিন্তু এইসব আম্পায়ারেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাঠে কাটাচ্ছেন—দিনের পর দিন। শারীরিক দিক এটা নিঃসন্দেহেই কষ্টকর, আর বড় খেলা হলে তো কথাই নেই। সেখানে বাড়তি ব্যাপারটাও আছে—মানসিক চাপ।

শুধু তাই নয়, মুহূর্তে প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। এডিলেড-এর মাঠে নোবলেটের হিট উইকেট নিয়ে অনেক বিতর্কের ঝড় বয়েছিল। আইন বইয়ের খোঁজাখুঁজির ধুম পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। কে জানতো ব্যাটসম্যান ওয়াইড-এ খেলতে গিয়ে হিট উইকেট করে বসবেন।

আর হলোও তাই এবং আম্পায়ারের সিদ্ধান্তও নির্ভুল বলে প্রমাণিত হলো।

পোশাকের দিক থেকেও অস্ট্রেলিয়া আর ইংল্যাণ্ডের আম্পায়ারদের যথেষ্ট পার্থক্য। অস্ট্রেলিয়ার আম্পায়ারের পরনে থাকে খাটো সাদা কোট, সাদা টুপি, নেভী ট্রাউজার্স আর সাদা বুট। ইংরেজদের এত কাণ্ড নেই—স্বাভাবিক জামা-কাপড়ের উপর একটা লম্বা সাদা রংয়ের ডাস্ট কোট চাপান শুধু তাঁরা।

বেশির ভাগ আম্পায়ারই খেলার বয়স অনেকদিন আগে পার করেই আসেন মাঠে। এঁদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা অবশ্যই অত্যন্ত কাজের। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে চোখের দৃষ্টি বা কানের ব্যাপারটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এসব ক্ষেত্রে পূর্ণ মানসিক ও ইন্দ্রিয়জনিত বৃত্তিগুলোর পুরো কাজ করে এমন অবস্থাতেই আম্পায়ারের কাজে আসা উচিত। স্পর্শনীয় পুরস্কার হয়তো জুটবে না, কিন্তু সে তুলনায় তাঁর কাজের প্রশংসা হবে প্রচুর।

খেলার সরঞ্জাম (Equipment)

ব্যাট :

যে কোনো খেলাতে খেলার সরঞ্জাম বাছাই অত্যন্ত গুরুত্বের। খেলোয়াড়ের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করে। ডন ব্র্যাডম্যান তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন সঠিক সরঞ্জাম নিয়ে মাঠে নামলে খেলার মান অনেক বেড়ে যায়। অনেক কিংবদন্তীও গড়ে উঠেছে, যেমন ভিক্টর ট্রাম্পার যে কোনো ব্যাট (পুরনোতেও আপত্তি নেই) নিয়ে খেলতে নামতেন। এঁর দক্ষতার প্রশংসা করে ব্র্যাডম্যান বলেছেন এটা তাঁর দ্বারা সম্ভব হতো না।

যারা নতুন খেলতে আসে তাদের ব্যাট নির্বাচন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হওয়া দরকার। বাপ-মায়েরা ছেলেদের জন্মদিনে বড় দেখে ব্যাট কিনে দেন। কারণ ? ছেলে বাড়ছে যে!

এঁদের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন, কিন্তু যতদিন না ওই বয়সে পৌছচ্ছে ছেলে—তার অবস্থা অনুমেয়। প্রমাণ ব্যাট-এর দৈর্ঘ্য পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি, ওজন মোটামুটি দু পাউণ্ড-এর কিছু বেশি। সাইজের তারতম্য আছে ব্যাট-এর।

খাটো হাতলের ব্যাট আছে, আছে হ্যারো (Harrow) মাপের। আগেরটার চেয়ে সামান্য হাল্‌কা।

ব্র্যাডম্যান খেলা শুরু করেছেন পুরো মাপের ব্যাট দিয়ে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে খাটো হাতলের ব্যাট-এ চলে গেছেন। বাকী দিনগুলো এই ব্যাটেই খেলেছেন। ব্র্যাডম্যানের উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি এবং পুরো মাপের হাতলে খেলার অসুবিধে হয় বলে তাঁর এই পরিবর্তন। তবু, ব্র্যাডম্যানের চেয়েও লম্বায় যাঁরা বেশি, তাদের অনেকেই খাটো হাতল ব্যাট-এ খেলেছেন। এ সম্পর্কে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই।

নিজস্ব ব্যাট থাকায় অনেক আনন্দ। ব্যাটে তেল মাখানো উচিত, বিশেষ করে শুকনো আবহাওয়ার দেশে। র লিনসিড (কাঁচা তিসি) তেল সপ্তাহে একবার করে। ষাঁড়ের হাড় দিয়ে ঘষলে আয়ু বাড়ে, ব্যাট-এর ছোট খাটো ছড়ে যাওয়া বা কাটা আঠালো ফিতে (adhesive tape) দিয়ে মেরামত করা চলতে পারে। বড় ধরনের কিছুতে বাঁধন দরকার। ইদানীং রবারের গ্রিপই বেশি কার্যকর বলে গ্রাহ্য হয়েছে। গ্রিপ কোনোক্রমে আলগা যেন না থাকে—খেলার সর্বনাশ ডেকে আনবে তা।

প্যাড:

বাজারে নানান কোম্পানির প্যাড মেলে। এদের অধিকাংশই খেলোয়াড়কে হাড়গোড় ভাঙা থেকে বাঁচায়। কিন্তু, এখানেও আরামের প্রশ্ন আছে। ভারী প্যাডে অবশ্য আহত হবার সম্ভাবনা কম, গতি কিন্তু ব্যাহত করে এগুলো। 'আমার এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সহ-খেলোয়াড়' ব্র্যাডম্যান বলছেন, 'এমন প্যাড ব্যবহার করতেন যাতে তাঁর চলাফেরা যথেষ্ট বাধা পেত। অবশ্যই মাথাব্যথা এটা। কিন্তু আমার মনে হয় এর সামান্য হেরফের হলে উনি আরও বড় খেলোয়াড় হতে পারতেন। উইকেট-রক্ষকদের জন্যে বিশেষ প্যাড্ আছে —বাড়তি প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি। এক্ষেত্রেও ব্র্যাডম্যানের আপত্তি আছে—গতির ব্যাপারটাই তো সব, সব খেলাতেই। লেগ্-গার্ডগুলো যখন নতুন অবস্থায় সেগুলোর ফিতে এত বেশি লম্বা, যে সাধারণ খেলোয়াড়ের পক্ষে অস্বস্তিকর। এগুলোকে ছেঁটে নেওয়া দরকার। সবক্ষেত্রে অবশ্য সম্ভব নয়, কারণ বিভিন্ন খেলায় ভিন্ন খেলোয়াড় ব্যবহার করেন এগুলো, তবু গুঁজে নেওয়া যায়। প্যাডের ওপর অংশ নরম হয়ে গেলে পালটে নেওয়া দরকার। কারণ

ব্র্যাডম্যানের একটা খেলায়, রান সংখ্যা যখন আশির ঘরে, এবং উনি সেঞ্চুরির দিকে শক্ত পায়ে এগোচ্ছেন। 'ঠিক তখনি অফ-এর দিক থেকে আসা একটা বল তাঁর ব্যাট-এর ভেতরের অংশ ছুঁয়ে প্যাড-এর মাথায় পড়লো। পায়ের ইঞ্চি দুয়েক বাইরে বেরিয়ে ছিল প্যাড। আসলে আউট হলেন তিনি।' আম্পায়ারকে এজন্যে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সেই চিরপরিচিত আওয়াজ উঠেছিল—ব্যাটে বলে হওয়ার আওয়াজ, আর প্যাড আর ব্যাট এর মধ্যে দূরত্ব এত কম ছিল যে, যে কোনো আম্পায়ারের পক্ষে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রায় অসম্ভবই বলা যায়।

পুরনো প্যাড-এ খেলেছিলেন ব্র্যাডম্যান, তার মূল্যও দিতে হলো তাঁকে।

গ্লাভস :

যে কোনো কিশোরই ব্যাটিং গ্লাভস পরার বিপক্ষে। চামড়ার সঙ্গে ব্যাট-এর সংযোগ না ঘটলে কি করে হয় খেলা! কিন্তু এ ধারণা তার মাথা থেকে যত তাড়াতাড়ি তাড়াতে পারে, ততই মঙ্গল তার পক্ষে। কারণ, কোনো ব্যাটসম্যানেরই গ্লাভস ছাড়া ব্যাট ধরা উচিত নয়। এতে আত্মবিশ্বাসই শুধু বাড়ে না, খেলারও সুবিধে হয়। এক হাতে গ্লাভ পরলেই কাজ মেটে না, দুটো হাতই মুড়তে হবে। গ্লাভ বা দস্তানা অনেক ধরনের। সবচেয়ে বেশি চালু হল গণ্টলিট (ধাতুর তৈরি) গ্লাভ। শরীরের কোনো অংশের সঙ্গে ব্যাট-এর প্রত্যক্ষ যোগ নেই। যে সব খেলোয়াড় বেশি ঘামেন তাদের কাছে এই গ্লাভই খুব কাজের হয়, কারণ ধাতুতে আর্দ্রতা শুষে নেয়।

'অনেককে দেখেছি,' ব্র্যাডম্যান বলছেন,—'লাঞ্চ বা চায়ের বিরতিতে ক্রিজ ছেড়ে আসার সময়ে গ্লাভস খুলে সেগুলো ঘাসের ওপর ছেড়ে আসেন, মুখটা ওপর দিকে করা, বিরতির মধ্যে শুকিয়ে নেবার প্রয়োজনে। আমি নিজে কিন্তু খোলা (open) গ্লাভ-এর পক্ষপাতী। কারণ আমার ঘাম কমই হতো। অবশ্য সমস্তই ব্যক্তিগত নির্বাচনের ব্যাপার। প্রখ্যাত ইংরেজ ব্যাটসম্যান ওয়ালটার হ্যামণ্ড আমার মত গ্লাভই পছন্দ করতেন, অবশ্য এর ভেতরের দিকে থাকতো সাধারণ সুতির সূক্ষ্ম গ্লাভ যা ভিজে গেলে পালটে নেওয়া যেত।'

প্রোটেকটর :

প্রোটেকটর ছাড়া মাঠে নামা উচিত নয় কোনো খেলোয়াড়ের। অ্যালু-

মিনিয়াম বা প্লাস্টিকের তৈরি প্রোটেকটর পরাই শ্রেয়, কারণ বড় ধরনের আঘাত থেকে এগুলো রক্ষা করে।

উরুর প্যাড :

ফাস্ট বোলারের মোকাবিলা করতে এ ধরনের প্যাড অপরিহার্য। স্পঞ্জ রবারের তৈরি বস্তুটি হাঁটুর ওপরের অংশের জন্যে, খুব বেশি পুরু নয়—আধ ইঞ্চি, হালকা।

জুতোমোজা :

আধুনিক জুতো প্রায় বেড়ানোর জুতোর মতই হাল্কা। যদি এগুলোতে ভেতরের দিকে প্যাড না দেওয়া থাকে তো রবার ইনসোল করে নেওয়া উচিত, নিদেনপক্ষে গোড়ালির জন্যে স্পঞ্জ রবার।

গরমের দিনে যখন মাঠ শক্ত—জুতোর হিল-এর ওপর চাপ পড়ে, বিশেষ যদি আপনি ফাস্ট বোলার হন। কিছুসংখ্যক আবার লম্বা ফিতের পক্ষপাতী, যেগুলো পায়ের পাতার তলা দিয়ে বাঁধা হয়। ফলে বাঁধন দৃঢ়তর হয়।

স্পাইক বা কাঁটা অনেক ধরনের। শুধু পেরেক মেরে দেওয়াগুলো পছন্দ ব্যাটসম্যানের। সোলের মধ্যে পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা কম। অসুবিধেও আছে এগুলোর—ক্ষয়ে গেলে বদলানো ছাড়া গতি নেই। বাজারে অবশ্য নতুন এক ধরনের জিনিস চালু হয়েছে যা আজ পালটিয়েও চালানো যায়। ফাস্ট বোলারদের ক্ষেত্রে ধাতুর প্রোটেক্টর দেওয়া বুট দরকার, নইলে ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনাও প্রবল।

কিছু খেলোয়াড় অবশ্য রবার সোল দেওয়া জুতো পছন্দ করেন। এধরনের বুট ফিল্ডিংয়ে কাজ দেয় ঠিকই, পা হালকা থাকে। কিন্তু ব্যাটিংয়ের ক্ষেত্রে এর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দিহান, কথাগুলো ব্র্যাডম্যানেরই। কাঁটা পরিষ্কার রাখতে হবে। লিনেনের ব্যাগ রাখাই শ্রেয় বুট, তাতে কাপড়ে কাদা লাগবে না।

হাতে-বোনা পুরু মোজা পাওয়া গেলে তা ক্রিকেটের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। অনেকে ডবল মোজা পরেন বাড়তি আরামের জন্যে, তবে তা ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ইয়ান জনসন মোজা ছাড়াই বরাবর খেলেছেন। কি করে সম্ভব হয়েছে এটা ব্র্যাডম্যানের কাছে তা বিস্ময়ের। পাউডার বা ট্যালকাট

ব্যবহার করা যেতে পারে। এক প্রবীন ক্রিকেট কোচ ব্র্যাডম্যানকে মোজার মধ্যে সামান্য পরিমান গন্ধক দিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এতে খিল ধরা থেকে রেহাই পাওয়া যায় বলে তাঁর অভিমত। আর একজন সর্ষে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এদের কোনোটাই কার্যকরী কিনা আদৌ তা নিয়ে কোনো বিতর্কে না গিয়ে বলা যায় খিল ধরার ব্যাপারটা গ্রীষ্মের দিনে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং তা ব্যবহার করেছি', ব্র্যাডম্যানের উক্তি।

ট্রাউজার আর সোয়েটার :

ট্রাউজার বা ফুল প্যাণ্ট বাড়তি থাকা বাঞ্ছনীয় ক্রিকেটে। সোয়েটার হাতবিহীন হওয়াই ভাল। ফাস্ট বোলাররা যাতে ঠাণ্ডার শিকার না হন সেজন্য তাঁদের এই সোয়েটার ব্যবহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

টুপি :

আবহাওয়া যদি খারাপ না হয়, টুপি ব্যবহার করাই সমীচীন। ব্র্যাডম্যানের মতে,—'আমি অনেক খেলোয়াড়কে গরমে অসুস্থ হতে দেখেছি, দেখেছি অনেক ক্যাচ পড়তে টুপিহীন খেলোয়াড়দের হাত ফসকে। টুপি থাকলে বল দেখতে যথেষ্ট সাহায্য করতো তা।

অত্যন্ত গরমের দিনেও অনেকে টুপি ছাড়াই নামেন, কলম্বোর মতন আবহাওয়াতেও—কিন্তু এটা সত্যিই নির্বোধের কাজ, বিপদ ডেকে আনা!

সব মিলিয়ে পোশাক ইত্যাদি নিঃসন্দেহে খেলোয়াড়দের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বের, হাতা খোলা, ময়লা জামা ট্রাউজার আর নোংরা জুতোর খেলোয়াড় কি দর্শকদের মনে কোনো ছাপ রাখতে পারে—'পহ্‌লে দর্শনধারী, পিছে গুণবিচারি'—এজন্যেই বলে বোধহয়।

আক্রমণের ভিত্তি : ফাস্ট বোলিং

সুঁটে বন্দ্যোপাধ্যায়

আর পাঁচটা খেলার মত ক্রিকেট খেলাটাও আসলে একটা লড়াই। অবশ্য এ লড়াই সুস্থ আবহাওয়া ও বন্ধুতার মেজাজ বজায় রেখে। কিন্তু মূল লক্ষ্য এক—অর্থাৎ জয়লাভ করা। লড়াই জেতার মূল উপাদান হচ্ছে—আক্রমণ, তীব্রতম আক্রমণ—যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ পুরোপুরি পরাভব স্বীকার করে নেয়।

ইনিংসের শুরুতে উইকেটের চরিত্র ব্যাটসম্যানদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগে, বোলারের বোলিং-পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হবার কিংবা ব্যাটসম্যানের চোখের নজর অভ্যস্ত হয়ে ওঠার আগেই আক্রমণ শানিয়ে চরম আঘাত হানা লড়াই জেতার সর্বজনস্বীকৃত কৌশল। ক্রিকেটে আক্রমণ শানানোর স্বাভাবিক রীতি হল ইনিংসের সূত্রপাতে ফাস্ট বোলারের সাহায্য নেওয়া। আবার শেষের দিকেও ওদের সহায়তায় আক্রমন পরিচালনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কারণ ফাস্ট বলের তীব্র গতিবেগের কাছে ব্যাটসম্যানের নজর অনেক সময় হার মানে। তাই, যে কোন ক্রিকেট দলের কাছেই ফাস্ট বোলারেরা অপরিহার্য হয়ে উঠছে। প্রতি দলে অন্তত দুজন অতিরিক্ত-পেসসম্পন্ন বোলার দরকার; তারাই দু' প্রান্ত থেকে বোলিং শুরু করে। তারা বোলিং-এর গতিবেগে গোড়ার দিকের ব্যাটসম্যানদের পর্যুদস্ত করতে পারে। 'পেস'-এর সঙ্গে স্যুইং যদি যুক্ত হয় তা হলে তো সোনায় সোহাগা। স্যুইং অর্থাৎ বলকে বাতাসের সাহায্যে বাঁকানো হচ্ছে ফাস্ট বোলারের তূণের দ্বিতীয় অস্ত্র। গতির তীব্রতা অবশ্যই প্রথম ও প্রধান অস্ত্র।

স্পিন বোলিংও নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আক্রমণ পদ্ধতি, তবে, যে কথা আগেই বলেছি, আক্রমণ হানার প্রাথমিক পদ্ধতি হচ্ছে ফাস্ট বোলিংয়ের সাহায্য নেওয়া। যে পক্ষ ফিল্ড করে তারা ফাস্ট বোলিং-এর মাধ্যমে আক্রমণ শুরু করে কয়েকটি বাড়তি সুবিধা আদায় করে নিতে পারে। এ কথা সত্য, খেলার সূচনা চূড়ান্ত ফলাফলকে প্রভাবিত করে। তাই একেবারে গোড়ার দিকে অল্প সময়ে দু-তিনটি উইকেটের পতন ঘটাতে পারলে সীমিত রানের মধ্যে প্রতিপক্ষকে খতম করা অসম্ভব নাও হতে পারে। আবার প্রথম দিকের উইকেটগুলো দীর্ঘ সময় টিঁকিয়ে রাখতে পারলে ব্যাটধারী দলের পক্ষে একটা

বড়োসড়ো রানের ইনিংস গড়ে তোলা বাস্তব হয়ে ওঠে। তাই, ইনিংসের শুরু কি ব্যাটধারী, কি ফিল্ডকারী, উভয় দলের কাছেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ফাস্ট বোলিংয়ের কথা যখন বারবার উঠছে তখন প্রথমেই জানতে হয় ফাস্ট বোলিংটা কী? ফাস্ট বল হচ্ছে এমন ধরনের বল যা বোলারের হাত থেকে ছোঁড়বার পর তীব্রগতিতে লক্ষ্যের (উইকেটের) দিকে ছুটে যায়। এই গতিবেগ ঘণ্টায় ৮০ মাইল কিংবা তারও বেশি হয়ে থাকে। সত্যিকারের ফাস্ট-বোলার গাদা গাদা হয় না। তবে তাঁদের মধ্যে যাঁদের খেলা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছে লারয়ুড, নিসার, ক্লার্ক, গোভার, অ্যালেন, কনস্ট্যানটাইন, লিওওয়াল, স্ট্যাথাম, মিলার, ট্রুম্যান, হল, গিলক্রিষ্ট, গ্রীফিথ ইত্যাদি। আমাকেও কেউ কেউ ফাস্ট-বোলার হিসাবে চিহ্নিত করতেন; কেউ কেউ অবশ্য সে বিষয়ে সহমত পোষণ করতেন না। আমার খেলোয়াড় জীবনের সেরা কাল হল ১৯৩২ থেকে ১৯৪২ এর কাছাকাছি সময়। এই দীর্ঘ দশ-এগারো বছরের মধ্যে মাত্র একটি বিদেশী ক্রিকেট দল ভারত সফর করে এবং একটি ভারতীয় দল বিদেশে খেলতে যায়। কারণ, সেকালে ক্রিকেট খেলা এখনকার মত সর্বসাধারণের কাছে পৌছে যায় নি, এবং ক্রমাগত বিদেশ সফরের রেওয়াজও চালু হয় নি। তাছাড়া, চল্লিশ দশকের শুরু থেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর বন্ধ হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসরে জাত ফাস্ট বোলারের অভাব এক সময়ে ভীষণভাবে অনুভূত হয়েছিল। এখন অবশ্য সে অবস্থাটা কেটে গেছে। অস্ট্রেলিয়ায় টমসন, লিলি, ওয়েস্ট-ইণ্ডিজে অ্যাণ্ডি রবার্টস, মাইকেল হোল্ডিং ও ড্যানিয়েল রয়েছে। ইংলণ্ডে আছে জর্জ উইলিস, আর্নল্ড, স্নো। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতের। সেখানে সত্যিকারের ফাস্ট বোলারের অভাব আর পূর্ণ হল না। অবশ্য এদেশে যাঁরা ক্রিকেট খেলা পরিচালনা করেন, ক্রিকেটের মানোন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁরাও কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে ফাস্ট বোলার তৈরি করার প্রয়াস পান না। এখানে ফাস্ট-বোলিংয়ের উপযুক্ত উইকেটও তৈরি হয় না। আমাদের ব্যাটসম্যানেরা স্বাভাবিক কারণেই ফাস্ট বলের ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে না।

যা হোক, এবারে দেখা যাক ফাস্ট বোলার হতে হলে আবশ্যকীয় গুণাবলী কোনগুলি। হ্যাঁ, তাকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে। সে হবে সুদেহী ও স্বাস্থ্যবান। এ কথা জানা দরকার যে ফাস্ট

বোলিং দুর্বলের অবসর বিনোদন নয়। তার জন্যে চাই শক্তি, গতি ও কঠোর শ্রমের সহিষ্ণুতা। শারীরিক কসরতে পটু অ্যাথলেটের দীর্ঘদেহ ফাস্ট বোলিং-এ অনেক সহায়তা করে। ছ'ফুটের কাছাকাছি উচ্চতার মানুষ নিশ্চয় কিছু অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করে থাকে। কেবলমাত্র লারয়ুড় আর গিলক্রিস্ট ছাড়া আর সব ফাস্ট বোলারই ঐ উচ্চতার মানুষ। আমাদের রমাকান্ত দেশাইতো একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। অবশ্য সে জাত ফাস্ট বোলার ছিল না, সে ছিল মিডিয়াম ফাস্ট।

উচ্চতার চাইতেও আরেকটি জরুরী বস্তু হল সুগঠিত দুটি চরণ, যা বোলিং ক্রীজ থেকে এসে বল ছোঁড়া পর্যন্ত দৌড়ের সময়ে বোলারকে যথাযথ গতিবেগ দিতে পারে। দিনের শেষভাগে যদি কোন ফাস্ট বোলারকে বল করতে ডাকা হয় তবে ক্লান্ত পদযুগল নিয়ে সে কিছুতেই সকালের মত তীব্রগতিতে বল করতে পারে না।

নিয়মমত বলতে গেলে বাঁ পা এগিয়ে তাতে সম্পূর্ণ ভর দিয়ে (ডানহাতি বোলারের পক্ষে) এমনভাবে বল ছুঁড়তে হবে যাতে করে ছোঁড়ার পর হাতটা যেন লক্ষ্যের দিকে বিনা বাধায় পৌঁছে যেতে পারে। হাতে তীব্র গতিবেগ পেতে হলে শরীরটাকে একটুকু আড়াআড়ি এনে দ্রুত বলটা ছাড়তে হবে ; এমনভাবে শরীরটা থাকবে যাতে করে বল ছোঁড়ার পর তা যেন ব্যাটিং উইকেটের দিকে সোজাসুজি হয়ে যায়। শরীরের নানা অংশের কাজগুলোর মধ্যে দ্রুত একটা সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে বোলিং ক্রীজ থেকে শুরু করে বল ছোঁড়া পর্যন্ত দৌড়বার সময়ে মাথা যেন বেশি নিচে না নামে এবং শরীরও বেশী না ঝুঁকে পড়ে। কেননা, এর ফলে বলের গতিবেগ ও নিশানা ব্যাহত হয়ে থাকে। যদিও 'পেস' হচ্ছে সহজাত ক্ষমতা কিন্তু টেকনিক্যাল দক্ষতা ও শরীরের বাঁক আর মোচড়ে সমন্বয়ের ক্ষমতা ক্রমাগত কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে বাড়ানো চলে। ফাস্ট বোলারের জীবন কঠোর নিয়মে বাঁধা অনুশীলনের জীবন। সাধনায় একাগ্রতা না থাকলে সিদ্ধি অসম্ভব।

পীচে পড়ে বলের গতিবেগ বাড়াবার জন্য ব্যাকস্পিন জাতীয় কৌশল প্রয়োগ করলে বেশি ফল পাওয়া যায়। এ ধরনের বল পীচে পড়ে দ্রুততর ছুটবে এবং লাফিয়ে না উঠে নিচু হয়ে গড়িয়ে যাবে।

আরেকটি প্রশ্ন সাধারণত করা হয় যে একজন ফাস্ট বোলার কি স্যুইং বা সোয়ারভ করাতে পারে ? উত্তরে বলা যায় হ্যাঁ পারে, তবে একজন মিডিয়াম

পেস বোলারের চাইতে কম দক্ষতায়। কেননা একজন ফাস্ট বোলারের অস্ত্র হচ্ছে তার গতিবেগ ; অথচ একজন মিডিয়াম পেস বোলার স্যুইংয়ের ভেল্কিতে কাজ সারতে চায়। অবশ্য দু'ক্ষেত্রেই লেংথ ও নিশানা স্থির রাখা অত্যন্ত জরুরী। বল যত দ্রুতগতিতে যাবে ততই হাওয়ার ভেতরে সহজগম্য হবে। সোয়ারভ করানো আজকাল তো প্রায় উঠেই গেছে। এ কাজ মিডিয়াম ফাস্টের চাইতেও শ্লথগতির বোলারের হাতে বেশি কার্যকরী হয়।

বোলিং, যে কোন ধরনেরই হোক না কেন, তা কিন্তু কেবলমাত্র শক্তি, দক্ষতা ও নিখুঁত টেকনিক্যাল জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে না, বরং ব্যাটস-ম্যানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, বুদ্ধির প্যাঁচে বলের লেংথ ও নিশানায় পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে ঠকিয়ে দিতে পারলেই বেশি ফল পাওয়া যায়। কোন ব্যাটসম্যানের যদি কোন বিশেষ ধরনের বলের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা থাকে তবে মাথা খাটিয়ে তাকে অন্য ধরনের বলের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজনবোধে দুদিক থেকেই মাঝে মাঝে স্যুইং করাতে হবে। এ ধরনের বল বিশেষ কার্যকরী হয় যখন বাতাস ভারী ও আর্দ্র থাকে।

একজন ফাস্ট বোলার হিসেবে সাফল্য লাভ করতে হলে ক্রমাগত অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে সঠিক নিশানায় ও লেংথে তীব্রগতিসম্পন্ন বল করার ক্ষমতা করায়ত্ত করতে হবে, ব্যাটসম্যানের দক্ষতা বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তার দুর্বলতায় খুঁজে দেখতে হবে। তাকে ঠকাবার পথ আবিষ্কার করাও কঠিন হবে না। ভুল পায়ে ব্যাটসম্যানকে খেলতে বাধ্য করে তাকে ক্যাচ আউট করার চেষ্টা করতে হবে। এই বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার প্রয়োগ একজন সাধারণ মাপের বোলার থেকে জাত বোলারকে চিনে নিতে সাহায্য করে।

একজন প্রথম শ্রেণীর ফাস্ট বোলারের কাঁধ-পিঠ ও হাতের সুগঠিত শক্তিশালী মাংসপেশী থাকা দরকার ; কারণ বোলিংয়ের বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী হিসাবেই তাঁর শরীরকে বাঁকাতে ও মোচড়াতে হয়। বোলিং আর্মকে এমনভাবে ছুঁড়তে হয় যার ফলে বল পীচে পড়ে দ্রুততর গতিতে ছুটতে পারে।

প্রশ্ন, এখন কীভাবে ভালো ফাস্ট বোলার হওয়া যায়? ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি ফাস্ট বোলার তৈরি করা যায় না, ফাস্ট বোলার জন্মায়। তাই রাম শ্যাম-যদু-মধু যে কোন লোককেই ধরেবেঁধে ফাস্ট বোলার করে দেওয়া চলে না। না, আন্তরিক চেষ্টা করেও নয়। যে সহজাত পেস ও স্পইপের অধিকারী তার অন্য দক্ষতা কম থাকলেও ক্রমাগত কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে

ব্যাটিং-এর গোড়াপত্তন

পঙ্কজ রায়

দলের গোড়াপত্তন করতে যে জোড়া ব্যাটধারী প্রথমে মাঠে নামে আক্রমণের আসল ধাক্কাটা তাদেরই সামলাতে হয়। এ কাজ যেমন কঠিন তেমনি দায়িত্ব-পূর্ণ। কেননা গোড়ার দিকে ঝপঝপ উইকেট পড়লে পরবর্তী ব্যাটস্‌ম্যানদের মনের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে আর বোলাররাও কিছুটা বাড়তি জোস্ পেয়ে যায়। গোড়াপত্তন ভালো হলে সাধারণত দলটা একটা শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে লড়াই চালাতে সক্ষম হয়।

তাই ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের প্রাথমিক দায়িত্ব হল ইনিংসের ভিত্তিটাকে পোক্ত করে তোলা, ঝটিতি রান তোলার প্রলোভন ত্যাগ করে উইকেটে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে বলের জৌলুস নষ্ট করা। আমার মনে হয় প্রথম ঘণ্টায় কোনও উইকেট না খুইয়ে ৩০ রান করা কয়েকটি উইকেটের বিনিময়ে ৬০ রান করার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। অল্প রানে দু-একটা উইকেট পড়ে গেলে পরের ব্যাটসম্যানেরা শঙ্কিত হয়ে পড়বে। এবং তাদের আত্মবিশ্বাস চিড় খেয়ে যাবে। আর বোলারেরা আরও নিপুণভাবে আক্রমণ শানাতে পারবে।

গোড়ার ব্যাটসম্যানদের কাছে উইকেটের চরিত্র সাধারণত স্পষ্ট থাকে না। কয়েক ওভার খেলা না চললে পেস বলের ধারও পরখ করা চলে না। এমনি অবস্থায় ওপেনিং ব্যাটসম্যানেরা ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে আসে। তখন বল পালিশের ঔজ্জ্বল্যে ঝকমক করতে থাকে আর বোলারও তখন সজীব এবং পূর্ণ শক্তিতে বল করে থাকে। তখন ফাস্ট-বল মাটিতে পড়ে আরও দ্রুত গতিতে ছোটে; ঘাসে-ঢাকা উইকেট হলে তো কথাই নেই। ফাস্ট বোলাররা শুরুর ক' ওভারই সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বল করতে পারে; এই সময়ে তাদের লেংথ ও নিশানা অনেক সঠিক থাকে। ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের এই আক্রমণের মুখে তাই প্রভূত সাহসে ভর করে দাঁড়াতে হয়। প্রতিটি বল সতর্কভাবে লক্ষ্য করে খেলে পেস বোলিং-এর বিষদাঁত ভেঙে তছনছ করে দিলেই তাদের উপরে পুরো কর্তৃত্ব স্থাপন করা যায়।

ওপেনিং ব্যাটসম্যান-জুটি যদি দীর্ঘ সময় উইকেটে অবস্থান করতে পারে তবে তারা যে শুধু পেস বোলারদের (তাদের যত দ্রুত ও সঠিক নিশানায়

বোলিং-এর সামর্থ্য থাকুক না কেন) মনে নৈরাশ্য সৃষ্টি করে তাই নয়, তাদের লেংথও হারাতে বাধ্য করে। পীচ পড়ে বলের গতি হ্রাস পায়, এবং বোলারের, বস্তুত পুরো দলটারই আক্রমণের ধার ও মানসিকতা ভোঁতা হয়ে যায়। তাই যে কথা বলছিলাম, ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের যতক্ষণ সম্ভব উইকেটে টিঁকে থাকা হল প্রথম কর্তব্য এবং পরবর্তী কাজ হল প্রতিটি বল লক্ষ্য করে খেলে সুযোগমত রান নেওয়া—আরও ভালো হয় রানগুলো খুচরো রান হলে। এর ফলে বোলারের মনঃসংযোগ নষ্ট হয়ে যায়।

একেবারে প্রথম ইনিংসের গোড়াপত্তন যদি করতে হয় তবে ওপেনিং ব্যাটস-ম্যানদের শিশির-ভেজা উইকেটে খেলতে হয়। এমন উইকেটে ফাস্ট বল পীচে পড়ে দ্রুততর গতি পায়। আবহাওয়া ভারী থাকলে বল বেশি স্যুইং করতে থাকে। এমন অবস্থায় বলের স্যুইং ও সোয়ার্ভ সম্পর্কে ব্যাটস্ম্যানদের অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হয়। অবশ্য উইকেটের অবস্থা যাই থাক না কেন প্রথম দিকের ওভারগুলো ব্যাটসম্যানকে গভীরভাবে নজর রাখতে হবে, এবং বল ও মাঠের চরিত্র বিচার করে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ব্যাট চালাতে হবে।

ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে এসে ব্যাটসম্যানদের কঠিন মানসিক চাপে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া বা হালকা শিথিল মেজাজে মাঠে নামা কোনটাই যথাযথ নয়। দায়িত্বসচেতন ও সতর্ক হয়ে গভীর একাগ্রতার সঙ্গে বোলারকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। প্রয়োজন তার দৌড়, বল ধরা, বল ছোড়া, ফলো থ্রু পর্যন্ত প্রতিটি ভঙ্গি লক্ষ্য করা। বল ধরার ভঙ্গি থেকে বলটির প্রকৃতি আন্দাজ করা যেতে পারে। ধরার ভঙ্গিটি যদি দেখা না যায় তাহলে ছোঁড়ার ভঙ্গি থেকে সেটি আন্দাজ করে নিতে হবে। বোলারের কোন বিশেষ মুদ্রাদোষ আছে কিনা তাও নজর করে দেখে নিতে হবে; বিশেষত, উইকেট-রক্ষকের সঙ্গে ইশারায় কোন প্ল্যান চালাচালি হয় কিনা তা দেখতে হবে। এ বিষয়টি আরও জরুরী, যখন বাম্পার ছাড়বার আগে বোলার ইঙ্গিতে তা উইকেট রক্ষককে জানিয়ে দিয়ে থাকে। বল ছোড়ার পরে নিরীক্ষণ করতে হবে বলের লেংথ, নিশানা, ফ্লাইট, সোয়ার্ভ আর তার স্যুইং।

যদিও ফাস্ট বোলার যখন প্রথম আক্রমণ শুরু করে তখন ফিল্ডিং সাজানো মোটামুটি একই ধরনের হয়ে থাকে; তবুও ব্যাটসম্যানকে প্রতিটি ফিল্ডারের অবস্থান খুঁটিয়ে দেখে নিতে হয় কেননা তা থেকে বোলিং-এর একটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে।

যখন কোন পেস-বোলার তার বল শুরু করে দ্রুততম সেই বলগুলির দু-একটি সঠিক নিশানা হারিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। উইকেটের বাইরের এইসব বলে খোঁচা দেওয়া প্রায় আত্মহত্যার সামিল। খোঁচা-খাওয়া বল উইকেটের কাছাকাছি ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকা ফিল্ডারের বিশ্বস্ত হাতে জমা পড়তে বাধ্য। তাই এই বলগুলি খেলা ব্রহ্মহত্যার মতো মহাপাপ বিবেচনা করে তা থেকে বিরত থাকতে হবে, বিশেষ করে যতক্ষণ না চোখ অভ্যস্ত হয়ে যায়। তাই প্রথম অবস্থায় উইকেটের কেবলমাত্র ভিতরের বলগুলিই সোজা ব্যাটে খেলা উচিত। লেগের দিকে বল পড়লে এবং সেদিকে বাঁক নিলে যদি লেগের দিকে ফিল্ডার সাজানো থাকে তবে সে বলগুলি ছেড়ে দেওয়াই বিধেয়। তখন সম্ভব হলে বল সামনের দিকে ঠেলে একটা খুচরো রান নিতে হবে। আর, প্রথমদিকের ওভারে ক্রশ ব্যাট—নৈব নৈব চ। প্রতিটি বল মাঝখান দিয়ে সোজা ব্যাটে খেলতে হবে।

তারপরে ব্যাটসম্যানের গতিবিধির কথা। উইকেটের সামনে একটি কাল্পনিক V আকার অঞ্চলে তা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যতক্ষণ না ব্যাটস-ম্যানের হাত জমে যায়, পুরো মাঠে কর্তৃত্ব ফলাতে পারে এবং ফিল্ডারদের মাঝখান দিয়ে ইচ্ছামতো বল পাঠাতে পারবার মত অবস্থায় আসে ততক্ষণ অতিরিক্ত সাহসী না হওয়াই ভালো। বোলিং-এর শুরুতে ফিল্ডাররা সাধারণত যখন উইকেটের পিছনে দাঁড়ায় তখন সবচেয়ে নিরাপদ এবং উত্তম ব্যবস্থা হল মিড-অফ বা মিড-অনের দিকে বল পাঠানো।

আগেই বলেছি ওপেনিং ব্যাটসম্যানের পক্ষে খুচরো রান নেওয়া আরও জরুরী। তাই উইকেটের মাঝে দৌড়ের ব্যাপারে তাদের খুব পটু হতে হবে। প্রথম পর্যায় রানগুলো যতদূর সম্ভব দৌড়ে সংগ্রহ করা দরকার; আর সবই সোজা ব্যাটে খেলে। ক্রশ ব্যাটে বাউণ্ডারিতে, না—কিছুতেই না, কেননা তাতে বিপদের গন্ধ থাকে।

দেখা গেছে সাধারণত তিনটি কারণেই ব্যাটসম্যানেরা আউট হয়ে থাকে। তাদের অসতর্কতা, অধৈর্য এবং বলের অকস্মাৎ গতি পরিবর্তন। ক্রিকেট খেলায় অসতর্কতা ও অধৈর্যের কোন স্থান নেই, অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে প্রতিটি বল সতর্কভাবে লক্ষ্য করতে হবে এবং ক্ষণিকের মধ্যেই স্থির করতে হবে বলটি ছেড়ে দেবে কিনা এবং খেললে তা কী ভাবে খেলবে। এই বিচার-ক্ষমতাই দক্ষ ওপেনিং ব্যাটসম্যানের প্রধান গুণ। পীচ থেকে পেস বোলার কেমন সাহায্য পাচ্ছে তাও তাকে ঠিকঠাক বুঝে নিতে হয়।

ওপেনিং ব্যাটসম্যানদের দুজনের মধ্যে কারোই বাড়তি কোন দায়িত্ব নেই। তাদের দায়িত্ব সমান। চাই একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও বোঝাপড়া, মানসিক ক্ষমতা ও কৌশলগত দক্ষতা। শুধু প্রচলিত রীতি হচ্ছে দুজন ব্যাটসম্যানের মধ্যে যে বয়স্ক সেই প্রথমে বলের মুখোমুখি হবে, তবে প্রথম বলে একটি রান হলে দু-নম্বর বলটিই অপর ব্যাটসম্যানকে খেলতে হবে, অর্থাৎ যা বলছিলাম দুজনের মধ্যে বস্তুত কোন পার্থক্য নেই।

গোড়াপত্তন করতে এসে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে হবে বলে কোন ব্যাটস্‌ম্যান যেন হাত গুটিয়ে বসে না থাকে। ওপেনিং বোলাররা সাধারণ ক্ষমতার অধিকারীও হতে পারে, প্রথম কয়েক ওভারেই তাদের আক্রমণের তীব্রতা ব্যাটসম্যানদের কাছে ধরা পড়ে যাবে। তাই বোলার বুঝে ব্যাট চালাতে হবে, এবং কোন ক্রমেই খেলার উপরে বোলারকে প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া চলবে না। বোলারকে অকারণ সমীহ করলে সে অনেকখানি মনের জোর পেয়ে যায় ফলে অতি সাধারণ মাপের বোলারও কোন কোন সময়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। যখন ব্যাটসম্যান একবার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে এবং চোখও অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, বলের ফ্লাইট বুঝতে পারবে, পীচের চরিত্রও জানা হয়ে যাবে তখন সে তার খেলার খেলা শুরু করবে। তার হাতে যে ধরনের মার আছে সুবিধামতো তার সদ্ব্যবহার করবে।

ওপেনিং ব্যাটসম্যানকে কৌশলের দিক থেকে দক্ষ এবং মেজাজের দিক থেকে শান্ত হতে হবে। এগিয়ে বা পেছিয়ে খেলা, আক্রমণাত্মক কি রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে খেলার ব্যাপারে সব চাইতে কার্যকরী নীতি হল বলটা যেভাবে পাওয়া যাবে সেইভাবেই খেলতে হবে। যদি বলটা ব্যাটসম্যানের আওতার মধ্যে থাকে তবে এগিয়ে খেলতে হবে, নইলে পেছিয়ে। স্টান্স নেবার পর ব্যাটসম্যান সামনের দিকে ঝুঁকে থাকবে যাতে বলের ফ্লাইট সে দেখতে পায়। এসময় শরীরের ভর দু-পায়ের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। আর পেছিয়ে খেলার সময়ে বাঁ পায়ে ভর দিতে হবে যাতে করে ডান পা দ্রুত বলের লাইনে সরিয়ে আনা যায় এবং প্রয়োজনমতো বলটি ছেড়ে দেওয়া যায়। এগিয়ে খেলার সময়ে ডান পায়ে শরীরের ভর দিয়ে বাঁ পা দ্রুত এগিয়ে নেওয়া যায় এমন অবস্থায় রাখতে হবে। এই ব্যবস্থা অবশ্য ডানহাতি ব্যাটসম্যান সম্পর্কে প্রযোজ্য। বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানের ক্ষেত্রে উল্টোটাই করতে হবে।

স্লো ও স্পিন বল খেলার সময়েও ঐ একই নিয়ম। শুধু একটিমাত্র তফাত

—এক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানেরা খেলার আগে আরও বেশি সময় পায়। এ ধরনের বল হয় পীচ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে খেলতে হবে নয়ত ছেড়ে দিয়ে বলের গতি ভালোভাবে লক্ষ্য করে পেছিয়ে সঠিকভাবে খেলতে হবে। যখন কোন বল এগিয়ে খেলতে হয় তখন অবশ্যই বলের নিচের দিকে আড়াআড়িভাবে এগুতে হবে। এই অবস্থায় প্রথম কাজ হল বাঁ পায়ের ঠিক পিছনে ডান পাটা নিয়ে আসতে হবে, বাঁ পায়ের গোড়ালি বরাবর থাকবে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল। বাঁহাতি ব্যাটসম্যানের সময়ে ঠিক বিপরীত।

অতিরিক্ত দ্রুতগতি বোলিং-এর বিরুদ্ধে, যেখানে এগিয়ে খেলার সুযোগ অত্যন্ত কম সেখানে বাঁ পায়ে ভর দিয়ে ডান পা তার পিছনে টেনে আনতে হবে। ডান পা আলগা রাখতে হবে যাতে প্রয়োজন হলে সহজে ডান পায়ে ভর দিয়ে পেছিয়ে এসে সে খেলতে পারে। এভাবে দাঁড়ালে এগিয়ে খেলতেও কোন বাধা থাকে না আবার বাঁ পায়ের স্থান পরিবর্তন না করেও ব্যাটে বল হাঁকড়ানো যেতে পারে।

যথাযথ ফুটওয়ার্ক ছাড়া যেটা সবচেয়ে জরুরী তা হল অবস্থা অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যে পায়ের স্থান পরিবর্তনের ক্ষমতা। এছাড়া আরেকটি অত্যন্ত জরুরী বিষয় হল টাইমিং। স্যুইংয়ের গতিবেগ যখন সর্বাধিক তখনই ব্যাটের আঘাত করা দরকার। ফলে বলটি তড়িৎগতিতে ছুটে যাবে। তাছাড়া বলটিকে এমন উচ্চতায় ও এমন একটি কোণ থেকে মারতে হবে যাতে বলটা যেন উঠে গিয়ে ক্যাচ হবার সুযোগ না সৃষ্টি করে, ঠিক জায়গায় ড্রপ পড়ে এবং ব্যাটসম্যান-নির্ধারিত পথেই যেন চলে যায়। এই ফল পেতে হলে সঠিক সময়ে এবং নির্দিষ্ট উচ্চতায় বলটি মারা অত্যন্ত জরুরী।

বস্তুত, সঠিক ফুটওয়ার্ক এবং নিখুঁত সময়জ্ঞান হচ্ছে একজন ব্যাটসম্যানের কৌশলগত দক্ষতার নিদর্শন। তাছাড়া উন্নত মানসিকতা, শান্ত পর্যবেক্ষণশীল মেজাজ ক্রমাগত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করতে হয়। একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান, যে দলের পক্ষে ইনিংসের গোড়াপত্তনের দায়িত্ব নিতে চায়—ফাস্ট বোলারের বিরুদ্ধে, নতুন বলের বিরুদ্ধে এবং ফাস্ট উইকেটের বিরুদ্ধে তাকে খেলতে হয়। আর সেজন্যেই তাকে হতে হয় সাহসী, সংযমী ও পর্যবেক্ষণশীল। এ কাজ একদিনের নয়, চাই দীর্ঘ প্রস্তুতি, একাগ্র অভিনিবেশ, প্রভূত নিষ্ঠা এবং কঠোর অধ্যবসায়।

প্রসঙ্গ : আম্পায়ারিং ও অন্যান্য

সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শুধুমাত্র আম্পায়ারই নয়, ক্রিকেট খেলোয়াড়দেরও ঐ খেলার আইনকানুন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আম্পায়ার সম্প্রদায়ের শিরোমণি ফ্রাঙ্ক চেস্টারের মতে—যে-কোন আম্পায়ারের কাজ অনেক সহজ হয়ে ওঠে যদি প্রতিটি খেলোয়াড় আইনকানুন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকে। এর ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানো যায়। ইংলণ্ডের চতুর ও কুশলী অধিনায়ক ডি. আর. জার্ডিন একই সুরে বলেছেন যে আইনকানুনগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করতে না পারলে কেউ প্রকৃত ক্রিকেটার হতে পারে না।

১৯৪৭ সালের নিয়মাবলীর সারসঙ্কলনে (৫ম সংস্করণ, ১৯'৩) খেলার আইনসমূহকে তিনটি সূত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। এই সূত্রগুলি হচ্ছে: (১) এম. সি. সি-র সরকারী আইন ও তার ব্যাখ্যাসমূহ (২) বিশেষ বিধি এবং (৩) পরীক্ষামূলক বিধিসমূহ। সাধারণভাবে এম. সি. সি-র আইনের আওতায় সকল খেলাই এসে পড়ে। অবশ্য কোথাও কোথাও প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের আইন প্রণয়ন করতে হয়েছে। এম. সি. সি-র রুলিং ও তার ইণ্টারপ্রিটেশনের মধ্যে এমন জোর থাকে যে সেগুলি মূল আইনের শুধুমাত্র সমানই হয়ে ওঠে না, অনেক সময়ে তাকে বাতিল পর্যন্ত করে দেয়। বিশেষ বিধি বলতে বোঝায় সেই ধরনের কয়েকটি নিয়ম যা এম. সি.সি., বিদেশী ক্রিকেটের পরিচালন পরিষদ, ও অন্যান্য সহকারী ও আমন্ত্রক অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অনুমোদিত। আইন, কানুন, বিধি, বিশেষ নির্দেশ, সংযোজনী ও সংশোধনী সকল সময়েই সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয় না, ফলে আইন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকা দরকার। বিশিষ্ট ইংরেজ আম্পায়ার কে. ম্যাকানলিস এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে আইনের শব্দগত অর্থের চাইতে তার তাৎপর্য বুঝে প্রখর সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে আইনের বিশেষ উদ্দেশ্য বিচার করেই আম্পায়ারকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অবশ্য ধর্মাধিকরণের বিচারকের মত আম্পায়ারও আইন এবং অতীতের নজিরের দ্বারা তাঁর রায় নিয়ন্ত্রিত করেন। অনেক ক্ষেত্রে অতীতের কোন নজিরও পাওয়া

যায় না, সে ক্ষেত্রে আম্পায়ারকেই উপস্থিত বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম আইন জ্ঞানের সাহায্যে নজির সৃষ্টি করতে হয়।

আম্পায়ারের কাজ : একজন আম্পায়ার যেমন খেলাটিকে সঠিক পথে চালিত করতে পারেন, তিনিই আবার খেলাটি পুরোপুরি নষ্টও করে দিতে পারেন। আম্পায়ারের একটি ভুল সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ খেলাটিকেই বিপথে চালিত করতে পারে, এমন কি ফলাফলও বিপরীতমুখী করতে পারে। অন্য খেলায় সিদ্ধান্ত ভুল হলে পরে তার পরিবর্তন করা চলে, ফলে ক্ষুব্ধপক্ষ দ্বিতীয়বার সুযোগ পেতে পারেন। মাঠে আম্পায়ারই সর্বেসর্বা। তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা চলে না। কোন খেলোয়াড় অসন্তুষ্ট হলে তিনি তাঁর অসন্তোষের কারণ দলীয় অধিনায়ককে জানাবেন, যিনি প্রয়োজনবোধে তা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনবেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত ডব্লু-ত্রয়ীর অন্যতম ক্লাইভ ওয়ালকট ঠিকই বলেছেন যে এমন কোন ক্রিকেট খেলা আজও হয়নি যাতে প্রতিটি খেলোয়াড় আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে মনেপ্রাণে সম্পূর্ণ তুষ্ট হয়েছেন। অবশ্য ক্রিকেটের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়দের আচরণও অনেক সংযত হয়েছে ; কেউ আম্পায়ারের ভুল সিদ্ধান্তে আউট হয়েছেন মনে করলেও সাধারণত প্রকাশ্যে দর্শকদের সামনে সে অসন্তোষ প্রকাশ করেন না। লেন হাটন, আধুনিক ইংলিশ ক্রিকেটের নায়ক, তাঁর বইতে খেলোয়াড়দের আচরণ সম্পর্কে অনেক কথাই লিখেছেন।

একজন ভালো আম্পায়ারের প্রধান কাজটি অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ও সতর্ক পর্যবেক্ষণ, খেলার প্রাথমিক পর্যায়েও যা ছিল আজও তেমনি, গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। তাদের প্রতি নির্দেশই হল : আইনের যথাযথ ব্যাখ্যা করুন আর আরও আরও বেশি মনঃসংযোগ করুন, দৃষ্টি শাণিত করুন, পর্যবেক্ষণে কোনও ভুল করবেন না। সেখানে কোন খামতি রাখবেন না। আম্পায়ার প্রতিটি খেলোয়াড়ের জন্যই নির্দিষ্ট এবং নিরপেক্ষভাবে প্রতিটি দলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হবেন। ইংলণ্ডে কোন আম্পায়ারের বিরুদ্ধে তিনবার একদেশদর্শিতার অভিযোগ উপস্থিত হলে তাঁর আম্পায়ারিংয়ের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।

আম্পায়ারের আবশ্যকীয় গুণাবলী : আম্পায়ারের আবশ্যকীয় গুণাবলী কি কি ? তাঁর শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হতে হবে, এবং ক্রিকেটের সূক্ষ্ম আইন সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের অধিকার থাকতে হবে। প্রয়োজনে সে জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। তাছাড়া প্রখর সাধারণ জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধি, দৃঢ়তা ও

সাহস, সরস মন ও পক্ষপাতহীন মানসিকতা থাকতে হবে। জন-অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে আম্পায়ারের মনে কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়। মিড্‌লসেক্সের প্রাক্তন খেলোয়াড়, আম্পায়ার হ্যারি আদর্শ আম্পায়ারের একটি দৃষ্টান্ত। ক্রিকেটের ন্যায়বিচারকে জনপ্রিয়তার যূপকাষ্ঠে বলি না দিয়ে যে সাহসিক নজির স্থাপন করেছেন তার উল্লেখ করতে হয়। আধুনিক ক্রিকেটের জনক ডা. ডব্লু জি. গ্রেস তখন তাঁর দক্ষতার মধ্যগগনে এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তখনও তিনি ডা. গ্রেসকে আউট দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন নি। প্রথম বলটি খেলতে এসে ডা. গ্রেস ফসকান এবং সেটি তাঁর অফ স্ট্যাম্প ছুঁয়ে যায় ও বেলটির পতন ঘটে। ডা. গ্রেস বেলটি কুড়িয়ে যথাস্থানে স্থাপন করতে করতে আম্পায়ারকে বলেন, আজ বাতাস বইছে বড় এলোমেলো, তাই না? আম্পায়ার শান্তভাবে জবাব দেন, তা ঠিকই, তবে আমার মধ্যে কোনও এলোমেলোভাব নেই, আপনি আউট।

ভব্যজনের খেলা ক্রিকেট : রাজার খেলা ক্রিকেট অবশ্যই ভব্যজনেরও খেলা। তাই আম্পায়ারদের যেমন কর্তব্য রয়েছে, খেলোয়াড়দেরও কর্তব্য রয়েছে আম্পায়ারদের প্রতি। তুজন আম্পায়ারের দলটি যদি সকল খেলোয়াড়ের অংশগ্রহণে পুষ্ট হয় তবে খেলাটি সুন্দর করে তোলার প্রচেষ্টা সার্থক রূপ পায়। খেলোয়াড়দের তরফ থেকে পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে কোনও আম্পায়ারের পক্ষেই খেলা পরিচালনা করা সহজ হয়ে ওঠে না। অনেক সময়ে ব্যাটসম্যান ছাড়া আর কেউ-ই ধরতে পারে না বলটি সত্যই ব্যাট ছুঁয়েছে কিনা। তাই ব্যাটসম্যান যদি নিশ্চিত বুঝে থাকে যে বলটি ব্যাট ছুঁয়েছে এবং ক্যাচটি যথাযথ হয়েছে তবে তার কর্তব্য হচ্ছে ক্রীজ থেকে বেরিয়ে আসা। অপরদিকে, ফিল্ডারও অনেকক্ষেত্রে একমাত্র সাক্ষী যে ক্যাচটি নিয়মানুযায়ী ধরা হয়েছে। যদি কোথাও তার ব্যত্যয় ঘটে থাকে তবে তারই উচিত আম্পায়ারকে সেটি ধরিয়ে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত ঘটনার কথা বলি, ডেনিস কম্পটন সে ঘটনায় ফিল্ডার হিসাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে সম্মিলিত একাদশের সঙ্গে গভর্নর একাদশের খেলা হচ্ছিল, আমি সে ম্যাচে আম্পায়ার। কম্পটন শর্ট মিড অফে ফিল্ড করছিলেন —আমার থেকে কিছুটা সামনে। ঝাঁপিয়ে পড়ে কম্পটন একটি ভিন্নু মানকড়ের ক্যাচ ধরেন, ভিন্নু আমার থেকে অনেক স্পষ্টভাবে বলটি দেখতে পাচ্ছিলেন। ক্যাচ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্যাভেলিয়ানের দিকে পা বাড়ালেন। কিন্তু কম্পটন

হাত তুলে দেখালেন যে বলটি ধরার আগে মাটি স্পর্শ করেছিল—অর্থাৎ মানকড় নট আউট। এটি সহযোগিতার একটি সার্থক নিদর্শন।

যদি কোনো খেলোয়াড়ের প্রত্যয় হয় যে ব্যাটসম্যান আউট হয়নি তবে তার পক্ষে আউটের আবেদন করে আম্পায়ারকে অকারণ বিড়ম্বিত করা সঙ্গত নয়।

আম্পায়ারকে খেলা চলাকালীন সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়। কয়েক ওভার বল করার পর বোলার বিশ্রাম করতে পারে; নন্ স্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যানরাও অবসর পায়। কিন্তু আম্পায়ারের পায়ের পাতা স্থির, দৃষ্টি সজাগ, কর্তব্যে অচঞ্চল। সহানুভূতির দিক থেকেও আম্পায়ার বঞ্চিত। যদি কোন ফিল্ডার ক্যাচ মিস করে তবে তার দুর্ভাগ্য বলে অনেকের আক্ষেপ শোনা যেতে পারে, কিন্তু কোনো আম্পায়ার ভুল সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে শোনা যাবে নানা কটূক্তি। কিছুতেই একথা স্মরণে আসে না যে, আম্পায়াররাও ব্যাটসম্যান, বোলার কিংবা ফিল্ডারের মত একই ধাতুতে গড়া, তাদেরও ভুলত্রুটি হতে পারে।

আপীল প্রসঙ্গে: প্রসঙ্গে মাঠের প্রান্ত থেকে উইকেটের কাছাকাছি যে কোন ফিল্ডসম্যানই আপীল করতে পারে এবং সে আপীল যত প্রচণ্ড ও ভীতিপ্রদ হোক না কেন আম্পায়ারকে সে সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। অবশ্য এটা নয় যে পুরো দলটা একযোগে আবেদন করলেই আম্পায়ারকে তাতে সম্মতি দিতে হবে। প্রতিটি আপীলই তার গুণাগুণ দেখে বিচার করতে হবে। ১৯৪৮ সালে ফ্রাঙ্ক চেস্টার অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে খেলায় বোলার ও উইকেট-কীপার ছাড়া আর কারো আবেদনে জবাব দিতে অস্বীকার করেছিলেন। লিণ্ডওয়ালের একটি সারবস্তুহীন আবেদন অস্ট্রেলিয়ানদের সঙ্গে তাঁর বিসম্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অস্ট্রেলিয়ানদের অঙ্গভঙ্গী সহকারে বিকট আপীল চেস্টার অনুমোদন করেন নি। ১৯৫৮ ৫৯ সালে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্টে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে আম্পায়ার হিসাবে কাজ করার সময়ে অস্ট্রেলিয়ানদের সম্পর্কে চেস্টারের আপত্তির সঙ্গত কারণ আমি খুঁজে পাই। স্ট্যাথাম, ট্রুম্যান, রীজওয়ে, হল, গিলক্রিস্ট, ডেরেক সেকেলটন, মোজ, মেকিফ, রুর্ক, লিণ্ডওয়াল প্রভৃতিদের খেলা আম্পায়ার হিসাবে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এঁদের মধ্যে এলেন ডেভিডসনই আমার মতে সেরা বাঁহাতি বোলার। তিনি ওভার দি উইকেট বল করছিলেন। তাঁর প্রথম বলটি ই ব্যাটসম্যান কুন্দরনকে পুরোপুরি পরাস্ত করে এবং তাঁর প্যাডে লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গে একযোগে তীব্র আবেদন ওঠে।

যেহেতু বলটি লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে পড়ে এবং ঘুরে প্যাডের পার্শ্বদেশ ছুঁয়ে যায়, সেহেতু আমি দ্বিধাহীন, স্পষ্ট কণ্ঠে নট আউট ঘোষণা করি। আমার এই ঘোষণা ডীপ থার্ডম্যান-এ ফিল্ডিংরত ম্যাকডোনাল্ডকে নিশ্চয় সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তিনি অঙ্গভঙ্গী করে লাফাতে লাফাতে থার্ডম্যান থেকে উইকেটের কাছে এসে ডান হাত তুলে আউটের আবেদনে অনড় থাকেন ; ঐ আবেদনটি যদিও ইতিপূর্বেই নাকচ হয়ে গিয়েছিল। এটি উষ্ম-সৃষ্টিকারী দৃশ্য। আমি শান্তভাবে অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন রিচি বেনোকে বললাম, এ ধরনের ঘটনা স্বাভাবিক খেলার প্রতিকূল। বেনো ম্যাকডোনাল্ডকে ডেকে সে কথা বললেন।

সন্দেহের অবকাশ : ফ্রাঙ্ক চেস্টারের মতে সন্দেহের অবকাশ থাকলে তা শুধুমাত্র ব্যাটস্‌ম্যানের অনুকূলে যাবার কোন কারণ নেই। আম্পায়ারকে পরিষ্কারভাবে হ্যাঁ কিংবা না বলতে হবে। যদি ব্যাটসম্যান সন্দেহের অবকাশের সুযোগ পায় তবে বোলার ও ফিল্ডাররাই বা তা পাবে না কেন ?

আপীলের ভঙ্গী : শুধুমাত্র ভঙ্গী দিয়ে আবেদন করা যাবে না, মুখে স্পষ্ট করে তা জানতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমার আরেকটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। বেশ কিছুকাল আগে জামসেদপুরে হোলকার বনাম ইন্দোরের খেলায় আমি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করছিলাম। একবার, যিনি ব্যাট করছিলেন তিনি হোলকার দলের কর্নেল সি. কে. নাইডুর কাছে তাঁর অনুরোধ ছাড়াই ব্যাটে মেরে বলটি পাঠিয়ে দেন। ডাবল হিট হলে ব্যাটসম্যান আউট হবেন। সি. কে বলটি কুড়িয়ে নিয়ে স্থিরভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলেন—যেন এ ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত জানতে চাইছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি আপীল করছেন ? মুখে সে আবেদন উচ্চারণ না করলে আমার রায় দেবার প্রশ্ন ওঠে না। সি. কে. আর কোন কথা না বলে বোলিং মার্কে ফিরে গেলেন, তিনি নিজেকে আনস্পোর্টিং হিসেবে চিহ্নিত করতে চাইলেন না, আমিও একটি অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে বেঁচে গেলাম। আমি যদি তাঁর নীরব প্রশ্নের উত্তরে ব্যাটসম্যানকে আউট দিতাম তবে তিনি হয়ত বলতেন, ওকে কেন আউট দিল, আমি তো কোন আপীল করি নি।

আরেক ধরনের ব্যাপার হয় যখন ব্যাটসম্যান পরিষ্কার বুঝতে পারেন যে তিনি এল. বি. ডব্লু হয়েছেন আর তা বুঝেই দ্রুত তার পা-দুটি সরিয়ে এনে গভীর মনোযোগ দিয়ে নিজের আর উইকেটের অবস্থানটি লক্ষ্য করতে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান ম্যাকডোনাল্ড ১৯৫৯-৬০এ কানপুরে ভারতের

বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে জেস্থ প্যাটেলের এমন একটি লেগকাটার বল তার প্যাডে লাগলে ঠিক এমনি কাণ্ডটি করেছিলেন। আমাকে সেবারে দু'দফা আঙুল তুলে তাকে আউটের নির্দেশ দিতে হয়েছিল কারণ আমার প্রথম নির্দেশ তিনি মানেন নি। আমার সিদ্ধান্তের পিছনে যুক্তি হচ্ছে যে-মুহূর্তে বলটি প্যাডে লাগে সেই মুহূর্তটি হচ্ছে এ প্রসঙ্গে ধর্তব্য।

আম্পায়ার নির্বাচন: ইংলণ্ডে আম্পায়াররা কঠিন অভ্যাসে মানসিক দিক থেকে আবেগশূন্য হয়ে ওঠে এবং নিজেদের ঐ জগতের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতবর্ষে আম্পায়াররা ইংলণ্ডের আম্পায়ারদের তুলনায় সুযোগের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও পায় না। দীর্ঘদিন ধরে কাউন্টি ক্রিকেটের মাঠে অবস্থান করার ফলে ওদেশের আম্পায়ারদের ভুলের সংখ্যাও সীমিত হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে আম্পায়ার নিয়োগের পদ্ধতিটিও বড়ই ত্রুটিপূর্ণ। ইংলণ্ডে যাঁরা প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে সদ্য অবসর গ্রহণ করেছেন এমন খেলোয়াড়দের মধ্য থেকেই আম্পায়ার সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে আগে যথেষ্ট সাফল্য লাভ না করলেও আম্পায়ার হিসাবে তাঁরা সফল হয়েছেন। এইসব আম্পায়ারদের স্বাভাবিক কারণেও কিছু বাড়তি সুবিধা থাকে। প্রথম শ্রেণীর আম্পায়ারদের তালিকা কাউন্টি ক্রিকেট থেকেই মনোনীত হয় এবং অনুমোদনের জন্য এম. সি. সিকে দেওয়া হয়।

আর ভারতের ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে সিরিজের পাঁচটি টেস্টম্যাচের জন্য প্রতিটির পৃথক আম্পায়ার নির্বাচন করা হয়েছে। উইজডেনেও এ সম্পর্কে তিক্ত রসাত্মক মন্তব্যে বলা হয়েছে ভারতবর্ষেই সত্যিকারের প্রতিভার ছড়াছড়ি। বিজয় মার্চেন্টের মত একজন বিখ্যাত ক্রিকেটার বলেছেন, আমার মনে হয় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আম্পায়ারকে একটি সুযোগ দেবার নীতি পরিত্যাগ করে এদেশের চারজন সেরা আম্পায়ার বেছে নিয়ে তাদের যত বেশি সম্ভব টেস্ট ম্যাচ খেলাবার নীতি গ্রহণ করবেন। টেস্টম্যাচ আম্পায়ারদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযুক্ত জায়গা নয়, সেখানে সেরা ব্যক্তিরাই নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

নিরপেক্ষ আম্পায়ার: বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক ম্যাচে প্রতিযোগী দেশে দুটির বাইরের কোন আম্পায়ার নিয়োগের জন্য বেশ হৈ-চৈ শোনা যাচ্ছে। এর কারণ অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে আম্পায়ারদের প্রদত্ত দৃষ্টিকটু ভুল সিদ্ধান্তসমূহ। ফ্রাঙ্ক চেস্টারের মতে এই প্রচেষ্টা ৪০ দশকের শেষাশেষি

অস্ট্রেলিয়ার বিল উডফুলই প্রথম শুরু করেছিলেন। ফ্রাঙ্ক চেস্টার বলেছেন আম্পায়ার নির্বাচন বিধিতে তাকে নিরপেক্ষ হবার জন্যে কোন পৃথক নির্দেশ নেই কেননা একথা ধরেই নেওয়া হয়েছে যে তিনি একজন আম্পায়ারই হবেন আর কিছু নয়। ডন ব্রাডম্যানও ঐ প্রচেষ্টার বিরোধী ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান ও প্রাক্তন অধিনায়ক আর. বি. সিম্পসন কিন্তু নির্দলীয় আম্পায়ার নিয়োগের প্রচেষ্টা সমর্থন করেন। চেস্টার এবং ব্রাডম্যানের যুগ গত হয়েছে এবং নূতনতর পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। অন্ততপক্ষে, পরীক্ষামূলকভাবে এই চেষ্টা করে দেখা যাক না! নির্দলীয় আম্পায়ার হয়ত ন্যায়বিচার করতে পারবেন। কিন্তু এর সম্ভাব্যতায় আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে এশিয়ান গেমস হকিতে এমন নির্দলীয় আম্পায়ার একটি দলকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। রাজনৈতিক রীতিতে আম্পায়ার নিয়োগের বিষয়ে একটি দেশ আপত্তি জানিয়েছিল। আম্পায়ারদের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময় ও আম্পায়ারদের আন্তর্জাতিক কনভেনশনের ব্যবস্থা হচ্ছে। এটি একটি সঠিক পদক্ষেপ।

এল. বি. ডব্লু. এবং উইকেটের পিছনের ক্যাচ : আম্পায়ারের কাজের দুটি বিশেষ জটিল বিষয় হল এল. বি. ডব্লু. ও উইকেটের পিছনের ক্যাচ—বিশেষত তা লেগের দিকে হলে। এ প্রসঙ্গে আমি আরেকটি বিষয়কে যুক্ত করতে চাই ; তা হল রান আউট। আম্পায়ার হিসেবে আমি দেখেছি এ তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েই নানা অসন্তোষ তৈরি হয়। আমি যদিও উপরোক্ত তিনটি বিষয়কে একই তালিকাভুক্ত করতে চাই তবু একথা ঠিক যে এল. বি. ডব্লু-র মত বিতর্কিত বিষয় আর কোনটিই নয়। কোন ব্যাটসম্যানই সহজে তাঁর এল বি. ডব্লু আউটের রায় মেনে নিতে চান না। এল. বি. ডব্লু. আইনটি ১৯৩৭ সালে সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ১৮৮০ সাল থেকে আর. বি. লিটলটন অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে এম. সি. সি. সাধারণভাবে কোন আইনের পরিবর্তন চান না, যদি না সে বিষয়ে দীর্ঘদিনের সঠিক প্রয়াস থাকে। এন্টনি আর্মস্ট্রং এই রক্ষণশীল মনোভাবের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, ক্রিকেট খেলার মুস্কিল এটাই যে এর সঙ্গে অন্য কোন খেলার মিল নেই। গেরাল্ড ব্রডরীব বলেছেন যে আইনকানুন পাল্টাবার জন্য অসংখ্য সংস্কারবাদী চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যদি তারা প্রবেশের কণামাত্র সুযোগ পায় তবে অচিরে খেলাটি তার চরিত্র হারাবে।

তবে, ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের পরিবর্তে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স তৈরি হবার পরে এই রক্ষণশীল মনোভাব কিছু পরিমাণে শিথিল হয়েছে। কিছু আইনের সংশোধন হয়েছে। পরীক্ষামূলক আইনকানুন তৈরি হয়েছে। অতিরিক্ত টীকা ও নির্দেশ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কেবলমাত্র বল ছোঁড়ার সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য তিন বছর ধরে বিতর্ক চলেছিল ; এবং আজও এ বিষয়ে সন্তোষজনক সংজ্ঞা পাওয়া যায়নি। আরেকটি পরীক্ষামূলক আইন বিচারাধীন রয়েছে।

যাহোক এল. বি. ডব্লু এবং উইকেটের পিছনে ক্যাচ প্রসঙ্গে আবার ফিরে যাই। ১৯৩৭ সালের এল. বি, ডব্লু. আইনের উদ্দেশ্য ছিল বঞ্চিত বোলারদের কিছু সহায়তা করা, ব্যাটসম্যান ও বোলারের ঠিক মাঝখানে তুলাদণ্ডটি স্থাপন করা এবং অফের দিকের খেলাকে উৎসাহদান করা। এই সংশোধনের উদ্দেশ্য ছিল প্যাডে খেলার ঝোঁকটি বন্ধ করা। সংশোধিত আইনে বলা হয়েছে যে যদি কোন স্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যান দু-উইকেটের মাঝে তার অফের দিকের কোন বল শরীরের অংশ দিয়ে ঠেকায় এবং আম্পায়ারের মনে হয় সে বলটি বাধা না পেলে উইকেটে লাগত তবে ব্যাটসম্যান আউট হবে। কিন্তু কপট ব্যাটসম্যানেরা অচিরেই আবিষ্কার করল যে সংশোধনের মূল উদ্দেশ্যটি বানচাল করতে হলে অফের দিকের ভিতরে ঢুকে আসা বলগুলি প্যাডে খেলতে হবে। তখন আইনে আবার সংশোধন হল। ৩৯ (খ) ধারায় বলা হল অফ স্ট্যাম্পের বাইরেও যদি কোনও বলের উইকেটে লাগার সম্ভাবনা থাকে তবে সে বল বাধাপ্রাপ্ত হলে ব্যাটস্‌ম্যান এল. বি. ডব্লু. আউট হবে।

কিন্তু এমন নূতন আইন তৈরির ফলে ইন-স্যুইং ও অফ-স্পিন বোলাররা বাড়তি সুযোগ পেতে থাকল ; অফের দিকের মারের বদলে অনের দিকের খেলায় উৎসাহ দেওয়া হল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে রক্ষণাত্মক খেলাকেও। যেহেতু স্পিন ও স্যুইং বলে মেরে খেলার সাধারণ রীতির বাইরে কোন ব্যাটসম্যানই যেতে পারে না সেহেতু এই আইনের ফলে অফ ড্রাইভ ও কাটের মত সৌন্দর্যময় দুটি মারের সংখ্যা কমে গেল। এল. বি. ডব্লু. আইনের এই পরিবর্তনের ফলে লেগ ব্রেক ও স্যুইংয়ে পারদর্শী হতে আর কেউ চায় না।

এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে যদি লেগের দিকের বল সম্পর্কেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়। এর ফলে কোন বিশেষ ধরনের বোলিংকে প্রাধান্য

দেওয়া হবে না, সকলেই সমান সুযোগ পাবে। ডন ব্রাডম্যান ও ওয়াট দীর্ঘদিন ধরেই এল. বি. ডব্লু প্রসঙ্গে লেগ স্ট্যাম্পের দিকের বলগুলি সম্পর্কে আইনের সংশোধনের পক্ষে মত প্রচার করে যাচ্ছেন। কিন্তু ফ্রাঙ্ক চেস্টার তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বলেছেন যে এর ফলে আম্পায়ারদের উপরে আরও বোঝা চাপবে এবং ব্যাটিং করা আরও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে। এল. বি. ডব্লু আইনের এই পরিবর্তনের পথে অবশ্য প্রত্যেকেই ইচ্ছাকৃত প্যাডে খেলায় বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা প্রস্তাব করেছেন যে ভবিষ্যতে সব ধরনের বলই প্যাডে খেলা বন্ধ করতে হবে। কারণ প্যাড তৈরি হয়েছে বলের আঘাত থেকে ব্যাটস-ম্যানকে রক্ষা করার জন্য, তাকে খেলার আরেকটি উপকরণ হিসাবে ব্যবহারের জন্য নয়।

ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক আর. ই. এস. ওয়াট একটি অভিনব প্রস্তাব রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে উইকেট থেকে পপিং ক্রীজ পর্যন্ত তিনটি সাদা সমান্তরাল রেখা টানা হোক যাতে করে আম্পায়ার বলের পিচটি সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারবেন এবং ব্যাটসম্যান গার্ড নেবার জন্যে যে চিহ্ন দেন তার প্রয়োজন আর হবে না। তবে আমার মতে ঐ লাইনটি আট ফুট দূর থেকে টানা দরকার কেবলমাত্র তাহলেই আম্পায়ারের প্রয়োজন সাধিত হবে। আমি জি. ডব্লু. বেলডামের বিখ্যাত "গ্রেট ব্যাটসমেন এণ্ড দেয়ার মেথড এট এ গ্লান্স" গ্রন্থে আর. এন. স্পুনারের চমৎকার অফ-ড্রাইভের একটি ছবি দেখেছিলাম যাতে আট ফুট দূর থেকে লাইন টানা হয়েছিল। অবশ্য এটি একটি নেট প্র্যাকটিসের ছবি।

এল. বি. ডব্লুতে লেগ কথাটি অর্থহীন, কেননা বর্তমান আইনে ব্যাটসম্যানের মাথায় লাগলেও সে এল. বি. ডব্লু আউট হতে পারে। সেক্ষেত্রে এইচ. বি. ডব্লু শব্দটি যথার্থ হতে পারত। এল. বি. ডব্লু বিচারের সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল যে আম্পায়ার সকল সময় স্থির করতে পারেন না যে বলটি শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে। অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখেছি, যে বলটি ব্যাটসম্যানকে পরাস্ত করেছে এবং মনে হয়েছে নিশ্চিত উইকেটে লাগবে শেষ পর্যন্ত তা উইকেটের এক চুল তফাত দিয়ে চলে গেছে। তাই সকল সময়ে আম্পায়ারকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে ব্যাটসম্যান যে বলটি ফরোয়ার্ড খেলতে গিয়েছিল সেটি মাটিতে ছিল, নাকি উঁচুতে ছিল।

তিনিই একজন যোগ্য আম্পায়ার যিনি এল. বি. ডব্লু সম্পর্কে মুহূর্তের বিচারে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারেন। ফ্রাঙ্ক চেস্টার সম্পর্কে

বলা হয়ে থাকে যে তিনি এল. বি. ডব্লু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে কয়েক মুহূর্ত বিবেচনা করতেন যখন প্রত্যেকে রুদ্ধশ্বাসে সেই সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় থাকতেন। মুহূর্তের সিদ্ধান্তে ভুলও হতে পারে। চোখে যে ছবি ধরা পড়ল তা মস্তিষ্কে পৌঁছুতেও কিছু সময় লাগে।

লেগের দিকের প্রতিটি ক্যাচকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বিচার করতে হবে, কেননা এক্ষেত্রে বল ও প্যাড পরস্পরের খুব কাছে থাকে। বলের ফ্লাইট লক্ষ্য করতে হবে ব্যাটের কানায় লাগা 'ক্লিক'টিকে। এই বিচারে যেন দক্ষতার কোন ঘাটতি না থাকে।

কাছ থেকে রান আউটের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে বেল ফেলার সময়ে বলটি হাতে ছিল কিনা ; এবং যেখান থেকে বল ফেরত এল একজন আম্পায়ার সত্বর সেখানে যাবেন এবং যেখান থেকে পপিং ক্রীজ স্পষ্ট দেখা যায় সেখানে পজিশন নিয়ে দাঁড়াবেন। আর যেখান থেকে বল ফেরত এল তার উল্টো দিকে যদি আম্পায়ার দাঁড়ান তবে বোলার ও ফিল্ডাররা তাঁর আড়ালে পড়ে যাবে। এ সম্পর্কে তিনটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এ তিনটি উদাহরণই ফ্রাঙ্ক চেস্টারের জীবন থেকে নেওয়া। একবার কেন্টের ফাস্ট বোলার অ্যালেন ওয়াল এল. বি. ডব্লুর আবেদন করলেন ওয়ালি হ্যামণ্ডের বিরুদ্ধে। হ্যামণ্ড একটি আনকোরা নতুন ব্যাট ব্যবহার করছিলেন। প্রথম বলেই আবেদন হল ওয়াল বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে চেস্টার সে আপীল নাকচ করে দিয়েছেন। হ্যামণ্ড কিছুই বুঝতে পারেন নি। কিন্তু আম্পায়ার তাঁর ব্যাটে বল খেলার অস্পষ্ট চিহ্ন দেখেছিলেন। বিস্মিত বোলারকে ডেকে তিনি দেখিয়েছিলেন ব্যাটের ধারে সদ্য বল খেলার অস্পষ্ট দাগ। তাতে প্রমাণিত হল তিনি নির্ভুল। ইয়র্কশায়ার বনাম মিডলসেক্সের কাউন্টি চাম্পিয়ানশিপের খেলায় হারবার্ট সাটক্লিফকে নট আউট ঘোষণার মধ্যে তাঁর অসামান্য প্রতিভা প্রকটিত হয়। জি. ও. এলেনের একটি বল সাটক্লিফ এগিয়ে খেলেন। বলটি ফ্রেড প্রিন্সের বিশস্ত দস্তানায় জমা পড়ে এবং মাঠ শুদ্ধু সকলেই ব্যাট খেলার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে একযোগে কট বিহাইণ্ডের আবেদন ওঠে। চেস্টার সে আবেদন বাতিল করে দেন। ফলে মিডলসেক্স দলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ওভার শেষ হবার পর চেস্টার ব্যাটসম্যান প্রান্তের উইকেটে হেঁটে যান এবং বিক্ষুব্ধ খেলোয়াড়দের দেখান প্রকৃত ঘটনাটি কি ঘটেছিল। বলটি অফ স্ট্যাম্পের উপরের দিকে সামান্য লেগেছিল কিন্তু কোন বেল পড়ে নি। নতুন

বলের মৃদু লাল ছাপ তখনও উইকেটে লেগেছিল। তৃতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৩৮-এ ট্রেন্টব্রীজে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলার সময়ে। ডন ব্র্যাডম্যান এই ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত ছিলেন এবং তিনি চেস্টারের সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ঐ সময়ে ব্র্যাডম্যান ৫১ রানে বেশ আস্থার সঙ্গে ব্যাট করছিলেন। রেগ সিনফীল্ডের একটি বল তিনি ফরোয়ার্ড খেলতে যান এবং বল সোজাসুজি উইকেটকীপার লেসলি একসের কাছে চলে আসে। এমস তৎপরতার সঙ্গে উইকেট ভেঙে দিয়ে স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার ই. রবিনসনের কাছে স্ট্যাম্প আউটের আবেদন জানান। রবিনসন সে আবেদন বাতিল করে দিলে এমস আম্পায়ার চেস্টারের কাছে পুনরায় আবেদন করেন। চেস্টার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কট বিহাইণ্ড বলে আউট ঘোষণা করেন। সিনফীল্ড ব্যাটে খেলার কথা বুঝতে পারেন নি বলে ক্যাচের আবেদন করেন নি। তিনি বলেছেন, কজন আম্পায়ার এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ডন ব্র্যাডম্যান বলেছেন তাঁর জীবনে দেখা এটি একটি শ্রেষ্ঠ ও নির্ভুল সিদ্ধান্ত।

রান আউট বনাম স্ট্যাম্প আউট : কেবলমাত্র সাধারণ দর্শকদের মধ্যেই নয়, আম্পায়ারদের মধ্যেও রান আউট ও স্ট্যাম্প আউট সম্পর্কে অনেক সময়ে মত পার্থক্য ঘটে থাকে। যখন বলটি 'জীবিত' থাকে তখন ব্যাটসম্যান দুই উইকেটের মধ্যে দৌড়নো অবস্থায় অথবা ক্রীজের বাইরে অবস্থানকালে যদি ফিল্ডিং পক্ষ উইকেট ভেঙে দেন তবে তিনি রান আউট হবেন। নূতন বিধির ৪১ নং ধারায় বলা হয়েছে যদি তিনি রান নেবার উদ্দেশ্যে দৌড় শুরু না করেন তবে ৪২ ধারায় যে পরিস্থিতি বর্ণিত হয়েছে তা বর্তমান থাকলে এমন কি নো বল ডাকা হলেও ব্যাটসম্যান রান আউট হবেন না। কি পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে ? ৪২-এর ধারায় স্ট্যাম্প আউটের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যে আউট অন্য কোনও ফিল্ডারের সাহায্য ছাড়াই কেবলমাত্র উইকেট-রক্ষকই করতে সক্ষম। যদি কোনও বলে নো বল ডাকা হয় এবং অন্য ফিল্ডারের কোন সাহায্য ছাড়াই উইকেট রক্ষক ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া স্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যানের উইকেট ভেঙে দেয় তখন রান করার চেষ্টা না থাকলে সে রান আউট হবে না, যেহেতু নো বলে স্ট্যাম্প আউট হয় না, সেহেতু সে নট আউট থাকবে। কিন্তু ধরে নেওয়া যাক, এমনি একটি নোবল উইকেট-রক্ষকের পরিবর্তে দ্বিতীয় স্লিপের ফিল্ডারের কাছে চলে গেল এবং সে তৎপরতার সঙ্গে উইকেট ভেঙে দিল যখন ব্যাটসম্যান পপিং ক্রীজের বাইরে

অবস্থান করছিল। যদিও ব্যাটসম্যান তখন রান নেবার চেষ্টায় ছিল না, তবুও সে রান আউটের আওতায় পড়বে যেহেতু উইকেট-রক্ষক ব্যতীত অপর একজন খেলোয়াড়ের দ্বারা উইকেট ভাঙা হয়েছে যখন ব্যাটসম্যান পপিং ক্রীজের বাইরে অবস্থান করছিল এবং বলটিও 'জীবিত' ছিল।

থ্রো : ছোঁড়া বল : থ্রো অর্থাৎ বল ছোঁড়া সম্পর্কে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত জরুরী। কোনও বোলারের বলকে নো বল ডাকার অধিকার আম্পায়ারের আছে। কিন্তু সিদ্ধান্তটি যদি ভুল হয় তবে তার মাশুল হিসাবে বোলারের ক্রিকেট জীবনটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ক্রিকেট বিধির ৪৬ (৪) ধারায় আম্পায়ারকে খেলার যথার্থতা বিচারের একমাত্র অধিকারী বলা হয়েছে। একটিমাত্র ব্যক্তির উপর এত গুরুদায়িত্বভার অর্পণ করা সঙ্গত কিনা সেকথা বিবেচনা করে দেখা দরকার।

এ বিষয়ে এটাই বিধেয় হওয়া উচিত যে, একজনের বোলিং পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও আম্পায়ারের যদি ধারণা হয় যে সে বল ছুঁড়ে থাকে তবে ঐ বিষয়টি একটি আম্পায়ার প্যানেলের সামনে তাকে উপস্থিত করা। প্যানেল সেই বোলারকে বিশদভাবে পরীক্ষা করবেন, তার ডেলিভারি লক্ষ্য করবেন এবং তাঁরাও যদি নিশ্চিত হন যে বোলার সত্যিই ছুঁড়ে বল করে থাকে তবে তাকে সতর্ক করে করে দেবেন, যাতে করে সে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ভেতর নিজের ত্রুটি সংশোধন করে নিতে পারে। যদি সেই সময়ের ভেতরেও সে ত্রুটি না শোধরায় তবে তার নাম কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে খারিজের জন্যে পাঠানো হবে। সারে কাউন্টি ও ইংল্যাণ্ড দলের বিখ্যাত ফাস্ট বোলার লক এক সময়ে ছুঁড়ে বল করতেন; পরবর্তী কালে সতর্কীকরণের পর তিনি নিজেকে সংশোধন করে নেন।

বল ছোঁড়া সম্পর্কে সর্বসম্মত কোন একটি সংজ্ঞা এখনও রচনা করা সম্ভব হয় নি। বিভিন্ন সংজ্ঞা বিচার করে দেখা হয়েছে এবং তা আজও চলছে। তাই এখনও এ সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্তের দায়িত্ব আম্পায়ারের আপন সংজ্ঞায় নিহিত আছে। তবে বিভিন্ন লোকের বক্তব্য তাঁর সিদ্ধান্ত তৈরি করতে সহায়তা করে।

বল ডেলিভারির সময় আম্পায়ারের লক্ষ্য করা কর্তব্য যে বোলারের হাতখানি সোজা সরলরেখায় অবস্থান করছে কিনা। তাই সংজ্ঞায় বলের ডেলিভারির সময়ে কব্জির মোচড় দেওয়া বন্ধ করা হয় নি। কব্জির মোচড়কে ছোঁড়া বলা চলে না। আবার এমন কথাও বলা চলে যে কব্জির মোচড় কব্জির এই

আন্দোলনটিকেই ভুলক্রমে ঝাঁকি হিসাবে ধরা হয়, তাই কব্জির কাজের কোনও সমালোচনা হয় না।

ধীরগতিসম্পন্ন ক্যামেরার ছবিতে বিভিন্ন কোণ থেকে বোলিং অ্যাকশনগুলি স্পষ্টভাবে বিচার করা যায়। এইভাবে বিচার করতে পারলেই সঠিক বিচার করা সম্ভবপর হবে। এটি সত্যিই একটি কঠিনতম কাজ—কোন্ বলটি থ্রো এবং কোন বলটি তা নয়—এই সত্য বিচার করা। যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার নিশ্চিত সোপান।

এ প্রসঙ্গে ১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতের দিল্লীর প্রথম টেস্টের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত একটি ঘটনার কথা বলতে চাই। লালা অমরনাথ আমাকে ও আমার সহযোগী আম্পায়ার ইউনুসকে জানান যে সফরকারী দলের আয়ান মেকিফ ও জর্ডন রুর্ক ছুঁড়ে বল করে থাকেন এবং পাকিস্তানে সফরের সময় এটি প্রমাণিত হয়েছে। এই ইঙ্গিতটি আমরা স্মরণে রেখেছিলাম। আর স্থির করেছিলাম যে আমরা দুজনের কাউকেই নো বল ডাকব না যতক্ষণ না স্কোয়ার লেগ অঞ্চল থেকে তাদের বোলিং পদ্ধতি যাচাই করে বলের 'থ্রো' সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি। আমরা খুঁটিয়ে দেখেও তাদের বলগুলি 'থ্রো' বলে স্থির নিশ্চিত হতে পারি নি। স্ট্রাইকিং ব্যাটসম্যানের কাছ থেকে আয়ান মেকিফ ও জর্ডন রুর্ক দুজনের বোলিং ভঙ্গীটাই বিভ্রান্তিকর ছিল, ফলে বলগুলি 'থ্রো'র মত দেখাচ্ছিল। কিন্তু 'অন'-এর দিক থেকে বিশদভাবে লক্ষ্য করলেন ভুলটি ধরা পড়েছিল। যারা বল থ্রো সম্পর্কে অভিযোগ খণ্ডন করেছেন তাঁদের অন্যতম হলেন সি. ভি. গ্রিমেট। কিন্তু ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ১৯৫৮-৫৯র টেস্ট সিরিজে বিল বাউস সবচেয়ে সোরগোল তুলেছিলেন। ১৯৫৭-৫৮য় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলায় আয়ান মেকিফ কিংবা জর্ডন রুর্ক কারোরই ডাক পড়েনি। এমনকি ১৯০৮-৫৯এ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেও নয়। কিন্তু আমরা তাদের ত্রুটি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি নি। তাই এ বিষয়ে নীরব থেকেই আমাদের মতামত জ্ঞাপন করেছিলাম।

সামনের পা ও নো-বল আইন : সামনের পা ও নো বল আইনে বল ছোঁড়ার আগে পা টেনে নেবার পুরোনো রীতিটির অবসান ঘটেছে এবং বোলারকে পীচ পর্যন্ত ছুটে আসার অভ্যাসটি ত্যাগ করতে হয়েছে। এই বিধি অনুযায়ী আম্পায়ার নো-বল ডাকবেন যদি বোলার বল ডেলিভারির সময়ে তার সামনের পায়ের কোন অংশ পপিং ক্রীজের পিছনে মাটিতে না পড়ে

কিংবা আম্পায়ার এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন যে বোলারের পিছনের পা রিটার্ন ক্রীজের মধ্যে পড়েনি বা তা স্পর্শ করে নি।

অস্ট্রেলিয়া দলের অনুরোধে নূতন বিধির ২৬ নং ধারায় যাতে বোলারের সামনের পায়ের ভূমি স্পর্শ করা ও তুলে নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার সামান্য পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। এতে বোলারকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা দেওয়া হলেও আম্পায়ারের উপর বাড়তি দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ পপিং ক্রীজের থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করে এটা নির্ধারণ করা কষ্টকর যে বোলারের কোনও অংশ পপিং ক্রীজের মধ্যে আছে নাকি তার উপরে চলে গেছে। যদিও তার সম্মুখের পা পপিং ক্রীজের ঠিক উপরে শূন্যে অবস্থান করে এবং তার কোন অংশই পপিং ক্রীজের মধ্যে না থাকে তবে ঐ অবস্থায় যে বল ডেলিভারি করা হবে তা অবশ্যই নো-বল হবে। সম্মুখের পা সম্পর্কে আইনের সামান্য রদবদল সত্বেও অস্ট্রেলিয়া কিন্তু এখনও পিছনের পায়ের নীতি আঁকড়ে থাকতে চায়, তাই তারা নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে করে যথেষ্ট পরিমাণে নো-বল ডাকা না হয় এবং ব্যাটসম্যান তা থেকে বাড়তি সুবিধা পেতে না পারে।

পিছনের পা নীতির ত্রুটি লক্ষ্য করে দীর্ঘদিন ধরে অনেক চিন্তা-ভাবনার ফলেই সম্মুখের পায়ের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য হল—কোন ব্যাটসম্যান যেন অবৈধ বলের শিকার না হন এবং তিনি যেন সহজভাবে খেলতে পারেন।

১৯৫৮-৫৯ সালে রিচি বেনোর দলেই গর্ডন রুর্ক বলে যে বোলারটি এসেছিলেন (যাঁর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) তিনি ইচ্ছা করে পা এগিয়ে নিয়ে যাবার নীতিতে অটল ছিলেন এবং ঐ বছরে কানপুর টেস্টে—যে ম্যাচ 'জেমু প্যাটেল টেস্ট' হিসেবে চিহ্নিত—তাঁর পিছনের পা-টিও পপিং ক্রীজ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতেন। বাঁ পা এমন এগিয়ে থাকার দরুন তার পায়ের আঙুল বল ছোঁড়বার আগে রিটার্ণ ক্রীজের উপরে এসে যেত। আমি তাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছিলাম এবং পপিং ক্রীজের একটু পিছনে পপিং ক্রীজ ও রিটার্ন ক্রীজের মাঝে একটি লাইন টেনে দিলাম যার ফলে সামনের পা সেই লাইনের মধ্যে মাটিতে না ফেললে নো বল হবে। আমি মনে মনে একটি হিসাব কষে নিলাম যে সম্মুখের পা যদি খুব বেশী এগিয়ে না যায় তবে পিছনের পায়ের অবস্থানে খুব হেরফের হবে না। রুর্ক একজন প্রকৃত খেলোয়াড় মনোভাবাপন্ন

ছিলেন তাই তিনি পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য দীর্ঘদিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করা সহজসাধ্য ছিল না। লিণ্ডওয়ালেরও বল করার সময়ে পা এগিয়ে নেবার অভ্যাস ছিল যদিও তা কর্কের মত নিরবচ্ছিন্ন ছিল না।

উইকেট-রক্ষক : উইকেট-রক্ষক সম্পর্কিত আইন খুব বেশি নেই আর তাতে কোনও জটিলতাও নেই। শুধুমাত্র, যতক্ষণ পর্যন্ত বলটি ব্যাটসম্যান স্পর্শ (ব্যাট অথবা শরীরের কোন অংশ দিয়ে) না করবে কিংবা সেটি উইকেট অতিক্রম না করবে ততক্ষণ তাকে উইকেটের পিছনে অবস্থান করতে হবে। এর কারণ হল সে যাতে ব্যাটসম্যানের স্বচ্ছন্দ খেলায় বাধা সৃষ্টি না করতে পারে। অবশ্য হাল আমলে ৪৩নং ধারার যে পরিবর্তন হয়েছে তাতে উইকেট রক্ষকের এমনি অনুপ্রবেশ সম্পর্কে বাধানিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাতে বলা হয়েছে এমন অনুপ্রবেশের ফলে যেন ফিল্ডিংপক্ষ কোনও বাড়তি সুযোগ না পায়, ব্যাটসম্যানের স্বাভাবিক খেলা বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তার ফলে ব্যাটসম্যান যেন আউট না হয়। ফুট-বলে অফ সাইড আইন যেমন আছে যাতে কোন খেলোয়াড় অফ সাইডে অবস্থান করলেও যদি খেলার মধ্যে সে সময় তার কোন ভূমিকা না থাকে তবে তাকে অন-সাইড হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের পঞ্চম টেস্টে আম্পায়ার হিসাবে আমাকে একটি অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। পঞ্চম দিনের অপরাহ্ণে খেলাটির পরিণতি নিশ্চিত ড্র-এর দিকে এগোচ্ছিল এবং ভারতীয় দলনায়ক হেমু অধিকারী দুর্ভেদ্য আত্মরক্ষামূলক নেতিবাচক ব্যাটিং করে যাচ্ছিলেন। কুলি স্মিথ বল করতে এসে আকাশছোঁয়া লোপ্পা বল দিয়ে অধিকারীকে আউট করার জন্য প্রলুব্ধ করতে লাগলেন। বল-গুলি প্রায় লম্বের মত পপিং ক্রীজে এসে পড়ছিল এবং অধিকারী সোজা ব্যাটে আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে খেলছিলেন। এমন একটি বল অধিকারী খেলবার আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক এবং উইকেট-রক্ষক আলেকজাণ্ডার পিছন থেকে হঠাৎ অধিকারীর সামনে উইকেটের উপরে এসে দাঁড়ালেন। অধিকারী যথারীতি আত্মরক্ষামূলক ব্যাট চালালেন। বলটি উপর থেকে পড়তে অনেক সময় লাগছিল। তাই আলেকজাণ্ডার সহজে উইকেটের লাইন পার হয়ে ব্যাটের কাছে এলেন এবং অধিকারী দ্বিতীয়বার ব্যাট না চালালে কট আউট হতেন।

অবশ্য দ্বিতীয়বারের ব্যাট চালনা আমি দেখতে পাইনি কেননা আলেকজাণ্ডার এসে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন যে আমার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুবার বলে ব্যাট চালনার জন্যে আউটের একটি জোর আবেদন উঠল। আমি সেই আবেদন অগ্রাহ্য করলাম। বলটি ব্যাটসম্যান মারবার কিংবা তাকে অতিক্রম করে যাবার আগেই উইকেট-রক্ষক উইকেটের রেখা অতিক্রম করে ব্যাটসম্যানের কাছে চলে এসে তাকে ব্যাট চালনার স্বাভাবিক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছিল। ক্রিকেট বিধির ৪৩ ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে ব্যাটসম্যানকে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক সুযোগ থেকে কেবলমাত্র ৩৭ ধারার ২নং টীকা ছাড়া উইকেট-রক্ষক কিছুতেই বঞ্চিত করতে পারবে না। এক্ষেত্রে সে সুযোগও থাকছে না কারণ আলেকজাণ্ডারই প্রথমে উইকেট অতিক্রম করে এসে ৪৩ ধারা অনুযায়ী বিধি ভঙ্গ করেছেন। ঘটনার পারস্পর্য অনুযায়ী সেই অপরাধেরই প্রথম বিচার করতে হবে। রীতিসম্মত খেলা সম্পর্কে ৪৬এর ধারায় যে কথা বলা হয়েছে তাও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যা হোক, আলেকজাণ্ডারকে ৪৩—৪৬ ধারাগুলি বিশদভাবে বুঝিয়ে বললে তিনি আমার সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ভয়-দেখানো বল : ৪৬ বিধির ৪(৬) টীকায় পরিচ্ছন্ন খেলা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে ক্রমাগত খাটো লেংথের দ্রুত বল ফেলার অর্থ ব্যাটসম্যানকে ভয় দেখানো। গত কয়েক বছর ধরে এই ধরনের বোলিং সকলের আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার টমসন, লিলি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অ্যাণ্ডি রবার্টস্ ও মাইকেল হোল্ডিং প্রভৃতির দ্রুতগতিসম্পন্ন বোলিং এর ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা সকলের জানা। ভারতের তৎকালীন অধিনায়ক বিষেন সিং বেদী জ্যামাইকার কিংসটনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেস্টকে সঙ্গত কারণেই 'যুদ্ধ' আখ্যা দিয়েছিলেন। যে কোন মূল্যে টেস্ট জেতার প্রয়াস ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের।

মাইকেল হোল্ডিং রাউণ্ড দ্য উইকেট বল করেছিলেন। তিনি এমন একটা কোণ থেকে বল করছিলেন যে বল মাটিতে পড়েই ব্যাটসম্যানের কাঁধ বা মাথা পর্যন্ত লাফিয়ে উঠছিল। এ ধরনের বলের একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্যাটসম্যানকে ভয় দেখানো, এমনকি তাকে আঘাত করা। জিম লেকার এই ব্যাপারে এত বেশি বিরক্ত হয়েছিলেন যে পরবর্তী কালের একটি রচনায় তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করে লিখেছিলেন— তাদের এমন ব্যবহার আমরা দীর্ঘদিন উপেক্ষা করতে পারি না। এ ধরনের একরোখা বোলারদের সম্পর্কে অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই আমাদের যা করণীয় তা করতে হবে। আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই যে এ

ধরনের বাউন্সারের ধারা যদি চলতে থাকে তবে অচিরেই এমনদিন আসবে যে টেস্টের আসরে মৃত্যুর শোক পালন করতে হবে। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, দিনকে আর গড়িয়ে দেওয়া চলবে না। মৌখিক শিষ্টাচারের দিনাবসান হয়েছে, এখন আইনসম্মত বিধিনিষেধ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। আমার মতে সারা পৃথিবীতেই এ ধরনের একটা আইন হওয়া উচিত যার ফলে প্রতি ওভারে একটির বেশি বাম্পার নিষিদ্ধ হবে এবং যে এই বিধিবিষেধ ভঙ্গ করবে সতর্কীকরণের চাইতেও গুরুতর শাস্তি প্রদানের কথা ভাবতে হবে। একই ওভারে দ্বিতীয় বাউন্সারের জন্য শাস্তিস্বরূপ ব্যাটসম্যানের ব্যক্তিগত স্কোরে অতিরিক্ত দশ রান যোগ হবে, আর ঐ রান বোলারের ব্যক্তিগত খতিয়ানে যুক্ত হবে।

৪৬ ধারার উপধারা ৬-এর ২নং টীকায় বলা হয়েছে— যদি আম্পায়ারের মনে হয় ক্রমাগত ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এ ধরনের শর্ট পীচ বল ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হচ্ছে তবে তা অন্যায় বলে বিবেচিত হবে।

এখন এই 'ক্রমাগত' ও 'ধারাবাহিকভাবে' এবং 'ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে' ইত্যাদি শব্দগুলি এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় যে ঐগুলি সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। অংশত এই কারণে এবং অংশত জাতীয় আবেগের কারণে কোনও আম্পায়ার তাঁর বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করে দু'বার সতর্কীকরণের পর ইনিংসের অবশিষ্ট সময়ের জন্য কোন বোলারকে বল করা থেকে বিরত করেন নি যদিও ১৯৩২-৩৩-এর বডি লাইন বোলিং-এর নোংরামি থেকে এখন অনেক বেশি বাউন্সার মাঠে ছোঁড়া হচ্ছে। এখন সকলে ভালো খেলার চাইতে স্বদেশের জন্য জয় অর্জন করতে চায়। সোনার দিনগুলি গত হয়েছে। বিগত শতাব্দীতে আর্নেস্ট জোন্স একবার ডব্লু. জিকে বাউন্সার দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। অথবা ওয়ারসেস্টারশায়ারের খেলোয়াড় ডব্লু. বি. বার্নস, যিনি বডি লাইন বোলিং-এর একজন উদ্যোক্তা তিনি ১৯১০ সালে লর্ডসের মাঠের খেলায় স্যার বোলহাম ওয়ার্নারের আপত্তি শুনে বাউন্সার ছোঁড়ার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন। বার্নসের নাম এখন হয়ত অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিবেগসম্পন্ন বোলার ছিলেন। দীর্ঘ দৌড়ের পর তিনি যখন বল ছুঁড়তেন বাতাসে তীব্র শব্দ তুলে তা গোলার মত ছুটে যেত যার ফলে ব্যাটস-ম্যানকে লেগের দিকে সরে গিয়ে আত্মরক্ষা পর্যন্ত করতে হত।

১৯৩২-৩৩ সালে ইংলণ্ডের অধিনায়ক জার্ডিন অস্ট্রেলিয়া সফরের সময়ে

কিংবদন্তীর নায়ক ব্রাডম্যান, যিনি মাত্র ২১ বছর বয়সে ৭টি ইনিংস খেলে ৯৭৪ রান করেন এবং তাঁর ক্রীড়ানৈপুণ্যে ১৯৩০ অস্ট্রেলিয়া অ্যাসেজ জয় করে, তার শৌর্যের-দীপ্তি ম্লান করে দেবার উদ্দেশ্যে 'বডি লাইন' বোলিং-এর আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার ফলেই ৬নং উপধারাটি ৪৬নং ধারায় যুক্ত হয়। তবে জার্ডিনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। লারয়ুড, ভোসি ও বাউসের যৌথ আক্রমণে গড় ৫০ রানের মধ্যে ব্রাডম্যান বাঁধা পড়েন। ইংলণ্ড ৪-১ ম্যাচের ব্যবধানে সিরিজে জয়লাভ করে। কিন্তু এই সিরিজের ফলে দু দেশের টেস্ট ম্যাচ খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

কারো কারো মতে 'ধারাবাহিক' শব্দটির যথাযথ ও শুদ্ধ সংজ্ঞা দেওয়া প্রয়োজন। ঐ আইনেরও একটা যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব এবং ছয় বলের ওভারে দুটি বীমার/বাউন্সার সম্পর্কেও একটি সুষ্ঠু বিধিনিষেধ আরোপ করা চলে।

ত্রিশের দশক থেকে এ বিষয়ে প্রতিবাদ ও বাধাদান চলে আসছে এবং 'স্ট্যাণ্ডিং ক্লিয়ার অফ দি উইকেট' এবং 'অ্যাট দি ব্যাটসম্যান' বাক্যাংশ দু'টি আইন থেকে বাদ দেবার ফলেও এ বিষয়ে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। বরঞ্চ বর্তমানে আরও বেশি বাউন্সার ছোঁড়া হচ্ছে এবং এই নোংরামি ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। কোন কোন ব্যক্তি মনে করেন যে মাঝে মাঝে ফাস্ট শর্ট পীচ বল দেওয়া ক্রিকেট খেলারই একটি অঙ্গ। এই মনোভাব এবং ক্রিকেটের বর্তমান বিধি যুক্তভাবে বিচার করে বলা যেতে পারে যে যদি একজন বোলার তার প্রথম বলেই শর্ট পীচ-বাউন্সার ছোঁড়ে এবং তাতে যদি ব্যাটসম্যান আহত হয় তবে তা কিন্তু বিধিসম্মত হবে, অবশ্য তার অসংখ্য বাউন্সার দেওয়া অনুমোদিত হবে না। তাই অনেকেই বাউন্সার পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী।

ফাস্ট শর্ট পীচ বলের নেতিবাচক দিক হল স্কোরিং-এর হার কমে যাবে এবং ফিল্ডিং অন সাইডে ছড়ানো হবে। আর ঘণ্টায় ১৭.৫ ওভার খেলার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিষদের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তা কার্যকরী হবে না।

১৯৭৫ সালের মে মাসের শেষে প্রুডেনশিয়াল কাপের খেলা শুরু হবার আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিষদের সভায় কতগুলি বিশেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যদিও এগুলি পরবর্তী কালে ভারত ও ইংলণ্ড সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মান্য করে নি। যাহোক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি হল :

(১) আম্পায়ারকে রীতিসম্মত খেলা সম্পর্কে ৪৫ নং এবং ওয়াইড বল সম্পর্কে ২৩ নং ব্যাখ্যা করতে বলা হতে পারে।

(২) দলের ম্যানেজার ও ব্যাটসম্যান তাঁর ফাস্ট বোলারদের নির্দেশ দেবেন যাতে করে বিপক্ষদলের অস্বীকৃত ব্যাটসম্যানের উদ্দেশ্যে বাউন্সার না ছোঁড়া হয়। ১৯৭৬ সালের জুলাইয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিষদ শর্ট পীচ ফাস্ট বল করা সম্পর্কে বাধানিষেধ আরও কঠোর করে।

(ক) টেস্ট ম্যাচ কিংবা অন্য ম্যাচে নিরবচ্ছিন্ন শর্ট পীচ ফাস্ট বল করা বে-আইনী বলে ঘোষণা করে।

(খ) অস্বীকৃত ব্যাটসম্যানের উদ্দেশ্যে বাউন্সার দেওয়াও বে-আইনী হবে।

(গ) যে বল ঠুকে দিলে ব্যাটসম্যানের কাঁধ কিংবা তার ওপরে লাফিয়ে উঠতে তাকেই বাউন্সার বলা হবে।

(ঘ) প্রতিটি অনুমোদিত দেশে আম্পায়ারদের ক্রিকেট বিধির এই ৪৬(৬) ধারা মান্য করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে।

প্রতিটি সদস্য-দেশকে বলা হয়েছে যে তারা যেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে ৪৬ নং সংশোধনী প্রয়োগ করে তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং এ বিষয়ে কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব থাকলে তা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিষদে পাঠিয়ে দেয়।

এই বাক্য কয়টির মধ্য দিয়ে একথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে সংশোধনটি জরুরী এবং তার পরিমার্জনও আবশ্যক।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিষদ সতর্কীকরণ সম্পর্কে আম্পায়ারদের নিম্নলিখিত বিধি অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছে—

(ক) ভীতিসঞ্চারক বল যে দিচ্ছে সেই বোলার ও দলের অধিনায়ককে প্রথমে সতর্ক করে দিতে হবে।

(খ) যদি ঐ ধরনের ক্রীড়ারীতির পরিবর্তন না হয় তবে অধিনায়কের দৃষ্টি পুনরায় আকর্ষণ করতে হবে।

(গ). যদি তবুও ঐ ধরনের বোলিং যদি চলতে থাকে তবে সেই বোলারের বোলিং বন্ধ করতে হবে।

এই সংশোধনীর মধ্যে শর্ট পীচ বল সম্পর্কিত সংজ্ঞাটিরও কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। নিয়মমত যখন একটি বল লং এবং শর্ট পীচের মধ্যে পড়ে কাঁধ সমান বা তার বেশি লাফিয়ে ওঠে সেইগুলিকে সেই ভীতিসঞ্চারী বোলিং বলা হয়ে থাকে।

পরিবর্ত: বদলি খেলোয়াড়: ক্রিকেট বিধির ২নং ধারায় পরিবর্ত বা বদলি খেলোয়াড় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি

একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এই ধারাটি একদা প্রভূত বিতর্ক ও আন্দোলন উপস্থিত করেছিল। কোন কোন পরিস্থিতিতে একটি দল তার অধিকার অনুযায়ী পরিবর্ত খেলোয়াড় নামাতে পারবে এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে বিপক্ষ অধিনায়কের সম্মতি নিতে হবে এ বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হল। এটাও স্থির হল যে যখন একজন পরিবর্ত খেলোয়াড় নেওয়া হবে তখন বিপক্ষ অধিনায়ককে তা জানানো হবে।

একজন আহত ব্যাটসম্যানের পক্ষে উইকেটের মধ্যে দৌড়বার জন্যে কে রানার হিসেবে খেলতে পারবে? এ বিষয়ে এম. সি. সি র পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছিল তাকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তি বলা যেতে পারে। তাতে বলা হয়েছিল: বিধিসম্মতভাবে ফিল্ডিংকারী দলের অধিনায়ক আহত ব্যাটসম্যানের পক্ষে কে দৌড়বে তাকে নিয়ে আপত্তি করতে পারবে না; তবে এটি প্রচলিত রীতি যে, যে-সকল ব্যাটসম্যান ইতিমধ্যেই আউট হয়েছে কি বা যারা একেবারে শেষের দিকে ব্যাট করতে আসবে তাদের মধ্যেই কেউ রানারের ভূমিকায় নামবে। এটা সঠিক নয়, বরং এতে অখেলোয়াড়োচিত মনোভাবেরই প্রকাশ পাবে যদি পরবর্তী ব্যাটসম্যানই রানার হিসাবে আসে। কারণ তার ফলে সে মাঠের পরিবেশ, আলো ইত্যাদির সঙ্গে পূর্বেই নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার বাড়তি সুবিধা নিতে পারে। এছাড়াও বলা যেতে পারে ঐ রানার ব্যাটসম্যান খুব কাছ থেকে বোলারদের বিচার করে দেখবার একটি তাৎপর্যপূর্ণ সুযোগ পেয়ে থাকে।

এ প্রশ্নের একটি সহজ সমাধান হচ্ছে একজন জরুরী ফিল্ডারকে এই কারণে দলে রাখা অথবা দ্বাদশ খেলোয়াড়কে দিয়ে রানারের দায়িত্ব পালন করানো। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে একবার পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একটি টেস্টে পাক অধিনায়ক কারদার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের একজন আহত ব্যাটসম্যানের পক্ষে রোহন কানহাইয়ের রানার হিসেবে মাঠে নামায় আপত্তি করেছিলেন। কানহাই সে ইনিংসে তখনও ব্যাট করেন নি।

পরিবর্ত খেলোয়াড় সংক্রান্ত আইনে 'খেলা চলাকালীন' শব্দটি সম্পর্কে দুটি পরস্পর-বিরোধী ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়। একদলের মতে শব্দটির অর্থ মাঠে চলাকালীন কেবলমাত্র খেলার সময়টিকে বোঝাচ্ছে। সে সময়ের অসুস্থতা, আঘাতপ্রাপ্তি ইত্যাদি বোঝাচ্ছে। এই ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ বলে অনুমিত হয়।

প্রসঙ্গটি এম. সি. সি-র কাছে পাঠানো হলে তাঁরা বললেন, যদি খেলার দরুন ঐ অসুস্থতা ইত্যাদি না ঘটে থাকে তবে পরিবর্ত খেলোয়াড়ের জন্য বিপক্ষ দলের অধিনায়কের সম্মতি নিতে হবে। এ সিদ্ধান্তও অর্থহীন। কর্নেল রেইটকারের মত একজন বোদ্ধা এর বিষয়ে বলেছেন খেলার সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন ক্রিয়াকলাপে জড়িত হয়ে কোন খেলোয়াড় অসুস্থ হলে তার পরিবর্তে বদলী খেলোয়াড়ের জন্য বিপক্ষ অধিনায়কের সম্মতি প্রয়োজন হতে পারে। এখানে 'খেলার সঙ্গে সম্পর্কহীন ক্রিয়াকলাপ' এই নির্দেশটির বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা হতে পারে। এই অভিমতকে স্বাগত জানাই। সারা পৃথিবী জুড়ে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা হচ্ছে। এখন এই নোংরামি কতটা কমে সেটাই দেখার বিষয়।

সারে তথা ইংলণ্ডের সেরা অফ স্পিনার জিক লেকার, যাঁকে ১৯৫০-৫১য় দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের খেলায় আম্পায়ার হিসেবে দেখার সুযোগ আমার ঘটেছিল, তিনি ওভার পিছু একটি করে বাম্পারের যে সুপারিশ করেছেন তা বিবেচনা করা দেখা যেতে পারে। অবশ্য এ বিষয়ে একটি মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করা যেতে পারে—প্রতি ওভারে দুটির বেশি বাম্পার দেওয়া চলবে না। পরপর দু'টি ওভারে তা মোট ৩টির বেশি হবে না।

অন-সাইড ফিল্ডিং : ১৯৭১ সালে নতুন এল. বি. ডব্লু. আইন প্রণীত হবার পর থেকে অন-সাইডে ফিল্ডারের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার প্রস্তাব নিয়ে নানা বিতর্ক সৃষ্টি হয়। অন সাইডে ফিল্ডারের সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার প্রশ্নটি কেবলমাত্র নতুন এল. বি.ডব্লু. আইনই নয়, ভীতিসঞ্চারী বাম্পার বোলিং প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য।

প্রথমে অন-সাইডে ফিল্ডারের সংখ্যা পাঁচে সীমাবদ্ধ করার একটি প্রস্তাব ভাবা হয়েছিল। পরে প্রস্তাব করা হয়েছিল অন সাইডে ফিল্ডারের সংখ্যা পাঁচ থাকবে তবে বল ডেলিভারির সময়ে পপিং ক্রীজের পিছনে দুজনের অধিক ফিল্ডার রাখা চলবে না। এ প্রস্তাব নিয়েও নানা বিতর্ক চলে। পরবর্তীকালে ঐকমত্য স্থাপিত হয় না, ফলে কোন সরকারী আইন রচিত হয় না। এবারে লেগ স্ট্যাম্পের বাইরের নেতিমূলক বোলিং বন্ধ করবার উদ্দেশ্য পপিং ক্রীজের পিছনে ফিল্ডারের সংখ্যা দুই-য়ে সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি আইন ইতিমধ্যেই রচিত হয়েছিল। নূতন সংশোধনগুলির বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় না, শুধুমাত্র পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তাবগুলির কার্যকারিতা একবছর লক্ষ্য করবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তী কালে বিস্তৃত আলোচনার পর স্থির হয় যে ৪৬নং ধারাই, পুনরায় সংশোধিত হওয়া পর্যন্ত, কার্যকরী থাকবে।

উইকেটের কাছাকাছি ফিল্ডিং—ব্যাটসম্যানকে ভয় দেখানো: পরীক্ষামূলকভাবে যথেচ্ছ ফিল্ডিং সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে। ব্যাটসম্যানের স্বচ্ছন্দ ব্যাট-চালনায় বাধা সৃষ্টি বন্ধ করতে স্থির হয়েছে যে তার সামনের ২২ গজ ১০ ফুট পরিমাণ অঞ্চলে কোন ফিল্ডার থাকতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বলটি ব্যাট অথবা ব্যাটসম্যানদের স্পর্শ করছে অথবা ব্যাট অতিক্রম করে যাচ্ছে। এই বিধিনিষেধ ভঙ্গ করলে নো বল ডাকা হবে।

সীমানারেখায় ক্যাচ: ৩৫ নং ধারায় সীমানা রেখার উপর ক্যাচ ধরা নিয়ে নানা যুক্তি-তর্ক আলোচনা ইত্যাদি হয়ে থাকে। কারণ এই ঘটনার সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আম্পায়ারের পক্ষে ফিল্ডারের পায়ের যথার্থ অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, এমন কি ফিল্ডার নিজেও তা পারে না। পরীক্ষামূলক আইনে এ সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিশদ নির্দেশ দেওয়া আছে।

ঐ আইনে (যা ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল) বলা হয়েছে যে বলটি ধরবার পর ফিল্ডার নিজেই তার শরীরকে মাঠের মধ্যে রাখবেন। যদি ক্যাচ ধরার জন্য যে গতিবেগ সৃষ্টি হবে তার ফলে ক্যাচ ধরার পর যদি শরীরের কোন অংশ মাঠের বাইরে চলে যায় তবে ব্যাটসম্যান আউট হবেন না, এবং তাঁর রান সংখ্যায় আরো ছয় রান যুক্ত হবে—অর্থাৎ মারটিকে ওভার বাউণ্ডারি হিসাবে বিবেচনা করতে হবে (২০ নং ধারা)। এই আইন এখন আম্পায়ারের ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভরশীল হয়েছে কারণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট পরিষদ পরীক্ষামূলক আইনকে সরকারী আইনে রূপান্তরিত করার প্রস্তাব অনুমোদন করে নি। অবশ্য অনেকগুলি দেশের ঘরোয়া আইনে পরীক্ষামূলক আইনের ধারাগুলি কার্যকরী রয়েছে। বিভিন্ন দেশ ঐ আইন সরকারীভাবে অনুমোদিত করার কথা নতুনভাবে উত্থাপন করেছেন। ফলে পরীক্ষামূলক আইনটি সরকারী আইনের অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

আম্পায়ারের অধিকার: যদিও নিজস্ব বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অনেক ক্ষমতা আম্পায়ারকে দেওয়া হয়েছে তথাপি এমন ক্ষমতা সীমাহীন নয়। অবশ্য যে কোন মূল্যে আম্পায়ারকে সব কিছু করার অধিকার দেওয়াও সঙ্গত নয়। যে কোন ক্ষমতার নিজেরই প্রকৃতি, গঠন এবং সম্ভাবনার মধ্যেই তার কিছু কিছু বাধা গড়ে ওঠে। কোনও কোনও বাধা প্রচ্ছন্ন থাকে এবং তা

খেলার আইনের মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে যায়, আর তাছাড়া আইনের মধ্যে কিছু কিছু সহজাত বাধাও থাকে তাও আম্পায়ারের ক্ষমতার সীমা টেনে দেয়।

রীতিসম্মত ও রীতিবিরুদ্ধ খেলা : ৪৬-এর ধারা অনুযায়ী আম্পায়ারই শেষ বিচারক যিনি ঘোষণা করবেন খেলাটি রীতি সম্মত হয়েছে কিনা। মাঠে ব্যাটসম্যান বোলার কিংবা ফিল্ডারের খেলা, বোলারের সুবিধা সৃষ্টির জন্য পীচে খোঁচা দেওয়া এই সবই তাঁর দ্রষ্টব্য। তেমনি রেসিন, তেল, কিংবা অন্য কোন বস্তু বলে মাখানো, বলের সীম তুলে দেওয়া, স্বাভাবিক খেলায় অন্য কোনভাবে বাধা সৃষ্টি করা এগুলিও তাঁকে দেখতে হয়। একজন খেলোয়াড় প্যাভেলিয়ানে কিছু সময় বিশ্রাম করে বাড়তি শক্তি নিয়ে মাঠে এসে সঙ্গে সঙ্গে বল করতে এলে তা থেকে তাকে বিরত করা, এসব রীতিসম্মত খেলার পক্ষে তাঁর করণীয়। ১৯৫১-য় সাসেক্স বনাম এসেক্সের খেলায় ট্রেভর বেইলি ৮ ওভার বল করার পর প্যাভেলিয়ানে চলে যান। আধঘণ্টা বিশ্রাম করার পর মাঠে নেমে বল করতে শুরু করলে সাসেক্সের অধিনায়ক জন ল্যারীজ আপত্তি করেন এবং আম্পায়ার চেস্টার ও ম্যাকানলীস আপত্তিটি সঙ্গত কারণেই গ্রাহ্য করেন, এবং ট্রেভর বেইলি এক ঘণ্টা ফিল্ড করার পরে পুনরায় বল করার যোগ্য হন। ঠিক এমনিভাবে কোন ফিল্ডার দীর্ঘ সময় বিশ্রাম করে যদি পরবর্তী ইনিংসের সূত্রপাত ঘটাতে আসেন তবে রীতিসম্মত খেলার স্বার্থে তাকে বারণ করাও আম্পায়ারের কর্তব্যের অংশ।

মাঠ, আবহাওয়া, আলো : মাঠ, আবহাওয়া ও আলোর অবস্থা অনেক মতানৈক্য ও বিরোধের কারণ হয়ে থাকে। বিষয়টি ৪৬ (৫) ধারার অন্তর্ভুক্ত। তাতে বলা হয়েছে যে খেলা শুরুর আগেই যদি অনুষ্ঠিত চুক্তির বিরোধী না হয় তবে অধিনায়কদ্বয় মাঠের উপযুক্ততা, আবহাওয়া, আলো ইত্যাদি খেলার পক্ষে কতটা অনুকূল তা বিচার করবেন, তাঁদের ঐকমত্য না হলে বিষয়টি আম্পায়ারের কাছে পেশ করা হবে। কিন্তু আম্পায়াররাও যদি একমত না হন? ৪৬ (৫) ধারায় এ সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে। তবে তাতেও একটি ছোট প্রশ্ন তোলা হয়েছে। অধিনায়কদের পীচের যোগ্যতা নির্ধারণের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা কি টসের পরেই ফুরিয়ে যাবে নাকি, খেলা শুরু পর্যন্ত তার মেয়াদ থাকবে? নাকি খেলা শুরু হলেও তা থাকবে? অবশ্য ৪৬ (৫) ধারায় টস করায় আগে কিংবা খেলা শুরুর আগে পর্যন্ত এ অধিকার থাকবে কিনা তা স্পষ্ট করে বলা নেই—তবে প্রথম শ্রেণীর খেলায় এমন অনেক নজির আছে যেখানে খেলা শুরুর আগেও আম্পায়ার অধিনায়কদের আপত্তি

গ্রাহ্য করেছেন। ৭নং ধারাটি ও ১৭৭৪ থেকে ঐ ধারার বিবর্তনটি লক্ষ্য করলে অনেক কিছু সহজবোধ্য হবে। ৭নং ধারায় বলা হয়েছে মাঠের কর্তৃপক্ষেরই পীচে তৈরীর দায়িত্ব; তার নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আম্পায়ারের উপর ন্যস্ত হয়। তবু টস হবার কিংবা ম্যাচ শুরু হবার আগে অধিনায়কদের আপত্তি জানাবার অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। যদি অধিনায়করা মনে করে যে পীচ যথাযথভাবে তৈরি হয় নি, কোথাও কোথাও মারাত্মক গর্ত আছে, মাটি জমে নি, অথবা অসমান রয়েছে তবেও কী সে আপত্তি জানাতে পারবে না? ৭নং এবং ৪৬নং ধারার উদ্দেশ্য এটি নয় যে পীচ সম্পর্কে আপত্তি জানাবার অধিকার অধিনায়কদের নেই। এবং কর্তৃপক্ষ যে ধরনের পীচই তাদের জন্যে তৈরি করুন না কেন তারা তাতেই খেলতে বাধ্য থাকবে। বরং আম্পায়ার এবং অধিনায়কদের অনুমোদন সাপেক্ষে পীচ তৈরীর অধিকার কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত হয়েছে।

১৯৩১ সালে সারে বনাম ইয়র্কশায়ারের একটি খেলায় ওভাল মাঠে তিন ওভার খেলার পরে সারে দলের অধিনায়ক ফেন্ডার পীচের উপযুক্ততা সম্পর্কে আপত্তি জানান। তাঁর মতে ওপেনিং বোলাররা মাঠে ঠিকমত পা রাখতে পারছে না। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে আম্পায়ার খেলা বন্ধ করে দেন। তাতে দর্শকরা প্রতিবাদ জানায় এবং সারে কমিটির অনুরোধে আট মিনিট পরে আবার খেলা শুরু হয়। স্থির হয় যে খেলা শুরুর আগেই যদি অধিনায়কদের মধ্যে মতানৈক্য হয় তবে তা আম্পায়ারের কাছে মতামতের জন্য পেশ করতে হবে। এই ঘটনাই প্রমাণ করে যে খেলা শুরুর আগে পর্যন্ত আপত্তি জানানোর অধিকার অধিনায়কদের আছে।

সারে বনাম নটিংহামশায়ারের একটি খেলায় (১৯৪৬-এ) বহিরাগত দলের অধিনায়ক কার মন্তব্য করেন যে এই মাঠ খেলা শুরু করার পক্ষে অনুপযুক্ত। ফ্রাঙ্ক চেস্টার সেই ম্যাচের একজন আম্পায়ার ছিলেন; তিনি আপত্তিটি গ্রাহ্য করে নতুন উইকেট তৈরি করে দিতে নির্দেশ দিলেন। ভারী রোলার দিয়ে অচিরে নতুন উইকেট তৈরির কাজ সম্পন্ন হল। ঘোষিত সময়ের দুঘণ্টা বাদে খেলা শুরু হল।

১৯৫১-৫২য় অমৃতসরে এম. সি. সি. বনাম উত্তর ভারতের খেলায় আমি এবং প্যাটেল আম্পায়ার ছিলাম। দু'দলের অধিনায়ক নাইজেল হাওয়ার্ড এবং অমরনাথ জানান যে পীচ খেলা শুরুর উপযুক্ত নয়। কারণ উইকেটের একটি

প্রান্তে সারারাত জল ছিল। আমরা আবেদনটি গ্রহণ করায় মধ্যাহ্ন ভোজের পরে নতুন উইকেটে খেলা শুরু হল।

মাঠ সংক্রান্ত আইনের ধারাগুলি (৭, ৮, ১০, ১১ এবং ১২) কৌতুহলী মন নিয়ে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে উইকেট নির্বাচন ও নির্মাণের দায়িত্ব ১৭৭৪ সালে আইনের শুরু থেকে বর্তমান-কাল পর্যন্ত কীভাবে নানা হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে। ১৭৭৪-এ বহিরাগত দলের কেবলমাত্র কোন ইনিংস খেলব তা বেছে নেওয়া নয়, কোন পীচে খেলা হবে তাও স্থির করার অধিকারও ছিল। তাই ইনিংস ও পীচের স্থান বেছে নেওয়ার অধিকার তাদের অনেকখানি বাড়তি সুযোগ করে দিয়েছিল। পীচের জন্য স্থান নির্বাচন তাদের দলের বোলিং-এর সুবিধা অনুযায়ী স্থির করার সুযোগ একটি দল পেত। ১৮১১ সালে এই অধিকার আম্পায়ারের কাছে চলে গেল। বর্তমান আইন রচিত হবার আগে পর্যন্ত ঐ নিয়ম চলছিল। অধুনাতন আইনে কর্তৃপক্ষই পীচের স্থান নির্বাচন ও নির্মাণের জন্য দায়ী।

এককথায় বলতে গেলে পীচের গঠন সম্পর্কে অধিনায়কদের আপত্তি করার অধিকার আছে। একজন অধিনায়ক তাঁর আপত্তির কারণ বিপক্ষ অধিনায়ককে জানালে তিনিও যদি সহমত পোষণ করেন তবে আম্পায়াররা সে সিদ্ধান্ত নির্দ্বিধায় মেনে নেবেন। উভয় অধিনায়কের মধ্যে যদিও মতৈক্য না হয় তবে আম্পায়ারদের রায়-ই চূড়ান্ত। খেলা শুরুর আগে যদি কোন পীচ অনুপযুক্ত বলে পরিত্যক্ত হয় তবে অন্য কোনও পীচ তৈরি করে খেলা শুরু করা চলবে। কিন্তু খেলা চলাকালীন কোন পীচ খেলার অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে উভয় অধিনায়ক সে সম্পর্কে একমত না হলে পীচের পরিবর্তন ঘটানো চলবে না।

স্বল্পালোকের সমস্যা ভারতে তত বেশি নয়। কিন্তু ইংলণ্ডে এ সমস্যায় আম্পায়ারদের খুবই বিব্রত হতে হয়। খেলা চলাকালীন বৃষ্টিপাত আরেকটি সমস্যা ; যার ফলে অনেক সময়ে আবহাওয়া নয়—ফলাফলের দিকে নজর রেখেই খেলা চালানো বা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কিন্তু এ সমস্যা তো এখানে ইংলণ্ডের মত প্রবল নয়। আলোকাভাবের প্রশ্নে আম্পায়ারকে ব্যাটসম্যানের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে বুঝতে হয় তিনি ঠিকমত বলের গতিপথ লক্ষ্য করতে পারছেন কী না ; হয়ত পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসেনি, মাঠের কোন অংশে অন্ধকারের ছায়া পড়েছে কিন্তু মাঠ খেলার পক্ষে পুরোপুরি অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে

নি। আবার কখনও দেখা গেছে ততবেশি আলো নেই তাই আম্পায়ার ফাস্ট বোলারদের বল দেওয়া থেকে বিরত রেখে খেলা চালিয়ে গেছেন। ঠিক এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৯৪৭ সালে ইংলণ্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে লীডসে অনুষ্ঠিত টেস্ট ম্যাচে। চেস্টার ও হিল ছিলেন আম্পায়ার। তাঁরা ফিল্ডিংপক্ষের অধিনায়ককে ডেকে বলেন যে যদি ফাস্ট বোলারদের বল করতে না দেওয়া হয় তাহলে এ আলোতে খেলা চালানো হবে। তিনি রাজী হলে খেলাটি চালু রাখা হয়েছিল।

১৯৩৩-এ লর্ডস মাঠে আম্পায়ারদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আলোর তীব্রতা নিরূপক লাইট মিটার প্যাভেলিয়ানে বসানো হয়েছিল, কিন্তু সেটি যথাযথ কাজ করে নি—যখন প্রচুর আলো ছিল তখন তাতে আলোকাভাব নির্দেশ করছিল। ফলে মাঠের দর্শকদের মধ্যে প্রভূত কৌতুকের উদ্রেক হয় তখন সেই যন্ত্রটি খুলে ফেলা হয়। আম্পায়ারের ব্যক্তিগত মর্জির উপরে আলোকাভাব সংক্রান্ত প্রশ্নটি নির্ভরশীল না হয়ে উন্নত আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পকেট লাইট মিটার জাতীয় যন্ত্র তৈরি করতে পারলে ভালো হয়।

১৯৩১ সাল থেকে আলোকাভাব ও আবহাওয়া সংক্রান্ত যে-সব আইন রচিত হয়েছে তার কিছু আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ঐ বছরে ব্যাটসম্যানদের কাছ আলোকাভাবের জন্য অনেকগুলি আবেদন পাবার পর খেলা বন্ধের জন্য ব্যক্তিগত আবেদনের অধিকার লোপ করে দেওয়া হল। আলোকাভাব আছে কিনা এ প্রশ্নটি আম্পায়ারদের বিবেচনার জন্য ছেড়ে রাখা হল। এই আইনের কিছু সংশোধন করে ১৯৩৬ সালে কাউন্টি ক্রিকেটের অ্যাডভাইসারি কমিটি আলোকাভাব ও অনুপযুক্ত আবহাওয়ার প্রশ্নটি উইকেটে অবস্থানকারী ব্যাটসম্যান এবং ফিল্ডিং পক্ষের অধিনায়কের উপর ন্যস্ত করলেন। যদি তাঁরা এ বিষয়ে একমত না হতে পারেন কেবলমাত্র তখনই আম্পায়ার বিষয়টি গ্রহণ করে তাঁর রায় দেবেন। ১৯৪৮ সালে আরেকটি সংশোধনীর মাধ্যমে দায়িত্বটি পুনরায় আম্পায়ারদের কাছে ফেরত পাঠানো হল, এবং ইংলণ্ডে প্রথম শ্রেণীর শ্রেণীর ক্রিকেটে নির্দেশ দেওয়া হল কোন পক্ষের খেলোয়াড়ই আলোকাভাব বা আবহাওয়ার কারণে খেলা বন্ধের আবেদন জানাতে পারবেন না। টেস্ট ক্রিকেটে এবং অস্ট্রেলিয়ার অবস্থা কিছুটা পরিবর্তিত। সেখানে দিনে একটিবার মাত্র ব্যাটিং-পক্ষ থেকে এমন আবেদন করা চলত। পুরাতন রীতিতে যেমন পুনঃ পুনঃ আবেদন জানানোর সুযোগ ছিল এই আইনে তা বন্ধ

হয়ে গেল। বর্তমান আইনে অবশ্য এ দায়িত্ব আবার দু-পক্ষের অধিনায়কদের কাছেই ফিরে এসেছে। তাঁরা যদি একমত হতে না পারেন অথবা খেলা শুরুর আগেই যদি দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন তবেই সব বিষয়টি আম্পায়ারদের এক্তিয়ারে যাবে।

সময়ের ইচ্ছাকৃত অপচয়, পীচ নষ্ট করে দেওয়া, বলের সীম নষ্ট করে দেওয়া, লেগ বাই, বিপদের এলাকার সংজ্ঞা, বলে পালিশ লাগানো ইত্যাদি রীতি-বিরুদ্ধ আচরণ সম্পর্কেও নানা পরীক্ষামূলক আইন আছে। ক্রিকেট খেলাকে তার পুরোনো মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে নিত্য নূতন আইন ও তার প্রয়োগে আম্পায়ারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক্রিকেট ও ক্রিকেটার : ইংল্যাণ্ড

ইতিহাস, মানে লিখিত নথিপত্রে যা আছে তা থেকে বলা যায় ক্রিকেটের সূত্রপাত সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। একথা সত্য যে আরও প্রাচীন কিছু কিছু তথ্য আছে কিন্তু তা এতই বিক্ষিপ্ত যে সেগুলি নৃতত্ত্বের এবং অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে যাচাই করে তা সিদ্ধ করা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। প্রাগৈতিহাসিক জিনিসকে গল্পের মত বলা যায় না। তার জন্য নানা প্রমাণ দাখিল করে দেখতে হবে কি সিদ্ধান্তে আমরা পৌছচ্ছি।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্রিকেট প্রমাণসাপেক্ষভাবে আয়ার্ল্যাণ্ডে খুবই জনপ্রিয় খেলা ছিল কারণ ক্রম্‌ওয়েল ডাবলিনের যাবতীয় ব্যাট ও বল পুড়িয়ে নষ্ট করার নির্দেশ দেন এবং ১৬৫৬ সালে সত্যই তার বহ্ন্যুৎসব হয়। দুশো বছর বাদে আইরিশ জনগণের মধ্যে ক্রিকেট আবার প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের "কেলটিক" (celtic) ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বা পশ্চিমী আইরিশ, ওয়েলস ইত্যাদি প্রাচীন আর্যজাতির মধ্যে এই খেলার প্রতি এক বিশেষ ধরনের আকর্ষণ ছিল।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমী অধিবাসী বা কেলটিক জনসম্প্রদায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ক্রিকেট যখন ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে পৌছল তার ক্ষেত্র হল দেশের এক বিচ্ছিন্ন অংশে—কেণ্ট, সাসেক্স্‌, সারে এবং হ্যাম্পশায়ারে। সাসেক্স্‌ ও কেণ্ট-এর সীমানায় নিউয়েনডেন নামক জায়গায় ক্রিকেট সংক্রান্ত প্রথম তথ্য পাওয়া যায়। অবশ্য এ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা শক্ত।

ক্রিকেটের একটি কৌশল হল তার সংখ্যা বা গণনার নিয়ম '১১'-নামক সংখ্যা বা তার গুণিতক। সাধারণভাবে মনে হয় এই সংখ্যা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ক্রিকেট খেলায় যে যখন আমরা ১১ নিয়ে কথা বলব তখনই ক্রিকেট টিম নিয়ে কথা বলছি এটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হবে না। এর একমাত্র সম্ভাব্য যুক্তি হল, যে এলাকায় ক্রিকেট খেলার সূত্রপাত সেখানে ঐ সংখ্যাটিই গণনার নিয়ম হিসেবে গণ্য হত। উল্লেখযোগ্য যে ফ্রান্সের উত্তরভাগে মোটামুটি সেইন নদী থেকে ফ্ল্যাণ্ডার্স পর্যন্ত যে এলাকা বিস্তৃত সেখানে ঠিক এই

ধরনের গণনার পদ্ধতিই চালু ছিল ; অর্থাৎ ঐ এলাকায় এগারো ইঞ্চিতে এক ফুট ধার্য হত। ক্রিকেট শব্দটি অ্যাংলো-স্যাক্সন 'cricce' শব্দ থেকে গৃহীত যার অর্থ বক্র দণ্ড (crooked staff) অর্থাৎ এক দণ্ড যার বক্রতা আছে কিংবা বলা যায় একদিকে বক্র দণ্ড।

১৫৯৮ সালে মহারানীর করোনার জন ডেরিক লিখিতভাবে সাক্ষ্য দেন যে (কাগজপত্র এখনও গিল্ডফোর্ডে রক্ষিত আছে) জন পারভিন নামক জনৈক ব্যক্তি ট্রিনিটির অন্তর্ভুক্ত এলাকায় কাঠের গোলা করার জন্য একটুকরো জমি বেআইনীভাবে অধিকার করেছেন। ডেরিক বলেন দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবত ঐ জমিটির সঙ্গে তিনি সুপরিচিত। ১৫০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত গিল্ডফোর্ড ফ্রী স্কুলের জনৈক ছাত্র ও তার সঙ্গীরা ঐ জমিতে ছোটাছুটি করত এবং ক্রিকেট (creckett) ও অন্যান্য খেলাধুলো করত।

ঐ একই সালে শেক্স্পীয়র-এর পৃষ্ঠপোষক আর্ল অফ সাদাম্পটনের ছেলেদের গৃহশিক্ষক গিওভানি ফ্লোরিও তাঁর ইংলিশ-ইতালিয়ান অভিধানে "sgrittare" শব্দটির ভাষান্তর হিসেবে লেখেন—'ক্রিকেট-উইকেট খেলা ও আমোদপ্রমোদ।" কয়েক বছর বাদে জন বুলোকর তাঁর 'ইংলিশ এক্স্পোজিটর' বইতে ক্রিকেটের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন—ক্রিকেট হল বল নিয়ে এক ধরনের খেলা।

১৬২২ সালে বক্স্গ্রোভের ছ'জন পাত্রীর বিরুদ্ধে রবিবার গীর্জার মাঠে ক্রিকেট খেলার অভিযোগ আনা হয়। চেম্বারলেন্-এর 'স্টেট অব ইংল্যাণ্ড' বইতে ১৭০০ সালের সংস্করণে এই প্রথম ক্রিকেট খেলাকে জনসাধারণের অবসর বিনোদনের বিশিষ্ট মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ১৭২০ সালে রেভারেণ্ড জন স্ট্রাইপ 'সার্ভে অব লন্ডন্' বই সম্পাদনা করতে গিয়ে ক্রিকেটকে রাজধানীর মানুষের জনপ্রিয় খেলা হিসেবে গণ্য করতে বাধ্য হন। অতএব বোঝা যায় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ক্রিকেট একটি জাতীয় ক্রীড়া হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ১৬৯৭ সালে "ফরেন পোস্ট' সাসেক্স্-এ এক বিরাট ক্রিকেট ম্যাচের কথা ঘোষণা করেন।

১৭২৬ সালে সাসেক্স্-এর জনৈক বিচারপতি ক্রিকেট খেলাকে নানারকম গোলমাল ও বিপজ্জনক জমায়েতের ষড়যন্ত্র হিসেবে গণ্য করেন ; কারণ প্রায়শই তাঁকে কনস্টেবল সহযোগে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সরকারী হুকুমনামা পাঠ করে জমায়েত ভাঙতে হত। ১৭৬৪ সালে ওয়েস্টমিনিস্টারের ম্যাজিস্ট্রেটরা ক্রিকেট

খেলাকে কেন্দ্র করে এ ধরনের জমায়েত কিভাবে বন্ধ করা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করেন। ১৭৭৬ সালের ৩১শে অকটোবর 'দি লনডন ক্রনিকল' পত্রিকা সংবাদ দেন :

'টিলরবি ফোর্ট-এ কেণ্ট ও
সাসেকস্-এর মধ্যে ক্রিকেট খেলা
কেন্দ্র করে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড।"

ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলা দুটি ভিন্নপথে বিকাশ লাভ করে। প্রথমত, ধনী পৃষ্ঠপোষকেরা এই খেলায় উৎসাহ প্রদান করেন—পেশাদার খেলোয়াড় নিয়োগ করে এবং নিজস্ব খেলার মাঠ তৈরি করে। উপযুক্ত মাঠ তৈরি করার ব্যাপারে টম লর্ড জাতীয় পৃষ্ঠপোষকগণ উৎসাহ জোগাতেন। অন্য পথটি ছিল গ্রামীণ স্তরে নিজস্ব রীতিনীতি ও ভঙ্গির দ্বারা ক্রিকেটের বিকাশ। ইংল্যাণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই দুটি ধারাই সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত এবং পরবর্তী কালে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছিল। ১৭৫০ সাল থেকে উক্ত ধনী পৃষ্ঠপোষকগোষ্ঠী যেমন স্যার হোরেস মান, আর্ল অফ ট্যাংকারভিল, ডিউক অফ ডরসেট, আর্ল অফ উইন্‌টিল্‌সি প্রমুখদের পৃষ্ঠপোষকতার মূলকথা ছিল, পেশাদার খেলোয়াড় নিয়োগ, তাদের অভ্যাস ও খেলার সুযোগ প্রদান, খেলার কলাকৌশলগত বিকাশ, এবং ১৭৪৪ সালে এঁরাই ক্রিকেটের নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ করেন, যা সর্বস্তরের ক্রিকেট খেলায় মেনে চলা হতে থাকে। উপরন্তু এই পৃষ্ঠপোষকরাই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এম. সি. সি. (মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব) প্রতিষ্ঠা করেন—আর পাঁচটা অভিজাতদের ক্রিকেট ক্লাব হিসেবে নয়, বরং ক্রিকেটের পথপ্রদর্শক সংস্থা হিসেবে। ১৭৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই এম. সি. সি. প্রথম থেকে ক্রিকেট সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন—গুরুত্বপূর্ণ খেলাগুলির নির্ঘণ্ট তৈরি করে, শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের ঐক্যবদ্ধ করে, আইনকানুন বিধিবদ্ধ বা রদবদল করে এবং ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে সবরকম মতদ্বৈধ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির রায় প্রদানকারী উচ্চতম সংস্থা হিসেবে। ক্রিকেট যা বহুদিন পর্যন্ত ছিল অনির্দিষ্ট ব্যাট ও বলের চালনা তা এই এম. সি. সি.-র হস্তক্ষেপে অল্প সময়ে শিল্পসম্মত খেলায় পর্যবসিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সাধারণত বৃহৎ জমিদারশ্রেণী যাদের লোকবল ছিল এবং ব্যয় করার মত উদ্বৃত্ত অর্থ ছিল। দ্বিতীয় চার্লস-এর পৌত্র রিচমণ্ড এবং গুডউড নামক দুজন জমিদারীর

মালিক তাঁদের প্রজাদের মধ্য থেকে ক্রিকেট দল গঠন করেন এবং নিজের জমিদারীতে খেলার উপযোগী মাঠ তৈরি করেন। ডিউকের দলে তাঁর বেতনভুক কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ খেলতেন কিন্তু এদের মধ্যে দুজন—ওয়েমার্ক ও ডিংগেট ছিলেন অসাধারণ খেলোয়াড়, এঁরা ভাড়া-করা পেশাদার খেলোয়াড়দের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না। রিচার্ড নিউল্যাণ্ড নামক জনৈক খেলোয়াড় ডিউকের দলে ও অন্যান্য দলেও খেলতেন কিন্তু তিনি ডিউকের কর্মচারী ছিলেন না।

এর পরবর্তী যুগের পৃষ্ঠপোষকরা ক্রিকেটের প্রসারে একরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন—বিশেষভাবে পেশাদার খেলোয়াড় নিয়োগের ক্ষেত্রে। এই পেশাদারী ক্রিকেটই উচ্চমানসম্পন্ন খেলার কলাকৌশলের উন্নতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে দেখা দেয়।

এ যুগের উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন স্যার হোরেস মান, আর্ল অব ট্যাংকারভিল এবং ডিউক অব ডরসেট। স্যার হোরেস ও ডিউকের জমিদারী ছিল কেণ্ট-এ এবং আর্ল এর সারে-তে। এটা ছিল বিখ্যাত হ্যাম্বলডন ক্লাবের যুগ যার পক্ষে ও বিপক্ষে উক্ত পৃষ্ঠপোষকরা দল গঠন করে বাজির টাকা ব্যয় করতেন। উল্লেখযোগ্য ক্রিকেট খেলা এখনও পর্যন্ত লনডন শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি, কিন্তু বহু বড় বড় খেলা হত লনডনের আর্টিলারি গ্রাউণ্ডে। উপরিউক্ত পৃষ্ঠপোষকদের অনেকেই ছিলেন বিশিষ্ট খেলোয়াড়।

স্যার হোরস মান-এর জন্ম ১৭৪৪ সালে। ১৭৭৪ থেকে ১৮০৭—এই দীর্ঘকাল তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য ছিলেন কিন্তু আইনসভার চেয়ে খেলাধুলার প্রতি তাঁর বেশি আকর্ষণ ছিল। তাঁর আবাসস্থল বিশপস্‌বোর্ন-এ (ক্যাণ্টারবেরির নিকটবর্তী) তিনি ক্রিকেটের উপযোগী এক মাঠ তৈরি করেন। তার সঙ্গে ছিল দর্শকদের বসার জায়গা, খেলোয়াড়দের বসার তাঁবু ও পানভোজনের নির্দিষ্ট জায়গা। বিশপস্‌বোর্ন-এ কয়েকজন বিখ্যাত খেলোয়াড়কে তিনি তাঁর জমিদারীর কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম জেমস এইলওয়ার্ড যিনি ছিলেন হ্যাম্বলডন ক্লাবের অন্যতম খেলোয়াড়। এইলওয়ার্ড ১৭৭৭ সালে ১৬৭ রানের এক ইনিংস খেলেন যেখানে একদিনের বেশি সময় লাগে। পরবর্তী কালে এইলওয়ার্ড স্যার হোরেস-এর জমিদারীতে বেলিফের কাজে নিযুক্ত হন। তিনি জন ও জর্জ রিং-কেও স্থায়ী পেশাদার খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর জমিদারীতে নিয়োগ করেন। স্যার হোরেস-এর বন্ধু

ও প্রতিদ্বন্দ্বী জন ফ্রেডরিক স্যাকৃভিল, ডিউক অব ডরসেট নিজে প্রায় দশ বছর ক্রিকেট খেলেন। ১৭৮৪ সালে তাঁকে ফ্রান্সে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানো হয়। ১৭৭৩ থেকে ১৭৮৪র মধ্যে তিনি কেণ্ট, ইংল্যাণ্ড ও হাম্বলডনের পক্ষে খেলেন।

এ যুগে ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র হাম্বলডন ক্লাবই ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হত। সাসেক্‌স্‌-এর বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান রিচার্ড নিউল্যাণ্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র রিচার্ড নীরেন নিজেও ভালো খেলতেন এবং বেশ কয়েক বছর হাম্বলডন ক্লাবের সামনে 'ব্যাট অ্যাণ্ড বল্‌' নামক একটি সরাইখানার মালিক ছিলেন। তিনি পরবর্তী কালে হাম্বল্‌ডন ক্লাবের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৭৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে হাম্বল্‌ডন ক্লাব কেণ্টকে চ্যালেঞ্জ জানায় ও পরাজিত করে। হাম্বল্‌ডন ক্লাবে বিখ্যাত ডেভিড হ্যারিস ইংল্যাণ্ডের একজন নামকরা বোলার হিসেবে পরিচিত। তাঁর অসামান্য বোলিং-এর জন্যই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ব্যাটিং-এর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৭৭৭ সালে হাম্বল্‌ডন ইংল্যাণ্ডের নির্বাচিত একাদশের সঙ্গে সেভেনওক্‌স-এর 'দি ভাইন' মাঠে খেলেন যেখানে এইলওয়ার্ড পুরো দুদিন খেলেছিলেন। এই প্রথম 'ম্যাচ' যেখানে প্রথম তিনটি স্টাম্প ব্যবহার করা হয়।

১৭৮৭ সালে এম. সি. সি-র প্রতিষ্ঠাতা হাম্বলডন ক্লাবের মৃত্যু পরোয়ানা হিসেবে ঘোষিত হয়। ক্রমশ অধিকতরভাবে লনডন ক্রিকেটের কেন্দ্রস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৭৯৩ সালে লর্ডস মাঠে হাম্বল্‌ডন বোধ করি তাঁদের শেষ গৌরবময় ম্যাচ খেলেন।

১৭৭৪ সালে তৎকালীন যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট অভিজাত 'স্টার অ্যাণ্ড গার্টার' নামক সরাইখানায় মিলিত হয়ে ক্রিকেটের আইনকানুন সংক্রান্ত সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। ১৭৮০ সালে ইস্‌লিংটনে হোয়াইট কন্‌ডুইট ক্লাবের হয়ে ক্রিকেট উৎসাহীরা খেলতে থাকেন। এই ক্লাবে টমাস লর্ড নামক জনৈক ব্যক্তি বোলার হিসেবে খুব খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর বাবা ইয়র্কশায়ারে প্রচুর সম্পত্তির মালিক ছিলেন। লর্ড ১৭৮৭ সালে গ্রাম্য পরিবেশে ডোরসেট স্কোয়ারের কাছে পোর্টম্যান পরিবারের কাছে একটি জমি ভাড়া নেন। জমিটিকে তিনি বহু পরিশ্রমে খেলার উপযোগী করে তোলেন এবং ১৭৮৭ সালের ৩১ শে মে লর্ডস-এর মাঠে প্রথম বলটি খেলা হয়। এর ঠিক এক বছর বাদে 'হোয়াইট কন্‌ডুইট ক্লাব' পৃথিবীখ্যাত এম. সি. সি.-তে পরিণত হয়। এই মহান ঘটনার জন্য যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন আর্ল অব

উইন্‌টিল্‌সি—যিনি হাম্বলডন, কনডুইট ও এম. সি. সি. এই তিনটি বিখ্যাত সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সুবিদিত। ১৮০০ সালের মধ্যে লর্ডস প্রতিষ্ঠানটি সব প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঊর্ধ্বে নিজের স্থান কায়েম করে। ইতিমধ্যে এম.সি.সি. বার ছয়েক ক্রিকেটের আইনকানুন সংশোধন করেন এবং ক্রিকেটের ক্ষেত্রে একমাত্র অধিকর্তা হিসেবে স্বীকৃত হয়। এদের মাঠটি এখন বছরের সেরা খেলাগুলির কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে।

ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন পোর্টম্যান পরিবার ভাড়া বৃদ্ধি করেন, ফলে লর্ড নতুন জায়গার খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। চুক্তি অনুযায়ী ১৮১০ সাল পর্যন্ত মেয়াদ ছিল কিন্তু ১৮০৯ সালে 'সেণ্ট জন্‌স উড'-এর একটি অংশ আয়ার পরিবারের কাছ থেকে নেন। অবশ্য এম. সি. সি. তখনও পুরনো মাঠেই খেলছিল এবং ১৮১০-১১ সালের শীতেই তারা নতুন মাঠে তাদের খেলাগুলি স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু পার্লামেণ্ট এক আইন অনুসারে সরাসরি মাঠের মধ্য দিয়ে রিজেণ্ট খাল খনন করতে চান ফলে এম. সি. সি. পুনরায় দ্বিতীয় জায়গা থেকে উচ্ছেদ হন এবং লর্ড পুনরায় আয়ার পরিবারের কাছে আরো মাইলখানেক উত্তরে জমি যোগাড় করেন। ১৮১৩-১৪ সালের শীতকালে এম. সি. সি.-র নতুন মাঠ তৈরি হয় এবং ২২শে জুন ১৮১৪ সালে এম. সি. সি. বনাম হার্টফোর্ডশায়ারের খেলা অনুষ্ঠিত হয় এই তৃতীয় মাঠে এবং এটিই শেষ পর্যন্ত এম. সি. সি-র স্থায়ী আবাসস্থলে পরিণত হয়। উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত বোলার ডেভিড হ্যারিস ছিলে এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। প্রসঙ্গত বোলিং-এর পদ্ধতি তখনও ছিল আণ্ডারহ্যানড। উইলিয়াম বেল্‌ডহ্যাম ১৭৮৭ সালে প্রথম খেলেন হাম্বলডনের হয়ে। দীর্ঘ ৩৫ বছর তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যাটস্‌ম্যান। বছরের পর বছর প্রতি ম্যাচে গড়ে তাঁর রান ছিল ৪৩; ১৭৯৪ সালে সারে-র পক্ষে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে তিনি ৭২ ও ১০২ রান করেন। উল্লেখযোগ্য স্লো বোলার হিসেবেও বেল্‌ডহ্যাম যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। কয়েক বছর বাদে আসেন সারে-র সেরা খেলোয়াড় উইলিয়াম ল্যাম্বার্ট মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি লর্ডস-এ একটি ম্যাচে যথাক্রমে ১০৭ ও ১৫৭ রান করে ক্রিকেটে ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ১৮৯৩ সালের আগে দীর্ঘ ৭৬ বছরে লর্ডস মাঠে এই রেকর্ড কেউ ভঙ্গ করতে পারেন নি। ১৮৯৩ সালে এ. ঈ. নট্‌স স্টাভার্ট ১২৫ রান করে নট আউট থাকেন মিড্‌ল্‌সেক্‌স-এর হয়ে নট্‌স এর বিপক্ষে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ক্ষিপ্রগতি আনভারহ্যান্‌ড বোলিং-এর বদলে

আগে প্রথগতি আনডারহ্যানড বোলিং। এ সময়ে এক নতুন ধরনের ব্যাটস্‌ম্যান উঠছিলেন যাঁরা বেল্‌ড্‌হ্যাম ও কেনেকৃস্‌ এর পথ অনুসরণ করে এতাবৎ অপ্রচলিত 'রানিং ডাউন' পদ্ধতিতে খেলতে থাকেন—অর্থাৎ সজোরে পিটিয়ে খেলতে থাকেন। ১৭৮৮ সালেই টম্‌ ওয়াকার নতুন বোলিং-এর কায়দা চালু করার চেষ্টা করেন, অবশ্য ক্লাবের কর্মকর্তারা তাঁকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু যে বীজ টম বপন করেন তা মাঠেই সুপ্ত থেকে যায় এবং দীর্ঘ বিশ বছর বাদে পুনরায় মাথা চাড়া দেয়। ১৮০৭ সালে কেন্ট বনাম ইংল্যাণ্ডের খেলায় জন উইল্‌স সম্বন্ধে 'মর্নিং হেরাল্ড' পত্রিকায় লেখা হয়:

> "জন উইল্‌স্‌-এর স্ট্রেট আর্মড বোলিং-এর ফলে
> রান তোলা খুবই কষ্টকর ; অন্যপক্ষে স্ট্রেট ফরোয়ার্ড
> বোলিং-এ তা সম্ভব।"

এই স্ট্রেট আর্মড বোলিং-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। খেলা চলাকালীন অনেকবার প্রচণ্ড হট্টগোল চলে এবং বেআইনীভাবে স্টাম্প তুলে ফেলা হয় ও খেলা বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে এ নিয়ে বাদানুবাদ চলতে থাকে ; অন্যান্যরা বিশেষভাবে উইলিয়াম অ্যালবি উইল্‌স-এর পথ অনুসরণ করেন। বাড ও ল্যাম্বার্ট এ ধরনের বোলিং-এ লর্ডস মাঠে খুবই সাফল্য অর্জন করেন। ১৫ জুলাই ১৮২২ সালে এম. সি. সি র বিরুদ্ধে কেন্ট-এর হয়ে খেলতে গিয়ে উইলস খেলা শুরু করেন ঐভাবে বোলিং করে এবং নোহমান "নো বল" ঘোষণা করেন, উইলস রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে লর্ডস ছেড়ে বেরিয়ে যান এবং বলা যায় ক্রিকেটের ইতিহাস ছেড়ে চলে যান। কিন্তু যে কাজ তিনি বিরক্তিভরে পরিত্যাগ করেন তার দায়িত্ব এসে পড়ে আরো বিখ্যাত ও শক্তিশালী কাঁধে—উইলিয়াম লিলি-হোয়াইট-এর কাঁধে। ১৮২২ সালে তিনি প্রথম ম্যাচ খেলেন এবং পরবর্তী পাঁচ বছরে তিনি ও তাঁর সহযোগী জেমস ব্রডব্রীজ তাঁদের কাউন্টিকে এমন উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন যে ১৮২৭ সালে তাঁরা অল ইংল্যাণ্ডের পক্ষে খেলার সুযোগ পান।

১৮২৮ সালে এই নতুন পদ্ধতির বোলাররা উচ্চতম অধিকর্তাদের কাছে অনুমতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। জি. টি. নাইট অল ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এর দাবি জানান এবং স্পোর্টস ম্যাগাজিনগুলির পাতা জুড়ে এ নিয়ে মসিযুদ্ধ চলতে

থাকে। অবশেষে এম. সি. সি. ১৮৩৫ সালে আইন সংশোধন করে নিম্নলিখিত ভাষা উল্লেখ করেন :

The Ball must be bowled, and if
it be thrown or jerked, or if the
hand be above the shoulder in
the delivery, the umpire must call
No Ball.

এই ঘোষণা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয় না ; কারণ পরবর্তী দশ বছর বোলাররা আইনের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের হাত ক্রমশ উঁচু থেকে আরো উঁচুতে ওঠাতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আলফ্রেড মীন এর পদ্ধতিতে এক্সপ্রেস বোলিং-এর পদ্ধতি চালু হয়। অবস্থা এমন ঘোরতর হয়ে ওঠে যে ১৮৪৫ সালে এম. সি. সি -কে পুনরায় বাধ্য হয়ে ১০নং আইনটি সংশোধন করে বোলারকে সন্দেহের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এইভাবে আরো সতেরো বছর বাদে অবশেষে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ফলে বোলারের ইচ্ছামতো বোলিং-এর অবাধ স্বাধীনতা মেলে।

অপেশাদার ক্রিকেট

স্কুলে টিউডর যুগ থেকেই ক্রিকেট জনপ্রিয় অবকাশরঞ্জনের মাধ্যম ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইটনে হোরেস ওয়ালপোল ক্রিকেট সম্বন্ধে অত্যন্ত অনীহা প্রকাশ করেন। ১৭৫১ সালে ইটন-এর প্রাক্তন ছাত্ররা ইংল্যাণ্ডের পক্ষে খেলতে থাকেন। ইটন-এর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ওয়েস্টমিনিস্টার যাঁরা টটহিল ফীল্ডসে খেলতেন। হ্যারোয় ক্রিকেট খেলা চালু হয় আরো বেশ কয়েক বছর বাদে। ১৮০৫ সালের মধ্যে হ্যারো ও ইটন বেশ কয়েকবার পরস্পরের সঙ্গে খেলে। ১৮০৫ থেকে ১৮১৮-র মধ্যে এই দুই স্কুলের মধ্যে খেলার কোনো রেকর্ড নেই। গোড়ার দিকে হ্যারো ইটন্ ও উইন্‌চেস্টারের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না এবং "ইউনিভারসিটি ব্লু" ছিল এদের তিন দলের একচেটিয়া ব্যাপার। ১৮৪০ থেকে ১৮৬২-র মধ্যে হ্যারোয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সাড়া জাগানো জমায়েত ছিল। ১৮৪৯ সালে আসেন রেজিল্যাণ্ড হ্যাংকে যিনি ইংল্যাণ্ডের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে পরবর্তী কালে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৮৫৫ সালে আসেন হেনরি আর্করাইট যিনি পরবর্তী কালে ইংল্যাণ্ডের স্লো বোলার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে ক্রিকেট খেলার মান ছিল প্রাগৈতিহাসিক। অক্সফোর্ড কলেজ ক্রিকেট অবশ্য দ্রুত বিকাশ লাভ করে। ইউনিভারসিটি ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য নাম আর. এ. এইচ মিচেল—যিনি ১৮৬২ সালেই অক্সফোর্ড 'ব্লু' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি অক্সফোর্ডে আসার দ্বিতীয় বছরেই ক্যাপটেনের পদ পান এবং ১৮৬৩-৬৪-৬৫ সালে অক্সফোর্ড তাঁর নেতৃত্বে জয়ী হয়। বোলিং-এর ক্ষেত্রে ১৮৩৩ সালে এইচ. ই. মোরারলে অক্সফোর্ডের পক্ষে ১৪টি উইকেট নেন। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক ছিল হ্যারোর পক্ষে রীতিমত সম্মানজনক যুগ কারণ তাঁরা লর্ডস-এ উপর্যুপরি আটবার জয়লাভ করেন এবং যদিও ইটন ১৮৬২ সালে জয়লাভ করে কিন্তু হাওয়া বইতে থাকে হ্যারোভিয়ানদের পক্ষে। মিচেল-এর কোচিং-এর ফল ফলতে থাকে এবং আগামী দশ বছরে তিনি পান এ. ডব্লু. রিডলে, হ্যারিস লিটলটনস, ওয়ালটার ফরবেস, ফ্রাংক বাক্ল্যাণ্ড স্টাডস্, হক্ ইভো ব্লাই প্রমুখ বিখ্যাত খেলোয়াড়দের। স্কুল ক্রিকেটের ইতিহাসে এক সঙ্গে এতগুলি প্রতিভাধর খেলোয়াড়ের মিছিল আর কখনও দেখা যায় নি।

১৮৩৫ সালে নতুন এক আইন চালু করে বলা হয় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে যাদের প্রথম ইনিংসের শেষে ১০০ রানের ঘাটতি থাকবে তাদের 'ফলো-অন' করতে হবে; ১৮৫৪ সালে এই রানের সংখ্যা কমিয়ে ৮০ করা হয়। ১৮৪৯ সালে প্রতি ইনিংসের শুরুতে পীচকে নতুনভাবে সাজাবার অনুমতি দেওয়া হয়। এতাবৎ ম্যাচের প্রথম বল থেকে শেষ বল পর্যন্ত পীচ ছোঁয়ার অনুমতি ছিল না।

আন্তর্জাতিক সফরের সূত্রপাত

১৮৫৯ সালে ক্রিকেটে ইংলিশ মরশুম শেষ হবার পর বারোজন পেশাদার খেলোয়াড় অ্যাটলান্টিক অতিক্রম করে কয়েকটি ম্যাচ খেলতে যান কানাডা ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে। এই সফরের দায়িত্ব নেন মূলত ইটন্ ও কেম্ব্রিজের প্রাক্তন ডব্লু. জি. পিকেরিং ও আমেরিকার সবচেয়ে অগ্রগণ্য সংগঠন মণ্ট্রিল ক্রিকেট ক্লাব। ফ্রেড লিলি-হোয়াইট দলের সঙ্গে যান স্কোরার ও প্রেস এজেন্ট হিসেবে এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে দলভুক্ত ছিলেন জর্জ পার ও জন উইস্ডেন। মণ্ট্রিল ক্লাবের চুক্তি অনুযায়ী খরচ বাদে প্রতিটি খেলোয়াড় পান ৫০ পাউণ্ড করে। ইংল্যাণ্ডে এই সফরে

অন্তর্ভুক্ত ছিলেন অল ইংল্যাণ্ড ও ইউনাইটেড ইলেভন থেকে ছজন করে। নটিংহাম থেকে পার, গ্রাণ্ডি ও জ্যাক্‌সন; সাসেক্‌স থেকে উইস্‌ডেন ও লিলি-হোয়াইট; কেম্ব্রিজ থেকে বিখ্যাত হেওয়ার্ড ও কারপেনটার এবং সারে থেকে ষ্টিফেন্‌স জুলিয়াস সীজার, লকইয়ার ও কেফিন। দুবছর বাদে ১৮৬১ সালে আরেকটি দল ইংল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় যায় যে দল পরবর্তী কালে ক্রিকেটে ইংল্যাণ্ডের পয়লা নম্বরের হয়ে ওঠে। পনেরো হাজার দর্শকদের সামনে প্রথম ম্যাচটি খেলা হয় মেলবোর্নে। কেফিন ও গ্রিফিথের ব্যাটিং-এর ফলে ইংল্যাণ্ড ৩০৫ রান করে এবং এক ইনিংস ৯৬ রানে জয়ী হয়। এই দলে ক্যাপ্টেন ছিলেন এইচ. এইচ. ষ্টিফেনসন। সর্বসাকুল্যে বারোটি ম্যাচ খেলা হয় যার মধ্যে চারটিতে জয় ও দুটিতে পরাজয়। শেষোক্ত দুটি খেলা হয় ক্যাসল্‌-মেইন ও সিডনির সঙ্গে। ১৮৬৩-৬৪ সালে জর্জ পার-এর অধিনায়কত্বে দ্বিতীয় দলটি খেলতে যায় অস্ট্রেলিয়ায় এবং প্রথম নিউজিল্যাণ্ড যায়। সফরের শেষে উইলিয়াম কেফিন মেলবোর্ন ক্লাবের কোচ হিসেবে নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘ সাত বছর মেলবোর্ন ও সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দলকে শিক্ষা দান করেন। ১৮৭৬-৭৭ সালে মেলবোর্নে সফররত ইংল্যাণ্ড দলকে সম্মিলিত অস্ট্রেলিয়ান একাদশ ৪৫ রানে পরাজিত করে।

১৮৭৮ সালে প্রথম অস্ট্রেলিয়ান দলকে ইংল্যাণ্ডে আমন্ত্রণ জানান জেমস্‌ লিলিহোয়াইট। তিনি অস্ট্রেলিয়ান দলের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেন। অতিথি দলের অধিনায়কত্ব করেন ডেভিড গ্রেগরি যাঁরা পাঁচটি ভাই ক্রিকেট জগতের স্বনামধন্য খেলোয়াড়। উক্ত সফরে দীর্ঘ কর্মসূচী নির্দিষ্ট হয়। সর্বসাকল্যে ৩৭টি ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা হয়। দলের বারোজন খেলোয়াড়দের মধ্যে ছ'জন ছিলেন নিউ সাউথওয়েল্‌স থেকে, পাঁচজন ভিক্টোরিয়া এবং একজন জি এইচ বার্টলে, টাসমানিয়া থেকে। নিউজিল্যাণ্ড সফরের পর অস্ট্রেলিয়ান দল লিভারপুল পৌঁছোন ১০ই মে। ২৭শে মে ইংল্যাণ্ড তার ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আঘাত পায় লর্ডসে অস্ট্রেলিয়ার হাতে। খেলা শুরু হবার বারো ঘণ্টা বাদে সমস্ত ইংল্যাণ্ডে খবর ছড়িয়ে পড়ে—ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বাছাই করা এম. এস. সি একাদশ একদিনে অস্ট্রেলিয়ার হাতে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। ইংল্যাণ্ড নয় উইকেটে পরাজিত। ৩১ উইকেটে সংগৃহীত রানের সংখ্যা ১০৫। অ্যালান ও বয়েলের দুর্ধর্ষ বোলিং-এর সামনে ইংল্যাণ্ড বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বয়েল ছ'টি উইকেট নেন মাত্র ৩ রানে।

১৮৮২ সালে ক্রিকেটের ইতিহাসে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা 'অ্যাসেজ'। ডব্লু. এল. মারডক-এর নেতৃত্বে একটি অস্ট্রেলিয়ান দল ওভাল মাঠে ইংল্যাণ্ডকে এক টেস্ট ম্যাচে ৭ রানে পরাজিত করে 'অ্যাসেজ'-এর ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। স্পোফোর্থ ৯০ রানে উক্ত ম্যাচে ১৪টি উইকেট নেন। স্পোর্টিং টাইমস নামক পত্রিকায় এক ব্যঙ্গাত্মক শোকসংবাদ ছেপে বলা হয় ইংল্যাণ্ড ক্রিকেটের পবিত্র চিতাভস্ম অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে কবর দেওয়া হবে। কিছুদিনের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক ইভো ব্লাই লণ্ডনে এক ভোজসভায় ঘোষণা করেন যে তার দলের লক্ষ্য হবে ঐ পবিত্র চিতাভস্ম পুনরুদ্ধার করা। ১৮৮২ সালে মারডক-এর দলের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ৩টি ম্যাচের মধ্যে তৃতীয়টি জয় করে 'অ্যাসেজ' পুনরুদ্ধার করেন এবং যে আধারটি তাঁকে অর্পণ করা হয় সেটি লর্ডস-এর ইম্পিরিয়াল ওঅর মেমোরিয়াল গ্যালারিতে রাখা আছে।

১৮৯৪ – ১৯১৪

ক্রিকেটের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সময়টিকে একটি স্বর্ণযুগ না বলে একমাত্র স্বর্ণযুগ বলে গণ্য করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। ইংল্যাণ্ডে এই যুগেই ক্রিকেট খেলা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বোর্ড অব কণ্ট্রোল গঠন করা হয় এবং টেস্ট ম্যাচে খেলোয়াড় নির্বাচনের ব্যাপারটি একটি কেন্দ্রীয় দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়। বিদেশ সফরকারী উপযুক্ত দল নির্বাচনেও কেন্দ্রীয় সংস্থার দায়িত্ব স্বীকৃত হয়। খেলাকে আধুনিকীকরণের জন্য যাবতীয় নিয়মকানুন এই সময়েই স্থিরীকৃত হয়।

ছয় বলের ওভার, ইচ্ছাকৃত ফলোঅন, ফলো-অনের সীমাবৃদ্ধি, নতুন বল সংক্রান্ত প্রাথমিক নিয়ম এবং সর্বশেষে ইয়র্কশায়ার কাউন্টি কর্তৃক অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড চালু করার পদ্ধতি এই যুগেই বিধিবদ্ধ করা হয়। শেষোক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থা যা এতাবৎ কোনো কাউন্টি কর্তৃক চালু করার প্রচেষ্টা বা চিন্তা পর্যন্ত হয়নি। ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেটের ইতিহাসে আর এমন কোনো যুগের কথা স্মরণ হয় না যখন একসঙ্গে এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কার্যকরী করা হয়।

১৮৯৪ সালে এম. সি. সি. এই প্রথম কাউন্টি ক্রিকেটের মধ্যে সাবিশায়ার লেস্টারশায়ার এসেক্স ওঅরিকশায়ার ও হ্যাম্পশায়ারকে প্রথম শ্রেণীর মানসম্পন্ন ক্রিকেটদল হিসেবে গণ্য করেন। ফলে উচ্চমানসম্পন্ন ক্রিকেট ম্যাচের সংখ্যা

প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৯ সালে এই প্রথম এক বছরে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়। ১৮৯৩ সালে রনজিৎসিংজি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রথম খেলেন। ১৮৯৬ সালে তিনি সর্বসাকল্যে ২৭৮০ রান করে ডব্লু. জি. গ্রেস-এর ১৮৭১ সালের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ১৮৯৯ সালে ৩১৫৯ রান, ১৯০০ সালে ৩০৬৫ অর্থাৎ গড়ে ৮৭.৫৭ করে ১৮৮৭ সালে আর্থার ক্রুসবেরি-সৃষ্ট রেকর্ড ভঙ্গ করেন। ১৯০১ সালে আর. এস. এ. ওয়ারনারের নেতৃত্বে প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডে খেলতে আসেন। নিয়মমাফিক এখন ঐচ্ছিক ফলো-অন হল তিনদিনের খেলায় ১৫০ রানে, দুদিনের ১০০ রানে এবং একদিনে ৭৫ রানে। ১৯০৩-৪ সালে পি. এফ. ওয়ারনারের অধিনায়কত্বে প্রথম এম. সি. সি. দল যান অস্ট্রেলিয়া সফরে। ১৯০৪ সালে এম. সি. সি.-র নেতৃত্বে কাউন্টি ক্রিকেট খেলার সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই সময় অক্সফোর্ড ও ওরস্টারশায়ারের মধ্যে খেলায় ৩৩ উইকেটে ১৪৯২ রানের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয় যা ১৯২৭ সাল পর্যন্ত অটুট থাকে।

১৯০৫ সালে এম. সি. সি. প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় যায় ই. ডব্লু. মান-এর নেতৃত্বে। এই বছরই এম. সি. সি. দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যান। দক্ষিণ আফ্রিকা রাবার লাভ করে। ১৯০৭ সালে ২০০ রানের পর নতুন বল গ্রহণ করার পদ্ধতি চালু হয়। এই নীতি ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকে; পরবর্তী কালে ৮৫ ওভারের পর নতুন বল গ্রহণ করার পদ্ধতি চালু হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৫ থেকে ১৯১৮-র মধ্যে উচ্চমানসম্পন্ন কিংবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ খেলা যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার জন্য সম্ভবপর ছিল না। ১৯১৯ সালের গ্রীষ্মে বহু খেলোয়াড় কাউন্টি ক্রিকেটে ফিরে আসেন কিন্তু চার বছরের ফাঁকে সকলেরই খেলার মান নষ্ট হয়ে যায়। একমাত্র এইচ. সাটক্লিফ (ইয়র্কশায়ার) তাঁর প্রথম মরশুমে ১৮৩৯ রান করে সকলের নজর কেড়ে নেন। ১৯২০-২১ সালে একটি এম. সি. সি. দল বাইরে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুদ্ধে যে দুজন খেলোয়াড় প্রাণ হারান তাঁরা কলিন ব্লাইব ও কে. এল. হাচিংস। এছাড়া ক্রিকেট জগতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে যাঁরা নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন তাঁরা হলেন বুথ, জীভ্‌স, আলেক জ্যাক্‌স, জেনিংস, ডেভিস, চেস্টার ইত্যাদি। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে দুজন বিখ্যাত খেলোয়াড়ের আবির্ভাব হয়, এঁরা ডব্লু. আর.

হ্যামণ্ড ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান ও অল রাউণ্ডার এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার হ্যারল্ড লারউড—যাঁর বলের গতি ও লক্ষ্য পরবর্তী কালে ১৯৩২-৩৩ সালে বডি-লাইন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করে। এই সময়েই ১৯৩২-এ ভারতের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট সুরু হয়।

দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দশটি টেস্ট সিরিজের খেলায় সর্বসাকল্যে ৪৯টি ম্যাচ খেলা হয়। এর মধ্যে ইংল্যাণ্ড ১৫টি জয়লাভ করে, অস্ট্রেলিয়া ২২টি এবং ১২টি ড্র হয়। এই যুগের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক আর্মস্ট্রং—একমাত্র ক্যাপটেন যিনি একই সিরিজে পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই জয়লাভ করতে সক্ষম হন। এই ঘটনা ঘটে ১৯২০-২১ সালে। কিন্তু ১৯২৮-২৯ সালে চ্যাপম্যানের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডের অস্ট্রেলিয়া সফরই দলকে তার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করে সসম্মানে ইংল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করে তোলে। ১৯৩৯ সালে ৮টি বলের ওভার চালু করার চেষ্টা হয় এম. সি. সি-র প্রতিটি ম্যাচে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা যথেষ্ট সন্তোষজনক না মনে হওয়ায় ১৯৪৫ সালে পুনরায় ৬-বলের ওভার চালু করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৯৪৬-৪৮ সালের শীতকালে অস্ট্রেলিয়া সফরের আমন্ত্রণ আসে ইংল্যাণ্ডের কাছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা অতিক্রম করে ইংল্যাণ্ড তখনও দলকে দৃঢ়পদে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি। পাঁচজন খেলোয়াড় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। তাদের মধ্যে ভেরিটি, টার্নবুল ও কেনেথ ফার্নেস-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬-৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়া সফররত ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়কত্ব করেন ওয়ালি হ্যামণ্ড; সঙ্গে যান নিম্নলিখিত খেলোয়াড়বৃন্দ—

(১) ইয়ার্ডলে (২) পি. এ. গির (৩) আলেক বেডসার (৪) কম্পটন (৫) এডরিচ (৬) ইভান্স (৭) ফিশলক (৮) হার্ডস্টাফ (৯) হাটন (১০) আইকিন (১১) ল্যাংরিজ (১২) পোলার্ড (১৩) স্মিথ (১৪) ভোস্ (১৫) ওয়াশব্রুক (১৬) রাইট।

ব্রিস্‌বেনে অনুষ্ঠিত ১ম টেস্ট শুরু হয় ২৯শে নভেম্বর ১৯৪৬। এ খেলায় ব্র্যাডম্যান করেন ১৮৭, হ্যাসেট ১২৮, ম্যাক্‌কুল ৯৫, মিলার ৭৯। ১৯৫৪-৫৫ সালের শীতকালে লেন হাটন-এর নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর প্রথম তিনটি টেস্ট খেলাতেই জয়ী হয়। ব্রিস্‌বেনে অনুষ্ঠিত প্রথম ম্যাচে ১ ইনিংস ১৫৪ রানে পরাজয়ের পর ফ্র্যাংক টাইসন ও ব্রায়ান

স্ট্যাথাম যুগ্মভাবে এমন ক্ষিপ্রগতি বলের সমন্বয় সাধন করেন অস্ট্রেলিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ড পরবর্তী তিনটি টেস্টেই জয়লাভ করে। টাইসন ২৮টি উইকেট নেন ও স্ট্যাথাম ১৮টি। হাটনের জন্য দেশে বীরোচিত সম্মান অপেক্ষা করছিল। তিনি পরবর্তী কালে ইংলিশ ক্রিকেটে তাঁর অবদানের জন্য 'নাইট' উপাধি লাভ করেন। ১৯৫৮ সালে ইংল্যাণ্ড দল ৫টি টেস্টের চারটিতে পরাজিত হয় এবং একটি ড্র হয়। মে ও কাউড্রে তাঁদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেন; মে ২য় টেস্টের ১ম ইনিংসে ১১৩ রান করেন মেলবোর্নে। অস্ট্রেলিয়া তাদের তিনজন বোলারের সাহায্যে সর্বদা প্রাধান্য বিস্তার করে থাকেন; বেনো ৩১টি, অ্যালান ডেভিডসন ২৪টি ও মেকিফ ১৭টি উইকেট নেন অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে।

১৯৬২-৬৩ সালে টেড ডেক্সটারের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড দল অস্ট্রেলিয়ায় সফরে যায় এবং তিনটি খেলা ড্র হয় তাই অ্যাসেজ অস্ট্রেলিয়াতেই থেকে যায়। ১৯৬৫-৬৬ সালে মাইক স্মিথের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের খেলাটি ড্র হয়। এই সিরিজের খেলায় খুবই দক্ষতা দেখান এড্‌রিজ ব্যারিংটন।

১৯৭০-৭১ সালের শীতকালে ইংল্যাণ্ডে ইলিংওয়ার্থ ও কাউড্রের মধ্যে কে অধিনায়কত্ব করবেন তা নিয়ে চরম বিতর্কের সৃষ্টি হয় ও খবরের কাগজে হেড-লাইন বেরুতে থাকে। অবশেষে ইলিংওয়ার্থকেই অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮৮৮ সাল থেকে এই প্রথম অস্ট্রেলিয়া স্বগৃহে একটি টেস্টেও জয়লাভ করতে অসমর্থ হন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ইংল্যাণ্ড দুটি টেস্টে জয়লাভ করে 'অ্যাসেজ' ফিরিয়ে আনেন। এই সফরে জেফ বয়কট সুদক্ষ ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বাক্ষর রাখেন যাঁর ভঙ্গিতে ব্র্যাডম্যানের দক্ষতার স্বাক্ষর মেলে। জন স্নো ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ দ্রুততম বোলার হিসেবে চিহ্নিত হন এবং অ্যালান নট্ শ্রেষ্ঠ উইকেট-রক্ষক হিসেবে সম্মান লাভ করেন।

১৯৭৫ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটে যোগ দিয়ে ইংল্যাণ্ড অস্ট্রেলিয়ার কাছে সেমিফাইনালে হেরে যায়। এরপর অন্যান্য কয়েকটি দেশের মত ইংল্যাণ্ডেও প্যাকারের সমস্যা দেখা দেয়। নামী খেলোয়াড়রা কেরী প্যাকারের বিশ্ব ক্রিকেট সিরিজে যোগ দেন। এসব ক্রিকেটারদের বাদ দিয়ে পরবর্তী টেস্ট দল গঠিত হয়। এ দল ৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়াকে ৫-১ ম্যাচে শোচনীয়ভাবে হারায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়ার এমন পরাজয় কখনো ঘটে নি। অধিনায়ক ছিলেন মাইক ব্রিয়ারলি। অবশ্য ১৯৭৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্টইণ্ডিজের কাছে হেরে যায়। ওয়েস্টইণ্ডিজ দলে প্যাকারের খেলোয়াড়রা খেলেছিলেন।

ক্রিকেটার : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আণ্ডারউড, ডেরেক লেসলি (১৯০৫—) কেন্ট দলের হয়ে খেলা শুরু করেন। পরে ইংলণ্ড দলের নিয়মিত বোলার হন। তিনি খেলোয়াড়দের মধ্যে কনিষ্ঠতম যিনি প্রথম আবির্ভাবে ১০০ উইকেট সংগ্রহ করেন। মাত্র ২৫ বছর ২৬৪ দিন বয়সে ১০০০ সংখ্যক উইকেটের অধিকারী হন। একমাত্র রোডস এবং লোম্যানেরই এর চাইতে কম বয়সে এমন নজির স্থাপনের উদাহরণ আছে। ইনি বাঁ হাতি স্লো মিডিয়ম পেস বোলার। প্রয়োজনে স্পিন করাতেও পারেন। ভেজা মাঠে তাঁর বোলিং দুর্ধর্ষ হয়। ৭৪টি টেস্টে ২৪.৯০ রান গড়ে তিনি ২৬৫টি উইকেট পেয়েছেন। পৃথিবীর আর মাত্র তিনজন বোলার তাঁর চাইতে বেশি উইকেট পেয়েছেন। এই তিন জন হলেন ইংল্যাণ্ডের ট্রুম্যান, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গিবস এবং ভারতের বেদী। প্যাকারে যোগ না দিলে তাঁর সংগ্রহ আরও বেশি হতে পারত। শোনা যাচ্ছে তিনি আবার টেস্ট খেলায় ফিরে আসছেন।

ইভান্স, টমাস গডফ্রে (১৯২০—) টেস্ট দলে উইকেট-রক্ষক-ব্যাটসম্যান ইভান্স ইংলণ্ড দলের পক্ষে ১৯৪৬ সাল থেকে অপরিহার্য হয়ে পড়েন। সে বছর ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টম্যাচ খেলতে আসেন, এবং সারা জীবনে ৯১ বার স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। উইকেটের পেছনে তাঁর তৎপরতা বিপক্ষ দলের ত্রাসের কারণ হত। তিনি টেস্টে মোট ২১৯ জনের আউট হবার কারণ হয়েছিলেন। একমাত্র নট ছাড়া অন্য কোন উইকেট-রক্ষকের এমন সাফল্যের নজির নেই। টেস্টে তাঁর সংগৃহীত রান ২৪৩৯। সারা জীবনে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তিনি ৮১১ টি 'ক্যাচ' এবং ২৪৯ জনকে স্ট্যাম্প আউট করেন। সমারসেট দলের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান ১৪৪।

ইলিংওয়ার্থ, রেমণ্ড (১৯৩২—) ইয়র্কশায়ারের এই অলরাউণ্ডার ক্রিকেট খেলোয়াড়টির যোগ্য সহযোগিতায় তাঁর দল ইয়র্কশায়ার ৭ বার চ্যাম্পিয়ান হয়। ১৯৬৮ সালে ইলিংওয়ার্থ লিসেস্টারশায়ার দলে যোগদান করেন। উক্ত দলের অধিনায়কের দায়িত্ব তাঁর উপরে অর্পিত হয়। পরবর্তী কালে তিনি ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। এবং ১৯৭০-৭১ তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অ্যাসেজ ছিনিয়ে আনে ইংলণ্ড

দল। পরের বছরে ১৯৭২ সালে অ্যাসেজ রক্ষা করার দায়িত্ব অধিনায়ক হিসাবে সুষ্ঠুভাবে পালন করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৯ তাঁর ব্যাটিং সাফল্যের সেরা নজির। ঐ বছর তাঁর মোট স্কোর ১৭২৬ (গড় ৪৬.৬৪)। ১৯৬৮ সাল তাঁর বোলিং এর সেরা বছর। তিনি ঐ বছরে ১৩১টি উইকেট (গড় ১৪.৩৬ রানে) লাভ করেন। ৩১টি টেস্টে ইংলণ্ডের নেতৃত্ব করেন, এবং মাত্র ৫টি ক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করেন। ১৯৭০ সালে অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৫৯ সালে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধেই তাঁর সর্বাধিক রান ১৬২। ওয়ারসেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে ৪২ রানে ৯ উইকেট তাঁর বোলিং-এর সেরা সাফল্য। এটি ১৯৫৭ সালে।

ইয়ার্ডলে, নরম্যান ওয়াল্টার ড্রান্সফিল্ড (১৯১৫—) কেম্ব্রিজের অধিনায়ক ইয়ার্ডলে ক্রিকেট ছাড়াও হকিতে বিশ্ববিদ্যালয় ব্লু হয়েছিলেন। তিনি একজন স্টাইলিস্ট ব্যাটসম্যান ও মিডিয়ম পেস বোলার ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার আগেই তাঁর ব্যাটিংয়ের দক্ষতা প্রকাশ পায়। সে সময়কার ইয়ং প্রফেশনাল বনাম ইয়ং অ্যামেচারদের খেলায় তাঁর ১৮৯ ও পাবলিক স্কুল বনাম আর্মির খেলায় ৬৩ রান এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭-৩৮ খ্রী লর্ড টেনিসনের দলের সঙ্গে ভারতবর্ষ সফর করেন। পরের বছরে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান এবং প্রথমবার টেস্ট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করেন। ২০টি টেস্টে ইয়ার্ডলে অংশ গ্রহণ করেছেন—তার মধ্যে ১৪টিতে অধিনায়কের দায়িত্ব ছিল তাঁর। টেস্টে সর্বোচ্চ রান দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৮৪৭-এ নটিংহামে ৯৯। ১৯৪৬-৪৭ সালে হ্যামণ্ডের কাছ থেকে তাঁর উপরে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী দলের নেতৃত্বভার অর্পিত হয়। সেবারে পর পর তিন ইনিংসে ব্র্যাডম্যানের উইকেট তিনি দখল করেন। গোটা সফরে সেরা বোলিং-এর গড় তাঁর। ৩৭.২০ রান গড়ে ১০টি উইকেট। ১৯৩৩ থেকে তিনি ইয়র্কশায়ারের পক্ষে খেলেছেন। অধিনায়ক হয়েছেন ১৯৪৮-এ। অবসর গ্রহণ করেন ১৯৫৫ সালে।

উ, রবার্ট ইলিয়ট স্টোরি (১৯০১—) উইয়াট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ওয়ারউইকশায়ারের নেতৃত্ব করেন ৮ বছর। যুদ্ধের পর ওরসেস্টারশায়ারের অধিনায়ক হন ৩ বছরের জন্য। ইংলণ্ড দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেন ১৬টি টেস্টে। তিনি অত্যন্ত নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান এবং ফলপ্রসূ পেস বোলার ছিলেন। ১৯২৩ সালে ওয়ারউইকশায়ারে খেলেন।

প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯২৭-২৮ খ্রী দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে। ১৯৩০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওভালে পঞ্চম টেস্টে অধিনায়ক নির্বাচিত হয়ে সাটক্লিফের সহযোগিতায় ৬ষ্ঠ উইকেটে ১৭০ রান তুলে নিজের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর জীবনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে রানের মোট সংগ্রহ ৩৯,৪০৪। সর্বোচ্চ রান ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে ১৯৩৩ সালে বার্মিংহামে ওয়ারউইকশায়ারের পক্ষে ২৩২, টেস্টে ১৯৩৫ সালে দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নটিংহামে ১৪৯। ১৯৫২ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৮টি মরশুমে সহস্রাধিক রান করেন। মরসুমের সর্বোচ্চ রান ১৯২৯ সালে। সেবারে মোট রান করেন ২৬৩০।

উলি, ফ্রাঙ্ক এডওয়ার্ড (১৮৮৭—১৯৭৮) কেন্টের এই খেলোয়াড়টি ইংলণ্ডের সেরা বাঁ-হাতি অলরাউণ্ডার। ১৯০৬ সালে খেলা শুরু করে দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে কৃতিত্বের সঙ্গে খেলে যখন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁর বয়স ৫১। ১৯০৭ সাল থেকে অবসর গ্রহণ কাল পর্যন্ত প্রতিটি বছরেই তিনি সহস্র রান পূর্ণ করেছেন। শুধু মাত্র ১ম বিশ্বযুদ্ধের বছর কটি বাদ দিয়ে তাঁর মরসুমী সহস্র রান হয়েছে ২৮ বার। ডা. ডব্লু জি. গ্রেস ছাড়া আর কেউ ওই রেকর্ডের অধিকারী হতে পারেন নি। তিনি সর্বদা রানের জন্যে ওঁৎ পেতে থাকতেন, এবং দ্রুত রান তুলতেন। তাঁর ইনিংসগুলিকে ভয়ঙ্কর মনে হত। সারের বিরুদ্ধে ১৯২৫ খ্রী ওভাল মাঠের ২২৯ রান এমনি বিপর্যয়কর ইনিংসের একটি নিদর্শন। মাত্র তিন ঘণ্টায় তিনি এই রান তোলেন। একটি বল ড্রাইভ করে মাঠ থেকে বহুদূরে একটি বাগানে পাঠিয়ে ছিলেন। ১৯২৫ খ্রী সমারসেটের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে তিনি ছক্কার বন্যা ছুটিয়ে দেন। ঐ খেলায় ২২৫ রান তোলেন, আটটি ছক্কার মার ছিল তার মধ্যে। তিনি ৮ বার ১০০০ রান ও ১০০ উইকেট পেয়ে ডাবল করেন। ১৯২১, ২২, ২৩ সালে উপর্যুপরি তিনবার ঐ কৃতিত্বের অধিকারী হন। ফার্স্ট স্লিপে ফিল্ডিং-এ তাঁর জুড়ি আজও পাওয়া যায় না। ১৯২০ সালে ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে একটি খেলায় ৬টি ক্যাচ ধরেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯১১-১২ সালে সিডনি টেস্টে ৬টি ক্যাচ লুফে বিশ্বরেকর্ডের একজন ভাগীদার। তিনি সারা জীবনে ১০১৫টি ক্যাচ লুফেছেন; উইকেট-রক্ষক ছাড়া অন্য ফিল্ডারের পক্ষে এটি একটি বিশ্ব রেকর্ড। তিনি মোট ৬৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন তার মধ্যে উপর্যুপরি ৫২টি। এটিও এক সময়ে বিশ্ব রেকর্ড ছিল।

উলিয়েট, জর্জ (১৮৫১—১৮৯৮) অলরাউণ্ডার হলেও ইয়র্কশায়ারের এই ক্রিকেটারটি প্রধানত ব্যাটসম্যান। বোলারদের পিটিয়ে ছাতু করতেন। ১৮৭৩ সালে প্রথম খেলতে এসেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৭৬-৭৭ খ্রী অস্ট্রেলিয়া সফরে দলের অন্তর্ভুক্ত হন ও সেই সিরিজে টেস্ট ম্যাচ খেলেন। ১৮৮১-৮২ খ্রীর সিরিজে ইংলণ্ডদলের পক্ষে তিনিই প্রথম সেঞ্চুরি করেন (১৪৯ রান) মেলবোর্ন মাঠে। বোলার হিসাবে লর্ডসে তাঁর সাফল্য ঐ অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধেই। সেবার দ্বিতীয় ইনিংসে উলিয়েট মাত্র ৩৬ রানে অস্ট্রেলিয়ার ৭ জন বাঘা ব্যাটসম্যানকে প্যাভেলিয়নে ফেরত পাঠিয়ে দেন। ২৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলে মোট ৯৪৯ রান ও ৫১টি উইকেট লাভ করেছেন।

এডরিচ, উইলিয়ম জন (১৯১৬—) ১৯৩৭ সালে মিড্‌লসেক্সের পক্ষে কাউণ্টি খেলতে এসে প্রথম বছরেই উইলিয়ম এডরিচ তাঁর ব্যাটিং প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখেন। সেই মরসুমে তিনি মোট ২১৫৪ রান করেন; তার মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে লর্ডস মাঠে তাঁর সংগ্রহ ১৭৫ রান। ফলে, পরের বছরেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবার জন্যে তিনি জাতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত হন। অবশ্য সে সিরিজে তিনি সফলকাম হন নি। এমন কি পরবর্তী বছরে ১৯৩৮-৩৯ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের প্রথম দিকেও ব্যর্থ হন। তবে শেষ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ২১৯ রান করে তাঁর নির্বাচনের যথার্থতা প্রমাণ করেন। যুদ্ধের পরে ক্রিকেটের মাঠে ফিরে তিনি উন্নত ব্যাটিং-এর পরিচয় দেন। ১৯৪৭ খ্রী তে ৩টি ডবল সেঞ্চুরি সমেত এডরিচ মোট ১২টি সেঞ্চুরি করেন। তিনি এবং ডেনিস কম্পটন ঐ বছরে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান সংগ্রহের রেকর্ড ভঙ্গ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল ৩৫৩৯ (গড় ৮০·৪৩) রান। এর ভেতরে নর্দাম্পটন-শায়ারের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২৬৭ রান রয়েছে।

১৯৫৮ সালে এডরিচ যখন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁর সংগ্রহে মোট ৩৬,৯৬৫ রান; এর মধ্যে ৮৬টি সেঞ্চুরি রয়েছে। মিডিয়ম ফাস্ট বোলার হিসাবে তাঁর ঝুলিতে প্রায় ৪০০ উইকেট।

৩৯টি টেস্ট ম্যাচে খেলেছেন। ১৯৫৩-৫৭ পর্যন্ত মিড্‌লসেক্স দলের পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন। উইলিয়ম এডরিচ একজন দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়ও ছিলেন।

এডরিচ, জন হুগ (১৯৩৭—) রক্ষণাত্মক ব্যাটিং-এর জন্য এডরিচের বিপুল খ্যাতি। তাঁকে দেখে কখনও মনে হত না যে তিনি কখনও আউট

হবেন ; আবার দলের প্রয়োজনে দ্রুত রান তুলতেও তাঁকে দেখা যেত। তিনি ১২টি টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন তার মধ্যে ৯টি-ই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ১৯৬৫ সালে লীডসে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বাধিক টেস্ট সংগ্রহ অপরাজিত ৩১০ রান। এই রানের ভেতর ৫টি ছয়, ৫২টি চার ছিল। ৮ ঘণ্টা ৫২ মিনিটের এই ইনিংসটি তাঁর দক্ষতা ও সহনশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঐ ইনিংসের দরুন ৯টি ইনিংসে তাঁর সংগৃহীত রানের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩১১। ক্রিকেটের ইতিহাসে এটি একটি রেকর্ড। তিনি সারে দলের পক্ষে আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৫৮ সালে। ১৯৭৩ সালে কাউন্টি দলের অধিনায়ক হন। ১৯৬৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন। এক মরসুমে সহস্রাধিক রান করার কৃতিত্ব তাঁর ১৮ বার। তার মধ্যে ১৯৬২ সালে সংগ্রহ করেন ২৪৮২ রান ; গড় ৫১·৭০। একই খেলায় দু ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন তিনবার।

ওয়ার্ডলে, জন হেনরি (১৯২৩—) দলীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদের ফলে ওয়ার্ডলের ক্রীড়াজীবনে অকালে যবনিকা পতন ঘটে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পর তাঁর মতো বাঁ-হাতি স্লো বোলার কমই দেখা গেছে। ১৯৪৬ খ্রী-তে খেলতে আসেন। ১২টি পূর্ণ মরশুম খেলার সুযোগ পান। তার ভেতরে ১০টি মরশুমে তিনি শতাধিক উইকেট সংগ্রহ করেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ইংলণ্ড দলে নির্বাচিত হন ; অবশ্য সে বছরে ততবেশি সফল হন নি। সর্বমোট ২৮টি টেস্ট খেলে ১০২টি উইকেট পেয়েছেন, বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান হিসাবেও তাঁর দক্ষতা নগণ্য নয়। দলের প্রয়োজনে অনেক সময়ে দৃঢ় হাতে ব্যাট চালনা করেছেন।

ওয়ার্নার, স্যার পেলহাম ফ্রান্সিস (১৮৭৩-১৯৬৩) মিডলসেক্স দলকে প্রথমশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করতে স্যার ওয়ার্নারের অবদান অপরিসীম। তাছাড়াও পৃথিবীর দেশে দেশে ক্রিকেটের প্রসারের জন্য অনেক কিছু করেছেন। ১৮৯৪ সালে মিডলসেক্সের পক্ষে খেলা শুরু করেন। ১৯০৮ সালে দলের অধিনায়ক হন এবং ১৯২০ সালে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব বহন করেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তিনি ৬০টি সেঞ্চুরি করেছেন তার মধ্যে ৩২টি লর্ডস মাঠে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলতে নেমে পুরো ইনিংস খেলে ১৩২ রানে অপরাজিত থেকে যান। এটি একটি রেকর্ড। তিনি ১৯০৩-০৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ও ১৯০৫-০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে

ইংলণ্ড দলের নেতৃত্ব করেন। ১৮৯৭ ও ৯৮ সালে আমেরিকা সফরে ও ১৯১১-১২ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। এই আকর্ষণীয় ব্যাটসম্যানটি ওয়ারউইকশায়ার বনাম অবশিষ্ট দলের খেলায় তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ২৪৪ রান করেন। খেলাটি ১৯১১ সালে ওভালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৫০ খ্রী-তে ওয়ার্নার এম. সি. সি-র সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বহুদিন টেস্ট নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য ও চেয়ারম্যান ছিলেন। 'ক্রিকেটার' নামক জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য ১৯৩৭ সালে 'স্যার' খেতাব পান।

ওয়াশব্রুক, সিরিল (১৯১৪—) ল্যাঙ্কাশায়ার দলের গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসম্যান ওয়াশব্রুক ১৯৩৩ সালে প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশগ্রহণ শুরু করে সারে দলের বিরুদ্ধে ম্যানচেস্টারে ১৫২ রান করেন। ১৯৫৯ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে ২০ বার সহস্রাধিক রান করেন। ১৯৪৭ সালে তাঁর মোট রান হয় ২৬৬২ (গড় ৬৮.২৫)। ১৯৩৭ থেকে ইংলণ্ড দলের নিয়মিত খেলোয়াড় এবং তখন হাটনের সহযোগী হিসাবে দলের ওপেনার। ১৯৪৮-৪৯ খ্রী দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তাঁদের প্রথম উইকেট জুটির ৩৫৯ রান তৎকালীন রেকর্ড। ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ২৫১। প্রায় পাঁচ বছর বাদ পড়ার পর আবার টেস্ট ক্রিকেটের আসরে অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে ৩য় টেস্ট খেলার সময়ে ডাক পড়ে। তখন তাঁর বয়স ৪১ বছর। সেই ম্যাচে অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় হাজির হয়ে ওয়াশব্রুক ৯৮ রান করেন এবং ইংলণ্ড সেই টেস্টে জয়লাভ করে। ইতিপূর্বে ১ম টেস্ট ড্র হয়েছিল, ২য় টেস্টে ইংলণ্ড পরাজিত হয়েছিল। ওয়াশব্রুক ১৯৫৪-৫৯ ল্যাঙ্কাশায়ার দলের অধিনায়ক ছিলেন। পরে ইংলণ্ড ক্রিকেট নির্বাচক-মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন।

এ্যালেন, জর্জ অসওয়াল্ড (১৯০২—) অ্যালেন অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণ করলেও ইংলণ্ডের ইটন ও কেম্‌ব্রিজে ক্রিকেট খেলা শেখেন। ক্রমে ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে তিনি ইংলণ্ডের সর্বাধিক জনপ্রিয় ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন।

বিতর্কমূলক বডি লাইন বোলিং-এর জন্য ১৯৩২-৩৩ খ্রী তিনি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন কিন্তু ১৯৩৬-৩৭ খ্রী-তে অধিনায়ক হিসাবে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে তিনি খেলোয়াড়-

সুলভ যে মনোভাব ও বিনীত ব্যবহার করেছিলেন তার ফলেই ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ক্রিকেট সম্পর্কে যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল তা আবার জোড়া লাগে। জি. ও. অ্যালেন ডানহাতি ফাস্ট বোলার হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি টেস্টে ৮১টি উইকেট (গড় ২৯·৩৭) পেয়েছিলেন এবং রান করেছিলেন ৭৫০ (গড় ২৪·১৯)। ১৯৪৮ সালে যখন তাঁর বয়স ৪৮ বছর তখনই ফ্রি ফরেস্টার দলের হয়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপক্ষে ১৩০ রান করেন। এটি তাঁর সর্বাধিক রানের ইনিংস।

১৯২২ সালে তিনি কেম্ব্রিজ ব্লু হন এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে আত্মপ্রকাশ করেন। ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে কাউন্টি দলের হয়ে লর্ডসের মাঠে ৪০ রানে ১০টি উইকেট পান। এটি ১৯২৯ সালের ঘটনা। ১৯৩১ সালে ওভালে নিউজিল্যাণ্ড দলের বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচে বোলিং-এ দারুণ কেরামতি দেখিয়েছিলেন। ১৩ ওভারে মাত্র ১৪ রান দিয়ে পেয়েছিলেন ৫টি উইকেট। ১৯৩৬-৩৭ খ্রী তিনি ও ভোসি দুজনে মিলে ব্রিসবেন টেস্টে মাত্র ৫৮ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস খতম করে দিয়েছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন ৩৬ রানে ৫ উইকেট। জীবনে ২৫টি টেস্ট-ম্যাচ খেলেছেন তার ভেতরে ১১টি ম্যাচে ইংলণ্ডের অধিনায়ক হন। এম.সি.সি. টেস্ট নির্বাচকমণ্ডলীর দীর্ঘদিনের চেয়ারম্যান। ১৮৬০-৬৪ সালে এম.সি. সি-র সভাপতি। আর কোষাধ্যক্ষ ১৯৬৪-৭৬ সালে।

এ্যাবেল, রবার্ট (১৮৫৭—১৯৩৬) ইংলণ্ড দলের পক্ষে এ পর্যন্ত মাত্র তিনজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান টেস্ট ম্যাচে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন—রবার্ট এ্যাবেল তাঁদের অন্যতম। তিনি সারে দলের খেলোয়াড়; দি গাভনার নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৯২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে সিডনিতে তাঁর রানসংখ্যা ছিল নট আউট ১৩২। এই ম্যাচে গোড়াপত্তন করতে এসে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। ১৮৯৯ সালে ওভালে সমারসেটের বিরুদ্ধে তিনি একটি বিস্ময়কর ইনিংস খেলে নট-আউট ৩৫৭ রান করেছিলেন। এটা সারে দলের পক্ষে সর্বাধিক ব্যক্তিগত সংগ্রহের রান। এবং একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান যিনি পুরো ইনিংস খেলেছেন তেমন খেলোয়াড়ের পক্ষেও একটি রেকর্ড। এই ইনিংসে এ্যাবেল মাত্র সাড়ে আট ঘণ্টা উইকেটে ছিলেন এবং সে সময়ে মোট ৮১১ রান স্কোরবোর্ডে উঠেছিল। কাউন্টি ক্রিকেটে ওভাল মাঠে এটাও সর্বাধিক রানের একটি রেকর্ড। ১৯০৪ সালে দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য তিনি যখন

ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁর সংগৃহীন রান হল ৩২,৬৬৯ (গড় ৩৫.৫৭)। তার মধ্যে ১৩টি টেস্ট ম্যাচের মোট রান হল ৭৪৪ (গড় ৩৭.২০)

এ্যামেস, লেসলি এগবার্ট জর্জ (১৯০৫—) অনেক ক্রিকেট যোদ্ধার মতে এ্যামেস উইকেট-রক্ষক ব্যাটসম্যান হিসাবে সেরা ক্রিকেটার। ১৯২৬ সালে তিনি কেন্ট দলের পক্ষে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

কটিবাতে আক্রান্ত হবার দরুন ১৯৫১ সালে তিনি অকালে খেলোয়াড় জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন; অবশ্য তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তখন তাঁর সংগৃহীত রান ৩৭,২৭৫ (গড় ৪৩.৫৬)। একবছরে ১০০০ রান সংগ্রহ তিনি ১৭ বার করেছিলেন।

তাঁর উইকেট-রক্ষার রেকর্ডও চমকপ্রদ। ১৯৩৮ সালের শেষে তাঁর স্ট্যাম্পিং-এর সংখ্যা হচ্ছে ৪১৫—এখনও এটি বিশ্ব রেকর্ড। কেবলমাত্র টেস্ট ম্যাচে উইকেটের পিছনে অবস্থান করে তিনি যে ৯৬ জন ব্যাটসম্যানকে প্যাভেলিয়নে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে ২৩জন স্ট্যাম্প আউট, বাকি ৭৩ জন ক্যাচ।

এ্যামেস মোট ৪৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। ১৯২৯-৩০ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম এবং সর্বশেষ টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন ১৯৩৮-২৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে তাঁর রানের সংখ্যা ২৪৩৮ (গড় ৪০.৬৩)

খেলোয়াড় জীবনে তিনি তিনবার ১০০০ রান সংগ্রহ ও ১০০ জনকে আউট করে 'ডাবল' অর্জন করেছেন। ১৯২৮ সালে তিনি ১৯১৯ রান করেন এবং উইকেট পান ১২:টি। ১৯৩২ খ্রী রান করেন ২৪৮২ এবং উইকেট পান ১০০টি। এ্যামেস ৫ বছর দু'হাজারের বেশি রান করেন। ১৯৩৩ সালে তাঁর সেরা ব্যাটিং-এর বছরে তিনি ৩৩৫৮ রান করেন। তার মধ্যে ৯টি সেঞ্চুরি ছিল। রানের গড় ছিল ৫৮.৮০। সে বছরে আউটও করেছিলেন ৬৬ জনকে।

১৯৩৩ সালে ওভালে ৩য় টেস্ট ম্যাচে তিনি ৮টি উইকেট পেয়ে তৎকালীন রেকর্ড স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, তিনি তিনবার দু ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন। গ্লাউসেস্টারশায়ারের বিপক্ষে তিনি ২৯৫ রান করেছিলেন কেন্টের পক্ষে খেলে। সেটাই তাঁর সর্বাধিক রান।

১৯৫০ সালে তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য মনোনীত হন। ইতিপূর্বে কোন পেশাদার খেলোয়াড় এমন মর্যাদা পান নি। ১৯৬০-৭৪ পর্যন্ত কেন্ট দলের তিনি সম্পাদক/ম্যানেজার ছিলেন।

কম্পটন, ডেনিস চার্লস (১৯১৮—) ইংলণ্ড দলের পক্ষে দুর্দান্ত রান সংগ্রহকারী ব্যাটধারী হিসাবে পরিচিত ডেনিস কম্পটনের একবছরে সর্বাধিক রান (১৯৪৭ সালে ৩৮১৬ রান) করার কৃতিত্বটি আজও অম্লান। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর সর্বমোট সংগ্রহ ৫৮০৭ (৭৮টি টেস্টে, গড় ৫০.০৬) রান। এ পর্যন্ত মাত্র আর ৯ জন ক্রিকেটার এর চেয়ে বেশি রান টেস্টম্যাচ থেকে সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

এই সহজিয়া ব্যাটসম্যানটি যিনি বিচিত্র মারের সৌন্দর্যে হাজার হাজার দর্শকের মনোরঞ্জন করতেন তিনি ১৯৩৬ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ক্রিকেটের আসনে পদার্পণ করেন এবং সেই বছরেই ১০০৪ রান করেন। তাঁর আত্ম-প্রকাশের পক্ষকালের মধ্যেই নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে একটি খেলায় ১০৫ মিনিটে অপরাজিত শতরান করেন।

পরের বছরেই তিনি নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম টেস্টম্যাচে ৬৫ রান করেন। ১৯৩৮ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় রূপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে নির্বাচিত হন, নটিংহামে ঐ দলের বিরুদ্ধে ১৯৩৮ সালে জুনে তিনি ১০২ রান করেন।

সে সময়ে ফুটবলেও কম্পটন পারদর্শিতার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ফরওয়ার্ডের খেলোয়াড় ছিলেন। ইংলণ্ড জাতীয় দলে ১১ বার নির্বাচিত হন।

কম্পটন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে ভারতবর্ষে ক্রিকেট খেলেছেন। রঞ্জি ট্রফির ফাইন্যালে ১৯৪৪-৪৫ খ্রী বোম্বাই বনাম হোলকারের খেলায় শেষোক্ত দলের পক্ষে নটআউট ২৪৯ রান করেন।

কম্পটনের ব্যাটিং সাফল্য তাঁর অন্য প্রতিভাকে ঢেকে রেখেছে। নইলে তাঁর মত বাঁ-হাতি দক্ষ বোলার খুব বেশি পাওয়া যায় না। তাঁর অলরাউণ্ডার পরিচয় অকল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার রেকর্ড থেকে প্রতিষ্ঠিত হবে। ঐ ম্যাচে ৯১ রান করেন এবং ৬৯ রানে ১১টি উইকেট দখল করেন।

১৯৪৮-৪৯ সালে উত্তর-পূর্ব ট্রান্সভাল দলের বিপক্ষে তাঁর সংগৃহীত ৩০০ সর্বাধিক রান। টেস্ট ক্রিকেটে ১৯৫৪ সালে নটিংহামে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২৯০ মিনিটে ২৭৮ রান ঐ পর্যায়ে সর্বাধিক সংগ্রহ।

১৯৫৫ সালে হাঁটুর আঘাতের জন্য তাঁর খেলোয়াড় জীবন বিঘ্নিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে দঃ আফ্রিকা সফরে তিনি শেষবারের মত দলের সঙ্গে আসেন। ১৯৫৯ সালের পর থেকে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সামান্যই দেখা গেছে

কাউড্রে, মাইকেল কলিন (১৯৩২—) .৯৪৬ সালে মাত্র তের বছর বয়সে টমব্রীজ স্কুল দলের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং দু'ইনিংসে যথাক্রমে ৭৫ ও ৪২ রান সংগ্রহ করেন। তাঁর মতো বয়সে খুব কম সংখ্যক খেলোয়াড়ই লর্ডসে ক্রিকেট খেলার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

কাউড্রে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু, ১৯৫১ সালে কেণ্ট দলের পক্ষে কাউণ্টি খেলা শুরু করেন ; এবং সেই বছরেই মোট ১১৮৯ (গড় ৩৩.০২) রান সংগ্রহ করেন। টেস্টম্যাচে আবির্ভাব ১৯৫৪ খ্রী-তে অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে, তখনও তাঁর বয়স ২২ পূর্ণ হয় নি। প্রথম ইনিংস খেলতে নেমে ৪০ রান করেন। সেই সফরের তৃতীয় টেস্টে সেঞ্চুরি করেন।

কলিন কাউড্রে জোরালো মারের ব্যাটসম্যান। স্ট্রেট ড্রাইভ তাঁর হাতের প্রিয় মার। তিনি ১১৪টি টেস্ট-ম্যাচ খেলেছেন তার মধ্যে ২৭টিতে দলের অধিনায়ক। ১৯৬২-৬৩ খ্রী দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এডিলেডে ১০০° জ্বর নিয়ে ৩০৭ রান তাঁর সর্বাধিক ব্যক্তিগত সংগ্রহ। এটি অস্ট্রেলিয়ায় ইংলণ্ডদলের খেলোয়াড়ের রেকর্ড রান।

উইকেটের কাছাকাছি তিনি একজন নিপুণ ফিল্ডার। টেস্ট-ম্যাচে ১১০টি ক্যাচ ধ'রে তিনি আরেকটি অনন্য রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম খেলোয়াড় যিনি উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরির (১৪৯ ও ১২২ রান) কৃতিত্ব অর্জন করেন। সে ম্যাচে তিনি কেণ্টের পক্ষে খেলেন। সোবার্স ছাড়া অপর কোন ক্রিকেটার কাউড্রের সমান টেস্টরান সংগ্রহ করতে সক্ষম হন নি। টেস্টে ২২টি শতরান সহ তাঁর সর্বমোট সংগ্রহ ৭৬৪২ (গড় ৪৪.০৬) রান।

কেনেডি, আলেকজাণ্ডার স্টুয়ার্ট (১৮৯১—১৯৫৯) স্কটল্যাণ্ডের এই ক্রিকেট খেলোয়াড়টি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। ১৯২২-২৩ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিনি পাঁচটি ম্যাচেই ইংলণ্ডের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সফরে গড় ১৯.৩২ রানে ৩১টি টেস্ট-উইকেট লাভ করেন। সফরে মোট উইকেট পান ৮২টি। ব্যাটে-বলে তাঁর দক্ষতার দরুন ১৯২১-৩০ খ্রী-র মধ্যে পাঁচবার ডবল্ পান। ১৯২২ খ্রী তে তাঁর সাফল্যের খতিয়ান উল্লেখযোগ্য। সে-বছরে ১৬.৮০ গড় রানে তিনি ২০৫টি উইকেট দখল করেন ; রান করেন ১১২৯। ১৯২৭ খ্রী প্লেয়ার্স দলের পক্ষে খেলে জেণ্টলমেনে দলের

প্রথম ইনিংসের দশটি উইকেটই মাত্র ৩৭ রানের বিনিময়ে কব্জা করেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে কেনেডি ২,৮৭৪টি উইকেট পান ও ১৬০০০-এর বেশি রান করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ক্লার্ক, উইলিয়ম (১৭৯৮-১৮৫৬) ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য নটিংহামের ক্লার্কের অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৮৪৬ সালে তিনি নিখিল ইংলণ্ড একাদশ স্থাপন করেন এবং তার উজ্জ্বল দিনগুলিতে তিনিই দলের দায়িত্ব বহন করেন। তখন অধিনায়কেরা পেশা হিসাবেই দল পরিচালনার দায়িত্ব নিতেন। ক্লার্ক নটিংহাম্পশায়ার দলের প্রথম অধিনায়ক এবং মৃত্যুর পূর্ব বৎসর পর্যন্ত ২০ বছরকালব্যাপী সেই দায়িত্ব কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেন। ক্লার্কের খেলোয়াড় জীবন অত্যন্ত দীর্ঘ। ১৮১৬ সালে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রথম মাঠে নামেন। এবং ১৮৫৬ সালে ইংলণ্ড একাদশ দলের পক্ষে শেষবারের মত খেলেন, সে খেলায় শেষ বলে একটি উইকেটও পান। তিনি ৪০ বৎসরের দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে নটিংহামশায়ার দলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তিনি টেণ্টব্রীজে দলের মাঠটি গড়ে তোলেন এবং সর্বপ্রথম খেলা দেখার জন্য দর্শনীর প্রবর্তন করেন।

তিনি কেবলমাত্র সংগঠক হিসাবেই না—সাহসী খেলোয়াড় হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। আণ্ডারআর্ম বোলার হিসাবে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ। অধুনা আণ্ডারআর্ম বোলিং প্রায় অচল হয়ে গেছে।

নটিংহামশায়ারের ইট প্রস্তুতকারক মানুষটি 'ওল্ড' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মাত্র ৫৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে একটিমাত্র বছরে ৪৭৬টি উইকেট দখল করেন। গড় ছিল মাত্র ৮ রান। আর এ সবই নিয়েছিলেন তাঁর আণ্ডারআর্ম বোলিং-এর দৌলতে।

গান, জর্জ (১৮৭৯-১৯৫৮) নটিংহামশায়ারের এই বিচিত্র ব্যাটসম্যানটি স্থির লক্ষ্য এবং রক্ষণাত্মক ব্যাটিং-এর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। যে কোন ধরনের বলই তিনি সহজ ভঙ্গিমায় খেলতে পারতেন। তবু জনমনোরঞ্জক খেলায় তাঁর আগ্রহ ছিল না বলে ১৯০২-৩২ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট জীবনে মাত্র ১৫টি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। কত রক্ষণাত্মক ভঙ্গি ছিল তাঁর খেলায়! ১৯২৯ খ্রী নটিংহামে ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিটের একটি দীর্ঘ ইনিংসে তিনি ৫৮ রান করেন। অবশ্য দ্রুত রানও করতে পারতেন তিনি।

টেন্টব্রীজে ১৯১৩ খ্রী ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে তিনি ৬ ঘণ্টায় ১৩২ রান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৮৫ মিনিটে ১০৯ রান করে অপরাজিত থাকেন। ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে ২০০ রান তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। উর-সেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৬৪ রান করে তিনি তাঁর ৫০তম জন্মদিন উদ্‌যাপন করেন। ১৯০৭ খ্রী-তে সিডনির টেস্ট খেলায় তিনি ১০৭ রান করেন। পরবর্তী পাঁচ বছরে আরও ১০টি টেস্ট খেলেন। কিন্তু তারপরে টেস্ট দল থেকে বাদ পড়ে যান। ১৭ বছর বাদে ১৯২৯-৩০ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় তাঁর ডাক পড়ে। ১৯৩২ খ্রী তাঁর অবসর গ্রহণের পর তাঁর পুত্রও নটিং-হামশায়ারে নিয়মিত খেলতে থাকেন। তবে তার আগে ১৯৩১ খ্রী একটি ম্যাচে ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে দুজনেই নটিংহামশায়ারের পক্ষে খেলেন এবং দুজনেই সেঞ্চুরি করে। একই ম্যাচে পিতা-পুত্রের সেঞ্চুরিও একটি রেকর্ড।

গ্রেভনি, টমাস উইলিয়ম (১৯২৭—) সুরসিক গ্রেভনি খেলার মাঠে যুগপৎ হাস্যরস ও রানের বন্যা ছুটিয়ে দিতেন। ২৩ বছর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে ১২২টি সেঞ্চুরি সহ রান করেছেন ৪৭,৭৯৩ (গড় ৪৪.৯১)। টেস্টম্যাচে তাঁর সর্বোচ্চ রান ১৯৫৭ সালে টেন্টব্রীজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ২৫৮। সে সিরিজে তাঁর রানের গড় ছিল ১১৮। ১৯৫৬ তাঁর সেরা মরসুম। সেবারে তিনি করেন মোট ২৩৯৭ রান (গড় ৪৯.৯৩)। ৫৫টি টেস্ট খেলার পর ১৯৬২-৬৩র সফরের শেষে কোন অজ্ঞাত কারণে তিনি টেস্ট নির্বাচক মণ্ডলীর কৃপা লাভ থেকে বঞ্চিত হন। ১৯৬৬তে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে তাঁকে আবার ডাকা হলে তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শন করেন। ব্যাটিং-এর গড়ে তিনি শীর্ষস্থানের অধিকারী হন। তাঁর শেষ ও ৭৯ তম টেস্ট খেলাও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে। ৪২ বছর বয়স্ক গ্রেভনি ওল্ড ট্যাফোর্ডের সেই ম্যাচে ৭৫ রান করেন।

গ্রেস, ডা. উইলিয়াম গিলবার্ট (১৮৪৯—১৯১৫) ক্রীড়াজগতের প্রবাদ-পুরুষ ডা. ডব্লু জি. গ্রেস আধুনিক ক্রিকেটের জনক। ক্রিকেটের যে প্রভূত জনপ্রিয়তা, তার মূলে ডা. গ্রেসের অবদান সকলেই স্বীকার করেন। তবু যত তাঁর ক্রীড়াকীর্তি তার চাইতেও বেশি কিংবদন্তীর এই নায়ক নিয়ে রচিত কল্প-কাহিনী। তাঁর চমৎকার স্বাস্থ্য, ঘন শ্মশ্রুযুক্ত মুখমণ্ডল সকলের পরিচিত। ব্রিস্টলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ডা. গ্রেস ছিলেন পাঁচজন ভাইয়ের মধ্যে চতুর্থ।

ওয়েস্ট গ্লৌসেস্টারশায়ার দলের পক্ষে তিনি যখন প্রথম ক্রিকেটের মাঠে আসেন তখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর। ১৮৬০ সালে তিনি ক্লিফটন দলের বিপক্ষে ৫১ রান করেন যখন তিনি এগারো পেরোন নি। পনেরো বছর বয়সে তিনি নিখিল ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে খেলেন। পরের বছরেই লর্ডস ও ওভালে খেলতে নামেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর মোট সংগ্রহ ৫৪,৮৯৬ রান যদিও পরবর্তীকালে চার জন ক্রিকেটার অতিক্রম করে গেছেন তবু ডা. গ্রেস যে ধরনের উইকেটে খেলেছেন তার প্রকৃতি বিচার করলে তাঁর বিপুল সংগ্রহ আমাদের প্রভূত বিস্ময় উৎপাদন করে। তাছাড়া তাঁর দখল করা উইকেটের সংখ্যা ২,৮৭২। তাঁর নিজের বলের পক্ষে তাঁর চেয়ে ভালো ফিল্ডারও দেখা যেত না। সাধারণত তিনি পয়েন্ট অঞ্চলে ফিল্ড করতেন। কিন্তু বল করার পরে ছুটে এসে এক্সট্রা মিড অফের জায়গা আগলাতেন। তাঁর ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান কেন্ট দলের বিপক্ষে এম. সি. সি. দলের হয়ে। ক্যাণ্টারবেরিতে অনুষ্ঠিত ১৮৭৬ সালের ঐ ম্যাচে তিনি ৩৩৪ রান করেন। এই রানসংখ্যা পরবর্তী ১৯ বছর ধরে সর্বাধিক রান হিসেবে বিবেচিত হত। ইয়র্কশায়ার (অপরাজিত ৩১৮) ও সাসেক্স-এর বিরুদ্ধে (৩০১) তাঁর আরও দুটি ত্রিশতাধিক রান। তাঁর দ্বিশতাধিক রানের সংখ্যা ১০। দু ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন ৩ বার। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে শতরান করেছেন ১২৬ বার। তাঁর সাফল্যের খতিয়ান ওল্টালে এমনি সব বিস্ময়কর তথ্য দেখা যাবে। ১৮৭১ সালে এক মরসুমে তাঁর সংগৃহীত রান ২৭৩৯ (গড় ৭৮.২৫) রান। ঐ বছরই উইকেট পেয়েছেন ৭৮টি (গড় ১৬.৬৪ রানে)। বোলিং-এর সেরা নিদর্শন ১৮৭৫-এ। সে বছরে ১৯১ উইকেট তাঁর ঝুলিতে জমা পড়ে (গড় ১২.৯২ রানে)। ১৮৭৭-এ একটি খেলায় ৮৯ রানে ১৭টি উইকেট দখল করেন শেফিল্ড দলের বিরুদ্ধে। তিনি স্লো-মিডিয়াম লেগ-ব্রেক বোলার ছিলেন। ডা. গ্রেস গ্লৌসেস্টারশায়ার দলের অধিনায়ক ছিলেন ১৮৭১-৯৮। ১৩টি টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড দল পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। এই সবগুলিই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তার মধ্যে মাত্র তিনটি ম্যাচে তাঁর দল হেরে যায়। ১৯০৮ সালে যখন তাঁর বয়স ৬০, তখনই শেষবারের মত প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে মাঠে নামেন।

চ্যাপম্যান, আর্থার পার্সী ফ্রাঙ্ক (১৯০০—৬১) ইংলণ্ড দলের সফলকাম অধিনায়কদের মধ্যে চ্যাপম্যান অন্যতম। তাঁর অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়ার

বিরুদ্ধে ৯টি ম্যাচের মধ্যে ইংলণ্ড ৬টিতে জয়লাভ করে। রীডিং তাঁর জন্মস্থান এবং ক্রিকেটজীবনের শুরুও হয় বার্কশায়ারে। তিনি কেম্ব্রিজের ছাত্র ছিলেন। ১৯২০-২২ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করে ব্লু পান।

১৯২৪ সালে তিনি কেণ্ট দলে যোগদান করেন এবং ১৯৩৯ সালে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত সে দলের পক্ষেই খেলেন। তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী ব্যাটসম্যান এবং নিপুণ ফিল্ডার। বিশেষত সিলি মিড-অফ্ অঞ্চলে ফিল্ডিং-এর জন্ম তিনি বিখ্যাত। ১৯৩০ সালে লর্ডস টেস্টের ২য় ইনিংসে তিনি ব্রাডম্যানকে যে দক্ষতার সঙ্গে লুফেছিলেন, সেই ম্যাচের ভাগ্যবান দর্শকদের স্মৃতিপট থেকে সে দৃশ্য কখনও মুছে যায় নি। ১৯২৮-২৯ সালে ব্রিসবেন টেস্টের উডফলের ক্যাচটিও অবিস্মরণীয়। চ্যাপম্যানই একমাত্র ব্যাটসম্যান যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে, জেন্টলমেন দলের পক্ষে, এবং ইংলণ্ড দলের পক্ষে লর্ডস মাঠে সেঞ্চুরি করেন। তিনি সর্বমোট ২৭টি সেঞ্চুরি করেন তন্মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ২৬০ উল্লেখযোগ্য।

চ্যাপম্যান ১৯৩১-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কেণ্ট দল পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর সর্বমোট রান ১৬,১৩৫ (গড় ৩১.৮২ রান)।

জার্ডিন, ডগলাস রবার্ট (১৯০০– ৫৮) ১৯৩২-এ প্রথম ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে সরকারী টেস্টে ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক ছিলেন ডগলাস জার্ডিন। পরবর্তী বছরে অস্ট্রেলিয়া সফরকালে বডি লাইন বোলিং নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় ওঠে সেই ইংলণ্ড দলেরও তিনি নেতৃত্ব করেন। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, নিয়মের অনুবর্তী ধীর মানুষটি তাঁর লক্ষে স্থির থাকতেন। ব্যাটিং-এ তাঁর চাতুর্য প্রকাশ পেত। তিনি স্লো বল করতেন তাঁর ফিল্ডিং-এ দক্ষতা ছিল চমৎকার। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু এবং সারে দলের খেলোয়াড় জার্ডিন ১৫টি টেস্টে ইংলণ্ড দলের নেতৃত্ব করেন। তবে ব্যাটিং এ অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত রক্ষণশীল হতেন। অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিসবেন টেস্টে ৮৩ মিনিটে কোনও রান করেন নি। ১৯২৮-২৯-এ টাসমনিয়ার বিরুদ্ধে অপরাজিত ২১৪ তার সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর।

জেসপ, গিলবার্ট লায়ার্ড (১৮৭৪—১৯৫৫) এই অকুতোভয় ব্যাটসম্যানটি তাঁর শাস্ত্রবিরোধী ব্যাটচালনার জন্য বনেদী ক্রীড়ানুরাগীদের সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। বোধহয় সেই কারণেই বিংশ শতাব্দী-পূর্ব ইংলণ্ডের ক্রীড়াজগতে তাঁর অনন্য স্বীকৃত হয়েছিল। এখনকার দিনে যে উজ্জ্বল

ক্রিকেটের জন্য সরব আলোচনা চলে তখন জেসপের কথা স্মরণে জাগে। গ্লৌসেস্টারশায়ারের এই বিখ্যাত খেলোয়াড়টি সব দিকেই যথেচ্ছ বল হাঁকাতে পারতেন। ১৮৯৯ সালে জেসপ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দলের অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার দল গ্লৌসেস্টারশায়ারের পক্ষে তিনি ২০ বছর কাল খেলেন তার মধ্যে ১৪ বছর দলের নেতৃত্ব করেন। তিন বছর দলের সম্পাদকও ছিলেন।

ব্যাটিং-এ তাঁর দক্ষতার কথা বলা হয়েছে। তিনি যে কত দ্রুত রান করতে পারতেন তার নজির হিসাবে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার ১৯০২ সালের ওভাল টেস্টের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ২৬৩ রান করলে জয়লাভ করবে এই অবস্থায় খেলতে নেমে ইংলণ্ড ৪৮ রানে ৫ উইকেট হারায়। তখন মাঠে এসে জেসপ সদর্পে ব্যাট চালনা করে ৭৫ মিনিটে ১০৪ রান করে ইংলণ্ডের জয় নিশ্চিত করেন; ইংলণ্ড এক উইকেটে জয়লাভ করে। ৬-বলের ওভারে দুটি ক্ষেত্রে ২৮ করে রান সংগ্রহ করেন। পাঁচবার তিনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে ২০০ উপর রান করেছেন। মোট তাঁর রানের সংগ্রহ হচ্ছে ২৬৭৬৪। তার মধ্যে তাঁর সর্বোচ্চ রানের ইনিংস হচ্ছে সাসেক্সের বিরুদ্ধে ১৭৫ মিনিটে ২৮৬ রান। তিনি কভার তয়েন্টের একজন সুদক্ষ ফিল্ডার। বোলার হিসাবে তাঁর সংগৃহীত উইকেট ২২.৯১ রানে ৮৫১ টি।

জ্যাকসন, স্যার ফ্রেডারিক স্ট্যানলি (১৮৭০-১৯৪১) জ্যাকসন একজন জাত ব্যাটসম্যান, ডান হাতি ফাস্ট মিডিয়াম বোলার কভার অঞ্চলের ফিল্ডার এবং সব মিলিয়ে সত্যিকারের অল-রাউণ্ডার। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই খেলোয়াড়টি ১৮৯৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নেমেই লর্ডসে প্রথম ইনিংসে ৯১ রান করেন। পরের বছরে জেণ্টলমেন বনাম প্লেয়ার্স দলের খেলায় প্রথমোক্ত দলের পক্ষে তিনি এবং এস. এস. উড কেবলমাত্র দুজন বোলারই বিপক্ষদলকে যথাক্রমে ১০৮ ও ১০১ রানে প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করতে বাধ্য করেন।

তিনি ইয়র্কশায়ারের পক্ষে কাউন্টি খেলতেন। সারা জীবনে ৭৭০টি উইকেট দখল করেছেন এবং রান করেছেন ১৫,৭৮২। তিনি অস্ট্রেলিয়া সফরে যেতে পারেন নি। কিন্তু স্বদেশে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দলের নেতৃত্ব নিয়ে ১৯০৫ সালে আপন দলকে অপরাজিত রাখেন। জ্যাকসন শুধু পাঁচবার টসেই জয়লাভ করেন নি, তিনি ব্যাটিং ও বোলিং এর গড়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

ক্রিকেটের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত থাকার দরুন ১৯২১ সালে তিনি এম. সি. সি-র সভাপতি হন। ১৯৩৪ সালে হন ইংলণ্ড টেস্ট নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান।

টিলডিসলি, জন টমাস (১৮৭৩—১৯৩০) ল্যাঙ্কাশায়ারের ওই পেশাদার নাছোড়বান্দা ব্যাটসম্যানটি তাঁর অসীম ধৈর্য ও ব্যাটিং-দক্ষতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ১৮৯৫ সালে তিনি ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষে কাউন্টি খেলা শুরু করেন এবং দ্বিতীয় খেলাটিতেই ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৫২ রান করেন। তিনি খুবই মারকুটে খেলোয়াড় ছিলেন এবং সুযোগ পেলেই উইকেটের চারপাশে মেরে রান তুলতেন। তিনি পরপর উনিশ বার মরশুমে সহস্র রান করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন, তন্মধ্যে চারবার দ্বিসহস্র ও একবার ত্রিসহস্রাধিক (৩০৪১) রান করেন। তিনি ১৩বার ডাবল সেঞ্চুরি করেন; সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর অপরাজিত ২৯৫। নটিংহামশায়ারের বিরুদ্ধে টেণ্টব্রীজে একটি খেলায় তিনি ২৫০ রান করেন। শেষ জুটিতে রান হয় ১৪১। তার মধ্যে সহ খেলোয়াড় ডব্লু. ওয়াবসলি করেন মাত্র ৩৭ রান। একটি খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরীর কৃতিত্ব তিনবার। খেলা থেকে অবসর গ্রহনের পর দীর্ঘদিন কোচ হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

টেট, ম্যুরিক উইলিয়াম (১৮৯৫-১৯৫৬) ব্যাটসম্যান হিসেবে দলে অন্তর্ভুক্ত হলেও পরবর্তীকালে বোলার হিসাবেই টেট প্রতিষ্ঠা পান। বলও বলও করতেন প্রথমে স্লো-অফ ব্রেক। খেলতেন সায়েন্স দলে। ১০ বছর পরে তাঁর বলের ধরণ পাল্টে যায়। তখন তিনি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। বলের তীব্র পেস এবং ভয়ঙ্করভাবে আউট সুয়িং করে। ১৯২৪-এ টেস্ট খেলায় জীবনের প্রথম বলে উইকেট দখল করে তাক লাগিয়ে দেন। দঃ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বার্মিহামের সেই টেস্টে সফরকারী দলের ইনিংস মাত্র ৩০ রানে ফুরিয়ে যায়। টেট ১২ রাণে ৪টি উইকেট দখল করে। টেট মোট ৩৯টি টেস্ট খেলেছেন তাতে ১৫৫ (গড় ২৬.১৩ রানে উইকেট দখল করেছেন। রান করেছেন ১১৯৮ (গড় ২৫.৪৮) ১৯২৪-২৫ এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫টি ম্যাচে গড় ২৩.১৮ রানের বিনিময়ে ৩৮টি উইকেট দখল করেন। এটি তাঁর সেরা সাফল্য এবং একটি জাতীয় রেকর্ড যা আজও ভাবা যায় নি। ২বার হাজার রান ও দু'শ উইকেট সংগ্রহের গৌরব অর্জন করেছেন।

ট্রুম্যান, ফ্রেডারিক কোওয়ার্ড (১৯৩১-) বোলার দৌড়তে শুরু করেছেন, বল ছোঁড়ার আগেই দেখা গেল ব্যাটসম্যান লেগ আম্পায়ারের আড়ালে। এমন ছবি বিরল হলেও অসম্ভব নয়। ১৯৫২-এ ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করে যখন তিনি বোলিং করতেন তখন প্রথমদিকে দেখা যেত সাহসী ওপেনাররা লেগ আম্পায়ারের আড়ালে। তিনিই প্রথম বোলার যিনি টেস্টে তিন শতাধিক (৩০৭) উইকেট দখল করেছেন। আর কোনও ফাস্ট বোলার এই কৃতিত্বের অধিকারী হন নি। ভারতের বিরুদ্ধে উক্ত সিরিজে ২৯টি উইকেট পান (গড় ১৩.৩১ রানে)। ম্যানচেস্টারের প্রথম টেস্টে মাত্র ৪.৮ ওভারে ৩১ রানের বিনিময়ে ৮টি উইকেট পান। টেস্ট ম্যাচের তাবৎ ইতিহাসে কোন ফাস্ট বোলার এমন কৃতিত্বের অধিকারী হন নি। এজবাস্টনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে তিনি ১৯৬৩ সালে এমন কৃতিত্ব দেখান। সেবারে ৭৫ রানে ৫ ও ৪৪ রানে ৭ উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে এক সময় তাঁর বোলিং-এর হিসাব ছিল ৩.১-২-০-৫। ঐ সিরিজে তিনি মোট ৩৪টি টেস্ট উইকেট পেয়েছিলেন। বোলিং ছাড়াও ডান হাতি ব্যাটসম্যান হিসাবেও নেহাৎ ফেলনা ছিলেন না। কাউন্টি ক্রিকেটে ১০৪ রান তাঁর ব্যাটিং-দক্ষতার পরিচয় বহন করেন।

ডগলাস, জন উইলিয়াম হিয়ারী টাইলর (১৮৮২-১৯৩০) শুধু ক্রিকেটের অল-রাউণ্ডার নন, বক্সিং-এ অলিম্পিকে চ্যাম্পিয়ান। ফুটবলে জাতীয় দলের খেলোয়াড় ডগলাসের তুলনা মেলা ভার।

১৯০১ সালে তিনি এসেক্সের পক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। দলের অধিনায়ক হন ১৯১১-২৮। ইংলণ্ড দলের পক্ষে যে ২৩টি টেস্ট খেলেন তার ১৮টিতে তিনিই ছিলেন অধিনায়ক।

ব্যাটসম্যান হিসাবে অত্যন্ত রক্ষণাত্মক ভঙ্গীতে তিনি খেলতেন। ফলে কোন কোন সময়ে অধৈর্য দর্শকদের উপহাসের কারণ হতেন। তবে ঠাণ্ডা মাথার খেলোয়াড় ডগলাস এ সব কিছু উপেক্ষা করে লক্ষ্যে স্থির থাকতেন। উল্লেখযোগ্য—১৯১৩-১৪ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সোওয়া চার ঘণ্টায় তাঁর ১১৯ রান এপ্রসঙ্গে ১৯২১ সালে তার পারদর্শিতার চূড়ান্তরূপ দেখা যায়। সে বছরে তিনি ১৫৪৭ রান সংগ্রহ করেন। উইকেট পান ১৩০টি। ঐ বছরই ৪৭ রানের বিনিময়ে ডার্বিশায়ারের ৯টি উইকেট লাভ করেন। স্কোর

ঐ ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধেই অপরাজিত ২১০ রান তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান। জীবনে তিনবার হ্যাটট্রিক করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ২৩ ইনিংসে গড় ৫০'০০ রান জ্যাক হবসের পরেই প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁর স্থান নির্দিষ্ট করেছিল। ১৯৩০ সালে নর্থ-সীতে এক জাহাজ দুর্ঘটনায় তাঁর সলিল সমাধি হয়।

ডলিভেরা, বেসিল লুইসন (১৯৩১—) দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটার ডলিভেরা বর্ণসমস্যার শিকার হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তী কালে ইংলণ্ডে কাউন্টি লীগে খেলার অধিকার পান এবং ইংলণ্ডদলের পক্ষে টেস্ট ম্যাচেও খেলেন। ১৯৬০ সালে ডলিভেরা এসে সেনট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে মিড্‌লটন দলের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেই বছরের সেরা খেলোয়াড়ের কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি একজন ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বিশ্বস্ত অফব্রেক বোলার।

১৯৬৫ সালে ডলিভেরা জাতীয় দলের পক্ষে নির্বাচিত হন। মোট ৪৪টি টেস্ট ম্যাচে তাঁর সংগৃহীত রান ২৪৮৪ (গড় ৪০'০৬) ও উইকেট ৪৭ (গড় ৩৯'৫৫ রানে)।

ডাকওয়ার্থ, জর্জ (১৯০১-১৯৬৬) ডাকওয়ার্থ ইংলণ্ড দলের একজন কৃতী উইকেট কীপার। ল্যাঙ্কাশায়ারের ওয়ারিংটনে জন্মগ্রহণ করে ও ঐ দলের পক্ষে তাঁর সেরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখলেও তাঁর খেলোয়াড় জীবনের সূত্রপাত হয় ওয়ারউইকশায়ারের পক্ষে অংশগ্রহণ করে। এক বছরে শতাধিক উইকেট পেয়েছেন। ১৯২৮ খ্রী তাঁর দখল করা ১০৭টি উইকেটের মধ্যে ৭৭টি ছিল ক্যাচ ও ৩০টি স্টাম্প।

ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষে কেন্টের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে তিনি ৮খানি উইকেট পান। ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে সমসংখ্যক উইকেট লাভ করেন।

১৯২৪ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে তিনি ২৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। পরবর্তী কালে দক্ষতা থাকলেও উন্নত ব্যাটসম্যান হিসাবে এমস উইকেট রক্ষক হিসাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

ডাফট, রিচার্ড (১৮৩৫-১৯০০) নটিংহামশায়ারের খেলোয়াড় রিচার্ড ডাফট প্রথমে অপেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে জীবন শুরু করে পরে পেশাদার হন। জীবনের শেষে পেশাদারী বৃত্তি ত্যাগ করে তিনি পুনরায় অপেশাদার হন।

তিনি একজন নিপুণ ব্যাটসম্যান ছিলেন। তাঁর হাতে বিচিত্র সব মার ছিল। নয়নসুখকর সেইসব মার থেকে প্রচুর রানও আসত।

ডাফট ১৮৫৮ সালে লর্ডসে জেণ্টলমেন দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৮৬০ সালে প্লেয়ার দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। পরবর্তী কালে ঐ দলের অধিনায়কও হন কয়েকবারের জন্ম।

তাঁর দীর্ঘ খেলোয়াড় জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বয়স ৫০ পেরুবার পরও তিনি ১৭টি সেঞ্চুরি করেন। তিনি নিখিল ইংলণ্ড একাদশের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৮৭৯ সালে একটি ক্রিকেট দল নিয়ে আমেরিকা সফরে যান।

রিচার্ড ডাফট ১৮৮০ সালে প্রথমে শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ১৮৯১ সালেও তাঁকে ক্রিকেট মাঠে দেখা গেছে। তিনি ৫৯ বছর বয়সে একটি ম্যাচে ১৪০ রান করেন। সেটাই তাঁর সর্বশেষ সেঞ্চুরি। ম্যাচটি অবশ্য প্রথম শ্রেণীর ছিল না।

ডেক্সটার, এডওয়ার্ড র‍্যালফ (১৯৩৫—) যুদ্ধোত্তরকালের নতুন মুখের মধ্যে টেড ডেক্সটার অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব।

তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট ও গল্ফ ব্লু। বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল পরিচালনা করেন ১৯৫৮য়। ম্যাঞ্চেস্টারে নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে টেস্টেও সেই গ্রীষ্মে তিনি প্রথম খেলেন এবং ৫২ রান করেন।

১৯৫৮-৫৯ খ্রী অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ডগামী দলে নির্বাচিত না হলেও পরবর্তী কালে দলীয় খেলোয়াড়েরা আহত হলে তাঁকে অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হয়। সেখানে উল্লেখযোগ্য কিছু করতে না পারলেও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ক্রাইস্ট চার্চের টেস্টে তিনি ১৪১ রান করেন। তন্মধ্যে ২৪টি চারের মার ছিল।

এ সত্ত্বেও স্বদেশে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে তাঁকে মাত্র দুটি টেস্টে খেলানো হয়। অবশ্য পরবর্তী শীতকালে তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাঁর কাউণ্টি-দল সাসেক্স ১৯৬০ সালে তাঁকে অধিনায়ক মনোনীত করে। তিনিও দক্ষভাবে খেলে দলকে লীগ টেবিলের পঞ্চদশ স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে উন্নীত করেন।

১৯৬১-৬২ সালে ভারত-পাকিস্তান সফরে তাঁর উপরে জাতীয় দল

পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁর সাফল্যের জন্য ১৯৬২ অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনিই অধিনায়ক মনোনীত হন। ৬২টি টেস্ট ম্যাচ খেলে ৩০টিতে তিনি অধিনায়কত্ব করেন। অবশ্য অধিনায়ক হিসাবে তাঁকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু ব্যাটসম্যান হিসাবে তাঁর সাফল্য অনস্বীকার্য।

নট, অ্যালান ফিলিপ্‌স্ এরিক (১৯৪৬—) ১৯৭৬-এর রাবার লড়াইয়ে ৬ জনকে আউট করে এই উইকেট রক্ষকটি টেস্ট ম্যাচে ২২১ জনের 'মৃত্যু'র কারণ হয়ে ওঠেন। তন্মধ্যে ২০৪টি ছিল 'ক্যাচ' ও ১৭টি 'স্টাম্প'। এছাড়া তিনি ১৯৭০-এ ইংলণ্ড বনাম বিশ্ব একাদশের পাঁচটি প্রদর্শনী খেলায় ১৪ জনকে আউট করেন। সেই দলের পক্ষে নট প্রথম শ্রেণীর খেলায় আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৬৪ সালে এবং অল্প দিনের মধ্যেই জাতীয় দলে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত উইকেট কীপার টি. জি. ইভান্সের ২১৯টি টেস্ট উইকেটের বিশ্ব রেকর্ডটি ভেঙে দেন। ইভান্স যে রেকর্ড গড়তে ১৩ বছর সময় নিয়েছিলেন তিনি মাত্র ৯ বছরেরই তা ভঙ্গ করেন। ব্যাটসম্যান হিসাবেও নটের দক্ষতা অনস্বীকার্য। তিনি ১৯৭২-এ সেভস্টোনে সারের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে দু' ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেন (১২৭ ও ১১৮)। দু' ইনিংসেই তিনি অপরাজিত ছিলেন। এম. সি. সি-র পক্ষে ভারতে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে তাঁর ১৫৬ রান উল্লেখযোগ্য। টেস্ট ম্যাচে তাঁর মোট রান ৩,৫৭৫ (গড় ৩৩'২৮)।

পার, জর্জ (১৮২৬-১৮৯১) বোলিং-এর লেগ থিয়োরি সকলের কাছে গৃহীত হবার আগেই তিনি এই ধরনের ব্যাটিং-এর সেরা নজির হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে বল আদৌ লেগের দিকে ফেলা হয় নি সে বলকেও দ্রুত পায়ের অবস্থান পরিবর্তন করে সেই দিকেই পাঠাতেন যাতে করে বোলারের চোখে প্রথমেই যা ফুটে উঠত তার নাম বিস্ময়। ১৮৪৭ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশে নিখিল ইংলণ্ড একাদশের পক্ষে লিসেস্টারশায়ারে খেলতে নেমেই শতরান করবার গৌরব অর্জন করেন। পরবর্তী খেলায় তাঁর রান অপরাজিত ৭৮ ও ৬৪। মনে রাখতে হবে তখন রান সংগ্রহ করা অতি কঠিন কাজ ছিল, কেননা ১৮ জন কিংবা তারও বেশি ফিল্ডার মাঠে থাকত। তাই, তাঁকে যে নর্থের লায়ন বলা হত তার ভেতরে কোনও অত্যুক্তি ছিল না। ১৮৫৬ সালে উইলিয়াম ক্লার্কের মৃত্যুর পর পার নিখিল ইংলণ্ড দলের ম্যানেজার মনোনীত হন। সে বছর থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত তিনি নটিংহামশায়ার দলের অধিনায়কের

দায়িত্ব বহন করেন। তিনি প্রথম একটি প্রতিনিধিমূলক জাতীয় দলকে বিদেশ সফরে নেতৃত্ব দেন। তাঁর যোগ্য পরিচালনায় ঐ দলটি ১৮৫৯ সালে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র সফরের শেষে অপরাজিত অবস্থায় দেশে ফেরে। ১৮৬৩ সালে দ্বিতীয় যে দলটি অস্ট্রেলিয়া যায় তারও অধিনায়কদের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়। প্রথম সফরে ইংলণ্ড দুটি ম্যাচে পরাজিত হলেও এই বারের সফরে অপরাজিত থাকে। তাই পারকে কেবলমাত্র ভালো ব্যাটসম্যান বললেই সব বলা হয় না। তিনি একজন সেরা অধিনায়ক, ইংলণ্ডের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ অধিনায়কদের অন্যতম।

পারকার, চার্লস ওয়ারিংটন লিওনার্ড (১৮৮৪-১৯৫৯) ১৯০৩ সালে এই বাঁহাতি স্লো বোলারটি গ্লৌসেস্টারশায়ারের পক্ষে খেলতে নামলেও অচিরে সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তাঁর ব্যাটিং তৎকালীন অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর বোলারদের তুলনায় খাটো থাকায় একটির বেশি টেস্ট ম্যাচে তাঁকে খেলানো হয় নি। ১৯১৯ খ্রী একটি খেলায় ৯১ রানে ১০টি উইকেট পান। পরের মরসুমেই ১০০টি উইকেট দখলের গৌরব অর্জন করেন। তারপর থেকে ১৯৩৫ খ্রী অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কোন মরসুমেই সে গৌরব হাতছাড়া হতে দেন নি। তাছাড়া ৫টি মরসুমে তিনি ২০০ উইকেট লাভ করেন। তাঁর সেরা গড় হচ্ছে ১৯৩০-এ। সে বছর গড় ১২.৮৪ রানের বিনিময়ে তিনি ১৭৯টি উইকেট পান। ১৯২২ সালে একটি ম্যাচে তিনি পরপর পাঁচ বলে ৫ জন ব্যাটসম্যানকে বোল্ড আউট করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তার একটি নো বল হয়ে যায়। তাঁর কৃতিত্বের খতিয়ানের আরও দুটি উল্লেখ করা যেতে পারে। সমারসেটের বিরুদ্ধে ৭৯ রানে ১০ উইকেট এবং এসেক্সের বিরুদ্ধে ১৭ উইকেট (৪৪ রানে ৯ ও ১২ রানে ৮ উইকেট)।

পিলচ, ফুলার (১৮০৩-৭০) তৎকালীন ইংলণ্ডে সেরা পেশাদারী ব্যাটসম্যান হিসাবে পরিচিত পিলচ বার্ষিক ১,০০০ পাউণ্ডের পুরস্কার পান। সিঙ্গল উইকেটের খেলায় তাঁর দক্ষতা বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। উইলিয়াম লিলি হোয়াটের সঙ্গে তাঁর ব্যাটে-বলে খুবই উপভোগ্য লড়াই হত। তাঁরই বিরুদ্ধে তিনি ১৮৩৭ সালের একটি খেলায় নিজস্ব সর্বাধিক রান (১৬০) করেন। ১৮৪৭ সালে নিখিল ইংলণ্ড দলের পক্ষে প্রথম খেলেন এবং ব্যাটিং নৈপুণ্যের জন্য সে দলে তাঁর স্থান পাকা হয়। ফরোয়ার্ড খেলার প্রবর্তক হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর খেলা দর্শকসাধারণের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়

ছিল। প্লেয়ার বনাম জেণ্টলম্যানের খেলায় ১৮২৭ থেকে ১৮৪৯ সালের মধ্যে ২৪ বার তিনি অংশ গ্রহণ করেন। খেলোয়াড়ের জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর সেই লরেন্স গ্রাউণ্ডের গ্রাউণ্ডসম্যানের কাজ করতেন। ক্রিকেট আম্পায়ার হিসাবেও তিনি কাজ করেছেন।

পীল, রবার্ট (১৮৫৭-১৯৪১) ইয়র্কশায়ারের বাঁহাতি স্লো বোলার যাকে সি. বি. ফ্রাই তাঁর আমলের সেরা বোলার বলেছেন। তিনি বাঁ হাতে চমৎকার ব্যাট করতেন, ফিল্ডিং-এ তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ১৮৮২ সালে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে নামেন এবং ১৮৯৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর খেলায় ১২০০০ রান করেন এবং ১৭৫৪ (গড় ১৬'২১ রানে) উইকেট দখল করেন। তিনি দুর্ভাগ্যবশত টেস্ট ম্যাচে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাঁর তিনটি 'জোড়া চশমা' (০-০) বোধহয় একটি রেকর্ড। লিসেস্টার-শায়ারের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২২৬ রান, ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২১০ রান তাঁর ব্যাটিং সাফল্যের কয়েকটিমাত্র নজির।

পেণ্টার, এডওয়ার্ড (১৯০১—) ১৯৩২-৩৩ জার্ডিনের দলের 'এ্যাসেজ' উদ্ধারের লড়াইয়ের অন্যতম সেরা সৈনিক হিসাবে পেণ্টার খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। টনসিলের অসুখে তিনি যখন হাসপাতালে শয্যাশায়ী তখন ব্রিসবেনে ইংলণ্ডের ব্যাটিং-এর ইমারত তাসের ঘরের মত ঝরে পড়েছিল। পেণ্টার সে অবস্থায় মাঠে নেমে ৮৩ রান করেছিলেন। দুদিন পরে তাঁরই ব্যাট থেকে রাবার জয়ের রানটি আসে। ১৯২৬ সালে ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষে খেলতে এসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত এক নাগাড়ে খেলে যান। যুদ্ধের শেষে ১৯৫০-এ যে কমনওয়েলথ দল ভারত সফর করে তিনি সে দলের সদস্য ছিলেন। খেলা থেকে অবসর নেবার পরেও কিছুকাল আম্পায়ার হিসাবে তিনি মাঠের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। ১৯৩৭ তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের সেরা মরসুম। ঐ বছরে তাঁর রান হয় ২৯০৪ (গড় ৫৩'৭৭) এবং সেই গ্রীষ্মে সাসেক্স দলের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করেন তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ৩২২। ল্যাঙ্কাশায়ার দলের পক্ষে একজন পেশাদার হিসাবে ম্যাকলার্নের ৪২৪ রানের পরের সর্বোচ্চ রানটি তাঁরই। ঐ ৩২২ রানের ১০০ রান করেন মধ্যাহ্ন ভোজের আগে ১১৫ মিনিটে, ২০০ রান করেন ২০৫ মিনিটে, ৩০০ রান করেন ২৯০ মিনিটে এবং ৩০০ মিনিটে করেন ৩২২ রান।

পেণ্টার কুড়িটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন; তন্মধ্যে ১৯৩৮-৩৯-এ দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ২৪৩।

ফেলিক্স, ওয়ানোসট্রিক (১৮০৪-১৮৭৬) ক্যাম্বারওয়েল গ্রীনের একজন স্কুল শিক্ষক। তৎকালীন ক্রীড়াজগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ক্রিকেটের মাঠে ফেলিক্স অন্য কারণে পরিচিত। তিনি ব্যাটিং দস্তানার প্রবর্তন করেন। তাঁর লেখা বই 'অন দ্য ব্যাট' সংগ্রহে রাখবার মত একটি চমৎকার গ্রন্থ। ফেলিক্স প্রধানত সারে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। ঐ দল ছাড়াও তিনি কেণ্ট এবং নিখিল ইংলণ্ড একাদশের পক্ষেও খেলেন। তাঁর যুগের সেরা বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ফেলিক্সের অফ ড্রাইভে এবং কাটগুলিতে ছিল শিল্পীর হাতের ছোঁওয়া। পয়েণ্ট অঞ্চলের একজন দক্ষ ফিল্ডার ও অত্যন্ত পরিশ্রমী বোলার।

হ্যারিস, ডেভিড (১৭৫৮-১৮০৩) ক্রিকেটের প্রাথমিক যুগের অন্যতম প্রধান ক্রিকেটার। প্রধানত বোলার। খেলার উন্নতিতে তাঁর অবদান আজও স্বীকৃত হয়।

তাঁর বোলিং পদ্ধতিটি ছিল একটি আদর্শ। নিখুঁত মাপের বল, বোলিং-এর মনোরম ভঙ্গী এবং সর্বোপরি তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য ক্রীড়াজগতের অন্যতম প্রিয় মানুষ ছিলেন। বোলার হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলতে তাঁর চেয়ে বেশি শ্রম বোধহয় কাউকে করতে হয় নি। জীবনের শেষের দিকে তিনি বাতে পঙ্গু হয়ে পড়েন।

ফ্রাই, চার্লস বার্গেস (১৮৭২-১৯৫৬) চার্লস ফ্রাই শুধুমাত্র একজন সুদক্ষ ক্রিকেটারই ছিলেন না, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলোয়াড়ও ছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ব্লু পেয়েছিলেন। জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং এফ. এ কাপের ফাইন্যালে খেলার গৌরব অর্জন করেছিলেন। ব্ল্যাকহীথ দলের পক্ষে তিনি নিয়মিত রাগবীও খেলতেন। একটি খেলায় আঘাত পাবার দরুন এই খেলাতেও তাঁর প্রাপ্য ব্লু থেকে বঞ্চিত হন। অবশ্য তাঁর তৃতীয় ব্লুটি জোটে অ্যাথেলেটিকস্-এ। তিনি দৈর্ঘ্য লম্ফনে যে রেকর্ড করেন তা পরবর্তী ২১ বছর পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল।

১৮৯১ সালে সারে দলের পক্ষে ক্রিকেট খেলা শুরু করেন, পরে ১৮৯৪ সালে সাসেক্স দলে চলে যান। ১৯০৮ সালে মার্কারী জাহাজে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন এবং ১৯০৯-২১ সালের মধ্যে মাত্র ৫টি মরশুমে তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অংশ গ্রহণ করেন।

ক্রীড়াজগৎ ছাড়া অন্যত্রও তাঁর অধিকার ছিল। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, সাংবাদিকতায় তাঁর দখল ছিল। রাজনীতিতেও আকর্ষণবোধ করতেন। অবশ্য হাউস অব কমন্সের সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন নি। তিনি শিক্ষকতার কাজ করেছেন ৭৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

ফ্রাই একজন বোলার হিসাবে ইংলণ্ড দলে আসেন, কিন্তু পরবর্তী কালে দলের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসাবে পরিগণিত হন। চমৎকার ড্রাইভ করতেন। পেছিয়ে এসে খেলায় তাঁর জুড়ি ছিল না।

মোট ২৬টি টেস্টে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে ৯ বার অধিনায়ক।

অস্ট্রেলিয়া সফরের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান না করলে আরও অনেক টেস্ট খেলতে পারতেন। ১৮৯৫-৯৬-এ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যান। এটাই তাঁর একমাত্র বিদেশ সফর। তিনি ১৬ বার সেঞ্চুরি করেছেন, এবং ৫বার দু-ইনিংসে শতাধিক রান করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ১৯০১ সালে তিনি পরপর ৬টি খেলায় শতরান করেন, এবং সে বছরে মোট রান করেন ৩১৪৭ (গড় ৭৮·৬৭)। ১৯১১য় হাম্পশায়ারের হয়ে এবং গ্লৌসেস্টারশায়ারের বিপক্ষে অপরাজিত ২৫৮ রান তাঁর সর্বাধিক ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

ফ্রীম্যান, আলফ্রেড পারসি (১৮৮৮-১৯৬৫) প্রথমশ্রেণীর ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট দখলের কৃতিত্ব উইলফ্রিড রোডসের। তার পরেই এই কৃতিত্বের অধিকারী ফ্রীম্যান। ১৯১৪ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত খেলোয়াড় জীবনে তিনি ১৮·৪২ গড় রানে ৩৭৭৬টি উইকেট দখল করেন। বোলার হিসাবে তাঁর অনন্য কৃতিত্বের কটি নজির :

এক ইনিংসে দশটি উইকেট দখল তিনবার। মরশুমে শতাধিক উইকেট লাভ ১৭ বার। ১৯২৮-এ একটি মরশুমে মোট সংগ্রহ ৩০৪টি উইকেট (গড় ১৮·০৫ রানে)। ১৯৩৩ খ্রী মোট ২৯৮টি উইকেট দখল গড় ১৫·২৬ রানের বিনিময়ে। তিনবার হ্যাটট্রিক করেন।

১৯২২ সালে তাঁর নিজ দল কেণ্টের পক্ষে সাসেক্স দলের বিরুদ্ধে তার বোলিং সাফল্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ঐ খেলায় এক ইনিংসে তিনি ১১ রানে ৯টি উইকেট দখল করেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও ৩৬ রানের বিনিময়ে ৮টি উইকেট পান। আবার দশবছর পরে ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধেও দু-ইনিংস মিলে ১৭টি উইকেট পান। ফ্রীম্যান সাধারণত লেগব্রেক বল করতেন। এবং তার বলকে সমীহ করতেন না এমন ব্যাটসম্যান সেযুগে ইংলণ্ডে ছিলেন না।

বয়কট, জিওফ্রে (১৯৪০—) ইংলণ্ড দলের পক্ষে অন্যতম সেরা ওপেনিং ব্যাটস-ম্যান বয়কট এখনও তার দলে অপরিহার্য। চলতি মরশুমে (১৯৭৯) সফররত ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে তাঁর অনবদ্য ব্যাটিং ইংলণ্ড দলের সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি।

ইয়র্কশায়ার কাউন্টি দলে স্থানলাভের পরবর্তী বছরে ১৯৬৪তে অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন। ১৯৭৪ সালের ভেতরে দশ বছরে তিনি টেস্ট ম্যাচ খেলে ১২টি সেঞ্চুরিসহ মোট ৪৫৭৯ রান (৪৭.৬৯) করেন। তার মধ্যে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে ১৯৬৭তে লীডস মাঠে অপরাজিত ২৪৬ রান তার ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর। অবশ্য ১৯৭৪-৭৫এর অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ড সফরে তিনি দল থেকে বাদ পড়ে যান। কিন্তু পরবর্তী কালে আবার জাতীয় দলে নিজের আসন পুনরুদ্ধার করেন। ১৯৭১ সালে তিনি ইয়র্কশায়ার দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৬৩ সালে ঐ দলে যোগদান করার পর থেকে তিনি বরাবরই ব্যাটিংয়ে দলের শীর্ষস্থান অধিকার করে আসছেন। ১৯৭১-এ স্বদেশে সেরা ব্যাটসম্যানের স্বীকৃতি পান। তাঁর রানের গড় সেবারে ছিল ১০০.১২। ব্রীজটাউনে এম. সি. সি. বনাম প্রেসিডেণ্ট একাদশের খেলায় তাঁর অপরাজিত ২৬১ এ-পর্যন্ত তাঁর সর্বাধিক সংগৃহীত রান। এ যাবৎ ৮৪টি টেস্ট খেলে তাঁর মোট রানসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৩১৬, গড় ৪৯.৩৪। তাঁর টেস্ট সেঞ্চুরির সংখ্যা ১৮।

বার্নেট, চার্লস জন (১৯১০—) গ্লোসেস্টারশায়ারের ক্রিকেটার সি. এস. বার্নেটের ছেলে চার্লস জন বার্নেট মাত্র ১৬ বছর বয়সে তাঁর জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে গ্লোসেস্টারশায়ার দলে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে রচডেল দলে যোগ দিয়ে সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে অংশগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঐ দলে খেলেছেন।

বার্নেট অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যাটসম্যান ছিলেন, বিশেষত অফের দিকে মারে তাঁর জুড়ি ছিল না। তিনি মিডিয়াম পেস বোলার হিসাবে সমপরিমাণ কার্যকর ছিলেন। তিনি বহুবার দলের ব্যাটিং শুরু করেছেন, বোলিংও শুরু করেছেন। ত্রিশের দশকে চারবার (১৯৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭) তিনি দ্বিসহস্রাধিক রান করেছেন।

১৯৩৩ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট-ম্যাচ খেলেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সেই সফরে বার্নেট একটি মাত্র ম্যাচ খেলেন। অবশ্য পরে ভারত সফরকালে ইংলণ্ড দলের পক্ষে তিনি তিনটি টেস্ট ম্যাচেই অংশগ্রহণ করেন।

পরবর্তী বছরে ভারতের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচ খেলার পরে ১৯৩৬-৩৭-এ অস্ট্রেলিয়া সফরকালে আন্তর্জাতিক ম্যাচে তিনি বিশেষভাবে সফল হন। এডিলেড টেস্টে তিনি সেঞ্চুরি করেন, সেই খেলায় ১২৯ তাঁর টেস্টে সংগৃহীত সর্বাধিক রান। কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ২৫৯ রানও তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান।

বার্নেট অসম্ভব জোরে বল মারতে পারতেন। বাথ-এ একটি খেলায় তিনি ১:৪ রান করেছিলেন তার মধ্যে ১১টি ওভার বাউণ্ডারি ও ১৮টি বাউণ্ডারি ছিল। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে এক ইনিংসে এ পর্যন্ত পাঁচজন খেলোয়াড় ১:টি ওভার বাউণ্ডারি করবার অধিকারী হয়েছেন।

বোলার হিসাবে তাঁর সেরা খেলা ১৯৩৬-এ এসেক্সের বিরুদ্ধে ১২ ওভারে ১৭ রানের বিনিময়ে ৬টি উইকেট লাভ।

উইলিয়াম, বার্নেস (১৮৫২-১৮৯৯) টেস্ট ম্যাচে বোলিংয়ের গড় হিসাবে সেরা বোলার হচ্ছেন নটিংহ্যাম্পশায়ারের উইলিয়াম বার্নেস।

তিনি কেবলমাত্র অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই ২:টি টেস্ট ম্যাচ খেলে ১৫.৫৪ রানের গড়ে ৫১টি উইকেট দখল করেছিলেন। একজন মিডিয়াম পেস বোলার ছিলেন তিনি এবং ব্যাটসম্যান হিসাবেও নির্ভরযোগ্য। টেস্টে তাঁর সংগ্রহ ৭২৫ রান (গড় ২৩.৩৮)। :৮৮৪ সালে এডিলেডে ১৩৪ ও অপরাজিত ২৮ তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ইনিংস। অবশ্য অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক ভঙ্গীতে ব্যাট করার জন্য তিনি সমালোচিত হয়েছেন। ১৮৭৫ থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে উইলিয়াম বার্নেসের ব্যক্তিগত রানের সংখ্যা ছিল ১৫,৫২৯। তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ১৬০। ১৮৮৫ সালে তাঁর বলের হিসাব চমকপ্রদ। সে বছরে তিনি ৯৭টি উইকেট (গড় ১৫.৫৩ রানে) পেয়েছিলেন।

বার্নেস, সিডনি ফ্রান্সিস (১৮৭৩-১৯৬৭) মাত্র ১৬.৪৩ গড় রানের বিনিময়ে টেস্ট উইকেট পাওয়া নিশ্চয় একটি প্রধান বোলারের নিদর্শন। এই কৃতিত্বের অধিকারী সিডনি বার্নেস নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী বোলার ছিলেন। তাঁর ঝুলিতে জমেছিল ১৮৯টি টেস্ট উইকেট উক্ত গড় রানের বিনিময়ে।

১৯০১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য এ. সি. ম্যাকলারেন যখন তাঁকে নির্বাচিত করেন তখন তিনি নিতান্তই অপরিচিত। কিন্তু অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে তিনি জনপ্রিয়তার উজ্জ্বল আলোকে অচিরেই চলে আসেন।

বার্নেসের পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে তখন পর্যন্ত তিনি প্রথম শ্রেণীর

ক্রিকেটে মাত্র ৯টি উইকেট পেয়েছিলেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া সফরের প্রথম দুটি টেস্টে তাঁর সংগ্রহে জমা পড়ে ১৯টি উইকেট; যার ভেতরে ছিল ৪২ রানে ৬ উইকেট ও ১২১ রানে ৭ উইকেট এর দু'টি ইনিংস। তৃতীয় টেস্টে হাঁটুতে আঘাত পান সেজন্য সফরের বাকী খেলায় তেমন কিছু করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও গড় ১৭ রানের বিনিময়ে ১৯টি উইকেট লাভ এখনও ইংলণ্ডে তাঁকে বোলিং গড়ের শীর্ষস্থানে রেখেছে।

১৯০৩—০৪এ তিনি অস্ট্রেলিয়া সফরে যেতে পারেন নি, কিন্তু ১৯০৭-০৮ এ ২৪টি টেস্ট উইকেট (গড় ২৬'০৮ রানে) লাভ করেন। ১৯১১-১২ খ্রী মেল-বোর্নের দ্বিতীয় টেস্টে ১১ ওভারে মাত্র ৬ রানের বিনিময়ে পাঁচজন বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানকে প্যাভেলিয়ানে ফিরিয়ে দেন। ১১ ওভারের ৯টি ই ছিল মেডেন। মনে রাখতে হবে উইকেটটি ছিল ব্যাটসম্যানের সহায়ক।

দক্ষিণ আফ্রিকা দলেরও সিডনি বার্নেসকে স্মরণে রাখার যথেষ্ট কারণ আছে। ১৯১২ সালে ইংলণ্ড সফরের সময় বার্নেস তাদের ৩৪টি উইকেট নিয়েছিলেন। ৮'২৯ ছিল উইকেট-পিছু রানের গড়। পরবর্তী বছরে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাটিং উইকেটে গড়ে ১০'৯৩ রানের বিনিময়ে তিনি ৪৯টি টেস্ট উইকেট দখল করেছিলেন।

সিডনি বার্নেসের সাফল্যের খতিয়ান যতই দেখা যাবে ততই মুগ্ধ হতে হবে। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তিনি গড়ে ১৬'১৩ রানের বিনিময়ে মোট ৬৫০টি উইকেট পেয়েছেন। প্রধানত লীগের খেলায় তাঁর অধিকাংশ সময় কেটেছে। সেখানে তাঁর সংগ্রহ প্রায় ৪০০০ উইকেট এবং উইকেট-পিছু রানের বিস্ময়কর গড় হচ্ছে মাত্র ৭।

সিডনি বার্নেস মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। তাঁর লেগব্রেকের তুলনা নেই। তিনি ওয়ারউইকশায়ার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষে প্রথমশ্রেণীর কাউন্টি ক্রিকেট খেলেছেন। মাইনর কাউন্টি খেলেছেন তাঁর বাসভূমি স্টাফোর্ডশায়ারের পক্ষে। লীগে তিনি প্রথমে খেলেন স্মেথউইকের পক্ষে। পরে খেলেন রীসটন, বার্নলে. চার্চ, পোর্টহিল, সল্টায়ার, ব্যাসলটন, মুর এবং রটেনস্টল প্রভৃতি দলে। ৫৭ বছর বয়সে তিনি রটেনস্টল দলে যোগ দেন এবং সে বছরেই গড়ে ৬'৩০ রানের বিনিময়ে ১১৫টি উইকেট পান।

তাঁর রেকর্ড প্রমাণ করে যে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বোলার। তিনি নতুন এবং পুরোনো দু-ধরনের বলেই চমৎকার বল করতেন।

বেইলি, ট্রেভর এডওয়ার্ড (১৯২৩—) ১৯২৩-এর ৩রা ডিসেম্বর বেইলি ওয়েস্টক্লিফে জন্মগ্রহণ করেন এবং ডালউইচ কলেজে শিক্ষালাভ করেন।

এসেক্স দলের পক্ষে ১৯৪৬-এ এই অলরাউণ্ডার ক্রিকেটারটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। কেম্বি জ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফুটবল ও ক্রিকেট দুটি ক্ষেত্রেই তিনি 'ব্লু' লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে একজন অপেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে ১৩ বছর পরে তিনি ১৫০০ রান ও ১০০ উইকেট পেয়ে 'ডাবল' অর্জন করেন। পরবর্তী কালে তিনি ১৯৫২, ১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২ সালে ডাবল পান তার মধ্যে ১৯৫৯ সালে তাঁর সংগৃহীত রান ছিল ২০১১ এবং উইকেটের সংখ্যা ১০০। ট্রেভর বেইলি ১৯৪৮ সালে এসেক্স দলে পরিচালক কর্মী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫৪-৫৫ ক্লাবের সম্পাদক হন ও ১৯৬১-৬৬ পর্যন্ত দলের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৪৯ সালে নিউজিল্যাণ্ড দলের বিপক্ষে শুরু করে তিনি জীবনে ৬১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। ১৯৫০-৫১ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ক্রাইস্টচার্চের টেস্টে ১৩৪ (নট আউট) তার সর্বাধিক টেস্ট সংগ্রহ। টেস্টে তিনি সর্বমোট ২২৯০ রানও ১৩২ উইকেট পেয়েছেন। এটি ইংলণ্ড দলের অলরাউণ্ডার হিসাবে একটি অসাধারণ সাফল্যের নজির।

ডান-হাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ১৯৪৯ সালের একটি কাউন্টি ম্যাচে ল্যাঙ্কাশায়ার দলের দশটি উইকেট একাই দখল করে ইনিংস মুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার ১৯৫৩-৫৪ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে কিংস্টনের টেস্ট ম্যাচের এক ইনিংসের ৭টি উইকেট পেয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে নিউপোর্ট-গ্রামারগনের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

বেডসার, আলেক ভিক্টর (১৯১৮—) ৫১টি টেস্ট ম্যাচে ২৪.৮৯ গড় রানের বিনিময় আলেক বেডসারের ঝুলিতে জমা উইকেটের সংখ্যা হল ২৩৬।

সারের এই হৃদয়বান মানুষটির মত পরিশ্রমী খেলোয়াড় পাওয়া দুর্লভ। ১৯৪৬-এ ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে লর্ডস মাঠে প্রথম আত্মপ্রকাশে তিনি ৪৯ রানে ৭ ও ৯৬ রানে ৪ উইকেট লাভ করেন। পরের টেস্টে তিনি ৬১ রানে ৪ ও ৫২ রানে ৭ উইকেট পান।

ডান-হাতি এই মিডিয়াম পেস বোলার ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পেশাদারী ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেন। এক বছরে ১০০ উইকেট লাভের গৌরব তিনি ১১ বার অর্জন করেন; তার মধ্যে ১৯৫৩ সালে তিনি ১৬২টি উইকেট দখল করেছিলেন। ঐ বছরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্য স্মরণীয়। ৫টি টেস্টে ১৭.৪৮ গড় রানের বিনিময়ে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ৩৯টি উইকেট দখল করেন।

একমাত্র জিম লেকারই তাঁর মত সফলকাম বোলার। সেই বছর নটিংহাম টেস্টে বেডসার ৯৯ রানের বিনিময়ে ১৪টি উইকেট পেয়েছিলেন।

আলেক বেডসার জন্মেছিলেন রীডিং-এ। ২১ বছর বয়সে সারে দলের পক্ষে প্রথম খেলেন। পরে যুদ্ধে চলে যান। ১৯৪৬ সালে জাতীয় দলে নির্বাচিত হন।

১৯৫৩য় এসেক্স দলের বিরুদ্ধে হ্যাট্‌ট্রিক করেন। ১৯৫২-য় কাউণ্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ১৮ রানে নটিংহাম্পশায়ারের ৮টি উইকেট দখল করেন। ১৯৫৩-য় ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধেও ১৮ রানে ৮ উইকেট পান। দুটি খেলাই লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ থেকে বেডসার ইংলণ্ড ক্রিকেট নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য।

ব্যারিংটন, কেনেথ ফ্র্যাঙ্ক (১৯৩০—) পাঁচ বছর সারে দলের মাঠের কর্মচারী হিসাবে কাজ করার পর সেই দলের পক্ষে ক্রিকেট খেলতে নেমে ব্যারিংটন অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। প্রধানত তাঁর ধারাবাহিক কৃতিত্বের জন্য ১৯৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪ ও ৬৭ সালে সারে দল সেরা দলের গৌরব অর্জন করে।

১৯৫৫ সালে ব্যারিংটন কেবলমাত্র দলের পক্ষেই খেলেন না। জাতীয় দলের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করেন। তা সত্ত্বেও চার বছর বাদে ভারতের বিরুদ্ধে খেলার আগে কোন টেস্ট ম্যাচে খেলার সুযোগ পান না। অবশ্য ঐ সিরিজে তিনি ব্যাটিং-এ যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখান। তাঁর গড় রানের হিসাব ৫৯.৫০। ফলে পরবর্তী কালে জাতীয় দলে তাঁর আসন নিশ্চিত হয়।

১৯৫৯ সালে বার্মিংহামে ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচের দু ইনিংসে যথাক্রমে ১৮৬ ও অপরাজিত ১১৮ রান করেন। ১৯৬৪ তে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওল্ড স্ট্যাফোর্ড মাঠে ২৫৬ তাঁর ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান।

১৯৬২-৬৩ তে অস্ট্রেলিয়া সফরকালে তাঁর মোট ৫৮২ রান একজন ইংরেজের পক্ষে একটি সফরে সংগৃহীত দ্বিতীয় সর্বাধিক রান। ইতিপূর্বে ডব্লু. আর হ্যামণ্ড ১৯২৯ সালে করেছিলেন ৯০৫ রান। অবশ্য সারের এই ব্যাটসম্যান ফাস্ট পীচে অধিক সফল হতেন।

ব্যারিংটন সর্বমোট ৮২টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন এবং তাঁর সংগ্রহের রান ৬,৮০৬, গড় ৫৮.৬৭। ১৯৬৪-৬৫র দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ৭ ইনিংসে (দুটি

অপরাজিত ইনিংস সহ) তাঁর রানের গড় ছিল ১০১'৬০। তাঁর টেস্ট সেঞ্চুরির সংখ্যা ২০।

ব্রাউণ্ড, লিওনার্ড চার্লস (১৮৭৫-১৯৫৫) ব্রাউণ্ড ইংলণ্ডদলের সর্বকালের অন্যতম সেরা অলরাউণ্ডার। স্লো বোলার হিসাবে শুরু করে তিনি নিখুঁত মিডিয়াম পেস এবং লেগ ব্রেক বোলার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তা ছাড়া তিনি একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ও স্লিপ অঞ্চলের দক্ষ ফিল্ডার ছিলেন। তিনি পাঁচ শতাধিক ক্যাচ লুফেছেন। তার মধ্যে ১৯০২ সালে এজবাস্টন টেস্টে ক্লেম হিলের একটি লেগ গ্লান্স যে অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে প্রথম স্লিপ থেকে লেগের দিকে গিয়ে ধরেছিলেন তার মধ্যে অসামান্য গতি এবং অ্যান্টিসিপেশনের সমন্বয় ঘটেছিল। এই ক্যাচটি তাঁকে বিপুল খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

ব্রাউণ্ড সর্বমোট ২৩টি টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯০৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্ন টেস্টে প্রথম ইনিংসে তিনি ৮১ রানে ৮টি উইকেট দখল করেছিলেন। তিনি টেস্টে ৪৭টি উইকেট (গড় ৩৮'৫১) পেয়েছিলেন তার মধ্যে ২১টি উইকেট ১৯০১-০২ সিরিজেই পাওয়া।

টেস্টে তিনটি সেঞ্চুরি সহ তিনি ৯৮৭ রান সংগ্রহ করেন (গড় ২৫'৯৭)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে লর্ডস মাঠে তাঁর সর্বাধিক টেস্ট রান ১০৪। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২৫৭ তাঁর সর্বাধিক রান।

১৯২০ সালে তিনি খেলোয়াড়-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং আম্পায়ারের দায়িত্ব নেন। প্রথম শ্রেণীর আম্পায়ার হিসাবে তিনি ১৯৩৮ পর্যন্ত নিয়মিত মাঠে হাজির হতেন।

ব্রিগ্‌স, জন (১৮৬২-১৯০২) ল্যাঙ্কাশায়ারের এই পেশাদার খেলোয়াড় একজন ব্যাটস্‌ম্যান এবং চেঞ্জ বোলার হিসাবে জীবন শুরু করলেও অত্যল্পকালের মধ্যে দক্ষ বোলাররূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাঁ-হাতি স্লো বোলার ব্রিগ্‌স্ দু'দিক থেকেই বল ব্রেক করাতে পারতেন। ব্যাট করতেন ডান হাতে। আর নিপুণতার সঙ্গে ফিল্ড করতেন কভার অঞ্চলে।

১৮৭৯ সালে মাত্র ২৬ বছর বয়সে তাঁর প্রথম আবির্ভাবের সময় ব্রিগস্

সাহসী ফিল্ডার হিসাবে তিনি ল্যাঙ্কাশায়ার দলভুক্ত হন কিন্তু ১৮৮৫ সালের মধ্যেই দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার হিসাবে পরিগণিত হন। ঐ বছরে ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে ২৯ রানে ৯ উইকেট লাভ করেন। তখন থেকে ১৯০০ সালে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত পাঁচবার বছরে দেড় শতাধিক উইকেট দখলের কৃতিত্ব অর্জন করেন। সর্বাধিক সাফল্য আসে ১৮৯৩ সালে। সে বছরে তিনি ১৫·২৯ রান গড়ে ১৬৬টি উইকেট লাভ করেন। ১৮৮৮ সালে ১৬০টি উইকেট লাভ করেন। সে বছরে রানের বিস্ময়কর গড় ১০·৪৯। ১৮৯০ সালে ম্যাঞ্চেস্টারে একটি ম্যাচে পরপর ৭টি বলে তিনি ৫টি উইকেট দখল করেন। ১৯০০ সালে ওয়ারসেস্টারশায়ার দলের বিরুদ্ধে এক ইনিংসের দশটি উইকেটই তিনি দখল করেন।

তিনি সর্বমোট ৩৩টি টেস্ট ম্যাচ খেলেন। কেপটাউনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে ২৮ রানে ১৫ উইকেট দখল করেন; তন্মধ্যে ১৪ জনকে পরিষ্কার বোল্ড আউট করেন এবং ১ জন এল. বি. ডব্লু হন। তিনি ৪টি টেস্টে ১০ বা ততোধিক উইকেট পেয়েছেন। টেস্টম্যাচে তাঁর সর্বমোট সংগ্রহ গড় ১৭·৭৪ রানের বিনিময়ে ১১৮ উইকেট।

ব্লাইথ, কলিন (১৮৭৯-১৯১৭) কেন্টের বাঁ-হাতি স্লো-বোলার কলিন ব্লাইথ সম্ভবত তাঁর জাতের সর্বকালীন সেরা বোলারদের অন্যতম।

প্রচণ্ড স্বাস্থ্যের অধিকারী না হলেও পরিশ্রমশীলতা ছিল তাঁর অন্যতম গুণ। অন্তত পাঁচটি ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন না নিয়ে তিনি সারা ম্যাচে একটানা বল করেছেন। ১৮৯৯এ আত্মপ্রকাশ করবার পরে ১৯১৫-য় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ২৫০৬টি উইকেট দখল করেছিলেন গড় ১৬·৮১ রানের বিনিময়ে। প্রথম খেলার প্রথম বলেই তিনি একটি উইকেট পান। ১৯০৭ সালের একটি খেলায় নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে তিনি ১৭টি উইকেট লাভের যে কৃতিত্ব অর্জন করেন তা পরবর্তী ২৬ বছরের মধ্যে কেউ স্পর্শ করতে পারে নি।

ব্লাইথ দু'বার হ্যাটট্রিক করেছিলেন। ১৯১২-য় একটি খেলায় ৩০ রানে ইনিংসের ১০টি উইকেটই দখল করেন। সেবারে ১৭৮টি উইকেট পেতে তাঁর রানের গড়ও কমে ১২·২৬ হয়ে যায়। ১৯০৯-এ তিনি সর্বাধিক ২১৫টি উইকেট (গড় রান ১৪·৫৪) পান। ব্লাইথ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিকের মৃত্যুবরণ করেন।

ভেরেটি, হেডলি (১৯০৫—১৯৪৩) ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঁ-হাতি স্পিন বোলার ভেরেটি ইয়র্কশায়ার দলে খেলতেন। ১৯৩০ সালে ইয়র্কশায়ারের পক্ষে প্রথম খেলেন। পরের বছরেই ওয়ারউইকশায়ারের ১০টি উইকেট ৩৬ রানের বিনিময়ে দখল করেন। পরের বছর ঐ লীডস মাঠেই মাত্র ৫২টি বলে ১০ রানে নটিংহামশায়ারের ১০টি উইকেট নিয়ে ইনিংস মুড়িয়ে দেন। ১৯৩১ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু পর্যন্ত ভেরেটি কোন মরসুমেই ১৫০টির কম উইকেট দখল করেন নি। ১৯৩৬-এর গ্রীষ্মে তাঁর সেরা সাফল্যের মরসুমে ২১৬টি উইকেট ঝুলিতে ভরে নেন। ১৯৩১-এ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন এবং মোট ৪০টি টেস্ট খেলেছেন। তাতে তাঁর ঝুলিতে জমা পড়েছে ১৪৪টি টেস্ট উইকেট (গড় ২৪.৩৭ রানে)। ১৯৩৪এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লর্ডসে তাঁর সাফল্যের খতিয়ান : ৬১ রানে ৭ উইকেট ও ৪১ রানে ৮ উইকেট। ব্যাটসম্যান হিসাবে ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর রান ৮ম/৯ম/১০ জুটির রেকর্ড হিসাবে একসময়ে পরিগণিত হত। ১৯৩৬-এ জ্যামাইকার বিরুদ্ধে ১০১ রান করেন। ১৯৪৩-এ যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়ে বীরের মৃত্যুবরণ করেন।

ভোসি, উইলিয়াম (১৯১৯—) নটিংহামশায়ারের দীর্ঘদেহী বোলারটি ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার 'বডিলাইন' বোলিং-এর জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৯৩২-৩৩-এর অস্ট্রেলিয়া সফরে ১৫টি টেস্ট উইকেট পান। বডিলাইন বিতর্ক শুরু হবার পর তিনি ও লারউড আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পুনরায় অংশ না নেবার কামনা ব্যক্ত করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ১৯৩৬এ ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে খেলার জন্যে আবার ডাক পড়ে। পরের বছরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যান এবং আরও সফল হন। গড় ২১.৫৩ রানের বিনিময়ে ২৬টি টেস্ট উইকেট পান। সিডনিতে পরপর চারটি বলে ও ব্রীয়েন, ব্রাডম্যান ও ম্যাকক্যাব-এর মত বাঘা ব্যাটসম্যানদের আউট করেন। বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯৪৬-৪৭-এ আবার অস্ট্রেলিয়া সফরে যান। ব্যাটসম্যান হিসাবেও ভোসির কৃতিত্ব স্মরণীয়। গ্ল্যামারগনের বিরুদ্ধে তাঁর ১৯৩১-এ একটি ম্যাচে রান ১২৯। টেস্ট ক্রিকেটে গড় ২৭.৮৮ রানের বিনিময়ে তিনি ৯৮টি উইকেট পান।

মীন, আলফ্রেড (১৮০৭—১৮৬১) ছ'ফুটের অধিক দীর্ঘ এবং তিন মন ওজনের এই খেলোয়াড়টি 'টেস্টের সিংহ' নামেই ক্রীড়াজগতে অধিক

পরিচিত। পরবর্তী কালের ডা. গ্রেসের মত অমিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী আলফ্রেড মীন উপস্থিত হলেও মাঠের চরিত্র পরিবর্তিত হয়ে যেত। প্রচণ্ড জোরে ব্যাট চালনা করতেন। প্রথম রাউণ্ড আর্ম বোলার মীন নিঁখুত লেংথে বল করতেন আর চমৎকার ফিল্ডিং করতেন স্লিপ অঞ্চলে।

১৮৩২ সালে তিনি প্রথম খেলতে নামেন। মাত্র দু'বছর বাদ দিলে প্রতি বছরেই জেন্টলম্যান বনাম প্লেয়ার দলের খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে শতাধিক উইকেট দখল করেন, রানের সংগ্রহ ৬০৫। তাঁর সময়ের সিঙ্গল উইকেটের খেলায় তিনি বহুবার ইংলণ্ড চাম্পিয়ান হন।

মে, পিটার বার্টার হাওয়ার্ড (১৯২৯—) ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতার অধিকারী পিটার মে সারে দলের অধিনায়ক ছিলেন। ইংলণ্ড দলেরও নেতৃত্ব করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু মে ১৯৫০ সালে সারে দলের পক্ষে খেলা শুরু করেন। ১৯৫২-৫৮ সাল পর্যন্ত ৭টি মরসুমে তিনি চমকপ্রদ ব্যাটিং করেন এবং ৬টি ক্ষেত্রেও শীর্ষ স্থানের অধিকারী হন। ১৯৫১ সালে তিনি ইংলণ্ড দলে নির্বাচিত হন এবং টেস্ট খেলার প্রথম ইনিংসেই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৩৮ রান করেন। ১৯৫৩—৫৯ পর্যন্ত প্রতিটি টেস্টে ইংলণ্ড দলের পক্ষে খেলেছেন। উপর্যুপরি ৫২ টেস্টে অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে ৪১টিতে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করা - এটিও একটি রেকর্ড। এই সময়েও মে চারবার সেরা ব্যাটস্‌ম্যানের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৫১ তাঁর ব্যাটিং সাফল্যের সেরা বছর। ঐ বছরে তিনি মোট ২৩৩৯ (গড় ৬৮.৭৯) রান করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ২৮৫। ১৯৫৭য় বার্মিংহামে ঐ রান করেন। সেবারে কলিন কাউড্রের সহযোগিতায় চতুর্থ উইকেটে ৪১১ রান করেন। চতুর্থ উইকেট জুটির এটি বিশ্বরেকর্ড।

মুরী, জন টমাস (১৯৩৫ —) মিডলসেক্সের এই উইকেট-রক্ষকটি ১৯৫২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত খেলে ১৫২৭টি আউটের কারণ হয়েছেন। ১৯৫৭য় তিনি উইকেট-রক্ষকের ডাবল অর্থাৎ সহস্র রান (১০২৫ রান) ও একশ জন (১০৪) ব্যাটসম্যানকে আউট করেন। ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৬১-৬২তে প্রথম টেস্ট খেলতে নামেন। জীবনে ২১টি টেস্ট খেলেছেন। ১৯৬৭ লর্ডসে এক ইনিংসে ৬জন ভারতীয় ব্যাটসম্যানকে আউট করেন।

ম্যাকলারন, আর্চিবল্ড ক্যাম্পবেল (১৮৭১-১৯৪৪) ম্যাকলারন ইংলণ্ডের সেই ব্যাটসম্যান যাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৪২৪ রানের রেকর্ডটি আজও অম্লান। তিনি ল্যাঙ্কাশায়ার দলে খেলতেন। সমারসেট দলের বিরুদ্ধে ১৮৯৫ সালে টিউনটন মাঠে এই রান তুলতে তাঁর লেগেছিল ৭ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। নিখুঁত ব্যাটিং ও চমৎকার ড্রাইভের আদর্শ নিদর্শন তাঁর ঐ ইনিংসটি। ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষে খেলতে নেমেই ১৮৯০ সালে সারের বিরুদ্ধে ১০৮ রান করেন। তিনি ২২টি টেস্টে ইংলণ্ড দলের নেতৃত্ব করেন। এর সবগুলিই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। আর মোট টেস্ট খেলেন ৩৫টি। যেমন সেঞ্চুরি দিয়ে ক্রিকেটে তাঁর আত্মপ্রকাশ তেমনি ডবল সেঞ্চুরি দিয়ে তাঁর অবসর গ্রহণ। ৫২ বছর বয়সে ওয়েলিংটনে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এম. সি. সি. দলের অধিনায়ক হিসাবে ১৯২৩-এ অপরাজিত ২০০ রান করেন। সেটিই তাঁর প্রথম শ্রেণীর শেষ ম্যাচ।

রাইট, ডগলাস ভিভিয়ান পাওসন (১৯১৪—) কেণ্টের এই মিডিয়াম পেস লেগব্রেগ, গুগলি বোলারটির বলে অনেক রান উঠলেও কখনও কখনও তাঁকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে দেখা যেত। তিনি জীবনে সাতবার হ্যাটট্রিক করেছেন। গ্লোসেস্টারশায়ার দলের বিরুদ্ধে খেলায় ১৯৩৯-এ ব্রিস্টলে এক ইনিংসে ৪৭ রানে ৯ উইকেট পেয়েছিলেন। ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধেও একটি খেলায় প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেট পান, পরের ইনিংসে ৬টি উইকেট। ১৬ গজ দৌড়ে তিনি বল করতেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫টি উইকেট পেয়ে তাঁর টেস্ট জীবন শুরু হয়। সর্বমোট ৩৪ টেস্ট ম্যাচের মধ্যে তাঁর সেরা খেলা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৪৭-এ সিডনিতে। ঐ খেলার প্রথম ইনিংসে তিনি ১০৫ রানে ৭ উইকেট দখল করেন। তিনি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে লেগব্রেক বল দিতেন যার ফলে রান উঠত ঠিকই আবার অনেক সময় সে বল খেলা অসম্ভব হয়ে উঠত।

রিচার্ডসন, পিটার এডওয়ার্ড (১৯৩১—) ওয়ারসেস্টারশায়ারের এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানটি ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নেমে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। নটিংহামের প্রথম টেস্টে তাঁর রান হয় ৮১ ও ৭৩। সেঞ্চুরি পান চতুর্থ টেস্টে। সিরিজে তাঁর রানের গড় হয় ৪৫·৫০। উল্লেখযোগ্য, সেই সিরিজের আটটি ইনিংসেই রিচার্ডসন উইকেট-রক্ষকের হাতে ধরা পড়েন। তিনি ১৯৬৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ওয়ারসেস্টাররশায়ার ছাড়া তিনি

কেণ্ট দলের পক্ষেও খেলেন। প্রথমশ্রেণীর ম্যাচে তাঁর মোট রান ২৬,০৫৫ (গড় ৩৯.৫৫); সর্বোচ্চ রান সমারসেট দলের বিরুদ্ধে ১৮৫।

রিচার্ডসন, টমাস (১৮৭০-১৯১২) ১৮৯৫ সালে এই বিখ্যাত ফাস্ট বোলারটি ১৪.৩৭ রানের বিনিময়ে ২৯০টি উইকেট লাভ করেন। এ. পি. ফ্রিম্যান (৩০৪টি উইকেট) ছাড়া অন্য কোনও বোলার এক মরসুমে এর চাইতে অধিক উইকেট লাভে সক্ষম হন নি। ১৮৯৪-৯৭ সালে তাঁর চূড়ান্ত সাফল্যের সময়ে মাত্র ৪ বছরে তিনি ১০৭৩টি (গড় ১৪.৬৯) উইকেট দখল করেন। ১৮৯৪ সালে ওভাল মাঠে ৪৫ রানের বিনিময়ে এসেক্স দলের ইনিংসের ১০টি উইকেট দখল করেন। সারে দলের খেলোয়াড় রিচার্ডসন ১৮৯২ সালে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে খেলতে আসেন এবং ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

রোডস, উইলফ্রেড (১৮৭৭-১৯৭৩) ইয়র্কশায়ারের এই অলরাউণ্ডার খেলোয়াড়টির সংগ্রহে ডাবল-এর যে রেকর্ডটি রয়েছে, আজ পর্যন্ত অপর কেউ সেটি অতিক্রম করতে পারে নি। কিরথিটনে জন্মেছিলেন, ইয়র্কশায়ারে খেলতে আসেন ১৮৯৮-এ। তারপরে আরও ৩২ বছর ধরে খেলে নিজের ৫৩ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৯০৩-এ প্রথমবার ডাবল পান। তারপরে আরও ১৫ বার তিনি ঐ গৌরব অর্জন করেন। দুবার ২০০ রান ও ১০০ উইকেট লাভ করেন। রোডস বাঁ-হাতি স্লো বোলার, না ছুটে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েই বল করতেন। তিনি বলে স্পিন ও ব্রেক দুই-ই করাতে পারতেন। এবং তাঁর আমলে ব্যাটিং উইকেটে এত ভালো বোলার আর ছিল না। ১০০ উইকেট দখলের নজির তাঁর ২৩ দফায়। এটিও একটি রেকর্ড। সবচেয়ে বড় রেকর্ডতাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে ৪০০০-এর অধিক উইকেট জমা পড়েছে। ইনিংসের দশটি উইকেট মুড়িয়ে দেবার কৃতিত্ব তাঁর না থাকলেও নটি প্রধান ব্যাটসম্যান ফিরিয়ে দেবার গৌরব অর্জন করেন তিনবার; তন্মধ্যে থর্নটন একাদশ বনাম অস্ট্রেলিয়া দলের খেলায় এক ইনিংসে ২৪ রানের বিনিময়ে ৯টি উইকেট পান। ডান-হাতি ব্যাটসম্যান রোডস্ ২১ দফায় বছরে ১০০০ রান করেন। অপরাজিত ২৬৭ তার ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান। তিনি ৫৮টি টেস্টে খেলেছেন, তন্মধ্যে ১৯০৩-০৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৫.৭৪ গড় রানে ৩১টি উইকেট পান। তিনি ও হার্স্ট দুজনে মিলে ৩৬ রানে অস্ট্রেলিয়া দলের ইনিংস খতম করে দেন, তন্মধ্যে রোডস পান ১৭ রানে ৭ উইকেট।

লক, রিচার্ড গ্রাহাম অ্যান্টনি (১৯২৯—) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালের অন্যতম সেরা বাঁ-হাতি স্লো বোলার, নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান ও উইকেটের কাছাকাছি দক্ষ ফিল্ডার লক ক্রিকেটের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। ডব্লু. জি. গ্রেস ও ফ্র্যাঙ্ক উলি ছাড়া যে কোন খেলোয়াড়ের চেয়ে তিনি বেশি 'ক্যাচ' ধরেছেন। ১৯৫৭য় লক 'ক্যাচ' ধরেছেন ৬৪টি, এর ভেতরে ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে ওভাল মাঠে একটি খেলায় তিনি ৮টি 'ক্যাচ' ধরেন। ঐ বছর তাঁর ক্রিকেট জীবনের সেরা বছর। বোলার হিসাবে তিনি ২১২টি উইকেট পান (গড় ১২·০২ রান)। এটিও একটি রেকর্ড। ১৯৫৫ সালে অবশ্য আরও বেশি উইকেট (২১৬) পান তবে রানের গড় হিসাবে তা (১৪·৩৯) ন্যূন ছিল। ২৬ বছরের বিস্তৃত ক্রিকেটজীবনে লক সারে, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ও লিসেস্টারশায়ারের পক্ষে খেলে ২৮৪৪ উইকেট (গড় ১৯·২৩ রানে) দখল করেছেন, 'ক্যাচ' লুফেছেন ৮৩০টি।

লেকার, জেম্‌স্ চার্ল্‌স (১৯২২-) ১৯৫৬ সালে ম্যানচেস্টার টেস্টে ৯০ রানে সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের ১৯টি উইকেট দখল করে এই স্লো অফ ব্রেক বোলারটি একটি বিস্ময়কর নজির স্থাপন করেন। একটি টেস্টে খেলায় দু ইনিংসে একটি মাত্র উইকেট ছাড়া সকল উইকেট দখলের অসামান্য কৃতিত্বটি যাঁর সেই জিম লেকার ঐ সফরকালে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসের ১০টি উইকেটই ঝুলিতে তুলে নিয়েছিলেন আরেকটি ম্যাচে—ওভালে সারে দলের পক্ষে। ১৯৪৬-এ সারে দলের পক্ষে প্রথম খেলতে নামেন। পরের বছরে লীগের খেলায় গড় ১৬·৬৫ রানে ৬৫টি উইকেট দখল করে বোলিং-এ শীর্ষস্থান দখল করেন। পরের মরসুমেই ১০০টি উইকেট দখল করেন। পরবর্তী ১১ বছরের প্রতিটিতেই শতাধিক উইকেট লাভ করেছেন। ১৯৫০ সালে তিনি ১৬৬টি উইকেট (গড় ১৫·৩২ রানে) দখল করেন। সেই বছরেই সংবাদপত্রের শিরোনাম হয়ে ওঠেন টেস্ট নির্বাচনী খেলায় ২ রানে ৮ উইকেট দখল করে। ১৯৫৯ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেও পরে তিনটি মরসুমের জন্য এসেক্সের পক্ষে খেলতে নামেন। প্রথম শ্রেণীর উইকেট দখলের খতিয়ান হচ্ছে ১৯৪৪ (গড় ১৮·৪০ রানে)।

লেল্যাণ্ড, মরিস (১৯০০-১৯৬৭) ইয়র্কশায়ারের এই রসিক ব্যক্তিটি তাঁর আমলে বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। জোরালো

কব্জিতে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে লেল্যাণ্ড ব্যাট করতেন, ফিল্ড করতেন সীমানার কাছাকাছি আর বাঁ হাতে স্লো বল করতেন। সারা জীবনে ৩৩,০০০ রান করেছেন তাঁর মধ্যে এক ইনিংসের সর্বোচ্চ রান এসেক্স-এর বিরুদ্ধে ২৬৩। আর সেঞ্চুরি করেছেন ৮০ বার। প্রথম টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯২৯ সালে মেলবোর্নে তাঁর রান হচ্ছে ১৩৭ ও অপরাজিত ৫৩। তিনি মোট ৪১টা টেস্টে ৯টি সেঞ্চুরি করেন। ওভাল মাঠে তাঁর সর্বোচ্চ টেস্ট রান ১৮৭ ঐ অস্ট্রেলিয়ারই বিরুদ্ধে। লেন হাটনের সহযোগিতায় দ্বিতীয় উইকেটে ৩৮২ রানের রেকর্ড করেন। ১৯৩৫-এ সারের বিরুদ্ধে একটি খেলায় হ্যাট্‌ট্রিক করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

লোম্যান, জর্জ আলফ্রেড (১৮৬৫—১৯০১) ডা. ডব্লু. জি. গ্রেস লোম্যানের মতো বুদ্ধিমান বোলার তিনি আর দেখেন নি যিনি মাথা খাটিয়ে, বলে পেসের তারতম্য ঘটিয়ে ও নিখুঁত নিশানায় বল করে ব্যাটসম্যানকে ঠকাতে অদ্বিতীয় ছিলেন। টেস্ট ম্যাচে লোম্যান ১১২টি উইকেট পেয়েছেন: তাতে রানের হার হচ্ছে ১০'৭৫। এটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আজও বিস্ময়কর রেকর্ড। ১৮৮৪ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত মাত্র ১৪ বছরের ক্রিকেটের জীবনে ১৪ রানের গড়ে আঠারো শতাধিক উইকেট লাভ করেন। ১৮টি টেস্টে অংশগ্রহণ করে ৫ বার ১০ বা ততোধিক উইকেট পান, আর হ্যাটট্রিক করেন একবার। অসীম শ্রমসহিষ্ণু বোলার লোম্যান অন্তত চারটি ক্ষেত্রে ইনিংসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একপ্রান্ত থেকে ক্রমাগত বল করে গিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা দল তাঁর হাতে একবার নাস্তানাবুদ হয়েছিল। তিনি ১৮৯৫-৯৬-এর সফরে তিনটি টেস্টে গড় ৫'৮০ রানের বিনিময়ে ৩৫টি উইকেট লাভ করেন। ঐ তিনটি টেস্টে তিনি মাত্র ৫২০টি বল ছুঁড়েছিলেন। এত কম বলে এবং কম রানে এতগুলি টেস্ট উইকেট পাওয়া আজও একটি অতুলনীয় রেকর্ড।

শ', আলফ্রেড (১৮৪২—১৯০৭) নটিংহামশায়ারের স্লো-মিডিয়াম পেস বোলার আলফ্রেড শ'কে বোলারদের সম্রাট আখ্যায় ভূষিত করা হয়। জীবনে তিনি পেয়েছেন ২০৭২টি (গড় ১১'৯৭ রানে) উইকেট। ১৮৭৮-এ তাঁর ঝুলিতে জমা পড়েছিল (গড় ১০'৯৬ রানের বিনিময়ে) ২০১টি উইকেট। ১৮৮০তে পান ১৭৭টি উইকেট গড় ৮'৫৪ রানের বিনিময়ে। এই রেকর্ডটি আজও ভাঙা যায়নি। গ্লৌসেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে একটি খেলায় উভয় ইনিংসে

তিনি হ্যাটট্রিক করেন। ১৮৭৪-এ লর্ডস মাঠে একটি ম্যাচে এম.সি.সি-র পক্ষে নর্থ-এর এক ইনিংসে ৭৩ রানের বিনিময়ে দশটি উইকেট দখল করেন। ১৮৮৩-৮৬ সালে নটিংহামশায়ারের অধিনায়ক ছিলেন। ১৮৮১-৮২-তে ইংলণ্ড দলের নেতৃত্ব করেন।

শ্রেউসবারি, আর্থার (১৮৫৬-১৯০৩) নটিংহামশায়ারের পেশাদার খেলোয়াড় শ্রেউসবারি তাঁর ২৭ বছরের ক্রীড়া-জীবনে ছাব্বিশ হাজারেরও বেশি রান করেন। ৪৭ বছর বয়সে অকালমৃত্যুর: পূর্ব পর্যন্ত তাঁর ব্যাটিং প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান। এমন কি তার আগের বছরে তিনি গড় ৫০·০০ রানে মোট ১২৫০ রান করেন। শক্ত পিচে দাঁড়াবার মনোবল তাঁর মত সচরাচর দেখা যেত না। তবে তাঁর রক্ষণাত্মক ব্যাটিং-এর মন্থরতা অনেকের কাছে সমালোচনার বিষয় ছিল। তাঁর বড় রানের ইনিংসের সংখ্যা কিন্তু কম নয়। তাঁর সর্বাধিক রান ২৬৭। শ্রেউসবারি ২৩টি টেস্ট খেলেছেন। সাতবার দলের নেতৃত্ব করেছেন। সবই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। তার মধ্যে তাঁর দল পাঁচবারই বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। ১৮৮৬ সালে অধিনায়ক হিসাবে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ ১৬৪ রানের ইনিংস ভোলা যায় না। সেই ম্যাচে ইংলণ্ড দল জয়লাভ করে।

স্ট্যাথাম, জন ব্রেইন জর্জ (১৯৩০—) ল্যাঙ্কাশায়ারের ডানহাতি ফাস্ট বোলার ও বাঁহাতি ব্যাটসম্যান একটি মরসুম খেলেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথমে নির্বাচিত না হলেও সফর চলাকালে তাঁকে অস্ট্রেলিয়ায় ডেকে পাঠানো হয় এবং নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫১য় যখন প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেন তখন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর বয়স নয় মাসও পূর্ণ হয় নি। ৭০টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করে তিনি ২৫২টি উইকেট লাভ করেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁর উইকেটের সংখ্যা ২২৬০ (গড় ১৬·২৬ রানে)। ১৯৫৭-য় ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে ৮৯ রানে ১৫ উইকেট লাভ তাঁর সর্বাধিক সাফল্যের নজির। ১৯৬০-এ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঐ সিরিজে ২৭টি উইকেট পান গড় ১৮·১৮ রানের বিনিময়ে।

সাটক্লিফ, হার্বার্ট (১৮৯৪—) ইয়র্কশায়ার দলের খেলোয়াড় হার্বার্ট সাটক্লিফ ইংলণ্ডের সর্বকালের একজন সেরা ক্রিকেটার। ১৯১৯ সালে খেলতে নেমেই মরসুমে সহস্র রান পূর্ণ করেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এ গৌরবে

কখনও ছেদ পড়েনি। তন্মধ্যে ১৯৩২-এ তাঁর সংগ্রহ ৩৩৩৬ রান (গড় ৭৪·১৩)। ১৯৩১-এ ৩০০৬ রান (গড় ৯৬·৯৬)। এক মরসুমে গড় ৯৬·৯৬ রানের রেকর্ডটি আজও কেউ ভাঙতে পারে নি। টেস্টম্যাচে জ্যাক হবসের জুটির সাফল্য লোককথায় পরিণত হয়েছে। ১৯২৪-এ এই জুটির খেলা শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। তাঁদের জুটিতে টেস্টে অন্তত ১৫টি শতাধিক রান হয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোচ্চ সংগ্রহ ১৯২৪-২৫-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্ন মাঠে ২৮৩ রান। ইয়র্কশায়ার দলে পি. হোমস আরেকটি অনবদ্য জুটি। তাঁর সহযোগিতায় সাটক্লিফ ৬৯টি প্রথম-উইকেট সেঞ্চুরি করেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে প্রথম উইকেট জুটির রেকর্ড রানটিও (৫৫৫) সাটক্লিফ সংগ্রহ করেন হোমসের জুটিতে। ১৯৪৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। সারা জীবনে ১৩৯ শতরান করেছেন। সর্বোচ্চ রান ৩১৩। ৫৪টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করেছেন। টেস্টে সর্বোচ্চ রান অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনীতে। সেই ম্যাচে তিনি ১৯৪ রান করেন। সারা জীবনে সাটক্লিফের মোট রান ৫০,১৩৫ (গড় ৫২·০০)।

সিম্পসন, রেজিন্যাল্ড টমাস (১৯২০—) নটিংহামশায়ারের কৃতী ওপেনিং ব্যাটসম্যান, কভার পয়েন্টের দুর্দান্ত ফিল্ডার। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৪৯-এর টেস্টে মাত্র ২৭ মিনিটে শেষ ৫৩ করে তাঁর শতরান পূর্ণ করেন। ২৭টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। তার ভেতরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৫০-৫১য় মেলবোর্ন টেস্টের অপরাজিত ১৫৬ রান তাঁর সর্বাধিক টেস্ট সংগ্রহ। সিম্পসন ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ক্রিকেট শুরু করেন। ১৯৫১-৬০ তাঁর কাউন্টি দলের অধিনায়ক ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে তিনি মোট ৩০,৫৪৬ রান করেন। সেরা ইনিংস ১৯৫০-৫১-য় এম. সি. সি দলের পক্ষে নিউ সাউথ ওয়েলস্ দলের বিরুদ্ধে। সিডনী মাঠের সে ইনিংসে তিনি ২৫৯ রান করেন। সিম্পসন মোট দশটি ডাবল সেঞ্চুরি করেন।

মীড, চার্লস ফিলিপ (১৮৮৭—১৯৫৮) ক্রিকেটের ইতিহাসে হ্যাম্পশায়ারের এই সহযোগের ব্যাটসম্যানটি রান সংগ্রহের জাদুকর বলে পরিচিত। পূর্বে তিনি সারে দলের ময়দান কর্মচারী ছিলেন। পরে ১৯০৫-এ হ্যাম্পশায়ার দলে যোগদান করেন। তাঁর সারা জীবনে ৫৫·৬১ রান করেন (গড় ৪৭·৬৭)।

তিনি ১৫৩টি সেঞ্চুরি করেন যা কেবলমাত্র হবস্, হেনড্রেন ও হ্যামণ্ড করেছিলেন। ১৯১৩ ও ২১ সালে সেরা ব্যাটসম্যানের মর্যাদা পান। ১১ বার এক মরসুমে দুহাজার রান করার কৃতিত্ব দেখান। ১৯২১ সাল তাঁর জীবনে সবচেয়ে সফল বছর। সে বছর তাঁর মোট রান হয় ৩১৭৯ (গড় রান ৬৯·০০) তার মধ্যে একটি ইনিংসে তাঁর রান ছিল অপরাজিত ২৮০। তিনি ২৭ মরসুমে হাজার রান করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যা ডব্লু. জি. গ্রেস ও ফ্রাঙ্ক উলি ছাড়া আর কেউ করতে পারেন নি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৭টি ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১০টি টেস্ট খেলেন। তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৮২ তাঁর সর্বোচ্চ রান।

স্যাণ্ডহ্যাম, এণ্ড (১৮৯০—) ২৫ বছরের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট জীবনে ১৪ বছরের বেশি টেস্টম্যাচ খেলবার সুযোগ পাননি স্যাণ্ডহ্যাম, আর যতটুকু খেলেছেন তা তাঁর প্রধান জুটি জ্যাক হব্সের কৃতিত্বের আড়ালে চলে গেছে। নিজের স্বার্থের কথা মনে না রেখে এই ক্রিকেটারটি হবসকে তাঁর রেকর্ড গড়ার কাজে সর্বদাই সহায়তা করে গেছেন। অবশ্য ১৯২৯-৩০এ কিংস্টনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৩২৫ রানের অনবদ্য ইনিংসটি তাঁর প্রতিভার অনন্য স্বাক্ষর। একজন গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসমান হিসাবে তিনি ১০টি ডবল সেঞ্চুরি করেন এবং ১৯২০ থেকে ৩৭ সাল পর্যন্ত ১৮টি মরসুমের প্রতিটিতেই ব্যক্তিগত সহস্র রান পূর্ণ করেন। সেই সময়ে অন্তত জ্যাক হবসের সহযোগিতায় প্রথম উইকেটে ৬৩ বার শতরানের রেকর্ড আছে; তন্মধ্যে ওভালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলের বিরুদ্ধে ৪২৮ সর্বোচ্চ রান। ১০৭টি সেঞ্চুরি সহ তাঁর মোট রান ৪১,২৮৪ (গড় ৪৪·৮২)। এম. সি. সির পক্ষে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে একটি খেলায় তাঁর উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি ছিল।

স্টাড্‌উইক, হার্বার্ট (১৮৮০-১৯৭০) সারে দলের এই উইকেট-রক্ষকটি শ্রমশীলতা এবং দক্ষতার জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। উইকেট ছাড়িয়ে বলের পিছনে তাকে লং অফের দিকেও ছুটতে দেখা যেত। ১৯০২ সালে সারে দলের পক্ষে খেলতে নামেন এবং অচিরেই ইংলণ্ড দলে স্থান করে নেন। ২৫ বছরের খেলোয়াড় জীবনে তিনি ১৪৯৩ জন ব্যাটসম্যানের প্যাভিলিয়ানে ফিরে যাবার কারণ হয়ে দাঁড়ান। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এই রেকর্ডটি অভগ্ন ছিল। লিটন মাঠে এসেক্সের বিরুদ্ধে একটি খেলায় ৭টি 'ক্যাচ' এবং ১টি 'স্টাম্প' করার

কৃতিত্ব তাঁর। আরেকটি খেলায় ওভাল মাঠে সাসেক্সের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ৬ জনের 'ক্যাচ' ধরেন।

স্মল, জন (১৭৩৭-১৮২৬) ক্রিকেট খেলার আদিযুগে পেশায় চর্মকার জন স্মল তার উন্নতিকল্পে অনেক কিছু করেছিলেন। তিনি শুধু খেলোয়াড়ই ছিলেন না, খেলার সরঞ্জাম তৈরি করতেন। ফলে খেলার পদ্ধতির উপরেও প্রভাব ফেলতে পারতেন। ১৮ বছর বয়সে হ্যামব্লেডন ক্লাবে ক্রিকেট খেলা শুরু করেন এবং ৬১ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন। শেষ খেলায় লর্ডস্ মাঠে এম. সি. সি-র বিরুদ্ধে খেলেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একবার হ্যামব্লেডন ক্লাবের পক্ষে পরপর তিনদিন ধরে একাকী ব্যাট করেন। তৎকালীন সিঙ্গল উইকেট ম্যাচে সেকালের সব বিখ্যাত বোলারের সঙ্গে তাঁর মোলাকাত হত। এমন একজন বোলার স্টিভেন্স। ১৭৭৫ কি ৭৬-এ একাধিক উইকেটের প্রবর্তন হলে এক উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় স্টিভেন্স তাঁকে তিন-তিনবার পরাস্ত করলেও বলটি দুটি উইকেটের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়ায় বেল-এর কোন ক্ষতি হয় না এবং স্মল নট আউট থাকেন। তিনি অত্যন্ত তৎপর, সুদক্ষ খেলোয়াড় হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন।

হক, লর্ড (১৮৬০-১৯৩৮) লর্ড হক ইটন ও কেম্ব্রিজে ক্রিকেট খেলেছেন এবং কেম্ব্রিজের ক্রিকেট ব্লু হয়েছেন। পরবর্তী কালে ইয়র্কশায়ার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান হয়ে ওঠেন। তিনি ইয়র্কশায়ারের অধিনায়ক ছিলেন ১৮৮৩-১৯১০। টেস্ট খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য ও এম.সি.সির সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদও অলঙ্কৃত করেছেন। ৪৭ বছর ধরে ইয়র্কশায়ার দলের সভাপতি ছিলেন। ইংলণ্ডের ক্রিকেট দলের এত সফল রাষ্ট্রদূত আর কখনও জন্মায় নি। তাঁর নেতৃত্বে ইংলণ্ড দল যে সমস্ত দেশে সফর করেছে তার মধ্যে আছে ভারত, আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কানাডা ও আর্জেন্টিনা। এসব খেলায় তাঁর ক্রীড়াশৈলী ও অধিনায়কের নৈপুণ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড হক ১৯১১ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

হবস, স্যার জন বেরী (১৮৮২-১৯৬৩) ব্যাটিং-এর নিখুঁত শিল্পী জ্যাক হবসের তুলনা মেলা ভার। ১৯০৫ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি ক্রিকেট খেলেছেন এবং সে সময়ে তাঁর সংগ্রহ ৬১,২৩৭ রান (গড় ৫০·৬৪), যার ভেতরে ১৯৭টি শত রানের গৌরব রয়েছে। কেম্ব্রিজে তাঁর

জন্ম। সে দলের হয়ে প্রথমে কাউন্টি খেলতে আসেন। পরে এসেক্স দলে খেলার চেষ্টা করেন। বিস্ময়ের কথা, সে দলে তখন তাঁর স্থান না হওয়ায় ১৯০৫ সালে তিনি সারে দলে যোগদান করেন এবং সারের পক্ষে প্রথম ম্যাচেই ১৫৫ রান করেন। ৬১টি টেস্টের সফল খেলোয়াড় হবস ১৯০৭-৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে যান এবং প্রথম টেস্ট ইনিংসেই ৮৩ রান করেন। টেস্টে তাঁর শেষ খেলাও ঐ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে—তবে 'স্বদেশে, ওভাল মাঠে, ১৯৩০ সালে। প্রথম টেস্টে গোড়াপত্তনে তাঁর সঙ্গী ছিলেন ফেন আর শেষ টেস্টের সঙ্গী হারবার্ট সাটক্লিফ। সারা জীবনে ১৬৬ বার প্রথম উইকেট জুটিতে শতাধিক রানের কৃতিত্বের তিনি অংশীদার। তবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে এ. স্যাণ্ডহামের সহযোগিতায় ৪২৮ তাঁর সর্বাধিক রান। হেওয়ার্ড, রোডস, সাটক্লিফের সঙ্গে তার আরও অনেক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রয়েছে। তবে তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টম্যাচে রোডসের সঙ্গে ৩২৩ রান। ১৯১১-১২ সালে মেলবোর্ন টেস্টে এই রান সংগৃহীত হয়েছিল। ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম উইকেট জুটির সর্বাধিক রানের এই রেকর্ডটি আজও অম্লান। মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ১২৬ সালে তাঁর অপরাজিত ৩১৬ ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান। পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান হবস কভার পয়েন্ট অঞ্চলের দুর্দান্ত ফিল্ডার। তাঁর খেলোয়াড় জীবনের শুরুতে স্লো-মিডিয়াম পেস বোলার হিসাবে বেশ কার্যকরী ছিলেন। ১৯২০ সালে গড় ১১·৮২ রানে ১৭টি উইকেট লাভ করেন। হবসের ব্যাটিং কৃতিত্বের কথা লিখে শেষ করা যায় না। যখন তাঁর বয়স ৫১ ছাড়িয়েছে তখন কাউন্টি লীগে সেরা দল ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় সেটি তাঁর শেষ সেঞ্চুরি। সে বছরই আরেকটি খেলায় ১১৬ ও অপরাজিত ৫১ রান করেন।

হাটন, স্যার লিওনার্ড (১৯১৬—) লেন হাটন পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান। যুদ্ধোত্তরকালে ইংলণ্ড দলের ব্যাটিং-এর ভগ্নদশাকে নিশ্চিতভাবে সাফল্যের তীরে পৌঁছে দিতে তিনি দৃঢ়চেতা, সংগ্রামী ও সাহসী যোদ্ধা হিসাবে চিহ্নিত। ১৯৩৪ সালে ইয়র্ক-শায়ারের পক্ষে প্রথম খেলতে নামেন এবং সেই বছরই একটি খেলায় ১৯৬ রান করেন। ১৮ বছর বয়স্ক কিশোরের নির্ভুল ব্যাটচালনা ও গভীর মনঃসংযোগ লক্ষ্য করে বিশেষজ্ঞ মহল তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। কিন্তু নিউজিল্যাণ্ডের

বিরুদ্ধে ১৯৩৭-এ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে লর্ডস মাঠে ০ এবং ১ রান করে আপাত ব্যর্থ হলেও পরের গ্রীষ্মে অস্টেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেন এবং সেই সিরিজের ওভাল টেস্টে তাঁর ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিটের ইনিংসে ৩৬৪ রানের রেকর্ড তৈরি হয়। ২০ বছর বাদে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গ্যারি সোবার্স সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটি ভেঙে দেন। যাহোক, ১৯৩৮-এ চারটি টেস্ট-ইনিংসে তাঁর রানের গড় দাঁড়ায় ১১৮'২৫। হাটনের টেস্ট সংগ্রহ ৬৯৭১, রান গড় ৫৬'৬৭। তার ভেতরে ১৯টি সেঞ্চুরি রয়েছে; এবং তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের রেকর্ডটি ইংলণ্ডের মাত্র অপর দুটি খেলোয়াড় কলিন কাউড্রে ও ডব্লু হ্যামণ্ড অতিক্রম করতে পেরেছেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ৪০,১৪০ রান। ইনিংস-পিছু রানের গড় ৫৫'৫১। ১৯৫৭ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। ব্যাটসম্যান হিসেবেই তিনি শুধু সফল ছিলেন না, অধিনায়ক হিসেবেও যোগ্য ছিলেন।

হারনে, জন টমাস (১৮৬৭-১৯৪৪) ইংলণ্ডের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার মিডলসেক্স দলের জন হারনে। ডান-হাতি অফ ব্রেক বোলার হারনে গড় ১৮ রানে ৩০৬১টি উইকেট দখল করেন। মিডলসেক্সের পক্ষে ১৮৮৮ সালে তিনি প্রথম খেলতে নামেন। এবং ৫৬ বছর বয়সে ১৯২৩ সালে ঐ দলে থেকেই ক্রিকেট জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ সাল তাঁর চূড়ান্ত সাফল্য আনে। তিনি ১২ই জুনের মধ্যে সে মরশুমে ১০০তম উইকেট দখল করেন; সে সাফল্য আজ পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করে যেতে পারেনি। সে বছর তিনি সর্বমোট ২৫৭টি উইকেট ঝুলিতে ভরে নেন। হারনে ১২টি টেস্ট ম্যাচ খেলেন। ১৮৯১-৯২তে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম, এবং ২৮৯৯-তে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ। এই ম্যাচগুলিতে তিনি ৪৯টি উইকেট দখল করেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওভালে ৬০ রানে ১০টি উইকেট তিনি পান। পরের বছরে ঐ দলের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকও করেন। স্বদেশের মাটিতে বিদেশী দলের বিরুদ্ধে এমন কৃতিত্ব ইতিপূর্বে কেউ করতে পারে নি। ১৯১০ সালে ৪৩ বছর বয়সেও তাঁর বোলিং-এর হিসাব ১২'৭৯ গড় রানে ১১৯টি উইকেট লাভ।

হারনে, জন উইলিয়াম (১৮৯১-১৯৬৫) মিডলসেক্সের এই সদাতৎপর খেলোয়াড়টি সেকালের অন্যতম সেরা অলরাউণ্ডার ছিলেন। তিনি

ব্যাট করতেন সাবলীল ভঙ্গিমায়, বল করতেন স্লো লেগ-ব্রেক। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্নে ১৯১১-১২ সালে তিনি যখন সেঞ্চুরি করেন তখন তাঁর বয়স ২১ও পূর্ণ হয় নি। টেস্ট ম্যাচে জন উইলিয়াম হারনে আপন প্রতিভার যথার্থ স্বাক্ষর রাখতে না পারলেও কাউন্টি খেলার খতিয়ানে তাঁর সাফল্য জলজ্বল করছে। ১৯১১ সালে তিনি শত উইকেট ও সহস্র রানের 'ডাবল' লাভ করেন। পরে ১৯১৩, ১৪ ও ২০ সালে ২০০০ রান ও ১০০ উইকেটের অধিকারী হন। ১৯২৩-এ শেষবারের মতো 'ডাবল' পান। এসেক্সের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে অপরাজিত ১০৬ রান ছাড়াও ১৪৬ রানে ১৪টি উইকেট দখল করেছিলেন। ১৯২৩-এ লর্ডসে সাসেক্সের বিরুদ্ধে ১৪০ ও অপরাজিত ৫৭ রান করা-ছাড়াও ১২৮ রানে ১২টি উইকেট পেয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে ভগ্ন-স্বাস্থ্যের দরুন তাঁকে ক্রীড়াঙ্গন থেকে সরে যেতে হয়, যদিও তিনি ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত খেলার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন তবু অতীতের সেই দক্ষতা আর ফিরে পান নি।

হার্ডস্টাফ, জোসেফ জুনিয়র (১৯১১-) এই শক্তিধর ব্যাটসম্যানটির তীব্র ড্রাইভে বিদ্যুতের ঝলকের মতো ছুটে যাওয়া বলের দিকে চেয়ে যে কোন দর্শকই রোমাঞ্চ বোধ করতে পারতেন। নটিংহামশায়ারের পক্ষে তিনি ১৯৩০ সালে খেলা শুরু করেন এবং দলের দ্রুত রান তোলার প্রধানতম ব্যাটসম্যান হিসাবে চিহ্নিত হন। তাঁর বাবাও নটিং-হামশায়ারের খেলোয়াড় ছিলেন। জুনিয়র হার্ডস্টাফ ১৯৩৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম খেলতে নামেন, ক্রমে ২৩টি টেস্ট ম্যাচে খেলার সুযোগ পান। ১৯৩৭ ছিল তাঁর সেরা মরসুম। ঐ বছরে মরসুমের দ্রুততম শতরান করার সুবাদে লরেন্স ট্রফি লাভ করেন। কেন্টের বিরুদ্ধে ক্যান্টারবারি মাঠে ৫১ মিনিটে শতরান পূর্ণ করেন। তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ রান (২৬৬) লিসেস্টার-শায়ারের বিরুদ্ধে করেন। মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে ২৪৩ ও সমারসেটের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২১৪ সেই মরসুমের সংগ্রহ। সে বছরে তাঁর মোট রান হয় ২৫৪০। ১৯৫৫ সালে যখন তিনি অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁর রানের মোট সংখ্যা ৩১,৮৪৭ (গড় ৪৪·৩৬)।

হার্স্ট, জর্জ হার্বার্ট (১৮৭১-১৯৪৫) ইংলণ্ডের অন্যতম সফল পেশাদার অলরাউণ্ডার হার্বার্ট হার্স্ট। ১৭ বছর বয়সে ইয়র্কশায়ারের

পক্ষে খেলতে নেমে চল্লিশ বছর মাঠে কাটিয়ে দেন। এই সময়ে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর সংগ্রহ ৩৬,২০৩ রান ও ২,৭২৭টি উইকেট। বাঁ-হাতি দ্রুত বোলার এবং জবরদস্ত ব্যাটসম্যান হার্স্ট ২৭টি মরসুমে 'ডাবল' অর্জন করেন। ১৯০৬ সালে তিনি মোট ২,৩৮৫ রান ও ২০৮টি উইকেট ঝুলিতে ভরেন। হাওয়ায় বল সোয়ার্ভ করিয়ে তিনি ব্যাটসম্যানকে ঠকিয়ে দিতেন। ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ১৯১০-এর একটি ইনিংসে মাত্র ২৩ রানের বিনিময়ে ৯টি উইকেট দখল করেন। লিসেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ৩৪১। তিনি মোট ২৪ টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। তবে এ সব খেলায় তার ক্রীড়াপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় মেলে না। তিনি ৩০ রানে ৫৯টি উইকেট পেয়েছেন এবং টেস্টে তাঁর মোট রান হচ্ছে ৭৯২ (গড় ২২'৬২)।

হুইস, ফ্রেডারিক হেনরী (১৮৭২-১৯৫৭) টেস্ট ম্যাচে অংশ গ্রহণ না করলেও এই উইকেট-রক্ষকের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তিনি এক মরসুমে '১০০টি উইকেট পতনের কারণ হয়েছিলেন। ১৯১১ ও ১৯১৩ সালে দুবার তিনি এই অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী হন। ১৯১১-য় তিনি ৬২টি ক্যাচ ও ৩৮টি স্টাম্প আউট করেন। ১৯১৩ সালে ৭০টি ক্যাচ ও ৩২টি স্টাম্প করেন। তিনি কেণ্ট দলের খেলোয়াড় ছিলেন। সারের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে তিনি ইনিংসের দশজন ব্যাটসম্যানেরই ব্যাটিং-এর ইতি টেনে দেন, তার মধ্যে নয়জনকে স্টাম্প করে। এটি আজও সারা বিশ্বের অক্ষত রেকর্ড। ১৮৯৫ থেকে ১৯১৪—যতদিন তিনি কেণ্ট দলের উইকেট-রক্ষক ছিলেন তার মধ্যে ২৬২ জন ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়ানে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার ভেতর ৯০৬ জন তাঁর ক্যাচ ও ৩৫৬ জন স্টাম্পের শিকার।

হেওয়ার্ড, টমাস ওয়াল্টার (১৮৭১-১৯৩৯) টমাস হেওয়ার্ড দীর্ঘ দিন ধরে সারে দলের ব্যাটিং-এর সূত্রপাত করতেন। ১৯০৫-১৯১৪ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী ছিলেন জ্যাক হব্‌স্, যিনি পরবর্তী কালে স্যার হয়েছিলেন। এই জুটির খেলা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁরা সেই অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে রোমাঞ্চিত বোধ করতেন। অন্তত ৪০ বার তাঁদের জুটি অবিচ্ছিন্ন শতরান করেছে। হেওয়ার্ড কেম্ব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন। সারে দলের পক্ষে প্রথম খেলতে নামেন ১৮৯৩ সালে। টমাস হেওয়ার্ড

পুরুষানুক্রমে ক্রিকেট খেলোয়াড়। তাঁর পিতা ও পিতামহ সারে দলের পক্ষে ক্রিকেট খেলেন। হেওয়ার্ড ফরোয়ার্ড ব্যাট করতেন। মিডিয়াম পেস বোলার ছিলেন। প্রায় ৫০০ প্রথম শ্রেণীর উইকেট তাঁর দখলে ছিল। ১৮৯৫ সালে এক মরসুমে সহস্র রান করার গৌরব অর্জন করেন। পরবর্তী ১৯ বছর ধরে এই গৌরব তাঁর করায়ত্ত ছিল। ১৯১৪-য় তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তার ভেতরে গড় ৪১·৮০ হিসাবে সর্বমোট ৪৩,৫১৮ রান তিনি সংগ্রহ করেন। ১৮৯৮-য় ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে ওভাল মাঠে তার অপরাজিত ৩১৫ রান সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর। তিন দফায় এক ম্যাচে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব দেখান। তাঁর সাফল্যের খতিয়ানে দেখা যায় যে তিনি মোট ১০৪ বার শতাধিক রান করেন। ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে এসে শেষ পর্যন্ত খেলে গেছেন এমন ঘটনা ঘটেছে ৮ বার। হবসের সঙ্গে তাঁর জুটির সর্বোচ্চ রান ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে ৩৫২ এবং ওয়ারসেস্টারের বিরুদ্ধে ৩১৩ রান।

হেনড্রেন, এলিয়াস হেনরি (১৮৮৯-১৯৬২) হেনড্রেন দ্রুত রান তুলতে পারতেন। যদিও খাটো হাতের হুকের জন্য তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিল তবু তিনি সব ধরনের মারেই পারদর্শী ছিলেন। ১৯০৭ সালে মিডলসেক্সের পক্ষে তিনি খেলতে নামেন এবং ১৯৩৮ সালে অবসর গ্রহণকালে তাঁর সংগৃহীত প্রথম শ্রেণীর খেলায় সংগৃহীত রানের সংখ্যা ছিল ৫৭,৬১১ (গড় ৫০·৮০)। ওয়ারসেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৩০১ তাঁর সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান। তিনি মোট ১৭০টি সেঞ্চুরি করেছিলেন। এমন অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী জ্যাক হবস ছাড়া আর কেউ নেই। জীবনের শেষ টেস্টেও লর্ডস মাঠে তিনি সেঞ্চুরি করেন। প্রথম যৌবনে তিনি চমৎকার ফুটবলও খেলতেন। ম্যানচেস্টার সিটি দলের পক্ষে লেফট আউট হিসাবে তাঁর স্থান পাকা ছিল। ১৯১৯-এ ভিকট্রি ইন্টারন্যাশনালের ম্যাচে তিনি ইংলণ্ড দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হোয়াইট, জেমস লিলি (১৮৪২-১৯২৯) সাসেক্সের লিলি হোয়াইট পরিবারই পুরুষানুক্রমে ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত। তাদের চতুর্থ পুরুষ জেমস সাসেক্স দলের হয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১৮৬২ সালে শুরু করে ঐ দলের পক্ষে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত প্রতিটি খেলায় তিনি অংশ গ্রহণ

করেন। বাঁ-হাতি এই মিডিয়ম পেস বোলারটি যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁর ঝুলিতে ১১৪০টি উইকেট যা গড়ে ১৫·৩৮ রানের বিনিময়ে সংগৃহীত। ১৮৭২ সালে নর্থ বনাম সাউথের খেলায় তিনি এক ইনিংসে নর্থের দশটি উইকেটই দখল করে নেন। ১৮৭৭ সালে ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ঢুটি টেস্টে তিনি জাতীয় দলের অধিনায়ক হন এবং পরবর্তী বছরে প্রথম অস্ট্রেলীয় দলের ইংলণ্ড সফরের আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন।

হ্যামণ্ড, ওয়াল্টার রেজিনাল্ড (১৯০৩-১৯৬৫) চৌখস অলরাউণ্ডার বলতে ক্রিকেটে যা বোঝায় তার নিদর্শন হিসাবে হ্যামণ্ডের জুড়ি মেলা ভার। তিনি টেস্টম্যাচে যত রান করেছেন এ পর্যন্ত তা অতিক্রম করতে পেরেছেন মাত্র কাউড্রে ও সোবার্স। ইংলণ্ডের সেরা বোলারদের সারিতে তাঁর বোলিং সাফল্যের নজির। ক্যাচ ধরেছেন অজস্র; একটি ম্যাচে ও একটি মরসুমে সর্বাধিক ক্যাচ ধরার রেকর্ডটিও তাঁর। ১৯২০ সালে হ্যামণ্ড খেলা শুরু করেন। চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে অফের দিকের বলগুলি মারতেন, তাতে ফুটে উঠত বলীর শৌর্য ও শিল্পীর মেজাজ। চতুর মিডিয়াম পেস বোলার ছিলেন, আর ছিলেন স্লিপ অঞ্চলের অদ্বিতীয় ফিল্ডার। ১৯২৮-২৯-এর অস্ট্রেলিয়া সফরে পরপর পাঁচটি টেস্ট ইনিংসে তাঁর রানের সমষ্টি হয় ৯০৫। সিডনীতে এক ইনিংসে করেন ২৫১। সে সিরিজে তাঁর রানের গড় ১১৩·১২, যা আজ পর্যন্ত কোন ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যান স্পর্শ করতে পারেন নি। তিন মরসুমে তাঁর রানের মোট সংখ্যা ৩ হাজার অতিক্রম করে গেছে। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩২-৩৩এ অকল্যাণ্ডে তাঁর সর্বোচ্চ রান ৩৩৬ (অপরাজিত)। ১৯৩৬-এ ইংলণ্ডের মাটিতে সর্বাধিক রানের (৩১৭ রান) ইনিংসটি খেলেছিলেন নটের বিরুদ্ধে। তিনি মোট ১৬৭টি সেঞ্চুরি করেছেন। ম্যাচের ঢু ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন ৭ বার—এটি আজও একটি বিশ্ব রেকর্ড। যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন তাঁর রানের গড় ৫৬·১০, মোট ৫০,৪৯৩। গ্লৌসেস্টারশায়ারের খেলোয়াড় হ্যামণ্ড ১৯২০-৩৭ পেশাদার ছিলেন। তারপরে আবার অপেশাদার হন এবং ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক মনোনীত হন। ২০টি টেস্টে তিনি স্বদেশের নেতৃত্বে করেন। ১৯৩৯-৪৬ গ্লৌসেস্টারশায়ারের অধিনায়ক ছিলেন হ্যামণ্ড।

হ্যারিস, লর্ড (১৮৫১-১৯৩২) লর্ড হ্যারিস ইংলণ্ডের ক্রীড়াজগতের সম্মানভাজন ব্যক্তিত্ব। মেজাজে খেলোয়াড়, চরিত্রে খাঁটি ইংরেজ ভদ্রলোক। প্রথম ইটনে ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিকেট শুরু করে পরে কেণ্ট দলে যোগদান করেন। ১৮৭৫-৮৯ পর্যন্ত ঐ দলের অধিনায়ক ছিলেন এবং সেই অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। রাজনীতি তাঁর ক্রিকেট জীবনের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৮৫ সালে তিনি ভারত-সংক্রান্ত দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ সালে হন বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর। ১৮৯৫ পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন। ঐ সময়ে ভারতবর্ষে ক্রিকেটের প্রসারে তাঁর যথেষ্ট দান রয়েছে। লর্ড হ্যারিস কেণ্ট দলের কেবলমাত্র খেলোয়াড়ই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দলের অধিনায়ক, সম্পাদক, চেয়ারম্যান ও সভাপতি। ইংলণ্ড দলেরও তিনি অধিনায়ক হয়েছিলেন। ইংলণ্ডে খেলাধুলা, বিশেষত, ক্রিকেটের উন্নতির জন্য লর্ড হ্যারিস যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। লর্ড হ্যারিস ছিলেন একজন চমৎকার ব্যাটসম্যান এবং দক্ষ ফিল্ডার। সাসেক্স দলের বিরুদ্ধে ১৮৮২ সালে তাঁর সর্বাধিক রানের সংগ্রহ হচ্ছে ১৭৬।

ক্রিকেট ও ক্রিকেটার : অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট খেলতে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে—বলা যায় আণ্ডার-আর্ম বোলিং-এর যুগ যখন অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। তাঁরা আচমকা আন্তর্জাতিক মান অর্জন করেন, বৈজ্ঞানিক ও রুচিসম্পন্ন তিনটি ইংলিশ টীমের সংস্পর্শে এসে। ওই দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই উনবিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তর দশকে ছিলেন পুরোদস্তুর পেশাদার। কিন্তু গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা হল এঁদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক খেলোয়াড়ই ইংলিশ ক্রিকেটের বশংবদ ভৃত্য বা নকলনবীশ।

সিডনি-র:প্রথম ক্রিকেট ক্লাব 'দি মিলিটারি' ১৮২৬ সালে সেনাবাহিনী ও গ্যারিসনের পীড়াপীড়ির ফলে স্থাপিত হয়। ঐ একই বছরে স্থানীয় বেসামরিক যুবকদের দ্বারা 'অস্ট্রেলিয়ান ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বেশ কয়েক বছর টিকে থাকে। সিডনি ক্লাব :প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৯। লিখিত তথ্য থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় ১৮৩০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সিডনির হাইড পার্কে প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বাজি ধরা হয় দল-প্রতি ২০ পাউণ্ড। উক্ত খেলায় বেসামরিক পক্ষের রানের সংখ্যা ৭৬: ও ১৩৬ এবং ৫৭৩ম রেজিমেণ্টের রান যথাক্রমে ১০১ ও ৮৭। ৩রা মার্চ আরেকটি খেলা হয় যেখানে বেসামরিক দলটি ৯৫ ও ৭৫ রানে জয়লাভ করে; সামরিক পক্ষের রানের সংখ্যা ছিল ৮২ ও ৫২। বাজির ক্ষেত্রে শুধু টাকাই নয় বরং কাঠ, শূকর, বাজরা, বুটজুতো, সাপের চামড়ার জুতো, মাখন, লবণাক্ত মাছ ইত্যাদিও দেওয়া হয়।

১৮৩৮ সালে মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উইলিয়াম স্ট্রীটের এক পরিত্যক্ত মাঠে খেলা শুরু হয়। এখানে পরবর্তী কালে টাঁকশালের বাড়িটি গড়ে ওঠে ফলে ক্লাবের মাঠ স্থানান্তরিত হয়। ভিক্টোরিয়ার ব্রাইটন ক্লাবের ভাগ্যে ১৮৪২ সালে প্রতিষ্ঠার পর আদিবাসীদের আবাসস্থলে একটি মাঠ জোটে।

উনবিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তর দশকেও অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেটের মান ছিল প্রাগৈতিহাসিক। "দি ব্রীসবেন ক্যুরিয়ার" পত্রিকা ১৮৬২ সালের জুন মাসে কুইন্‌স্‌ল্যান্ড নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌-এর খেলা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলে :

"মাঠের নিদারুণ অবস্থায়
অনবরত আছাড় খাওয়া এবং
পা পিছলে যাওয়া এবং খানাখন্দে
বলের পিছনে লম্ফঝম্ফ অপরিহার্য হওয়া
সত্ত্বেও খেলার মান মোটামুটি উচ্চই ছিল।"

১৮৫০ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলা, কি শহরে, কি মফঃস্বলে, সম্পূর্ণতঃ ক্লাবগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ভিক্টোরিয়া ও টাসমানিয়া-র মধ্যে প্রথম খেলাটি হয়, অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম ইংলিশ দল অবতরণ করার দশ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৫০-৫১ সালে; দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় মেলবোর্ন-এ ভিক্টোরিয়া বনাম নিউ সাউথ ওয়েলস্ ১৮৫৬-৫৭য়। এমন কি ক্লাবের মধ্যে খেলাগুলিও ১৮৬০-এর আগে নিয়মিত প্রতিযোগিতামূলক হত না। নিয়মিত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা প্রথম সিডনিতে শুরু হয় ১৮৭১-৭২ সালে; অ্যাডিলেডে ১৪৭৩-৭৪; ১৮৭৬-৭৭এ ব্রিস্‌বেন্-এ ও ১৯০০-০১ সালে পার্থ-এ।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম দিকের ক্রিকেট ক্লাবগুলি বর্তমানের ন্যায় জেলাভিত্তিক ছিল না, ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টায় বিক্ষিপ্তভাবে এখান-সেখান থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করে দুটি দল গঠন করা হত। অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলার বিকাশের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য নাম মেলবোর্ন ক্লাব; সিডনির অ্যালবার্ট ক্লাব ও অস্ট্রেলিয়ান ক্লাব। ১৮৫২ সালে রেডফার্নে প্রতিষ্ঠিত আলবার্ট ক্লাব থেকে আসেন অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ক্রিকেট ক্যাপটেন ডেভিড গ্রেগরি এবং স্বনামধন্য ব্যাটসম্যান চার্লস ব্যানারম্যান যিনি ১ম ইনিংসে প্রথম সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেন ইংল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড ও কানাডার বিপক্ষে। এই ক্লাব থেকেই আসেন অস্ট্রেলিয়ার ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম ব্যাটসম্যান উইলিয়াম লয়েড মারডক এবং শ্রেষ্ঠতম বোলার ফ্রেড্‌রিক রবার্ট স্পোফোর্থ—যিনি তাঁর স্বদেশে এবং বিদেশে 'দানব' হিসেবে বিখ্যাত বা কুখ্যাত হন।

অ্যাল্‌বার্ট ক্লাব অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের জগতে খেলার এক সুনির্দিষ্ট মান নির্ধারণ করেন এমন এক সময়ে যখন ক্রিকেটে শৃঙ্খলা বস্তুটি ছিল অনুপস্থিত। ঐ শতকের পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তরের দশকে এই অ্যালবার্ট ক্লাবের খেলোয়াড়দের সাদা ট্রাউজার্স, নীল শার্ট, কালো বুট ও সাদা স্ট্র-হ্যাট পরে মাঠে নামা আবশ্যিক করা হয়। কেবলমাত্র অধিনায়কদের অন্য খেলোয়াড়দের থেকে পৃথক করার

জন্য ভিন্ন রঙের শার্ট পরার অনুমতি দেওয়া হয়। অবশ্য উইকেট-রক্ষকরা বিশেষ কারণেই লাল রঙের শার্ট পরে মাঠে নামতেন। উক্ত ক্লাবের খেলার মান উন্নত করার জন্য অস্ট্রেলিয়া সফরেও প্রথম ইংল্যাণ্ড দলের চার্লস লরেন্সকে কোচ হিসেবে নিয়োগ করা হয়; পরবর্তী কালে এম. সি. সি দলের উইলিয়াম ক্যাফিনের নেতৃত্বে দলের খেলোয়াড়দের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ক্যাফিন ১৮৬১-৬২ এবং ১৮৬৩-৬৪ ইংল্যাণ্ড দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া সফর করেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট জগতে প্রথম সেঞ্চুরি করার গৌরব মেলবোর্ন ক্লাবের খেলোয়াড়ের। মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের মুখ্য অবদান ক্রিকেট জগতে সাংগঠনিক রূপদান এবং খেলার মান উন্নয়ন। অস্ট্রেলিয়ায় নিয়মিত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট খেলার প্রবর্তন, প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ এবং প্রথম দুটি টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত করার কৃতিত্ব এই মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই ক্লাবের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন সাউথ মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব থেকেই আসেন জন ম্যাক্কার্থি, ব্ল্যাক্হাম, হ্যারি ট্রট, ওয়ারইক আর্মস্ট্রং, উইলিয়াম উড্ফল, লিণ্ডসে হ্যাসেট, আয়ান জনসন প্রমুখ দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়রা এবং অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের ৩১জন অধিনায়কদের মধ্যে ছ জন এই সাউথ মেলবোর্ন ক্লাবের সদস্য। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের মূল কারণ প্রতি শনিবার বিকেলে ক্লাব পর্যায়ের খেলাগুলির মধ্যেই নিহিত। ব্রিটেনে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার উক্ত খেলাগুলিতে ব্যাপক জনসাধারণ তাঁদের দক্ষতা প্রকাশের সবরকম সুযোগ পান। জনপ্রিয়তা ও মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্য খেলাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার ফলেই ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে অস্ট্রেলিয়ায় সর্বাধিক সংখ্যক খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ময়দানে হাজির হতে পেরেছেন।

পাচবছরে নিউ সাউথ ওয়েলস-এর সঙ্গে পাঁচটি খেলার মধ্যে ক্রমান্বয়ে চারটিতে জয়লাভ করে। ভিক্টোরিয়া অবশেষে ইংল্যাণ্ড থেকে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মোকাবিলা করার আশা প্রকাশ করে। চব্বিশ হাজার মাইল অতিক্রম করে তাঁরা লণ্ডন থেকে মেলবোর্ন পৌছবেন এই শর্তে যে প্রতিটি খেলোয়াড় ১৫০ পাউণ্ড স্টার্লিং পাবেন এবং প্রথম শ্রেণীর সুযোগ-সুবিধা থেকে কোনোভাবেই বঞ্চিত হবেন না। ফলে ইংলিশ টীম ১৮ই অক্টোবর পুলিভায়ল বন্দর ছেড়ে যাত্রা করেন এবং ২৪শে ডিসেম্বর মেলবোর্ন এসে

পৌঁছোন। সেখান থেকে তাঁদের বোর্ক স্ট্রীটে কাফে দ্য প্যারীতে নিয়ে গিয়ে প্রথম অস্ট্রেলিয়ার খাবারের স্বাদগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। ১৮৬২ সালের নববর্ষের দিনে তাঁরা আনুমানিক ১৫,০০০ দর্শকের সামনে জাতীয় সংগীতের মূর্ছনা আকণ্ঠ পান করে মাঠে নামেন। বলাই বাহুল্য ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করে এবং অস্ট্রেলিয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের রণাঙ্গনে প্রবেশ করে এমন এক প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যাঁরা ক্রিকেট খেলার সূত্রপাত করেন আনুমানিক পাঁচশো বছর আগে।

টেস্টের পথে অগ্রগতি

১৮৬৪ সালে জর্জ পার-এর নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড থেকে যে দল অস্ট্রেলিয়ায় আসে, সেই দলে একাধিক ওভার-আর্ম বোলার ছিলেন। সিড্‌নির মাঠে দর্শকের গ্যালারিতে বসে একটি কিশোর এই খেলা দেখার সুযোগ পায়, তার নাম ফ্রেডরিক রবার্ট স্পোফোর্থ—জন্ম সিডনির নিকটবর্তী বল্‌মেইন শহরে। স্পোফোর্থ এই খেলায় প্রথম ওভার-আর্ম বোলার জর্জ টারাণ্টকে বল করতে দেখেন। বহু বছর বাদে স্পোফোর্থ লেখেন :

> 'টারাণ্ট-এর প্রতি আমার আনুগত্যে আমি কখনও
> অবহেলা করিনি এবং তার যোগ্য পুরস্কারও
> পেয়েছি।"

ষাট ও সত্তর দশকে অস্ট্রেলিয়ান উইকেটে দ্রুত ওভার-আর্ম বোলিং-এর উপযোগিতা অসামান্য। ১৮৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়া দল যখন বিদেশ যাত্রা করে, ছ'ফুট তিন ইঞ্চি, লম্বা সুদেহী স্পোফোর্থ তখন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের আতঙ্ক এবং চৌখশ খেলোয়াড়দের মধ্যে সেরা খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৬-র মধ্যে তাঁর পাঁচটি বিদেশ সফরে তিনি ৬৪৭টি উইকেট নেন ১২.৪-এ, ঐ একই সংখ্যক অভিযানে পামার ৪৫৬ জন ব্যাটসম্যানকে উইকেটচ্যুত করেন ১৫.৫এ এবং ১৭টি টেস্ট খেলায় ৭৮টি উইকেট নেন ২১.৫-এ। সৌভাগ্যবশত উক্ত টীমে এমন কয়েকজন ব্যাটসম্যান ছিলেন যাঁরা যথেষ্ট রান সংগ্রহ করে স্পোফোর্থ বয়েল পামার, ও ফেন্‌ডেন্স-কে জয়লাভের যথাযোগ্য সুযোগ দেন, যা এক শতাব্দী বাদে এখনও ক্রিকেটের ইতিহাসে অমর জয়লাভ হিসেবে চিহ্নিত। এইসব খেলোয়াড়রা সিডনি ও মেলবোর্নে উইলিয়াম ক্যাফিন ও চার্লস লরেন্স-এর কাছে যথার্থ

শিক্ষানবীশী করেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এঁদের নাম উইলিয়াম লয়েড মারড্‌ক, চার্লস ও আলেকজাণ্ডার ব্যানারম্যান, পার্সি স্টানিস্‌লাস ম্যাকডোনেল ও টম হোরান। তুলনামূলকভাবে সত্তর দশকে ইংল্যাণ্ডে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে সব খেলোয়াড়দের মধ্যে শীর্ষতম এগারোজন সকলেই ছিলেন অপেশাদার। তাই ১৮৭৬ সালে জেমস লিলি হোয়াইটের নেতৃত্বে ইংলিশ টীম অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছলে কেউ বিশ্বাস করেন নি যে অস্ট্রেলিয়া কট্টর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শত্রুপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। কিন্তু নিউ সাউথ ওয়েল্‌স ফিফ্‌টিন যখন ইংলিশ টীমকে ২ উইকেটে পরাজিত করে তখন সকলের টনক নড়ে।

মেলবোর্নে ১৮৭৭ সালের ১৭ই মার্চ বেলা একটায় অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যাণ্ড প্রথম টেস্ট খেলা হয়। নিউ সাউথ ওয়েল্‌স-এর ডেভিড গ্রেগরি সংযুক্ত অস্ট্রেলিয়ান দলের অধিনায়কত্ব করেন এবং টসে জিতে প্রথম খেলা শুরু করেন। চার্লস ব্যানারম্যান ও ন্যাটা টমস্‌ন ওপেনিং ব্যাট্‌সম্যান হিসেবে মাঠে নামেন, বিপক্ষ দল থেকে আক্রমণ শুরু করেন বোলার শ' ও হিল। দিনের শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া টিঁকে থাকে; ব্যানারম্যান ১২৬ রানে নট আউট থেকে যান, ছ' উইকেটে ১৬৬ রান ওঠে।

পরের দিন খেলা শুরু হতে ব্যান্যারম্যান ও ব্ল্যাকহ্যাম আরো ৩৪ রান যোগ করেন; লাঞ্চের সময় রান ওঠে ৭ উইকেটে ২৩০। অস্ট্রেলিয়া ইনিংস শেষ করে ২৪৫ রানে, যা অনেকের কাছে ছিল অচিন্তনীয়। জাপ্‌ ও সেলবি ইংল্যাণ্ডের হয়ে বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ ইনিংস শুরু করেন। জাপ ৫৪ রানে নট আউট থেকে যান। লিলি হোয়াইট ও হিল সমবেতভাবে ২৩ রান করেন। এইভাবে অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসে ৪৯ রানে এগিয়ে থাকে।

খেলার শেষে ভিক্‌টোরিয়ান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন প্রতিটি খেলোয়াড়কে স্বর্ণপদক উপহার দেন, অবশ্যই অন্যান্যদের তুলনায় অধিনায়ক গ্রেগরিকে প্রদত্ত পদকটি সর্ববৃহৎ তাঁর অধিনায়কত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যাণ্ডের সর্বপ্রথম টেস্টম্যাচে অস্ট্রেলিয়ান দলের স্কোর ছিল নিম্নরূপ:

১ম ইনিংস॥ ২৪৫ (বাই ৪, লেগবাই ২, ওয়াইড ২)

উইকেট পতন—২, ৪০, ৪১, ১১৮, ১৪২, ১৪৩, ১৯৭. ২৪২, ২৪২, ২৪৫

২য় ইনিংস ॥ ১০৪ (বাই ৫, লেগবাই ৩)

উইকেট পতন—৭, ২৭, ৩১, ৩১, ৩৫; ৫৮, ৭১, ৭৫, ৭৫, ১০৪

মেলবোর্নে ২য় টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয় সপ্তাহ দুয়েক বাদে। অস্ট্রেলিয়ান দলে ই. জে. গ্রেগরি, কুপারে এবং হোরানের স্থলে খেলেন স্পোফোর্থ, মারডক ও টি. জে. ডি. কেলি। চারদিন খেলা চলে ও ইংল্যাণ্ড চার উইকেটে জয়লাভ করে। অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংসে ১২১ রানে আউট হয়ে যায়। সর্বাধিক রান করেন মিডউইনটার ৩১। ইংল্যাণ্ড ১৩৫ রানে এগিয়ে থাকে। এইভাবে অস্ট্রেলিয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট রণাঙ্গনে পদার্পণ করে ১৯৭২ সালের মধ্যে মোট ২৩৩টি টেস্ট খেলায় অংশ নিয়ে ১৪৯টিতে জয়লাভ করে ও ৮৯টিতে পরাজয় বরণ করে।

অ্যাশেজ-এর পথে

ষাট ও সত্তর দশকে পাঁচটি ইংলিশ টীম অস্ট্রেলিয়া সফর করে ; কিন্তু ইংল্যাণ্ড মানসিক দিক থেকে ছিল আহত ও রাগান্বিত। মাত্র একবছর আগে ১৮৭৮ সালে ভ্রমণরত ইংলিশ টীমের ক্যাপটেন লর্ড হ্যারিস স্থানীয় গুণ্ডাদের হাতে আক্রান্ত ও অপমানিত হন সিডনির ক্রিকেট মাঠে।

এই অসম্মানজনক ঘটনা ইংল্যাণ্ড সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। ১৮৮০ সালে লণ্ডনে ইংল্যাণ্ডের বহু সম্মানিত খেলোয়াড়বৃন্দ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃত হন। ফলে অস্ট্রেলিয়ান দল তাদের আট সপ্তাহব্যাপী ইংল্যাণ্ড সফরে যাত্রার প্রাক্কালে মেলবোর্নে টেলিগ্রাম মারফত এই সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়া এই টেলিগ্রামের সংবাদ অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৩ই মে লণ্ডনে পৌঁছে তারা জানতে পারে তাদের জন্য কোনো খেলার ব্যবস্থা করা হয়নি। অস্ট্রেলিয়ান দল এম. সি. সি. দলকে আবেদন জানালে তারা জানায় ঐ মরসুমের সমস্ত খেলার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই পাকা হয়ে গেছে এবং তা কোনভাবেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। বিখ্যাত ডব্লু. জি. গ্রেস ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করে লণ্ডনে অস্ট্রেলিয়ান দলের খেলার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হন এবং অকৃতকার্য হন। অবশেষে আগস্টের শেষে লর্ড হ্যারিসের কাছে নানা পক্ষ থেকে গুরুতর আবেদন-নিবেদনের ফলে তিনি অস্ট্রেলিয়ান দলের বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড একাদশকে সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের অবসান ঘটিয়ে মাঠে নামাতে সক্ষম হন। তাই লণ্ডনের কেনিংটন ওভালে সেপ্টেম্বর ৬, ৭, ও ৮ তারিখে প্রথম টেস্ট খেলা হয়। ডব্লু. জি. গ্রেস ও তাঁর বড়

ভাই দুজনে ইনিংস শুরু করেন ওপেনিং ব্যাট্‌সম্যান হিসেবে; গ্রেস ১৫২ রানে পামারের বলে আউট হয়ে যান। ইংল্যাণ্ড প্রথমদিনে ৮ উইকেটে ৪১০ রান করেন। অস্ট্রেলিয়া প্রত্যুত্তরে ১৪৯ রান করেন সর্বসাকল্যে।

১৮৮২ সালে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলা ছিল আরো উত্তেজনাপূর্ণ কারণ তা 'অ্যাশেজ'-এর প্রতিষ্ঠা করে। এই 'অ্যাশেজ'-এর ঘটনা ব্রিটিশ ইতিহাসে ট্রাফ্‌ল্‌গার বা ওয়াটারল্যুর যুদ্ধের মতই স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে।

১৮৮১-৮২ সালের গ্রীষ্মকালে মারডকের অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়া পুরোদস্তুর পেশাদার ইংলিশ টীমকে সিডনিতে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় পাঁচ উইকেটে পরাজিত করে। ইংলিশ টীমের অধিনায়ক ছিলেন আলফ্রেড শ'। সাতটি টেস্ট খেলার মধ্যে ছটি খেলা হয় অস্ট্রেলিয়ায়। অস্ট্রেলিয়া চারটিতে জয়লাভ করে। ১৮৮২ ফলের ২৮শে অগস্ট কেনিংটন ওভালে ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার সেই বিখ্যাত খেলাটি হয়। যার সংবাদ পরদিন স্পোর্টিং টাইমস পত্রিকায় শোকসংবাদ হিসেবে ছাপা হয়। অস্ট্রেলিয়া খেলা শুরু করে এমনই বিপজ্জনকভাবে যে লাঞ্চের মধ্যেই ৬টি উইকেট পড়ে যায় এবং রানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৮। লাঞ্চের পর ২০ মিনিটের মধ্যে সব কটি উইকেট পড়ে যায় মাত্র ৬৩ রানে। ইংল্যাণ্ড ব্যাট করতে নামেন স্পোফোর্থ-এর বলের বিরুদ্ধে। মাত্র চার রানেই বিখ্যাত ডব্লু. জি. গ্রেস তাঁবুতে ফিরে যান এবং বারলো ফিরে যান মাত্র ১১ রান করে। ইংল্যাণ্ডের সব কটি উইকেট পড়ে যায় ১০১ রানে—স্পোফোর্থ মাত্র ৪৬ রানে ৭টি উইকেট নেন।

পরদিন অবস্থা তথৈবচ, কিন্তু ম্যাসি ও ব্যানারম্যান এক ঘণ্টার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ৬৬ রান তোলেন; মারডক তোলেন ২৯ রান এবং ১২২ রানে অস্ট্রেলিয়ার সব কটি উইকেট পড়ে যায়; ইংল্যাণ্ডকে জয়লাভ করতে হলে আরো ৮৫ রান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ব্যাট করতে নামেন বিকেল চারটে নাগাদ ডব্লু. জি ও হর্নবি (ইংলিশ ক্যাপটেন)। ১৫ রানের মাথায় হর্নবি মাঠ ছেড়ে চলে যান এবং উলিয়েট গ্রেস সমবেতভাবে রানের সংখ্যা ৫১য় দাঁড় করান। ইংল্যাণ্ডের হাতে ছিল ৭টি উইকেট এবং প্রয়োজন ছিল মাত্র ৩৪ রান। ৬৬ রানের মাথায় স্পোফোর্থ লিটল্‌টনকে আউট করেন। এখনও ১৯ রান প্রয়োজন ছিল, হাতে ছিল ৫টি উইকেট। অস্ট্রেলিয়া মাত্র ৭ রানে জয়ী হন। স্পোফোর্থ ৪৪ রানে ৭টি উইকেট নেন—এবং পুরো

ম্যাচে সর্বসাকল্যে ৯০ রানে ১৪টি উইকেট নেন যা কোনো অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়ের পক্ষে একটি টেস্ট খেলায় সম্ভবপর হয়নি।

পরের দিন "স্পোর্টিং টাইমস" পত্রিকায় 'ইন মেমোরিয়াস' শীর্ষকে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়।

'In affectionate remembrance of
English Cricket which died on The Oval
on August 29th, 1882. Deeply lamented by a
large circle of sorrowing friends
and acquaintances.
NB. The body will be cremeted & the
Ashes taken to Australia'.

স্বর্ণযুগ

কেনিংটন্ ওভালের সামান্য, কিন্তু অমূল্য জয়লাভে ইংল্যাণ্ড এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের বিকাশের মূল বৈশিষ্ট্য তার পেস্ বোলাররা। ১৮৮২ সালে ইংল্যাণ্ডে সর্বসাকল্যে যে ৩৮টি খেলা হয় তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ২৩টিতে জয়লাভ করে এবং ৪টিতে পরাজয় বরণ করে। অস্ট্রেলিয়ার দলে মারডক ছিলেন এমন একজন ব্যাটসম্যান যাঁর সাথে ইংল্যাণ্ডের ডব্লু. জি. গ্রেস-এর তুলনা চলে। ম্যাক্‌ডোনেল, ম্যাসি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে ভীতিপ্রদ মারকুটে খেলোয়াড়দ্বয়, ব্ল্যাকহাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উইকেট কীপার, স্পোফোর্থ সবচেয়ে বিপজ্জনক ও মারাত্মক বোলার এবং গিফিন সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছিলেন।

১৮৯১-৯২ সালে লর্ড শেফিল্ডের অধিনায়কত্বে যে ইংলিশ টীম অস্ট্রেলিয়া সফর করে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট জগতে তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। অ্যাশেজ-এর পুনরুদ্ধার ও শেফিল্ডের দলকে অস্ট্রেলিয়ায় যে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় তাতে মুগ্ধ হয়ে শেফিল্ড অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কাউনসিলকে ১৫০ পাউণ্ড দান করেন। কাউনসিল ঐ টাকাতে একটি শীল্ড নির্মাণ করেন। পরবর্তী কালে নিউ সাউথ ওয়েল্‌স, ভিক্টোরিয়া ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া আন্তঃপ্রাদেশিক ম্যাচে উক্ত শীল্ডের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়।

১৮৯০ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া ৭০টি খেলায় জয়লাভ করে এবং ৫২টিতে পরাজয় বরণ করে। ১৯৩৪ থেকে ১৯৫৩

এই দীর্ঘ উনিশ বছর এবং ১৯৫৯ থেকে ১৯৭১ দীর্ঘ বারো বছর অস্ট্রেলিয়া অ্যাশেজ দখল করে রাখেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের স্বর্ণযুগে যেসব ব্যাট্‌স-ম্যানের আগমন হয় তাদের মধ্যে সিড্‌ গ্রেগরি হ্যারি গ্রাহাম ও অ্যালবার্ট ট্রট-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইংল্যাণ্ডের সাথে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে সাহায্য আসে তার অনেকটাই আসে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে। ১৮৭৭ থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ানদলে ন্যূনপক্ষে তিনটি, প্রায়ই চারটি এবং একবার পাঁচজন দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় ছিলেন। জো, ডারলিং হিল্‌ ও আয়ান চ্যাপেল—দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া এই তিনজন অধিনায়ক উপহার দেয় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটজগৎকে।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের স্বর্ণযুগ শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ক্রিকেট জগতে উল্লেখযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৮৯১ থেকে ১৯১২র মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ২৫টি টেস্ট ম্যাচে জয়লাভ করে। ১৮৯১-৯২ সালে অস্ট্রেলিয়া অ্যাশেজ পুনরুদ্ধার করে এবং ১৮৯৯ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে ১১টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ৯টিতে জয়ী হবার গৌরব অর্জন করে।

যুদ্ধোত্তরকাল

প্রথম মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়া অকিঞ্চিৎকর এক তরী হিসেবে ক্রিকেট জগতে আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু তার অধিনায়ক ওয়ারিক আর্মস্ট্রং-এর মধ্যে বিশাল রণতরী পরিচালনার দক্ষতা ছিল। তাঁর অধিনায়কত্বেই অস্ট্রেলিয়া তাদের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে শ্রেষ্ঠতম সম্মান অর্জনের অধিকারী হয়। ১৯২০-২১ সালে অনুষ্ঠিত দশটি টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া আটটিতে জয়লাভ করে; এবং ১৯২১ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়া ৩৭৭ রানের ব্যবধানে, ১ ইনিংসে ৯১ রান; ১১৯ রান, ৮ উইকেট, ৯ উইকেট, ১০ উইকেট, ৮ উইকেট ও ২১৯ রানে জয়লাভ করে। শেষোক্ত দুটি খেলা ড্র হয়। ১৯২০-২১ সালের উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন হার্বার্ট কলিন্‌স। ওপেনিং ব্যাট্‌সম্যান হিসেবে টেস্টে যথাক্রমে ৭০ ও ১০৪ রান করেন; কেলেওয়ে ৪৭.১৪ গড়ে করেন ৩৩০ রান এবং বোলিং-এর ক্ষেত্রে ১৫টি উইকেট নেন ২১.০০ রানের গড় হিসাবে। ইংলাণ্ডের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে ১৯২১-২৪ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার যুবাবয়সী ব্যাট্‌সম্যানেরা ক্রিকেটের ইতিহাসে

কতকগুলি রেকর্ড সৃষ্টি করেন। উইলিয়াম হ্যারল্ড পোন্‌সফোর্ড ১৯২২-২৩ সালে টাস্‌মানিয়ার বিরুদ্ধে ভিকটোরিয়ার পক্ষে অংশগ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ করেন ৪২৯ করে। এই সময়ে মেলি ও গ্রিমেট বোলার হিসেবে উভয়েই গুগ্‌লি বোলার হিসেবে গণ্য তবু তাঁরা ব্যাটসম্যানদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভঙ্গী অবলম্বন করতেন। মেলি বাতাসে তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে দ্রুত ঘুরতেন এবং ব্যাটসম্যানদের সর্বনাশ সাধনের আগে যেন আমন্ত্রণ জানাতেন। গ্রিমেট অন্যপক্ষে ব্যাটম্যানদের প্রতিটি রান সংগ্রহ দুঃসাধ্য করে তুলতেন। দক্ষ তীরন্দাজের মত গ্রিমেট তার লেগ্‌স্পিন, টপ-স্পিন, স্ট্রেট ব্রেক ইত্যাদি ব্যবহার করে ১৮২৪-২৫ সালে ১১টি উইকেট নেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে; তাদের মধ্যে ছিলেন হব্‌স, স্যাণ্ডহাম, উলার হেন্‌ড্রেন ও হেআর্ন। সর্বসাকল্যে ইংল্যাণ্ড মাত্র ১৬৭ ও ১৪৬ রান সংগ্রহ করেন।

১৯২৬ সালের টেস্ট সিরিজে গ্রিমেট ও মেলি ৩৯টির মধ্যে ২৭টি উইকেট নেন। বিশ দশকে অস্ট্রেলিয়ার যেসব খেলোয়াড়রা দেশের সম্মান শীর্ষে তুলে ধরেন তাঁরা ক্রমশ বয়োবৃদ্ধির ফলে ক্ষীয়মাণ হয়ে পড়ছিলেন ক্রমশ। ফলে টেস্ট খেলার কুশীলবদের মধ্যে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান ও তাঁর যুগ

১৯২৮ সালের ব্রিস্‌বেন টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হত যদি না সেখানে অসাধারণ আত্মপ্রত্যয়, অতুলনীয় দক্ষতা ও অদ্বিতীয় একাগ্রতা সম্পন্ন এক যুবক ব্যাটসম্যানের আবির্ভাব ঘটত, যার নাম ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাডম্যান। অস্ট্রেলিয়া উক্ত টেস্ট খেলায় ৬৭৫ রানের পরাজয় বরণ করে এবং আতঙ্কের সাথে লক্ষ্য করে ইংল্যাণ্ডের এমন শক্তিশালী দল অতীতে কখনও বিদেশে খেলতে পাঠানো হয় নি, যাদের মোকাবিলা প্রায় অসম্ভব হিসেবে গণ্য করা যায়। ঐ দলে ছিলেন হবস্‌, সাটক্লিফ, হ্যামণ্ড, জার্ডিন, হেন্‌ড্রেন ও চ্যাপম্যান এবং যে দলের বোলিং-এ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লারউড ও টেট্‌ এবং সহযোগিতা করছিলেন জে. সি. হোয়াইট। ব্র্যাডম্যান সেই মরসুমেরই গোড়ায় এম. সি. সি-র সঙ্গে খেলায় লারউড, টেট ও হোয়াইটের সঙ্গে খেলায় ২৯৫ রান রান করেন কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকমণ্ডলী তাঁকে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বাদ দেন। কিন্তু ব্র্যাডম্যান সেঞ্চুরি করে তাঁরে ক্ষমতার

পরিচয় দেন প্রথম ক্লাব ম্যাচেই; আর একটি সেঞ্চুরি করেন শেফিল্ড শীল্ড ম্যাচে এবং ৮৭ ও ১৩২ রান করে নট আউট থাকেন এম. সি. সি-র বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায়। অন্য কোনো ব্যাটস্‌ম্যান উপর্যুপরি এমন দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হন নি। তৎসত্ত্বেও তাঁকে দ্বিতীয় টেস্টে বাদ দেওয়া হয়। ফলে মরসুমের অবশিষ্ট অংশে তিনি এর শোধ তোলেন। ঐ মরসুমে তাঁর সামগ্রিক রান সংখ্যা ছিল ১৯৬০। ১৯২৯-৩০ সালে ১৫৮৬। ভিক্টর ট্রাম্পার যদি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান স্বভাবজাত ব্যাটসম্যান হন, হবস যদি আপাদমস্তক 'কপিবুক' ক্রিকেটার হন, ব্র্যাডম্যান এক অদ্বিতীয় বিধ্বংসী সার্থক ব্যাটসম্যান। তাঁর মতো অন্য কোনো খেলোয়াড় ক্রিকেটের এক যুগকে অর্থাৎ ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৮ সালে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত একাই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন নি। ব্রাডম্যান ক্রিকেট খেলায় যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী চিন্তা ও একাগ্রতা আরোপ করেন যা খুব কম মানুষ তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আরোপ করেছেন। কথিত আছে ব্র্যাড্‌ম্যান:বোলারের হাত থেকে বল বেরুবার আগেই সেই বল দেখতে ও বিচার করার ক্ষমতা রাখতেন এবং তাঁর চোখের ক্ষিপ্রতা ও সিদ্ধান্ত তাঁর পদক্ষেপের সঙ্গে যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। গ্রিমেট বলেছেন, ব্র্যাডম্যানের হাতে ব্যাট দেখলে বোলাররা তাঁদের বলের দূরত্ব ও গতি হারিয়ে ফেলে হাল ছেড়ে দিতেন। তাঁদের যখন এমন দিশেহারা অবস্থা তখন ব্র্যাডম্যান একাধিপত্য শুরু করতেন যা বিপক্ষের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করত।

যে অস্ট্রেলিয়ান দল ১৯২৬ ও ১৯২৮-২৯ সালে ইংল্যাণ্ডকে বিনীতভাবে জায়গা ছেড়ে দেয়, পরবর্তী কালে সেই থেকেই অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে যে পনেরোজন খেলোয়াড় ইংল্যাণ্ড সফরে যান তাঁদের মধ্যে ৯ জন ছিলেন বিশের কোঠায়, বাকি ৬ জন হয়ত তেইশ বছর কিংবা তারো কম। এই যুবকদের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয় শ্রদ্ধেয় স্কুলের শিক্ষক উইলিয়ম উড্‌ফুল-এর হাতে। তিনি ৩৬ ইনিংসে সর্বসাকল্যে রান সংগ্রহ করেন ২৯৬০, গড় ছিল ৯৮.৬৬ এবং ৫টি টেস্টে ৯৭৪ রান। ১৯৩২ সালের ইংল্যাণ্ডের অস্ট্রেলিয়া সফরে জার্ডিন সর্বপ্রথম মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া একাদশের বিপক্ষে তাঁর বডিলাইন বোলিং শুরু করেন এবং চালাতে থাকেন সিড্‌নিতে ১ম টেস্ট খেলা পর্যন্ত। লারউড বোলিং করতেন ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে। উপরন্তু যখন তিনি শর্ট-পীচ বাম্পার বোলিং করছেন ব্যাট্‌সম্যানের শরীরের

উপরিভাগ লক্ষ্য করে জার্ডিন লেগ-এর দিকে আটজন ফিল্ডারকে নিয়োগ করেন—একজন সিলি মিড-অন, একজন স্কোয়ার লেগ-এ, দুজন লেগ, তিনজন লেগ-স্লিপ, এবং একজন বাউণ্ডারির কাছে এই চক্রের বাইরে পাছে কোনো ব্যাটম্যান যদি অসীম সাহসে হুক করেন তাকে বাধাদানের জন্য।

বডিলাইন বোলিং-এর বিরুদ্ধে ব্র্যাডম্যানের সর্বশ্রেষ্ঠ ইনিংস খেলা হয় ২য় টেস্টে মেলবোর্নে। তিনি ১০৩ রান করেন এবং বিখ্যাত অস্ট্রেলিয়ান স্পিন্ বোলার বিল্ ও'রেলিকে ১২৯ রানে দশটি উইকেট নিতে সাহায্য করেন।

১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ার সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী ছিলেন ব্র্যাডম্যান ও পোন্সফোর্ড। এঁরা দুজনেই বডিলাইন বোলিং-এর ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কাটিয়ে উঠতে সময় নেন। ১৯৩৪ সালে লীড্স-এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ টেস্ট খেলায় যখন জয়-পরাজয় দোদুল্যমান অবস্থায় ছিল তিন উইকেটে ৩৯ রানে তাঁরা আরও ৩৮৮ রান যোগ দেন ৪র্থ উইকেটে ৩৪১ মিনিট খেলে ; পোনস্ফোর্ড ১৮১ রানে হিট্ উইকেটে আউট হয়ে ফিরে যান। ব্র্যাডম্যান শেষ করেন ৩০৪ রানে, একটি তাঁর দ্বিতীয় তিন শতাধিক রান হেডিংলে ক্রিকেট মাঠে। ওভাল মাঠে শেষ টেস্টে পোন্সফোর্ড ২৬৬ রান ও ব্র্যাড্ম্যান ২৪৪ রান করে এই জুটি আরো আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটান ৩১৬ মিনিটে ৪৫১ রান সংগ্রহ করে। উড্ফুল টেস্ট খেলায় ২৩০০ এবং পোনস্ফোর্ড ২১২২ রান সংগ্রহ করে ইংল্যাণ্ডে শ্রেষ্ঠ ওপেনিং ব্যাট্ম্যান হব্স ও সাটক্লিফের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণ্য হন। এঁরা ছাড়া আরো কয়েকজন যথার্থ শিল্পী ব্যাট্সম্যানের নাম উল্লেখ করা যায় : আর্চি জ্যাক্সন ও স্ট্যানলি ম্যাকাবে, যাঁরা ব্র্যাডম্যানের কথায় অনেক বিপজ্জনক অবস্থায় দলের মুখ রক্ষা করেছেন যা তাঁর মতে তাঁর পক্ষেও কল্পনাতীত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুর্বে শেষ অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটে ব্র্যাডম্যানের গোড়ালিতে হাড় ভেঙে যায় ফলে অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংসে ৫৭৯ রানে পরাজয় বরণ করেও "অ্যাশেজ" রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

১৯৪৬-৪৭ সালে পুনরায় যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা শুরু হয় ব্রিস্বেন-এ ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব করলেও ম্যাকাবে এবং রেলি অবসর গ্রহণ করেছেন ; এতদ্সত্ত্বেও ১ম মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের যা মান ছিল ২য় মহাযুদ্ধের পর সেই মান আরও বেশ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় আরো অনেক নতুন প্রতিভাবানদের আগমনে। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে

যে অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস-এর খেলা ড্র হয় লিণ্ডসে হ্যাসেটের অধিনায়কত্বে সেখান থেকে আসেন কীথ মিলার। তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেন বিপজ্জনক ফাস্ট বোলিং জুটির অন্যতম রাসেল রেমণ্ড লিণ্ডওয়াল নিউ গিনির সামরিক দফতর থেকে। লিণ্ডওয়াল ১৯৪৩ সালে ছিলেন বোলিং কলাকৌশলগত দিক থেকে শীর্ষদেশে। তীক্ষ্ণ ইনসুইং কবিতার ছন্দের মত আউটসুইং বাম্পার ডেলিভারির চতুরতায় তিনি গ্রিমেট-এর মতই সুদক্ষ ব্যাটসম্যানদের দুর্ভেদ্য বেড়াজাল ভেঙে তছনছ করে দিতেন।

১৯৪৬-৪৭ সালে ব্র্যাডম্যান তার প্রাচীনতম ইংলিশ শত্রু হ্যামণ্ডের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পেলেন লিণ্ডওয়াল ও মিলারকে—যাঁদের মাধ্যমে তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে সুদে আসলে শোধ তুললেন। ক্যাপটেন হিসাবে তাঁর হাতে ছিল তুরুপের তাস এবং ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি পুনরায় নিঃসন্দেহ হলেন, যেদিকে দুচোখ যায় তাঁরই একাধিপত্য। ৮০টি টেস্ট ইনিংসে তিনি ২৯টি সেঞ্চুরি করেন তার মধ্যে তিনটিতে তিনশতাধিক এবং দশটিতে ডবল সেঞ্চুরি। ব্র্যাডম্যানের টেস্ট খেলার গড় রান ছিল ৯৯.৯৪। অন্যান্য ব্যাটসম্যান যাঁরা টেস্ট খেলায় ১৫০০ রান করেছেন তাদের মধ্যে একমাত্র গ্যারি সোবার্সের ৬৩.৭৭ এবং হার্বার্ট সাটক্লিফের ৬০.৭৩; এরাই একমাত্র ব্যাটসম্যান যাঁদের ইনিংসের গড় ষাটের বেশি। টেস্ট খেলায় রান সংগ্রহের গতির ক্ষেত্রেও ব্র্যাডম্যান ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। ছ'বার তিনি ২০০ রান বা ততোধিক করেন একদিনে এবং পাচবার ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে তিনি ১০০ বা ততোধিক করেন এক সেশনে। ওভালে ১৯৩৪ সালে টেস্ট খেলায় একদিনে তিনি বত্রিশটি চার মারেন এবং একটি ছয়।

ব্র্যাডম্যানের অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়া ১১টি টেস্টে জয়লাভ করে এবং ৩টিতে পরাজয় বরণ করে কিন্তু: কখনও 'অ্যাশেজ' হারায়নি। ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া চারটি টেস্টেই জয়লাভ করে, একটিতেও হারে নি। অধিনায়ক হিসেবে ব্র্যাডম্যান, হ্যাসেট মিলার, লিণ্ডওয়াল-এর মত প্রতিভার মিছিল নিয়ে নির্দয়ভাবে শত্রুপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে জয়ের পর জয় করে গেছেন। এই জয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ১৯৪৮ সালে লীড্স-এর মাঠে, মাত্র ১২ মিনিট সময় হাতে ব্র্যাড্ম্যান ১৭৩ রানে নট আউট হয়ে, এবং আর্থার মরিসের ১৮২ রান অস্ট্রেলিয়াকে ৩৪৪ মিনিটে ৩ উইকেটে ১০৪ রান সংগ্রহ করতে সাহায্য করে শেষ দিনে চতুর্থ ইনিংসের খেলায়।

বিশ্বজয়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অস্ট্রেলিয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ক্ষেত্রে এক সংস্কারযুক্ত সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। ঐ মহাযুদ্ধের আগে নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতের ক্ষেত্রে ক্রিকেট খেলার বিকাশের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের ভূমিকা ছিল মুখ্য। যুদ্ধের পরবর্তী কালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮৮টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। ভারত প্রথম অস্ট্রেলিয়া সফরে যায় লালা অমরনাথের নেতৃত্বে ১৯৪৭-৪৮ সালে। ১৯৪৮-৪৯ অস্ট্রেলিয়া লিণ্ডসে হ্যাসেটের অধিনায়কত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যায় এবং ১৯৫৫ সালে আয়ান জনসনের অধিনায়কত্বে প্রথম অস্ট্রেলিয়ান টীম যায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। হ্যাসেটের অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়া ১৪টি টেস্টে জয়লাভ করে এবং ৫টিতে পরাজয় বরণ করে। ব্র্যাডম্যানের নেতৃত্বে জয়ের সংখ্যা ১৫টি ও পরাজয় ৩টি। ব্র্যাডম্যানের কাছে দলের পরাজয় খুবই ভদ্র, বিনীতভাবে মেনে নেওয়ার মানসিকতা ছিল, কিন্তু হ্যাসেট স্পষ্টই বুঝিয়ে দিতেন যে তাঁর চোখে দলের পরাজয় আদৌ চরম বিপর্যয় নয়। ১৯৪৫ সালে কলকাতার ইডেন উদ্যানে এক মারমুখী দর্শকের বিক্ষোভে যখন খেলা বন্ধ হবার উপক্রম তখন হ্যাসেট উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করেন একটি সিগারেট চেয়ে। মুহূর্তে মাঠ খালি হয়ে যায় এবং খেলা শুরু হয়। মানুষ হিসেবে হ্যাসেট ঐ রকমই ছিলেন এবং তাঁর অসাধারণ রসবোধ ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার তাঁর দলের খেলোয়াড়দের প্রভাবিত করে। ১৯৪৯-৫০ সালে অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৪—০ পরাজিত করার পর পোর্ট এলিজাবেথে কীথ মিলার সমঝদার দর্শকদের মধ্যে বেল্‌সগুলি ছুঁড়ে দেন। হ্যাসেটের অধিনায়কত্বে যে এক অসাধারণ ব্যাটসম্যান খেলার সুযোগ পান তাঁর নাম নীল হার্ভে। নিউল্যাণ্ডস-এ তাঁর ১৭৮ রানের মধ্যে ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কভার ড্রাইভ, স্কোয়ার ও লেট কাটিং যা অনেকের মতে অদৃষ্টপূর্ব। হ্যাসেট অধিনায়ক হিসেবে ১৯৫০-৫২ সালেও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলায় সাফল্য লাভ করেন এবং ১৯৫১-৫২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধেও বটে। এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডকে ৩-১ পরাজিত করে ক্রিকেটের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবার স্বপ্ন দেখেছিল। ঐ খেলাতেই মিলার ও লিণ্ডওয়ালের বিরুদ্ধে তিন ভয়াবহ Wকে—(Worrell, Weekės, Walcott) বোলিং এর মাধ্যমে ভয় দেখাবার অভিযোগ আনা হয়।

১৯৪৬ থেকে ১৯৫২-র মধ্যে ব্র্যাডম্যান ও হ্যাসেট অধিনায়ক হিসেবে প্রতিভাধর বোলারদের যে সহযোগিতা পেয়েছেন তা সব অধিনায়কদেরই স্বপ্ন। হাটনের উপরোধে ১৯৫৪-৫৫ সালে যে ইংলিশ টীম অস্ট্রেলিয়া সফরে যায় সেই দলে ছিলেন পাঁচজন পেস্ বোলার। 'টাইফুন' ফ্র্যাংক টাইসনের সঙ্গে ব্রায়ান স্ট্যাথামের যে জুটি তৈরি হয় ওপেনিং বোলার হিসেবে তা বিদেশ সফররত এতাবৎ কোনো ইংলিশ টীমে দেখা যায় নি। ব্রিসবেনে ১ম টেস্টটি এক ইনিংস ও ১৫৪ রানে পরাজিত হয়ে ইংল্যাণ্ড উপর্যুপরি তিনটি ম্যাচে জয়লাভ করে দলের শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ স্থাপিত করেন।

১৯৫৮ সালে অস্ট্রেলিয়ান দলের কনিষ্ঠতম অধিনায়ক ২২ বছর বয়সী আয়ান ক্রেগ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দুটি সেঞ্চুরি ও ৩০টি উইকেট আয়ত্ত করার পর, রিচি বেনো-র হাতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দলের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁর টেস্ট ম্যাচের পরিসংখ্যান যাচাই করলে দেখা যায় তিনি অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে গণ্য। ৬৩টি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে তিনি ২৪৮টি উইকেট নেন এবং রান সংগ্রহ করেন ২২০১। এই রেকর্ডে সম্পৃক্ত হয় অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক (৬৩) "ক্যাচ" গ্রহণের কৃতিত্ব। বেনো-র অধিনায়কত্বের যুগেই নীল হার্ভে ৬১৪৯ রান করে অবসর গ্রহণ করেন—এর মধ্যে ছিল ২১টি সেঞ্চুরি (গড়ে ৪৮.৪২) ও ৭৯টি টেস্টে ৬২টি ক্যাচ। অস্ট্রেলিয়ায় অসংখ্য সুদক্ষ ফিল্ড্সম্যান এসেছেন। কিন্তু হার্ভের মত নির্ভরযোগ্য ফিলড্সম্যান দুর্লভ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় অ্যালান ডেভিডসনের যিনি ৪৫টি খেলায় ১৩২৮ রান করেন, ১৮৬টি উইকেট নেন এবং ৫৩টি 'ক্যাচ'; নির্ভরযোগ্য ওপেনিং ব্যাট্সম্যান কলিন ম্যাক্ডোনাল্ড। এছাড়া ১৯৬০-৬১ সালের বিখ্যাত ববি সিম্পসন, নরম্যান ও নীল। ১৮৯৭ থেকে ১৯৬৩ মধ্যে অস্ট্রেলিয়া নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক রেকর্ড সৃষ্টি করেন ক্রিকেটের ইতিহাসে :

প্রতিদ্বন্দ্বী	ম্যাচ	জয়	পরাজয়	ড্র	টাই
ইংল্যাণ্ড	১৮৮	৭৭	৬৪	৪৭	—
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৯	২৭	৩	৯	—
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২০	১৩	৩	—	১
ভারত	১৩	৮	১	৪	—
পাকিস্তান	৪	২	১	১	—
নিউজিল্যাণ্ড	১	১	—	—	—
	২৬৫	১২৮	৭২	৬৪	

রিচি বেনো অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর, অর্থাৎ ১৯৬৩-৬৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১ম টেস্টের পর অস্ট্রেলিয়ার টেস্টে ক্রিকেটের মান অনেক পড়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় :

প্রতিদ্বন্দ্বী	ম্যাচ	জয়	পরাজয়	ড্র
ইংল্যাণ্ড	২২	৩	৪	১৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৪	২	৮	৪
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১০	৪	৩	৩
ভারত	১২	৮	২	২
পাকিস্তান	২	—	—	২
	৬০	১৭	১৭	২৬

তথ্যাগতভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ৫২টি টেস্ট খেলায় ববি সিম্পসন ৪১৩১ রান এবং বিল লরি ৬৮টি টেস্ট খেলায় ৫২৩৪ রান (১৩টি সেঞ্চুরি) সংগ্রহ করেন। এঁরা সাম্প্রতিককালে অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সুনাম অর্জন করেছেন। একমাত্র ব্র্যাড্‌ম্যান ৫২টি টেস্টে ৬৯৯৬ ও হার্ভে ৭৯টি খেলায় ৬১৪৯ রান করে লরি ও সিম্পসনের চেয়ে বেশি রান সংগ্রহ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।

১৯৬২-৬৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১ম টেস্টে খেলায় লরি ২৬০ মিনিট ব্যাট করে ৯৮ রান সংগ্রহ করেন; পরবর্তী ১৯৬৫-৬৬ সালের টেস্টে ৪২০ মিনিটে রান করেন ১৬৬। লরি টেস্ট ম্যাচে গড়ে ঘণ্টায় ২৫ রান করতেন।

সাম্প্রতিককালের আরো দুজন উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় ডু ওয়ালটারস ও কীথ স্ট্যাকপোল। ওয়ালটারস ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় ৩২০ মিনিটে ১৫৫ রান করেন। ব্রিস্‌বেনে স্ট্যাকপোল যখন ৪৫৪ মিনিটে ২০৭ রান করেন তখন মাঠে এমন উদ্দীপনা দেখা দেয় যে সাংবাদিক বলেন স্ট্যাকপোল অস্ট্রেলিয়ার মহান পূর্বসূরীদের হাতে পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটের অতীতে দিকপালরা অধিকাংশই আক্রমণাত্মক খেলা খেলতেন এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণ ঠেকাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, ফলে তাঁরা নিজেদের বোলারদের জয়লাভের সময় ও সুযোগ দিতেন। আয়ান চ্যাপেলের অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়া তার অতীতের আক্রমণাত্মক ভঙ্গি ফিরে পাচ্ছে। চ্যাপেল, লরির স্থলে জাতীয় অধিনায়ক হিসেবে, তাঁর পিতামহ ভিক্টর রিচার্ডসনের পদাঙ্ক অনুসরণের

দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছেন। কীথ স্ট্যাকপোল, ডু ওয়াল্টারস, গ্রেগ চ্যাপেল, আয়ান চ্যাপেল এমন কয়েকজন সুদক্ষ ব্যাট্সম্যান পেয়েছেন যা তাঁর দলের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অত্যাবশ্যকীয়; উপরন্তু ডেনিস লীলী ও কেরি ও'কীকের নির্ভরযোগ্য ক্ষিপ্রগতি বোলারদের পেয়ে তিনি যে ধরনের আক্রমণাত্মক ব্যূহ রচনা করতে উদ্যত তা সফল হবে এবং অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে নতুন প্রাণ সঞ্চার ও মাধুর্য আরোপ করবে। প্রয়োজন হল পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিরোধমূলক পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং অতীতের দৃঢ় প্রত্যয়।

নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য টেস্ট রেকর্ডগুলি অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহ্যময় ক্রিকেটের পরিচয়। টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব যেসব খেলোয়াড়দের:

ডব্ল্যু. বার্ডস্লে ॥ বনাম ইংল্যাণ্ড/ওভাল/১৯০৯

এ. আর মরিস ॥ ,, ,, /অ্যাডিলেড/১৯৪৬-৪৭

ডি জি ব্র্যাডম্যান ॥ বনাম ভারত/মেলবোর্ন/১৯৪৭-৪৮

জে এ আর মোরোনে ॥ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা/জোহানেসবার্গ/১৯৪৯-৫০

আর. বি. সিম্পসন ॥ বনাম পাকিস্তান/করাচী/১৯৬৪-৬৫

কে.ডি. ওয়ালটারস ॥ বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ/সিড্নি/১৯৬৮-৬৯

টেস্টে সর্বাধিক উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব যেসব বোলারদের:

এফ. আর. স্পোফোর্থ ॥ ৯০ রানে ১৪টি/বনাম ইংল্যাণ্ড/ওভাল (১৮৮২)

সি. ভি. গ্রিমেট ॥ ১২৯ রানে ১৪টি/বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা/ অ্যাডিলেড (১৯৩১-৩২)

ফিল্ডসম্যান হিসেবে সর্বাধিক 'ক্যাচ' গ্রহণের কৃতিত্ব:

রিচি বেনো ॥ ৬৩টি টেস্টে ৬৫টি

ক্রিকেটার : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ওয়ারউইক, উইনারিজ আরমস্ট্রং (১৮৭৯-৪৭) বিশালদেহী আরমস্ট্রং অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সফল অধিনায়ক। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১০টি টেস্টে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে আপন দলকে অপরাজিত রাখেন, ৮টি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে, অপর ২টি টেস্ট অমীমাংসিত থাকে। মোট ৫৩টি টেস্ট খেলেছেন। ইংলণ্ডের মানুষ তাঁর ক্ষমতার নিদর্শন পান ১৯০২-এ সাসেক্স দলের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৭২ রানের ফুলঝুরির মধ্যে। তখন তিনি মাত্র ২৩ বছরের তরুণ। স্বদেশে ভিক্টোরিয়ার পক্ষে খেলতেন। ১৯০৫-এর সফরে তিনি ব্যাটিং-এর গড়ে স্বীয় দলের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। মোট ১৯০২ রান পান (গড় ৫০·০৫)। সমারসেটের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বোচ্চ রান ৩০৩, সেটি করতে সময় লাগে ৩১৫ মিনিট। তাঁর নেতৃত্বে ইংলণ্ড সফরে ২৯টি খেলার মধ্যে মাত্র দুটিতে তাঁর দল পরাজিত হয়। ইংলণ্ডে সাফল্যের মূলে তাঁর চাতুর্যপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত বিশেষ কার্যকরী হয়। একজন সেরা অলরাউণ্ডার ছাড়াও ক্যাপটেন হিসাবেও তিনি অনন্য। টেস্টে জোহান্সবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৫৯ রান করেন। এটি ১৯০২-০৩ সালের কথা। তবে ইংলণ্ডের বিপক্ষে সিডনিতে ১৯২০ সালের ১৫৮ রানের ইনিংস অবিস্মরণীয়। ৪৬টি সেঞ্চুরি সমেত মোট ১৬,৭৩১ রান (গড় ৪৭·১৩) পান। বোলিংয়েও তাঁর নৈপুণ্যের কথা বলা প্রয়োজন। ইংলণ্ড সফরে তিনি একাই (৪৪৩, গড় ১৬·৪৫) উইকেট লাভ করেন। নটিংহামশায়ারের বিরুদ্ধে ১৯০২-এ ৪৭ রানে ৮ উইকেট এক ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ ফসল।

উইলিয়াম, ম্যালডন উডফুল (১৮৯৭-১৯৬৫) এক সময়ে উডফুলকে বলা হত অপরাজেয় ব্যাটসম্যান। পর পর দুটি মরসুমে কোন বল তাঁর উইকেট স্পর্শ করতে পারে নি। যেবার ভিক্টোরিয়া একাদশের পক্ষে নিউ-জিল্যাণ্ড সফর করেন সেবারেও একটি ইনিংসেও বোল্ড আউট হন নি এবং ১৩টি ইনিংসের মধ্যে ৭টিতে অপরাজিত থেকে গড়ে রান করেন ১৪৮·৩৩। তিনি একজন কেতাদুরস্ত ব্যাটসম্যান ছিলেন না ঠিক, কিন্তু তাঁর রক্ষণভাগ

ছিল ত্রুটিহীন। ১৯২৪-২৫-এ ক্যানটারবেরির বিরুদ্ধে তাঁর অপরাজিত ২১২ রান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, পরবর্তী বছরে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৩৬ রান করলে তাঁকে শেষ মুহূর্তে ইংলণ্ডগামী দলভুক্ত করা হয়। এ সিদ্ধান্ত কত সঠিক হয়েছিল তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি সেই সফরে গড় ৫৭·৬৫ রানকরে ব্যাটিং-এ শীর্ষস্থান দখল করেন। টেস্টে তাঁর গড় রান ছিল ৫১·০০। এসেক্সের বিরুদ্ধে তাঁর ২০১ টেস্ট সফরে অস্ট্রেলিয়া দলের কোন খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান। ১৯৩০-এর ইংলণ্ড সফরে তাঁর রানের গড় হয় ৫৭.৩৬ এবং সর্বোচ্চ রান কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ২১৬। ১৯৩৪-এর সফরে গড় রান ৫২.৮৩। সর্বোচ্চ গ্ল্যামারগনের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২২৮। ১৯২৮-২৯-এ ব্রিসবেন টেস্ট তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন। লারউড, হোয়াইট, টেট প্রভৃতি বিখ্যাত বোলারদের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া ৬৬ রানে সকলে আউট হয়ে গেলেও উডফুল ৩০ রানে অপরাজিত থাকেন। ৩৫টি টেস্টে তাঁর রানের গড় ৪৬.০০। মেলবোর্নে ১৯৩১-৩২এ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৬১ তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ টেস্ট স্কোর। ২৫টি টেস্টে অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। বিতর্কিত বডি লাইন সিরিজ ছাড়া আর কোনবার পরাজিত হন নি।

উইলিয়াম, জোসেফ ওরেলি (১৯০৫—) 'টাইগার' নামে ক্রীড়ামোদী মহলে খ্যাত এই মিডিয়াম পেস লেকব্রেক গুগলি বোলারটিকে খেলা খুব সহজসাধ্য ছিল না। তিনি পেসে বিভিন্ন রকমফের ঘটাতে পারতেন, ফলে হতচকিত ব্যাটসম্যানেরা অনেক সময়ে কিছু বোঝার আগেই আউট হতেন। ২৭টি টেস্ট ম্যাচে তিনি খেলেছেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩৪-এ নটিংহামের একটি টেস্টে ৭৫ রানে ৪ উইকেট, ৫৪ রানে ৭টি উইকেট দখল করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ঐ সিরিজে গড় ২৪.৯২ রানে তিনি ২৮টি উইকেট লাভ করেন। ঐ সফরে টনটোনে সমারসেটের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ৩৮ রানে ৯টি উইকেট দখল করেন। ১৯২৭ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলে তিনি ১৭ রানেরও কম গড়ে মোট ৭৭৪টি উইকেট দখল করেন।

ওয়াল্টার্স, কেভিন ডগলাস (১৯৪৫—) মিডিয়াম পেস বোলার, এবং. ব্যাটসম্যান ওয়াল্টার্স কিন্তু দীর্ঘ দিন টেস্ট খেলতে পারেন নি। তিনি তিনবার ইংলণ্ড সফর করেছেন। সেখানে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ স্বাক্ষর রাখতে পারেন নি তবু কয়েকটি খেলার স্মৃতি সহজে মুছে যাবে না। ১৯৭৩-৭৪

সালে অকল্যাণ্ডে অস্ট্রেলিয়া দল ভারী মুশকিলে পড়েছিল ৩৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে। সে সময় পঞ্চম উইকেটে খেলতে নেমে ওয়াল্টার্স ৯৯ মিনিটে অর্ধশত রান ও ১৫৮ মিনিটে শত রান পূর্ণ করেন। সে ইনিংসে মাত্র তিনজন দু অঙ্কের রানে পৌঁছতে পেরেছিল। তিনি ছিলেন নিউ সাউথ ওয়েলসের খেলোয়াড়। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে তিনি ২৫৩ রান করেন ও ৬৩ রানে ৭ উইকেট দখল করেন। ১৯৬৮-৬৯-এ সিডনীতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্টে ২৪২ ও ১০৩ রানের দুটি ইনিংস গড়ে রেকর্ড করছেন। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে ডবল সেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরির অধিকারী।

কেলী, জেমস জোসেফ (১৮৬৭-১৯৩৮) অস্ট্রেলিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ উইকেট-রক্ষক জোসেফ কেলী মাত্র দশ বছরের জন্য ক্রিকেট আসরে হাজির ছিলেন। তিনি ১৮৯৪-৯৫-এ খেলা শুরু করে ১৯০৫-এ অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ৩৬টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন এবং ৬৩ জনকে প্যাভিলিয়ানে পাঠিয়ে দিয়েছেন ৪৩টি 'ক্যাচ' ও ২০টি 'স্টাম্পে'র আঘাতে। ১৯০১-০২ সিরিজের চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ডের ৮ জন ব্যাটসম্যানকে তিনি 'ক্যাচ' করেন। ব্যাটসম্যান হিসাবে তাঁকে সফল হতে দেখা যায়। ১৮৯৯-এ ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে করেন ১৯৩, ১৯০৫-এ তিনি ও লেভার শেষ উইকেটে ১১২ রান যোগ করেন যার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত দান ৭৪।

কিপ্যাক্স, অ্যালান এফ. (১৭৯৭-১৯৭২) নিউ সাউথ ওয়েলসের এই খেলোয়াড়টি এম. সি. সি. দলের বিরুদ্ধে ১৯২৪-২৫ সফরের সময় অপরাজিত ৮২ রান করে শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলভুক্ত হন। তারপর তিনি আরও ৩১টি টেস্ট খেলেন। নিজ রাজ্য নিউ সাউথ ওয়েলসের পক্ষে কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৩১৫ তাঁর সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর। ৬ ঘণ্টা ২৮ মিনিটে ৪১টি বাউণ্ডারির সাহায্যে তিনি ঐ রান করেন। শেষ উইকেট জুটিতে জে. ই. হুকারের সহযোগিতায় ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ১৯২৮-২৯ সালে মেলবোর্ন মাঠে তাঁর ৩০৭ রান আজও বিশ্ব রেকর্ড, ঐ রানের মধ্যে তাঁর রান ছিল ২৪০। তিনি দ্রুত রান তুলতেন এবং আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে খেলতেন; ৪৩টি সেঞ্চুরি করেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে তাঁর রানের গড় ৭৫·৬৯।

গিফিন, জর্জ (১৮৫৯-২৭) জর্জ গিফিন তাঁর সময়ের একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য চৌখস ক্রিকেটার। তিনি ছিলেন মিডিয়াম পেস বোলার, এবং চিত্তাকর্ষক ছিল ব্যাটিং ভঙ্গী। পাঁচবার তিনি ইংলণ্ড সফর করেন, তার ভেতরে তিনবার ১০০ উইকেট ও ১০০০ রানের অধিকারী হয়ে ডাবল পান। তবে অল-রাউণ্ডার হিসাবে তাঁর সেরা সাফল্য ভিক্টোরিয়া দলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ১৮৯১-৯২-এ এডিলেডে। ঐ খেলায় তিনি ২৭১ রান করেন এবং ১৬৬ রানের বিনিময়ে ১৬টি উইকেট পান। অস্ট্রেলিয়া একাদশের পক্ষে ১৮৮৩-৮৪-তে অবশিষ্ট দলের ইনিংসের ১০টি উইকেট তিনি ৬৬ রানে দখল করে নেন। ১৮৮৫-৮৬তে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে তাঁর ঝুলিতে ১৭টি উইকেট জমা পড়ে। তিনি মোট ৩১টি টেস্ট ম্যাচ খেলেন। তার সবগুলিই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। ১৮৯৪-৯৫-এ সিডনী টেস্টে তিনি ১৬১ ও ৪১ রান করেন এবং ৭৫ রানে ৪ ও ১৬৪ রানে ৪ উইকেট লাভ করেন। সেই টেস্ট সিরিজে তিনি মোট ৪৭৫ রান (গড় ৫২.৭৭) ও ৩৪ উইকেট (গড় ২৪ ১১) দখল করেন। গিফিন ৪টি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্ব করেন। টেস্টে তাঁর মোট রান ১২৩৮ (গড় ২৩ ৩৫) ও উইকেট ১০৩ (গড় ২৭.০৯)।

গ্রিমেট, ক্লারেন্স ভিক্টর (১৮৯১—) দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ে অস্ট্রেলিয়ার সেরা লেগব্রেক বোলার গ্রিমেট নিউজিল্যাণ্ডে জন্মেছিলেন। খেলেছেন ভিক্টোরিয়া ও দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলে, ১৯২৪-২৫ সালে সিডনীতে সে টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম খেলায় দারুণ রোমাঞ্চ সৃষ্টি হয়। তিনি প্রথম ইনিংসে ৪৫ রানে ৫ উইকেট পান। দ্বিতীয় ইনিংসে পান ৬টি উইকেট ৩৭ রানের বিনিময়ে। ফলে তিনি সেবারের সেরা বোলার হিসাবে স্বীকৃত হন উইকেট-পিছু ৭.৪৫ রান দিয়ে। ইংলণ্ড সফরেও তাঁর বোলিং এমনি ভয়ঙ্কর ছিল। ১৯২৬-এর জুলাইয়ে লীডস্ টেস্টে তিনি ৮৮ রানে ৫ ও ৫৯ রানে ২ উইকেটে দখল করেন। এ সফরের শেষেও তিনি বোলিং-এ অস্ট্রেলিয়া দলে শীর্ষস্থান দখল করেন। ৩৭টি টেস্ট খেলে গ্রিমেট ২১৬টি (গড় ২৪.২১ রানে) উইকেট দখল করেন। আজ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় কেবলমাত্র লিণ্ডওয়াল, ম্যাকেঞ্জি ও রিচি বেনো ঐ কৃতিত্বকে অতিক্রম করতে পেরেছেন।

গ্রেগরী, জ্যাক মরিসন (১৮৯৫-১৯৭৩) গ্রেগরী পরিবার অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-জগতের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জ্যাক মরিসন সেই পরিবারের

সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার। ছ-ফুট দীর্ঘ এই খেলোয়াড়টি যেমন জোরালো ড্রাইভ মারতেন তেমন ভয়ঙ্কর দ্রুত বল করতেন। স্লিপ অঞ্চলে তাঁর ফিল্ডিংও ছিল চমৎকার। ১৯২০-২১ সিডনী টেস্টে তিনি ইংল্যাণ্ডের ছ-জন ব্যাটসম্যানকে ক্যাচ করেছিলেন। ২৪টি টেস্টে তাঁর মোট রান ১১৪৬। তাঁর পাওয়া উইকেটের সংখ্যা ৮৫। ১৯২০-২১-এ ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম সিরিজে তিনি অলরাউণ্ডার হিসাবে সার্থক হন। দ্বিতীয় টেস্টে তিনি এক ইনিংসে ১০৫ রান করেন ও ৬৯ রানে ৭টি ও ৩২ রানে ১টি উইকেট দখল করেন। তৃতীয় টেস্টে তাঁর রান হয় ১০ ও অপরাজিত ৭৮। উইকেট পান ১০৮ রানে ২ ও ৫০ রানে ৩ উইকেট। চতুর্থ টেস্টে তাঁর রানসংখ্যা ৭৭ ও অপরাজিত ৭৬। উইকেট পান ৬১ রানে ১। শেষ টেস্টে এক ইনিংসে রান করেন ৯৩। উইকেট পান ৭৯ রানে ৩। ঐ ম্যাচেই ৬টি ক্যাচ লুফেছিলেন।

গ্রেগরী, সিডনী এডওয়ার্ড (১৮৭০-১৯২৯) কেতাবী ভঙ্গীতে ব্যাট-চালনায় পটু ছিলেন এডওয়ার্ড গ্রেগরী। ব্যাটিং-এ বিভিন্ন মারে তিনি পারদর্শী, বিশেষত হুকে। মোট ৫৮টি টেস্টে তিনি খেলেছেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম খেলেছেন ১৮৯১-৯২এ। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ খেলেছেন ১৯১২-য় ত্রিদলীয় প্রতিযোগিতায়। ১৯১২ সিরিজের ৬টি খেলায় তিনিই অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ছিলেন। কভার পয়েণ্টে নিপুণ ফিল্ডিং-এর জন্যে তাঁর খ্যাতি ছিল। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেই তাঁর টেস্টে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ২০১ হয় সিডনীতে, ১৮৯৪-৯৫এ। ১৯০৯-এ ওভালে ডব্লু ব্রাডস্লের সহযোগিতায় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম উইকেট জুটির রেকর্ড রান করেন—১৩৫ মিনিটে তাঁরা ১৮০ রান সংগ্রহ করেন।

চ্যাপেল, আয়ান মাইকেল (১৯৪৩—) তিন চ্যাপেল ভায়ের জ্যেষ্ঠ। ১৯৬৪-তে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে প্রথম টেস্ট খেলা। ১৯৭০-৭১ সিরিজে বিল লরির কাছ থেকে অধিনায়কের দায়িত্বভার নিয়ে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অ্যাসেজের লড়াই পরিচালনা করেন। তাঁর নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া ৩০টি টেস্টে খেলে ১৫টিতে জয়লাভ করে। ৭২টি টেস্টে তিনি ৫,১৮৭ রান (গড় ৪২.৮৬) করেন। তার ভেতর ১৪টি 'শতরান' ছিল। টেস্ট ম্যাচে সর্বাধিক রান ১৯৬ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এডিলেডে ১৯৭২-৭৩এ।

তিনি একজন দক্ষ লেগস্পিন ও গুগলি বোলার ছিলেন। রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে একটি ম্যাচে ৫৩ রানে ৫টি উইকেট পেয়েছিলেন।

চ্যাপেল, গ্রেগরী স্টিফেন (১৯৪৮—) একজন দক্ষ ব্যাটসম্যান, মিডিয়াম পেস বোলার এবং চমৎকার ফিল্ডার চ্যাপেল জাত অলরাউণ্ডার। ১৯৭৪-৭৫-এর টেস্ট সিরিজে তিনি ১৪টি ক্যাচ ধরেন। ঐ সিরিজে পার্থে অনুষ্ঠিত টেস্টে ৭টি ক্যাচ ধরে এক অসাধারণ রেকর্ড স্থাপন করেন। উইকেট-রক্ষক নন অমন একজন ফিল্ডারের পক্ষে এক ম্যাচে এতগুলি ক্যাচ ধরার দ্বিতীয় কোন নজির নেই। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে পার্থ টেস্টে প্রথম আত্মপ্রকাশে তিনি সেঞ্চুরি (১০৮ রান) করেন। ১৯৬৬-৬৭-তে দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন। সমারসেটের পক্ষে ১৯৬৮ ও ৬৯-এ যথাক্রমে ১১৬৩ ও ১৩৩০ করেন। ১৯৭১-৭২-এ অস্ট্রেলিয়া বনাম অবশিষ্ট বিশ্ব একাদশের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং-এ শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৯৭২-এ লর্ডসের টেস্টে একটি রোমাঞ্চকর সেঞ্চুরি করেন। সে সফরেও তিনি রানের গড়ে (৭০.০০) দলের সেরা হন। ১৯৭৩-এ কুইন্সল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক হন।

১৯৭৫-৭৬-এ অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক মনোনীত হন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে সেবারে ব্যাটিং-এ শীর্ষস্থান (গড় ১১৭ রান) অধিকার করেন। মাত্র ৩৮টি টেস্টে তাঁর ৩০০০ রান পূর্ণ হয়।

পিটার জন পারসেল বর্গ (১৯৩২—) ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার লড়াইয়ে ১৯৬৪-তে হেডিংলে টেস্টে যিনি ১৬০ রান তুলে অস্ট্রেলিয়াকে জয়ের পথে পৌঁছে দেন তিনি পিটার বর্গ। সে ইনিংসে তাঁর হুক, কাট ও ড্রাইভের মধ্যে প্রথমশ্রেণীর ব্যাটসম্যানের সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠছিল। বার্গ কুইন্সল্যাণ্ড দলের খেলোয়াড়। ১৯৫২-৫৩ থেকে ঐ দলে খেলছেন। ১৯৬৮-তে অবসর গ্রহণের আগে ঐ দলেরই অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৬৩-তে নিউ সাউথ ওয়েলেসের বিরুদ্ধে ব্রিসবেনে ২৮৩ রান করে কুইন্সল্যাণ্ডের পক্ষে চারটি রেকর্ড করেছেন। ৪২টি টেস্টে খেলে তিনি ২২৯০ রান করেছেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বোচ্চ টেস্ট রান ১৮১, ১৯৬১-তে ওভালে ট্রুম্যান ও স্ট্যাথামের চরম প্রাধান্যের দিনে তাঁদের বলের ধার ভোঁতা করে সে রান সংগ্রহ করা হয়।

জনসন, আয়ান উইলিয়াম (১৯১৮—) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সেরা অলরাউণ্ডার। আয়ান জনসন যদিও ১৯৩৫-৩৬এ ভিক্টোরিয়ার পক্ষে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রবেশ করেন, তথাপি ১৯৪৬-এর আগে টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পান নি। ডানহাতি ব্যাটস্‌ম্যান, অফব্রেক বোলার এবং চমৎকার স্লিপ ফিল্ডার জনসন ৪৫টি টেস্ট খেলেছেন ; তার মধ্যে ১৭টিতে অধিনায়ক। টেস্টে হাজারের বেশি রান করেছেন এবং ১১৯টি উইকেট পেয়েছেন। তাঁর সফল বোলিং ১৯৪৮-এ লিসেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে ৪২ রানে ৭ উইকেট লাভে। সেবারে ইংলণ্ড সফরে গড় ১৮·৩৭ রানে তিনি ৮৫টি উইকেট পান। কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মেলবোর্নে তাঁর সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ১৩২।

জনস্টন, উইলিয়াম আরাস (১৯২২—) এই মিডিয়াম ফাস্ট বাঁহাতি বোলারটি ১৯৪৫-৪৬এ ভিক্টোরিয়ার পক্ষে প্রথম খেলতে আসেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে সফররত ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে টেস্টে প্রথম খেলতে এসে তাদের ধস নামিয়ে দেন। ৪টি টেস্টে তিনি ১৬টি উইকেট পান গড় ১১.৩৭ রানের বিনিময়ে। ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে খেলায় যখন সফরকারী দলের প্রথম ৩টি উইকেট ফেলে দেন তখনও খাতায় তাদের নামে কোন রান ওঠেনি। ১৯৪৮–এ ইংলাণ্ড সফরে ৫টি টেস্ট খেলেন এবং ২৭টি উইকেট (গড় ২৩ ৩৩ রানে) পান। ১৯৫৩-র সফরে তিনি সার্থকতা অর্জন করতে পারেন নি। মাত্র ৭টি উইকেট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তিনি মোট ৪০টি টেস্ট খেলে ১৬০টি উইকেট (গড় ২৩.৯০ রানে) পেয়েছেন। ১৯৪৮–এ ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে খেলায় বেডফোর্ডে তিনি ১৮ রানে ৬ ও ২২ রানে ৪ উইকেট দখল করেন। জনস্টন ব্যাটসম্যান না হয়েও ১৯৫৩-র ইংলণ্ড সফরে ব্যাটিং-এর গড় হিসাবে শীর্ষস্থান দখল করেন। সেবারে তাঁর গড় রান ছিল ১০২। ১৭ ইনিংস খেলে তিনি ১৬টি ইনিংসেই অপরাজিত ছিলেন।

ট্যালন, ডোনাল্ড (১৯১৬—) ডোনাল্ড ট্যালন অস্ট্রেলিয়ার উইকেট-কীপার। বার্নেটের পরে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে আসেন এবং প্রথম সিরিজেই ১৯৪৬-৪৭এ চমক সৃষ্টি করেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ঐ সিরিজে তিনি ২০ জনকে আউট করে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ট্যালন আরও আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় হাজির হতে পারতেন ; কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের

কারণে প্রথম যৌবনের দিনগুলো টেস্ট খেলায় লাগানো যায় নি। ১৯৩৮-৩৯ সাল তাঁর চরম সফল মরসুম, ঐ বছরে একটি খেলায় ১২ জনকে খতম করে ৬৪ বছরের পুরনো রেকর্ড স্পর্শ করেন। ঐ বছরের একই মরসুমে এক ইনিংসে ৭ জনকে আউট করে আরেকটি বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করেন। প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দায়িত্ব সহকারে ব্যাট করতেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৪৬-৪৭-এর মেলবোর্ন টেস্টের উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ ম্যাচে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অষ্টম উইকেট খেলতে নেমে ট্যালন ৯২ রান করেন। তিনি মোট ২১টি টেস্ট খেলেছিলেন।

ভিক্টর টমাস ট্রাম্পার (১৮৭৭-১৯১৫) ক্রিকেটের রাজকুমার অস্ট্রেলিয়ার সেরা ব্যাটসম্যান ভিক্টর ট্রাম্পার প্রবাদপুরুষ। অস্ট্রেলিয়ার মানুষের কাছে তিনি সর্বাধিক জনপ্রিয়, এমন কি ডন ব্র্যাডম্যানের চাইতেও বড় ব্যাটসম্যান হিসেবে পরিচিত। স্কুলের খেলার সময়ে তাঁর ব্যাটিং-দক্ষতা এমন পর্যায়ে ওঠে যে স্কুল দলে তাঁর যোগদান নিষিদ্ধ হয়। বলা হয়, তাঁকে আউট করার মতো বোলার স্কুলের মাঠে পাওয়া যায় না। তাঁর টেস্ট জীবন ১৮৯৯ থেকে ১৯১১। এই সময়ে তিনি ৪৮টি টেস্ট খেলেছেন। তাঁর টেস্টে রানের সংখ্যা হচ্ছে ৩১৬৪ (গড় ৩৯·০৬)। কিন্তু এই রানের খতিয়ানে তাঁর প্রতিভার পরিমাপ পাওয়া যায় না। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়—তাঁর খেলায় ছিল কবিতার ছন্দ, ছিল সংগীতের গভীর মূর্ছনা,…ছিল বিচিত্র ভঙ্গী, তা যেমন বিশ্বস্ত কেতাবী আবার তেমনি কেতা-বিরোধী সম্পূর্ণ আপন ঘরানা, ট্রাম্পারের তুলনা ট্রাম্পারই। ১৮৯৯-এ সাসেক্সের বিরুদ্ধে একটি খেলায় তিনি অপরাজিত ৩০০ রান করেন। এটাই তাঁর সর্বাধিক রানের ইনিংস; কিন্তু তিনি স্বল্পতর রানের অনেক ইনিংস গড়েছেন যাতে তাঁর তুলনাহীন ব্যাটিং-নৈপুণ্য বিচ্ছুরিত হয়েছে; সিডনীতে এক ইনিংসে মাত্র ৫৭ মিনিটে তাঁর সেঞ্চুরির কথা কজন ভুলতে পেরেছে? কিংবা নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ২ ঘণ্টা ১১ মিনিটে ২০০ রান করা বা ১৯০৫-এ ব্রিস্টলে মধ্যাহ্ন-বিরতির আগেই ১০৮ রান করার কথা?

১৯০২ সালে ইংলণ্ডে তাঁর সেরা খেলা দেখা যায়। সেই সময়ে তিনি ১১টি সেঞ্চুরি করেন, তার মধ্যে এসেক্সের বিরুদ্ধে দু'ইনিংসে সেঞ্চুরিও রয়েছে। কোন ইনিংসেই তিনি ব্যর্থ হন নি। মোট রান করেন ২৫৭০ (গড় ৪৮·৪৯)।

ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে তিনি ডাফের সহযোগিতায় প্রথম উইকেটে ১৩৫ রান করেন। মধ্যাহ্নভোজের আগে রান ওঠে এক উইকেটে ১৭৩। তারপর খেলা শুরু হলে ১০৪ রানে ট্রাম্পার উইকেট-রক্ষকের হাতে ধরা পড়েন। এই টেস্টের কথা প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ট্রাম্বল, হ্যগ (১৮৬৭-১৯৩৮) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার যে বোলারটি সর্বাধিক টেস্ট উইকেট নিয়েছেন তাঁর নাম হ্যগ ট্রাম্বল। মাত্র ৩১টি টেস্ট খেলেই ইংলণ্ডের ১৪১টি উইকেট (গড় ২০·৮৮ রানে) তাঁর ঝুলিতে জমা পড়েছে। ট্রাম্বল টেস্টে তুবার হ্যাটট্রিক করেছেন। হ্যাটট্রিক করেছেন গ্লৌসেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধেও। ১৯০২-এ ওভাল টেস্টে তাঁর সেরা খেলা। একটানা বল করে তিনি ৬৫ রানে ৮ ও ১০৮-রানে ৪টি উইকেট পান। ছ ফুট তিন ইঞ্চি দীর্ঘ মানুষটি স্লো-মিডিয়াম বল করতে কিছুটা বাড়তি সুবিধা পেতেন। ১৮৯০ থেকে ১৯০২-এর মধ্যে পাচবার ইংলণ্ড সফর করে ট্রাম্বল ৬০৬টি উইকেট পান গড় ১৬·৬৮ রানের বিনিময়ে। ব্যাটিংয়েও তিনি নেহাত খেলো ছিলেন না। তাঁর রক্ষণভাগ বেশ ভালো ছিল। ১৮৯৮তে মেলবোর্ন টেস্টে সি হিলের সহযোগিতায় সপ্তম উইকেটে ১৬৫ রান করেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। শ্লিপ অঞ্চলের ফিল্ডার হিসাবে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় তাঁর ক্যাচ ধরার খতিয়ানে। তিনি টেস্টে ৪৫টি ক্যাচ ধরেছেন।

ডার্লিং, জোসেফ (১৮৭০-১৯৪৮) মাত্র ১৪ বছর বয়সে সেণ্ট পিটার্স কলেজের ৪৭০ রানের ইনিংসে জোসেফ ডার্লিং-এর রানসংখ্যা ছিল ২৫২। খেলাটি এডিলেডে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবু তাঁর পেশার জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলার জন্যে তাঁকে দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। পরের বছরে ১৮৯৪ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় নির্বাচিত হন, পরে ইংলণ্ডে যে চারবার সফরে যান তার মধ্যে তিনবারই ডার্লিং ছিলেন অধিনায়ক। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও তিনি ৩টি টেস্ট খেলেছেন। ১৮৯৪-১৯০৫ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে তিনি ৩৪টি টেষ্ট ম্যাচে গোড়া পত্তন করেছেন। তার মধ্যে ২১টিতে তিনি ছিলেন অধিনায়ক। ১৮৯৬ সালে লিসেস্টারে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৪ তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর।

নোব্‌ল, মণ্টেগু আলফ্রেড (১৮৭৩-১৯৪০) টেস্ট ক্রিকেটে যাঁরা অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেছেন তাঁদের মধ্যে গুটিকয় অলরাউণ্ডারের মধ্যে

অন্যতম হলেন নোব্‌ল্‌। মাপা লেংথে মিডিয়াম ফাস্ট বল করতেন। দারুণ ব্যাট করতেন, অসাধারণ ডিফেন্স ছিল তাঁর। প্রয়োজনবোধে রানের ঝড় তুলতেন। তাঁর রক্ষণাত্মক ব্যাটিংএর নজির হিসাবে ম্যাঞ্চেস্টারে ১৮৯৯এর একটি ইনিংসের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই ম্যাচে ৫ ঘণ্টা ২০ মিনিটে মাত্র ৮৯ রান করেন। ১৯০৫ সালে সাসেক্সের বিরুদ্ধে একটি খেলায় এই নোব্‌ল্‌ই ৫ ঘণ্টায় ব্যক্তিগত ২৬৭ রান করেছিলেন। জীবনে ৪২টি টেস্ট খেলেছেন, তার মধ্যে ১৫টিতে অধিনায়ক। স্থির মস্তিষ্কের অধিনায়ক হিসাবে নোবল্‌ অত্যন্ত সফল। তিনি যেন জয়ের জন্যেই খেলতেন এবং জয়লাভের আনন্দের সঙ্গে আর কোন কিছুই তুলনায় নয়। প্রথম শ্রেণীর খেলায় তিনি ১৪০৩৪ (গড় ৪০·৮০) রান করেছেন।

পন্‌স্‌ফোর্ড, উইলিয়াম হ্যারল্ড (১৯০০) পন্‌স্‌ফোর্ড ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান। শুধু নির্ভরশীল নন, আকর্ষণীয়ও। ১৯২২-২৩এ তিনি রেকর্ড রান করে সংবাদপত্রের শিরোনাম হন। ভিক্টোরিয়া দলের হয়ে মেলবোর্ন মাঠে তাসমানিয়ার বিরুদ্ধে ৪২৯ রান করেন। ঐ মাঠে ১৯২৭-২৮ সালে তিনি পুনরায় ৪৩৭ রান করেন। এবারে কুইন্সল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে। আজ পর্যন্ত পন্‌স্‌ফোর্ডই একমাত্র ব্যাটসম্যান যিনি এক ইনিংসে চারশতাধিক রান দু দফায় করতে পেরেছেন। ১৯২৪-২৫এ সিডনীতে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে খেলতে এসেই ১১০ রান করেন। পরে দুটি ইংলণ্ড সফরকালে পূর্ণ শক্তিতে ব্যাট করতে তাঁকে দেখা যায় নি। শেষ সফর ১৯৩৪-এ। সেই সফরে তিমি ঝলসে উঠেছিলেন। চতুর্থ টেস্টে লীডসে তিনি ১৮১ রান করার পর হিট উইকেট করে আউট হন। ওভালের শেষ টেস্টেও তিনি অসাধারণ ইনিংস খেলে ২৬৬ রান করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে এবারেও হিট উইকেট করে আউট হন। ঐ ম্যাচে তিনি ডন ব্র্যাডম্যানের সহযোগিতায় দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে রেকর্ড রান করেন ৪৫১। ১৯৩৪ সিরিজে পন্‌স্‌ফোর্ডের টেস্ট রানের গড় দাঁড়ায় ৯৪·৮৩। তিনি মোট ২৯টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। রান করেছেন ২১২২ (গড় ৪৮·২২)। প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁর গড় রান ৬৫। ই. আর. মাইসের সহযোগিতায় কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভিক্টোরিয়ার পক্ষে প্রথম উইকেট জুটিতে করেন ৪৫৬ রান। এই রেকর্ডটি আজও অস্ট্রেলিয়ায় ভাঙা যায় নি। এস, জে, ম্যাস্‌কারের সহযোগিতায়

তৃতীয় উইকেট জুটিতে করেন ৩৮৯ রান। অস্ট্রেলিয়া বনাম এম. সি. সির খেলায় লর্ডস মাঠে এই রান করেন ১৯৩৪-এর সফরে। এটিও একটি রেকর্ড। ৩৮৯ রানের মধ্যে তার ব্যক্তিগত স্কোর ছিল অপরাজিত ২৮১। এম. সি. সির বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানের পক্ষে এটি সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর। অবশ্য টেস্ট ম্যাচে এর চেয়ে বেশি রানের নজির আছে।

বেনো, রিচি (১৯৩০—) নিউ সাউথ ওয়েলস-এর এই ক্রিকেটারটি ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রথম শ্রেণীর খেলায় আত্মপ্রকাশ করে দু-একটি খেলার পরই দুর্ভাগ্যক্রমে মুখে আঘাত পেয়ে কিছুদিন খেলার আসর থেকে সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণ করেন। পরের বছরে আবার পিচে ফিরে এসে জোরালো আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে ব্যাট চালনা করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি দারুণ ড্রাইভ করতেন। ব্যাট করা ছাড়াও তিনি ডান হাতে লেগব্রেগ ও গুগলি বল করতেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলতে নামেন ১৯৫১-৫২-য়। ১৯৫২-৫৩-য় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলার পর ১৯৫৩-য় ইংলণ্ড সফরে নির্বাচিত হন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কিংস্টন টেস্টে তিনি ৭৮ মিনিটে ১০০ রান পূর্ণ করেন। ১৯৫৭-৫৮-য় দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তিনি দলের সফলতম বোলার। সেবারে গড়ে ১৯.৪০ রানের বিনিময়ে তিনি ১০৪টি উইকেট লাভ করেন। ১৯৫৮-৫৯-এ ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে টেস্টে অধিনায়ক নির্বাচিত হন। সেই রবারের লড়াইয়ে তিনি বোলার ও অধিনায়ক —দুটি ভূমিকায় সফল হন। তিনি দু দলের বোলারদের মধ্যে সর্বাধিক ৩১টি উইকেট (গড়ে ১৮.৮৩) পান। মেলবোর্নে ইংলণ্ড দলকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠিয়ে পরাজিত করেন। পরবর্তী বছরে ভারত-পাকিস্তান সফরেও যথারীতি সফল হন। সেবারে তাঁর ঝুলিতে জমা পড়ে ৪১টি উইকেট (গড় ১৮ রানে)। পরবর্তী বছরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে রবার জয়ের সফল লড়াইয়ে তিনিই অস্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্ব করেন। পরবর্তী বছরে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যে নেতৃত্ব দেন তাতে যোগ্য অধিনায়কের শৌর্য, বিজ্ঞতা, প্রাণিত করার ক্ষমতা বিশেষ রূপে প্রকাশ পায়। রিচি বেনো মোট ৬৩টি টেস্ট খেলেছেন; তার মধ্যে ২৮টিতে অধিনায়ক। কোন টেস্ট সিরিজে তিনি পরাজিত হন নি। টেস্ট উইকেট লাভ করেছেন ২৪৮ (গড় ২৭.০৩ রানে)।

বোসাঙ্কোয়েট, বার্ণার্ড জেমস টিণ্ডাল (১৮৭৭-১৯৩৬) গুগলি বলের আবিষ্কারক হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে বটে, তবে তিনি একজন চমৎকার ব্যাটসম্যানও। ১৯০২-০৩-এ ওয়ার্নারের দলে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সফরের সময়ে তাঁর গুগলি বলে ভিক্টর ট্রাম্পার বোল্ড আউট হয়ে যান। সেই সফরে কোনও টেস্ট খেলা হয় নি; তবে সে বছর ও পরবর্তী ১৯০৩-০৪-এর অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় তিনি বোলিং-এ বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। সিডনীতে চতুর্থ টেস্টে বস্তুত তার জন্যেই ইংলণ্ড অ্যাশেজ জয়ে সক্ষম হয়। বোসাঙ্কোয়েট দ্বিতীয় ইনিংসে ৫১ রানে ৬টি উইকেট লাভ করেন। ১৮৯৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলে প্রথম খেলেন। পরে ১৮৯৯-১৯১৯ দীর্ঘকাল মিডলসেক্স দলের পক্ষে খেলেন। কাউন্টি ম্যাচে দুবার শতাধিক রান করার কৃতিত্ব তাঁর আছে।

ব্র্যাডম্যান, স্যার ডোনাল্ড জর্জ (১৯০৮—) যতকাল ক্রিকেট খেলা চলবে, ডন ব্র্যাডম্যানের নাম ততকালই উচ্চারিত হবে। ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন শক্তিধর পুরুষ আর আসেন নি। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কেবল ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যবসায়ের ফলে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারে পরিণত হয়েছেন। তাঁর খেলার প্রকরণগত বিন্যাস কেতাবী না হলেও তিনি ছিলেন রান উৎপাদনের যন্ত্রবিশেষ। তাঁর মেজাজ ছিল স্থির, ধৈর্য ছিল অসীম, রান সংগ্রহের বাসনা ছিল তীব্র, তাঁর প্রতিভা ছিল সন্দেহাতীত। তিনি খেলায় রান ছাড়া আর কিছুই বুঝতে চাইতেন না; নির্দয়ভাবে বোলারকে হত্যা করে চলতেন; জয় সহজ ও করায়ত্ত হলেও রানের ইচ্ছায় ভাঁটা পড়ত না। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিনি নিউ সাউথ ওয়েলস দলের পক্ষে খেলেছেন, দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত খেলে তিনি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের ক্রিকেটে ডা. ডব্লু. জি. গ্রেস্যের যে ভূমিকা অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ডের সেই ভূমিকা। ১৯ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে নেমেই তিনি সেঞ্চুরি করেন। পরের বছরেই নিউ সাউথ ওয়েলসের পক্ষে খেলে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে অপরাজিত ৩৪০ রানের একটি রেকর্ড করেন। যখন তিনি ১৯৪৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন তখন ১২৭টি সেঞ্চুরি নিয়ে তাঁর রান ২৮,০৬৭; যার গড় ৯৫·১৪—ক্রিকেটের ইতিহাসে বিরল। তিনি ৩৭ ইনিংসে দ্বিশতাধিক রান করেছেন। ৩০০র কোঠা পার করেছেন ছয়বার। তাঁর সর্বোচ্চ রান ৪৫২। সে ক্ষেত্রেও অপরাজিত। খেলাটি কুইন্সল্যাণ্ডের

বিরুদ্ধে সিডনীতে ১৯২৯-৩০ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। টেস্টে সর্বাধিক রান ৩৩৪ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩০-এ লীডস মাঠে। ইংলণ্ডে চারবার তিনি সফর করেছেন, সেখানে তাঁর রানের গড় ৯৬'৪৪। ১৯৩০-এ ইংলণ্ড সফরে তাঁর মোট রান হয় ২৯৬০; বলা বাহুল্য, এটি অস্ট্রেলিয়া দলে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। ১৯২৮-২৯এ স্বদেশে ১৬৯০ রানও শীর্ষস্থান অধিকারের পরিচায়ক। শেফিল্ড শীল্ডের ম্যাচে তিনি মোট ৮৯২৬ রান করেন যার গড় হচ্ছে ১০৮'৮৫। তিনি মাত্র ৫২টি টেস্ট খেলেছেন যার ভেতরে ২৪টি টেস্টে অধিনায়ক। যে ৫টি সিরিজে তিনি দল পরিচালন করেছেন তার কোনটিতেই পরাজিত হন নি। তাঁর টেস্ট ম্যাচের মোট সংগ্রহ ৬৯৯৬ রান। ১৯৪৮ সালে ওভাল টেস্টে তিনি যখন শেষবারের মতো নামেন তখন যদি মাত্র আর ৪টি রান করতে পারতেন তবে তাঁর টেস্টে রানের গড় হত ঠিক ২০০। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি সেই ইনিংসে হেলিসের বলে শূন্য রানে ফিরে যান। তাঁর রানের গড় দাঁড়ায় ৯৯'৯৪ রান যা ক্রিকেটের ইতিহাসে কখনও অতিক্রান্ত হবে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে, তখন টেস্ট খেলার সংখ্যা অনেক কম ছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে দীর্ঘদিন টেস্ট ম্যাচের আসর বসে নি।

ব্রাডসলে, ওয়ারেন (১৮৮৩-১৯৫৪) নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর খেলোয়াড় ব্রাডস্লে ১৯০৮-০৯এ খ্যাতিমান হয়ে উঠেন ও ১৯০৯-এর ইংলণ্ড সফরের জন্য জাতীয় দলে নির্বাচিত হন। প্রথম সফরেই তিনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেন এবং দলে তাঁর স্থান পাকা করেন। ঐ সফরে ওভালের পঞ্চম টেস্টে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি (১৩৬, ১৩০) করে রেকর্ড করেন। এসেক্সের বিরুদ্ধে করেন ২১৯, গ্লৌসেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে ২১১, ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে ১১৮ সেবারের সফরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রান। সেবারে মোট ২১৮০ (গড় ৪৬'৩৮) রান করে অস্ট্রেলিয়া দলের ব্যাটিং-এ শীর্ষস্থান দখল করেন। এসেক্সের বিরুদ্ধে ২১৯ তাঁর ইংলণ্ডে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর হলেও পরবর্তী তিনটি ইংলণ্ড সফরে ব্যক্তিগত ২০০০ রান পূর্ণ করেছিলেন। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রাডস্লে নিঃসন্দেহে অস্ট্রেলিয়ার সেরা বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ছিলেন। ইংলণ্ডের মতো স্বদেশে তিনি সফল হন নি, ৫৩টি সেঞ্চুরি সহ তাঁর মোট রান ১৭০০০-এর উপর, যার গড় হচ্ছে ৫০ রান। তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ২৬৪। এ সব রেকর্ড মেলাবার সময়ে মনে রাখতে হবে তিনি একজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান ছিলেন।

ব্ল্যাকহাম, জন ম্যাকার্থি (১৮৫২-১৯৩২) ভিক্টোরিয়া দলের এই বিখ্যাত উইকেট-রক্ষকের চেয়ে যোগ্যতর কোন ক্রিকেটার তখন আর ছিল না। সাধারণত কোন উইকেট-রক্ষক টেস্ট দল পরিচালনার দায়িত্ব পান না, ১৮৮৫ ও ১৮৯৫-এ দুটি ইংলণ্ড সফরে ৮টি টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্ব করেন ব্ল্যাকহাম। অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে তিনি ৮ বার ইংলণ্ড সফর করেছেন। ব্যাটসম্যান হিসাবেও তাঁর ভূমিকা নেহাত নগণ্য ছিল না। ৩৫টি টেস্টে তিনি ৮০০ রান করেছেন। ১৮৯৪-৯৫-এ সিডনী টেস্টে ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে ৭৪ রান করেছিলেন। সেই ম্যাচে নবম উইকেটে গ্রেগরীর সহযোগিতায় তিনি ১৫৪ রান করেন। এটি তখনও একটি রেকর্ড। উইকেটের পিছনে বিদ্যুৎগতি তাঁকে খ্যাতি এনে দেয়। ১৮৯৪-৯৫-এ প্রথম টেস্টে খেলার সময়ে আঘাত পান, ফলে টেস্ট খেলার ইতি ঘটে।

মরিস, আর্থার রবার্ট (১৯২২—) অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সেরা বাঁ-হাতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের প্রথম দিকের প্রায় প্রতিটি টেস্টেই দলের গোড়াপত্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। উইকেটের চারপাশে পিটিয়ে খেলায় তাঁর খ্যাতি ছিল। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে আত্মপ্রকাশ করেই নিউ সাউথ ওয়েলসের পক্ষে ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন। ১৯৪০-৪১-এ সিডনীতে কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ঐ খেলায় তিনি ১৪৮ ও ১১১ রান করেন। ১৯৪৬-৪৭-এ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ব্রিসবেন ও সিডনী টেস্টে তিনি ব্যর্থ হলেও পরের টেস্টগুলিতে ১৫৫, ১২২ ও অপরাজিত ১২৪ রান করেন। ১৯৪৮ সালে ইংলণ্ড সফরে এসে টেস্টে ব্যাটিংএ শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। তাঁর গড় রান ছিল ৮৭'০০। সকল ম্যাচ মিলিয়ে তাঁর গড় ৭২'১৮ রান ছিল। ব্রিস্টলে গ্লোসেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে তাঁর ৩০০ মিনিটে ২৯০ রানের অনবদ্য ইনিংসটি অবিস্মরণীয়। ৪৬টি টেস্টে ১২টি সেঞ্চুরি সহ তাঁর মোট রান সংখ্যা ৩,৫৩৩ (গড় ৪৩'৪৮)। সাড়ে সাত ঘণ্টায় এডিলেডে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ২০৬ তাঁর সর্বোচ্চ টেস্ট স্কোর।

মিলার, কীথ রোজ (১৯১৯—) কীথ মিলার পৃথিবীর অন্যতম সেরা অলরাউণ্ডার। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত ৫৫ টেস্ট খেলে তিনি রান করেছেন ২৯৫৮ (গড় ৩৬'৯৭), উইকেট পেয়েছেন ১৭০টি (গড় ২২'৯৭ রানে)। মিলার ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রথম শ্রেণীর খেলায় আসেন। মেলবোর্নে তাসমানিয়ার বিরুদ্ধে ভিক্টোরিয়ার এক ইনিংসে ১৮১ রান করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দ্বিতীয়

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে টেস্ট ক্রিকেট বন্ধ ছিল। যুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে বিজয়-উৎসবের জন্য যে ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে মিলার ব্যাটিং-এ শীর্ষস্থান অধিকার করেন। নিউ সাউথ ওয়েলস দলে যোগ দেন এবং ১৯৪৬-এ টেস্টজীবনও শুরু হয়। ব্রিসবেনে টেস্টে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ঐ বছর ডিসেম্বরে ৭৯ রান করেন। ১৯৪৮, ৫৩ ও ৫৬ সালে তিনি ইংলণ্ড সফর করেন। শেষ সফরে লিসেস্টার-শায়ারের বিরুদ্ধে তাঁর সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর অপরাজিত ২৮১ রান করেন। তাঁর সেরা টেস্ট সিরিজ ১৯৫৫-এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। পাঁচটি ম্যাচে তিনি ৪৩৯ (গড় ৭৩.১৬) রান করেন, এবং ২০টি (গড় ৩২.০০ রানে) উইকেট পান। কিংস্টনের শেষ টেস্টে এক ইনিংসে ১০৯ রান করেন এবং দু ইনিংসে ৮টি (৬+২) উইকেট পান। ১৯৫৫-৫৬-য় জীবনের শেষ মরসুমে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ৭টি উইকেট মাত্র ১২ রানের বিনিময়ে দখল করেন।

মেইলী, আর্থার আলফ্রেড (১৮৮৮-১৯৬৭) জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজ খেলতে এসে ইংলণ্ডের এক ইনিংসের ৯টি উইকেট মাত্র ১২১ রানে দখল করে ইতিহাস সৃষ্টি করেন লেগ-স্পিন গুগলি বোলার মেইলী। ১৯২১ সালে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ড দলের দ্বিতীয় ইনিংসে মেইলীর এই সংহারমূর্তি দেখা যায়। সেই সিরিজে তিনি ৩৬টি টেস্ট উইকেট লাভ করেন, এটি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক সিরিজে অস্ট্রেলিয় বোলার হিসাবে আজও রেকর্ড উইকেটপ্রাপ্তি। পরবর্তী কালে কয়েকবার ইংলণ্ড সফর করেন মেইলী। তবে স্বদেশের মাটির মতো সাফল্য আসে নি। ১৯২১ সালে তিনি মাত্র ৬৬ রানে লিভারপুলে অনুষ্ঠিত গ্লোসেস্টারশায়ার দলের ইনিংসের সব কটি উইকেটই ঝুলিতে বোঝাই করে নেন। ১৯২৬-এর সফরে ল্যাঙ্কা-শায়ারের ৯টি উইকেটই পান মাত্র ৮৬ রানের বিনিময়ে। মেইলী নিউ সাউথ ওয়েলসের পক্ষে খেলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে ৭৭৯টি (গড় ২৪.১০ রানে) উইকেট পেয়েছেন।

ম্যাককেব, স্ট্যানলী জোসেফ (১৯১০-৬৮) অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত ব্যাটসম্যান। মিডিয়াম পেস বলও করতেন। ১৯৩৮-এ প্রথম টেস্ট ট্রেণ্টব্রিজে মাত্র ২৩০ মিনিটে ২৩২ রান করে তরুণ ডেনিস কম্পটনের হাতে ধরা পড়ে বিদায় নেন। টেস্ট ম্যাচে এত দ্রুত ডবল সেঞ্চুরি আর কখনও হয় নি। তাঁর ব্যক্তিগত সর্বাধিক স্কোর ২৪০ সারে দলের বিরুদ্ধে। ১৯৩৪ সালের সফরে

ওভালে ঐ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯২৮-২৯ এ ম্যাক্‌কেব খেলা শুরু করেন। ব্যাট-বলে নৈপুণ্যের জন্য ১৯৩০-এ ইংলণ্ড সফরের জন্য তিনি নির্বাচিত হন। ৩৯টি টেস্ট খেলে মোট ২৭৪৮ (গড় ৪৮.২১) রান করেন।

কলিন, ক্যাম্পবেল ম্যাকডোনাল্ড (১৯২৮) ভিক্টোরিয়া দলের পক্ষে ১০৪৭-৪৮এ ক্রিকেট খেলা শুরু করে ধীরে ধীরে অস্ট্রেলিয়ার অপরিহার্য ওপেনার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভিক্টোরিয়া দলের গোড়াপত্তন করতে এসে প্রথম উইকেট জুটিতে ১৯৪৯-৫৯এ কে. মিউলম্যানের সহযোগিতায় ৩৩৭ রান করেন। তাঁর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত রান ১৪৬। ঐ বছরই নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে সিডনীতে করেন ২০৭। ফলে টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে খেলবার জন্য নির্বাচিত হন। তিনি তিনবার ইংলণ্ড সফর করেছেন। ১৯৬১তে ইংলণ্ড সফরে তৃতীয় টেস্ট খেলার সময় আঙুলে আঘাত পেয়ে অবসর গ্রহণ করেন। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২২৯ রান তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

গ্রাহাম, ডগলাস ম্যাকেঞ্জি (১৯৪১) মাত্র ২৭ বছর ৬ মাস বয়সে ২০০ টেস্ট ক্রিকেট দখল করে যে ফাস্ট বোলারটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন তাঁর নাম গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ১৯৫৯-৬০ তিনি খেলা শুরু করেন। দশ বছর পরে লিসেস্টারশায়ার দলে পাকাপাকিভাবে যোগদান করেন। ৬০টি টেস্টে তাঁর সংগ্রহ মোট ২৪৬টি উইকেট। রিচি বেনো ছাড়া অন্য কোনও অস্ট্রেলিয়ার বোলার টেস্টে তাঁর চেয়ে বেশি সফল হয় নি। গ্ল্যামারগন ক্রিকেট দল ম্যাকেঞ্জিকে নিশ্চয় স্মরণে রাখবে। ১৯৭১-এর অগস্টে লিসেস্টারশায়ারের দলের বিরুদ্ধে খেলায় মাত্র ২৪ রানে তাদের ইনিংস গুঁড়িয়ে যায়। ম্যাকেঞ্জি একাই সে খেলার ৮ রানে ৭টি উইকেট পেয়েছিলেন।

মাকার্টনি, চার্লস জর্জ (১৮৮৬-১৮৫৮) ম্যাকার্টনি স্লো বল করতেন বাঁ হাতে আর দুর্দান্ত ব্যাট ধরতেন ডানহাতে। প্রথম যুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রধান ব্যাটসম্যান হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। যুদ্ধের আগে এবং পরে মোট চারবার তিনি ইংলণ্ড সফর করেছিলেন। ১৯০৯-এর প্রথম সফরে লীডস্ টেস্টে তিনি ৮৫ রানে ১১টি উইকেট দখল করেন। ১৯১২য় তাঁর ভূমিকা প্রধানত ব্যাটসম্যানের। সে সফরে তাঁর ৬টি পৃথক সেঞ্চুরি ছিল।. এসেক্সের বিরুদ্ধে ২০৮ রান ঐ সফরে করেন। ১৯২০-এর সফরে

তাঁর সেঞ্চুরির সংখ্যা ৭, সর্বোচ্চ নটিংহামশায়ারের বিরুদ্ধে একদিনে করেন ৩৪৫। ইংলণ্ডের মাটিতে কোন অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানের পক্ষে এটি রেকর্ড। ১৯২৬-এর শেষ সফরেও তিনি ৭টি সেঞ্চুরি করেন। ঐ সফরে লীডস্ টেস্টে তাঁর অনবদ্য ১৫১ রান ভোলার নয়। উডফুলের সহযোগিতায় দ্বিতীয় উইকেটে তিনি ২৩৫ রান যোগ করেন। ১৯৩৫-এ তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন খতিয়ানে ৪৯টি সেঞ্চুরি জমা পড়েছে।

রেডপাথ, আয়ান রিচি (১৯৪১—) রেডপাথ ছিলেন রান সংগ্রহের নিপুণ শিল্পী। ১৯৬৩ থেকে ৭৬ সাল পর্যন্ত ৬৬টি টেস্ট খেলে তাঁর রানের খাতায় জমার সংখ্যা ৪,৭৩৭ (গড় ৪৩·৪৫)। ১৯৭০-৭১-এ পার্থে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৭১ টেস্টম্যাচে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। ভিক্টোরিয়া দলে বিল লরির সঙ্গে ইনিংসের গোড়া পত্তন করতেন। পরে জাতীয় দলেও তাঁদের একই ভূমিকা পালন করতে হত। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে তাঁর সর্বোচ্চ স্কোর ২৬১ হয় কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬২-৬৩তে। খেলাটি মেলবোর্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ফাস্ট বোলিং-এর বিরুদ্ধে সহজ ও সপ্রতিভ ব্যাটসম্যান রেডপাথ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭৫-৭৬ সালে তিনটি সেঞ্চুরি করেন। টেস্টম্যাচে তাঁর সেঞ্চুরির সংখ্যা ৮।

র‍্যান্সফোর্ড, ভার্নন সীমোর (১৮৮৫-১৯৫৮) ভিক্টোরিয়ার বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান এবং কভার অঞ্চলের অসাধারণ ফিল্ডার র‍্যান্সফোর্ডের মত চমৎকার ভদ্র মানুষ ক্রিকেটের মাঠেও বেশি দেখা যায় না। ১৮ বছর বয়সে ভিক্টোরিয়া দলের পক্ষে খেলা শুরু করেন। ৪ বছর পরে আপন দক্ষতায় টেস্ট দলে স্থান পান। ১৯০৮-০৯ সালে নিউ সাউথ ওয়েলেসের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন। তাঁর পূর্বে সে মরসুমে কেউ অমন কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন না। তাই ইংলণ্ড সফরে নির্বাচিত হন। সেই সিরিজে ব্যাটসম্যানের তালিকায় তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। তাঁর রানের গড় ছিল ৫৮.৮৩। লর্ডসের টেস্টে তাঁর অপরাজিত ১৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। ঐ মাঠে এম. সি. সি-র বিরুদ্ধেও তিনি পরে ১৯০ রান করেন। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে তিনি আর কখনও টেস্টে অন্তর্ভুক্ত হন নি।

লরি, উইলিয়াম মরিস (১৯৩৭—) অস্ট্রেলিয়ার একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। স্ট্যাথাম ও ট্রুম্যানের বোলিং-এর বিরুদ্ধে যখন

অস্ট্রেলিয়া দল ১৯৬১তে লর্ডস মাঠে তৃণের মত ভেসে যাচ্ছিল তখন লরি একাই প্রতিরোধের শক্ত দেওয়াল তুলে দাঁড়ান। ঐ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ২৩৮ রানের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত রান ছিল ১৩০। মনে রাখতে হবে সেটাই তাঁর দ্বিতীয় টেস্ট খেলা। ৬৭টি টেস্ট খেলার পর আকস্মিকভাবেই তাঁকে অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং দল থেকেও তিনি বাদ পড়েন। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁর সংগৃহীত রান ৫২৩৪ (গড় ৪৭.১৫)। শ্লথগতি ব্যাটিং-এর জন্য তাঁকে অধিনায়কের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, যদিও তখনও তাঁর ব্যাটিং-দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। ভিক্টোরিয়া দলের আর কোনও খেলোয়াড় তার চেয়ে বেশি রান করতে পারেন নি। নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে ২৬৫ রান তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান। টেস্টে সর্বাধিক রান ১৯৬৪-৬৫এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ব্রিজটাউনে তাঁর ২১০। হল ও গ্রীফিথের ভয়ঙ্কর ফাস্ট বলের বিরুদ্ধে এই রান সংগৃহীত হয়। সিম্পসনের সহযোগিতায় প্রথম উইকেটে ৩৮২ রান করেন; আর মাত্র ৩১ রান করলেই প্রথম উইকেট জুটির টেস্ট রেকর্ড স্পর্শ করতে পারতেন। তিনি দুর্দান্ত ব্যাট করতে পারতেন, তবু ফাস্ট বলের বিরুদ্ধেই যেন খেলা আরও খুলত।

লিণ্ডওয়াল, রেমণ্ড রাসেল (১৯২১—) শুধু অস্ট্রেলিয়া নয় সারা পৃথিবীর অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার রে লিণ্ডওয়াল। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ছিলেন বিপক্ষ দলের গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসম্যানদের ত্রাস। তিনি নতুন বল নিলে প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যানদেরও বুকে কাঁপন ধরত। প্রথম দুটি টেস্টে ১৯৪৮এ ইংলণ্ডের বিখ্যাত ব্যাটসম্যান ওয়াশব্রুককে ৬ ও ৮ রানে আউট করেন, লেন হাটনকে করেন ১৩ রানে। ১৯৪৬ থেকে ৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি ৬১টি টেস্টে অংশগ্রহণ করেন এবং ২২৮টি উইকেট দখল করেন। বেনো এবং ম্যাকেঞ্জি ছাড়া অপর কোন অস্ট্রেলিয়ার বোলার এত উইকেট পান নি। লিণ্ডওয়াল ভারতের বিরুদ্ধে স্বদেশে ও ভারতে খেলেছেন। প্রথম দুটি ইংলণ্ড সফরে ২৭ ও ২৬ টি টেস্ট উইকেট সংগ্রহ করে বোলিং-এ শীর্ষস্থান দখল করেন। ব্যাটিং-এও তাঁর যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মেলবোর্নে (১৯৪৬-৪৭) তিনি ১১৫ মিনিটে ১০০ করেছিলেন। সে সিরিজে তাঁর বোলিংও সফল হয়েছিল। তিনি শেষ টেস্টে ৬৩ রানে ৭ ও ৪৬ রানে ২ উইকেট লাভ করেন। ১৯৪৮এ ওভাল টেস্ট তাঁকে সর্বাধিক সাফল্য এনে দিয়েছিল। তিনি ২০

রানে ৬ ও ৫০ রানে ৩ উইকেট পান সেই ম্যাচে। লিগুওয়াল ক্রিকেট ছাড়াও চমৎকার রাগবী খেলতেন, অ্যাথলীট হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল।

সিম্পসন, রবার্ট বাডেলী (১৯৩৬—) মাত্র ১৬ বছর বয়সে নিউ সাউথ ওয়েলস দলের পক্ষে খেলা শুরু করে ক্রমশ অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অল-রাউণ্ডার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শুধুমাত্র নিপুণ খেলোয়াড় নন, তিনি ছিলেন অসাধারণ কূটবুদ্ধিসম্পন্ন অধিনায়ক। ডান-হাতি ব্যাটসম্যান, লেগ স্পিন বোল্যার আর শ্লিপ অঞ্চলের সতর্ক ফিল্ডার। রিচি বেনোর পরে অধিনায়কের দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত হয় এবং তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে ২৯টি টেস্টে সে দায়িত্ব পালন করে এবং অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে মোট ৫২টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করে অবসর নিয়েছিলেন। ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৩১১ রানের এক বিরাট ইনিংস গড়ে তুলে তিনি সকলের প্রশংসাভাজন হন। সেটি ১৯৬৪ সালের চতুর্থ টেস্ট। ১২ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট ধরে তিনি ব্যাট চালনা করেছিলেন। নিউ সাউথ ওয়েলসের পক্ষে কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬০র অক্টোবরে ব্রিসবেন মাঠে তাঁর ৩৫৯ রান প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে তাঁর সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর।

১৯৭৭-৭৮ সালে জাতীয় দলের সঙ্কটের সময় তাঁকে আবার অস্ট্রেলিয়া দলের হাল ধরবার জন্য ডাকা হয়। প্যাকার সাহেবের হামলায় তখন অস্ট্রেলিয়ার সেরা ক্রিকেটাররা টেস্ট ম্যাচের বাইরে। এ অবস্থায় ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তিনি অধিনায়ক হয়ে রাবার জেতেন। অবশ্য সে বছরই ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গিয়ে সুবিধে করতে পারেন নি। সর্বসাকল্যে ৬২টি টেস্ট ম্যাচ খেলে তিনি ৪৬.৮১ গড়ে মোট ৪৮৬৯ রান, ৪২.২৬ গড়ে মোট ৭১টি উইকেট এবং ১১০টি ক্যাচ ধরেছিলেন। টেস্টে তাঁর সেঞ্চুরির সংখ্যা ১০।

স্পফোর্থ, ফ্রেডারিক রবার্ট (১৮৫৩-১৯২৬) আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের গোড়ার দিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার। স্পফোর্থ পরবর্তী কালে ইংলণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হলেও অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ১৮৭৮, ৮০, ৮২, ৮৪ ও ৮৬ সালে ইংলণ্ড সফর করেন। ঐ সফরসমূহে তিনি গড় ১২.৩০ রানে ৬৬২টি উইকেট দখল করেন। ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি দীর্ঘ বোলারটি মাপা লেংথে অত্যন্ত দ্রুত বল করতেন এবং পেসের রকমফের ঘটিয়ে ব্যাটসম্যানদের সংহার করতেন। ১৮৭৮-এর প্রথম সফরে তিনি গড় মাত্র ১১ রানে ৯৭টি উইকেট পান। সেই সফরে এইচ. এফ. বেলির সহায়তায় এম. সি. সি-র দুটি ইনিংস মাত্র ৩৩ ও

১৯ রানে মুড়িয়ে দেন। স্পফোর্থ ৪ রানে ৬ উইকেট ও ১৬ রানে ৪ উইকেট দখল করেন। সেবারে অস্ট্রেলিয়া দল ইংলণ্ড ছাড়াও আমেরিকা ও নিউজিল্যাণ্ড সফর করে। তিনি তাতে মোট ৭৬৪টি উইকেট সংগ্রহ করেন। তিনি মাত্র ১৮টি টেস্ট খেলে ৯৪টি উইকেট (গড় ১৮'৪১) দখল করেন। একবার ইংলণ্ডের সেরা ব্যাটসম্যানদের প্যাভিলিয়ানে ফিরিয়ে জয় তাদের মুঠো থেকে ছিনিয়ে এনেছিলেন। ১৯৮২র ওভাল টেস্টে ৮৫ রান করলে জয় হবে এমন অবস্থায় ব্যাট করতে নেমে ৭৭ রানে সকলে আউট হয়ে যান, স্পফোর্থ ৪৪ রানে ৭ জনকে আউট করে দেন। প্রথম ইনিংসেও ৪৬ রানে তিনি ৭টি উইকেট পেয়েছিলেন। একটি টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একজন অস্ট্রেলিয়া বোলারের ১৪টি উইকেটপ্রাপ্তি ৯০ বছর ব্যাপী রেকর্ড ছিল। ১৯৭২ সালে ম্যাসী ১৬টি উইকেট নিয়ে সেই রেকর্ড ভেঙে দেন।

হারভে, রবার্ট নীল (১৯২৮—) ভারতের বিরুদ্ধে মেলবোর্ন টেস্টে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে খেলতে নেমে ১৫৩ রান করে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং পরবর্তী বছরে দলের ইংলণ্ড সফরে নিজের আসনটি পাকা করে নেন। ইংলণ্ড চতুর্থ টেস্টে লীডসে তিনি যথারীতি তাঁর দক্ষতা প্রকাশ করেন ১১২ রানের সংগ্রহটি গড়ে তুলে। বিশ্বের সেরা বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হতে থাকে। সেই সফরে তাঁর রান হয় ১১২৯ (গড় ৫৩'৭৬)। ১৯৫৩ র সফরে লিসেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২০২ রান সহ মোট রান করেন ২০৪০ (গড় ৬৫'৮০)। অবশ্য ১৯৫৬-য় এই রানের বানে ভাটা পড়ে। সেবারে তিনি মোট রান করেন ৯৭৬ (গড় ৩১'৪৮)। অবশ্য এ সফরেও এম. সি. সি-র বিরুদ্ধে লর্ডসে তিনি ২২৫ রান করেন। নীল হারভে ৭৯টি টেস্টে খেলেছেন; মোট রান করেছেন ৬১৪৯ (গড় ৪৮'৪১) একমাত্র ব্র্যাডম্যান ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার আর কেউ তাঁর রানের পাহাড়কে অতিক্রম করতে পারেন নি। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে তাঁর আক্রমণাত্মক ব্যাটিং-এর কথা স্মরণ করতে হয়। ১৯৪৯-৫০ এর সফরে তিনি ৭৬'৩০ গড়ে মোট ১৫'২৬ রান করেন। ১৯৫২-৫৩ সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে তাঁর রানের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ৮৩৪ (গড় ৯২'৬৬)। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নিজ দল নিউ সাউথ ওয়েলসের পক্ষে তার সর্বাধিক স্কোর অপরাজিত ২৩১ রান। এটি হয় সিডনীতে অনুষ্ঠিত ১৯৬২-৬৩র খেলায়।

হিল, ক্লেমেণ্ট (১৮৭৭—১৯৪৫) অনেকের মতে ক্লেমেণ্ট হিল অস্ট্রেলিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। ক্রিকেট জীবনের শুরুতে তাঁর উইকেট-রক্ষকের ভূমিকা ছিল। পরবর্তী কালে সে ভূমিকা ত্যাগ করে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং-এ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি সাউথ অস্ট্রেলিয়া দলে খেলা শুরু করেন। যখন তাঁর বয়স ১৯ বছর তখন শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তে ১৮৯৬ সালে ইংলণ্ড সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়া দলভুক্ত হন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে তিনি যে আকর্ষণীয় ২০৬ রান করেছিলেন তার ফলেই এই অন্তর্ভুক্তি হয়। অবশ্য সেই সিরিজে তিনি তত সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। সত্য যে স্বদেশের ফাস্ট উইকেটে তিনি যত বেশি সফল ইংলণ্ডের স্লো উইকেটে তত সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। পরের বছরে ১৮৯৭-৯৮ সালে মেলবোর্নে সফররত ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে একটি চমৎকার ১৮৮ রানের ইনিংস উপহার দেন। ১৮৯৯তে লর্ডসে করেন ১৩৫ রান। আবার ১৯০১-০২ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি তিনটি ইনিংসে তাঁর রান হয় ৯৯, ৯৮ ও ৯৭। জীবনে মোট ৪৯টি টেস্ট তিনি খেলেছেন; মোট রান করেছেন ৩৪০২ (গড় ৩৯.৫৫)। তন্মধ্যে ৭টি সেঞ্চুরি। টেস্টে সর্বোচ্চ রান ১৯১ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১৯১০-১১য় সিডনীতে করেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে নিউ সাউথ ওয়েলস দলের বিরুদ্ধে এডিলেডে ১৯০০-০১ সালে অপরাজিত ৩৬৫ তাঁর ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান।

হ্যাসেট, আর্থার লিণ্ডসে (১৯১৩—) ডন ব্র্যাডম্যানের পর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের অধিনায়কের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় লিণ্ডসে হ্যাসেটের উপর। হ্যাসেট নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান, রক্ষণাত্মক ভঙ্গীতে ব্যাট করতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁর ধীর-গতি ব্যাটিং অনেক সময়ে দর্শকের বিরক্তি উৎপাদন করত। ভিক্টোরিয়া দলের ক্রিকেটার হ্যাসেট ১৯৩২-৩৩এ প্রথম শ্রেণীর খেলার আসরে আসেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩৮-এ টেস্ট খেলেন। সারা জীবনে ৪৩টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করেছেন, রান করেছেন মোট ৩০৭৩ (গড় ৪৬.৫৬)। টেস্টে সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ১৯৮। ভারতের বিরুদ্ধে এডিলেডে ১৯৪৭-৪৮-এ তিনি ঐ রান করেন। তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান ১৯৫০-৫১ ভিক্টোরিয়ার পক্ষে এম. সি. সি. দলের বিরুদ্ধে ২৩২।

ক্রিকেট ও ক্রিকেটার : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ক্রিকেট ইংল্যাণ্ডের জাতীয় খেলা। ইংলণ্ডবাসীরাই রাজ্য জয় করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে-রাজ্যে এই ক্রিকেট খেলাকেও ছড়িয়ে দিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীই ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রিকেট খেলার গোড়াপত্তন করে। তারপর দেখতে দেখতে ১৮৯৫ খ্রী থেকে ১৯২৬ খ্রীর মধ্যে আটবার ইংলণ্ড থেকে ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে খেলতে গেছে—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে তিনবার ক্রিকেট দল ইংল্যাণ্ডে খেলতে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেটের জনক এইচ. বি. জি. অস্টিন (পরে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন) ১৯০৬ এবং ১৯২৩ খ্রী ইংল্যাণ্ডগামী টীমের অধিনায়কত্ব করেন।

তারপর ১৯২৭ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রিকেট বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হলেও কিন্তু সেই সময়ে বোর্ডের কাজকর্ম পরিচালনা করা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। প্রধান অন্তরায় ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্তর্দেশীয় রেষারেষি। এই রেষারেষির ফলে নিরপেক্ষভাবে দল গঠন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে ১৯৩০ খ্রী ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে চারটি টেস্ট খেলায় প্রতি টেস্টে অধিনায়ক বদল হয়—চারজন অধিনায়ক এই সিরিজে অধিনায়কত্ব করেন এবং চব্বিশজন খেলোয়াড়কে খেলার জন্যে নির্বাচিত করা হয়। এমন কি এরপরেও ১৯৪৮ খ্রী ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে তিনজন অধিনায়ক নির্বাচিত হন।

তখনকার দিনে খেলাটি পুরোপুরিভাবে অপেশাদার হওয়ায় ভালো ভালো খেলোয়াড়ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে গুরুত্বপূর্ণ খেলাতে আর্থিক অসঙ্গতির জন্যে যোগ দিতে পারতেন না। এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গার দূরত্ব খুবই বেশি। হাজার মাইল দূরে নিজের খরচায় খেলতে যাওয়ার ক্ষমতা অপেশাদার খেলোয়াড়দের থাকত না। নির্বাচকদের পক্ষেও এরকম ঘুরে ঘুরে খেলা দেখা সম্ভবপর ছিল না। ফলে কোন তরুণ বা নতুন খেলোয়াড় ভালো খেললেও নির্বাচকরা তার খোঁজ পেতেন না এবং প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়ের ফর্ম একদম

পড়ে গেলেও তাঁর ওপরেই নির্ভর করতে হত। তাই ক্লাব-ক্রিকেটের ফলাফল দেখেই বিদেশগামী ক্রিকেট টীম নির্বাচিত হত। ফলে বাইরে গিয়ে দু-চার জন খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও এই দল কোনই যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারত না। আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজে তখন যোগ্যতা যাচাই করে অধিনায়কও নির্বাচিত হত না, অধিনায়ক নির্বাচিত হত গায়ের রঙে। কোন কালা আদমীকে অধিনায়ক নির্বাচিত করা হত না। কারণ তখনকার শাসকগোষ্ঠীর মতে কালা আদমীরা রাজনৈতিক, সামাজিক বা খেলার বিষয়ে নেতৃত্ব দেবার অনুপযুক্ত ছিল। ফলে, তখন অনেক উপযুক্ত অধিনায়ক বাতিল হয়ে গেছেন—আর টীম স্পিরিট বলতে আমরা যা বুঝি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে তার অভাব তাই পুরো মাত্রায় থেকে যেত। সেই কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট ইতিহাস উজ্জ্বল নয়—বরং খুবই মলিন। ইংল্যাণ্ড বা অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে চ্যালোনোর বা হেডলিকে নিঃসন্দেহে তখনকার দিনের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কতগুলি উইকেট পেয়েছেন বা রানের পরিসংখ্যান দিয়ে বিচার করলে কনস্ট্যানটাইনের প্রতি সত্যিই অবিচার করা হবে। কনস্ট্যানটাইন তখনকার ক্রিকেট দুনিয়ায় এক চমকজাগানো প্রতিভা। তাঁর সাড়াজাগানো ব্যাটিং বোলিং এবং ফিল্ডিং তখনকার দিনের দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে। যে কোন ফাস্ট বোলারের সঙ্গে জর্জ জন, জর্জ ফ্রান্সিস, হারম্যান গ্রিফিথ বা ম্যানি মার্টিনড্যালেব তুলনা করা যেতে পারে কিন্তু দল হিসাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খুবই ব্যর্থতার পরিচয় দেয়।

১৯২৮ খ্রী ২৩শে জুন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম টেস্ট ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে শুরু করে লর্ডসে। সেই প্রথম সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলে এবং তিনটিতেই ইংল্যাণ্ডের কাছে ইনিংসে পরাজিত হয়। নবাগত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড পূর্ণ শক্তি নিয়েই মাঠে নামে। হবস্, সাটক্লিফ, হ্যামণ্ড, জার্ডিন টিলডেসলে, টেট এবং লারউড সকলেই খেলেন। সেই বছরই শীতকালে এই দল নিয়েই চ্যাপম্যান অস্ট্রেলিয়াতে অস্ট্রেলিয়াকে ৪-১ টেস্টে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন।

নবাগত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড পূর্ণ শক্তি নিয়ে মাঠে নামায় এ বিষয়ে যথেষ্ট সমালোচনা হয়। তাই পরের বছর ১৯২৯-৩০ খ্রী এম. সি. সি যে ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে খেলতে যায় তাতে নিয়মিত খেলোয়াড়দের বিশেষ

সুযোগ দেওয়া হয় নি। ক্যালথ্রোপের অধিনায়কত্বে টেস্ট খেলোয়াড় হেনড্রেন আর রোডস এই দলে আসেন। তখন রোডসের বয়স ৫২, হেনড্রেন ৪০, জর্জ গান ৫০, স্যাণ্ডাম ৩৯—অবশ্য দুজন তরুণ খেলোয়াড়ও এই দলে নির্বাচিত হন—তাঁরা হলেন বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার কিল ভোসি (২০) আর উইকেট কিপার অ্যামেস (২৪)।

নানা দিক দিয়ে চিন্তা করলে এবারের সিরিজকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা যেতে পারে। ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় টেস্টম্যাচে জয় লাভ করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তৃতীয় টেস্টম্যাচে জয় লাভ করে। কথা ছিল, চতুর্থ বা শেষ টেস্ট সাবিনা পার্কে অনুষ্ঠিত হবে এবং খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলবে। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে বাধা পেয়ে নবম দিনেও খেলা শেষ না হওয়ায় খেলটি পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয়। কারণ ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের দেশে ফিরে যাবার জন্যে জাহাজ ধরতে যেতে হয়। এই সিরিজে একটি ট্রিপল সেঞ্চুরি, তিনটি ডবল সেঞ্চুরি এবং আটটা সেঞ্চুরি হয়।

প্রথম টেস্ট—ম্যাচ ড্র, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৩৬৯ (রোচ ১১২, ডি-ফেয়ার্স ৮০, সিয়ালি ৫৮, স্টিভেন্স ১০৫ রানে ৫) এবং ৩৮৪ (হেডলি ১৭৬, রোচ ৭৭, ডি-ফেয়ার্স ৭০, স্টিভেন্স ৯০ রানে ৫) ইংল্যাণ্ড ৪৬৭ (স্যাণ্ডাম ১৫২, হেনড্রেন ৮০, হেণ্ডস ৪৭, ক্যালথ্রোপ ৪০) এবং ৩ উইকেটে ১৬৭ (স্যাণ্ডাম ৫১, এমেস ৪৪ নঃ আঃ)

দ্বিতীয় টেস্ট—ইংল্যাণ্ড ১৬৭ রানে জয়লাভ করে। ইংল্যাণ্ড ২৩৮ (হেনড্রেন ৭৭, এমেস ৪২, গ্রিফিথ ৬৩ রানে ৫ উইকেট) এবং ৪২৫ আট উইকেট ডিক্লেয়ার্ড (হেনড্রেন ২০৫ নট আউট এমেস ১০৫, কনস্ট্যানটাইন ১৬৫ রানে ৪ উইকেট) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৫৪ (হাণ্ট ৫৮ কনস্ট্যানটাইন ৫৮, অ্যাস্টিল ৫৮ রানে ৪, ভোস ৭৯ রানে ৪ উইঃ) এবং ২১২ (ডি ফেয়ার্স ৪৫, ভোস ৭০ রানে ৭ উইকেট)।

তৃতীয় টেস্ট—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫৮৯ রানে জয়লাভ করে। ও ই ৪৭১ (রোচ ২০৯, হেডলি ১১৪ হাণ্ট ৫৩) এবং ২৯০ (হেডলি ১১২, ব্রাউন ৭০ ন আ অ্যাস্টিল ৭০ রানে ৪) ইংল্যাণ্ড ১৪৫ (হেনড্রেন ৫৬, কনস্ট্যানটাইন ৩৫ রানে

ও ফ্রান্সিস ৪০ রানে এবং ৩২৭ (হেনড্রেন ১২৩, ক্যালথ্রোপ ৪৯, গান ৪৫ কনস্ট্যানটাইন ৮৭ রানে ৫)

চতুর্থ টেস্ট—ম্যাচ ড্র, ইংল্যাণ্ড ৮৪৯ (স্যাণ্ডাম ৩২৫, এমেস ১৪৯, গান ৮৫, হেনড্রেন ৬১ ওয়েস্ট ৫৮ ওকানোর ৫১, স্কট ২৫৫ রানে ৫) এবং ৯ উইকেটে ২৭২ ডিক্লেয়ার্ড (হেনড্রেন ৫৫, স্যাণ্ডাম ৫০, গান ৪৭, স্কট ১০৮ রানে ৪) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৮৬ (নানেস ৬৬, প্যাসাইলাইণ্ড ৪৪) এবং ৫ উইকেটে ৫০৮ (হেডলি ২২৩, নানেন্স ৯২)

তারপর ১৯৩০-৩১ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়। বিখ্যাত ব্যাটসম্যান সি. জি. ম্যাকার্টনির চেষ্টাতে এই সফর সম্ভব হয়। ইংল্যাণ্ডে ১৯২৮ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা দেখে তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে অস্ট্রেলিয়ায় আনার চেষ্টা করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রাও অস্ট্রেলিয়ায় যাবার জন্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

অনেক আশা নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টীম সেবার অস্ট্রেলিয়া সফরে যায়—কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয়ে তাদের বিশেষ নিরাশ হতে হয়। অবশ্য এই সিরিজে পঞ্চম বা শেষ টেস্টে জয়লাভ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তাদের হৃত গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টিমে গ্রিফিথ, কনস্ট্যানটাইন, ফ্রান্সিস এবং সেণ্টহিলের মতো দুরন্ত সব ফাস্ট বোলার দিয়ে দল গঠন করা হয়। স্পিনার না দিয়ে যে জুয়া খেলা হয় তারই পরিণামে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিশেষ বিপদে পড়ে। একমাত্র লেগস্পিন-গুগলি বোলার স্কটকে দলে নেওয়া হয়। শেষে ব্যাটসম্যান হিসাবে নির্বাচিত মার্টিনকে বাধ্য হয়ে স্লো ন্যাটা স্পিনারের ভূমিকা নিতে হয়—এবং তিনি এই সফরে সর্বাধিক বল করেন।

অপর দিকে অস্ট্রেলিয়া দলে তখন খেলছেন উডফুল, পন্সফোর্ড, ব্র্যাডম্যান, কিপ্যাক্স, জ্যাকসন, ম্যাকেব, গ্রিমেট প্রভৃতি বাঘা-বাঘা খেলোয়াড়। প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় টেস্টেও অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস এবং ১৭২ রানে জয়লাভ করে। তৃতীয় টেস্টেও অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস এবং ২১৭ রানে জয়লাভ করে। চতুর্থ টেস্টেও অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস এবং ১২২ রানে জয়লাভ করে। পঞ্চম টেস্টে কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৩০ রানে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অস্ট্রেলিয়া এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে আর টেস্টম্যাচ খেলা হয় নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আরো তিনবার টেস্ট ম্যাচ খেলে। এই তিনবারই তারা ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলে।

১৯৩৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডে ভ্রমণে আসে এবং তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এবারের খেলাও ১৯২৮ সালের ভ্রমণের মতোই বিশেষ ভালো কোন ফল দেখাতে পারে নি। এবারের দলে মাত্র ১৫জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়। আর ঠিক হয় ইংল্যাণ্ডে লীগ খেলেছেন কিংবা পড়াশোনা করেছেন এ রকম দু-একজনকে পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে গ্রহণ করা হবে—তাদের মধ্যে কনস্ট্যানটাইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনি তখন ইংল্যাণ্ডে ক্রিকেট লীগ খেলছিলেন। তিনটি টেস্টের মধ্যে কনস্ট্যানটাইনকে কেবলমাত্র দ্বিতীয় টেস্ট দলে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড যদি ঠিকভাবে চেষ্টা করতেন তা হলে তাঁকে হয়তো সব খেলাতেই পাওয়া যেতে পারত। তিনটি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস এবং ২৭ রানে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হয়। তৃতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস এবং ১৭ রানে জয়লাভ করে।

এই সফরে হেডলি সাতটি সেঞ্চুরি করেন। দুটি অপরাজিত ডবল সেঞ্চুরি করেন—তাঁর প্রথম শ্রেণীর খেলায় মোট ২৩২০ রান সংগৃহীত হয়।

১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বব উইয়েট-এর নেতৃত্বে এম. সি. সি. দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে আসে। এবারে এম. সি. সি. তাদের শ্রেষ্ঠ দল না পাঠালেও পূর্বের চেয়ে অনেক ভালো দলই পাঠায়।

প্রথম টেস্টে ইংল্যাণ্ড দল চার উইকেটে জয় লাভ করে। দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২১৭ রানে জয় লাভ করে। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ ড্র হয়। চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস এবং ১৬১ রানে জয় লাভ করে।

এবারেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং-এর প্রধান দায়িত্ব বহন করেন হেডলি। শেষ টেস্ট ম্যাচে উনি ২৭০ রানে অপরাজিত থাকেন।

১৯৩৯ সালে গ্রাণ্ট রলফ-এর অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংল্যাণ্ডে আবার খেলতে আসে। এবারে নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুটি ভুল হয়। ত্রিনিদাদবাসী জে. বি. ক্যামেরন সমারসেট এবং কেম্‌ব্রিজ ইউনিভার্সিটির হয়ে তখন ক্রিকেট খেলছিলেন। ইংলণ্ডে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং তাঁর বোলিং-এর ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে দলে সহ-অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়। নির্বাচকরা মনে করেছিলেন তিনি আগের মতোই তখনো লেগব্রেক এবং গুগলি বোলিংই

করছেন। আসলে কিন্তু তখন তিনি অফব্রেক বল করছিলেন। অভিজ্ঞ উইকেট-রক্ষক এবং ব্যাটসম্যান ব্যারো তখন আমেরিকায় বসবাস করতেন— বেশ কিছু দিনের জন্যে তিনি ক্রিকেটের সংশ্রব ত্যাগ করেছিলেন। ম্যালেরিয়ায় মিরিন ত্রিশ্চানির মৃত্যু হওয়ায় ব্যারোকে তার স্থলে নির্বাচন করা হয়। ব্যারোর ফর্ম এতো খারাপ হয়ে গিয়েছিল ব্যাটসম্যান সীলে শেষ পর্যন্ত শেষ দুটি টেস্টে উইকেট-রক্ষকের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হন। পরাজিত হলেও এই সিরিজে সফরকারী দল হিসাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আগেকার চেয়ে অনেক ভালো ফল করে।

প্রথম টেস্টে খেলা শেষ হবার কয়েক মিনিট পূর্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংল্যাণ্ডের কাছে ৮ উইকেটে পরাজিত হয়। জর্জ হেডলি লর্ডস মাঠের দু ইনিংসেই সেঞ্চুরি করে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ ড্র হয়। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচও ড্র হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর কোন সরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেনি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি টেস্টে খেলার ওপর যবনিকা নেমে আসে কিন্তু ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ক্রিকেট খেলার কোন ঘাটতি দেখা যায় নি। এই সময়েই ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ক্রিকেটের বিশেষ উন্নতি ঘটে। স্থানীয় ক্রিকেট ম্যাচের মধ্যে তরুণ খেলোয়াড়েরা যেন টেস্ট ক্রিকেট পুনরারম্ভের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। এ দিকে যুদ্ধশেষে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইংল্যাণ্ডের এই দুর্বলতা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের মনে যথেষ্ট আস্থা এনে দেয়।

পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভারত, নিউজিল্যাণ্ড এবং পাকিস্তানের সঙ্গেও টেস্ট খেলার চুক্তি হয়। ফলে দেশে কিংবা বিদেশে প্রতি বছর খেলোয়াড়দের অন্তত একটা টেস্ট সিরিজে অংশ গ্রহণের সুযোগ মেলে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সর্বস্তরেই খেলার মানের এবং পরিবেশের যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়েরা পেশাদার হিসাবে যথেষ্ট সংখ্যায় খেলতে শুরু করেন। ওয়ালকট, উইকস এবং ওরেলের মতো দুর্ধর্ষ ব্যাটসম্যানরা বিদেশ সফরে গিয়ে সাফল্য লাভ করেন। ১৯৫০-৬০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীতে এমন কোন বোলার ছিলেন না যাঁরা এই তিন ডব্লিউকে সমীহ না করে চলতেন।

মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে ওরেলের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাকে উপেক্ষা করা আর

সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই কালা আদমী ওরেলকে কিছুটা চাপে পড়ে ১৯৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রেলিয়া সফরে বাধ্য হয়েই অধিনায়ক হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অবশ্য হেডলি এর আগে একটা টেস্টে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। অধিনায়ক হওয়া ওরেলের কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয়। ওরেল যদি ব্যর্থ হতেন তা হলে কোন কালা আদমীর পক্ষে আবার অধিনায়কপদে ফিরে আসতে বেশ কিছু বছর পার হয়ে যেত।

ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং-এর চেয়ে যে বিষয়ে ওরেলের প্রতিভার পরিচয় বেশি উজ্জ্বল তা হল তাঁর অধিনায়কত্ব। এখনও পর্যন্ত যদি সর্বকালের বিশ্ব ক্রিকেটদল নির্বাচন করা হয় তা হলে সে দলের অধিনায়ক হিসাবে ওরেলের দাবি নির্বাচকদের বিশেষ ভাবে স্মরণে রাখতে হবে। অধিনায়ক হিসাবে ওরেলের সাফল্য পরবর্তী কালে কালা আদমীদের অধিনায়ক হবার পথ প্রশস্ত করে দেয়।

মহাযুদ্ধের পর থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রায় প্রতি বছরই দেশে কিংবা বিদেশে টেস্ট খেলায় ব্যস্ত—তাই সব টেস্ট ম্যাচের ফলাফল ও বিবরণ বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়। তবু ১৯৫০ থেকে ৬০ দশকের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের কিছু উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

টেস্ট ক্রিকেট যেমন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ শুরু করেছেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলে, তেমনি মহাযুদ্ধের পরেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আবার টেস্ট ক্রিকেটের জগতে ফিরে আসে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই খেলা শুরু করে। তবে এবারে তারা খেলে স্বদেশের মাটিতে।

যুদ্ধের পর ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে খেলতে যায়। যুদ্ধের ফলে ইংল্যাণ্ড দল দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই দৌর্বল্য কাটাতে তাদের বেশ কয়েক বছর পার হয়ে যায়।

অপর দিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তরুণ প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের দ্বারা পুষ্ট হয়ে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্যে ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্লো বাঁ-হাতি স্পিনার হিসাবে ওরেল যখন প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন তখন তিনি স্কুলের ছাত্র। স্পিনার হিসাবে দলে স্থান লাভ করলেও—একবার গর্ডাডের সঙ্গে চতুর্থ উইকেটে অপরাজিত জুটিতে ত্রিনিদাদের বিরুদ্ধে ৫০২ রান করেন এবং আর একবার

ওয়ালকটের সঙ্গেও চতুর্থ উইকেটে ৫৭৬ রান সংগ্রহ করেন। প্রথম শ্রেণীর ঘরোয়া ক্রিকেটে ওরেল, ওয়ালকট ও স্টলম্যায়ার ট্রিপল সেঞ্চুরি করেন। সেঞ্চুরি আর ডবল সেঞ্চুরির ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়।

বারবাডোজ দলে মধ্যিখানের ব্যাটিং অর্ডারে দুই ডব্লিউ-এর সঙ্গে আর এক ডব্লিউ এসে যোগ দেন—তিনি হলেন এভার্টন উইক্স। ওরেল ও ওয়ালকটের মতো বিশালদেহী না হলেও ছোটো-খাটো উইক্স ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। ব্যাটসম্যান হিসাবে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়দের নামের তালিকায় এই তিন ডব্লিউ-এর নাম চিরদিন লেখা থাকবে।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আর দুজন যে চমকজাগানো খেলোয়াড় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে ছিলেন তাঁরা হলেন দুই স্পিনার আলফ ভ্যালেণ্টাইন আর সোনি রামাধীন।

১৯৪৭-১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে যে এম. সি. সি. দল সফরে আসে তাতে কম্পটন, এডরিচ, ওয়াশব্রুক, হাটন, বেডসার, ইয়ার্ডলে এবং ডগ রাইট এঁদের কেউই ছিলেন না। অবশ্য পরে হাটন দলে যোগদান করেন।

পুরো টীম না পাঠানোর ফলে এই সফরে এম. সি. সি. একটিও প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে জয় লাভ করতে পারেনি। এত বড় শোচনীয় ব্যর্থতা ইংল্যাণ্ডকে আর কখনো ভোগ করতে হয় নি। প্রথম টেস্ট ড্র হয়। দ্বিতীয় টেস্টও ড্র হয়। তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৭ উইকেটে জয় লাভ করে। শেষ টেস্টেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১০ উইকেটে জয় লাভ করে।

তারপরে ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ম্যাচ খেলতে প্রথম ভারতে আসে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই সফরকে কেন্দ্র করে ভারতে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই দলের বিপক্ষেই বাংলার দুই খেলোয়াড় মণ্টু ব্যানার্জী ও সুঁটে ব্যানার্জী প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পান।

ইডেন গার্ডেনে এভার্টন উইক্স দু ইনিংসে সেঞ্চুরি করে পরপর পাঁচটি টেস্ট সেঞ্চুরি করার রেকর্ড স্থাপন করেন। তিনটি টেস্ট ম্যাচ পর পর ড্র হবার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্টে এক ইনিংস এবং ১৯৩ রানে জয়লাভ করে। তারপর বম্বেতে ভারতের নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশত সময়-অভাবে ম্যাচ ড্র হয়ে যায়। যখন অষ্টম উইকেটের জুটিতে ফাদকার আর গোলাম আমেদ ব্যাট করছিলেন তখন জেতার জন্যে ৬ রান বাকি, সময় ছিল মাত্র কয়েক

মিনিট। জোন্স যখন তাঁর ওভারের ষষ্ঠ বলটি করার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন আম্পায়ার জোসি উত্তেজনায় উইকেটের বেল তুলে ফেলে খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তার আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা যেভাবে সময় নষ্ট করেছিলেন তা খুবই অখেলোয়াড়ি মনোভাবের পরিচয় বহন করে। এমন কি প্রায় শেষ দিকে উইকেট-রক্ষক ওয়ালকট হাতের গ্লাভস খুলে ফেলে প্যাভিলিয়ানে ফিরে গিয়েও কিছু সময় নষ্ট করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যে ভারতকে পরে ১৯৭১ খ্রী অবধি অপেক্ষা করতে হয়।

যদিও ১৯৪৮-৪৯ খ্রী ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলা শুরু হয় কিন্তু এই শুরু হবার পর এরই মধ্যে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে বহু টেস্ট খেলাই হয়েছে। ১৯৫৩ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে সেবার পাঁচটি টেস্ট খেলা হয়। চারটি টেস্ট ড্র হয়। দ্বিতীয় টেস্টে ভারত ১৪২ রানে পরাজিত হয়। তারপর ১৯৫৮-৫৯ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতে আসে। প্রথম এবং পঞ্চম টেস্ট ড্র হয়। আর তিনটি টেস্ট ম্যাচে ভারত পরাজিত হয়। তারপর ১৯৬২ খ্রী ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যায়। সেবার ভারত পাঁচটি টেস্টেই পরাজিত হয়। তারপর ১৯৬৬-৬৭ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতে আসে। তিনটি টেস্ট খেলা হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দুটিতে জয়লাভ করে, একটি ড্র হয়। তারপর ১৯৭১ খ্রী ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজে যায় এবং একটি টেস্ট ম্যাচে জয়লাভ করে সেবারের সিরিজে জয়ী হয়। আর চারটি টেস্ট ম্যাচ ড্র হয়েছিল। এই সফরে সারদেশাই প্রথম টেস্টে ২১২, দ্বিতীয় টেস্টে ১৯২ এবং তৃতীয় টেস্টে ১২৪ রান করেন। সুনীল গাভাসকর করেন তৃতীয় টেস্টে ১১৬, চতুর্থ টেস্টে ১১৭ এবং শেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১১৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২২০ রান। ১৯৭৪-৭৫ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভারতে আসে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম দুটি টেস্টে জয়লাভ করে। তৃতীয় এবং চতুর্থ টেস্টে ভারত জয়লাভ করে। শেষ এবং পঞ্চম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করে সিরিজে জয়ী হয়। আবার ১৯৭৬ খ্রী ভারত ওদেশে যায়। প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করে। দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হয়। তৃতীয় টেস্টে ভারত জয়লাভ করে। চতুর্থ টেস্টে ভারত পরাজিত হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ৫ জন খেলোয়াড় আহত থাকায় ব্যাট করতে পারে নি। হোল্ডিং ও হোল্ডার ক্রমাগত শর্টপিচ বল দিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের আঘাত করে। এই টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলিং ক্রিকেট খেলার ভদ্রতাবোধকে পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছিল।

১৯৭৮-৭৯ খ্রী কালীচরণ যে দলকে ভারতে নিয়ে আসেন তা ছিল অত্যন্ত তুর্বল দল। কারণ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়রাই তখন প্যাকারের পেশাদার খেলায় চুক্তিবদ্ধ। তাই কালীচরণের অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সবচাইতে তুর্বল ক্রিকেটের স্বাক্ষর রেখে যায়।

ভারতের সঙ্গে ১৯৪৮-৪৯ খ্রী সিরিজ শেষ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫১ খ্রী ইংল্যাণ্ডে যায় টেস্ট খেলতে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট ইতিহাসে এই সফর সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে ইংল্যাণ্ড প্রথম টেস্ট ম্যাচে জয়লাভ করে। বাকি চারটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করে সর্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। সেই সফরে তিন ডব্লিউ-এর খেলা দেখে ইংল্যাণ্ড চমকে উঠেছিল—আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। সোনি রামাধীন আর ভ্যালেণ্টাইনও তাঁদের স্পিন বোলিং-এর জাতুতে ইংল্যাণ্ডকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছিল। তারপরে ১৯৫৩-৫৪, ১৯৫৭, ১৯৫৯-৬০, ১৯৬৩, ১৯৬৭-৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭৩, ১৯৭৩-৭৪, ১৯৭৬ খ্রী ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। অন্য দেশের তুলনায় ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সর্বাধিক টেস্ট ম্যাচ খেলেছে।

এর মধ্যে ১৯৫১-৫২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নিউজিল্যাণ্ড সফরে যায়। তুটি টেস্টের মধ্যে প্রথমটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করে। দ্বিতীয়টি ড্র হয়। তারপর আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজই ১৯৫৫-৫৬ খ্রী নিউজিল্যাণ্ড সফরে যায়, চারটি টেস্ট খেলা হয়। প্রথম তিনটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করে। শেষ টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড জয়লাভ করে। ১৯৬৮-৬৯ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজই আবার নিউজিল্যাণ্ড সফর করে। তিনটি টেস্টের প্রথমটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করে। দ্বিতীয়টিতে নিউজিল্যাণ্ড জয়লাভ করে। শেষ টেস্ট ড্র হয়। ১৯৭৪ খ্রী নিউজিল্যাণ্ড প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে আসে। পাঁচটি টেস্টের সব কটি খেলাই ড্র হয়। এই প্রথম একটি বিদেশী দল এসে সব কটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচই অমীমাংসিত-ভাবে শেষ করে যায়। এই সফরে টার্নার ১২১৪ রান করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে মরসুমে চারটি ডবল সেঞ্চুরি করে তিনি ১৯৩২ খ্রী হেনড্রেনের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ভঙ্গ করেন। সফরের পুর্বে ভারতের কাছে পরাজিত হয়েও নিউজিল্যাণ্ড দল যেভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গিয়ে অপরাজিত অবস্থায় সফর শেষ করে তা খুবই কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৬১-৫২ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আবার অস্ট্রেলিয়ায়

খেলতে আসে। ইংল্যাণ্ডকে শোচনীয়ভাবে হারানোয় অস্ট্রেলিয়ানরাও ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে আসার জন্যে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলই শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হয়ে ঘরে ফেরে। কেবল ওরেল আর স্টলমেয়ারই টেস্টে সেঞ্চুরি করতে পেরেছিলেন। আর ব্যাটিং-এর গড়ে সব চেয়ে বেশি ছিলেন গোমেজ ৩৬, উইক্স ২৪.৫০, রে আর ওয়ালকট ১৪.৫১। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই ব্যাটিং ব্যর্থতা সত্যই বিস্ময়কর।

অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার লিণ্ডওয়াল আর মিলার এই দুই বোলার তখন তাঁদের ক্ষমতার মধ্যগগনে। লিণ্ডওয়াল ২১টা আর মিলার ৩১টা উইকেট পান। আর ন্যাটা ফাস্ট মিডিয়াম বোলার জনস্টন পান ২৩টা উইকেট।

সেবার পাঁচটি টেস্টের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে ৪টিতে আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করে একটিতে।

তারপর আবার ১২৫৬ খ্রী অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আসে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের শক্তি অনুযায়ী ফলাফল দেখাতে পারে না। সেবারের সফরেও অস্ট্রেলিয়ায় যুদ্ধের পূর্বের কিছু বিখ্যাত খেলোয়াড় যেমন মরিস্, হার্ভে, মিলার, লিণ্ডওয়াল, জনস্টন এবং নতুন অধিনায়ক জনসনকে দলে রাখে। এইসব খেলোয়াড়রা তাঁদের অভিজ্ঞতাকে এই সফরে পুরো মাত্রায় কাজে লাগান। এই সিরিজে টেস্টে ওয়ালকট দুবার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন—টেস্টে তাঁর মোট রান হয় ৮২৭। হার্ভে ও মিলার টেস্টে তিনটি করে সেঞ্চুরি করেন। এমনকি অ্যাটকিনসন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হয়ে ৭ নম্বর ব্যাটসম্যান হিসাবে খেলতে এসেও একবার সেঞ্চুরি করেন। পাঁচটি টেস্টে মোট ২১টি সেঞ্চুরি হয়। অস্ট্রেলিয়া তিনটি টেস্টে জয়লাভ করে, আর দুটি ড্র হয়।

তারপর ১৯৬০-৬১ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়া সফরে আসে। এই সফরে পরাজিত হলেও শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিজয়ীর চেয়ে বেশি সম্মান লাভ করে। এই সফরে ওরেল প্রথম অধিনায়ক হিসাবে আসেন এবং কি মাঠে কি মাঠের বাইরে অধিনায়কত্বের চরম উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন। চতুর্থ টেস্টে যখন ওরেলের বলে সোবার্স শেষ খেলোয়াড় ক্লাইনের ক্যাচ লুফে নেন তখনও খেলা শেষ হবার এক ঘণ্টা বাকি। সমস্ত ফিল্ডসম্যানই মনে করেছিলেন ক্লাইন আউট হয়ে গেছেন—তাই তাঁরা বিজয়ানন্দে যখন প্যাভিলিয়ানে ফিরে আসছিলেন—তখন আম্পায়ার সেই ক্যাচটিকে নাকচ করেন। ওই সিদ্ধান্তে

যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমস্ত খেলোয়াড় প্রতিবাদ করে ওঠেন—তখন ওরেল আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চরম, এই কথা মনে রেখে সমস্ত ফিল্ডসম্যানদের শান্ত ও সংযত হতে আদেশ দেন। এর ফল অস্ট্রেলিয়া এই টেস্ট ম্যাচে ড্র করে সিরিজ জিতে ওরেল ট্রফি লাভ করে।

এই সিরিজের প্রথম টেস্টটি পৃথিবীর একমাত্র টাই টেস্ট হিসাবে নিষ্পত্তি হয়। এত উত্তেজনাপূর্ণ টেস্ট পৃথিবীতে আর হয় নি। এই সিরিজ থেকেই অস্ট্রেলিয়া আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে ওরেল ট্রফি প্রবর্তিত হয়। সেবার দ্বিতীয় ও পঞ্চম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে, তৃতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করে। তাই অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে ১৯৬০-৬১ খ্রী সিরিজই সবচাইতে স্মরণীয় সিরিজ। তারপর থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট খেলার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

১৯৬৫ খ্রী অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আসে। তখন ওরেল অবসর গ্রহণ করলেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টীমকে তিনি তখন গুণগত মর্যাদায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে গেছেন—ওরেলের ব্যক্তিত্ব তখনও দলের খেলোয়াড়দের ওপর বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তাই ওরেলকে মাঠে না পাওয়া গেলেও দলের সঙ্গে পাওয়ার জন্য তাঁকে ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়। সেবারে সোবার্সের অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়াকে ২-১ টেস্টে পরাজিত করে বিশেষ সম্মান অর্জন করে। কারণ তার আগেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬২ খ্রী ভারতকে ৫-১ টেস্টে হারায়, এবং ১৯৬৩ খ্রী ইংল্যাণ্ডকে ৩-১ টেস্ট ম্যাচে হারায়।

১৯৬৮-৬৯ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যায় অস্ট্রেলিয়ায় এবং পরাজিত হয়। সে সফরে অধিনায়ক হিসাবে সোবার্স দলের খেলোয়াড়দের ওপর নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি এবং বেশির ভাগ সময় তিনি গল্‌ফ খেলেই সময় অতিবাহিত করেন। ফলে অস্ট্রেলিয়া ৩-১ টেস্ট জয়লাভ করে ওরেল ট্রফি নিজেদের দখলে রাখে।

তারপর ১৯৭৩ খ্রী অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে আসে। তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কারণ তার আগে ২৬টি টেস্ট খেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাত্র দুটিতে জয়লাভ করেছে—আর তার আগে ১৯৭১ খ্রী স্বদেশে ভারতীয়দের হাতে পরাজিত হয়েছে এবং ১৯৭২ খ্রী নিউজিল্যাণ্ডকে পাঁচটার মধ্যে একটি টেস্টেও পরাজিত করতে পারে নি। এই সিরিজের পূর্বে

সোবার্সের হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল এবং তাঁর ওপর নির্বাচকমণ্ডলীও নানা কারণে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই শেষ অবধি সোবার্স এই সিরিজে খেলেন নি। কানহাই অধিনায়ক হন। অস্ট্রেলিয়া ২-০ টেস্টে জয়লাভ করে সেবার ওরেল ট্রফি লাভ করে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন ১৯৭৫-৭৬ খ্রী অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে আসে তার আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ওয়ার্লড কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে বিশেষ সম্মান অর্জন করে। তাই লয়েডের অধিনায়কত্বে সেই দলের সফর অস্ট্রেলিয়াতে বিশেষ সাড়া তুলেছিল, কিন্তু কার্যত অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৬টি টেস্টের সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৫-১ টেস্টে পরাজিত হয়ে দেশে ফেরে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর পাকিস্তানের মধ্যে সরকারী টেস্ট খেলা শুরু ১৯৫৮ খ্রী। সে বছর পাকিস্তান দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করতে আসে। এই সফরে প্রথম টেস্টে হানিফ ৩৩৭ রান করেন ৯৭০ মিনিট ব্যাট করে। এত দীর্ঘ সময় ধরে টেস্টে আর কেউ কখনো ব্যাট করেন নি। আবার তৃতীয় টেস্টে ২১-বছর-বয়সী সোবার্স (পরে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন) তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টে তিন সংখ্যার রান পূর্ণ করেন অপরাজিত অবস্থায় ৩৬৫ রান করে। ব্যক্তিগতভাবে টেস্টে ৩৬৫ রানই হল বিশ্বরেকর্ড। বিলাতে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকায় ওরেল সেবার দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণে অসমর্থ হন—তাই আলেকজাণ্ডার দলপতি নির্বাচিত হন। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে প্রথমটি ড্র হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তিনটিতে জয়লাভ করে। শেষ টেস্টে পাকিস্তান বিজয়ী হয়।

ভারত সফর শেষ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৯৫৯ খ্রী পাকিস্তান সফরে আসে। ভারতে সাফল্য লাভ করলেও পাকিস্তানে তাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বিশেষ করে পাকিস্তানী আম্পায়ারিং অত্যন্ত অবনত মানের হয়। প্রথম তিনটি ইনিংসে সোবার্সকে কম রানের মধ্যে এল. বি. ডব্লিউ আউট করে দেওয়া হয়। এই আউটের ব্যাপারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করে। শেষ অবধি তিনটি টেস্টের এই সিরিজে পাকিস্তান ২-১ টেস্টে জয়ী হয়।

তারপর আবার ভারত সফর শেষ করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৯৭৫ খ্রী পাকিস্তান সফরে আসে। তখন পাকিস্তানে ক্রিকেট খেলায় উপযুক্ত পিচ তৈরি হয়েছে এবং উচ্ছৃঙ্খল দর্শকও যথেষ্ট সংযত হয়েছে। সেবার দুটি টেস্টের এই সিরিজ অমীমাংসিত ভাবে সমাপ্ত থাকে।

১৯৭৭ খ্রী পাকিস্তান শক্তিশালী দল নিয়েই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করে। দলের অধিনায়ক হন মুস্তাক মহম্মদ। এই সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ও চতুর্থ টেস্টে জয়লাভ করে। পাকিস্তান জয়লাভ করে পঞ্চম টেস্টে। আর দুটি টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

১৯২৮ খ্রী ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টেস্টে খেলা শুরু করেছিল। তাই ইংল্যাণ্ডে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার কথা উল্লেখ করেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চাশ বছরের ক্রিকেট ইতিহাস শেষ করতে চাই। অবশ্য তার আগে যে কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজনীয় তা হল ১৯৭৫ এবং ১৯৭৯ খ্রী যে প্রুডেন্সিয়াল কাপ প্রতিযোগিতা হয় তাতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলই দু বার চ্যাম্পিয়ন হয়—আর দুবার তারা অস্ট্রেলিয়ান দলকে ফাইনালে পরাজিত করে। সীমিত ওভারের প্রুডেন্সিয়াল কাপ জিতে বিশ্বজয়ী হওয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। অবশ্য দুবারই জয়লাভের জন্য লয়েডের দানকে অস্বীকার করা যায় না। প্রথম বছর ফাইনালে লয়েডের প্রচণ্ড মারের স্মৃতি আজো দর্শকদের চোখে ভাসছে। প্রথম বারের ফাইনালে লয়েড সেঞ্চুরিও (১০২) করেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলার যে প্রচলন এবং জনপ্রিয়তা দেখা দিয়েছে প্রুডেন্সিয়াল কাপে জয়লাভ করা হল তারই প্রত্যক্ষ ফল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর ইংল্যাণ্ডের টেস্ট ম্যাচের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। ১৯৫৩-৫৪ খ্রী এম. সি. সি. দল চতুর্থ বার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে আসে। প্রথম পেশাদার অধিনায়ক হাটন এম. সি. সি. দলকে বি শে নিয়ে আসেন। দলে কম্পটন, মে, গ্রেভনি এবং উইলি ওয়াটসনের মতো ব্যাটসম্যান এবং ট্রুম্যান, স্ট্যাথাম, লেকার, লক এবং ওয়ার্ল্ড-এর মতো বোলারও ছিলেন। দুটি দলই ছিল বিশেষ শক্তিশালী, তাই টেস্ট সিরিজ ২-২ ম্যাচে অমীমাংসিত থেকে যায়।

১৯৫৭ খ্রী ৩৮-বছর-বয়সী গডার্ড-এর নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডে আসে। এই দলে তিন ডব্লিউ, সোবার্স, স্মিথ, গিলক্রাইট, রামাধিন, কানহাই ছিলেন। তবু ইংল্যাণ্ড দল ৩-০ টেস্টে জয় লাভ করে। একমাত্র কলি স্মিথই এই সফরে ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ করেন। টেস্টে কেবল স্মিথ ২টি আর ওরেল একটি সেঞ্চুরি করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে আর কেউই সেঞ্চুরি করতে পারেন নি।

তারপর ১৯৫৯-৬০ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজে এম. সি. সি. খেলতে আসে। একবছর আগেও অস্ট্রেলিয়াতে গ্রেভনি, ওয়াটসন, বেলি, ল্যাকার, লক, টাইসন ছিলেন, কিন্তু এ সফরে পিটার মে-র অধিনায়কত্বে এসেছিলেন আরো তরুণ দল—ব্যারিংটন, স্মিথ, পুলার, সুব্বারাও, ইলিংওয়ার্থ প্রভৃতি। পুরনোদের মধ্যে কেবল ট্রুম্যান আর স্ট্যাথাম ছিলেন।

যেমন ১৯৫০-৬০ দশকে এসেছিলেন তিন ডব্লিউ, স্টলমেয়ার, রামাধিন, ভ্যালেন্টাইন প্রভৃতি দিকপাল খেলোয়াড়; তেমনি '৬০'-৭০ দশকে কানহাই, সোবার্স, হান্ট, স্মিথ, হল, গ্রিফিথ, বুচার, সলোমান, গিলক্রাইস্টের মতো প্রখ্যাত খেলোয়াড়েরা। অবশ্য ১৯৫৯-৬০ খ্রী এম. সি. সি. আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে পাঁচটি টেস্টের মধ্যে তিনটি ড্র হয়, দ্বিতীয় আর চতুর্থটিতে এম. সি. সি. জয়লাভ করে।

১৯৬৩ খ্রী ওরেলের অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ড সফরে এসে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মর্যাদা ক্রিকেট-জগতে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টে জয় লাভ করে। তৃতীয় টেস্টে ইংল্যাণ্ড জয়ী হয়। একটি টেস্ট ড্র হয়। এই সিরিজেই ওরেল তাঁর শেষ অধিনায়কত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মরসুমের শেষে ওরেল লেখেন, আমার কোন অনুযোগ নেই। জীবনে অনেক পেয়েছি, শেষ দু বছরে আমার জীবনের আশাও পূর্ণ হয়েছে। আমার উদেশ্য ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জকে একটি প্রকৃত দলে পরিণত করা—এবং আমি তা করেছি।

১৯৬৬ খ্রী সোবার্সের অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আবার ইংল্যাণ্ড সফরে আসে। এ সফরেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয় লাভ করে প্রথম, তৃতীয় আর চতুর্থ টেস্টে। ইংল্যাণ্ড জয়ী হয় শেষ টেস্টে। একটিমাত্র টেস্ট ড্র হয়।

১৯৬৭-৬৮ খ্রী কাউড্রের অধিনায়কত্বে এম. সি. সি. দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আসে। চারটি টেস্ট ড্র হয়। চতুর্থ টেস্টে ইংল্যাণ্ড জয় লাভ করে।

পরের বছর ১৯৬৯ খ্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আসে ইংল্যাণ্ডে। তিনটি টেস্ট খেলায় ইংল্যাণ্ড দুটিতে জয়লাভ করে, দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হয়।

১৯৭৩ খ্রী কানহাই-এর অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডে এসে ৩টি টেস্ট খেলে ২টি টেস্টে জয়লাভ করে। একটি ড্র হয়।

মাইক ডেনিস-এর নেতৃত্বে ১৯৭৩-৭৪ খ্রী ইংল্যাণ্ড দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে আসে। এই সিরিজে দ্বিতীয় টেস্টে রো রান করেন ১২০, তৃতীয় টেস্টে ৩০২

এবং পঞ্চম টেস্টে ১২৩। এই সিরিজে প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয় লাভ করে। ইংল্যাণ্ড জয় লাভ করে শেষ টেস্টে। আর তিনটি টেস্ট ড্র হয়।

১৯৭৬ খ্রী লয়েড-এর অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ইংল্যাণ্ডে আসে। প্রথম দুটি টেস্ট ড্র হয়। শেষ তিনটি টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করে।

পঞ্চাশ বছরের ক্রিকেট ইতিহাসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যত গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজিত করতে সক্ষম হয়েছে তা হিসাব-নিকাশ করে দেখলে সত্যিই বিস্ময় জাগে। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের খেলার হ্যাপি গো লাকি আচরণ—পৃথিবীর সকল দেশের ক্রিকেট-রসিক দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। তাই আজ ক্রিকেট দুনিয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক সাড়া-জাগানো নাম। সত্তর দশকেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে লয়েড, রিচার্ড, কালীচরণ, হোল্ডিং, রবার্টস প্রভৃতির মতো সেরা খেলোয়াড়েরা রয়েছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ভৌগোলিক অবস্থান একটু বিচিত্র। বিচ্ছিন্ন কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টি হল এ দেশটি। একটি দ্বীপের সঙ্গে আর-একটি দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য প্রচুর। রাজনীতিগত অমিলও বড় কম নয়। কিন্তু এইসব বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের মধ্যেও তারা এক জায়গায় ঐক্যবদ্ধ। ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে তাদের এই একতা গড়ে উঠেছে। বহু ধনীরা খেলাধুলাকে মিলনের মন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। খেলাধুলা মানুষকে উদার করে। এ জন্যই খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি বা sportsman s spirit বলতে ঔদার্যকেও বোঝায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট এ ঔদার্যকে অনেকটা ব্যক্ত করেছে। দ্বীপবাসীদের বিচ্ছিন্নতার মধ্যেও ঐক্য তার প্রমাণ।

ক্রিকেটার : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আলেকজাণ্ডার, ফ্রাঞ্জ (১৯২৮—) আলেকজাণ্ডার ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত উইকেট-রক্ষক এবং নিপুণ ব্যাটসম্যান : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ক্রিকেট জগতে যুগ্ম দক্ষতার বিরল নিদর্শন। অধিনায়ক হিসাবেও তিনি কৃতিত্বের অধিকারী। ক্রিকেটে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু। ক্রিকেট ছাড়াও ফুটবলে তিনি পারদর্শী ছিলেন এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলেও ইংলণ্ডের পক্ষে খেলেন। ফুটবলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লু হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন আর সুব্বারাওয়ের সহযোগিতায় নটিংহামশায়ারের বিরুদ্ধে ২২০ রানের একটি পঞ্চম উইকেট জুটি রেকর্ড করেন। আলেকজাণ্ডার একজন দক্ষ ব্যাটসম্যান, আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে ব্যাট চালনায় তাঁর খ্যাতি ছিল। ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনি দলের সেরা ব্যাটসম্যান বিবেচিত হন। সর্বোচ্চ রান করেন ১০৮। তাঁর রানের গড় ছিল ৬০.৫০। সে সিরিজে তিনি ১৬টি ক্যাচ ধরেন। ১৯৫৯-৬০ কলে ইংল্যাণ্ড দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকালে পাঁচটি টেস্টে তিনি ২৩ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেন। বারবাডোজে টেস্টের এক ইনিংসে ইংলণ্ডের ৫ জন ব্যাটসম্যানকে ক্যাচ করেন। ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষে প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

উইক্স ইভার্টন ড্য কাউরসী (১৯২৫—) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত ডব্লু ত্রয়ীর অন্যতম ইভার্টন উইক্স হলেন রান সংগ্রহের যান্ত্রিক প্রতিভা—মেকানিক্যাল জিনিয়াস। খর্বকায়, সুদেহী, প্রত্যয়দৃঢ়, নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান বারবাডোজের ফসল। তাঁর ক্ষিপ্রগতি, শক্তিশালী মার, দুর্ভেদ্য রক্ষণভাগ, এবং রান সংগ্রহের অসাধারণ দক্ষতা তাঁকে যুদ্ধোত্তর কালের সেরা রান-শিকারীতে পরিণত করেছিল। ১৯৪৪-১৯৪৫-এ তিনি প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশ গ্রহণ করেন, এবং ১৯৪৭-৪৮ এ যখন ইংলণ্ড দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে আসে তখন তিনি স্বদেশের পক্ষে নির্বাচিত হন। প্রথম তিনটি টেস্টে মোটামুটি রান করলেও চতুর্থ টেস্টে ১৪১ রান করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। তারপরেই ১৯৪৮-৪৯এ ভারত সফরে এসে উপরি-উপরি আরও ৪টি টেস্ট সেঞ্চুরির সহযোগে মোট ৫টি উপর্যুপরি টেস্ট সেঞ্চুরির দুর্লভ সম্মান অর্জন করেন।

আজ পর্যন্ত এ রেকর্ডটি ভঙ্গ হয় নি। ৯০ রানে পৌঁছে রান আউট হবার দরুন ষষ্ঠ সেঞ্চুরির সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। সেবারে তাঁর রানের গড় দাঁড়ায় ১১১.২৮। ১৯৫২-৫৩ সালে তাঁর পরবর্তী ভারত সফরে এমনি চমকপ্রদ স্কোর করেন। তাঁর মোট রান হয় ৭১৬, গড় ১০২'২৮ রান। ইংল্যাণ্ডে ১৯৪৯ সালে ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে তিনি প্রথম খেলতে যান এবং সে মরসুমে ১৪৭০ রান করে রেকর্ড করেন। ১৯৫০ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে ইংলণ্ড সফরে আসেন এবং সফরে মোট ২৩১০ (গড় ৭৯.৬৫) রান করে দলীয় ব্যাটিংএ শীর্ষস্থান দখল করেন। সে সফরে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তাঁর অপরাজিত ৩০৪ রান ইংলণ্ড সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে রেকর্ড রান! সেই গ্রীষ্মে উইক্স আরও ৪টি ডবল সেঞ্চুরি করেন। ক্রিকেটের ইতিহাসে একমাত্র ব্রাডম্যানই একটি মরসুমে এর চাইতে বেশী ডবল সেঞ্চুরির অধিকারী। তিনি ১৯৩০-এ ছয়টি ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। সেটি একটি রেকর্ড।

ওরেল, স্যার ফ্রাঙ্ক মোর্টিমর ম্যাগলিন (১৯২৪-৬৭) মাত্র ১৮ বছর বয়সে বারবাডোজের পক্ষে প্রথম খেলতে নেমেছিলেন তিন ডব্লুর সেরা খেলোয়াড় ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, নেমেই ত্রিনিদাদের বিপক্ষে রান করেছিলেলেন ৬৪—কেউ তাঁকে আউট করতে পারেন নি। পরের বছরে ঐ ত্রিনিদাদের বিপক্ষে রান করলেন ৩০৮—এবারেও অপরাজিত রইলেন! প্রথম শ্রেণীর খেলার ত্রিশতাধিক রানের গৌরব তাঁর বয়সে আর কেউ অর্জন করতে পারে নি। ক্রিকেটের পীঠস্থান ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়া যখন নেতিমূলক ব্যাধিতে আক্রান্ত, তখন উজ্জ্বল ক্রিকেটের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসরে নেমেছিলেন ফ্রাঙ্ক ওরেল। সারা জীবন তিনি সে প্রতিশ্রুতি বজায় রেখেছেন। ওরেল ক্রিকেটের শিল্পী, চমৎকার মেজে খেলতেন। তিন ডব্লুর মধ্যে তিনিই ছিলেন অলরাউণ্ডার। ব্যাটিং-এর মতো বোলিং-ফিল্ডিং'য়েও সমান দক্ষ। দক্ষতা ছিল তাঁর দল পরিচালনায়। ইংল্যাণ্ডে টেস্ট খেলার আগেই তিনি লীগ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করে সে-দেশবাসীকে মুগ্ধ করেছেন। ১৯৫০-এর সিরিজে তিনি দু দলের সেরা ব্যাটসম্যান। তাঁর রানের গড় ৮৯.৮৩। নটিংহামের খেলাটির আনন্দময় স্মৃতি কিছুতেই মুছে যাবার নয়। তিনি ঐ ম্যাচে যে ২৬১ রান করেন তার ২৩৯ রানই একদিনে সংগৃহীত হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল ৩৫টি বাউণ্ডারি ও ২টি ওভার বাউণ্ডারি। তিনিই একমাত্র ক্রিকেটার যাঁর জুটিতে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে দুবার পাঁচশতাধিক রান উঠেছে। দুবারই বারবাডোজের পক্ষে ত্রিনিদাদের বিরুদ্ধে জন গডার্ডের

সহযোগিতায় ১৯৪৩-৪৪এ ৫০২ রান (জুটি অবিচ্ছিন্ন) এবং ১৯৪৫-৪৬এ ক্লাইড ওয়ালকটের সহযোগিতায় ৫৭৪ রান (জুটি অবিচ্ছিন্ন)। ওরেল বাঁহাতি মিডিয়াম পেস বোলার ছিলেন। চমৎকার স্যুয়িং করাতেন। ১৯৫১-৫২য় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এডিলেড টেস্ট এক ইনিংসে ৩৮ রানে ৬টি উইকেট দখল করেন। ৫১ টি টেস্টে তিনি সর্বমোট খেলেছেন এবং ১৫টি টেস্টে দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। ওরেল পৃথিবীর প্রথম নিগ্রো অধিনায়ক। আদর্শ ক্রিকেটারের স্বীকৃতিতে তাঁকে স্যর উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে টেস্ট সিরিজে বিজয়ী দলের প্রাপ্য ট্রফি তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত হয়েছে। মাত্র ৪২ বছর বয়সে লিউকোমিয়া রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

ওয়ালকট, ক্লাইড লিওপোল্ড (১৯২৬—) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিখ্যাত তিন W-র অন্যতম ক্লাইড ওয়ালকট টেস্টম্যাচের ইতিহাসে সবচেয়ে সুসমঞ্জস ব্যাটসম্যান। বারবাডোজের এই খেলোয়াড়টির ব্যাটিং-এর ধারাবাহিক রেকর্ড একথার সারবত্তা প্রমাণ করবে। বিশালদেহী ওয়ালকটের হাতে ছিল অসম্ভব শক্তি—সোজা ড্রাইভে বল মাঠ পার করতেন। তাঁর প্রচণ্ড মারের মুখে দক্ষ বোলারদেরও লেংথ নষ্ট হয়ে যেত। ডেনিস কম্পটন তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, গ্রেট ম্যাচ-উইনিং ব্যাটসম্যান। স্কুলের ছাত্র হিসাবেই তিনি নিপুণ ড্রাইভ ও ব্যাক প্লের জন্যে সকলের নজরে পড়েন। তাঁর দীর্ঘদেহ বলের লাইনে সহজে পৌঁছতে সহায়তা করত বলে তিনি কিছু বাড়তি সুবিধা পেতেন। ১৯৪৭-৪৮এ তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেন। পরের বছরে ১৯৪৮-৪৯এ ভারত সফরে দুটি সেঞ্চুরি সহ তাঁর রানের গড় দাঁড়ায় (৭৫.৩৩)। ১৯৫৪-৫৫ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে ওয়ালকট সর্বাধিক সফল হন, সেবারে দুটি টেস্টে দু ইনিংসে সেঞ্চুরি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সেই সিরিজে মোট ৫টি সেঞ্চুরি করেন। সফরের শেষে রানের গড় দাঁড়ায় ৮২.৭০। ১৯৪৫-৪৬এ ত্রিনিদাদের বিরুদ্ধে বারবাডোজের খেলোয়াড় ওয়ালকট অপরাজিত ৩১৩ রান করেন। সেটি তাঁর ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান।

কনস্ট্যান্টাইন, লিয়ারী (১৯০২—১৯৭১) সর্বকালের অন্যতম সেরা অলরাউণ্ডার লিয়ারী ক্রিকেট-আকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। দ্রুত রান তোলায় তাঁর জুড়ি পাওয়া যায় না, জুড়ি পাওয়া যায় না তাঁর ফিল্ডিং নৈপুণ্যের—বিশেষত কভার পয়েন্ট ফিল্ডিং-এর। ১৯২৮ সালে এসেক্সের বিরুদ্ধে ৯০ মিনিটে ১৩০ রান কিংবা ১৯৩০-৩১ অস্ট্রেলিয়া সফরে তাসমানিয়ার

বিরুদ্ধে ৫২ মিনিটে শতরান তাঁর দ্রুত রান তোলার কয়েকটি

কনস্ট্যানটাইন ১৯২০-২২এ প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন। পরের বছরে ১৯২৩-এ ইংলণ্ড সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলভুক্ত হন। অবশ্য সেবারে কোন টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পায় নি। ১৯২৮ সালে তিনি পুনরায় ইংল্যাণ্ড সফরে আসেন। সেবারে তিনটি টেস্টে অংশগ্রহণ করলেও ফিল্ডারের ভূমিকা ছাড়া অন্যত্র স্বাভাবিক সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু কাউন্টি দলগুলির বিরুদ্ধে তাঁর সহজাত প্রতিভা লক্ষ্য করা করা যায়। সফরে লর্ডস মাঠে মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে তিনি ৮৬ রান করেন। পরে বল করতে এসে ১৪.৩ ওভারে ৫৭ রানের বিনিময়ে ৭টি উইকেট লাভ করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন দ্বিতীয় দফা খেলা শুরু করে তখন তাদের জয়লাভের জন্য ২৫৯ প্রয়োজন। কিন্তু ১২১ রান তুলতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৫টি উইকেট পড়ে যায়, কনস্ট্যানটাইন ১০৩ রান করেন, তার ভেতরে ২টি ছয় ও ১২টি চার ছিল। তিনি বিখ্যাত জি. ও. অ্যালেনের একটি বল একস্ট্রা কভারের ভেতর দিয়ে গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে চালান করে দেন।

কানহাই, রোহন বাবুলাল (১৯৩৫—) রোহন কানহাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। টেস্টে তাঁর ব্যাক্তিগত স্কোর ৬,২২৭ (গড় ৪৭.৫৩)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কেবলমাত্র গ্যারি সোবার্স এই রানসংখ্যা অতিক্রম করতে পেরেছেন। কানহাই সর্বমোট ৭১টি টেস্ট খেলেছেন। টেস্টে তাঁর সর্বোচ্চ রান ভারতের বিরুদ্ধে কলকাতার ইডেন উদ্যানে। সেবারে তিনি ২৫৬ রান করেন। ব্রিটিশ গায়নার পক্ষে ১৯৫৪-৫৫ সালে আত্মপ্রকাশের পর তিনি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া এবং ওয়ারউইকশায়ারের পক্ষে খেলেন। ১৯৭২ সালে ওয়ারউইকশায়ারকে লীগ চ্যাম্পিয়ান হতে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরেই গ্যারি সোবার্সের পরবর্তী অধিনায়ক হিসাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪এ বিদেশে ও স্বদেশে ইংলণ্ড দলকে পরাজিত করে রাবার দখল করেন। তিনি মোট ১৩টি টেস্টে অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের সর্বাধিক কৃতিত্বপূর্ণ ইনিংস ১৯৭৩ খ্রী লর্ডসের মাঠে। সেইবারে টেস্টে তাঁরই নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৮ উইকেটে ৬২৫ রান করে, তাঁর ব্যক্তিগত রান ছিল ১৫৭।

গডার্ড, জন ডগলাস ক্লড (১৯১৯—) ১৯৪৮-৪৯ জন সালে গডার্ড প্রথম ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ছিলেন। বারবাডোজের এই খেলোয়াড়টি একজন চৌখস ক্রিকেটার। ডানহাতে সুন্দর মিডিয়াম পেস বল করতেন। ব্যাট ধরতেন বাঁহাতে। তাঁর ছিল দুর্ভেদ্য রক্ষণশীল ব্যাটিং-ভঙ্গিমা। তবে সুযোগমত বল হাঁকড়াতেও জুড়ি ছিল না। তাছাড়া তিনি ছিলেন চমৎকার ফিল্ডার। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে গডার্ড যখন খেলতে আসেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। তাঁর সর্বাধিক রান অপরাজিত ২১৮ বারবা-ডোজে, ত্রিনিদাদ দলের বিরুদ্ধে। ১৯৪৩-৪৪র এই খেলায় তিনি ও ফ্র্যাঙ্ক ওরেল চতুর্থ উইকেটে ৫০২ রান যোগ করেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে তিনি জর্জটাউন টেস্টে ৩১ রানে ৫টি ইংলণ্ড উইকেট ও ১৯৫০এ ওভালে এক ইনিংসে ২৫ রানে ইংলণ্ডের ৪টি উইকেট লাভ করেন। ১৯৫০ ও ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ড সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ছিলেন গডার্ড। জীবনে মোট ২২টি টেস্টে দল পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপরে অর্পিত হয়।

গীবস, ল্যান্সেলট রিচার্ড (১৯৩৪—) ১৯৫৭ সালে রামাধীনের পরিবর্তে নূতন যে অফস্পিনারটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলভুক্ত হলেন তিনি ল্যান্স গীবস। প্রথম দিকে তিনি বিশেষ সফল হন নি কিন্তু ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর চমকপ্রদ সাফল্য আসে। এডিলেড টেস্টে তিনি হ্যাটট্রিক করেন, এবং ঐ সফরে গড় ২০·৭৮ রানের বিনিময়ে ১৯টি উইকেট পান। ১৯৭০ সালের মধ্যে তাঁর ঝুলিতে যত টেস্ট উইকেট জমা পড়ে ইতিপূর্বে কোন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বোলার তত উইকেট কখনও পান নি। অবশ্য তখন তাঁর ক্ষমতা কমে আসছে বলে বিবেচিত হচ্ছিল। কিন্তু ১৯৭২-৭৩ সালে তিনি আবার সর্বাধিক সফল অফস্পিন বোলার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অস্ট্রেলিয়ার ঐ সফরে তিনি দলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ২৬টি টেস্ট উইকেট (গড় ২৬·৮ রানে) দখল করেন। ১৯৬১-৬২ সালে তিনি একটি বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। ভারতের বিরুদ্ধে ব্রিজটাউনের সেই টেস্টে ভারতীয় দল খেলা অমীমাংসিত রাখবার জন্যে যখন উদগ্রীব তখন শেষ দিনে বিরতির পরে বল করতে এসে ১৫·৩ ওভার বল করে মাত্র ৬ রানে ৮ উইকেট দখল করেন। ১৯৬৩তে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে, ১৫৭ রানে ইংলণ্ড দলের ১১টি উইকেট দখল করে নিজ দলকে ঐ মাঠে জয়ী করেন। ১৯৭৬ সালে মেলবোর্নে ষষ্ঠ টেস্টে তিনি ফ্রেড ট্রুম্যানের ৩০৭ টেস্ট উইকেট দখলের রেকর্ড ভেঙে

৩০৯টি উইকেটে আপন ঝুলি বোঝাই করেন। ৭৯ টেস্টে খেলে গড় ২৯·০৯ রানের বিনিময়ে তাঁর এই উইকেট্ট সংগৃহীত হয়।

গোমেজ, জেরাল্ড এথ্ রিজ (১৯১৯—) গোমেজও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিখ্যাত অলরাউণ্ডার। ত্রিনিদাদের এই খেলোয়াড়টি দ্রুতহারে রান তুলতেন, মিডিয়াম পেসে সঠিক গুড লেংথ বল করে ব্যাটসম্যানকে বেঁধে রাখতে পারতেন আর নিখুঁত ফিল্ডিং করতেন। নির্ভুল নিশানায় বল করতেন তিনি, সে বল থেকে রান সংগ্রহ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। তাঁর অধিকাংশ ওভারই তাই মেডেন হত। ১৯৪৮-৪৯এ ভারত সফরে দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ২৪ রানে ৯ উইকেট লাভ তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর। ১৯৫১-৫২য় সিডনী টেস্টে একটি ইনিংসে বোলিং পরিবর্তন না ঘটিয়ে আগাগোড়া বল করে ৫৫ রানের বিনিময়ে তিনি ৭টি উইকেট দখল করেন। ঐ সফরে তাঁর ঝুলিতে গড় ১৯·৭৬ রানের বিনিময়ে ৩০টি উইকেট জমা পড়ে।

গ্রীফিথ, চার্লস ক্রিস্টোফার (১৯৩৮—) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার। ১৯৬৩ সালে ইংলণ্ড সফরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ঐ সফরে তিনি গড় ১৬·২০ রানের বিনিময়ে ৩২টি টেস্ট উইকেট ও সর্বমোট ১১৯টি উইকেট (গড় ১২·৮৩ রানে) দখল করেন। দীর্ঘদেহ ও সুস্বাস্থ্য গ্রীফিথকে অতিরিক্ত সুবিধা এনে দিত। তাঁর উচ্চতা ছিল ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং ওজন ছিল ২১০ পাউণ্ড। ঝড়ের বেগে তিনি বল করতেন—যে বল খেলা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল তাঁর ডেলিভারি নিয়ে বারংবার নানা প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে। কিন্তু বল ছোঁড়ার অপরাধে মাত্র ২ বার নো বল হয়েছে। টেস্ট ম্যাচে তিনি দীর্ঘদিন অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। ২৮টি টেস্ট অংশ গ্রহণ করে তিনি ২৮.৫৪ রানের বিনিময়ে ৯৮টি উইকেট লাভ করেছেন।

ভ্যালেণ্টাইন, আলফ্রেড লুইস (১৯৩০—) জ্যামাইকার বাঁ-হাতি স্লো স্পিন বোলার। ১৯৫০ সালে ইংলণ্ডে খেলতে এসে গড় ২০-৪২ রানের বিনিময়ে ৩৩টি উইকেট দখলের ফলে ভ্যালেণ্টাইনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইনের যুগপৎ আক্রমণে সে দফায় ইংলণ্ড সত্যিই বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। রামাধীন যদিও সেই সফরে ভ্যালেণ্টাইনের চেয়ে বেশি উইকেট দখল করেছিলেন তবু ভ্যালেণ্টাইন একাধিক টেস্ট ম্যাচে দশটির বেশি উইকেট পাবার অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টারে প্রথম টেস্ট

খেলার আসরে যোগদান করে তিনি ২০৭ রানে ১১টি উইকেট পান, ওভালে পান ১০টি উইকেট ১৬০ রানের বিনিময়ে। ১৯৫০ সালে ঐ ম্যাঞ্চেস্টার মাঠে ল্যাঙ্কাশায়ার দলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ২৬ রানে ৮টি ও ৩১ রানে ৫টি উইকেট পান। ক্যান্টারবেরিতে মাত্র ৬ রানে কেন্ট দলের ৫টি উইকেট দখল করেন। ১৯৫২ রানে তিনি বার্মিংহাম লীগ ক্রিকেটে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৬০-৬১ সালে শেষবারের মত অস্ট্রেলিয়া সফরে যান। সেবারও ক্লান্তিহীন একটানা বল করে তাঁর সক্ষমতার পরিচয় দেন। পুরো সফরে তিনি ৩৯টি উইকেট পান। একমাত্র ওয়েলেসলী হলই তাঁর চেয়ে বেশি উইকেট দখলের অধিকারী ছিলেন।

রামাধীন, সোনী (১৯৩০—) যুদ্ধোত্তরকালের সেরা ডানহাতি মিডিয়াম স্লো বোলার ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খ্যাতকীর্তি সোনী রামাধীনের পূর্ব-পুরুষ ভারতবর্ষের মানুষ। ১৯৫০ সালে তিনি যখন ইংলণ্ড যান তখন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর অভিজ্ঞতা সামান্য অথচ মরসুমের শেষে তিনি অত্যন্ত পরিণত ক্রিকেটার। বলকে দুমুখী স্পিন করিয়ে ম্যানচেস্টারের প্রথম টেস্টে তিনি ৯০ রানে ২ উইকেট ও ৭৭ রানে ২ উইকেট দখল করেন। অথচ লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে পরপর ১০টি মেডেন ওভার বল করেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও করেন ১১টি। অর্থাৎ তখনই ইংলণ্ড দলের কাছে তাঁর বল ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ঐ টেস্টে তিনি ৬৬ রানে ৫টি ও ৮৬ রানে ৬টি উইকেট পান। ইংলণ্ড সফরের শেষে তাঁর ঝুলিতে জমা পড়ে ২০০৯ রানে ১৩৫টি উইকেট (গড় ১৪.৮৮ রানে)। অবশ্য রামাধীনের বোলিং-এর ধার পরবর্তী সফরে অনেক ভোঁতা হয়ে এসেছিল। ১৯৫৭র ইংলণ্ড সফরের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪৯ রানে ৭ উইকেট পান। সোনী রামাধীন মোট ১৫৮টি টেস্ট উইকেট পান গড় ২৮.৯৬ রানের বিনিময়ে। পরে ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করতেন। যখন প্রথম শ্রেণীর খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেন তাঁর সংগ্রহে সর্বমোট ৭৫৮টি উইকেট।

রিচার্ডস, আইজাক ভিভিয়ান আলেকজাণ্ডার (১৯৫২—) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সুযোগ্য ব্যাটসম্যান, মর্যাদাপূর্ণ চলাফেরায় মাঠে তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠত। ১৯৭৬এ ইংলণ্ড সফরে অত্যন্ত সফল হন, সেবার দুটি টেস্টে দ্বিশতাধিক রান করার কৃতিত্ব অর্জন করেন, এবং সে সিরিজে মোট ৮২৯ রান (গড় ১১৮.৪২) করেন। ফলে ১৯৭৬ সালে অর্থাৎ একটি ক্যালেণ্ডার বর্ষে তাঁর

সংগৃহীত রানের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭১০, যার মধ্যে ৭টি সেঞ্চুরি ছিল। এই অসাধারণ ক্রিকেটারটি মাত্র ১৯৭১-৭২ সালে লীওয়ার্ড দ্বীপের পক্ষে প্রথম মাঠে নামেন। তারপর থেকে সম্মিলিত দ্বীপপুঞ্জের পক্ষে নিয়মিত খেলেন। ১৯৭৪ সালে সমারসেট দলে যোগদান করেন।

লয়েড, ক্লাইভ বার্বাট (১৯৪৪—) দক্ষ বাঁ হাতি ব্যাটসম্যান, নিপুণ ফিল্ডার এবং ডানহাতি মিডিয়াম পেস বোলার। ১৯৬৬-৬৭তে ভারত সফরে দলের সঙ্গে এসে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। প্রথম ইনিংসেই ভারতীয় ফিল্ডারদের অসতর্কতায় জীবন ফিরে পান এবং একটি উজ্জ্বল ইনিংস উপহার দেন। শতাধিক রানের সেই ইনিংস ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে বিজয়ীর মালায় ভূষিত করে। তারপরে ক্লাইভ লয়েড অনেক উজ্জ্বল ব্যাটিং-এর নিদর্শন রেখেছেন ও স্বীয় দলকে জয়লাভের পথে টেনে নিয়ে গেছেন। অবশ্য ১৯৭৩এ অস্ট্রেলিয়া সফর পর্যন্ত তাঁর সাফল্য অনিয়মিত ছিল, কখনও কখনও তিনি ব্যর্থও হয়েছেন। কিন্তু তৎপরবর্তী কালে তাঁর যাত্রা কেবলমাত্র সাফল্যের কুসুম-বিছানো পথে। ভারত-পাকিস্তান সফরে তিনি অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বদেশে ভারতীয় দলের বিরুদ্ধে সিরিজ জয়ে দলের নেতা ছিলেন। ১৯৭৬-এর ইংলণ্ড সফরেও। ব্রিটিশ গায়নার পক্ষে ১৯৬৩তে প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন। ল্যাঙ্কাশায়ারের পক্ষে খেলেছেন। তাঁর ৮টি মরসুমের মধ্যে ৬ বার সেরা কাউন্টি ব্যাটসম্যান বিবেচিত হন। ১৯৭৬ সালে গ্লামারগনের বিরুদ্ধে দ্রুততম ডবল সেঞ্চুরির অধিকারী জেসপের রেকর্ড স্পর্শ করেন। ঐ ম্যাচে ১২০ মিনিটে তিনি ২০১ রান করেন। ১৯৭৪-৭৫-এ ভারতের বিরুদ্ধে বোম্বাই টেস্টে অপরাজিত ২৪২ তাঁর সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর। ১৯৭০এ বোলিংএ সাফল্যের নজির ল্যাঙ্কাশায়ারে বিরুদ্ধে ৪৮ রানে ৪ উইকেট দখল করা। ঐ খেলা ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সোবার্স, স্যার গারফিল্ড সেণ্ট, আউব্রান (১৯৩৬—) ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডারের নাম গ্যারি সোবার্স। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই বাঁহাতি ক্রিকেটারটি টেস্টে রান করেছেন ৮০৩২ যা আজ পর্যন্ত ব্যক্তিগত সংগ্রহে সর্বাধিক টেস্ট রান। তাঁর রানের গড় ৫৭·৭৮। আর টেস্ট উইকেট দখল করেছেন ২৩৫টি (গড় ৩৪·০৩ রানের বিনিময়ে) ব্যাট-বলের নৈপুণ্য ছাড়াও ফিল্ডিং'এ তাঁর জুড়ি মেলা ভার। আর দল পরিচালনা? তিনি অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড ও ভারতের বিরুদ্ধে তাঁর দলকে নিপুণভাবে পরিচালনা

করে রবার জয় করেছেন। ১৯৭০এ ইংলণ্ড ও ১৯৭১-৭২এ অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর পরিচালিত বিশ্ব একাদশ দল বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। ব্যাটে বলে ফিল্ডিংএ দল পরিচালনায় সৌজন্যবোধে এমন একটি ব্যক্তিত্বের নজির আর কখনও পাওয়া যায় নি, কখনও পাওয়া যাবে কি না তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। ১৯৫৪-৫৫ সালে অসুস্থ ভ্যালেণ্টাইনের পরিবর্তে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার জন্যে সোবার্সের ডাক পড়ে। তখনও তিনি ১৮ বছর বয়সে পা দেন নি। তার আগে সোবার্স মাত্র দুটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছিলেন। ১৯৬৬ সালের ইংলণ্ড সফরে তিনি সাফল্যের শীর্ষে ওঠেন, ঐ সিরিজে ৭২২ রান (গড় ১০৩.১৪) সংগ্রহ করেন। ২০টি উইকেট (গড় ২৭.২৫ রানে) পেয়ে বোলিংএও দ্বিতীয় শীর্ষ-স্থানাধিকারী হন। তাঁর মতো প্রতিভাসম্পন্ন বাঁহাতি বোলার সে দেশে আর দেখা যায় নি। তাঁর আপন দল বারবাডোজ ছাড়াও তিনি দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেছেন। ইংলণ্ডে লীগ ক্রিকেট খেলেছেন। ১৯৬৮ সালে নটিংহামশায়ার দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ৯৩টি টেস্ট ও ১০ টি বিশ্ব একাদশের খেলায় অংশ গ্রহণের পর অবসর গ্রহণ করেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় তাঁর সংগ্রহ ২৮,৩১৫ রান (গড় ৫৪.৮৭) ও ১০৩৩ উইকেট (২৭.৭৪ রানে)। টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৫৭-৫৮র কিংস্টনে অপরাজিত ৩৬৫ রান এখনও পর্যন্ত টেস্ট ম্যাচে ব্যক্তিগত রানের সর্বোচ্চ রেকর্ড।

স্টলমেয়ার, জেফরি বক্সটার (১৯২১—) মাত্র ১৮ বছর বয়সে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে খেলতে এসেই এই দীর্ঘদেহী স্টাইলিশ ওপেনিং ব্যাটসম্যানটি তাঁর উন্নত ক্রীড়াশৈলীর স্বাক্ষর রাখেন। সেটি ১৯৩৯ সাল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ইনিংস টউনটন টেস্টে মাত্র ৮৪ রানে মুড়িয়ে গেলেও তরুণ স্টলমেয়ার ৪৫ রানে অপরাজিত থাকেন। তিনি খুবই কেতাদুরস্ত খেলোয়াড় ছিলেন। মোট ৩২টি টেস্ট ম্যাচ খেলে ১৩টিতে দলেব নেতৃত্ব দেন। মোট রান করেন ২১৫৬। ত্রিনিদাদ বনাম ব্রিটিশ গায়নার খেলায় ত্রিনিদাদে ১৯৪৬-৪৭ সালে ৩২৪ রান তাঁর সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর; টেস্টে ১৯৪৮-৪৯ মাদ্রাজে ভারতের বিরুদ্ধে ১৬০ রান টেস্টে তাঁর সর্বোচ্চ রান। ঐ ম্যাচে এ. এফ. রে-র সহযোগিতায় তিনি প্রথম উইকেট জুটিতে ২৩৯ রান করেন—সেটি আজও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের টেস্ট ম্যাচে প্রথম উইকেট জুটির সর্বোচ্চ স্কোর।

স্মিথ, ওনীল গর্ডন (১৯৩৩-৫৯) কলি স্মিথ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট

দলের একটি উজ্জ্বল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী জ্যোতিষ্ক। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আত্মপ্রকাশের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই একটি মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। ১৯৫৪-৫৫ সালে প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করার পর তৃতীয় ম্যাচটিতেই জ্যামাইকার পক্ষে খেলতে নেমে সফররত অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে ১৬৯ রান করেন; ফলে তাঁর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই সিরিজেই টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগ পেয়ে ৪৪ ও ১০৪ রান করেন। স্মিথ জোরালো মেরে খেলায় বিশ্বাসী ছিলেন। একটি খেলায় ৬টি ওভার বাউণ্ডারি ও ৪টি বাউণ্ডারির সাহায্যে তিনি ৭৯ রান করেন। ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট আবির্ভাবেই তিনি বার্মিংহামে ১৬১ রান করেন। সে খেলায় জিম লেকারের একটি বল এত জোরে হাঁকড়েছিলেন যে সেটি উড়ে গিয়ে দূরে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ব্যালকনির ছাদের টালি ফুটো করে দেয়।

হল, ওয়েলসলি উইনফিল্ড (১৯৩৭—) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীর অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার ওয়েলসলি হল। ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ড সফরে প্রথমবারে গিয়ে ব্যর্থ হলেও তার ২০তম টেস্টেই শততম উইকেট দখলের কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারত-পাকিস্তান সফরকালে মাত্র ৮টি টেস্টে গড় ১৫·০৮ রানের বিনিময়ে তিনি ৪৬টি উইকেট লাভ করেন। এই সফরে তিনি একটি টেস্টে হ্যাটট্রিক করেন। ঐ কৃতিত্ব এই প্রথম একজন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান বোলারের কপালে জুটল। ১৯৫৯-৬০ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পায়। কিংসটনের টেস্টের প্রথম ইনিংসে তিনি ৬৯ রানে ৭টি উইকেট অধিকার করেন। অস্ট্রেলিয়া সফরেও তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯৬৩-তে লর্ডস মাঠে বিরতিহীন একটানা ৪০ ওভার বল করেন, কিন্তু তিনি এতটুকু ক্লান্ত হন নি, তাঁর বলের পেসও নষ্ট হয় নি। সে ইনিংসে তিনি ৯৩ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট দখল করেন। ৪৮টি টেস্ট ম্যাচে তিনি মোট ১৯২টি উইকেট পেয়েছেন।

হাণ্ট, কর্নার্ড ক্লিফোর্ড কাস (১৯৩২ —) ১৯৬৭'র পয়লা জানুয়ারি কলকাতায় ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্টে ম্যাচে যে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড ঘটেছিল তাতে যে মানুষটির ভূমিকা বারবার সকলের মনে পড়েছিল তিনি সফরকারী দলের সহ অধিনায়ক কনার্ড হাণ্ট। তিনি টেস্টের আসরে প্রথম এসেই ব্রিজটাউনে পাকিস্তান দলের বিরুদ্ধে পিটিয়ে খেলে ১৪২ রান করেন। সেটা ১৯৫৭-৫৮ সালের পাকিস্তান দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর। তার পরবর্তী কালে তাঁর প্রত্যয়দৃঢ় অনেক চমৎকার ব্যাটিং-এর ইনিংস দেখা গেছে। সেই সফরেই পাকিস্তানের

বিরুদ্ধে কিংস্টনে সোবার্সের সহযোগিতায় ৪১৬ রান করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের পক্ষে ২য় উইকেটে সর্বাধিক রান করার রেকর্ড করেছেন। জ্যামাইকার বিরুদ্ধে ২৬৩ তাঁর সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর। ব্যাটিং-এর মতো আউটফিল্ডেও তাঁর জুড়ি বড় বেশি ছিল না। ১৯৬৩তে ইংলণ্ড সফরে দলের সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হন। সেবারের টেস্ট সিরিজে তিনি ছিলেন ব্যাটিং-এর গড়ে শীর্ষ স্থানের অধিকারী (৫৮·৮৭)। ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠে সাড়ে আট ঘণ্টার একটি অসাধারণ ইনিংস খেলে রান করেন ১৮৬। আবার ১৯৬৭-তে ঐ মাঠেই একটি ঝকঝকে টেস্ট ইনিংসে উইকেটের চারদিকে মেরে ১৩৫ রান করেন। আবার সেই দলের বিরুদ্ধে ২টি ওভার বাউণ্ডারি ও ৩১টি বাউণ্ডারির সাহায্যে অপরাজিত ২০৬ তাঁর আরেকটি উজ্জ্বল ব্যাটিং-এর নজির। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তিনি গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসম্যান। ৪৪টি টেস্ট তাঁর রানের গড় ৪৫.০৬। কর্নাড হাণ্ট ল্যাঙ্কাশায়ার লীগেও খেলেছেন।

হেডলী, জর্জ আলফানসো (১৯০৯—) জর্জ হেডলী কালা ব্রাডম্যান হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ডাকনামেই বোঝা যায় তাঁর ব্যাটিং খ্যাতি কতখানি ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। তিনি জ্যামাইকার খেলোয়াড় ছিলেন এবং বয়স ২১ পৌঁছবার আগেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯২৯-৩০-এর টেস্ট ম্যাচে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে তাঁর আসন পাকা করে নেন এবং ১৯৫৩-৫৪ সাল পর্যন্ত সে আসন প্রায় অটল ছিল। ১৯৫৩-৫৪-য় তিনি টেস্ট ম্যাচ থেক অবসর গ্রহণ করেন। ২২টি টেস্ট খেলে তিনি কুশলী ব্যাটসম্যান হিসাবে গড় রান করেন ৬০·৮৩। এটি শীর্ষস্থানীয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের মধ্যে অন্যতম গড়। হেডলী তাঁর প্রথম টেস্ট আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি (১৭৬) করেন। তৃতীয় টেস্টে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন। চতুর্থ টেস্টে ২২৩ রান করেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম সফরে ব্রিসবেন টেস্টে করেন ১৯৩ রান এবং সিডনী টেস্টে করেন ১০৫। ১৯৩৯ সালে লর্ডস মাঠে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করে ঐ মাঠে একটি রেকর্ড করেন, ১৯৩৪-৩৫ সালে কিংস্টনে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান অপরাজিত ২৭০ করেন। হেডলীর বিস্ময়কর রানের গড় দেখে অনেকেই বিস্মিত হবেন, কিন্তু এ তথ্য তাঁদের বিস্ময়কে বর্ধিত করবে যখন তাঁরা জানবেন যে এই রান এমন দলের পক্ষে করেছেন যে দল তখন হারের বিরুদ্ধেই লড়াই করছে। ১৯৩০-৩৯ এই কয় বছরে তিনি টেস্টে রান করেছেন ২১৩৫, যার গড় ৬৬·৭১। তাঁর এই রানসংখ্যা ঐ সময়ে বাকী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়েরা যত রান করেছেন তাঁর এক-চতুর্থাংশের চেয়ে বেশী।

ক্রিকেট ও ক্রিকেটার : ভারত

ক্রিকেট ভারতে এসেছিল ইংরেজদের পেছু পেছু। এটাই স্বাভাবিক। কেননা ক্রিকেট পুরোদস্তুর ইংরেজদের খেলা। ইংরেজরা যে দেশেই গেছে সঙ্গে নিয়ে গেছে বাণিজ্যপোত আর ক্রিকেট।

ভারতে ক্রিকেট খেলার শুরু আজকে নয়। এমন কি পলাশীর যুদ্ধের আগেও ভারতের মাটিতে ক্রিকেট খেলা হয়েছিল এমন নজির আছে। যতদূর জানা যায় ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কচ্ছের বন্দরে দুদল ইংরেজ নাবিকের মধ্যে ক্রিকেট খেলা হয়েছিল। অবশ্য ইংরেজদের এদেশে আনাগোনা শুরু হয়েছিল এরও প্রায় একশ বছর আগে। তাই এ সময়ের মধ্যে কোন খেলা হয়েছিল কিনা তা জোর করে বলা যায় না। হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে তার কোন লিখিত বিবরণ নেই।

অবশ্য ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে যে খেলাটি হয়েছিল তা কোন ভারতীয় দর্শক দেখেছিল কিনা জানা নেই। দেখলেও তাদের মধ্যে আগ্রহ নিশ্চয়ই ছিল না। কেননা এরপর বহু বছর ধরে যেসব খেলার বিবরণ পাওয়া গেছে তাতে কোন ভারতীয় যোগ দেয় নি। সাম্রাজ্য লাভ করার পর ইংরেজদের মধ্যে যে উন্নাসিকতা ও অহংকার দেখা দিয়েছিল, আদিপর্বে (অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের আগে) তা না থাকাই স্বাভাবিক। তবুও এটাও ঠিক, অপরিচিত এ জটিল খেলাটির দিকে কোন স্থানীয় অধিবাসীর আগ্রহ হওয়া অসম্ভব। যাই হোক আদিপর্বে ক্রিকেট খেলা সম্ভবত সীমাবদ্ধ ছিল ইংরেজদের বাণিজ্যকেন্দ্র আর সেনা ছাউনিগুলিতে। তারপর ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হল পলাশীর যুদ্ধ। প্রায় ফাঁকতালেই একটা গোটা রাজত্বের অধিকারী হয়ে বসল ইংরেজরা। আরও প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর লাগল তাদের এদেশে থিতু হয়ে বসতে। ওয়ারেন হেস্টিংস দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যটিকে মুঠোয় আনলেন। ইংরেজরা বুঝল এদেশে তাদের থাকতে হবে অনেক দিন। ইংরেজরা প্রথম বাংলাদেশে অধিকার করেছিল ব'লে নতুন গড়ে ওঠা কলকাতা শহর হল তাদের প্রধান আস্তানা। এই কলকাতাতেই পত্তন হয়েছিল প্রথম ক্রিকেট

ক্লাবের ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে। তার নাম ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। ইংল্যাণ্ডের বাইরে এটাই হল সর্বপ্রাচীন ক্রিকেট ক্লাব। খেলার জন্য বেছে নেওয়া হল ইংল্যাণ্ডের ইডেন গার্ডেন অঞ্চলটি। এ অঞ্চল ঘিরেই তখন গড়ে উঠেছিল ভারতের নতুন প্রভুদের বসতি। সে হিসেবে ইডেন গার্ডেনও ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে আছে। ধারাবাহিক ক্রিকেট খেলার এমন নজির পৃথিবীর আর খুব কম মাঠেরই আছে। বয়সও এর হতে চলল প্রায় দুশ বছর।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীরা এ ক্লাবের পত্তন করেছিল। কোন দেশীয় ব্যক্তিকে এ ক্লাবের সভ্য করা হত না। অবশ্য দেশীয়রা তখন এ খেলা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয় নি।

কলকাতায় প্রথম ক্রিকেট ক্লাব স্থাপিত হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রথম কোন প্রতিযোগিতমূলক খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বোম্বাইতে ১৮৯৭ সালে। কলকাতায় প্রথম প্রতিযোগিতামূলক খেলা হল ১৮০৪ সালে। প্রতিযোগী দল দুটি ছিল 'ওল্ড ইটোনীয়ান' বনাম 'জেণ্টলমেন অব ক্যালকাটা'। রবার্ট ভ্যান্সিটার্ট এ খেলায় সেঞ্চুরি করেছিলেন। কলকাতার মাঠে প্রথম সেঞ্চুরি।

কলকাতার মাঠে ক্রিকেট খেলা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হলেও বাঙালীদের মধ্যে এ খেলা তেমন সাড়া জাগাতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। বরং ইংরেজের সঙ্গে আসা অপর খেলা ফুটবল স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে অনেক বেশি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। অবশ্য কোন কোন কলেজে ইংরেজ অধ্যাপকের উৎসাহে বাঙালী ছাত্ররা ক্রিকেট খেলা শুরু করেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্রিকেট ক্লাবের পত্তন হয় ১৮৭৮ সালে। উদ্যোক্তা ছিলেন নাকি একজন এদেশী অধ্যাপক! অবশ্য বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক সারদারঞ্জন রায় ও তাঁর পরিবারের ক্রিকেটে আবির্ভাব এর খুব পরের কথা নয়।

পশ্চিম ভারতে ব্যাপারটা কিন্তু হল অন্যরকম। বোম্বাইয়ের পারসী সম্প্রদায় ক্রিকেটে অনেক বেশি আগ্রহ প্রকাশ করল। তার কারণও ছিল। বোম্বাইয়ের পারসীরা ছিল ধনী। ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্যের লেনদেন তাঁদের মধ্যে ছিল বাঙালীদের তুলনায় অনেক বেশি। আর কে না জানে ক্রিকেট প্রধানত ধনীদের খেলা। তাই মধ্যবিত্ত এবং মূলত চাকুরিজীবী বাঙালীদের মধ্যে ক্রিকেটের ব্যাপক প্রচলন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণেই সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে ইংরেজদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে যুক্ত থেকে ইংরেজী প্রথার জীবনযাত্রা আর আদবকায়দার সঙ্গে পারসীরা সহজে পরিচিত

হতে পেরেছিল। প্রধানত পারসীদের প্রচেষ্টাতেই বোম্বাই অঞ্চলে ক্রিকেট বেশি করে শিকড় গাড়তে পেরেছিল।

এ প্রসঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলোর উদ্যোগকেও স্মরণ করা যেতে পারে। রাজনৈতিক কারণে বন্ধুতামূলক বশ্যতার কল্যাণে নামে-মাত্র স্বাধীন দেশীয় রাজ্যগুলো বিলিতি আদবকায়দা আর বিলাসবহুল জীবনযাত্রা অনুকরণ করতে শুরু করেছিল। পাতিয়ালা, বরোদা, নবনগর, হোলকার প্রভৃতি অঞ্চলে ক্রিকেট অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অতীতের দিকপাল বহু ভারতীয় ক্রিকেটার এসব অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।

১৮৪৮ সালে পারসী ক্রিকেটারদের দ্বারা স্থাপিত হল 'দ্য ওরিয়েন্টাল ক্লাব।' কিন্তু দুবছরের মধ্যেই ক্লাবের মধ্যে দেখা দিল ভাঙন। একদল তরুণ ১৮৫০ সালে তৈরি করল একটি নতুন ক্লাব। ক্লাবের নাম হল 'ইয়ং জোরাসট্রিয়ান্‌স্‌ ক্লাব'। ক্লাবটি এখনও টিকে আছে। সে হিসেবে এটিই বর্তমানের প্রাচীনতম ক্রিকেট ক্লাব।

পারসীদের এ উদ্যম হিন্দুদের মধ্যেও প্রভূত উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। পারসীদের দেখাদেখি তাঁরাও একটি ক্লাব স্থাপিত করলেন ১৮৬৬ সালে। তার নাম হল বোম্বে ইউনিয়ন হিন্দু ক্রিকেট ক্লাব।

ইতিমধ্যে দ্য ইয়ং জোরাসট্রিয়ান ক্লাব সম্ভবত কিছুটা শক্তিশালী হয়েছিল। ১৮৭৭ সালে তাই পারসী দলের সঙ্গে ইংরেজ দলের খেলা হল। সম্ভবত কোন ভারতীয় দলের সঙ্গে কোন বিদেশী দলের এটাই প্রথম খেলা। ইংরেজ দল মাত্র ৬৩ রানে জয়লাভ করেছিল। এ খেলার সবচাইতে মজার ব্যাপার হল এতে কোন বাউণ্ডারিতে রান হয় নি। দুটো দলই স্কোর করেছিল খুচরো রানের সাহায্যে।

এইচ. ডি. প্যাটেল নামে জনৈক পারসী যুবক বিলেতে ডাক্তারী পড়তে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ক্রিকেট কিছু রপ্ত করেছিলেন। ডাক্তার হয়ে এদেশে ফিরে তিনি ক্রিকেট শিক্ষার্থে আগ্রহী হয়েছিলেন। বিখ্যাত শিল্পপতি স্যর দোরাবজি টাটার উদ্যোগে ১৮৮৪ সালে পারসী জিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন যুগ শুরু হল। একটি পারসী ক্রিকেট দল এ বছর বেসরকারী সফরের জন্য ইংল্যাণ্ডে গেল। এ দলের অধিনায়ক ছিলেন ডঃ এইচ. ডি. প্যাটেল। ইংল্যাণ্ডে এ দল সবশুদ্ধ ২৮টি ম্যাচ খেলেছিল। তার মধ্যে একটি জয়, আঠারটি পরাজয় এবং আটটি খেলা অমীমাংসিত হয়েছিল।

১৮৮৮ সালে আরেকটি পারসী দল ইংল্যাণ্ড সফরে যান। পেস্তনজী কাঙ্গা ছিলেন এদলের অধিনায়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পরবর্তী কালের বিখ্যাত ক্রিকেটার ডঃ কাঙ্গা ছিলেন পেস্তনজীর ভাইপো। এ সফরে সবচাইতে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ডঃ পাবরী। ব্যাটে বলে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। এ সফরে তিনি ১৩.৬১ গড় রান দিয়ে মোট ১৭০টি উইকেট পেয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব বটে। অন্য কোন ভারতীয় বোলার সম্ভবত পরবর্তী কালে এ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। পারসী দল সবশুদ্ধ ৩১টি ম্যাচ খেলেছিল। সফরের ফলাফল: আটটি জয়, এগারটি পরাজয় এবং বারটি অমীমাংসিত।

দুটি সফরের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় ভারতীয় দলের খেলায় ক্রমিক উন্নতি সূচিত হয়েছে। সম্ভবত এ দলের কৃতিত্বের স্বীকৃতিতে এ বছরেরই শেষের দিকে একটি ইংরেজ দল ভারত সফরে আসেন। এ দলের অধিনায়ক ছিলেন জি. এফ. ভেরনন। ইনি ছিলেন মিড্‌ল্‌সেকসের খেলোয়াড়। ইংল্যাণ্ডের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টও খেলেছিলেন তিনি। এ দলে আরও তিনজন টেস্ট খেলোয়াড় ছিলেন লর্ড হক, এ. এন. হর্নবি এবং এইচ. ফিলিপসন। এ দল মোট বারোটি ম্যাচ খেলেছিল। তার মধ্যে দশটিতে জয়, একটিতে পরাজয় হয়েছিল। বাকি খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য, পারসীদলের কাছে ইংরেজদল পরাজিত হয়েছিল। ডঃ পাবরী দু ইনিংসেই নটি করে উইকেট পেয়েছিলেন। ফলে ইংরেজদল ৯৭ আর ৬১ রানে ধ্বসে গিয়েছিল।

এরপর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইংরেজ দলটি ভারত সফরে আসে। সপ্তম লর্ড হক মার্টিন ব্লাডেন ছিলেন অধিনায়ক। ইনি ইয়র্কশায়ার দলের অধিনায়ক ছিলেন ১৮৮১ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। ইনি মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের সভাপতি ছিলেন ছ'বছর (১৯১৪-১৯১৯ খ্রী)।

এ দলের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন স্ট্যানলি জ্যাকসন। ইনি একজন সেরা অল রাউণ্ডার ছিলেন। ১৯০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইনি অধিনায়কও হয়েছিলেন। স্যার জ্যাকসন ছাড়াও দলের অপর উল্লেখযোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন সেকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার হ্যাস্টলটাইন।

পারসীদলের সঙ্গে এ দলের দুটি খেলা হয়েছিল। একটি খেলায় পারসী দল ১০৯ রানে জিতেছিল। ইংরেজ দল পরের খেলায় মাত্র সাত রানে জিতে

রান বাঁচিয়েছিল। পারসী দলের হয়ে ভাল খেলেছিলেন ড. পাবরী, বি. সি. মছলিওয়া, ডিঃ এন. রাইটার এবং এন. সি. বাপসোলা।

সমকালে ইংল্যাণ্ডে একজন ভারতীয় খেলোয়াড় তাঁর প্রতিভার ছটায় ইংরেজদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। তার নাম প্রিন্স রণজিৎ সিংহ, নওনগরের জামসাহেব। ক্রিকেটের ইতিহাসে তিনি 'রণজি' নামে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ব্যাটিংয়ের দাপটে তিনি তখন ইংল্যাণ্ডের মাঠ কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন। পরাধীন ভারতবাসীর একজন হয়েও নিজের কবজির জোরে তিনি ইংরেজদের মধ্যে আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্রিকেট মাঠে রণজির ধারাবাহিক সাফল্য এবং ইংল্যাণ্ড দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্যুচ্চমক ব্যাটিং তাবৎ ক্রীড়ানুরাগীর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভাবে তাঁর রাজসিক সেঞ্চুরি আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। যদিও রণজি কোনদিন ভারতের পক্ষে টেস্ট খেলেন নি, তবুও তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্য ও কৃতিত্ব ইংল্যাণ্ডের কাছে ভারতীয় ক্রিকেটের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে ১৮৯৬ সালে ৫ই অক্টোবর সংখ্যায় লণ্ডনের বিখ্যাত টাইম্‌স্ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : Prince Ranjitsinji's victory has enabled the average Englishman to realise India, and has made him respect Indians to a degree that no other triumph could have secured. প্রধানত রণজির একক কৃতিত্বে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের মর্যাদা বেড়ে গেল বহুগুণ।

তৃতীয় একটি ইংরেজ দল ভারত সফরে এল ১৯০২-৩ সালে। দলের নাম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অ্যাথলেটিকস। অধিনায়ক ছিলেন কে. জে. কী। এ দল মোট উনিশটি ম্যাচ খেলে বারোটি জয়, দুটি পরাজয় এবং পাঁচটি অমীমাংসিত খেলা দিয়ে সফর শেষ করে। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করেছিলেন এফ. এচ. হলিন্স এবং এ. এইচ. হর্নবি। উভয়েই সফরে মোট ১০০০ রানের কোটা ছাড়িয়ে যান। স্পিন বোলার হেওয়ার্ড ১০.৯০ গড় রানে ১০০টি উইকেট লাভ করেন। সফরকারী দলের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য খেলা ছিল বোম্বাইতে প্রেসিডেন্সি একাদশের বিরুদ্ধে স্থানীয় দলের ব্যাটসম্যান গ্রীগ চমৎকার ভাবে ব্যাট করে দলের মোট রানসংখ্যা ৪১২-র মধ্যে একাই ২০৪ রান করেন। আগন্তুক দলের উইলিয়মও ১০৫ রান করেছিলেন। স্থানীয় দল ৪৬ রানে জয়লাভ করেছিল।

ভারতীয় ক্রিকেটের উল্লেখযোগ্য পট পরিবর্তন ঘটে ইউরোপীয় এবং পারসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বার্ষিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রবর্তনে। নিয়মিত প্রতিযোগিতা হলে স্বাভাবিক ভাবেই খেলার আগ্রহ, দায়িত্ব ও মান বেড়ে যায়। দ্বিদলীয় প্রতিযোগিতা চলেছিল ১৮৯৫ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত। ১৯০৭ সালে প্রতিযোগিতায় হিন্দু দলও যোগ দিয়েছিল। ফলে এটি ত্রিদলীয় প্রতিযোগিতা বলে গণ্য হতে থাকে। ১৯১২ সালে মুসলিম দল যোগ দিলে এটি চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়। চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতার ফলে ক্রিকেট সম্পর্কে ভারতীয় দর্শকদের উৎসাহ ও আগ্রহ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। খেলার কাল পরিধি এবং সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় নতুন খেলোয়াড়ও তৈরি হতে থাকে অনেক বেশি করে। চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতার জন্যই ভারতে ক্রিকেট জনপ্রিয়তা বিস্তার লাভ করতে থাকে। ১৯৩৭ সাল থেকে 'অবশিষ্ট দল' প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হলে এর চেহারা পঞ্চদলীয় হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য ততদিনে ভারত টেস্ট খেলার আঙিনায় ঢুকে পড়েছে।

পারসী আর ইংরেজ দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা ১৮৯৫ থেকে ১৯০৬ খ্রী. পর্যন্ত চলেছিল। প্রতি বছর বোম্বাই আর পুনাতে দুদলের খেলা অনুষ্ঠিত হত। এটি প্রেসিডেন্সি ম্যাচ নামে অভিহিত হত। সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

বছর		বোম্বাইতে বিজয়ী	পুনাতে বিজয়ী
১৮৯৫	সাল	ইংরেজ	পারসী
১৮৯৬	,,	ইংরেজ	ইংরেজ
১৮৯৭	,,	অমীমাংসিত	পারসী
১৮৯৮	,,	ইংরেজ	ইংরেজ
১৮৯৯	,,	অমীমাংসিত	খেলা হয় নি
১৯০০	,,	পারসী	অমীমাংসিত
১৯০১	,,	পারসী	ইংরেজ
১৯০২	,,	পারসী	ইংরেজ
১৯০৩	,,	পারসী	ইংরেজ
১৯০৪	,,	পারসী	বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত
১৯০৫	,,	খেলা হয় নি	পারসী
১৯০৬	,,	খেলা হয় নি	ইংরেজ

১৯০৭ সালে হিন্দু দল যোগ দেওয়াতে এটি ত্রিদলীয় প্রতিযোগিতা নামে খ্যাত হয়। চলেছিল ১৯১১ সাল পর্যন্ত। ফাইনালের ফলাফল :

বছর		বিজয়ী	বিজিত
১৯০৭	সালে	পারসী	ইংরেজ
১৯০৮	”	পারসী	পারসী
১৯০৯	”	পারসী ও ইংরেজ দলের খেলা অমীমাংসিত	
১৯১০	”	পারসী ও ইংরেজ দলের খেলা অমীমাংসিত	
১৯১১	”	পারসী .	ইংরেজ

১৯১২ সালে যোগ দিল মুসলিম দল। শুরু হল চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতা। চলেছিল ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত। ফাইনালের ফলাফল :

বছর		বিজয়ী	বিজিত
১৯১২	সাল	পারসী	মুসলিম
১৯১৩	”	হিন্দু ও মুসলিম দলের খেলা অমীমাংসিত	
১৯১৪	”	হিন্দু ও পারসী দলের খেলা অমীমাংসিত	
১৯১৫	”	ইংরেজ	হিন্দু
১৯১৬	”	পারসী ও ইংরেজ দলের খেলা অমীমাংসিত	
১৯১৭	”	পারসী ও হিন্দু দলের খেলা অমীমাংসিত	
১৯১৮	”	ইংরেজ	পারসী
১৯১৯	”	হিন্দু	মুসলিম
১৯২০	”	হিন্দু ও পারসী দলের খেলা অমীমাংসিত	
১৯২১	”	ইংরেজ	পারসী
১৯২২	”	পারসী	হিন্দু
১৯২৩	”	হিন্দু	ইংরেজ
১৯২৪	”	মুসলিম	হিন্দু
১৯২৫	”	হিন্দু	ইংরেজ
১৯২৬	”	হিন্দু	ইংরেজ
১৯২৭	”	ইংরেজ	মুসলিম
১৯২৮	”	পারসী	ইংরেজ
১৯২৯	”	হিন্দু	পারসী
১৯৩০	”	খেলা হয় নি	

১৯৩১	,,	খেলা হয় নি	
১৯৩২	,,	খেলা হয় নি	
১৯৩৩	,,	খেলা হয় নি	
১৯৩৪	,,	মুসলিম	হিন্দু
১৯৩৫	,,	মুসলিম	হিন্দু
১৯৩৬	,,	হিন্দু	ইংরেজ

১৯৩৭ সালে অবশিষ্ট দল যোগ দেওয়ায় এটি পঞ্চদলীয় প্রতিযোগিতারূপে গণ্য হল। চলেছিল ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত। ফাইনালের ফলাফল:

বছর		বিজয়ী	বিজিত
১৯৩৭	সাল	মুসলিম	ইংরেজ
১৯৩৮	,,	মুসলিম	হিন্দু
১৯৩৯	,,	হিন্দু	মুসলিম
১৯৪০	,,	মুসলিম	অবশিষ্ট (হিন্দু দল যোগ দেয় নি)
১৯৪১	,,	হিন্দু	পারসী
১৯৪২	,,	খেলা হয় নি	
১৯৪৩	,,	হিন্দু	অবশিষ্ট
১৯৪৪	,,	মুসলিম	হিন্দু

এ প্রতিযোগিতা সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে এই মর্মে মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন চালালে ১৯৪৫ সাল থেকে পরিত্যক্ত হয়।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতার চেহারা আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ হলেও এর প্রবর্তনের পেছনে ব্রিটিশ রাজের সুচতুর রাজনৈতিক অভিসন্ধি কাজ করেছিল। এ খেলার মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর ভারতে প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গী আত্মপ্রকাশ করেছিল। মনে রাখতে হবে, এ সময়টি মোটামুটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সমকালীন ছিল। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস। ১৯০৩ সাল ১৯০৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। চরমপন্থী দলের কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছিল। 'বিভেদ ও শাসন' এই ছিল ইংরেজদের অন্যতম নীতি। খেলার মাঠেও তা কৌশলে প্রয়োগ করে ইংরেজ তার মুনাফা ঘরে তুলতে চেয়েছিল এবং পরবর্তী কালে সফলও হয়েছিল। বিশেষত মুসলিম লীগের অভ্যুত্থানের পর থেকে হিন্দু-মুসলমানের

প্রতিযোগিতা সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন জুগিয়েছিল। ইংরেজ কিন্তু নিজের দেশে এ ধরনের সম্প্রদায়ভিত্তিক কোন প্রতিযোগিতা চালু করে নি। অবশ্য এটাও ঠিক, ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রায় সকলেই এ মানসিকতার শিকার হন নি। এ বিষয়ে মুস্তাক আলি অত্যন্ত সুন্দর একটি ঘটনার কথা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন।

এ প্রতিযোগিতার আর একটি বৈষম্যও চোখে পড়ার মত। ভারতীয় দলগুলোর মধ্যে বিভাগ হয়েছিল ধর্মভিত্তিক—পারসী, হিন্দু আর মুসলমান। সাহেবদের মধ্যে কিন্তু প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক বা অন্য কিছু হল না। এমন কি তারা খ্রীষ্টান দল বলেও চিহ্নিত হল না। তাদের নাম হল ইউরোপীয়ান। এর ফলে তাদের রাজার জাতি বলে পরিচয় বজায় রইল। অন্যদিকে দেশী খ্রীষ্টানরাও এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণে বঞ্চিত হলেন। তাতে বেশ কিছু ভারতীয় খ্রীষ্টান খেলোয়াড় প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পেলেন না।

যাই হোক তৃতীয় একটি ভারতীয় দল ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিল ১৯১১ সালে। এর আগের সফরকারী দল দুটোতে শুধুমাত্র পারসী খেলোয়াড়রাই ছিলেন। এই প্রথম পারসীদের বাইরেও অন্য কিছু খেলোয়াড় সুযোগ পেলেন। ফলে কিছু সীমাবদ্ধ হলেও এর একটি সর্বভারতীয় চেহারা হল। তখনও ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড সৃষ্টি হয় নি। তাই খেলোয়াড় নির্বাচনের ভার একটি কমিটির ওপর দেওয়া হয়েছিল। পাতিয়ালার বিশবর্ষীয় তরুণ মহারাজা ভূপিন্দর সিং অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। দলে অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন মেহেরোমজি, ডক্টর কাঙ্গা, মেজর মিস্ত্রীর মত কৃতী ব্যাটসম্যান এবং আলাউদ্দিনের মত সেরা ফাস্ট বোলার ও বিখ্যাত স্পিন বোলার বালু। তেইশটি খেলার মধ্যে ভারতীয় দল ছয়টিতে জয়লাভ ও পনেরটিতে পরাজয় বরণ করেছিল। বাকি খেলাগুলো অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছিল। অবশ্য এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ ছিল মোট চৌদ্দটি। ভারতীয় দল প্রথম শ্রেণীর খেলাগুলোতে শোচনীয় ফল দেখিয়েছিল। দশটি খেলায় পরাজয় এবং মাত্র দুটিতে জয়লাভ নিশ্চয়ই বিশেষ উজ্জ্বল চিত্র নয়। সফরের প্রথম এগারটি খেলায় (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলা মিলিয়ে) পর পর পরাজয় বরণ করেছিল। দ্বাদশ খেলায় লিস্টারশায়ার দলের বিরুদ্ধে প্রথম তারা জয়ের মুখ দেখেছিল। ফলে ভারতীয় দলের মনোবল বলতে

আর কিছু ছিল না। ক্রিকেট পত্রিকা 'উইসডেন' এ সফরকে 'সম্পূর্ণ হতাশাব্যঞ্জক' বলে অভিহিত করেছিল।

সফরে মেহেরোমজি মোট ১২২৭ রান (গড় ২৮'৫৩) করেছিলেন। অবশ্য মেজর মিস্ত্রী মোট ১৮৮ রান করে ৩১.৩৩ গড়ে দলের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করেছিলেন। বালু ১৮.৮৬ গড় রান দিয়ে ১১৬টি উইকেট পেয়েছিলেন। ভারতীয় দলের ফিল্ডিং অতি নিম্নমানের হয়েছিল।

১৯২৫ সালে লণ্ডনে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স হয়েছিল। কলকাতা থেকে স্যর উইলিয়ম কুরী ও মারী রবার্টসন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা এ সম্মেলনে দুটি বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন। প্রথমতঃ তাঁরা এম. সি. সি.-কে একটি সেরা দল ভারতে পাঠাতে রাজী করান। দ্বিতীয়ত ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড গঠিত হলে এম. সি. সি. তাকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকার করে।

এম. সি. সি. দল ১৯২৬ সালে ভারতে এল। অধিনায়ক ছিলেন আর্থার গিলিগান। ইনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এর আগের মরসুমে ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক ছিলেন। অন্যান্য বিখ্যাত খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন উইয়াট (ইনি পরবর্তী কালে ইংল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন), স্যাণ্ডহাম (অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান) এবং সমকালীন শ্রেষ্ঠ বোলার মরিস টেট। তাছাড়া, সিয়ারী, অ্যাস্টিল ও বয়েস-এর মতো সেরা বোলাররাও এসেছিলেন। অবশ্য জ্যাক হবস্, বার্ট সাটক্লিফ, ফ্র্যাঙ্ক উলী ও প্যাট্সি হেনড্রেনের মতো সেরা খেলোয়াড়রা সফরকারী দলের সঙ্গে ছিলেন না।

এ দল কোন টেস্ট খেলে নি, কেননা তখনও ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সদস্য হয় নি। দলটি ছমাস ধরে ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) সফর করে। ভারতে তারা ম্যাচ খেলেছিল পঁচিশটি এবং ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে খেলেছিল ছয়টি। বিভিন্ন স্থানীয় দলের সঙ্গে খেলা ছাড়াও দলটি ভারতীয় একাদশের সঙ্গে দুটি ম্যাচ খেলেছিল।

দলটি ভারতে মোট একত্রিশটি ম্যাচ খেলে নয়টিতে বিজয়ী হয়। বাকী বাইশটি খেলা অমীমাংসিত থাকে। তারা একটিতেও পরাজিত হয় নি।

ভারত বনাম এম. সি সি.-র প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বোম্বাইতে। এম. সি. সি. প্রথমে ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে ৩৬২ রান করে। প্রত্যুত্তরে ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে ৪৩৭ রান করেছিল। ওয়াজির আলি ৩৮, নাভ্লে

৭৪, মিস্ত্রি ৫১ এবং দেওধর ১৪৮ রান করেছিলেন। একসময়ে ভারতীয় দলের সাত উইকেটে ২৭৮ রান ছিল। এ হেন সময়ে ব্যাট করতে এসে দেওধর ২৫৫ মিনিট ব্যাট করে ৪২টি বাউণ্ডারির সাহায্যে উক্ত রান করেন। অথচ দেওধরের কিন্তু প্রথমটায় ভারতীয় দলে খেলার কথা ছিল না। শেষমুহূর্তে দলে স্থান পেয়ে তিনি এ কৃতিত্ব দেখান। এম. সি. সি. দ্বিতীয় ইনিংসে পাঁচ উইকেটে ৯৭ রান করার পর খেলায় যবনিকা নেমে আসে। ফলাফল অমীমাংসিত থাকে।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় খেলায় ভারতীয় দলকে পরাজয় বরণ করতে হয়। ভারতীয় দল প্রথমে ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে ১৪৬ রান করেন। প্রত্যুত্তরে এম. সি. সি. দল করে ২৩৩ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দলের রানসংখ্যা হল ২৬৯। ১৮৩ রান করলে জিতবে এমন অবস্থায় ব্যাট করতে নেমে এম. সি. সি. ছয় উইকেটে ১৮৬ রান তুলে নেয়। ফলে আগন্তুক দল চার উইকেটে জিতে যায়।

এম. সি. সি. দলের ব্যাটসম্যান স্যাণ্ডহাম ১৯৭৭ রান করে ৮৬.১৭ গড়ে ব্যাটিং-য়ে শীর্ষস্থান লাভ করেছিলেন। মরিস টেট ১২৪৯ রান (গড় ৩৪.৬০) এবং ১২৮ উইকেট লাভ করে (গড় ১৩.৪৪) 'ডাবল' পান। ভারতে কোন বিদেশী খেলোয়াড়ের মধ্যে তিনিই এ কৃতিত্ব প্রথম অর্জন করেন। ইংরেজ খেলোয়াড়রা মোট ১৪টি সেঞ্চুরি করেছিলেন। স্যাণ্ডহাম ৭টি, উইলেট ৩টি, টেট ২টি এবং পার্সন্‌স্ ও আর্‌লে ১টি করে।

ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাটিং-য়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ওয়াজির আলি (মোট রান ৫১৯, গড় ৪৭.০৯) এবং সি. কে. নাইডু (মোট রান ৩১০)। ওয়াজির আলির ছোটভাই নাজির আলি ৩০.০৭ রান গড়ে ৩০টি উইকেট পান। অপর সফল বোলার ছিলেন রামজি। তাঁর সংগ্রহ ছিল ১৯টি উইকেট (গড় ১২.২১)। ভারতীয়দের মধ্যে সেঞ্চুরি করেছিলেন ওয়াজির আলি ২টি, দেওধর ১টি এবং সি. কে. নাইডু ১টি। নাইডু একটি মারমুখী সেঞ্চুরি করে উপস্থিত পঞ্চাশ হাজার দর্শককে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। একশ মিনিটে তিনি ১৫৩ রান করেছিলেন। বাউণ্ডারি হাঁকিয়েছিলেন ১৩টি এবং ওভার বাউণ্ডারি ১১টি। এটি এখনও একটি অনন্য নজির হয়ে আছে।

যদিও এম. সি. সি. দল অপরাজিত অবস্থায় সফর সমাপ্ত করেছিল, তবু ভারতীয় ক্রিকেটের উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা আর্থার গিলিগানও স্বীকার করতে

বাধ্য হন। ভারতীয় দলের ব্যাটিং ও বোলিং তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। অবশ্য অতি নিম্নমানের ফিল্ডিংয়ের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

এম. সি. সি. দলের ভারত সফর ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এক নতুন যুগের পত্তন করল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড গঠিত হল। ভারত ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সের সভ্যপদ লাভ করল। এ সময়ে ভারতীয় কিছু সর্বভারতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জ্যাক্ হবস্ ও বার্ট সাটক্লিফের মতো ব্যাটসম্যানও অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারী টেস্ট খেলবার যোগ্যতা অর্জন করল। সরকারী ভাবে টেস্ট খেলার জন্য ভারতীয় দল ইংল্যাণ্ডে গেল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। পোরবন্দরের মহারাজা ছিলেন অধিনায়ক। সহ অধিনায়ক হয়েছিলেন লিম্বদির মহারাজকুমার ঘনশ্যাম সিং। লক্ষ্য করার মত, তখনকার স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ অধিনায়ক নির্বাচিত হন নি। তার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল রাজা বা রাজকুমারদেরই। এতেই নির্বাচকমণ্ডলীর মানসিক গঠনের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে যেমন কোন পেশাদার কিংবা ওয়েস্ট ইণ্ডিজে কোন কাল চামড়ার খেলোয়াড় অধিনায়ক হতে পারতেন না, সেই মনোবৃত্তি ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীকেও বহুকাল আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। (ইংল্যাণ্ডে হাটন এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ওরেল সে ঐতিহ্য ভাঙেন।) দলে অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন সি. কে. নাইডু, ওয়াজির আলি, নাজির আলি, যোগেন্দ্র সিং, অমর সিং, মহম্মদ নিসার, নাওমল, নাভ্‌লে, কোল্‌হা, মর্শাল, লাল সিংহ, পালিয়া, জাহাঙ্গীর খান (পাকিস্তানের বর্তমান খেলোয়াড় মজিদ খানের বাবা), কাপাদিয়া, গোদাম্বে এবং গোলাম মহম্মদ। এসব খেলোয়াড়দের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের প্রবাদপুরুষ হয়ে আছেন। ভারতীয় দল একটি টেস্ট সমেত ছাব্বিশটি ম্যাচে খেলেছিল। তার ভিতর ৯টিতে জয়, ৮টিতে পরাজয় বরণ করেছিল। বাকি ৯টি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। এ ছাড়াও এ দল আরও ১২টি অপ্রধান খেলা খেলেছিল। তার ফলাফল ৪টি জয়, ১টি পরাজয়, ৫টি অমীমাংসিত, ২টি পরিত্যক্ত।

ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন নাইডু (সফরে মোট রান ১৮৪২, গড় ৩৭·৫৯), ওয়াজির আলি (১৭২৫ রান, গড় ৩৩·৮২), নাজির আলি (১১৪২ রান, গড় ২৯·৫৫) এবং নাওমল (১৫০৬ রান, গড় ২৮·৪১)। নাইডুর কৃতিত্ব উইজডেন-এও (ক্রিকেটের বার্ষিক পঞ্জিকা) স্বীকৃত হয়েছিল।

উইজডেন তাঁকে ১৯৩৩ সালে Cricketer of the year নির্বাচিত করেছিল। কোন ভারতীয় এ সম্মান পেলেন এই প্রথম। রণজি বা দিলীপ সিং ভারতের হয়ে খেলেন নি, তাই তাঁদের এ হিসেবের বাইরে রাখা হচ্ছে।

বোলারদের মধ্যে অমর সিং ২০.৭৮ গড়ে ১২১টি উইকেট এবং মহম্মদ নিসার ১৮.০৯ গড়ে ৭১টি উইকেট পেয়েছিলেন। নাইডু ২৫.৫৩ গড় রান দিয়ে ৬৫টি উইকেট লাভ করেছিলেন।

২৫শে জুন ক্রিকেট তীর্থ লর্ডস মাঠে প্রথম সরকারী টেস্ট শুরু হল। এ খেলার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, দলের অধিনায়ক ও সহ অধিনায়ক সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাই অধিনায়কত্ব করেছিলেন সি. কে. নাইডু। তাঁর অধিনায়কত্ব সম্পর্কে উইজডেন মন্তব্য করেছিল : fortunately for the side they possessed in C. K. Nayadu: easily their best batsman, a man of high character and directness of purpose, who in the absence of the two above him, was able to take over the captaincy, with skill and no small measure of success,

এ সব সত্ত্বেও কিন্তু ভারতীয় দল প্রথম সরকারী টেস্টে ১৫৮ রানে হেরে গেল প্রধানত ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য। নইলে হোমস, সাটক্লিফ, উলি, হ্যামণ্ড, জার্ডিন, পেণ্টার-শোভিত ইংরেজদলকে মাত্র (?) ২৫৯ ও ২৭৫ রানে ধ্বসিয়ে দেওয়া কম ছিল না। নিসার, অমর সিং, নাইডু, জাহাঙ্গীর খান এ অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

যাই হোক, পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতের টেস্ট যাত্রা শুরু হল। পরাজয়ের কালিমা মুছল কুড়ি বছর পরে ১৯৫১ সালে এম. সি. সি. যখন ভারতে এসেছিল। পঁচিশতম টেস্টে এ বিজয় করায়ত্ত হয়েছিল। সে অনেক পরের কথা।

ইতিমধ্যে ১৯৩৩-৩৪ সালে এম. সি. সি. প্রথম সরকারী সফরে ভারতে এল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইংরেজ দল বিদেশে মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (সংক্ষেপে এম. সি. সি.) নাম নিয়ে খেলতে যায়। স্বদেশের খেলায় অবশ্য ইংরেজ দল হিসেবেই নাম থাকে। সিরিজে তিনটি টেস্ট খেলা হয়েছিল। টেস্ট খেলার বিশদ ইতিহাস এখানে আর আলোচনা করা হবে না। কেন না প্রতিটি টেস্ট সিরিজ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের সম্পূর্ণ স্কোর কার্ড পরে পাওয়া যাবে।

এ যাবৎকালে ভারত টেস্ট খেলেছে ১৭৬টি। তার মধ্যে জয় মাত্র ৩১.

বার। পরাজয় ৬৭ বার। অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ হয়েছে ৭৮ বার। এ শোচনীয় অবস্থার কারণ কি? এখানে এ নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথম কারণ: অধিনায়ক সমস্যা। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যাঁরা সিরিজে অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের অনেকের খেলার যোগ্যতাই ছিল না। ১৯৩২ খ্রী তবু নির্বাচিত অধিনায়ক ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে স্বেচ্ছায় দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে যোগ্যতম ব্যক্তি সি. কে. নাইডু অধিনায়ক হতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালে এ ঔদার্য আর দেখা যায় নি। ১৯৫৯ সালে দাত্তু গায়কোয়াড়ের দলে থাকারই কোন যুক্তি ছিল না, কিন্তু তিনি হয়েছিলেন অধিনায়ক। ১৯৭৯ সালে বেঙ্কটরাঘবন সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। ১৯৪৬ সালে পতৌদির নবাব ইফতিকার আলি ছিলেন অধিনায়ক। তিনি বরাবর ইংল্যাণ্ড দলের হয়ে খেলতেন তাই ভারতীয় দলের সঙ্গে সঙ্গতি বা co-ordination তাঁর ছিল কি না সন্দেহ। ১৯৫২ সালে ভারত প্রথম রাবার জিতেছিল, পাকিস্তানের বিপক্ষে। অধিনায়ক ছিলেন অমরনাথ। অথচ কোন অজ্ঞাত কারণে পরবর্তী সিরিজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে তাঁকে দল থেকেই বাদ দেওয়া হল। কণ্ট্রাক্টরকে যখন অধিনায়ক করা হয় তখন যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন উমরিগড়। অথচ তাঁকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এমন উদাহরণ আরও আছে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই দল বিপর্যস্ত হয়েছে। তাছাড়া ভাল খেলোয়াড় হলেই যে ভাল অধিনায়ক হবেন তার কোন মানে নেই। ভাল অধিনায়ক হবার যোগ্যতা হল—ব্যক্তিত্ব ও মাঠের প্রকৃতি বোঝার ক্ষমতা, দলকে সংহত রাখার শক্তি এবং দ্রুত ও উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেবার মত বুদ্ধি।

দ্বিতীয় কারণ: ভারত বহু বিশ্বখ্যাত ক্রিকেটারকে জন্ম দিয়েছে। সি. কে. নাইডু, মুস্তাক আলি, বিজয় মার্চেন্ট, লালা অমরনাথ, বিনু মানকড়, গোলাম আমেদ, সুভাষ গুপ্তে, বিষন সিং বেদী, গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, সুনীল গাভাসকর প্রভৃতি খেলোয়াড় বিশ্বের যে কোন দলের গৌরব হতে পারেন। অথচ বহু তারকা-শোভিত দলও বার বার পরাজিত হয়ে ক্রীড়ানুরাগীদের হতাশ করেছে। এর অন্যতম একটি কারণ হল দলগত সংহতির অভাব। কোন কোন খেলোয়াড়ের মধ্যে পারস্পরিক রেষারেষি এত বেশি যে তাঁদের কেউ একজনকে বিপদে ফেলবার জন্য দলের বিপর্যয় ডেকে আনতেও পিছুপা নন।

১৯৩৬ সালে অমরনাথকে ইংল্যাণ্ড থেকে অন্যায়ভাবে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে অমরনাথের অধিনায়কত্বে খেলতে হবে বলে কোন কোন দিকপাল অস্ট্রেলিয়া সফরে যান নি। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় জয়লাভের পর দ্বিতীয় টেস্টে কেউ কেউ খেলেন নি, ফলে ভারত শোচনীয়ভাবে হেরেছিল। ১৯৫৯ সালে ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় টেস্টে লর্ডস মাঠে অসুস্থ গায়কোয়াড়ের পরিবর্তে অধিনায়কত্ব করেছিলেন পঙ্কজ রায়। খেলাটিতে এমন পরিস্থিতি এসেছিল যাতে একটু চেষ্টা করলেই ভারত হয়ত জিততে পারত। পাছে জিতলে পঙ্কজ কায়েমীভাবে অধিনায়ক বনে যান সেজন্য শোনা যায়, কোন কোন দিকপাল ক্রিকেটার ইচ্ছে করে ক্যাচ ছেড়েছিলেন এবং বাজে ফিল্ডিং দিয়েছিলেন। ব্যাপারটি যদি সত্য হয় তাহলে তার চাইতে মর্মান্তিক আর কি হতে পারে। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় দল যখন ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিল অধিনায়ক ছিলেন ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ কুমার অর্থাৎ 'ভিজি'। সেবার কিন্তু দলের যোগ্যতম খেলোয়াড় ছিলেন সি. কে নাইডু—তাঁরই অধিনায়ক হওয়া উচিত ছিল। তাঁর যোগ্যতা উইজডেনও স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার সি. কে. নাইডু অধিনায়ক তো হতে পারেন নি, উল্টে ভিজির দল তাঁকে ব্যঙ্গ করে ছড়া বেঁধেছিল :

বাহার সে কালা
অন্দর সে কালা
বড়া বদমাস্ হ্যায় ইয়ে ইন্দোরওয়ালা।

এর চাইতে নোংরা ব্যাপার আর কি হতে পারে? এতে আর খেলা জেতা যায় না।

তৃতীয় কারণ: যোগ্যতাকে উপেক্ষা। নির্বাচকমণ্ডলীর খামখেয়ালী ও একদেশদর্শিতার জন্য অনেক যোগ্য খেলোয়াড় দলে ঢুকতে পারেন নি। মুস্তাক আলিকে ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হয়েছিল। 'নো মুস্তাক, নো টেস্ট' ক্রীড়ানুরাগী মানুষের এ দাবিতে মুস্তাক দলভুক্ত হয়ে সেঞ্চুরি করেছিলেন। শুঁটে ব্যানার্জিকে দুবার (১৯৩৬ সাল ও ১৯৪৬ সাল) ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে একটি টেস্টেও সুযোগ দেওয়া হয় নি। ১৯৩৬ সালে নাহয় মহম্মদ নিসারের মত ফাস্ট বোলার দলে ছিলেন, কিন্তু ১৯৪৬ সালে ত তাঁর তুল্য ফাস্ট বোলার দলে কেউ ছিলেন না। ১৯৪৮ সালে তাঁকে যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে একটি মাত্র

খেলায় সুযোগ দেওয়া হল তখন তাঁর প্রতিভা অস্তাচলগামী। তা সত্ত্বেও তিনি দু ইনিংসে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিলেন। অথচ তাঁর দীপ্ত যৌবনের দিনগুলো নির্বাচকমণ্ডলী নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করেছিলেন। মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে একটি মাত্র খেলায় সুযোগ পেয়ে তিনি দু ইনিংসে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিলেন। তার পরবর্তী আর কোন খেলায় এ খেলোয়াড়কে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ভুলে যাওয়া হয়েছিল। হরিয়ানার রাজিন্দার গোয়েল (রণজিতে যার সর্বাধিক মোট উইকেট পাবার রেকর্ড আছে) একবারও টেস্ট খেলার সুযোগ পান নি। দিলীপ দোসী সুযোগ পেলেন খেলোয়াড় জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে। রাজিন্দার সিং হন্‌স্‌ সুযোগ পাবেন কি না কে জানে? অথচ দিনের পর দিন ব্যর্থ বেশ কিছু খেলোয়াড় বার বার সুযোগ পেয়েছেন। এ ব্যাপারে প্রাদেশিকতাও বেশ কাজ করে থাকে।

চতুর্থ কারণ: ফিল্ডিং-য়ের প্রতি অমনোযোগ। 'Miss a catch, miss a match' ক্রিকেটের এ মহান আপ্তবাক্যটি ভারতীয় দল বার বার প্রমাণ করেছে। সেই সুদূর ১৯২৬ সালে এম. সি.সি. যখন ভারতে বেসরকারী সফরে এসেছিল, অধিনায়ক আর্থার গিলিগ্যান দেশে ফিরে ভারতীয় দলের ফিল্ডিংকে 'হতাশাব্যঞ্জক' বলে মন্তব্য করেছিলেন। বহু ভারতীয় সেরা ব্যাটসম্যান ও বোলার ফিল্ডিংয়ে অসহ্য অপটু ছিলেন। অন্যথায় মানকড়, গোলাম আমেদ বা গুপ্তের মতবোলার আরও অনেক উইকেট পেতে পারতেন। সোলকাবের ফিল্ডিং নৈপুণ্য ইংল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের রাবার জয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল একথা আজ সকলেই জানেন।

পঞ্চম কারণ: ফাস্ট বোলিং ভীতি। সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম প্রবেশের সময় ভারতীয় দলে দুজন শ্রেষ্ঠ ফাস্ট বোলার ছিলেন, মহম্মদ নিসার ও অমরসিং। এহেন সফল জোড়া ফাস্ট বোলার ভারতীয় দলে পরবর্তী কালে আর দেখা যায় নি। ভারতীয় দল ক্রমে ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলতে অনভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তা প্রচণ্ডভাবে প্রকট হয়ে পড়ে ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে। ট্রুম্যান ও স্ট্যাথামের বলে দলের বিপর্যয়ের কাহিনী সকলের জানা। এর পর থেকে খুব কম সময়েই ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা যথার্থ ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ভাল খেলতে পেরেছেন।

ষষ্ঠ কারণ: একপেশে উইকেট। ভারতীয় ক্রিকেটের কর্ণধারগণ

যেহেতু ফাস্ট বোলারদের বিশেষ পছন্দ করেন না সেই কারণে এমন উইকেট তৈরি করান যাতে স্পিন বল সহজেই কার্যকরী হতে পারে। ফলে উইকেটে অনেক সময়েই প্রাণ থাকে না। আর তার জন্য অধিকাংশ খেলা একঘেয়ে ও অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

এবার এখানে ভারত প্রতিটি দেশের সঙ্গে কতগুলো টেস্ট খেলেছে এবং তার ফলাফল কি হয়েছে তা সংক্ষেপে সাজিয়ে দেওয়া গেল।

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

১৯৩২ খ্রী খেলা ১; পরাজয় ১। ১৯৩৩-৩৪ খ্রী খেলা ৩; পরাজয় ২, অমীমাংসিত ১। ১৯৩৭ খ্রী খেলা ৩; পরাজয় ২, অমীমাংসিত ১। ১৯৪৬ খ্রী খেলা ৩; পরাজয় ১, অমীমাংসিত ২। ১৯৫১-৫২ খ্রী খেলা ৫; জয় ১, পরাজয় ১, অমীমাংসিত ৩। ১৯৫২ খ্রী খেলা ৪; পরাজয় ৩, অমীমাংসিত ১। ১৯৫৯ খ্রী ৫; পরাজয় ৫। ১৯৬১-৬২ খ্রী খেলা ৫; জয় ২, অমীমাংসিত ৩। ১৯৬৪ খ্রী খেলা ৫; অমীমাংসিত ৫। ১৯৬৭ খ্রী খেলা ৩; পরাজয় ৩। ১৯৭১ খ্রী খেলা ৩; জয় ১, অমীমাংসিত ২। ১৯৭২-৭৩ খ্রী খেলা ৫; জয় ২, পরাজয় ১, অমীমাংসিত ২। ১৯৭৪ খ্রী খেলা ৩; পরাজয় ৩। ১৯৭৫-৭৬ খ্রী খেলা ৫; জয় ১, পরাজয় ৩, অমীমাংসিত ১। ১৯৭৯ খ্রী খেলা ৪; পরাজয় ১, অমীমাংসিত ৩। অর্থাৎ এ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে টেস্ট খেলা হয়েছে ৭৫ টি, তার মধ্যে ভারতের জয় ৭, পরাজয় ২৬। অমীমাংসিত টেস্টের সংখ্যা ২৪।

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

১৯৪৭-৪৮ খ্রী খেলা ৫; পরাজয় ৪, অমীমাংসিত ১। ১৯৫৬ খ্রী খেলা ৩; পরাজয় ২, অমীমাংসিত ১। ১৯৫৯ খ্রী খেলা ৫; জয় ১, পরাজয় ২, অমীমাংসিত ২। ১৯৬৪ খ্রী খেলা ৩; জয় ১, পরাজয় ১ অমীমাংসিত ১। ১৯৬৭-৬৮ খ্রী খেলা ৪; পরাজয় ৪। ১৯৬৯ খ্রী খেলা ৫; জয় ১, পরাজয় ৩, অমীমাংসিত ১। ১৯৭৭-৭৮ খ্রী খেলা ৫; জয় ২, পরাজয় ৩। ১৯৮৭৯ খ্রী খেলা ৬; জয় ১, অমীমাংসিত ৫। মোট খেলা ৩৬; জয় ৬; পরাজয় ১৯; অমীমাংসিত ১১।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

১৯৪৮ খ্রী খেলা ৫; পরাজয় ৪ অমীমাংসিত ১। ১৯৫৩ খ্রী খেলা ৫; পরাজয় ১, অমীমাংসিত ৪। ১৯৫৮ খ্রী খেলা ৫; পরাজয় ৩, অমীমাংসিত ২।

১৯৬২ খ্রী খেলা ৫ ; পরাজয় ৫ । ১৯৬৬-৬৭খ্রী খেলা ৩, পরাজয় ২, অমীমাংসিত ১ । ১৯৭১ খ্রী খেলা ৫ ; জয় ১, অমীমাংসিত ৪ । ১৯৭৪-৭৫ খ্রী খেলা ৫ ; জয় ২, পরাজয় ৩ । ১৯৭৬ খ্রী খেলা ৪ ; জয় ১, পরাজয় ২, অমীমাংসিত ১ । ১৯৭৮-৭৯ খ্রী খেলা ৬ ; জয় ১, অমীমাংসিত ৫ । মোট খেলা ৪৩ ; জয় ৫, পরাজয় ১৭, অমীমাংসিত ২১ ।

ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ড

১৯৫৫-৫৬ খ্রী খেলা ৫ ; জয় ২ অমীমাংসিত ৩ । ১৯৬৫ খ্রী খেলা ৪ জয় ১,অমীমাংসিত ৩ । ১৯৬৮ খ্রী খেলা ৪ ; জয় ৩, পরাজয় ১ । ১৯৬৯ খ্রী খেলা ৩ ; জয় ১, পরাজয়, অমীমাংসিত ১ । ১৯৭৬ খ্রী খেলা ৩ ; জয় ১, পরাজয় ১, অমীমাংসিত ১ । ১৯৭৬ খ্রী খেলা ৩ ; জয় ২, অমীমাংসিত ১ । মোট খেলা ২২ ; জয় ১০ ; পরাজয় ৩ ; অমীমাংসিত ৯ ।

ভারত বনাম পাকিস্তান

১৯৫২ খ্রী খেলা ৫ ; জয় ২, পরাজয় ১, অমীমাংসিত ২ । ১৯৫৫ খ্রী খেলা ৫ ; অমীমাংসিত ৫ । ১৯৬০-৬১ খ্রী খেলা ৫ ; অমীমাংসিত ৫ । ১৯৭৮ খ্রী খেলা ৩ ; পরাজয় ২, অমীমাংসিত ১ । মোট খেলা ১৮ ; জয় ২ ; পরাজয় ৩ অমীমাংসিত ১৩ ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের কোন টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয় নি ।

উপরের তালিকায় কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় । যথা, **এক.** ভারত টেস্টে প্রথম জয়ী হয় ১৯৫২ সালে এম. সি. সি. তথা ইংল্যাণ্ড দলকে হারিয়ে । এটি ছিল ভারতের ২৫-তম টেস্ট ।

দুই. ভারতের প্রথম টেস্ট রাবার জয় ১৯৫২ সালে। বিপক্ষে ছিল পাকিস্তান । ভারত ২-১ ম্যাচে সিরিজ জিতেছিল ।

তিন. সিরিজের সব কটি খেলায় ভারত পরাজিত হয় ১৯৫৯ সালে । বিপক্ষ দল ছিল ইংল্যাণ্ড ।

চার. অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম জয়লাভ করে ১৯৫৯ সালে কানপুর টেস্টে । সিরিজে অবশ্য ভারত পরাজিত হয়েছিল । প্রথম রাবার পায় ১৯৭৯ সালে ।

পাঁচ. ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম জয়লাভ করে ১৯৭১ সালে, পোর্ট অব স্পেনের টেস্টে । এ জয়ের সুবাদে ভারত রাবার জিতেছিল । অর্থাৎ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে প্রথম জেতার সুযোগেই রাবার করায়ত্ত করেছিল ।

ছয়. ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে ভারত প্রথম জয়ী হয়েছিল ১৯৭১ সালে ওভাল মাঠে। এই একটি মাত্র টেস্ট জয়ের স্থবাদে সেবার ভারত রাবার জিতেছিল। অবশ্য ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রথম রাবার জিতেছিল ১৯৬২-৬৩ সালে কলকাতা ও মাদ্রাজ টেস্টে জয়লাভ করে। ইংল্যাণ্ড সেবার একটি খেলাতেও জিততে পারে নি।

ভারত এ-পর্যন্ত টেস্ট খেলেছে ১৭৬টি। তার মধ্যে জয়লাভ করেছে ৩০টি খেলায়, পরাজিত হয়েছে ৬৮টিতে, অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে ৭৮৬টি খেলা।

সরকারী টেস্ট খেলা ছাড়াও ভারত বেশ কয়েকটি বেসরকারী টেস্ট সিরিজ খেলেছে। এখানে তার কিছু পরিসংখ্যান দেওয়া হল :

১৯৩৫-৩৬ শ্রী জ্যাক রাইডারের নেতৃত্বে একটি বেসরকারী অস্ট্রেলিয়া দল ভারত সফরে আসে। এ দলের সহ-অধিনায়ক ছিলেন চার্লস ম্যাকার্টনি। এটি পাতিয়ালার মহারাজার অস্ট্রেলীয় দল বলে চিহ্নিত হয়েছিল। এ দল ৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলে। ভারত ২টি এবং অস্ট্রেলীয় দল ২টি টেস্টে জয়লাভ করেছিল। সংক্ষিপ্ত কলাফল—

প্রথম টেস্ট : বোম্বাই ৫, ৬, ৭, ডিসেম্বর ১৯৩৫

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত ১ম ইনিংস ১৬৩ (পাতিয়ালার যুবরাজ ৪০)

২য় ইনিংস ১৬৩ (অমরনাথ ৪১ ; আয়রনমঙ্গার ৭০রানে ৫ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ২৬৮ (রাইডার ১৪০ ; নিসার ৭২ রানে ৬ উইকেট)

২য় ইনিংস ৫৯ (১ উইকেটে)

অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে বিজয়ী

দ্বিতীয় টেস্ট: কলকাতা ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩৫ এবং ১, ২ জানুয়ারি ১৯৩৬

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত ১ম ইনিংস ৪৮ (ম্যাকার্টনি ১৭ রানে ৫ উইকেট অক্সেনহ্যাম ১৭ রানে ৫ উইকেট)

২য় ইনিংস ১৭২ (ম্যাকার্টনি ৪২ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ৯৯ (নিসার ৩৫ রানে ৬ উইকেট, বাকা জিলানী ২৩ রানে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস ৮০ (২ উইকেটে)

অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী

তৃতীয় টেস্ট : লাহোর ১০, ১১, ১২, ১৩, জানুয়ারি ১৯৩৬

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস ১৪৯ (ওয়াজির আলি ৭৬)

২য় ইনিংস ৩০১ (ওয়াজির আলি ৯২, শুঁটে ব্যানার্জী ৭০)

অস্ট্রেলিয়া : ১ম ইনিংস ১৬৬ (আমীর ইলাহি ১৬ রানে ৩ উইকেট, নিসার ৭২ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস ২১৬ (রাইডার ৭০ ; বাকা জিলানী ১৬ রানে ৪ উইকেট, নিসার ৮০ রানে ৪ উইকেট)

ভারত ৬৮ রানে বিজয়ী

চতুর্থ টেস্ট : মাদ্রাজ ৬, ৭, ৮, ৯, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস : ১৮৯ (অমর সিং ৪৫, মুস্তাক আলি ৪৩, ম্যাকার্টনি ৫২ রানে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস : ১১৩ (ম্যাকার্টনি ৪১ রানে ৬ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ১ম ইনিংস : ১৬২ (অমর সিং ৫৫ রানে ৫ উইকেট, নিসার ৬১ রানে ৫ উইকেট)

২য় ইনিংস : ১০৭ (রাইডার ৪১ ; নিসার ৩৬ রানে ৬ উইকেট)

ভারত ৩৩ রানে বিজয়ী

১৯৩৭-৩৮ সালে লর্ড টেনিসনের অধিনায়কত্বে একটি ইংরেজ দল এসেছিল। দলে এডরিচ, হার্ডস্টাফ প্রভৃতির মত বিখ্যাত খেলোয়াড়েরা ছিলেন। দলটি ৫টি টেস্ট খেলেছিল। জিতেছিল ৩টি খেলায়। হেরেছিল ২টিতে।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

প্রথম টেস্ট : লাহোর : ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ নভেম্বর ১৯৩৭

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস : ১২১ (পাতিয়ালার যুবরাজ ৪১, গোভার ৪০ রানে ৬ উইকেট)

২য় ইনিংস : ১৯৯ (অমরনাথ ৪৪ ; গোভার ৬৬ রানে ৪ উইকেট)

লর্ড টেনিসনের দল : ১ম ইনিংস ২০৭ (ইয়ার্ডলি ৯৬ ; অমর সিং ৬৯ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস ১১৪ (১ উইকেটে)

লর্ড টেনিসন একাদশ ৯ উইকেটে বিজয়ী

দ্বিতীয় টেস্ট : বোম্বাই : ১১, ১২, ১৩, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩৭

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস : ১৫৩ (গোভার ৪৬ রানে ৫ উইকেট)

২য় ইনিংস : ২০৮ (মানকড় ৮৮ ; গোভার ৮৮ রানে ৫ উইকেট)

লর্ড টেনিসন একাদশ ১ম ইনিংস ১৯১ (পার্কস ৪৪ ; ভুটে ব্যানার্জী ৪৭ রানে ৩ উইকেট)
২য় ইনিংস : ১৭১ (৪ উইকেটে)

লর্ড টেনিসন একাদশ ৬ উইকেটে বিজয়ী

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৭ ; ১, ২, ৩ জানুয়ারি ১৯৩৮

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস : ৩৫০ (অমরনাথ ১২৩, মুস্তাক আলি ১০১, মানকড় ৫৫ ; পোপ ৭০ রানে ৫ উইকেট, গোভার ৯৩ রানে ৪ উইকেট)
২য় ইনিংস : ১৯২ (হিন্দেলকার ৬০, মুস্তাক আলি ৫৫)

লর্ড টেনিসন একাদশ : ১ম ইনিংস ২৫৭ (হার্ডস্টাফ ৫৯ ; নিসার ৭৯ রানে ৪ উইকেট, অমর সিং ৬৫ রানে ৪ উইকেট)

ভারত ৯৩ রানে বিজয়ী

চতুর্থ টেস্ট : মাদ্রাজ : ৫, ৬, ৭, ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস : ২৬৩ (মানকড় ১১৩ নট আউট ; পোপ ৫১ রানে ৫ উইকেট)

লর্ড টেনিসন একাদশ : ১ম ইনিংস ৯৪ (মানকড় ১৮ রানে ৩ উইকেট, অমর সিং ৫৮ রানে ৬ উইকেট)

ভারত ১ ইনিংস ও ৬ রানে বিজয়ী

পঞ্চম টেস্ট : বোম্বাই : ১২, ১৩, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস : ১৩১ (পোপ ৪৯ রানে ৫ উইকেট) ।
২য় ইনিংস ১৩১ (মানকড় ৫৭ ; পোপ ২৮ রানে ৩ উইকেট)

লর্ড টেনিসন একাদশ : ১ম ইনিংস : ১৩০ (অমর সিং ৪৭ রানে ৫ উইকেট)
২য় ইনিংস : ২৮৮ (এডরিচ ৫৬, পোপ ৪৯ ; মানকড় ৪৯ রানে ৩ উইকেট ; অমর সিং ৯৫ রানে উইকেট)

লর্ড টেনিসন একাদশ ১৫৬ রানে বিজয়ী

১৯৪৫ সালে অস্ট্রেলিয়া সার্ভিসেস দল (সেনাদল) এসেছিল। অধিনায়ক ছিলেন লিণ্ডসে হাসেট। তাছাড়া দলে ছিলেন কীথ মিলার ও আরও কিছু

প্রখ্যাত খেলোয়াড়। তাঁরা এ দেশে ৩টি টেস্ট খেলেছিল। ভারতের জয় হয়েছিল ১টি টেস্টে। অমীমাংসিত ছিল ২টি টেস্ট।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

প্রথম টেস্ট : বোম্বাই ১০, ১১, ১২, ১৩, নভেম্বর ১৯৪৫ ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস : ৩৩৯ (হাজারে ৭৫, অমরনাথ ৬৪)

২য় ইনিংস : ৩০৪ (মার্চেন্ট ৬৯, অমরনাথ ৫০ ; প্রাইস ৫৪ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া : ১ম ইনিংস : ৫৩১ (পেটিফোর্ড ১২৪, কারমোডি ১১৩, হাজারে ১০৯ রানে ৫ উইকেট)

২য় ইনিংস : ৩১ (১ উইকেটে)

খেলা অমীমাংসিত

দ্বিতীয় টেস্ট : কলকাতা ২৬, ২৭, ২৮, নভেম্বর ১৯৪৫ ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস : ৩৮৮ (মানকড় ৭৮, মোদী ৭৫, হাজারে ৬৫)

২য় ইনিংস : ৩৫০ (৪ উইকেটে। মার্চেন্ট ১৫৫ নট আউট, কারদার ৮৬ নট আউট, অমরনাথ ৪৮)

অস্ট্রেলিয়া : ১ম ইনিংস : ৪৭২ (রিদিংটন ১৫৫, পেটিফোর্ড ১০১, মিলার ৪২ ; মানকড় ১৪৭ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস ৪৯ (২ উইকেটে)

খেলা অমীমাংসিত

তৃতীয় টেস্ট : মাদ্রাজ ৭, ৮, ৯, ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৫ ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস : ৫২৫ (মোদী ২০৩, অমরনাথ ১১৩, সি. এস. নাইডু ৬৪, গুল মহম্মদ ৫৫)

২য় ইনিংস : ৯২ (৪ উইকেটে)

অস্ট্রেলিয়া : ১ম ইনিংস : ৩৩৯ (হ্যাসেট ১৪৩, শুঁটে ব্যানার্জী ৮৬ রানে ৪ উইকেট, সারভাতে ৯৪ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস : ২৭৫ (কারমোডি ৯২, রিদিংটন ৬৭ ; শুঁটে ব্যানার্জী ৮২ রানে ৪ উইকেট, সারভাতে ১১৩ রানে ৪ উইকেট)

ভারত ৬ উইকেটে বিজয়ী

১৯৪৯-৫০ সালে সফরে এসেছিল প্রথম কমনওয়েলথ দল। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-ভুক্ত দেশগুলো থেকে বাছাই করে দল গঠন করা হয়েছিল বলে এ দলের **উক্ত নাম** ছিল। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-ভুক্ত কিছু দেশেই অবশ্য ক্রিকেট খেলা **হয়ে থাকে।** এ দলের অধিনায়ক ছিলেন লিভিংস্টোন। ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া **ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ** দল থেকে খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছিল। দলে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, **জর্জ** ট্রাইব প্রভৃতি বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন। দলটি ৫টি টেস্ট খেলেছিল। **ফলাফল** ভারতের জয় ২, পরাজয় ১, অমীমাংসিত ২।

প্রথম টেস্ট : দিল্লী ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫ নভেম্বর ১৯৪৯।

সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ভারত : ১ম ইনিংস : ২৯১ (কারদকার ১১০, অধিকারী ৭৪)

২য় ইনিংস : ৩২৭ (হাজারে ১৪০, উমরিগড় ৫৫, মন্ত্রী ৫৪, অধিকারী ৪৪ নট আউট। ট্রাইব ৬৫ রানে ৪ উইকেট)

কমনওয়েলথ দল : দল ১ম ইনিংস : ৬০৮ (৮ উইকেটে ঘোষিত। ওল্ডফীল্ড ১৫১, লিভিংস্টোন ১২৩, ওরেল ৫৮, ফ্রিয়র ৫১)

ভারত ৯ উইকেটে পরাজিত

দ্বিতীয় টেস্ট : বোম্বাই : ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০ ডিসেম্বর ১৯৪৯।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস : ২৮৯ (কারদকার ৭৮ নট আউট, মার্চেন্ট ৭৮, মোদী ৫৮। ল্যামবার্ট ৭৬ রানে ৪ উইকেট, ফ্রিয়র ৮৯ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস : ৪৩০ (আট উইকেটে ঘোষিত। মার্চেন্ট ৯৪, অধিকারী ৯৩ উমরিগড় ৬৭, হাজারে ৬৪, মোদী ৫১)

কমনওয়েলথ দল : ১ম ইনিংস : ৪৪৮ (ফ্রিয়র ১৩২, ওল্ডফীল্ড ১১০, ওরেল ৭৮। মোদী ৫ রানে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস : ১১০ (৩ উইকেটে ঘোষিত)

খেলা অমীমাংসিত

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা ৩০, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৯, ১, ২, ৩ জানুয়ারি ১৯৫০।

সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ভারত : ১ম ইনিংস : ৪২২ (হাজারে ১৭৫ নট আউট, মানকড় ৯১)
২য় ইনিংস : ১১৭ (তিন উইকেটে। মুস্তাক আলি ৪৫)

কমনওয়েলথ দল : ১ম ইনিংস : ১৯০ (পুঁটু চৌধুরী ৫৬ রানে ৪ উইকেট, ফাদকার ৫০ রানে ৩ উইকেট)
২য় ইনিংস : ৩৪৮ (ওল্ডফীল্ড ১৫৮, লিভিংস্টোন ৫৯। সি. এস. নাইডু ৫৯ রানে ৫ উইকেট)

ভারত ৭ উইকেটে জয়ী

চতুর্থ টেস্ট : কানপুর ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, জানুয়ারি ১৯৫০

ভারত : ১ম ইনিংস : ৩৮৬ (মুস্তাক আলি ১২৯, ফাদকার ৬১, অধিকারী ৬১। ট্রাইব ১২২ রানে ৫ উইকেট, ওরেল ৪২ রানে ৩ উইকেট)
২য় ইনিংস : ৮৪ (৪ উইকেটে। হাজারে ৪১ নট আউট)

কমনওয়েলথ দল : ১ম ইনিংস : ৪৪৮ (ওরেল ২২৩ নট আউট, লিভিংস্টোন ৮০, ট্রাইব ৬১। হাজারে ৫৯ রানে ৩ উইকেট)
২য় ইনিংস : ২৩৭ (৩ উইকেটে ঘোষিত। ওরেল ৮৩ নট আউট, লিভিংস্টোন ৮১)

খেলা অমীমাংসিত

পঞ্চম টেস্ট : মাদ্রাজ ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫০

সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ভারত : ১ম ইনিংস : ৩১৩ (হাজারে ৭৭, কিষেনচাঁদ ৭২। ফিট্‌জমোরিস ৪০ রানে ৩ উইকেট, ট্রাইব ৯০ রানে ৪ উইকেট)
২য় ইনিংস : ২৬১ (সাত উইকেটে। হাজারে ৮৪, উমরিগড় ৫৯, মুস্তাক আলি ৪২ নট আউট)

কমনওয়েলথ দল : ১ম ইনিংস : ৩২৪ (ওরেল ১৬১। ফাদকার ৮৯ রানে ৪ উইকেট)
২য় ইনিংস : ২৪৭ (হোল্ট ৮৪ নট আউট। ফাদকার ২৮ রানে ৩ উইকেট পুঁটু চৌধুরী ৭০ রানে ৩ উইকেট)

ভারত ৩ উইকেটে বিজয়ী

১৯৫০-৫১ সালে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দল ভারতে এসেছিল। অধিনায়ক ছিলেন লেসলী এমস এবং সহ-অধিনায়ক ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। এ দলটি যথার্থই শক্তিশালী ছিল। বারলো, ডুল্যাণ্ড, এমেট, আইকিন, জ্যাকসন, লেকার, সোনি রামাধীন, রিজওয়ে, শ্যাকলটন, স্পুনার, ট্রাইব প্রভৃতি খ্যাতনামা খেলোয়াড় দলের সঙ্গে এসেছিলেন। ফলাফলও কমনওয়েলথ দলের অনুকূলে গিয়েছিল। ৫টি খেলার মধ্যে ভারত ২টি খেলায় পরাজিত হয়েছিল। ৩টি খেলা অমীমাংসিত ছিল।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

প্রথম টেস্ট : দিল্লী ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, নভেম্বর ১৯৫০

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস : ১৬৯ (ফাদকার ৪১। রামাধীন ৪৪ রানে ৪ উইকেট, ট্রাইব ৪৭ রানে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস : ৪২৯ (৬ উইকেটে ঘোষিত। হাজারে ১৪৪ নট আউট, মুস্তাক ৬১, অধিকারী ৫৬, উমরিগড় ৫৬, মার্চেন্ট ৪৮)

কমনওয়েলথ দল : ১ম ইনিংস : ২৭২ (ডুল্যাণ্ড ১০৮, এমেট ৫৫। মানকড় ৬৬ রানে ৪ উইকেট, পুঁটু চৌধুরী ৮২ রানে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস : ২১৪ (১ উইকেটে। ফিশলক ১০২ নট আউট। গিম্বলেট ৬৩, এমেট ৪৩ নট আউট)

খেলা অমীমাংসিত

দ্বিতীয় টেস্ট : বোম্বাই ১, ২, ৩, ৪, ৫ ডিসেম্বর। ১৯৫০।

সংক্ষিপ্ত স্কোর :

ভারত : ১ম ইনিংস ৮২ (রিজওয়ে ১৬ রানে ৪ উইকেট, লেকার ৩২ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস ৩৯৩ (উমরিগড় ১৩০, হাজারে ১১৫, মার্চেন্ট ৬২। লেকার ৮৮ রানে ৫ উইকেট)

কমনওয়েলথ দল : ১ ইনিংস ৪২৭ (গিব্‌স্ ৮৯, আইকিন ৭৭, স্পুনার ৬২ নট আউট, ওরেল ৫৫, সি. এস. নাইডু ৮৩ রানে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস ৪৯ (বিনা উইকেটে)।

ভারত ১০ উইকেটে পরাজিত

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা ৩০, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫০ ১, ২, ৩ জানুয়ারি ১৯৫৮ খ্রী।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস ৪৬৭ (সাত উইকেটে ঘোষিত। হাজারে ১৬৪, উমরিগড় ৯৩, সি. এস. নাইডু ৫৪। রিজওয়ে ১৩২ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস ৩৯ (১ উইকেটে)

কমনওয়েলথ দল : ১ম ইনিংস ২২৭ (আইকিন ৯৬ নট আউট, ওরেল ৬১। ফাদকার ৬০ রানে ৪ উইকেট, পুঁটু চৌধুরী ৩৭ রানে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস ৪৫৭ (আইকিন ১১১, ডুল্যাণ্ড ১০৬, ওরেল ৫৮। মানকড ১০২ রানে ৪ উইকেট)

খেলা অমীমাংসিত

চতুর্থ টেস্ট : মাদ্রাজ ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪ জানুয়ারি ১৯৫১।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস ৩৬১ (উমরিগড় ১১০, হাজারে ৮০, মানকড় ৫২। ওরেল ৫০ রানে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস : ৩০২ (৫ উইকেটে ঘোষিত। হাজারে ৭৫, মার্চেন্ট ৭২, ফাদকার ৬১। শ্যাকলটন ১৫৩ রানে ৪ উইকেট)

কমনওয়েলথ দল : ১ম ইনিংস ৩৯৩ (আইকিন ১১০, এমেট ৯৬, ওরেল ৭১। ফাদকার ৮৯ রানে ৫ উইকেট, মানকড় ৭০ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস : ২২৫ (৬ উইকেটে। আইকিন ৮৬, এমেট ৫৩। মানকড় ৭৫ রানে ৩ উইকেট)

খেলা অমীমাংসিত

পঞ্চম টেস্ট : কানপুর ৮. ৯, ১০, ১১, ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত : ১ম ইনিংস ২৪০ (উমরিগড় ৫৭। ডুল্যাণ্ড ৭০ রানে ৪ উইকেট, রামাধীন ৯০ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস : ৩৬২ (মার্চেন্ট ১০৭, মুস্তাক আলি ৮০, উমরিগড় ৬৩, গোপীনাথ ৬৬ নট আউট। রামাধীন ১০২ রানে ৫ উইকেট)

কমনওয়েলথ দল ১ম ইনিংস ৪১৩ (ওরেল ১১৬, গিবস ৯৯। হাজারে ৩২ রানে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস : ২৬৬ (৬ উইকেটে ঘোষিত। ওরেল ৭১ নট আউট, আইকিন ৬৩, গায়কোয়াড় ৮৩ রানে ৩ উইকেট)

ভারত ৭৭ রানে পরাজিত

১৯৫৩-৫৪ সালে সিলভার জুবিলী ওভারসীজ ক্রিকেট টীম এসেছিল। অধিনায়ক ছিলেন বেন বার্নেট। অপর খেলোয়াড়দের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল, সিম্পসন, এডরিচ, এমেট, লক্সটন, ফ্লেচার, লোডার, রামাধীন, ওয়াটকিন্স, সুব্বারাও, আইভারসন প্রভৃতি। এটিও আসলে একটি কমনওয়েলথ দল ছিল। ৫টি টেস্টের মধ্যে ভারত ২টিতে জয়লাভ করে এবং ১টিতে পরাজিত হয়। ১টি খেলা অমীমাংসিত থাকে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

প্রথম টেস্ট : দিল্লী ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ নভেম্বর ১৯৫৩।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত ১ম ইনিংস ৩৮৭ (রামচাঁদ ১১০, মঞ্জরেকার ৮৬। ওরেল ৬২ রানে ৪ উইকেট)

সিলভার জুবিলী দল ১ম ইনিংস ১৯৮ (সিম্পসন ৫৭। সুভাষ গুপ্ত ৯১ রানে ৮ উইকেট)

২য় ইনিংস ১৭৪ (সিম্পসন ৫৯, ওরেল ৫৪। গোলাম আমেদ ৫২ রানে ৬ উইকেট। সুভাষ গুপ্তে ৮২ রানে ৪ উইকেট)

ভারত ১ ইনিংস ও ১৫ রানে বিজয়ী

দ্বিতীয় টেস্ট : বোম্বাই ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ডিসেম্বর ১৯৫৩ খ্রী

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত ১ম ইনিংস ১৫২ (উমরিগড় ৮৩। ওরেল ৩২ রানে ৩ উইকেট, লোডার ৫৩ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস ৪৪৭ (৫ উইকেটে। মানকড় ১৫৪, গাদকারী ১০২ নট আউট, গোপীনাথ ৬৭ নট আউট, হাজারে ৬১। লোডার ৪৩ রানে ৩ উইকেট)

সিলভার জুবিলী দল ১ম ইনিংস ৫০৪ (৬ উইকেটে। সিম্পসন ১২১, ব্যারিক ১০২ নট আউট মারশাল ৯০,. লক্সটন ৫৫। মানকড় ১১০ রানে ৩ উইকেট)

খেলা অমীমাংসিত

তৃতীয় টেস্ট : কলকাতা ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৩; ১, ২, ৩ জানুয়ারি ১৯৫৪।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত ১ম ইনিংস ২৩৮ (উমরিগড় ১১২ নট আউট। আইভারসন ৭৮ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস ১৯০ (রামচাঁদ ১১১। আইভারসন ৪৭ রানে ৬ উইকেট ; লোডার ৪৪ রানে ৩ উইকেট)

সিলভার জুবিলী দল ১ম ইনিংস ২৪৫ (মিউলম্যান ৭৫। গুপ্তে ৯৫ রানে ৬ উইকেট, গোলাম আমেদ ৬৩ রানে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস ১৮৭ (৪ উইকেটে। মারশাল ৮৮ নট আউট, ওয়াটকিন্স ৫৫ নট আউট)

সিলভার জুবিলী দল ৬ উইকেটে বিজয়ী

চতুর্থ টেস্ট : মাদ্রাজ ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ জানুয়ারি ১৯৫৪।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত ১ম ইনিংস ৪৪০ (৯ উইকেটে ঘোষিত। পঙ্কজ রায় ১৪১, রামচাঁদ ৯৬, কেনী ৬৫)

সিলভার জুবিলী দল ১ম ইনিংস ২২২ (মিউলম্যান ১২৪। গোলাম আমেদ ৫১ রানে ৫ উইকেট, গুপ্তে ৯৬ রানে ৩ উইকেট)

২য় ইনিংস ১৬৮ (ওয়াটকিন্স ৪৪। গোলাম আমেদ ৪২ রানে ৭ উইকেট, গুপ্তে ৯২ রানে ৩ উইকেট)

ভারত এক ইনিংস ৫০ রানে বিজয়ী

পঞ্চম টেস্ট : লক্ষ্ণৌ ৩১ জানুয়ারী ১, ২, ৩, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪।

সংক্ষিপ্ত স্কোর : ভারত ১ম ইনিংস ৪১৬ (পাঞ্জাবী ১০৭, উমরিগড় ৮৭, কাদকার ৬৩, মুস্তাক আলি ৫৮। আইভারসন ৯৬ রানে ৪ উইকেট)

২য় ইনিংস ১৬৩ (২ উইকেটে ঘোষিত। মুস্তাক আলি ৭০ নট আউট পঙ্কজ রায় ৫৮)

সিলভার জুবিলী দল ১ম ইনিংস ৩৪৫ (মিউলম্যান ১৩১। ফাদকার ৮ রানে ৩ উইকেট, ভাণ্ডারী ৯০ রানে ৩ উইকেট) ২য় ইনিংস ৬৪ (৩ উইকেট)

খেলা অমীমাংসিত

এ ছাড়াও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারত তিন সিরিজ বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ খেলেছে এবং রাবার জয় করেছে।

সরকারী ও বেসরকারী টেস্ট ম্যাচে ভারতের সাফল্য ও অসাফল্যের সঙ্গে চলে পুরোদমে ঘরোয়া ক্রিকেটের আসর। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড টেস্ট খেলা ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসর পরিচালনা করে থাকে। পঞ্চদলীয় প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হলেও অন্যান্য প্রতিযোগিতা জোরদার হয়েছে এবং ক্রমে তাদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে। কাজেই এখানে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড সম্পর্কে কিছু আলোচনা সন্নিবেশিত হলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠার ইতিহাস : কিছু তথ্য

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সঠিক তারিখ জানা যায় না। কেউ বলেন এ প্রতিষ্ঠান ১৯২৭ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে, আবার কারো মতে ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু আবার এ তথ্যও পাওয়া যায় ১৯২৬ সালে লণ্ডনে এম. সি. সি. আয়োজিত যে ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্স হয়েছিল তাতে মিঃ রবার্টসন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। মিঃ রবার্টসন ক্যালকাটা ক্লাবের সদস্য ছিলেন এবং এ কনফারেন্সের ৩১শে মে ও ২৮শে জুলাইয়ের অধিবেশনে অংশ নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব ১৯২৬-২৭ সালে সর্বপ্রথম এম. সি. সি. তথা ইংল্যাণ্ড দলের ভারত পরিক্রমার বন্দোবস্ত করেছিল। এ কথা অবশ্য আগেই বলা হয়েছে।

ঐতিহাসিকদের মতে, এম. সি. সি-র ভারত সফরই ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করেছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর তারিখে দিল্লীর রোশেনারা ক্লাবের সি. আর. ই. গ্রাণ্ট আয়োজিত এক ভোজসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে সত্বর ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এ বৈঠকের সভাপতি ছিলেন পাতিয়ালার ভূতপূর্ব শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র সিংজী। ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্য মহারাজার অবদান অপরিসীম। এ বৈঠকে বাঙলা, সিন্ধু, পাতিয়ালা, পঞ্জাব, ইউনাইটেড প্রভিন্স (U. P.), দিল্লী, রাজপুতানা, ভূপাল, গোয়ালিয়র, বরোদা, মধ্যভারত, কাঠিয়াবাড়, আলোয়ার প্রভৃতি প্রদেশ প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এ বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয়েছিল—'সিন্ধু, পাতিয়ালা, দিল্লী, ইউ. পি., রাজপুতানা, আলোয়ার, বাঙলা, ভূপাল, গোয়ালিয়র, বরোদা, কাঠিয়াবাড় ও মধ্যভারতের ক্রিকেট-প্রেমিক প্রতিনিধিবৃন্দ নিম্নলিখিত প্রয়োজনে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব অনুমোদন করছে :

১) সারা ভারতে ক্রিকেট খেলা প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য

২) প্রাদেশিক, বিদেশী ও অন্যবিধ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন ও নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য

৩) বিদেশী টিম-এর ভারত ভ্রমণ ব্যবস্থা, ভারতীয় টিমগুলোর দেশ ও বিদেশে খেলবার ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য

৪) আবশ্যক হলে আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার আয়োজন ও নিয়ন্ত্রণ করা

৫) বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে কোন কলহ বা মতভেদ হলে তার নিষ্পত্তি এবং কোন সদস্য-সংস্থা বোর্ডের কাছে আপীল করলে তার সুরাহা করা।

৬) বাঞ্ছনীয় মনে হলে মেরিলীবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব (M. C. C.) রচিত নিয়মাবলী ও তার সংশোধনগুলো স্বীকার করা।'

দিল্লী বৈঠকের পর বোম্বাইয়ের জিমখানা ক্লাবে দ্বিতীয় বৈঠক বসে ১৯২৮ সালের এপ্রিল মাসে। এ বৈঠকে স্থির হয় বোর্ডের কাজ প্রধানত নীতিবিষয়ক ও নিয়ন্ত্রণাত্মক হবে। এ জন্য একটি অস্থায়ী বোর্ড গঠন করবার প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং তাতে সভাপতি ছাড়াও এ সকল সদস্য ছিলেন—

১) ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব
২) বোম্বাই, মাদ্রাজ, সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস ও পাঞ্জাবের সমিতিবৃন্দ
৩) করাচার সমিতি
৪) রাজেন্দ্র জিমখানা, পাতিয়ালা
৫) রোশেনারা ক্লাব, দিল্লী
৬) কাঠিয়াবাড় ক্লাব।

এ অস্থায়ী বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আঞ্চলিক (Zonal) সংঘ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছিল বোর্ডের সদস্য-সংখ্যা আট হলেই তার অস্থায়ীদশা সমাপ্ত হবে এবং বোর্ড স্থায়ী হবে।

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড ও আঞ্চলিক সংঘসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য পাতিয়ালার মহারাজা ভূপেন্দ্র সিংহ, নবনগরের মহারাজা জামসাহেব দিগ্বিজয় সিংহ, ইন্দোরের মহারাজা, ভূপালের নবাব, কুচবিহারের মহারাজা, সি. আর. ই. গ্রাণ্ট, এ. এস. ডিমেলো, ডঃ কাঙ্গা, এ.এল. হোসী, কর্নেল রুবী, এফ. টি. জোন্স, মারে রবার্টসন, সার আর. রিচমণ্ড, জাস্টিস পিয়ার্সন প্রমুখ ব্যক্তি প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন। লর্ড উইলিংডনও বোর্ড প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহিত ও সহায়তা করেছিলেন। মিঃ আর. ই. গ্রাণ্ট গীবন বোর্ডের প্রথম সভাপতি এবং এ. এস. ডিমেলো প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক হন। মি. গীবন দশ বছর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। ডিমেলো ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত অবৈতনিক সম্পাদক এবং এবং তারপরে সহ-সভাপতি হন। ১৯৪৬ সালে তিনি সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন।

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিচালনায় ১৯৩৪ সাল থেকে আন্তঃ-রাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতা (National Cricket Championship) অর্থাৎ রনজি ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ১৯৩৫ সাল থেকে শুরু হয় আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অর্থাৎ রোহিংটন বারিয়া ট্রফির

খেলা। অবশ্য ১৯৪২ সাল থেকে এ প্রতিযোগিতা পরিচালনার ভার আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের ওপর বর্তেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের পরিচালনায় আন্তঃ-রাজ্য স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা কুচবিহার ট্রফির খেলা ১৯৪৫ সাল থেকে শুরু হয়। দিলীপ ট্রফির খেলা বোর্ড চালু করে ১৯৬০ সাল থেকে।

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করে নিয়েছে। এ পাঁচটি অঞ্চলে সর্বসাকল্যে ২৭টি সংঘ রয়েছে। তাদের নাম এখানে তুলে দেওয়া হল :

ক] পূর্বাঞ্চল East Zone **মোট পাঁচটি**

(১) বাংলা ক্রিকেট সংঘ (২) বিহার ক্রিকেট সংঘ (৩) আসাম ক্রিকেট সংঘ (৪) ওড়িশা ক্রিকেট সংঘ (৫) ন্যাশন্যাল ক্রিকেট ক্লাব

খ] পশ্চিমাঞ্চল West Zone **মোট ছয়টি**

(১) বোম্বাই ক্রিকেট সংঘ (২) দ্য ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড (৩) মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংঘ (৪) বরোদা ক্রিকেট সংঘ (৫) গুজরাট ক্রিকেট সংঘ (৬) সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংঘ

গ] উত্তরাঞ্চল North Zone **মোট সাতটি**

(১) দিল্লী ক্রিকেট সংঘ (২) দক্ষিণ পাঞ্জাব ক্রিকেট সংঘ (৩) উত্তর পাঞ্জাব ক্রিকেট সংঘ (৪) জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট সংঘ (৫) ভারতীয় আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড (৬) রেলওয়ে খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (৭) সেনাবাহিনী খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

ঘ] দক্ষিণাঞ্চল South Zone **মোট পাঁচটি**

(১) তামিলনাডু ক্রিকেট সংঘ (২) কর্ণাটক ক্রিকেট সংঘ (৩) হায়দরাবাদ ক্রিকেট সংঘ (৪) কেরল ক্রিকেট সংঘ (৫) অন্ধ্র ক্রিকেট সংঘ

ঙ] মধ্যাঞ্চল Central Zone **মোট চারটি**

(১) উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট সংঘ (২) মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট সংঘ (৩) রাজস্থান ক্রিকেট সংঘ (৪) বিদর্ভ ক্রিকেট সংঘ

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের বিভিন্ন কার্য সম্পন্ন করবার জন্য দশটি উপসমিতি রয়েছে। তাদের নাম যথাক্রমে—

(১) কার্যকরী সমিতি (Working Committee)

(২) রনজি ট্রফি উপসমিতি (Ranji Trophy Committee)

(৩) টেস্ট নির্বাচক সমিতি (Test Selection Committee)
(৪) প্রশিক্ষণ উপসমিতি (Coaching Committee)
(৫) স্কুল টুর্নামেণ্ট উপসমিতি (School Commitee)
(৬) নির্ণায়ক উপসমিতি (Fixtures Committee)
(৭) পরোপকার নিধি সমিতি (Benavolent Fund Committee)
(৮) নিয়ম সংশোধন সমিতি (Technical Committee)
(৯) আম্পায়ার উপসমিতি (Umpire Sub-Committee)
(১০) ভিজি ট্রফি টুর্নামেণ্ট কমিটি (Vizzy Trophy Tournament Committee)

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হবার আগে একমাত্র পঞ্চদলীয় প্রতিযোগিতাই এদেশে প্রধানতম প্রতিযোগিতা ছিল।

ভারতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হল।

১. **রনজি ট্রফি :** ক্রিকেটের কিংবদন্তীর নায়ক নবনগরের জামসাহেব রনজিৎ সিংজীর (১৮৭২-১৯৩৩ সাল) স্মৃতিতে এ ট্রফির প্রবর্তন হয়েছিল। রনজিৎ সিংহ সারা ক্রিকেট দুনিয়ায় 'রণজি' নামে পরিচিত ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেটে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল যেন 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়' রূপে। তাঁর কৃতিত্ব পরাধীন ভারতের গ্লানি অনেকটা মুছিয়ে দিয়েছিল। রক্ষণশীল ইংরেজদের উন্নাসিকতাকে হেলায় বিপর্যস্ত করে তিনি ইংল্যাণ্ড দলে রাজকীয় আসন অধিকার করে নিয়েছিলেন। এখনও পৃথিবীর গুটিপাঁচেক সর্বকালীন সেরা ব্যাটসম্যান বেছে নিতে হলে রনজির নাম অন্তর্ভুক্ত হবেই। ক্রিকেটের এই প্রবাদপুরুষের মৃত্যু হয় ১৯৩৩ সাল। রনজি ট্রফি এ যুগন্ধর ক্রিকেটারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কলকাতার রনজি স্টেডিয়ামও তাঁর নাম বহন করছে। অবশ্য এখানে একথাও বলা যেতে পারে, ভারতীয় ক্রিকেট রনজির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয় নি।

রনজি ট্রফি প্রতিযোগিতা চালু হয় ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে। এর আগের বছর ইংল্যাণ্ড দল সরকারী সফরে এদেশে এসেছিল। এ সফর ভারতীয়দের মনে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তাগণও উৎসাহিত হয়ে ভেবেছিলেন ইংল্যাণ্ড বা অস্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন ক্লাবের মধ্যে যে ধরনের প্রতিযোগিতা চালু আছে তার অনুরূপ কিছু এদেশেও প্রবর্তন করলে

ভাল হয়। রনজি ট্রফির প্রবর্তনা সেই প্রেরণারই ফসল। রনজির মৃত্যুর প্রায় সমকালেই ঘটায় প্রতিযোগিতার নাম এই অমর ক্রিকেটারের নামের সঙ্গে একসূত্রে বাধা পড়ে এর মর্যাদা বাড়িয়েছে।

পাঞ্জাবের তৎকালীন রাজ্যপাল স্যার সিকন্দর হায়াৎ খান তখন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে সিমলায় ১৯৩৪ সালে এক বৈঠক বসে। এ বৈঠকে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। দক্ষিণ পাঞ্জাব ক্রিকেট সংঘের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিলেন পাতিয়ালার মহারাজা ভূপেন্দ্র সিং। এ. এস. ডীমেলো এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডীমেলো রনজি ট্রফির জন্য একটি প্রস্তাবের খসড়া পেশ করেছিলেন। ট্রফিটি কেমন হবে তারও নকসা সভায় হাজির করেছিলেন। এ সম্পর্কে উত্তরকালে তিনি লিখেছেন, "It was something like trepidation that I submitted my proposal for the Ranji Trophy to the august gathering and also laid bofore the meeting an artist's drawing of the proposed trophy, a Grecian urn two feet high, with a lid, the handle of which represented Father Time. Even I was not prepared in the events that followed. The late Maharaja of Patiala jumped up when I was scarcely halfway through my brief proposal. In deep tone, charged with emotion, His Highness claimed the honour and privilege of perpetuating the name of the great Ranji, who had departed his life only the year before. He offered straightway to present a gold cup of the magnificient design submitted by me to be called Ranji Trophy. It was to be competed for annually by the Provincial Cricket Associations of India." ট্রফিটির মূল্য ছিল ৭৫০০ টাকা।

রনজি ট্রফি প্রতিযোগিতার প্রথম খেলা শুরু হয়েছিল ১৯৩৪ সালে ৪ঠা নভেম্বর। প্রতিযোগী দল দুটি ছিল মাদ্রাজ আর মহীশূর। বর্তমানে দুটি রাজ্যেরই নাম পরিবর্তিত হয়েছে। উভয়ের নাম যথাক্রমে হয়েছে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক।

১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ খ্রী পর্যন্ত নক আউট পদ্ধতিতে খেলা হত। ১৯৫৭-৫৮ খ্রী থেকে আঞ্চলিক স্তরে লীগ পদ্ধতিতে খেলা হয়। পরে ফাইনাল

পর্যায়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে নক আউট পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়। এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের বিন্যাস এবং প্রতি অঞ্চলে প্রতিযোগীদের নাম দেওয়া হল।

ক. উত্তরাঞ্চল : (১) দিল্লী ও জেলা ক্রিকেট সংঘ
(২) দক্ষিণ পাঞ্জাব ক্রিকেট সংঘ
(৩) সেনাবাহিনী-খেলাধুলো নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(৪) উত্তর পাঞ্জাব ক্রিকেট সংঘ
(৫) রেলওয়ে খেলাধুলো নিয়ন্ত্রণ বোর্ড
(৬) জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট সংঘ

খ. দক্ষিণাঞ্চল : (১) তামিলনাড়ু ক্রিকেট সংঘ
(২) কর্ণাটক ক্রিকেট সংঘ
(৩) হায়দ্রাবাদ ক্রিকেট সংঘ
(৪) কেরল ক্রিকেট সংঘ
(৫) অন্ধ্র ক্রিকেট সংঘ

গ. পশ্চিমাঞ্চল : (১) বোম্বাই ক্রিকেট সংঘ
(২) মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংঘ
(৩) বরোদা ক্রিকেট সংঘ
(৪) গুজরাত ক্রিকেট সংঘ
(৫) সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংঘ

ঘ. মধ্যাঞ্চল (১) উত্তর প্রদেশ ক্রিকেট সংঘ
(২) মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট সংঘ
(৩) রাজস্থান ক্রিকেট সংঘ
(৪) বিদর্ভ ক্রিকেট সংঘ

ঙ. পূর্বাঞ্চল (১) বাঙলা ক্রিকেট সংঘ
(২) বিহার ক্রিকেট সংঘ
(৩) আসাম ক্রিকেট সংঘ
(৪) ওড়িশা ক্রিকেট সংঘ

১৯৩৪-৩৫ খ্রী থেকে এ যাবৎ ৪৫ বার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে এ যাবৎ ট্রফি বিজয়ী ও বিজেতাদের নাম দেওয়া হল।

বছর	বিজয়ী	অধিনায়ক	বিজেতা	অধিনায়ক	স্থান
১৯৩৪-৩৫	বোম্বাই	এল. পি. জয়	উত্তর ভারত	জি. ই. বি. অ্যাবেল	বোম্বাই
৩৫-৩৬	বোম্বাই	এইচ. জে. ভেজিফদার	মাদ্রাজ	এম. বালিয়া	দিল্লী
১৯৩৬-৩৭	নবনগর	এ. এফ. ওয়েন্সলে	বাঙলা	পি. আই. ভ্যানডেরগুস্ট	বোম্বাই
১৯৩৭-৩৮	হায়দ্রাবাদ	এস. এম. হুসেন	নবনগর	এ. এফ. ওয়েন্সলে	বোম্বাই
১৯৩৮-৩৯	বাঙলা	টি. সি. লঙফিল্ড	দক্ষিণ পাঞ্জাব	ওয়াজির আলি	কলকাতা
১৯৩৯-৪০	মহারাষ্ট্র	ডি. বি. দেওধর	উত্তরপ্রদেশ	পি. ই. পালিয়া	পুনা
১৯৪০-৪১	মহারাষ্ট্র	ডি. বি. দেওধর	মাদ্রাজ	সি. পি. জনস্টোন	মাদ্রাজ
১৯৪১-৪২	বোম্বাই	বিজয় মার্চেন্ট	মহীশূর	এস. দারাশা	বোম্বাই
১৯৪২-৪৩	বরোদা	ডব্লু. ঘোরপাড়ে	হায়দ্রাবাদ	এস. এম. হুসেন	সেকেন্দ্রাবাদ
১৯৪৩-৪৪	পশ্চিম ভারত	এইচ. ব্যারিট	বাঙলা	কুচবিহারের মহারাজা	বোম্বাই
১৯৪৪-৪৫	বোম্বাই	বিজয় মার্চেন্ট	হোলকার	সি. কে. নাইডু	বোম্বাই
১৯৪৫-৪৬	হোলকার	সি. কে. নাইডু	বরোদা	আর নিম্বলকর	ইন্দোর
১৯৪৬-৪৭	বরোদা	আর. নিম্বলকর	হোলকার	কে. সি. ইব্রাহিম	বরোদা
১৯৪৭-৪৮	হোলকার	সি. কে. নাইডু	বোম্বাই	কে. সি. ইব্রাহিম	ইন্দোর
১৯৪৮-৪৯	বোম্বাই	কে. সি. ইব্রাহিম	বরোদা	আর. নিম্বলকর	বোম্বাই
১৯৪৯-৫০	বরোদা	আর. নিম্বলকর	হোলকার	সি. কে. নাইডু	বরোদা
১৯৫০-৫১	হোলকার	সি. কে. নাইডু	গুজরাত	পি. কামবাত্তা	ইন্দোর
১৯৫১-৫২	বোম্বাই	মাধব মন্ত্রী	হোলকার	সি. কে. নাইডু	বোম্বাই
১৯৫২-৫৩	হোলকার	সি. কে. নাইডু	বাঙলা	প্রবীর সেন	কলকাতা
১৯৫৩-৫৪	বোম্বাই	এস. সোহনী	হোলকার	মুস্তাক আলি	ইন্দোর
১৯৫৪-৫৫	মাদ্রাজ	আর. আলাগানন	হোলকার	মুস্তাক আলি	ইন্দোর
১৯৫৫-৫৬	বোম্বাই	মাধব মন্ত্রী	বাংলা	প্রবীর সেন	কলকাতা
১৯৫৬-৫৭	বোম্বাই	মাধব মন্ত্রী	সার্ভিসেস	হেমু অধিকারী	নিউদিল্লী
১৯৫৭-৫৮	বরোদা	দাত্তু গায়কোয়াড়	সার্ভিসেস	হেমু অধিকারী	বরোদা
১৯৫৮-৫৯	বোম্বাই	মাধব আপ্তে	বাংলা	পঙ্কজ রায়	বোম্বাই
১৯৫৯-৬০	বোম্বাই	পলি উমরিগড়	মহীশূর	কে. বাসুদেবমূর্তি	বোম্বাই
১৯৬০-৬১	বোম্বাই	পলি উমড়িগড়	রাজস্থান	কে. এম. রুংতা	উদয়পুর
১৯৬১-৬২	বোম্বাই	মাধব আপ্তে	রাজস্থান	কে. এম. রুংতা	বোম্বাই
১৯৬২-৬৩	বোম্বাই	পলি উমড়িগড়	রাজস্থান	রাজ সিং	জয়পুর

বছর	বিজয়ী	অধিনায়ক	বিজেতা	অধিনায়ক	স্থান
১৯৬৩-৬৪	বোম্বাই	বাপু নাদকার্নি	রাজস্থান	রাজ সিং	বোম্বাই
১৯৬৪-৬৫	বোম্বাই	বাপু নাদকার্নি	হায়দ্রাবাদ	জয়সীমা	হায়দ্রাবাদ
১৯৬৫-৬৬	বোম্বাই	বাপু নাদকার্নি	রাজস্থান	রাজ সিং	জয়পুর
১৯৬৬-৬৭	বোম্বাই	এম. হার্দিকার	রাজস্থান	হনুমন্ত সিং	বোম্বাই
১৯৬৭-৬৮	বোম্বাই	এম. হার্দিকার	মাদ্রাজ	পি. কে বেলিয়াপ্পা	বোম্বাই
১৯৬৮-৬৯	বোম্বাই	অজিত ওয়াদেকার	বাংলা	অম্বর রায়	বোম্বাই
১৯৬৯-৭০	বোম্বাই	অজিত ওয়াদেকার	রাজস্থান	হনুমন্ত সিং	বোম্বাই
১৯৭০-৭১	বোম্বাই	সুধীর নায়েক	মহারাষ্ট্র	চান্দু বোরদে	বোম্বাই
১৯৭১-৭২	বোম্বাই	অজিত ওয়াদেকার	বাংলা	চুনী গোস্বামী	বোম্বাই
১৯৭২-৭৩	বোম্বাই	অজিত ওয়াদেকার	তামিলনাড়ু	বেঙ্কটরাঘবন	মাদ্রাজ
১৯৭৩-৭৪	কর্ণাটক	এরাপল্লী প্রসন্ন	রাজস্থান	হনুমন্ত সিং	উদয়পুর
১৯৭৪-৭৫	বোম্বাই	অশোক মানকড়	বিহার	দলজিৎ সিং	জামসেদপুর
১৯৭৬-৭৭	বোম্বাই	সুনীল গাভাসকার	দিল্লী	বিষণ সিং বেদী	নিউ দিল্লী
১৯৭৭-৭৮	কর্ণাটক	এরাপল্লী প্রসন্ন	উত্তরপ্রদেশ	মহম্মদ শহীদ	মোহননগর
১৯৭৮-৭৯	দিল্লী	বিষণ সিং বেদী	কর্ণাটক	গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ	বাঙ্গালোর

উপরের তালিকায় দেখা গেল রণজি ট্রফি বিজয়ে সিংহভাগ নিয়েছে বোম্বাই। মোট ৪৫ বার প্রতিযোগিতার মধ্যে বোম্বাই একাই চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ২৭ বার। তার মধ্যে ১৫ বার উপর্যুপরি চাম্পিয়ান। বিশ্বে এটি একটি অনন্য নজির। অন্যান্য দলের মধ্যে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে বরোদা ও হোলকার ৪ বার করে, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক ২ বার করে এবং নবনগর, বাঙলা, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, পশ্চিম ভারত ও দিল্লী ১ বার করে। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য সবচাইতে চমকপ্রদ খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫২-৫৩ সালে হোলকার ও বাংলার মধ্যে। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় খেলাটি শেষ হয়েছিল। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বিজয়ী হয়েছিল হোলকার। অনেকে এ খেলাটিকে 'শতাব্দীর সেরা খেলা' বলে অভিহিত করেছিলেন।

২. দিলীপ ট্রফি: ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ৩৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা বসেছিল মাদ্রাজে ১৯৬১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর। এ সভায় স্থির হয়েছিল বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড় দিলীপ সিংহের স্মৃতিতে একটি প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হবে। (দিলীপ সিংহ খ্যাতনামা রণজির ভাইপো ছিলেন।) ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ৫০০০ টাকায়

একটি ট্রফি নির্মাণ করান। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হল। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এ প্রতিযোগিতা হবে বলে স্থির হল। এই মর্মে ১৯৬১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর অঞ্চলের প্রথম ম্যাচ শুরু হল। এ যাবত কাল পর্যন্ত দিলীপ ট্রফির ফাইনাল খেলার ফলাফল দেওয়া হল—

বছর	বিজয়ী	বিজেতা
১৯৬১-৬২	পশ্চিম অঞ্চল	দক্ষিণ অঞ্চল
১৯৬২-৬৩	পশ্চিম অঞ্চল	দক্ষিণ অঞ্চল
১৯৬৩-৬৪	পশ্চিম অঞ্চল দক্ষিণ অঞ্চল	} যুগ্ম বিজয়ী
১৯৬৪-৬৫	পশ্চিম অঞ্চল	মধ্য অঞ্চল
১৯৬৫-৬৬	দক্ষিণ অঞ্চল	মধ্য অঞ্চল
১৯৬৬-৬৭	দক্ষিণ অঞ্চল	পশ্চিম অঞ্চল
১৯৬৭-৬৮	দক্ষিণ অঞ্চল	পশ্চিম অঞ্চল
১৯৬৮-৬৯	পশ্চিম অঞ্চল	দক্ষিণ অঞ্চল
১৯৬৯-৭০	পশ্চিম অঞ্চল	উত্তর অঞ্চল
১৯৭০-৭১	দক্ষিণ অঞ্চল	পূর্ব অঞ্চল
১৯৭১-৭২	মধ্য অঞ্চল	পশ্চিম অঞ্চল
১৯৭২-৭৩	পশ্চিম অঞ্চল	মধ্য অঞ্চল
১৯৭৩-৭৪		মধ্য অঞ্চল
১৯৭৪-৭৫	দক্ষিণ অঞ্চল	পশ্চিম অঞ্চল
১৯৭৫-৭৬	দক্ষিণ অঞ্চল	উত্তর অঞ্চল
১৯৭৬-৭৭	পশ্চিম অঞ্চল	উত্তর অঞ্চল
১৯৭৭-৭৮	পশ্চিম অঞ্চল	উত্তর অঞ্চল
১৯৭৮-৭৯		দক্ষিণ অঞ্চল

৩. **ইরাণী কাপ :** য় ক্রিকেটের সঙ্গে জে. আর. ইরানীর যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত গভীর। ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ১৯২৮ খ্রী থেকে ১৯৬৪ খ্রী পর্যন্ত (একবার শুধু সহ-সভাপতি ছিলেন)। বোর্ডের সভাপতি ছিলেন ১৯৬৫ খ্রী থেকে ১৯৬৯ খ্রী পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর স্মৃতিতে এ প্রতিযোগিতার প্রবর্তন। প্রতিযোগী দল রনজি ট্রফির বিজয়ী বনাম অবশিষ্ট ভারতীয় দল। এ যাবৎ খেলার ফলাফল—

বছর		
১৯৫৯-৬০	বোম্বাই	অবশিষ্ট ভারত
১৯৬০-৬১ ১৯৬১-৬২	খেলা হয় নি	
১৯৬২-৬৩	বোম্বাই	অবশিষ্ট ভারত
১৯৬৩-৬৪	বোম্বাই	অবশিষ্ট ভারত
১৯৬৪-৬৫	বোম্বাই	অবশিষ্ট ভারত
১৯৬৫-৬৬	বোম্বাই ও অবশিষ্ট ভারতের খেলার প্রথম ইনিংস শেষ হয় নি	
১৯৬৬-৬৭	অবশিষ্ট দল	বোম্বাই
১৯৬৭-৬৮	বোম্বাই	অবশিষ্ট দল
১৯৬৮-৬৯	অবশিষ্ট দল	বোম্বাই
১৯৭০-৭১	বোম্বাই	অবশিষ্ট দল
১৯৭১-৭২	অবশিষ্ট দল	বোম্বাই
১৯৭২-৭৩	বোম্বাই	অবশিষ্ট দল
১৯৭৩-৭৪	অবশিষ্ট দল	বোম্বাই
১৯৭৪-৭৫	কর্ণাটক	অবশিষ্ট দল
১৯৭৫-৭৬	বোম্বাই	অবশিষ্ট দল
১৯৭৬-৭৭	বোম্বাই	অবশিষ্ট দল
১৯৭৭-৭৮	অবশিষ্ট দল	বোম্বাই
১৯৭৮-৭৯	অবশিষ্ট দল	কর্ণাটক

৪. দেওধর ট্রফি : ভারতের বিখ্যাত খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধরের নামাঙ্কিত ট্রফিতেও আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এ ট্রফির খেলা শুরু হয়েছে ১৯৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। এ খেলাটি ৬০ ওভারে সীমাবদ্ধ। এ যাবত এ খেলার ফলাফল :

বছর	বিজয়ী
১৯৭৩-৭৪	দক্ষিণ অঞ্চল
১৯৭৪-৭৫	দক্ষিণ অঞ্চল
১৯৭৫-৭৬	পশ্চিম অঞ্চল
১৯৭৬-৭৭	উত্তর অঞ্চল
১৯৭৭-৭৮	উত্তর অঞ্চল
১৯৭৮-৭৯	দক্ষিণ অঞ্চল

৫. **ভিজি ট্রফি** : এ ট্রফিটিও ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড প্রদত্ত। প্রয়াত ক্রিকেটার বিজয়নগরের মহারাজকুমার ওরফে 'ভিজি'র উদ্দেশে নিবেদিত। 'ভিজি' ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন ১৯৩৬ সালে। এটিও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা। এ যাবৎ বিজয়ী ও বিজেতা :

বছর	বিজয়ী	বিজেতা
১৯৬৬-৬৭	পশ্চিম অঞ্চল	দক্ষিণ অঞ্চল
১৯৬৭-৬৮	পশ্চিম অঞ্চল	দক্ষিণ অঞ্চল
১৯৬৮-৬৯	পশ্চিম অঞ্চল	উত্তর অঞ্চল
১৯৬৯-৭০	পূর্ব অঞ্চল	উত্তর অঞ্চল
১৯৭০-৭১	দক্ষিণ অঞ্চল	উত্তর অঞ্চল
১৯৭১-৭২	অনুষ্ঠিত হয়নি	
১৯৭২-৭৩	পশ্চিম অঞ্চল	পূর্ব অঞ্চল
১৯৭৩-৭৪	উত্তর অঞ্চল	পশ্চিম অঞ্চল
১৯৭৪-৭৫	উত্তর অঞ্চল	পশ্চিম অঞ্চল
১৯৭৫-৭৬	উত্তর অঞ্চল	পশ্চিম অঞ্চল
১৯৭৬-৭৭	উত্তর অঞ্চল	পশ্চিম অঞ্চল
১৯৭৭-৭৮	দক্ষিণ অঞ্চল	উত্তর অঞ্চল
১৯৭৮-৭৯	উত্তর অঞ্চল	দক্ষিণ অঞ্চল

৬. **সি. কে. নাইডু ট্রফি** : ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ সি. কে. নাইডুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এ ট্রফির প্রবর্তন হয়েছে। যে সকল খেলোয়াড়ের বাইশ বছর বয়স হয়নি এবং রনজি প্রতিযোগিতায় খেলে নি তাদের ভেতর থেকে দল বাছাই হয়। প্রতিযোগিতা হয় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে। গত দুবছরের বিজয়ী ও বিজেতা :

	বিজয়ী	বিজেতা		বিজয়ী	বিজেতা
১৯৭৭-৭৮	দক্ষিণ অঞ্চল	পূর্ব অঞ্চল	১৯৭৮-৭৯	উত্তর অঞ্চল	পশ্চিম অঞ্চল

৭. **রোহিংটন বারিয়া ট্রফি** (আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা) : এ প্রতিযোগিতাটি ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে নয়। এ যাবৎ প্রতিযোগিতার ফলাফল :

বছর	বিজয়ী	বিজেতা	বছর	বিজয়ী	বিজেতা
১৯৩৫	পাঞ্জাব	বোম্বাই	১৯৫৭	বোম্বাই	পাঞ্জাব
১৯৩৬	পাঞ্জাব	নাগপুর	১৯৫৮	বোম্বাই	দিল্লী
১৯৩৭	পাঞ্জাব	আলিগড়	১৯৫৯	দিল্লী	বোম্বাই
১৯৩৮	বোম্বাই	পাঞ্জাব	১৯৬০	বোম্বাই	এলাহাবাদ
১৯৩৯	বোম্বাই	পাঞ্জাব	১৯৬১	মহীশূর	বোম্বাই
১৯৪০	বোম্বাই	মহীশূর	১৯৬২	পুনা	মাদ্রাজ
১৯৪১	বোম্বাই	বারানসী	১৯৬৩	বোম্বাই	মাদ্রাজ
১৯৪২	বোম্বাই	আলিগড়	১৯৬৪	বোম্বাই	কলকাতা
১৯৪৩	পাঞ্জাব	মাদ্রাজ	১৯৬৫	বোম্বাই	ব্যাঙ্গালোর
১৯৪৪	বোম্বাই	পাঞ্জাব	১৯৬৬	ওসমানিয়া	বোম্বাই
১৯৪৫	বোম্বাই	পাঞ্জাব	১৯৬৭	কলকাতা	ইন্দোর
১৯৪৬	বোম্বাই	আলিগড়	১৯৬৮	দিল্লী	ওসমানিয়া
১৯৪৭	বোম্বাই	আগ্রা	১৯৬৯	বোম্বাই	ব্যাঙ্গালোর
১৯৪৮	বোম্বাই	কলকাতা	১৯৭০	মাদ্রাজ	বোম্বাই
১৯৪৯	বোম্বাই	কলকাতা	১৯৭১	পাঞ্জাব	উদয়পুর
১৯৫০	মহীশূর	দিল্লী	১৯৭২	মাদ্রাজ	দিল্লী
১৯৫১	মহীশূর	এলাহাবাদ	১৯৭৩	দিল্লী	বোম্বাই
১৯৫২	বোম্বাই	দিল্লী	১৯৭৪	বোম্বাই	দিল্লী
১৯৫৩	দিল্লী	মহীশূর	১৯৭৫	মাদ্রাজ	বোম্বাই
১৯৫৪	বোম্বাই	পাঞ্জাব	১৯৭৬	ওসমানিয়া	বোম্বাই
১৯৫৫	বোম্বাই	দিল্লী	১৯৭৭	দিল্লী	ওসমানিয়া
১৯৫৬	বোম্বাই	দিল্লী	১৯৭৮	দিল্লী	বোম্বাই

৮. **কুচবিহার ট্রফি** : সারা-ভারত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার বিজয়ীকে কুচবিহার ট্রফি প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতাটি ১৯৪৬ সাল থেকে শুরু হয়েছিল। কুচবিহারের মহারাজা ট্রফিটি দান করেছিলেন। এ প্রতিযোগিতাটিও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। গত দু' বছরে বিজয়ী-বিজেতা :

১৯৭৮ খ্রী উত্তর অঞ্চল-পশ্চিম অঞ্চল ১৯৭৯ খ্রী উত্তর অঞ্চল-পশ্চিম অঞ্চল

ক্রিকেটার : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অধিকারী, হেমু (১২ অগস্ট, ১৯১৯ খ্রী) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও ডানহাতি ধীর গতির লেগব্রেক বোলার। রোহিংটন বারিয়া ট্রফিতে খেলে প্রথম নাম করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দলে খেলে বারাণসীর বিরুদ্ধে ১২৩ রান, নাগপুরের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৭৩ রান এবং পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১০৯ ও ২২২ রান করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আসেন। ১৯৪৫-৪৬ সালে নবনগরের বিরুদ্ধে দু ইনিংসে শতরান করেছিলেন (১২৯ ও ১৫১ নট আউট)। ১৯৫০ সালে সেনাদলে যোগ দেন এবং রনজি ট্রফিতে এ দলের নেতৃত্ব দেন। এ পর্যায়ে ব্যাটিংয়ে রাজপুতানার (বর্তমান রাজস্থান) বিরুদ্ধে ১৯৫১-৫২ সালে অপরাজিত ২৩০ রান তাঁর সেরা কৃতিত্ব। বোলিংয়ে ১৯৩৯-৪০ সালে গুজরাতের বিরুদ্ধে ২ রানে ৩ উইকেট পেয়েছিলেন। ১৯৪১, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ সালে পঞ্চদলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতাতেও অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলা শুরু করেছিলেন। সবশুদ্ধ তিনি ২১টি টেস্ট খেলেছিলেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫টি, ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৫টি, ১৯৫১-৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৩টি, ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৩টি, ১৯৫২-৫৩ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২টি, ১৯৫৬-৫৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২টি, ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১টি। ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে তিনি ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে জীবনের শেষ টেস্টে দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। তাঁর সেরা টেস্ট ইনিংস ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে দিল্লীতে অপরাজিত ১১৪ (টেস্টে তাঁর সর্বমোট রান ৮৭২)। কিছু বেসরকারী টেস্টেও তিনি খেলেছিলেন। কভার অঞ্চলের ফিল্ডার হিসেবে তাঁর নাম ছিল। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৭৮০০-র বেশি রান করেছিলেন।

১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে তিনি নির্বাচন সমিতির সদস্য ছিলেন। ভারতীয় দলের ম্যানেজার হয়েও কয়েক বার তিনি বিদেশ সফর করেছিলেন।

অমরনাথ, লালা (১১ সেপ্টেম্বর ১৯১১) ডানহাতি বোলার ও ব্যাটসম্যান। ভারতের অন্যতম সেরা অলরাউণ্ডার। একটি বিতর্কিত ও

অসাধারণ প্রতিভা। টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম আবির্ভাবে ১৯৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে শতরান করেছিলেন। ভারতের কোন খেলোয়াড়ের এ কৃতিত্বের এটাই প্রথম নজির। তিনি সর্বসাকল্যে ২৪টি টেস্ট খেলেছিলেন। এর মধ্যে ১৫টি টেস্ট ম্যাচে ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। কোন দলের বিরুদ্ধে ভারত প্রথম রাবার জয় করেছিল তার অধিনায়কত্বে (১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে)। টেস্ট খেলায় ব্যাটিং ও বোলিংয়ের পরিসংখ্যান :

ব্যাটিং : টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
২৪	৪০	৪	৮৭৮	১১৮	২৪.৩৯	২৩

বোলিং : ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
৬৪০.৫	১৯৬	১৪৮১	৪৫	৩২.৯১

অবশ্য পরিসংখ্যান তাঁর প্রতিভাকে ঠিকমত প্রকাশ করে নি। তার প্রধান কারণ তিনি একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে খেলতেন, ফলে আউট হতেন তাড়াতাড়ি। কিন্তু যতক্ষণ খেলতেন মারের জলুসে দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে যেত। অত্যন্ত বুদ্ধিমান অধিনায়ক হিসেবে তিনি বিদেশেও প্রশংসা পেয়েছেন। কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হবার ফলে বহুবার অন্যায়ভাবে দল থেকে বাদ গেছেন। এমন কি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাবার জেতার পরেই তাঁকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ভারতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। ফলে তিনি টেস্ট খেলা থেকে সরে দাঁড়ান।

রনজি ট্রফিতে তিনি প্রথম বছর থেকেই খেলেছেন। ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে ১৯৫১-৬২ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ পাঞ্জাব দলে, ১৯৫২-৫৩ সালে গুজরাট দলে, ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৬-৫৭ সালে পাতিয়ালা দলে, ১৯৫৪-৫৫ সালে উত্তর প্রদেশ দলে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে রেলওয়ে দলের হয়ে খেলেছেন। রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৫৭	২	২১৬২	১৫৫ ন. আ	৩৯.৩০
বোলিং	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
	১৫৩৮.৪	৫৬৪	২৭৬৪	১৯০	১৪.৫৫

তাঁর টেস্ট খেলার হিসাব : ইংল্যাণ্ড ১৯৩৩ (৩টি), ১৯৪৬ (৩টি)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭ (৫টি) অধিনায়ক। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮ (৫টি) অধিনায়ক। পাকিস্তান ১৯৫২ (৫টি) অধিনায়ক।

তিনি ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতিও হয়েছিলেন। টেস্ট-খেলোয়াড় সুরিন্দর ও মহীন্দর অমরনাথ তাঁর পুত্র।

অমরনাথ, মহীন্দর (২৪ মে, ১৯৫১) লালা অমরনাথের ছোট ছেলে। অলরাউণ্ডার। ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার। তিনি ২৬টি টেস্ট খেলে মোট রান করেছেন ১৪৬৬ (গড় ৩২'৫৭) এবং উইকেট পেয়েছেন ২৩টি (গড় ৫০'০০)। তাঁর সর্বোচ্চ রান অপরাজিত ১০১ এবং ক্যাচ ধরেছেন ২৩টি।

অমরনাথ, সুরিন্দর (৩০ ডিসেম্বর ১৯৪৮) লালা অমরনাথের বড় ছেলে। বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। মারকুটে খেলোয়াড়। বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে টেস্টে প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরি করেছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে। তারপর অবশ্য খেলায় বিশেষ ভাল ফল দেখাতে পারেন নি। টেস্ট খেলেছেন ৭টি—নিউজিল্যাণ্ড ১৯৭৬ (৩টি) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭৬ (২টি) ইংল্যাণ্ড ১৯৭৬-৭৭ (২টি)। পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৭	১৩	০	৪০৪	১২৪	৩১.০০	৪

অমরসিংহ (জন্ম ৪ ডিসেম্বর ১৯১০, মৃত্যু ২০ মে ১৯৪০) ডানহাতি অলরাউণ্ডার। তবে ফাস্ট বোলার হিসেবেই অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। নিসার-অমর সিং বোলার জুটি ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটের আদি পর্বে বিপক্ষ দলকে ত্রস্ত করে তুলতেন। অল্পবয়সে মৃত্যু না হলে তিনি আরও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারতেন। টেস্ট খেলেছেন ৭টি। যথা : ইংল্যাণ্ড ১৯৩২ (১টি), ১৯৩৩ (৩টি), ১৯৩৬ (৩টি)। তাঁর পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	৭	১৪	১	২৯২	৫১	২২.১৭	৩

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৩৬৩.৪	৯৫	৮৫৮	২৮	৩০.৬৪

রনজি ট্রফিতে তিনি খেলেছেন ১৯৩৪-৩৫ ও ১৯৩৫-৩৬ সালে পশ্চিম ভারতের পক্ষে। তারপর মৃত্যু পর্যন্ত নবনগরের পক্ষে। রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান ২৬ ইনিংস খেলে ৪৩.৬৬ গড়ে ১০০৯ রান এবং ১৫.৫৬ গড়ে ১০৫টি উইকেট। এ ছাড়া তিনি কিছু বেসরকারী টেস্ট ম্যাচও খেলেছিলেন।

আপ্তে, মাধবরাও লক্ষ্মণরাও (৫ অক্টোবর ১৯৩২) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খেলে নাম করেন। টেস্ট খেলেছেন মোট ৭টি। যথা—পাকিস্তান ১৯৫২ (২টি), ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৩ (৫টি)। টেস্টে তাঁর পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৭	১৩	২	৫৪৩	১৬৩ ন. আ	৪৯.২১	২

কয়েকটি বেসরকারী টেস্টও খেলেছিলেন। রনজি ট্রফিতে বোম্বাই দলের হয়ে খেলতেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	রান	সর্বোচ্চ	গড়
৬৪	১২	২০৭০	১৫৭	৩৯.৮১

ক্রিকেট ছাড়াও টেনিস, ব্যাডমিন্টন ভাল খেলতেন।

আবিদ আলি, সৈয়দ (৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২) অলরাউণ্ডার। দলের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খেলোয়াড়। টেস্ট খেলেছেন ২৯টি। যথা—অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৭ (৪টি)। ১৯৬৮ (১টি)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৮ (৪টি), ১৯৬৯ (৩টি)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭১ (৫টি), ১৯৭৪ (২টি)। ইংল্যাণ্ড ১৯৭১ (৩টি), ১৯৭২-৭৩ (৪টি)। ১৯৭৪ (৩টি)। তাঁর পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	নটআউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	২৯	৫৩	৩	১০১৮	৮১	২০.৩৬	৩২

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৬৭৭.৪	১২৫	১৯৮০	৪৭	৪২.১২

রনজিতে খেলতেন হায়দরাবাদের পক্ষে। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ব্যাটিং	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
	১১৬	৯	৩৫০৮	১৭৩ ন আ	৩২.৭৮

বোলিং	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
	১৮২৯.৫	৪৫২	৩৯২৯	১৮৩	২১.৪৬

আমীর ইলাহি (১লা সেপ্টেম্বর ১৯০৮) ডানহাতি বোলার। অবিভক্ত ভারতের হয়ে টেস্টে প্রথম খেলার সুযোগ পান অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে। অবশ্য তার আগে বেশ কিছু বেসরকারী টেস্টে ভারতের হয়ে খেলেছিলেন। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে তিনি পাকিস্তানে চলে যান। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান দলের সঙ্গে ভারত সফরে এসেছিলেন। যে দুজন খেলোয়াড় ভারত ও পাকিস্তানের হয়ে টেস্টে খেলেছিলেন ইনি তাদের

একজন। বলা বাহুল্য অপর জন আব্দুল হাফিজ কারদার। আমীর ইলাহি স্পিন বোলার ছিলেন।

ইঞ্জিনিয়ার, ফারুক (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৮) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও **উইকেটরক্ষক**। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উইকেটরক্ষক। বিশ্ব একাদশের পক্ষেও খেলেছেন। বোম্বাই দলের খেলোয়াড় ছিলেন। তবে রনজি ট্রফিতে খুব বেশি খেলেননি। ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলে খেলে সকলের নজরে আসেন। পরের বছর সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৫০ রান করেন এবং তিনজনকে স্টাম্প আউট করেন। টেস্ট খেলেছেন ৪৬টি। যথা: ইংল্যাণ্ড ১৯৬১ (৪টি) ১৯৬৭ (৩টি) ১৯৭১ (৩) ১৯৭২-৭৩ (৫টি) ১৯৭৪ (৩টি)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬২ (৩টি) ১৯৬৬ (১টি) ১৯৭৪ (৫টি)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৫ (৪টি) ১৯৬৮ (৪টি) ১৯৬৯ (২টি)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৭ (৪টি) ১৯৬৯ (৫টি)। টেস্টে তাঁর পরিসংখ্যান:

	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৪৬	৮৬	৩	২৬১১	১২১	৩১'০৮

উইকেটরক্ষক হিসেবে টেস্টে তাঁর শিকার ৮২টি [১৬টি স্টাম্প এবং ৬৬টি ক্যাচ]। এটি এ যাবত ভারতীয় ক্রিকেটের রেকর্ড ছিল। সম্প্রতি সৈয়দ কিরমানি এটি ভেঙেছেন।

ইন্দ্রজিৎ সিংজী (১৫ জুন, ১৯৩৭) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেট-রক্ষক। ১৯৫৫-৫৬ সালে সৌরাষ্ট্র দলের পক্ষে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খেলে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট আসরে আসেন। ১৯৫৭-৫৮ থেকে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। টেস্ট খেলেছিলেন মোট ৪টি। যথা— অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৪ (৩টি), নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৯ (১টি)। রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান:

ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৮০	৩	২১২৪	১২৪	২৭'৫৮

ইব্রাহিম, কে. সি. (২৬ জানুয়ারি ১৯১৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। বোম্বাই দলের পক্ষে খেলতেন। টেস্ট খেলেছেন মোট ৪টি। সবগুলোই ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে। টেস্টে তাঁর পরিসংখ্যান:

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৪	৮	০	১৬৯	৮৫	২১'৩৩

রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৩৯	৪	২৩২৯	২৩০ নট আ.	৬৬·৫৪

ইরানী, জে. কে. (১৮ অগস্ট ১৯২৩) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক। টেস্ট খেলেছেন ২টি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৪৭ সালে।

উমরিগড়, পলি (২৮ মে ১৯২৬) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চৌকস খেলোয়াড় উমরিগড় দীর্ঘকাল দলের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। গোড়ার দিকে ফাস্ট বলে কিছু দুর্বলতা থাকলেও পরে তা কাটিয়ে উঠে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। পঞ্চকোণীয় ও রনজি ট্রফিতে ভাল খেলে সকলের নজরে আসেন এবং ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে আবির্ভূত হন। তারপর একমাত্র ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ডে টেস্টে খারাপ খেললেও অন্যান্য প্রায় প্রতিটি সিরিজে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি সর্বসাকল্যে টেস্ট খেলেছিলেন ৫৯টি এবং সেঞ্চুরি করেছিলেন ১২টি। দুটি বিষয়ই দীর্ঘকাল ভারতীয় ক্রিকেটে রেকর্ড ছিল। তাঁর খেলার হিসেব :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮ (১), ১৯৫৩ (৫), ১৯৫৮ (৫), ১৯৬২ (৫)। ইংল্যাণ্ড ১৯৫১ (৫), ১৯৫২ (৪), ১৯৫৯ (৪), ১৯৬১ (৪)। পাকিস্তান ১৯৫২ (৫), ১৯৫৫ (৫), ১৯৬০ (৫)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৫)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ (৩) ১৯৫৯ (৩)।

টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	৫৯	৯৪	৮	৩৬৩১	২২৩	৪২·২২	৩৪

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৭৮৯·৪	২৫৯	১৪৭৫	৩৫	৪২·১৪

প্রত্যেক দেশের বিরুদ্ধেই তিনি শতরান করেছিলেন। ১৯৫১-৫২ সাল থেকে এক নাগাড়ে ৪১টি টেস্ট খেলেছিলেন। ছয়বার ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে খেলার সময় ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে মতপার্থক্যের দরুন নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হন। রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৭০	১২	৪১০২	২৪৫	৭০·৭২

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	২৮৮·৫	১১৭	৫০২	৩৫	১৪·৩৫

এ ছাড়া কিছু বেসরকারী টেস্ট ম্যাচেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। শারীরিক কারণে খেলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সদস্য এবং বিদেশগামী ভারতীয় দলের ম্যানেজার হয়েছিলেন। ভারত সরকার থেকে 'পদ্মশ্রী' পেয়েছিলেন।

ওয়াদেকার, অজিত লক্ষ্মণ (১ এপ্রিল, ১৯৪০) বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। ১৯৬৬-৬৭ সালে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। তার আগে রনজি ট্রফিতে বোম্বাই দলের পক্ষে খেলে সবার নজরে আসেন। সবশুদ্ধ টেস্ট খেলেছেন ৩৭টি। তার মধ্যে ১৬টি খেলায় ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন। মনসুর আলি পতৌদিকে সরিয়ে ১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজগামী ভারতীয় দলের অধিনায়ক করা হয় তাঁকে অনেকটা আকস্মিক ভাবে। কিন্তু সেবারই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে প্রথম রাবার লাভের ফলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সে বছরেই ইংল্যাণ্ডের মাটিতে প্রথম টেস্ট জয় করে অধিনায়ক হিসেবে ওয়াদেকার সম্মানের চরমসীমায় উঠেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালে ইংল্যাণ্ডে আবার গিয়ে তিনটি খেলায় শোচনীয়ভাবে ভারতীয় দল হারে। ফলে অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়ে তাঁকে টেস্ট ক্রিকেটের আসর থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। যুগপৎ এমন সম্মান ও অসম্মান খুব কম খেলোয়াড়ের ভাগ্যেই জুটেছে। মোট টেস্ট খেলেছিলেন ৩৭টি। যথা—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬৬ (২), ১৯৭১ (৫)। ইংল্যাণ্ড ১৯৬৭ (৩), ১৯৭১ (৩), ১৯৭২-৭৩ (৫), ১৯৭৪ (৩)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৭ (৪), ১৯৬৯ (৫)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৮ (৪), ১৯৬৯ (৩)। টেস্টে তাঁর পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	৩৭	৭১	৩	২১১৫	১৪৩	৩১.১০	৪৪

রণজির পরিসংখ্যান :

	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৮৬	১২	৪৩৩৮	৩২৩ ন. আ	৬০.৯৪

কিরমানি, সৈয়দ মুস্তাফা (২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক। ইঞ্জিনিয়রের পরবর্তী কালে ভারতের শ্রেষ্ঠ উইকেটরক্ষক। বস্তুত ইঞ্জিনিয়রের উজ্জ্বল উপস্থিতির জন্য টেস্ট ক্রিকেট আসরে তাঁর প্রবেশ কিছু বিলম্বিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি চার বছরের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়রের উইকেট রক্ষণের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন

১৯৭৯ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁর প্রতি এটা যে অবিচার করা হয়েছিল তা তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন তারপর অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে খেলায়। এমন গরিমাযুক্ত প্রত্যাবর্তন ভারতীয় ক্রিকেট খুব কমই ঘটেছে। এ যাবত তিনি টেস্ট খেলেছেন ৩৫টি :

নিউজিল্যাণ্ড ১৯৭৬ (৩), ১৯৭৬ (৩)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭৬ (৪), ১৯৭৮-৭৯ (৬)। ইংল্যাণ্ড ১৯৭৬-৭৭ (৫)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৭৭-৭৮ (৫), ১৯৭৯ (৬)। পাকিস্তান ১৯৭৮ (৩)। টেস্টে তাঁর পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৩৫	৫১	৮	১২৬১	১০১ ন. আ.	২৯·০৯

এর মধ্যে নৈশপ্রহরী হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এ বছর খেলতে নেমে শতরান করেছিলেন। এ ছাড়া উইকেটরক্ষক হিসেবে তিনি আউট করেছেন ৭৯ জনকে (৫৮টি ক্যাচ এবং ২১টি স্টাম্পড)।

কপিলদেব নিখঞ্জ (৬ জানুয়ারি ১৯৫৯) ডানহাতি বোলার ও ব্যাটসম্যান। ইদানীংকালে ভারতীয় দলের সব চাইতে সাড়া-জাগানো হরিয়ানার এ খেলোয়াড়টি ছাত্রজীবনেই খেলাধুলোয় পারদর্শিতা দেখিয়ে আসছেন। দৌড়ে বিজয়ীর পুরস্কার তাঁর ছিল বাঁধা। রনজিতে প্রথম আবির্ভাব ১৯৭৫ সালে হরিয়ানার পক্ষে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে। এ খেলার প্রথম ইনিংসে ৩৯ রানে ৬ উইকেট পেয়েছিলেন। প্রথম টেস্ট খেলায় সুযোগ পান ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তারপর এ যাবৎ টেস্ট খেলেছেন ১৯টি। যথা

পাকিস্তান ১৯৭৮ (৩)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭৮-৭৯ (৬)। ইংল্যাণ্ড ১৯৭৯ (৪)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৭৯ (৬)।

তাঁর পরিসংখ্যান :

ব্যাটিং	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
	১৯	২৫	৩	৭৪৫	১২৬ ন. আ	৩৩·৮৬	৭

	ওভার	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৬৬৯·৪	২১০৮	৬৮	৩১·০০

আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে তিনি যে শুধু দর্শকদের আনন্দ দেন তাই নয়, প্রয়োজনে খেলার গতিও ঘুরিয়ে দিতে পারেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭৯ সালে একমাত্র টেস্টটি জেতার মূলে তাঁর লড়িয়ে মেজাজ অনেকটাই

কাজ করেছিল। বিনু মানকড়ের পর ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র তাঁরই টেস্টে ডাবল করার সম্ভাবনা আছে।

কিষেণচাঁদ, গোগুমল (১৪ এপ্রিল, ১৯২৫) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। মোট ৫টি টেস্ট খেলেছিলেন। উল্লেখযোগ্য রান করতে পারেন নি। খেলেছিলেন ১৯৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ৪টি এবং ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১টি টেস্ট। রনজি ট্রফিতে অবশ্য তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। রনজি ট্রফির পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
১০৬	২৮	৪২৪৬	১৮১	৫৪·৪৪

তিনি বরোদা দলের খেলোয়াড় ছিলেন।

কৃপাল সিং, এ. জি. (৬ অগস্ট, ১৯৩৩) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। প্রয়োজনে বলও করতেন। টেস্ট খেলেছেন ১৪টি। যথা—

নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৪)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ (২), ১৯৬৪ (১)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৮ (১)। ইংল্যাণ্ড ১৯৫৯ (১), ১৯৬১ (৩), ১৯৬৪ (২)।

টেস্টে তাঁর পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
১৪	২০	৫	৪২১	১০০ ন. আ.	২৮·৬৬	৪

রনজি ট্রফিতে তিনি হায়দ্রাবাদ দলের পক্ষে করেন :

ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৫৮	৬	২৫৮১	২০৮	৪৯·৬৩

এ ছাড়া কিছু বেসরকারী টেস্টও খেলেছিলেন।

কৃষ্ণমূর্তি, পাছিয়া (১২ জুলাই, ১৯৪৭) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও ও উইকেটরক্ষক। হায়দ্রাবাদ দলের খেলোয়াড় ছিলেন। টেস্ট খেলেছেন ৫টি, সবগুলোই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে। টেস্ট পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৫	৬	×	৩৩	২০	৫·৫০

আউট করেছিলেন ৮ জনকে (৭টি ক্যাচ, ১টি স্টাম্পড)। রনজি ট্রফিতে তাঁর ব্যাটিং পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৫৫	১১	৭২০	৭৮	১৬·৩৬

উইকেট রক্ষণ : ৭০টি ক্যাচ, ৩৭টি স্টাম্পড।

কুন্দরন, বুধিসাগর কৃষ্ণাপ্পা (২ অক্টোবর, ১৯৩৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক। মারকুটে ব্যাটসম্যান হিসেবে খ্যাতি ছিল। ফিল্ডিংও করতেন অসাধারণ। ব্যাটিং ও ফিল্ডিং দক্ষতার জন্য ইঞ্জিনিয়ার থাকা সত্ত্বেও দলে বেশ কয়েকবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। বস্তুত এক সময় ইঞ্জিনিয়ারকেও তিনি দীপ্তিতে আড়ালে ফেলে দিয়েছিলেন। টেস্ট খেলছেন সবশুদ্ধ ১৮টি :

অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ (৩)। পাকিস্তান ১৯৬০ (২)। ইংল্যাণ্ড ১৯৬১ (১), ১৯৬৪ (৫) ১৯৬৭ (২)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬২ (২), ১৯৬৬ (২)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৫(১)।

টেস্টে তাঁর পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
১৮	৩৪	৪	৯৮১	১৯২	৩২'৭০

১৯৬৪ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯২ রান যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। প্রচণ্ড মেরে খেলেছিলেন তিনি। একটুর জন্য মধ্যাহ্ন-ভোজের আগে শত রান পান নি। উইকেট-রক্ষক হিসেবে তাঁর শিকার ৩১টি (৭ স্টাম্পড, ২৪ ক্যাচ)।

কর্ণাটক দলের পক্ষে খেলে রনজিতে তিনি করেন—

ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৬১	৭	২২৬০	২০৫	৪১'৮৫

একটু অকালেই টেস্ট ক্রিকেটের জগৎ থেকে সরে যেতে হয়েছে তাঁকে।

কুমার, বামন বী (২৬ জুন, ১৯৩৫) ডানহাতি স্পিন বোলার। টেস্ট খেলেছেন ২টি। একটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৬০ সালে, অপরটি ১৯৬১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। জীবনের প্রথম টেস্টে ১৩২ রানে ৭টি উইকেট পেয়েছিলেন। এটি তখন ভারতীয় দলের রেকর্ড ছিল।

তামিলনাড়ুর এ খেলোয়াড়টি কিন্তু রনজি ট্রফিতে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
৩১০২'৩	৯০০	৭৭৫৬	৪১৭	১৮'৫৯

এটি রেকর্ড ছিল। সম্প্রতি রাজিন্দর গোয়েল এ রেকর্ড ভেঙেছেন।

কেনী, রামনাথ বী (২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০) ডানহাতি ব্যাটসম্যান পরিচ্ছন্ন শৈলীর কুশলী খেলোয়াড় ছিলেন। অবশ্য টেস্টে তাঁর প্রতিভা ম ফুটে ওঠে নি। টেস্ট খেলেছিলেন মোট ৫টি। যথা—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৮ (১) অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ (৪)।

টেস্ট পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৫	১০	১	২৪৫	৬২	২৭.২২	১

প্রথমে বোম্বাই দলের হয়ে ১৯৫০-৫১ সালে খেলা শুরু করেন। পরে বাংলা দলের হয়েও খেলেছিলেন। রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৪৪	৬	২০৬২	২১৮ ন. আ	৫৪·২৬

ভারতীয় ক্রিকেট কন্‌ট্রোল বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

কণ্ট্রাক্টর, নরীম্যান (৭ মার্চ, ১৯৩৪) বাঁহাতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান। জীবনের প্রথম শ্রেণীর প্রথম খেলায় বরোদার বিরুদ্ধে উভয় ইনিংসে শত রান করেন (১০২ অপরাজিত এবং ১৫২ রান)। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৫৮-৫৯ সাল পর্যন্ত গুজরাত দলের পক্ষে খেলেন। ১৯৫৯-৬০ সালে রেলওয়ে দলে যোগ দেন। পরে আবার গুজরাতে ফিরে ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত খেলেন।

তিনি সবসুদ্ধ ৩১টি টেস্ট খেলেছিলেন। যথা—

নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৪); অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ (১) ১৯৫৯ (৫); ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৮ (৫) ১৯৬২ (২); ইংল্যাণ্ড ১৯৫৯ (৪) ১৯৬০-৬১ (৫); পাকিস্তান ১৯৬০ (৫)।

এর মধ্যে ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, ১৯৬০-৬১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং ১৯৬২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে মোট ১২টি খেলায় ভারতের অধিনায়ক ছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকালে ১৯৬২ সালে তৃতীয় টেস্টের আগে একটি স্থানীয় খেলায় ফাস্ট বোলার গ্রিফিথের বলে মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছিলেন। এ আঘাত তাঁর খেলোয়াড় জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল। টেস্টে তাঁর পরিসংখ্যান—

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৩১	৫২	১	১৬১১	১০৮	৩১·৫৯	১৮

রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৯৪	৮	৩৭০৭	১৭৬	৪৩·১০

১৯৬২ সালে পদ্মশ্রী উপাধি পেয়েছিলেন।

কোলাহা, এল. এইচ. এম. (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯০২—মৃত্যু ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। টেস্ট খেলেছিলেন দুটি, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩২ সালে ১টি এবং ১৯৩৩ সালে ১টি। চার ইনিংসে তাঁর রান মোট ৬৯ (গড় ১৭·২৫)। রনজি ট্রফির খেলায় ৩৬টি ইনিংসে ৫ বার অপরাজিত থেকে মোট ১০৮৫ রান করেছেন।

গাদকারী, চন্দ্র (৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও দক্ষ ফিল্ডার। মোট টেস্ট খেলেছেন ৬টি :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৩ (৩) ; পাকিস্তান ১৯৫৫ (৩)।

পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৬	১০	৪	১৩৩	৫০ ন. আ.	২২·১৭	৬

পাঞ্জাব ও সার্ভিসেস দলের পক্ষে খেলে রনজি ট্রফিতে করেন

ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৪৯	৬	২১৩৩	১৪৫	৪৯.৬০

গাভাসকর, সুনীল মনোহর (১০ জুলাই, ১৯৪৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। বর্তমান বিশ্বের সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান এবং সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। এর মধ্যেই ইনি বহু বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। বোম্বাই দলের খেলোয়াড়। জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৭১ সালে। সেই সিরিজে ১৫৪·৮০ গড়ে মোট ৭৭৪ রান করেন। খেলোয়াড় জীবনের প্রথম সিরিজে এ রান বিশ্ব রেকর্ড। তারপর একে একে বহু রেকর্ড করেছেন এবং সম্ভবত আরও বহু রেকর্ড করবেন। এ যাবৎ মোট টেস্ট খেলেছেন ৫৬টি :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭১ (৪), ১৯৭৪-৭৫ (২), ১৯৭৬ (৪), ১৯৭৮-৭৯ (৬); ইংল্যাণ্ড ১৯৭১ (৩) ১৯৭২-৭৩ (৫), ১৯৭৪ (৩), ১৯৭৬-৭৭ (৫), ১৯৭৯ (৪); নিউজিল্যাণ্ড ১৯৭৬ (৩), ১৯৭৬ (৩) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৭৭-৭৮ (৫) ১৯৭৯ (৬); পাকিস্তান ১৯৭৮ (৩)।

টেস্ট খেলায় তাঁর পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৫৬	১০১	৭	৫৩৭২	২২১	৫৭·১৫	৪৮

এর মধ্যে তিনি ২২টি সেঞ্চুরি করেছেন। কোন ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে এ কৃতিত্ব একটি বিশ্ব রেকর্ড। মোট ৫৩৭২ রানও ভারতীয় রেকর্ড।

রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

খেলা	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৩৬	৫২	৯	২৮৮০	২৮২	৬৬.৯৮

বিশ্ব একাদশ দলের পক্ষে গাভাসকর খেলেছেন।

গায়কোয়াড়, অংশুমান (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক দত্তাজী রাও গায়কোয়াড়ের পুত্র। এ যাবৎ টেস্ট খেলেছেন ১৪টি :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭৪ (৩), ১৯৭৬ (৩) ; নিউজিল্যাণ্ড ১৯৭৬ (৩) ; ইংল্যাণ্ড ১৯৭৬-৭৭ (৪); অস্ট্রেলিয়া ১৯৭৭-৭৮ (১)।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৭৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য তিনি মনোনীত হন নি। পরে সুরিন্দার অমরনাথ আহত হলে তাঁকে পাঠানো হয়। টেস্টে তাঁর পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
১৪	২৬	২	৭৪২	৮১ ন. আ.	৩০.৯১	৫

এর মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৭৬ সালের সাহসী ইনিংসটি মনে রাখার মত। ক্ষমতা অনুযায়ী এঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটে নি। বরোদার পক্ষে রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

খেলা	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৩৫	৫৭	৬	১৭৭৯	১৫৫	৩৪.৮৮

এ ছাড়া রণজিতে উইকেট পেয়েছেন ১৬টি (গড় ৩২.৪৪)।

গায়কোয়াড়, দত্তাজী রাও (২৭ অক্টোবর, ১৯২৮) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও ভাল ফিল্ডার। ১৯৪৭-৪৮ সালে বরোদার হয়ে কাথিয়াবাড়ের বিরুদ্ধে খেলে প্রথম নাম করেন। ১৯৫৭-৫৮ সালে এ দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। সেবার বরোদা রনজি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৬৯	৩	৩১৩৯	২৪৯ ন. আ	৪৭.৫৬

টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগ পান ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। সবসুদ্ধ ১১টি টেস্ট খেলেন। তার মধ্যে চারটিতে তিনি ভারতীয় দলের

অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৫৯ সালে ইংল্যাণ্ডগামী ভারতীয় দলের অধিনায়ক নিযুক্ত হওয়ায় অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
১১	২০	১	৩৫০	৫২	১৮·৪২	৫

তাঁর টেস্ট খেলার হিসাব—ইংল্যাণ্ড ১৯৫২ (১) ; ১৯৫৯ (৪) ; পাকিস্তান ১৯৫২ (২) ১৯৬০ (১) ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৩ (২) ১৯৫৮ (১)।

গায়কোয়াড়, হীরালাল (২৯ অগস্ট, ১৯২৮) বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ও মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। ১৯৪১-৪২ সালে রনজি ট্রফিতে প্রথম মধ্যভারত ও বেরারের হয়ে মাদ্রাজের বিরুদ্ধে খেলেন। পরে হোলকার দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। ১৯৫২-৫৩ সালে রনজি ট্রফির ফাইনাল খেলায় ইডেন গার্ডেনে বাংলার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামী ব্যাটিং হোলকারকে বিজয়ী করেছিল। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৯৬	১২	১৯৭৬	১৬৪	২৩·৫২

একটি মাত্র টেস্ট খেলেছেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালে। শেষ জীবনে মধ্যভারতের সদস্য ছিলেন।

গার্ড, গোলাম (১২ ডিসেম্বর, ১৯২৫—মৃত্যু ১৩ মার্চ, ১৯৭৮) বাঁহাতি মিডিয়াম পেস বোলার। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলেন ১৯৪৭-৪৮ সালে, বোম্বাই দলের হয়ে কাথিয়াবাড়ের বিরুদ্ধে। সফরে ১৯৫৩-৫৪, এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে গুজরাতে খেলা বাদে বাকী সময় বোম্বাই দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান—

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
৭৮২·১	২০২	১৯৫৭	১০২	১৯·১৯

টেস্ট খেলেছেন ২টি : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৫৮ সালে ১টি এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৫৯ সালে ১টি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৮৮ রানে ৩ উইকেট তার সেরা টেস্ট বোলিং।

গুপ্তে, বালু পণ্ডরীনাথ (৩০ অগস্ট, ১৯৩৪) ডানহাতি স্পিন বোলার। বিখ্যাত বোলার সুভাষ গুপ্তের ভাই। ১৯৫৩-৫৪ সালে বোম্বাইয়ের

পক্ষে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৫৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে প্রথম শ্রেণীর খেলায় আত্ম-প্রকাশ করেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
২০০৪.২	৫০০	৫৩১৩	২৩৭	২২.৪২

টেস্ট খেলেছেন তিনটি—১৯৬০ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১টি, ১৯৬৪ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১টি এবং ১৯৬৫ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১টি।

গুপ্তে, সুভাষ পনঢরীনাথ 'ফর্গী' (১১ ডিসেম্বর, ১৯২৯) ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার। তাঁর পাক-ধরানো বোলিং বিপক্ষ দলে ভীতির সঞ্চার করত। ১৯৪৮-৪৯ সালে বোম্বাই দলের পক্ষে মাদ্রাজের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর খেলায় আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৫৩-৫৪ ও ১৯৫৭-৫৮ সালে বাংলা দলে এবং ১৯৬০-৬১ ও ১১৬৩-৬৪ সালে রাজস্থান দলেও খেলেছেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান—

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
৮২৮·১	২১০	২২২৪	১২১	১৮·৭১

টেস্ট খেলেছেন মোট ৩৬টি: ইংল্যাণ্ড ১৯৫১ (১), ১৯৫৯ (৫), ১৯৬১ (২); পাকিস্তান ১৯৫২ (২), ১৯৫৫ (৫), ১৯৬০ (৩); ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৩ (৫) ১৯৫৮ (৫); নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৫); অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ (৩)।

টেস্টে তাঁর পরিসংখ্যান—

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	ক্যাচ
১৮৮০.৪	৫৯৮	৪৪০৩	১৪৯	২৯.৫৫	১৪

জীবনের সেরা বোলিং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১০২ রানে ৯ উইকেট (১৯৫৮-৫৯ সালে)। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোলযোগের দরুন তাঁকে দক্ষতা হারানোর আগেই টেস্ট ক্রিকেট আসর থেকে বিদায় নিতে হয়।

গুল মহম্মদ (১৫ অক্টোবর, ১৯২১) বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার। ১৯৫৪ সালে অস্ট্রেলিয়া সার্ভিসেস দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পান। ১৯৪৬ সালে ইংল্যাণ্ড এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান:

ইনিংস	নট আউট	মোট	গড়
৫১	২	১৮৪২	৩৭.৫৮

টেস্ট খেলেছেন সবশুদ্ধ ৮টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৪৬ (১) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭ (৫); পাকিস্তান ১৯৫২ (২)। টেস্টে তাঁর কৃতিত্ব এমন কিছু উজ্জ্বল না হলেও রনজিতে বরোদার পক্ষে খেলে হোলকারের বিরুদ্ধে রান করেছিলেন ৩১৯। ১৯৪৬-৪৭ সালের এ খেলায় বিজয় হাজারের সঙ্গে জুটিতে হয়েছিল ৫৭৭ রান। চতুর্থ উইকেটে জুটির এটা এখনও বিশ্ব রেকর্ড।

গুলাম, আমেদ (৪ জুলাই, ১৯২২) ভারতের অন্যতম সেরা ডানহাতি স্পিন বোলার। এককালে মানকড়-গুলাম আমেদ জুটি এবং গোলাম আমেদ-গুপ্তে জুটি বিশ্বের ব্যাটসম্যানদের ত্রাস ছিল। হায়দ্রাবাদ দলের খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৫২-৫৪ এবং ১৯৫৭-৫৯ সালে এ দলের অধিনায়কও ছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান—

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১৪৮০·৩	২৪৯	২৫৩৪	১৭৯	১৮.২৩

টেস্ট খেলেছেন ২২টি ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮ (৩) ; ১৯৫৮ (২) ; ইংল্যাণ্ড ১৯৫১ (২) ১৯৫২ (৪) ; পাকিস্তান ১৯৫২ (৪) ১৯৫৫ (৪) ; নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (১) অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ (২)। এর মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৫৮ সালে একটি টেস্টে ভারতীয় দলের নেতৃত্বও করেছিলেন। টেস্ট পরিসংখ্যান—

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	ক্যাচ
৯৪১.৪	২৫৩	২০৫২	৬৮	৩০.১৭	১১

টেস্টে সেরা বোলিং ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪৯ রানে ৭ উইকেট। ব্যাটিংয়ে সেরা কৃতিত্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫০ রান (১৯৫২ সালে)। বর্তমানে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সম্পাদক।

গুহ, সুব্রত (২৩ জানুয়ারি, ১৯৪৬) ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। বাঙলা দলের হয়ে রনজিতে খেলেছেন বহুবার। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান—

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১২০৬	২৮৭	৩০৫৩	২০৯	১৪.৬০

টেস্ট খেলেছেন ৪টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৬৭ (১) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৯ (৩)।

পরিসংখ্যান—ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১১২.২	২৩	৩১১	৩	১০৩.৬৬

গোপালন, এম. জে (৯ জুন, ১৯০৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার মাদ্রাজের খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৪১-৪২ ও ১৯৪৩-৪৪ সালে এ দলের

অধিনায়কও ছিলেন। রনজিতে পেয়েছেন ১৩৮১ রানে ৬৭টি উইকেট। রান করেছেন ১১৪২।

১৯৩৩-৩৪ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে খেলে দুই ইনিংসে ১৮ রান এবং ৩৯ রানে ৩ উইকেটের অধিকারী হয়েছিলেন।

গোপীনাথ সি.ডি. (১ মার্চ, ১৯৩০) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। মাদ্রাজের খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রবেশ ১৯৪৯-৫০ সালে মহীশূরের বিরুদ্ধে। ১৯৫৩-৫৪ সালে নিজের দলের অধিনায়কও হয়েছিলেন। রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	মোট	গড়
৫২	৬	২৩৪৯	৫১.০৯

গোপীনাথ কুশলী ব্যাটসম্যান ছিলেন চিত্তাকর্ষক ব্যাটিং করতেন। প্রথম টেস্ট খেলেন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। খেলেছিলেন মোট ৮টি টেস্ট। তাঁর কৃতিত্ব প্রতিভা অনুযায়ী ফুটে ওঠে নি। টেস্ট খেলার হিসেব : ইংল্যাণ্ড ১৯৫১ (৩), ১৯৫২ (১) ; পাকিস্তান ১৯৫২ (১), ১৯৫৫ (২) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ (১)। পরিসংখ্যান—

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৮	১২	১	২৪২	৫০ ন. আ	২২.০০	২

ঘোরপাড়ে, জয়সিংহ এম. (২ অক্টোবর, ১৯৩৯—২৯ মার্চ, ১৯৭৮) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার ছিলেন। বরোদার পক্ষে গুজরাতের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর খেলায় আত্মপ্রকাশ। রনজিতে হাজারের বেশি রান করেছেন। সেরা বোলিং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বরোদার পক্ষে খেলে তিনি ১৯ রানে ৬ উইকেট পেয়েছিলেন।

টেস্টে খেলার হিসাব : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৩ (২), ১৯৫৮ (১) ; নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (১) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ (১) ; ইংল্যাণ্ড ১৯৫৯ (৩)। ৮টি টেস্টের ১৫টি ইনিংসে তিনি রান করেছিলেন ২২৯টি।

ঘাউড়ি, কারসেন (২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১) বাঁ হাতি বোলার ও ব্যাটসম্যান। নতুন বলে দ্রুত এবং পুরোনো বলে স্পিন করাতে পারেন। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে থাকেন। বর্তমানে ভারতীয় দলের উল্লেখযোগ্য সদস্য। ১৯৬৯-৭০ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রবেশ। বোম্বাই দলের খেলোয়াড়। ১৯৭২-৭৩ পর্যন্ত অবশ্য সৌরাষ্ট্র দলের পক্ষে খেলেছেন। রনজিতে পরিসংখ্যান :

	খেলা	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৩৫	৪৯	১১	১২০০	৮৭ ন. আ	৩১:৫৭

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৯১৩	১৮৫	২৯১৬	১২৪	২৩.৫১

টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগ পান ১৯৭৪ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে। এযাবৎ টেস্ট খেলেছেন ২৮টি। টেস্ট পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	২৮	৪০	১০	৬৯৩	৮৬	২৩.১০	১৪

	ওভার	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৮৩৯	২৫৭৩	৭৮	৩২.০০

চন্দ্রশেখর, ভাগবত (১৭ মে, ১৯৪৫) ডানহাতি স্পিন বোলার। পৃথিবীর বিস্ময়-বোলার হিসেবে চিহ্নিত ছিলেন। তাঁর দুর্ধর্ষ ও চমকপ্রদ বোলিংয়ের দরুন সত্তর দশকে বেশ কয়েকবার ভারত টেস্টে জয়লাভ করেছে। কর্ণাটকের খেলোয়াড়। ১৯৬৩-৬৪ সালে প্রথম শ্রেণীর খেলায় আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৭১ সালে ইংল্যাণ্ডের লর্ডস মাঠে ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক জয়ে তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক। ১৯৭৪-৭৫ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতার টেস্টে অসাধারণ বোলিং করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে ভারতের অনুকূলে এনেছিলেন। ১৯৭৭-৭৮ সালেও মেলবোর্নে অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান—

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
২৩২৪.২	৫২১	৭০০৫	৩৯৪	১৭.৭৭

তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ই	ন. আ	রান	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৫৮	৮০	৩৯	১৬৭	২২	৪.০৭

	ও	রান	উইকেট	গড়	ক্যাচ
বোলিং	২৬৬২.৩	৭১৯৯	২৪২	২৯.৭৯	২৫

চৌধুরী, নারোদচন্দ্র (২৩ মে, ১৯২৩—ডিসেম্বর, ১৯৭৯) মিডিয়াম পেস বোলার। বাঙলা দলের খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় প্রবেশ ১৯৪১-৪২ সালে। কিছুদিন বিহার দলেও খেলেছেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
৮৪৮.৫	১৯১	২৩৬১	১২০	১৯.৬৮

একবার তিনি মার্চেন্ট মুস্তাক ও অমরনাথকে পরপর তিন বলে করে হ্যাটট্রিক করেন। এটি যে কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব। টেস্টে অবশ্য তিনি তেমনি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড তাঁর প্রতি বেশ অবিচার করেছিলেন। ফলে উপযুক্ত সময়ে তাঁকে সুযোগ দেওয়া হয় নি। টেস্ট খেলেছেন ২টি। ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ১টি এবং ১৯৫১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১টি। ২০৬ রানে এক উইকেট পেয়েছিলেন।

চৌহান, চেতন (২১ জুলাই, ১৯৪৭) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও দক্ষ ফিল্ডার। নির্ভরযোগ্য ওপেনার। গাভাসকরের ইদানীংকালের অন্যতম জুটি। রনজিতে খেলা শুরু করেন ১৯৬৭-৬৮ সালে। ১৯৭৪-৭৫ সাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে খেলেছেন। তার পর থেকে দিল্লী দলের নিয়মিত খেলোয়াড়। রনজির হিসেব :

ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৮৩	৭	৪২৬৮	২০৭	৫৬'১৫

টেস্ট খেলেছেন মোট ২৮টি :

নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৯ (২) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৯ (১) ১৯৭৭-৭৮ (৪) ১৯৭৯ (৬) ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭৮-৭৯ (৬) ; পাকিস্তান ১৯৭৮ (৩) ; ইংল্যাণ্ড ১৯৭২-৭৩ (২) ১৯৭৯ (৪)।

টেস্ট পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	ক্যাচ
২৮	৪৬	১	১৪৭০	৯৩	২৯

সুরতি ও আবিদ আলির মতো তিনিও কোন শতরান না করেও টেস্টে হাজার রান পূর্ণ করেছেন। কয়েকবার সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় গিয়ে আউট হয়েছেন।

জাহাঙ্গীর খাঁ, এম (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১০) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। বর্তমানে পাকিস্তানের অধিবাসী। ভারতীয় দলের প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরে তিনি সদস্য ছিলেন। রনজি ট্রফিতে ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে উত্তর ভারতের নেতৃত্ব করেছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	ন. আ	মোট	গড়
১১	২	৩০০	৩৩'৩৩

মোট টেস্ট খেলেছেন ৪টি। প্রত্যেকটি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩২ এবং ১৯৩৬ সালে। টেস্টে ৭টি ইনিংস খেলে রান করেছেন ৩৯ এবং ২৫৫ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। বর্তমানের পাকিস্তানের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান মজিদ খাঁ তাঁর ছেলে।

জয়, এল. পি. (১ এপ্রিল, ১৯০২—২৯ জানুয়ারি, ১৯৬৮) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। একমাত্র টেস্ট খেলেছেন ১৯৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। এ খেলায় তিনি ১৯ রান করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন।

বোম্বাই দলের খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে ১৯৪১-৪২ সাল পর্যন্ত ১৩ বার রনজি ট্রফির খেলায় তিনি ১১ বার দলের অধিনায়কও ছিলেন।

রনজিতে পরিসংখ্যান : ইনিংস	ন আ	মোট	গড়
২১	৩	৭৭৪	৪৩

জয়সিমা, এম. এল. (৩ মার্চ, ১৯৩৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও মধ্যম গতির বোলার। ব্যাটে ও বলে বহুবার দলের গোড়াপত্তন করেছেন। হায়দ্রাবাদ দলের খেলোয়াড়। সেই দলের নেতৃত্বও করেছেন। প্রয়োজনে আক্রমণ ও রক্ষণে পারদর্শী ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট শুরু করেন ১৯৫৪-৫৫ সালে। রনজি ট্রফির প্রথম খেলায় ৯০ রান করেছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
১২৬	১২	৫২২৭	২৫৯	৪৫.৮৫

টেস্ট খেলেছিলেন ৩৯টি। যথা—

ইংল্যাণ্ড ১৯৫৯ (১), ১৯৬১ (৫), ১৯৬৪ (৫) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ (১), ১৯৬৪ (৩), ১৯৬৭ (২) ; নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৫ (৪), ১৯৬৮ (৪), ১৯৬৯ (১) ; পাকিস্তান ১৯৬০ (৪) ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬২ (৪) ১৯৬৬ (২) ১৯৭১ (৩)।

পরিসংখ্যান : টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৩৯	৭১	৪	২০৫৬	১২৯	৩০.৬৮	১৮

১৯৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধের টেস্টে তিনি পাঁচ দিনের মধ্যে প্রতিদিনই কোন না সময় ব্যাটিং করে রেকর্ড করেছিলেন।

জোশী, পি. জি. (২৭ অক্টোবর, ১৯২৬) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট শুরু ১৯৪৬-৪৭ সালে। মহারাষ্ট্র দলের খেলোয়াড় ছিলেন। টেস্ট খেলেছিলেন ১২টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৫১ (২) ১৯৫৯ (৩) ; পাকিস্তান ১৯৫২ (১), ১৯৬০ (১) ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৩ (৩), ১৯৫৮ (১) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ (১)।

তাঁর সেরা খেলা ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সে খেলায় তিনি অপরাজিত ৫২ রান ও ৩ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেছিলেন।

তামানে, নরেন্দ্র এস (৪ অগস্ট, ১৯৩৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক। ভারতের অন্যতম সেরা উইকেটরক্ষক। প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন ১৯৫১-৫২ সালে। সেবার তিনি সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলেন। রনজি ট্রফির খেলা শুরু তার দুবছর পর। বোম্বাই দলের খেলোয়াড় ছিলেন। সে খেলায় তিনি বিপক্ষ দলের সাতজন ব্যাটসম্যানকে ঘায়েল করেছিলেন। বরোদার বিরুদ্ধে ১৯৫৮-৫৯ সালে অপরাজিত ১০০ রান তাঁর জীবনের সেরা ব্যাটিং। টেস্ট খেলেছিলেন সবশুদ্ধ ২১টি। যথা—

পাকিস্তান ১৯৫৫ (৫), ১৯৬০ (২); নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৪); অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ (৩) ১৯৫৯ (১); ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৮ (৪); ইংল্যাণ্ড ১৯৫৯ (২)।

পরিসংখ্যান :	টেস্ট	সর্বোচ্চ	মোট	গড়
	২১	৫৪ ন. আ	২২২	১০·০৯

এছাড়া তিনি বিপক্ষ দলের ৪১ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন (৩৫ ক্যাচ, ১৬ স্টাম্প)। তাঁর সর্বোত্তম উইকেটরক্ষণ ১৯৫৪-৫৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সে খেলায় তিনি ৬ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেছিলেন (৫ ক্যাচ, ১ স্টাম্প)।

দানী, হেমচন্দ্র (২৪ মে, ১৯৩৩) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও দক্ষ ফিল্ডার। মহারাষ্ট্রের খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন ১৯৫১-৫২ সালে বরোদার বিরুদ্ধে। এ খেলায় দু-ইনিংসে রান করেন ৩৩ ও ৫৫ এবং ২৪ রানে ৩ উইকেট পান। পরে তিনি সার্ভিসেস দলে যোগ দেন।

রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :	ইনিংস	ন. আ	রান	সর্বোচ্চ	গড়
	১১৭	১০	৫১০৪	১৬৬ ন. আ	৪৭·৭০

মাত্র ১টি টেস্ট খেলায় সুযোগ পান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালে।

দিলওয়ার হুসেন (১৯ মার্চ, ১৯০৭—২৮ অগস্ট, ১৯৬৭) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক। ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে মধ্য ভারতের পক্ষে রনজি ট্রফিতে খেলেছেন এবং ১৯৪০-৪১ সালে এ দলের নেতৃত্বও করেছেন। রনজি ট্রফিতে তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্যাটিং ১৯৩৮-৩৯ সালে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে। এ খেলায় তিনি ৭০ রান করেছিলেন। টেস্ট খেলেছিলেন মোট ৩টি: ইংল্যাণ্ড ১৯৩৩ (২), ১৯৩৬ (১)।

তাঁর পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	ন. আ.	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৩	৬	০	২৫৪	৫৯	৪২.৩৩

এ ছাড়া তিনি উইকেটরক্ষক হিসেবে সাতজনকে আউট করেন (১ স্টাম্প, ৬ ক্যাচ)। ১৯৩৩ সালে কলকাতার টেস্টে মাথায় চোট পেয়েও অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়ে দুই ইনিংসে যথাক্রমে ৫৯ ও ৫৭ রান করেন।

দিবেচা, রমেশ (১৮ অক্টোবর, ১৯২৮) ডানহাতি দ্রুতগতির বোলার। ১৯৫০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলে স্থান পেয়েছিলেন। তার আগে ১৯৪৭ সালে গ্রোভার ক্রিকেট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে ২৩.২৬ রান গড়ে ৫২টি উইকেট পেয়েছিলেন। পরের বছরও প্রায় অনুরূপ কৃতিত্ব দেখান। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ প্রতিযোগিতায় প্রথম দলের পক্ষে খেলে দু-ইনিংসে ৯৮ রানে ৯ উইকেট পেয়েছিলেন।

টেস্ট খেলেছিলেন মোট ৫টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৫১ (২), ১৯৫২ (২) এবং পাকিস্তান ১৯৫২ (১)। তাঁর পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	ক্যাচ
১৭৪	৪৪	৩৬১	১১	৩২.৮২	৫

দুরানী, সেলিম (১৫ আগস্ট, ১৮৩৫) বাঁ-হাতি আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান ও বোলার। অসাধারণ বর্ণময় চরিত্র। তিনি ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে প্রথম অর্জুন পুরস্কার পান (১৯৬২ সাল)। ১৯৫৩-৫৪ সালে ছাত্রাবস্থা থেকেই রনজি ট্রফিতে খেলছেন। প্রথম খেলাতেই সৌরাষ্ট্র দলের পক্ষে গুজরাতের বিরুদ্ধে শতরান করেন। পরের তিন বছর গুজরাত দলে খেলেন এবং তারপর থেকে রাজস্থান দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

	খেলা	ইনিংস	ন আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৭১	১১২	৭	৩৬১৫	১৩৭ ন. আ	৩৪.৪২

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	১৯১৪.৩	৫২৪	৪৪৮২	২৩৭	১৮.৯১

টেস্ট খেলেছেন মোট ২৯। যথা—অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ (১) ১৯৬৪ (৩)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৫ (৩)। ইংল্যাণ্ড ১৯৬২ (৫) ১৯৬৪ (৫) ১৯৭২-৭৩ (৩)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬২ (৫) ১৯৬৬ (১) ১৯৭১ (৩)।

এর মধ্যে ১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কলকাতার টেস্টে এক ওভারে তিন সেরা ব্যাটসম্যানকে আউট করে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান। তাছাড়া

টেস্ট খেলায় দ্রুততম অর্ধশত রান করার বিশ্ব রেকর্ড তাঁরই দখলে। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	২৯	৫০	২	১২০২	১০৪	২৫.০৪	১৪

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	১০৭০	৩১৩	২৬৫৭	৭৫	৩৫.৩৩

পরিসংখ্যান তাঁর প্রতিভাকে ঠিকভাবে প্রকাশ করে নি। হঠাৎ খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে অনেকবার সম্ভব হয়েছে। প্রয়োজনে উইকেট রক্ষণ করতে পারতেন।

দেশাই, রমাকান্ত (২০ জুন, ১৯৩৯) ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। দীর্ঘকাল ভারতীয় দলের আক্রমণের উৎস ছিলেন। এই অনতিদীর্ঘ খেলোয়াড়টি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রথম সাড়া তোলেন ১৯৫৮-৫৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। এ খেলায় ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষে খেলে দু ইনিংসে ১২৮ রানে ৮ উইকেট পেয়েছিলেন। এ বছরেই রনজি ট্রফিতে গুজরাতের বিরুদ্ধে দু ইনিংসে ৩৯ রানে ৭ উইকেট পান। বোম্বাই দলের খেলোয়াড় ছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১৩৭৫.৪	৩৮৫	৩৪৩৩	২১৯	১৫.৬৮

বোলিং ছাড়া ব্যাটিংয়েও তাঁর মোটামুটি দক্ষতা ছিল। রনজিতে তাঁর সর্বোত্তম ব্যাটিং রাজস্থানের বিরুদ্ধে ১৯৬২-৬৩ সালে। সে খেলায় তিনি ২০৭ রান করেছিলেন।

ইনি মোট ২৮টি টেস্ট খেলেছেন। যথা—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৮ (২), ১৯৬২ (৩)। ইংল্যাণ্ড ১৯৫৯ (৫), ১৯৬১ (৪), ১৯৬৪ (২)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ (৩), ১৯৬৭ (১)। পাকিস্তান ১৯৬০ (৩), ১৯৬৭ (১)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৫ (৩) ১৯৬৮ (১)।

তাঁর টেস্টে বোলিংয়ের হিসেব :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	ক্যাচ
৯০৫.৫	১৭৭	২৭৬৩	৭৪	৩৭.৩৩	৯

জীবনের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৬৯ রানে ৪ উইকেট পান। সর্বোত্তম টেস্ট বোলিং নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৫ সালে (৫৬ রানে ৬ উইকেট)। টেস্ট ব্যাটিংয়ে সেরা কৃতিত্ব ১৯৬০-৬১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তিনি করেছিলেন ৮৫ রান।

যোশী, দিলীপ (ডিসেম্বর, ১৯৪৭) বাঁ-হাতি স্পিন বোলার। জন্মসূত্রে গুজরাতি হলেও দিলীপ বাঙলা দলের পক্ষে খেলে থাকেন। প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন ১৯৬৮-৬৯ সালে। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১৬০২.২	৫৮২	৩২৪৭	২২০	১৪.৭৫

প্রথম শ্রেণীর খেলায় চারশ'র বেশি উইকেট পেয়েছেন। টেস্ট খেলার আসরে এসেছেন অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সে। ভারতীয় স্পিনার-ত্রয়ী বেদী-চন্দ্র-বেঙ্কট জায়গা ছাড়তে ১৯৭৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। এ সুযোগেই প্রথম আবির্ভাবে সর্বাধিক টেস্ট উইকেট লাভের ভারতীয় রেকর্ড গড়েন। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান :

ওভার	মোট রান	উইকেট	গড়
৩০৬.২	৬৩০	২৭	২৩.৩৩

সৈয়দ নাজির আলি (৮ জুন, ১৯৬০—১১ মার্চ, ১৯৬৩) ডানহাতি বোলার ও ব্যাটসম্যান। দক্ষিণ পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রের হয়ে ১৯৩৪-৩৫ থেকে ১৯৪১-৪২ পর্যন্ত রনজি ট্রফিতে মোট ১২টি ম্যাচ খেলেছেন। বেশির ভাগ সময় দেশের বাইরেই কাটাতেন। রনজি ট্রফির পরিসংখ্যান :

	ইনিংস	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	১৯	৬৩৮	১৫১	৩৩.৫৭

তাছাড়া ৩৯৬ রান দিয়ে ১৮ উইকেট পেয়েছিলেন। টেস্ট খেলেছেন মোট ২টি—ইংল্যাণ্ড ১৯৩২ (১), ১৯৩৩ (১)।

পরিসংখ্যান :	টেস্ট	ইনিংস	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
	২	৪	৩০	১৩	৭.৫০

টেস্টে সর্বোত্তম বোলিং ৮৩ রানে ৪ উইকেট (১৯৩৩-৩৪ সালে মাদ্রাজে)। দেশ ভাগের পর পাকিস্তানের অধিবাসী হয়েছিলেন।

নাভলে, জে. জি. (৭ ডিসেম্বর, ১৯০২) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক। হিন্দু দলের পক্ষে চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতা খেলে নাম করেন। রনজিতে গোয়ালিয়র দলের হয়ে খেলেছেন। টেস্ট খেলেছেন ২টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৩২ (১) ১৯৩৩ (১)। জীবনের প্রথম টেস্টে লর্ডস মাঠে করেছিলেন দু ইনিংসে ১২ ও ১৩। ১৯৩৩-৩৪ সালে করেছিলেন দু-ইনিংসে ১৩ ও ৪। টেস্টের বাইরে সর্বোত্তম ব্যাটিং ১৯২৬-২৭ সালে বেসরকারী এম. সি. সি-র বিরুদ্ধে ৭৪ ও ৫১ রান।

নাওমল, জাউমল (১৭ এপ্রিল, ১৯০৭) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত সিন্ধু দলের পক্ষে রনজিতে খেলেছেন। রনজিতে তাঁর হিসেব :

ইনিংস	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
২৩	৮৬৫	২০৩ ন. আ	৪৩.২৫

১৯৩৭-৩৮ সালে সিন্ধু দলের অধিনায়কও হয়েছিলেন। টেস্ট খেলেছেন মোট ৩টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৩২ (১), ১৯৩৩-৩৪ (২)। পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৩	৬	১০৮	৪৩	১৮

জীবনের শেষ খেলায় মাদ্রাজে ৫ রান করে মাথায় আঘাত পেয়ে অবসৃত হন।

নাদকার্নি, রমেশচন্দ্র জী. বাপু (১৪ এপ্রিল, ১৯৩৩) বাঁহাতি বোলার ও ব্যাটসম্যান। ষাটের দশকে ভারতীয় দলের অপরিহার্য সদস্য ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রবেশ ১৯৫১-৫২ সালে বরোদার বিরুদ্ধে। ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৫৯-৬০ সাল পর্যন্ত মহারাষ্ট্র দলের অধিনায়ক ছিলেন। তারপর বোম্বাই চলে আসেন। ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে বোম্বাই দলের নেতৃত্ব করেছেন দীর্ঘকাল। রনজিতে তাঁর হিসেব :

ব্যাটিং	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
	৭৪	১০	৩৯৯৩	২৮৩ ন. আ.	৬৩.২৯
বোলিং	**ওভার**	**মেডেন**	**রান**	**উইকেট**	**গড়**
	২০৬৯.২	৯৫১	৩১৭২	১৮১	১৭.৬২

রনজিতে তিনি তিনবার দ্বিশতাধিক রান করেন।

টেস্ট খেলেছেন মোট ৪১টি : নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (১), ১৯৬৫ (৪), ১৯৬৮ (৪)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৮ (১), ১৯৬২ (৫), ১৯৬৬ (১)। ইংল্যাণ্ড ১৯৫৯ (৪) ১৯৬১ (১), ১৯৬৪ (৫)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ (৫), ১৯৬৪ (৩), ১৯৬৭ (৩)। পাকিস্তান ১৯৬০ (৪)। টেস্ট পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	৪১	৬৭	১২	১৪১৪	১২২ ন.আ	২৫.৭০	২৪

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	১৪৩০	৬৪৬	২৫৯৯	৮৮	২৯.০৭

দলের প্রয়োজনে চমৎকার রক্ষণাত্মক ব্যাটিং করতে পারতেন। ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একনাগাড়ে ২৯ ওভার বল করে মেডেন পেয়েছিলেন। এটি একটি বিশ্ব রেকর্ড।

নাইডু, কোট্টারি কনকৈয়া (৩১ অক্টোবর, ১৮৯৫—১৪ নভেম্বর, ১৯৬৭) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার। ভারতীয় ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ভারতের প্রথম টেস্ট অধিনায়কও হয়েছিলেন তিনি। দলমতনির্বিশেষে সকল খেলোয়াড়ের এমন শ্রদ্ধা ও প্রশংসা খুব কম লোকই পেয়ে থাকেন। অবশ্য তাঁর ক্রিকেট জীবনের সেরা বছরগুলো টেস্ট ক্রিকেটের বাইরেই কেটেছে। প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান ৩৭ বছর বয়সে ১৯৩২ সালে। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট শুরু করেছিলেন ১৯২১ সালে বোম্বাইতে চতুষ্কোণীয় প্রতিযোগিতায় হিন্দু দলের পক্ষে, ইউরোপীয় দলের বিরুদ্ধে। এ প্রতিযোগিতায় তিনি ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত লাগাতর খেলে পাঁচটি শতরান করেছেন। রনজি ট্রফির প্রথম বছর থেকেই খেলেছেন। ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে ১৯৫২-৫৩ পর্যন্ত মধ্য ভারত তথা হোলকার দলের খেলোয়াড় ছিলেন। তারপর থেকে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের হয়ে খেলেছেন। উভয় পর্যায়েই তিনি অধিনায়কও ছিলেন। তাঁর আমলে হোলকার দল শক্তিশালী ছিল। ৬২ বছর বয়সে শেষবারের মত ক্রিকেট খেলে রাজস্থানের বিরুদ্ধে ৬৪ এবং বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে ২২ ও ৫৫ রান করেছিলেন। এবারেও বিনু মানকড়ের বলে ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। এক ইনিংসে ১১টি ছক্কা মারার ভারতীয় রেকর্ডটিও তাঁরই দখলে। রনজি ট্রফিতে তাঁর পরিসংখ্যান .

	ইনিংস	নট আউট	রান	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৭৩	৩	২৫৭৬	২০০	৩৬.৮০
	ওভার	মেডেন	রান	উইকেটে	গড়
বোলিং	১০৮৫.২	২৪৩	২৮০২	১০৯	২৫.৭১

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৮৭৮২ রান এবং ২৯৯টি উইকেটের অধিকারী হয়েছিলেন। টেস্ট খেলায় তাঁর পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	৭	৩৫০	৮১	২৫.০০	৪

তাছাড়া ৪২.৮৮ গড়ে ৯টি উইকেট লাভও করেছিলেন। ভারতীয় খেলোয়াড় হিসাবে তিনিই প্রথম উইজডেন বর্ষপঞ্জীতে স্থান লাভ করেন।

নাইডু, সি. এস (১৮ এপ্রিল, ১৯১৪) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার। সি. কে. নাইডুর ছোট ভাই। অসাধারণ স্পিন বোলার ছিলেন। ১৯৩৩-৩৪ সালে এম. সি. সি. দলের বিরুদ্ধে প্রথম বড় খেলার সুযোগ পান। ১৯ বছর বয়সে প্রথম টেস্ট খেলেন। ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ সাল

পর্যন্ত মধ্যভারত তথা হোলকার, বরোদা, বাঙলা ও উত্তর প্রদেশের হয়ে বিভিন্ন সময়ে রনজি ট্রফিতে খেলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৮৮	৩	২৫৭৫	১২৭	৩০.২৯

	ওভার	মেডেন	মোট রান	উইকেট	গড়
বোলিং	২১৮২.১	৩৯১	৬৯৩১	২৯৫	২৩.৪৯

প্রথম শ্রেণীর খেলায় ৫০০-র বেশি উইকেট পেয়েছিলেন। টেস্ট খেলেছেন মোট ৯১টি। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	সর্বোচ্চ	মোট রান	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	১১	৩৬	১৪৭	৯.১৮	৩

তাছাড়া ৩৫৯ রানে ২টি উইকেট পেয়েছিলেন।

নিসার মহম্মদ (১ অগস্ট, ১৯১০—১১ মার্চ, ১৯৬৩) ডানহাতি বোলার। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকালীন সেরা ফাস্ট বোলার হিসাবে স্বীকৃত। নিসার-অমর সিং সে-যুগে পৃথিবীর সেরা ব্যাটসম্যানদের কাঁপিয়ে দিত। রণজি ট্রফিতে দক্ষিণ পাঞ্জাবের পক্ষে খেলে ৪৬৪ রান দিয়ে ৩২ উইকেট পেয়েছিলেন। তাঁর সর্বোত্তম বোলিং ১৯৩৮-৩৯ সালে সিন্ধু প্রদেশের বিরুদ্ধে। সে-খেলায় তিনি ১৭ রান দিয়ে ৬ উইকেট পেয়েছিলেন। টেস্ট খেলেছিলেন মোট ৬টি। তাঁর পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
২০১.৫	৩৪	৭০৭	২৫	২৮.২৮

লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে বেসরকারী টেস্টের এক ইনিংসে ৭৯ রান দিয়ে ৫ উইকেট পেয়েছিলেন।

প্যাটেল, জসু, এম (২৬ নভেম্বর, ১৯৬৪) ডানহাতি বোলার। ম্যাটিং উইকেটে দুর্ধর্ষ ছিলেন। ১৯৫৯-৬০ কানপুরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চমকপ্রদ বোলিং করে ভারতের জয়ে সাহায্য করেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের সেটিই ছিল প্রথম জয়। এজন্য ১৯৬০ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' প্রদান করেন। প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন গুজরাতের হয়ে সিন্ধু-প্রদেশের বিরুদ্ধে ১৯৪৩-৪৪ সালে। রণজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১৩১০.৩		২৮২৭	১৪০	২০.১৯

টেস্ট খেলেছিলেন মোট ৭টি: পাকিস্তান ১৯৫৫ (১), নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (১), অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ (২) এবং ১৯৫৯ (৩)। টেস্ট পরিসংখ্যান:

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	ক্যাচ
২৭৭.৩	৯৪	৬৩৬	২৯	২১.৯৩	২

পতৌদি, নবাব ইফ্তিকার আলি (১৬ মার্চ, ১৯১০—৫ জানুয়ারি, ১৯৫২) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ক্রিকেট জীবন শুরু ইংল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ড দলের পক্ষে টেস্টও খেলেছিলেন তিনি। ১৯৪৬ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। ভারতের হয়ে মোট ৩টি টেস্ট খেলেছিলেন। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান:

টেস্ট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৩	৫৫	২২	১১.০০

(বলাবাহুল্য ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট খেলার হিসেব এর মধ্যে ধরা হয় নি)। ১৮৪৫-৪৬ সালে রণজি ট্রফির খেলায় পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রতিনিধিত্ব করেন। শারীরিক কারণে তিনি দক্ষতা হারাবার আগেই খেলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

পতৌদি, নবাব মনসুর আলি খাঁ (৫ জানুয়ারি, ১৯৪১) ইফতিকার আলির পুত্র। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও দক্ষ ফিল্ডার। মোটর দুর্ঘটনায় একটি চোখ হারালেও তিনি অসাধারণ খেলোয়াড় বলে স্বীকৃত। সবচেয়ে কম বয়সে দলের অধিনায়ক হবার বিশ্ব রেকর্ডটি তাঁরই। ১৯৬২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকালে অধিনায়ক কন্ট্রাকটর আহত হলে সহ-অধিনায়ক মনসুর আলির উপর দল পরিচালনার ভার বর্তায়। এ দায়িত্ব থেকে ১৯৭১ সালে অপ্রত্যাশিত ও খানিকটা অন্যায়ভাবে অব্যাহতি পান। অবশ্য ১৯৭৪-৭৫ সালে আবার এ দায়িত্বে তিনি ফিরে আসেন। অত্যন্ত কুশলী অধিনায়ক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ক্রিকেট খেলা শুরু করেন ইংল্যাণ্ডে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়কও হয়েছিলেন। ১৯৫৯ সালে সমারসেট দলের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে দিল্লী দলের হয়ে রণজি ট্রফির খেলায় অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৬১ সালে সফরকারী ইংল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান। সেই সিরিজেই মাদ্রাজ টেস্টে শতরান করেন। টেস্ট খেলেছেন মোট ৪৬টি। যথা—

ইংল্যাণ্ড ১৯৬১ (৩), ১৯৬৪ (৫), ১৯৬৭ (৩), ১৯৭২-৭৩ (৩)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬২ (৩), ১৯৬৬ (৩), ১৯৭৪-৭৫ (৪)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৪ (৩), ১৯৬১ (৩), ১৯৬৯ (৫) নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৫ (৪), ১৯৬৮ (৪), ১৯৬৯ (৩)। তাঁর টেস্টের পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৪৬	৮৪	৩	২৭৯৩	২০৩ ন. আ	৩৪.৪৮	২৬

এছাড়া ৮৪ রান দিয়ে ১টি উইকেটও পেয়েছিলেন। টেস্টে পাঁচটি শতরান করেছিলেন। রণজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৭৫	৭	২৫৬২	১৯৮	৩৭.৬৪

পালিয়া, পি. ই. (৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১০) বামহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার। ১৯৩৩-৩৪ সাল থেকে ১৯৪২-৪৩ সাল পর্যন্ত উত্তর প্রদেশের পক্ষে রণজিতে খেলেছেন। এ দলের অধিনায়কও হয়েছিলেন। রণজি ট্রফির খেলায় তিনি ২৯টি ইনিংস খেলে একবার অপরাজিত থেকে ১১৫৬ রান করেছিলেন (সর্বোচ্চ ২১৬)। ১১৫৬ রান রান দিয়ে ৫৭টি উইকেট পেয়েছিলেন।

টেস্ট খেলেছিলেন মোট ২টি, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালে। তাতে ৯·৬৬ গড়ে মোট ২৯ রান করেছিলেন (সর্বোচ্চ ১৬)। কোন উইকেট পান নি।

প্রসন্ন, এরাপল্লী অনন্তরাও এস (২২ মে, ১৯৪০) ডানহাতি স্পিনার। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার বলে স্বীকৃত। বহুদিন ভারতীয় আক্রমণের অন্যতম উৎস ছিলেন। কর্নাটকের খেলোয়াড়। প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন ১৯৬১-৬২ সালে। ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে তাঁর দলের অধিনায়ক ছিলেন। রনজি ট্রফির খেলার তাঁর পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
২৬৮৫·১	৭৬৫	৬১৮৭	৩৬১	১৭·১৪

রণজিতে সেরা বোলিং ১৯৭০-৭১ সালে অন্ধের বিরুদ্ধে ৫০ রানে ৮ উইকেট তাছাড়া রণজিতে মোট ৭৮ রান (গড় ১৩·১৮) করেছেন। খেলোয়াড় জীবনে ২২·৮৭ রান দিয়ে ৯৩৭টি উইকেট পেয়েছেন। টেস্ট খেলেছেন মোট ৪৯টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৬১ (১), ১৯৬৭ (৩) ১৯৭২-৭৩ (৩), ১৯৭৪(২) ১৯৭৬-৭৭ (৪)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬২ (১) ১৯৬৬ (১) ১৯৭১ (৩) ১৯৭৪ (৫) ১৯৭৬ (১)।

অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৭ (৪) ১৯৭৯ (৫) ১৯৭৭-৭৯ (৪)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৮ (৪) ১৯৬৯ (৩) ১৯৭৬ (৩) পাকিস্তান ১৯৭৮ (২)। টেস্ট পরিসংখ্যান:

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	ক্যাচ
২৩৯৫·১	৫৮৮	৫৭৪২	১৮৯	৩০·৩৮	১৮

সেরা টেস্ট বোলিং নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৭৫-৭৬ সালে ৭৬ রানে ৮ উইকেট। টেস্টে মোট রান করেছেন ৭৩৫ (গড় ১১·৮৪)।

১৯৬৯ সালে অর্জুন পুরস্কার এবং ১৯৭০ সালে পদ্মশ্রী পেয়েছেন। বই লিখেছেন একটি 'One More Over'।

প্যাটেল, ব্রিজেশ (২৪ নভেম্বর, ১৯৫২) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। কর্নাটকের খেলোয়াড়। কভার অঞ্চলের দক্ষ ফিল্ডার ব্রিজেশ ১৯৬৯-৭০ সালে প্রথম শ্রেণীর খেলায় আসেন। রণজির হিসেব:

ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৬৮	৯	২৭৬৪	১৮৩	৪৬·৮৪

খেলোয়াড় জীবনে রান করেছেন ৬৬৬১ (গড় ৩৭·২১)। টেস্ট খেলেছেন মোট ২১টি। যথা—

ইংল্যাণ্ড ১৯৭৪ (২) ১৯৭৬-৭৭ (৫)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭৪ (৩) ১৯৭৬ (৩)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৭৬ (৩) ১৯৭৬ (৩)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৭৭-৭৮ (২)। পরিসংখ্যান:

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
২১	৩৮	৫	৯৭২	১১৫	২৯·৪৫	১৭

টেস্টে সর্বোচ্চ রান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১১৫ (১৯৭৫-৭৬ সালে)।

ফাদকার, দত্তাত্রেয় গজানন (১২ ডিসেম্বর, ১৯২৫) ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার ও ব্যাটসম্যান। দলের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথমে বোম্বাই ও পরে কিছুদিন বাঙলা দলের পক্ষে খেলেছেন। ১৯৪২-৪৩ সালে বরোদার বিরুদ্ধে রণজি ট্রফিতে তাঁর প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু। রণজিতে পরিসংখ্যান:

	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৪৭	৬	১৯২০	২১৭	৪৬·৮৩

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	১৬২৩·০	৪৭৯	৩৫৮৮	২১৬	১৬·৬৭

রণজিতে সর্বোত্তম ব্যাটিং ১৯৫০ সালে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২১৭ রান। সর্বোত্তম বোলিং মহীশূরের বিরুদ্ধে ১৯৫১-৫২ সালে ৮ রানে ৫ উইকেট। টেস্ট খেলেছেন মোট ৩১টি :

অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭ (৪) ১৯৫৬ (১)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮ (৪) ১৯৫৩ (৪) ১৯৫৮ (১)। ইংল্যাণ্ড ১৯৫১ (৪) ১৯৫২ (৪)। পাকিস্তান ১৫৯২ (২) ১৯৫৫ (৩)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৪)। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	৩১	৪৫	৭	১২২৯	১২৩·	৩২·২৪	২০

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৯৭১	২৭৭	২২৮৫	৬২	৩৬·৮৫

টেস্ট জীবনে যদিও তিনবার এক ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন তবু সর্বোত্তম বোলিং হিসেবে ১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৪ রানে ৩ উইকেট গণ্য হতে পারে। সর্বোত্তম ব্যাটিং একই সিরিজে ১২৩ রান। ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে খেলেছেন। শেষদিকে ভারতীয় রেলওয়ে দলের খেলোয়াড় ছিলেন।

ব্যানার্জী, এম, ('মণ্টু') (১ নভেম্বর, ১৯১৯) ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। উপেক্ষিত অন্যতম বাঙালী খেলোয়াড়। ১৯৩৯ সালে রণজি ট্রফিতে প্রথম খেলেন। খেলায় বিহারের পক্ষে খেলে বাঙলার বিরুদ্ধে দু ইনিংসে যথাক্রমে ৪৮ ও ২৬ রান করেন এবং ৩৩ রানে ৩ উইকেট পান। ১৯৪০-৪১ সালে ৭ রানে ৩ জন বাংলার খেলোয়াড়কে আউট করেন। ১৯৪৩-৪৪ সালে বাঙলার বিরুদ্ধে অপরাজিত ১০১ রান করেছিলেন। রণজিতে তাঁর ব্যাটিং ও বোলিংয়ের সর্বোত্তম নিদর্শন যথাক্রমে আসামের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৭০ এবং ১৯৫০-৫১ সালে হোলকারের বিরুদ্ধে ৫টি উইকেট। জীবনের অন্তিম পর্বে বাঙলা দলের অপরিহার্য খেলোয়াড় ছিলেন।

জীবনে একটি মাত্র টেস্ট খেলেছেন ১৯৪৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতায়। সে খেলায় ১২০ রান দিয়ে ৪ উইকেট পেলেও ভবিষ্যতে আর কখনো ভারতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি।

ব্যানার্জী এস. এন. ('শুঁটে') (৩ অক্টোবর, ১৯১১) ডানহাতি ফাস্ট বোলার ও আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান। এঁর প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের উপেক্ষা অতুলনীয়। বোলিং প্রতিভার তুঙ্গে ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালে ভারতীয় দলের পক্ষে ইংল্যাণ্ড সফর করে একটি টেস্টেও খেলার সুযোগ পান নি। ১৯৩৬ সালে

না হয় নিসার-অমর সিং জুটি ছিলেন, কিন্তু ১৯৪৬ সালে এ কৈফিয়ত ছিল না। সেবার নিঃসন্দেহে দ্রুততম ও কার্যকর বোলার ছিলেন। ১৯৪৮ সালে খেলোয়াড় জীবনের অন্তিম লগ্নে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট খেলার সুযোগ পান। সে খেলায় দু ইনিংসে ১২৭ রানে ৪ উইকেট পেয়েছিলেন।

রণজি ট্রফিতে প্রথম খেলেন ১৯৩৫-৩৬ সালে বাঙলার হয়ে মধ্য ভারতের বিরুদ্ধে। ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৪১-৪২ সালে নবনগরের খেলোয়াড় ছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
৯৪৬	১৭৮	২৮৩১	১৩২	২১'৫৭

রণজিতে সর্বোত্তম বোলিং মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৫ রানে ৮ উইকেট (১৯৪১ সালে নবনগরের পক্ষে)। জীবনের সর্বোত্তম ব্যাটিং ইংল্যাণ্ডে ১৯৪৬ সালে সারে দলের বিরুদ্ধে ১২১ রান। এ খেলায় দশম উইকেটে সার্ভাতে ও শুঁটে ব্যানার্জী ২৪৯ রান করেছিলেন।

বাকা জিলানী (২০ জুলাই, ১৯১১—২ জুলাই, ১৯৪১) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার। ১৯৩৪-৩৫ সালে রণজি ট্রফির প্রথম খেলায় উত্তর ভারতের হয়ে দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে হ্যাট্‌ট্রিক সমেত ৭ রানে ৫ উইকেট পান। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রণজি ট্রফিতে প্রথম হ্যাটট্রিক তিনিই করেছিলেন। রণজিতে ৪৫০ রান দিয়ে মোট ২৭ উইকেট পেয়েছেন এবং ১৪ ইনিংসে একবার অপরাজিত থেকে মোট ২৮৪ রান করেছিলেন। তাঁর সর্বোত্তম ব্যাটিং ১৯৩৫-৩৬ সালে দক্ষিণ পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ৭৬ রান।

১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে খেলেছিলেন।

বেগ, আব্বাস আলি (১৯ মার্চ, ১৯৩৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। অত্যন্ত সাড়া জাগিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিত্যালয়ের খেলোয়াড় থাকা কালে ১৯৫৯ সালে ভারতীয় দল ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে অসুবিধেয় পড়েছিল। তখন বিশেষ অনুমতিক্রমে বেগকে টেস্ট দলে স্থান দেওয়া হয়। সে খেলায় তিনি ১১২ রান করে সাড়া তোলেন। পরবর্তী কালে অবশ্য তাঁর খ্যাতি ও নৈপুণ্য অনুযায়ী খেলতে পারেন নি।

রণজি ট্রফিতে হায়দরাবাদের পক্ষে খেলা শুরু করেন ১৯৫৪-৫৫ সালে। রণজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	সর্বোচ্চ	মোট	গড়
১০০	১১	১২৯	৩৫২৪	৩৯.৫৯

জীবনে সর্বোত্তম ব্যাটিং দিলীপ ট্রফিতে (১৯৬৬-৬৭ সালে) অপরাজিত ২২৪ রান। টেস্ট খেলেছেন মোট ১০টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৫৯ (২)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ (৩)। পাকিস্তান ১৯৬০ (৩)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬৬ (২)।

খেলার পরিসংখ্যান : টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
১০	১৮	০	৪২৮	১১২	২৩.৭৭	১

বোরদে, চন্দ্রকান্ত গুলাবরাও (২১ জুলাই, ১৯৩৪) ডানহাতি বোলার ও ব্যাটসম্যান। দলের পক্ষে অপরিহার্য এই খেলোয়াড় বহুদিন ভারতীয় দলের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। ১৯৫২-৫৩ সালে স্কুলে পড়ার সময়েই প্রথম রনজিতে খেলার সুযোগ পান। সে খেলায় মহারাষ্ট্র দলের পক্ষে খেলে শক্তিশালী বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে দু ইনিংসে ৫৫ আর অপরাজিত ৬১ রান করেছিলেন। ১৯৫৪-৫৫ সালে থেকে ১৯৬৩-৬৪ পর্যন্ত বরোদায় খেলেন এবং শেষ তিন বছর সে দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৬৪-৬৫ সালে পুনরায় মহারাষ্ট্রে এসে অধিনায়ক হন। রনজি ট্রফির পরিসংখ্যান :

ব্যাটিং	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
	৯৬	১৪	৪৩৩৮	২০৭ ন. আ.	৫২.৯০
	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৯৫০	২৩৯	২২৫৫	১০২	২১.১২

রণজিতে তাঁর সেরা বোলিং ১৯৫৮-৫৯ সালে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৪৪ রানে ৭ উইকেট। টেস্ট খেলেছেন মোট ৫৫টি। যথা—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৮ (৪) ১৯৬২ (৫) ১৯৬৬ (৩)। ইংল্যাণ্ড ১৯৫৯ (৪) ১৯৬১-৬২ (৫) ১৯৬৪ (৫) ১৯৬৭ (৩)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ (৫) ১৯৬৪ (৩) ১৯৬৭ (৪) ১৯৬৯ (১)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৫ (৪) ১৯৬৮ (৪) পাকিস্তান ১৯৬০ (৫)।

টেস্ট পরিসংখ্যান :	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	৫৫	৯৭	১১	৩০৬২	১৭৭ ন. আ	৩৫.৬০	৩৮

এ ছাড়া ২৪১৬ রান দিয়ে ৫২টি উইকেট (গড় ৪৬.৪৬) পেয়েছিলেন। শেষদিকে পেশীর ব্যথায় বল করা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ব্যাটিংয়ে সর্বোচ্চ যদিও ১৯৬০ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৭৭ করেছিলেন তবু তাঁর সর্বোত্তম ব্যাটিং জীবনের প্রথম সিরিজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে যাতে তিনি প্রথম ইনিংসে শতরান ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৬ রান করেছিলেন। সর্বোত্তম বোলিং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ২১ রানে ৪ উইকেট।

মন্ত্রী, মাধবজী কৃষ্ণাজী (১ সেপ্টেম্বর, ১৯২১) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক। ১৯৪১-৪২ সালে রনজি ট্রফির খেলা শুরু করে উত্তর ভারতের ৯ জন ব্যাটসম্যানকে ঘায়েল করেন। বোম্বাই দলের খেলোয়াড় ছিলেন; এ দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। মাত্র এক বছর (১৯৪২-৪৩) মহারাষ্ট্র দলের পক্ষে খেলেন। রনজিতে তাঁর হিসেব :

ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৬২	৭	২৭৮৭	২০০	৫০.৬৭

টেস্ট খেলেছেন ৪টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৫১ (১) ১৯৫২ (২)। পাকিস্তান ১৯৫৫ (১)। এতে ৯.৫৭ রান গড়ে মোট ৬৭ রান (সর্বোচ্চ ৩৯) করেন এবং ৯ জন বিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানকে ঘায়েল করেন (৮ ক্যাচ, ১ স্টাম্পড)।

মার্চেন্ট, বিজয় মাধবজী (১২ অক্টোবর, ১৯১১) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ধ্রুপদী রীতির খেলোয়াড় বলে বন্দিত ছিলেন। বোম্বাই দলের পক্ষে খেলতেন। ভারতীয় দলের ব্যাটিং শক্তির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ মার্চেন্ট গোড়া থেকেই রনজি ট্রফিতে খেলেছেন। রনজিতে গড় রানে এখনও তিনি শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। রনজিতে তাঁর হিসেব :

ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৪৭	১০	৩৬৩৯	৩৫৯	৯৮.৩৫

মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ১৯৪৩ সালে ৩৫৯ রান করেছিলেন। আরও কয়েক বার দ্বিশত রান করেন। টেস্ট খেলেছিলেন মোট ১০টি। যথা—

ইংল্যাণ্ড ১৯৩৩ (৩) ১৯৩৬ (৩) ১৯৪৬ (৩) ১৯৫১ (১)।

এসব খেলায় তাঁর পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
১০	১৮	০	৮৫৯	১৫৪	৪৭.৭১৮	৮

জীবনের শেষ টেস্টে সর্বোচ্চ ১৫৪ রান করেন। অর্থাৎ দক্ষতা হারাবার আগেই টেস্ট খেলা থেকে তিনি সরে দাঁড়ান।

মঞ্জরেকার, বিজয়লক্ষণ (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) ডানহাতি নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। ছাত্রাবস্থাতে রনজি ট্রফিতে খেলার সুযোগ পান। প্রথম খেলা ১৯৪৯-৫০ সালে বোম্বাই দলের পক্ষে ৬৯ রান এবং সম্মিলিত স্কুল দলের পক্ষে ৯১ রান করেন। রনজিতে তিনি বিভিন্ন সময়ে বোম্বাই, বাঙলা, অন্ধ্র, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান দলের পক্ষে খেলেছেন। রনজিতে তাঁর হিসেব :

ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৭৩	৯	৩৬৮৬	২৪০ ন. আ	৫৭·৫৯

টেস্ট খেলেছেন মোট ৫৫টি—

ইংল্যাণ্ড ১৯৫১ (২) ১৯৫২ (৪) ১৯৫৯ (২) ১৯৬১ (৫) ১৯৬৪ (৪)। পাকিস্তান ১৯৫৩ (৩) ১৯৫৫ (৫) ১৯৬০ (৫)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৩ (৪) ১৯৫৮(৪) ১৯৬২ (৫)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৫) ১৯৬৫ (১) অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ (৩) ১৯৬৪(৩)।

টেস্ট পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	ন. অ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৫৫	৯২	১০	৩২০৯	১৮৯ ন. আ	৩৯·১৩	১৮

এছাড়া উইকেটরক্ষক হিসেবে ২ জনকে স্টাম্পড করেছিলেন। জীবনের শেষ টেস্টে শতরান করা সত্ত্বেও পরের খেলায় দলের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় খানিকটা অভিমানভরেই টেস্ট খেলা থেকে অবসর নেন।

মদনলাল শর্মা (২০ মার্চ, ১৯৫১) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও মিডিয়ম ফাস্ট বোলার। দিল্লীর খেলোয়াড় মদনলাল ১৯৬৮-৬৯ সালে প্রথম শ্রেণীর খেলায় আসেন। রনজিতে পরিসংখ্যান :

	ইনিংস	ন. আ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৬১	১৩	২৩৫৫	২২৩	৪৯·০৬

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৮৩৫·৩	১৪৫	২৪৩১	১১০	২১·৯৩

টেস্ট খেলেছেন ১৬টি। ব্যাটিংয়ে ১৭·৮৩ গড়ে মোট ৪২৮ রান এবং ৩৩·৬৮ গড়ে ২৯টি উইকেট পেয়েছেন।

মানকড়, (বিনু) মুলবন্তরায় হিম্মৎলাল (১২ এপ্রিল, ১৯১৭—২১ অগস্ট, ১৯৭৮) বাঁহাতি স্পিনার ও ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ভারতের শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার এবং বিশ্বের অন্যতম সেরাদের মধ্যেও পড়েন। ১৯৩৭-৩৮ সালে লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে খেলে প্রথম সাড়া জাগান। মাদ্রাজের বেসরকারী সেই টেস্ট

ম্যাচে তিনি ১১৩ রান করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে প্রথম বিদেশী খেলোয়াড় হিসেবে হাজার রান ও একশ উইকেট পেয়েছিলেন।

১৯৩৫-৩৬ সাল থেকে রনজিতে খেলতে থাকেন। তখন তিনি পশ্চিম ভারত দলের খেলোয়াড় ছিলেন। তারপর ১৯৩৬-৩৭ থেকে ১৯৪১-৪২ সাল পর্যন্ত নবনগর, ১৯৪৩-৪৪ সালে মহারাষ্ট্র, ১৯৪৪-৪৫ থেকে ১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৫০-৫১ সালে (অধিনায়ক হিসেবে) গুজরাত, ৪৮-৪৯ সালে বাঙলা, ১৯৫১-৫২, ৫৩-৫৪ ও ৫৫-৫৬ সালে বোম্বাই এবং ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে ১৯৬১-৬২ পর্যন্ত রাজস্থান দলে খেলেছেন। এর জন্যে ১৯৫৯-৬০ ও ১৯৬০-৬১ সালে শেষোক্ত দলের নেতৃত্বও করেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান:

ব্যাটিং	ইনিংস	ন. আ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
	৮৭	২	৩১২৪	২২১	৩৬.৭৪
	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	১৮৫৬.৫	৬১২	৩৯৩৬	১৭০	২৩.১৫

রনজিতে সেরা ব্যাটিং ১৯৫৭-৫৮ সালে বিদর্ভের বিরুদ্ধে ২২১ এবং সর্বোত্তম বোলিং ১৯৫৮-৫৯ সালে ২৭ রানে ৬ উইকেট। টেস্ট খেলেছেন মোট ৪৪টি:

ইংল্যাণ্ড ১৯৪৬ (৩) ১৯৫১ (৫) ১৯৫২ (৩)। অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭ (৫) ১৯৫৬ (৩) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮ (৫) ১৯৫৩ (৫) ১৯৫৮ (২)। পাকিস্তান ১৯৫২ (৪) ১৯৫৫ (৫) নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৪)।

টেস্ট পরিসংখ্যান:

	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	৪৪	৭২	৫	২১০৯	২৩১	৩১.৪৯	৩৩

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	২৪০৯.৪	৭৭৪	১৫০১	১৬২	৩২.৩১

এ পরিসংখ্যান দিয়ে মানকড়ের প্রতিভা মাপা যায় না। ২৩টি টেস্ট খেলে দ্রুততম ডাবল (১০০০ রান ও ১০০ উইকেট) করার বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। সম্প্রতি আয়ান বথাম (ইং) এটি ভেঙেছেন। টেস্টে প্রথম জুটির বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী তিনি এবং পঙ্কজ রায় (৪১৩ রান নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫ সালে)। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ টেস্ট রানের রেকর্ড (২৩১ রান) এখনও তাঁরই দখলে। ১৯৫২ সালে লর্ডস মাঠে এমন অসাধারণ খেলেছিলেন যাঁর জন্য সেই খেলাটি 'মানকড়ের টেস্ট' নামে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। ল্যাঙ্কাশায়ার লীগেও খেলেছেন। ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান

সফরকারী ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। ভারতের প্রথম টেস্ট জয় (১৯৫১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে) এবং রাবার জয়ে (১৯৫২ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে) তাঁর অবদান ছিল সর্বাধিক। মানুষ হিসেবেও তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন।

মানকড়, অশোক (১২ অক্টোবর, ১৯৪৬) বিনু মানকড়ের বড় ছেলে। ডানহাতি ব্যাটসম্যান। বোম্বাই দলের খেলোয়াড়। উক্ত দলের অধিনায়কত্বও করেছেন। ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলছেন। রণজিতে তাঁর হিসেব—

ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৯৩	২৫	৪৭৭৯	২০৮ ন. আ	৭০'২৭

প্রথম শ্রেণীর খেলায় ৪৯'৯২ গড়ে মোট ১০০৮৫ রান করেছেন। টেস্ট খেলেছেন মোট ২২টি—নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৯ (২) ১৯৭৬ (৩) অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৯ (৫) ১৯৭৭-৭৮ (৩) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭১ (৩) ১৯৭৪ (১) ইংল্যাণ্ড ১৯৭১ (৩) ১৯৭৪ (১) ১৯৭৬-৭৭ (১)।

টেস্টের হিসেব :	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ.	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
	২২	৪২	৩	৯৯১	৯৭	২৫'৪১	১২

মুস্তাক আলি (১৭ ডিসেম্বর, ১৯১৪) ডানহাতি বোলার ও ব্যাটসম্যান। বাঙালী দর্শকের সবচাইতে প্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৩৩ সালে সফরকারী এম. সি. সি. দলের বিরুদ্ধে খেলা দিয়ে প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রকাশ করেন। রণজি ট্রফিতে খেলেছেন ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৯৪০-৪১ সালে গুজরাত, ১৯৫৬-৫৭ সালে উত্তরপ্রদেশ দলের হয়ে খেলেছেন। গুজরাতের তিনি অধিনায়কত্বও করেন। বাকি সময় মধ্য-ভারত তথা হোলকার দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। রণজিতে তাঁর হিসেব—

ইনিংস	ন. আ.	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
১০৮	৬	৫০১৩	২৩৩	৪৯'১৫

এরমধ্যে ১৭টি শতরানও আছে। তাছাড়া ২৯'৮৭ গড়ে ৫৪টি উইকেট পেয়েছেন। সর্বোত্তম বোলিং ১৯৩৯-৪০ সালে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে ১০৮ রানে ৭ উইকেট। প্রথম শ্রেণীর খেলায় ১০৮৮৪ (গড় ৩৭'১১) রান এবং ৮৮ উইকেট (গড় ৩৬'১৪) পেয়েছিলেন। টেস্ট খেলেছিলেন মোট ১১টি।

ইংল্যাণ্ড ১৯৩৩ (২) ১৯৩৬ (৩) ১৯৪৬ (২) ১৯৫১ (১) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮ (৩)।

টেস্টের হিসেব :	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ.	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
	১১	২০	১	৬১২	১১২	৩১·৫৯	১৮

এছাড়া উইকেট পেয়েছেন ২০৩ রানে ৩টি (গড় ৬৭·৩৩)। অসাধারণ আত্ম-প্রত্যয়ী ও আক্রমণাত্মক খেলোয়াড় ছিলেন। সামান্য সময় উইকেটে থাকলেও দর্শকদের খেলা দেখিয়ে মাতিয়ে দিতেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তাঁকে প্রথমটায় দলভুক্ত করা হয়নি বলে কলকাতায় রব উঠেছিল 'নো মুস্তাক নো টেস্ট'। খানিকটা অবিচার করেই তাঁকে টেস্ট আসর থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলায় তার শতরান বিশেষজ্ঞদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল।

মেহরোমজী, কে. আর (৯ অগস্ট, ১৯১১) ডানহাতি বোলার ও উইকেট-রক্ষক। ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সালে ১টি টেস্ট খেলেছিলেন। রণজিতে পশ্চিম ভারতের পক্ষে খেলতেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে সিন্ধুপ্রদেশের বিরুদ্ধে ৫টি ক্যাচ ও ১টি স্টাম্প করে খেলোয়াড় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখান।

মোদী, রুসী শেরিয়ার (১১ নভেম্বর ১৯২৪) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। বোম্বাই দলের খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন ১৯৪২-৪৩ সালে। রণজিতে একবছরে ১০০৮ রান করেছিলেন (১৯৪৪ সাল)।

রণজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :	ইনিংস	ন. আ.	রান	সর্বোচ্চ	গড়
	৩৭	৪	২৬৯৬	২৪৫ ন. আ.	৮১·৭০

সর্বোত্তম বোলিং নবনগরের বিরুদ্ধে ২৫ রানে ৫ উইকেট (১৯৪৬-৪৭ সাল)।

টেস্ট খেলেছিলেন মোট ১০টি। যথা—ইংল্যাণ্ড ১৯৪৬ (৩) ১৯৫১ (১)। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮ (৫)। পাকিস্তান ১৯৫২ (১)।

পরিসংখ্যান :	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ.	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
	১০	১৭	১	৭৩৪	১১২	৪৬	৩

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে একমাত্র শতরানটি করেছিলেন।

রামজী, এল (১৯০০—২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৮) ফাস্ট বোলার। ডানহাতি খেলোয়াড় রামজী মাত্র একবছর পশ্চিম ভারতের পক্ষে রনজি ট্রফিতে খেলে ছিলেন। তাতে তাঁর সর্বোত্তম বোলিং বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে ২৯ রানে ৪ উইকেট (১৯৩৪-৩৫ সাল)। চতুর্দলীয় খেলায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

টেস্ট খেলেছিলেন ১টি—১৯৩৩ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। টেস্টে খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। ৬৪ রানে মাত্র ১ উইকেট পেয়েছিলেন।

রামচাঁদ, গুলাব রায়, এস (২৬ জুলাই, ১৯২৭) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার। বোম্বাই দলের খেলোয়াড় হয়ে ১৯৪৫-৪৬ সাল থেকে ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত খেলেছেন। এর মধ্যে ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে এ দলের অধিনায়ক ছিলেন। মাঝে একবছর ১৯৫৬-৫৭ সালে রাজস্থানে খেলেন। রণজিতে করেছেন :

	ইংনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৫২	১৮	২৫৬৯	২৩০	৭৫'৫৬

সর্বোত্তম বোলিং সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ১২ রানে ৮ উইকেট (১৯৫৯ সালে)। টেস্ট খেলেছেন মোট ৩৩টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৫২ (৪), পাকিস্তান ১৯৫২ (৩), ১৯৫৫ (৫), ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৩ (৫), ১৯৫৮ (৩), নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৫), অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ (৩) ১৯৫৯ (৫)।

পরিসংখ্যান :	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	৩৩	৫৩	৫	১১৮০	১০৯	২৪'৫৮	২০

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৮২৯	২৬০	১৯০০	৪১	৪৬'৩৪

উইকেটের কাছাকাছি অঞ্চলের দক্ষ ফিল্ডার ছিলেন। জীবনের শেষ সিরিজে (১৯৫৯) ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন। সেই সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত প্রথম টেস্ট জয়ের স্বাদ পায়। এর জন্য তাঁর দল পরিচালনার কুশলতার জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিলেন। টেস্টে মোট ২টি শতরান করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্ট বোলিং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৪৯ রানে ৬ উইকেট (১৯৫৫ সাল)।

রামস্বামী, সি (১৮ জুন, ১৮৯৬) বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। জীবনে দুটি মাত্র টেস্ট খেলেছেন ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে।

পরিসংখ্যান :	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ.	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
	২	৪	১	১৭০	৬০	৫৬'৬৭

ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে গড় রানে তিনি এখনো দ্বিতীয় স্থানে আছেন। রণজি ট্রফিতে ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে ১৯৪১-৪২ সাল সাল পর্যন্ত বাঙলা দলের হয়ে খেলেছেন। ১৯৩৯-৪০ সালে এ দলের অধিনায়ক ছিলেন। রণজির হিসেব :

ইংনিস	ন. আ.	মোট	সর্বোচ্চ
২৫	১	৪০১	৬৩

১৯৫২-৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকারী ভারতীয় দলের ম্যানেজার ছিলেন।

রায়, পঙ্কজ (৩১ মে, ১৯২৮) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। একমাত্র বাঙালী খেলোয়াড় তিনি দীর্ঘকাল টেস্ট ক্রিকেট আসর অলংকৃত করেছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আসেন। সে খেলায় উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে অপরাজিত শতরান করে ক্রিকেটে তাঁর আসন পাকা করে নেন। রনজি ট্রফিতে শতরান করার কৃতিত্বে তাঁর স্থান দ্বিতীয়। তিনি ২১টি শতরান করেছিলেন। দুবার একই খেলার দু-ইনিংসে শতরান করেন। রনজিতে দুবার এক মরশুমে ছশোর বেশি রান করেছিলেন। ১৯৬২-৬৩ সালে গ্রিলক্রিস্টের অখেলোয়াড়োচিত বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দু-ইনিংসে দুটি শতরান তাঁর খেলোয়াড় জীবনের সেরা কৃতিত্ব। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৮৩	৪	৫১৪৯	২০২ন. আ.	৬৫·১৮

টেস্ট খেলার সুযোগ প্রথমে পান ১৯৫১-৫২ সালে। সেবার জীবনের দ্বিতীয় টেস্টে শতরান করেন। সেবার পঞ্চম টেস্টে পুনরায় শতরান করেন। সেই টেস্টে ভারত প্রথম ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য তার আগে কোন টেস্টে এতকাল ভারত জিততে পারে নি। তার পরের সিরিজে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তেমন সুবিধে করতে পারে নি। কিন্তু পরবর্তী সিরিজে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম টেস্ট রাবার জয়ে তাঁর ভূমিকা অনুজ্জ্বল ছিল না। ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গিয়েও অন্তত একটি টেস্টে অসাধারণ খেলেছিলেন। ১৯৫৫ সালে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মানকড়-রায়ের প্রথম উইকেট জুটির ৪১৩ রান এখনও বিশ্বরেকর্ড বলে চিহ্নিত আছে। সে খেলায় তিনি করেছিলেন ১৭৩ রান। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রাবার জয়েও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পঙ্কজ রায়ের খেলোয়াড় জীবনের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা একমাত্র ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বাদে অন্য সব দেশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম জয়লাভের কৃতিত্বে তাঁর অংশ ছিল। ১৯৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়া-জয়ী ভারতীয় দলেও তিনি ছিলেন টেস্ট খেলেছেন মোট ৪৩টি। ইংল্যাণ্ড ১৯৫১ (৫) ১৯৫২ (৪) ১৯৫৯ (৫)। পাকিস্তান ১৯৫২ (৩) ১৯৫৫ (৫) ১৯৬০ (১) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৩ (৪) ১৯৫৮ (৫) অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৬ (৩) ১৯৫৯ (৩)। নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৫ (৫)। টেস্ট পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৪৩	৭৯	৪	২৪৪১	১৭৩	৩২.৫৪	১৬

১৯৫৯ সালে লর্ডস মাঠে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্বও করেছিলেন। পরিস্থিতি সামান্য অনুকূল হলে ভারত সে খেলায় জিততে পারত। এছাড়া ৬৬ রান দিয়ে ১টি টেস্ট উইকেটও পেয়েছিলেন তিনি।

রায়, অম্বর (৫ জুন, ১৯৪৫) বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। বাঙলা দলের খেলোয়াড়। পঙ্কজ রায়ের ভাইপো। টেস্ট খেলেছেন মোট ৪টি। ২টি নিউজিল্যাণ্ড (১৯৬৯), ২টি অস্ট্রেলিয়ার (১৯৬৯) বিরুদ্ধে। ৪টি টেস্টে সর্বোচ্চ ৪৮ রান সহ মোট ৯১ রান (গড় ১৩.০০) করেছেন। রনজিতে অবশ্য তাঁর ভূমিকা উজ্জ্বল। যথা—

ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৯২	১৫	৩৮১৭	১৯৭	৪৯.৫৭

রায়, সারদারঞ্জন (১৮৫৯-১৯২৬) বাংলার ক্রিকেটের জনক সারদারঞ্জন রায় বাংলার ডব্লু. জি. গ্রেস নামেই পরিচিত ছিলেন। ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে এবং তাঁর দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত দীর্ঘ দেহের জন্যই ঐ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। সারদারঞ্জনের পরিবার বাঙলার সংস্কৃতি জগতে বিশেষ পরিচিত। উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায় ঐ পরিবারেরই মানুষ। অধ্যাপনা পেশা হলেও ক্রিকেট তাঁর রক্তে মিশে ছিল। নিজে অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন, সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল, কিন্তু তিনি আসলে ছিলেন ক্রিকেট-গত প্রাণ। ১৮৮৪ সালে তিনি উৎসাহী ব্যক্তিদের সহায়তায় কলকাতা টাউন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে বাঙালীদের মধ্যে ক্রিকেটের প্রসার ঘটাতে প্রয়াস পান। টাউন ক্লাব ছাড়াও তাঁর মেট্রোপলিটন (বিদ্যাসাগর) কলেজও অনেক ক্রিকেটানুরাগী সরবরাহ করে। তাঁরই উদ্যোগে, প্রাচীনতম ইংরাজ ক্রীড়া-সংস্থা ক্যালকাটা ক্লাব ভারতীয় তথা বাঙালীদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় আগ্রহী হয়। কলকাতায় রনজি খেলতে আসেন ১৮৯৬-এ। সেবারে এক প্রদর্শনী খেলায় পাতিয়ালার মহারাজার দলের পক্ষে তিনি খেলে তাঁর অনবদ্য ক্রীড়া চাতুর্যে এদেশের যুবকদের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করেছিলেন কুশলী সংগঠক সারদারঞ্জন সে সুযোগ নষ্ট হতে দেন নি। ক্রিকেটে তাঁর যে শিষ্যদল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন রায়চৌধুরী পরিবারের মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, প্রমদারঞ্জন, শৈলজা, হৈমজা, নীরজা, নৃপজা, নীতিন ও হীরেন বসু, কার্তিক ও গণেশ বসু, জে. দত্তরায়, এম. দত্তরায় প্রভৃতি।

অমর সিং (১৬ ডিসেম্বর, ১৯০৯) ডানহাতি ফাস্ট বোলার। ১৯৩২ সালে লর্ডস মাঠে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছিলেন। সেটিই তাঁর জীবনের একমাত্র টেস্ট খেলা। দু ইনিংসে তিনি করেছিলেন ১৫ ও ২৯। দক্ষ ফিল্ডার লাল সিং ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে দক্ষিণ পাঞ্জাবের পক্ষে রনজিতে খেলেন। রনজিতে তাঁর সর্বোচ্চ রান ৫৭ উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে।

বিজয় আনন্দ এল. এল., বিজয়নগরম রাজকুমার (২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৮— ২ ডিসেম্বর, ১৯৬৫) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে আজীবন নানাভাবে জড়িয়ে ছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ছিলেন বেশ কয়েকবার। ১৯৩৪-৩৫ সালে রনজি ট্রফির খেলায় তিনি উত্তর প্রদেশের নেতৃত্ব করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে ইংল্যাণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। মোট তিনটি টেস্ট খেলেছিলেন। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান অকিঞ্চিৎকর। তাঁর অধিনায়কত্বে দলাদলি ভারতীয় দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার থেকে পদ্মভূষণ লাভ করেছিলেন। ক্রীড়ামহলে তিনি 'ভিজি' নামে পরিচিত ছিলেন। বেতারে ক্রিকেটের ধারাবিবরণী (ইংরেজীতে) দিয়ে তিনি খ্যাতনামা হন।

বিশ্বনাথ, গুণ্ডাপ্পা রঙ্গনাথ (১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। সাম্প্রতিক ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বিশ্বনাথ ১৯৬৭-৬৮ সালে রনজিতে কর্ণাটকের পক্ষে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে প্রথম আবির্ভূত হন। প্রথম খেলাতেই তিনি দ্বিশতক রান করে রেকর্ড করেন। এ যাবৎ রনজির খেলায় তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	ন. আ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৭৪	৪	৩৩২৬	২৪৭	৪৭.৫১

টেস্ট ম্যাচে প্রথম আবির্ভূত হন ১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এবারেও প্রথম খেলাতেই শতরান করে নতুন নজির তৈরি করেন। শুধু তাই নয় এর পর তিনি এ যাবৎ খেলার মধ্যে ১১টি টেস্ট শতরান করে ভারতীয় ক্রিকেটের একটি সংস্কারকে ভাঙেন। বিশ্বনাথের আগে অন্য কোন ব্যাটসম্যান প্রথম আবির্ভাবে শতরান করে আর দ্বিতীয় শতরানের মুখ দেখেন নি। তিনি মোট টেস্ট খেলেছেন ৬২টি :

অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৯ (৪) ১৯৭৭-৭৮ (৫) ১৯৭৯ (৬) ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭১ (৩) ১৯৭৪-৭৫ (৫) ১৯৭৬ (৪) ১৯৭৮-৭৯ (৬) ; ইংল্যাণ্ড ১৯৭১ (৩)

১৯৭২-৭৩ (৫) ১৯৭৪ (৩) ১৯৭৬-৭৭ (৫) ১৯৭৯ (৪); নিউজিল্যাণ্ড ১৯৭৬ (৩) ১৯৭৬ (৩); পাকিস্তান ১৯৭৮ (৩)।

তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৬২	১০৯	৮	৪৭৫৯	১৭৯	৪৭.১২	৪৪

বহুবার ভারতীয় দলের সঙ্কটকালে তিনি পরিত্রাতারূপে আবির্ভূত হয়েছেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজটি এ হিসেবে চমকপ্রদ ছিল।

বেদী, বিষণ সিং (২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) বাঁ-হাতি বোলার। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন।

১৯৬৮-৭৯ পর্যন্ত পাঞ্জাব দলের হয়ে খেলেছেন। ১৯৬৯-৭০ থেকে দিল্লী ও উত্তরাঞ্চল দলের পক্ষে খেলেছেন। উভয় দলের অধিনায়কও হয়েছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উ.	গড়
২৫৭৬.৪	৯০৩	৫১৮০	৩৫৬	১৪.৫৫

এ ছাড়া ১৩.৮২ গড়ে মোট ৮৭১ রান করেছেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় তিনি এ যাবৎ উইকেট পেয়েছেন প্রায় ১৩০০টি। টেস্ট খেলেছেন মোট ৬৭টি :

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬৬ (২) ১৯৭১ (৫) ১৯৭৪-৭৫ (৪) ১৯৭৬ (৪) ১৯৭৯ (২); ইংল্যাণ্ড ১২৬৭ (৩) ১৯৭১ (৩) ১৯৭২-৭৩ (৫) ১৯৭৪ (৩) ১৯৭৬-৭৭ (৫) ১৯৭৯ (৪); অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৭ (২) ১৯৬৯ (৫) ১৯৭৭-৭৮ (৫); নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৮ (৪) ১৯৬৯ (৩) ১৯৭৬ (২) ১৯৭৬ (৩); পাকিস্তান ১৯৭৮ (৩)।

তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান :

ওভার	রান	উইকেট	গড়	ক্যাচ
৩৫৬২.২	৭৬৩৭	২৬৬	২৮.৭১	২৬

এ ছাড়া তিনি ৮.৯৭ গড়ে মোট ৬৫৫ রান করেছেন। টেস্টে তাঁর সর্বোচ্চ রান ৫০। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন। কিছুটা অন্যায়ভাবেই তাঁর অধিনায়কপদ খারিজ হয়ে যায় এবং ক্রমে সম্পূর্ণ নৈপুণ্য হারাবার আগেই টেস্ট থেকে বাদ পড়ে যান। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক টেস্ট উইকেট পেয়েছেন এবং পৃথিবীর

বোলারদের মধ্যেও এক্ষেত্রে তাঁর স্থান তৃতীয়। অধিনায়ক হিসেবে বিদেশের সব স্থানে ব্যবহারের জন্য প্রশংসা পেয়েছেন। ইংলণ্ডে নর্দাম্পটন দলের হয়ে দীর্ঘকাল খেলেছেন।

বেঙ্কটরাঘবন, শ্রীনিবাস (২১ এপ্রিল, ১৯৪৫) ডানহাতি স্পিন বোলার। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বোলার ও দক্ষ ফিল্ডার তামিলনাড়ুর পক্ষে রনজিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ১৯৬৩-৬৪ সালে। এ দলের তিনি অধিনায়কও হয়েছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান:

	ইনিংস	ন. আ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৮৩	১৩	১৫১২	১৩৭	২১·৬০
	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	২৭৯৭	৮১১	৬১৮৪	৩৬৪	১৬·৯৮

প্রথম শ্রেণীর খেলায় চার হাজারের বেশি রান করেছেন এবং প্রায় হাজারটি উইকেট সংগ্রহ করেছেন। টেস্ট খেলেছেন মোট ৫০টি:

নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৫ (৪) ১৯৬৯ (২) ১৯৭৬ (১) ১৯৭৬ (৩); ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬৬ (২) ১৯৭১ (৫) ১৯৭৪-৭৫ (২) ১৯৭৬ (৩); ইংল্যাণ্ড ১৯৬৭ (১) ১৯৭১ (৩) ১৯৭২-৭৩ (২) ১৯৭৪ (২) ১৯৭৬-৭৭ (১) ১৯৭৯ (৪); অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৯ (৫) ১৯৭৭-৭৮ (১) ১৯৭৯ (৩)।

তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান:

টেস্ট	ওভার	রান	উইকেট	গড়	ক্যাচ
৫০	২২৩৮	৪৯৪৪	১৪৫	৩৪·০১	৩৯

এ ছাড়া টেস্টে তিনি মোট ৭৩২ রান করেছেন।

সরদেশাই, দিলীপ (৮ অগস্ট, ১৯৪০) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দলের পক্ষে প্রয়োজনীয় খেলোয়াড় ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন ১৯৬০-৬১ সালে। সেবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়ে খেলে ৮৭ রান করে সকলের নজরে আসেন। সে বছর থেকেই বোম্বাই দলের হয়ে রনজিতে খেলতে থাকেন। রনজিতে তাঁর হিসেব:

ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৭৯	১৩	৩৫৯৯	২১২	৫৪·৫৩

টেস্ট খেলেছেন মোট ৩০টি: ইংল্যাণ্ড ১৯৬১ (১) ১৯৬৪ (৫) ১৯৬৭ (১) ১৯৭১ (৩) ১৯৭২-৭৩ (১); ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬২ (২) ১৯৬৬ (৩) ১৯৭১

(৫) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৪ (৩) ১৯৬৭ (১) ১৯৬৯ (১) ; নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৫ (৩)। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৩০	৫৫	৪	২০০১	২১২	৩৯'২৩	৪

১৯৭১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে নির্বাচিত হলে দেশে তাঁর বিরুদ্ধে নানা সমালোচনার ঝড় ওঠে। কিন্তু সেই সিরিজে বার বার দলীয় সঙ্কটে পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখা দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেন। সে সিরিজেরই প্রথম টেস্টে জীবনের সর্বোচ্চ টেস্ট রান (২১২) সন

সারভাতে, চন্দু টি (২২ জুন, ১৯২০) ডানহাতি বোলার ও ব্যাটসম্যান। মধ্যভারত ও বেরার, মহারাষ্ট্র এবং হোলকার দলের খেলোয়াড় ছিলেন। বহুবার চমকপ্রদ বোলিং করেছিলেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে প্রথম খেলায় ৩ রানে ৫ উইকেটে এবং ১৫ রানে ১ উইকেট নিয়েছিলেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে বিহারের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

	ইনিংস	ন. আ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	১২৩	১২	৪৮৮৯	২৪৬	৪৪'০৫
	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	২৪০১'৫	৫৮২	৭৭০৭	২৮১	২৭'৪২

টেস্ট খেলেছেন মোট ৯টি। টেস্টে তাঁর তেমন নৈপুণ্য প্রকাশ পায় নি। পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৯	২০৮	৩৭	১৩

এছাড়া ৩৭৪ রান দিয়ে ৩টি উইকেট (গড় ১২৪'৬৬) পেয়েছিলেন। টেস্ট খেলেছিলেন ৯টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৪৬ (১) ১৯৫১-৫২ (১) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭-৪৮ (৫) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮ (২)।

সুরেন্দ্রনাথ, আর (৪ জানুয়ারি, ১৯৩৭) ডানহাতি মিডিয়াম ফাস্ট বোলার। সেনাদলের খেলোয়াড় ছিলেন। স্পিন বোলারদের রাজত্বে এককালে দেশাই-সুরেন্দ্রনাথ জুটি কিছুটা জোর বলের রসদ ভারতীয় দলে জুগিয়েছিলেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন। পূর্ব পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে এই প্রথম খেলায় তিনি দু ইনিংসে ২১ রানে ১ উইকেট ও ২৯ রানে ৩ উইকেট পেয়েছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
১৫৬১	৪৮৬	৩৭৮১	১৮০	২১.০১

টেস্ট খেলেন মোট ১১টি : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৫৮ (২) ইংল্যাণ্ড ১৯৫৯ (৫) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৫৯ (২) ; পাকিস্তান ১৯৬০ (২)। টেস্ট পরিসংখ্যান :

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়	ক্যাচ
৪৩৩.৪	১৪৪	১০৫৩	২৬	৪০.৫০	৪

১৯৫৯ সালে ইংল্যাণ্ড সফরে Surrender Not নামে অভিহিত হয়েছিলেন। সব সময়ে কর্তৃপক্ষের সুবিচার পেয়েছেন এমন কথা বলা যায় না ।

সুরতি, রুসী ফ্রেমরোজ (২৫ মে, ১৯৩৬) বাঁহাতি বোলার ও ব্যাটসম্যান এবং দক্ষ ফিল্ডার। গুজরাতের এ খেলোয়াড়টি প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন ১৯৫৬-৫৭ সালে। বোম্বাই দলের বিরুদ্ধে এ খেলায় দু-ইনিংসে ১২ ও ১৪ রান করেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	ন. আ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৭৪	৪	২৩২৯	২৪৬ ন. আ.	৩৩.২৭

১৯৫৯-৬০ সালে উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রান করেন। টেস্ট খেলেছিলেন মোট ২৬টি : পাকিস্তান ১৯৬০ (২) ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬২ (৫) ১৯৬৬ (২) ; ইংল্যাণ্ড ১৯৬৪ (১) ১৯৬৭ (২) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৪ (২) ১৯৬৭ (৪) ১৯৬৯ (১) ; নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৫ (১) ১৯৬৮ (৪) ১৯৬৯ (২)। টেস্ট পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	২৬	৪৮	৪	১২৬৩	৯৯	২৮.৭০	২৮

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৫৮৭.১	১১২	১৯৬২	৪২	৪৬.৭২

সেন, প্রবীর (৩১ মে, ১৯২৬—১৭ জানুয়ারি, ১৯৭০) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক। পঙ্কজ রায়ের পর উল্লেখযোগ্য বাঙালী যিনি টেস্ট খেলার আসরে কিছুদিনের জন্য ঠাঁই করে নিতে পেরেছিলেন। বাঙলা দলের হয়ে ১৯৪৩-৪৪ সালে প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	ন. আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
৫৯	০	১৭৯৬	১৬৮	৩০.৪৪

সর্বোচ্চ রান বিহারের বিরুদ্ধে করেছিলেন। ১৯৫২-৫৩ সালে বাঙলা দলের অধিনায়ক হিসেবে রনজির ফাইনালে হোলকার দলের বিরুদ্ধে অসাধারণভাবে

খেলা পরিচালনা করেছিলেন। টেস্ট খেলেছেন মোট ১৪টি : অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭ (৩) ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮ (৫) ; ইংল্যাণ্ড ১৯৫১ (২) ১৯৫২ (২) ; পাকিস্তান ১৯৫২ (২)। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান :

টেস্ট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
১৪	১৬৫	২৫	১১·৭৮	২০

এছাড়া তিনি ১১ জনকে স্টাম্প করেছিলেন। উইকেটরক্ষক হিসেবে ডন ব্র্যাডম্যানের প্রশংসা পেয়েছিলেন।

সেনগুপ্ত, এ. কে. (৩ অগস্ট, ১৯৩৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। সেনাদলের খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রথম রনজি ট্রফিতে খেলেন। সে বছরেই সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে শতরান করে সকলের নজরে আসেন। এঁকে দলভুক্ত করা নিয়ে ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ভারতীয় অধিনায়কের মতপার্থক্য সূচিত হয়। অবশ্য তিনি জীবনের একমাত্র টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে দু ইনিংসে মোট ৯ রান করে ক্রীড়ামোদীদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন নি।

সোহনি, এস. ডব্লু. (৫ মার্চ, ১৯১৮) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার। মহারাষ্ট্র দলের খেলোয়াড় ছিলেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	৬৬	৪	২১৬২	২১৮ ন. আ	৩৪·৮৭

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	১৮৭৬·৪	২৮৫	৩৪০৫	১৩৯	২৪·৫০

টেস্ট খেলেছিলেন মোট ৪টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৪৬ (২) ১৯৫১ (১) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭ (১)। টেস্টের হিসেব :

টেস্ট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
৪	৮৩	২৯ ন. আ	১৬·৬০	২

এছাড়া ২০২ রান দিয়ে ২টি উইকেট পেয়েছিলেন (গড় ১০১·০০)।

সোলকার, একনাথ ধুন্ডু (১৮ মার্চ, ১৯৪৮) বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান ও বোলার। বোম্বাই দলের পক্ষে রনজিতে খেলা শুরু করেন ১৯৬৬-৬৭ সাল থেকে। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

	ইনিংস	ন. আ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	৭৯	৮	২০৯১	১৪৫	২৯·৪৫	৫৮

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	১৩০২'১	৮৪'২	২৪৯১	১১২	২২'২৪

খেলোয়াড় জীবনে রান করেছেন ৫ হাজারের বেশি, উইকেট পেয়েছেন ২০৪টি এবং ক্যাচ লুফেছেন ১৫০টি। টেস্ট খেলেছেন মোট ২৭টি: নিউজিল্যাণ্ড ১৯৫৯ (১) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৯ (৪) ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৭১ (৫) ১৯৭৪-৭৫ (৪), ১৯৭৬ (১) ; ইংল্যাণ্ড ১৯৭১ (৩) ১৯৭২-৭৩ (৫) ১৯৭৪ (৩) ১৯৭৬-৭৭ (১)। টেস্ট পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	ন.আ	মোট	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	২৭	৪৮	৮	১০৬৮	১০২	২৫'৪২	৫৩

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৩৭৭'৩	৪২	১০৭০	১৮	৫৯'৪৪

সোলকারকে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিল্ডার বলা যায়। সর্ট লেগে তাঁর ফিল্ডিং যে কোন ব্যাটসম্যানের ভয়ের কারণ হত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে রাবার জয়ে তাঁর ভূমিকা অসাধারণ ছিল। পৃথিবীর আর কোন খেলোয়াড় এত কম টেস্ট খেলে এত বেশি ক্যাচ ধরতে পারেন নি।

হাজারে, বিজয় স্যামুয়েল (১১ মার্চ, ১৯১৫) ডানহাতি বোলার ও ব্যাটসম্যান। চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের ভারতীয় ব্যাটিংয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে রনজি ট্রফিতে খেলতে থাকেন। বিভিন্ন সময়ে মহারাষ্ট্র, মধ্যভারত এবং বরোদা দলের পক্ষে খেলেছেন। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

	ইনিংস	নট আউট	মোট	সর্বোচ্চ	গড়
ব্যাটিং	১০৩	১৩	৬৩১২	৩১৬ ন. আ	৬৯'৩৬

	ওভার	মেডেন	মোট রান	উইকেট	গড়
বোলিং	২৮৩৬	৮৯৭	৫৭৮৫	২৯১	১৯'৮৬

রনজিতে তিনি মোট ২২টি শতরান করেছিলেন। এটি এখনো একটি রেকর্ড। মোট টেস্ট খেলেছিলেন ৩০টি: ইংল্যাণ্ড ১৯৪৬ (৩) ১৯৫১ (৫) ১৯৫২ (৪) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৪৭ (৬) ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৪৮ (৫) ১৯৫৩ (৫) ; পাকিস্তান ১৯৫২ (৩)। তার টেস্ট পরিসংখ্যান :

	টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
ব্যাটিং	৩০	৫২	৬	২১৯২	১৬৪ ন. আ	৪৭'৬৫	১১

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
বোলিং	৩৫৯'৪	৯০	১২২০	২০	৬১'০০

১৯৫১ ও ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এবং ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে অস্ট্রেলিয়ায় একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে শতরান করে ভারতীয় রেকর্ড করেন। এ রেকর্ড বহুদিন অম্লান ছিল। ১৯৫৩ সালে তাঁকে আউট করবার জন্য টেস্টের প্রাক্কালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয়েছিল।

হনুমন্ত সিং (২৯ মার্চ, ১৯৩৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ১৯৫৬-৫৭ সালে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রবেশ। রাজস্থান দলের খেলোয়াড়। রনজিতে তাঁর পরিসংখ্যান :

ইনিংস	ন. আ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
১৪৭	২৭	৬১৬৩	২১৩ ন. আ	৫১·৩৫

রনজিতে মোট সব চাইতে বেশি রান করার রেকর্ড তাঁরই। প্রথম শ্রেণীর খেলায় প্রায় দশহাজার রান করেছেন। টেস্ট খেলেছিলেন ১৪টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৬৪ (২) ১৯৬৭ (২) ; অস্ট্রেলিয়া ১৯৬৪ (৩) নিউজিল্যাণ্ড ১৯৬৫ (৪) ১৯৬৯ (১) ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৯৬৬ (২)। টেস্ট পরিসংখ্যান :

টেস্ট	ইনিংস	ন. আ	মোটরান	সর্বোচ্চ	গড়	ক্যাচ
১৪	২৪	২	৬৮৬	১০৫	৩১·১৮	১১

জীবনের প্রথম টেস্টে শতরান করলেও পরবর্তী কালে খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। তবে কয়েকবার শতরানের গোড়ায় এসে আউট হয়ে গেছেন। সোবার্স তাঁর ব্যাটিংয়ের খুব প্রশংসা করেছিলেন।

হিন্দেলকার, ডি. ডি. (১ জানুয়ারি, ১৯০৯—৩০ মার্চ, ১৯৪৯) ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও উইকেটরক্ষক। ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে ১৯৪৫-৪৬ সাল পযন্ত বোম্বাই দলের হয়ে রনজিতে খেলেছেন। রনজিতে ৩৪টি ইনিংসে তাঁর মোট রান ৫৭৭। সর্বোচ্চ রান ৫৫। এ রান তিনি ১৯৩৪-৩৫ সালে মাদ্রাজের বিরুদ্ধে এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে নবনগরের বিরুদ্ধে করেছিলেন। জীবনের সেরা উইকেটরক্ষক ১৯৩৪-৩৫ সালে। সেবার তিনি পশ্চিম ভারতের ৬ জন ব্যাটসম্যানকে ঘায়েল করেছিলেন। টেস্ট খেলেছিলেন মোট ৪টি : ইংল্যাণ্ড ১৯৩৬ (১) ১৯৪৬ (৩)। তাঁর টেস্ট পরিসংখ্যান :

টেস্ট	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৪	৭১	২৬	২৪·১০

এছাড়া তিনি তিনজনকে ক্যাচ ধরে আউট করেছিলেন।

ক্রিকেট ও ক্রিকেটার : পাকিস্তান

টেস্ট ক্রিকেটের সংসারে পাকিস্তানের আবির্ভাব ঘটেছে অন্য পাঁচটি দেশের অনুপাতে অনেক পরে। তবু দক্ষ ও সম্ভাবনাময় দল হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে পাকিস্তানের দেরি হয় নি। এতো অল্পসময়ে আন্তর্জাতিক মহলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দৃষ্টান্ত বিস্ময়কর না হলেও চাঞ্চল্যকর বৈকি। নবজাতক যেন জন্মলগ্নেই পরিণত সংগতি যোগাড়ের ঠিকানা জেনে নিতে পেরেছিল।

ভারত বিভাগের বছর পাঁচেকের মধ্যে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক (তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল) ক্রিকেট সম্মেলনের অনুমোদন পায়। সঠিক হিসেবে ১৯৫২ সালে। আর তার পাঁচ বছরের মধ্যেই তারা একে একে টেস্ট ক্রিকেটের একগণ্ডা শরিককে অন্তত একটি করে খেলায় পরাজিত করে। হারজিতের এইসব দৃষ্টান্ত সত্যই উল্লেখযোগ্য। যেহেতু চার প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুপাতে পাকিস্তান ছিল বয়সে নবীন। একেবারে শিশু প্রায়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনের অনুমোদন পেয়েই পাকিস্তান ভারতে আসে ১৯৫২ সালে। এসে রাবার হারাতে বাধ্য হলেও লক্ষ্মৌ টেস্টে তারা জিতেছিল। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান যায় ইংলণ্ডে। সেবারে ইংলণ্ড রাবার পেলেও ওভাল মাঠে কিন্তু পাকিস্তান জিতেছিল। ১৯৫৬-৫৭ মরশুমে ইয়ান জনসনের অস্ট্রেলিয়াকে পাকিস্তান করাচীতে হারিয়েছিল এবং পরের বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মাটিতে একটি খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। ১৯৫৭-৫৮ মরশুমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অবশ্য রাবার পেয়েছিল। কিন্তু আগের বছর স্বদেশের মাঠে পাকিস্তান ইয়ান জনসনের অস্ট্রেলিয়াকে একটি টেস্টেও জিততে দেয় নি।

একেবারে শৈশবাবস্থায় পাকিস্তান ক্রিকেটে সম্ভাবনার যে প্রতিশ্রুতি জাগিয়েছিল উত্তরপর্বে সে প্রতিশ্রুতি কখনো পূর্ণ হয়েছে। কখনো বা আশাভঙ্গের যন্ত্রণায় পাকিস্তানকে ভুগতে হয়েছে। এসব ঘটনা খুবই স্বাভাবিক। কারণ ক্রিকেট আসলে একটি খেলাই। এবং খেলায় হারজিৎ থাকেই, থাকবেও। খেলার আসরে কোনো দলই চিরদিন অপরাজেয় থাকতে পারে না। তবু জিৎহার, উত্থান-পতনের সামগ্রিক মূল্যায়নে পাকিস্তান বিশ্ব ক্রিকেটে যে শক্তি বলে পরিগণিত হয়ে আছে তা অবশ্য [illegible]।

এই শক্তি সঞ্চয়ে পাকিস্তান ক্রিকেটকে ভালবেসেছে। ক্রীড়া মানোন্নয়নে যত্ন নিয়েছে। উঠতি তরুণদের বছর বছর ইংলণ্ডে পাঠিয়ে ক্রীড়াকৌশল ও অভিজ্ঞতায় তাদের রপ্ত করে তোলার সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়েছে।

উঠতি তরুণদের নিয়ে গড়া পাকিস্তান ইগলেট দলের বিদেশ সফর এই পরিকল্পনারই অংশ। ইগলেট দলের অনেক প্রতিনিধিই উত্তরকালে পাক জাতীয় দলে নিজেদের জায়গা করে নিতে পেরেছেন। তাছাড়া বিদেশে অধ্যয়নরত পাক ছাত্ররা ইংলণ্ডে ক্রিকেট খেলার সুযোগ পেয়ে আসছেন সেই পঞ্চাশের দশক থেকেই। পাকিস্তান এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানী তরুণদের ইংলণ্ডে খেলার সুযোগ করে দিতে অর্থ সাহায্য করেছেন নিয়মিত। এইসব সহৃদয় কারণে পাকিস্তানী ক্রিকেটের ক্রমোন্নয়নের পথ ক্রমশই সুগম হয়ে ওঠে।

খণ্ডিত মানচিত্রের যে অংশটি বর্তমানে পাকিস্তানী বলে চিহ্নিত সেই অঞ্চলে ইংরেজ আমলে ক্রিকেট এক জনপ্রিয় খেলা হিসেবেই পরিচিত ছিল। আর লোকপ্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ছিল হকি, পোলো, স্কোয়াস ইত্যাদি। অখণ্ড ভারতের যেসব অঞ্চলে ক্রিকেটের রেওয়াজ ছিল বহুল প্রচলিত, লাহোর তাদের অন্যতম। করাচীতে ক্রিকেটের আদর কদর ছিল যথেষ্ট। লাহোর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল এবং করাচী দেশব্যবচ্ছেদের আগে ভারতীয় টেস্ট দলে নিয়মিত খেলোয়াড় সরবরাহ করত।

পাকিস্তান হবার পর এই দুটি শহরেই ক্রিকেটী অনুরাগ যেন জোয়ারের জলের মতো ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকলে অনুকূল লগ্ন উপস্থিত জেনে পাকিস্তানী নিয়ামক সংস্থাও স্বদেশীয় ক্রিকেট সম্পর্কে গঠনমূলক প্রকল্পগুলি বাস্তবিক করার কাজে হাত দেন। সেদিন কাজের হাত সক্রিয় হয়ে উঠেছিল বলেই পাকিস্তানী ক্রিকেট যথাসময়ে অথবা বলতে পারি যে সময়ের আগেই উপকৃত হতে পেরেছে।

নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কালেই সে দেশে এমন কজন ক্রিকেটার ছিলেন অখণ্ড ভারতের জাতীয় দলে স্থান পাওয়ার যোগ্যতা যাঁদের ছিল। যথা আব্দুল হাফিজ কারদার ও ফজল মামুদ। প্রকৃতপক্ষে কারদার ১৯৪৬ সালে ভারতীয় দলের সদস্য হিসেবে ইংলণ্ডে ঘুরে এসেছিলেন এবং ফজল পরের বছর ভারতীয় দলের পক্ষে অস্ট্রেলিয়া সফরে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। যুগলের পাশে ছিলেন ইমতিয়াজ আমেদ, খান মহম্মদ, মামুদ হোসেন প্রমুখেরা। সামগ্রিক নিরিখে তাঁদের যোগ্যতাও ছিল তদানীন্তন ভারতের সামনের সারির খেলোয়াড়দের অনুরূপ।

এই ক'জন খেলোয়াড়কে ঘিরেই গোড়ার পর্বে পাকিস্তানী ক্রিকেটের সমস্ত শক্তি সংহত হতে থাকলে নবীন তারকা হানিফ মহম্মদ এসে তাঁদের পাশে দাঁড়ান। এঁদের সামর্থ্য সম্বল করে পাকিস্তান প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে ১৯৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে। দু-বছর পর নাইজেল হাওয়ার্ড পরিচালিত এম সি সি-র বিরুদ্ধে।

তখনও পাকিস্তান টেস্ট খেলার মর্যাদা পায় নি। তবু ব্যাটিং উইকেটে ফজল মামুদের বোলিং নিপুণতা, ষোল বছরের ছেলে হানিফ মহম্মদের ব্যাটের নির্ভরতা লক্ষ্য করে এম সি সি-র প্রতিনিধিরা ক্রিকেটে পাকিস্তানী সম্ভাবনা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হতে পারেন। তাঁদের সংশয়াতীত অভিমত দেখে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনও অচিরে পাকিস্তানের অনুকূলে অনুমোদন মঞ্জুর করে।

গড়ে ওঠার মুখে মাঝমাঠে নিজেদের বাহুবলের পরিচয় রেখে যাঁরা পাকিস্তানী ক্রিকেটের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করে তুলতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে হানিফ মহম্মদ ও ফজল মামুদের নাম অবশ্যই স্মরণীয়।

ফজল মামুদ ছিলেন তাঁর কালের বিশ্বের অন্যতম সেরা সিম্ বোলার। লেগ কাটারে সিদ্ধকর্ম। তাঁর বলের উৎকর্ষের তারিফে অনেকে তাঁকে পাকিস্তানের বেডসার বলে অভিহিত করতেন। কারণ ইংলণ্ডের আলেক বেডসারের প্রতিষ্ঠা তখন ছিল বিশ্বের সেরা সিম বোলার হিসেবে। টেস্ট ক্রিকেটে ফজল ১৩৯টি উইকেট পেয়েছিলেন। এবং একটি টেস্টে তাঁর সর্বাধিক সংগ্রহ হ'ল তেরোটি উইকেট।

আর হানিফ মহম্মদ শুধু তাঁর কালেরই নয়, সর্বকালের অন্যতম সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান। টেস্ট ক্রিকেটে এক ডজন সেঞ্চুরি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে এক ইনিংসে ৩৩৭ রান করা ছাড়াও হানিফ বিশ্ব ক্রিকেটে ব্যক্তিগত স্কোরের একটি রেকর্ড গড়ে রেখেছেন ভাওয়ালপুরের বিপক্ষে করাচীর হয়ে একাই ৪৯৯ করে। বলতে গেলে হানিফই হলেন পাকিস্তানী মুখর ক্রিকেটারদের অগ্রপথিক। তিনি ও ফজল মামুদ পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের নেতৃত্বও করেছেন। হানিফ অনুজ মুস্তাক মহম্মদ নেতৃপদে আসীন হয়েছিলেন। হানিফ ভায়েদের অনেকেই কোনো না কোনো সময়ে টেস্ট খেলায় পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আক্ষরিক অর্থে ক্রিকেটিং ফ্যামিলি বলতে যা বোঝায় করাচীর মহম্মদেরা হলেন তাই।

হানিফ মহম্মদ, ফজল মামুদ, আব্দুল হাফিজ কারদার, ইমতিয়াজ আমেদ, খান মহম্মদ, মামুদ হোসেন প্রমুখকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান একদিন টেস্ট ক্রিকেটে তার যাত্রা শুরু করেছিল। সেই অভিযানকে সফল করে তুলতে উত্তরকালে অনেক বিখ্যাত খেলোয়াড়ই বিভিন্ন অধ্যায়ে নানাভাবে জাতীয় দলের সেবা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই খ্যাতি দেশ ও ভারত উপমহাদেশের গণ্ডী অতিক্রম করে দূর দুরান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন সব খ্যাতিমান খেলোয়াড়দের পেশাদারী চুক্তিতে আবদ্ধ করে ইংলণ্ডের বিভিন্ন কাউন্টি ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে নিয়ে যান। সে দেশে নিয়মিত খেলার সুযোগে তাঁদের ক্রীড়ামানেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। ১৯৭৭ সালে অস্ট্রেলীয় শ্রেষ্ঠী কেরি প্যাকার বিশ্বের বাছাই খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গড়ে ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেটের প্রচলন ঘটালে মোটা পারিশ্রমিকের চুক্তিতে প্রায় দু গণ্ডা পাকিস্তানী খেলোয়াড় প্যাকারের সংস্থায় যোগ দেন।

ধনকুবের কেরি প্যাকার মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মূলত তাঁদেরই নিজের দলভুক্ত করেছিলেন যাঁদের ক্রীড়াদক্ষতা ছিল প্রশ্নের অতীত এবং যাঁদের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ছিল দর্শকমণ্ডলীর কাছে দুনিবার। এক কথায় যাঁরা সুপার ক্রিকেটার হিসেবে পরিচিত কেরি প্যাকার তাঁদেরই ক্রীড়াদক্ষতার মূল্য ধরে দিতে চেয়েছিলেন অকৃপণ মেজাজে হাজার হাজার টাকা উপুড়হস্ত করে।

কেরি প্যাকার যে নিঃস্বার্থভাবে ক্রিকেটারদের আর্থিক সাহায্য করতে বসেছিলেন তা নয়। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়িক স্বার্থের সংঘাত ঘটায় তিনি নিজস্ব দল গড়ে ক্রিকেট বোর্ডের প্রতি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। আসলে তিনি এমন এমন খেলোয়াড় বেছে নিয়েছিলেন যাঁদের দক্ষতা, যোগ্যতা সম্পর্কে সবাই ছিলেন নিঃসন্দেহ।

এমনি সংশয়াতীত দক্ষ পাকিস্তানী ক্রিকেটার হলেন মজিদ খাঁ, জাহির আব্বাস, আসিফ ইকবাল, হানিফ অনুজ মুস্তাক মহম্মদ, জাভেদ মিয়াদাদ, ইমরান খাঁ, সরফরাজ নাওয়াজ প্রমুখেরা। তাঁরা টেস্ট ক্রিকেট খেলার সঙ্গে সঙ্গে কেরি প্যাকার-প্রবর্তিত ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেটেও খেলেছেন। তাঁরাই এ যুগে পাকিস্তানের সুপার ক্রিকেটার। হানিফ মহম্মদ, ফজল মামুদের ঐতিহ্য তাঁরাই আজ বৃষস্কন্ধের মতো বহন করে চলেছেন। তাঁরা পাকিস্তানী ক্রিকেটের প্রতিচ্ছবিকে উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে পেরেছেন। তার সম্ভ্রম বাড়িয়েছেন, অনাগত কালকে তাঁদের নির্দেশিত পথে চলতে করেছেন অনুপ্রাণিত। নতুনকালে শিক্ষাদীক্ষা যদি সম্পূর্ণ হয় তাহলে উত্তরসূরিরাও পাকিস্তানী ক্রিকেটের মান বজায় রাখতে পারবেন বলে বিশ্বাস করা যায়।

ক্রিকেটার : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আলম, ইন্তিখাব (১৯৪১—) পাকিস্তানের অন্যতম অলরাউণ্ডার। ডান-হাতি ব্যাটসম্যান এবং লেগব্রেক গুগলি বোলার। ১৯৫৮ সালে করাচিতে প্রথম শ্রেণীর খেলায় যখন আত্মপ্রকাশ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর ৯ মাস। ১৯৫৯ সালে করাচিতেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যখন টেস্ট খেলতে নামেন তখনও তিনি ১৮ বছরের চৌকাঠ পেরোন নি। ৪৩টি টেস্টে ১০৮ উইকেট দখল করেন। ফজল মামুদের পর তিনিই দ্বিতীয় পাকিস্তানী যিনি শততম টেস্ট উইকেট দখলের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিশ্ব একাদশের পক্ষে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ১৯৬৯-৭৫ সালের মধ্যে ১৭ বার পাকিস্তান দলের নেতৃত্ব করেছেন। কাউন্টিম্যাচে ওভালে ইয়র্কশায়ারের বিপক্ষে সারে দলের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন ১৯৭১-এ। [illegible] বিরুদ্ধে ১৩৯ রান করেছেন। হবার্টে ভিক্টোরিয়া দলের ৮টি উইকেট দখল করেছিলেন মাত্র ৫৫ রানের বিনিময়ে। করাচী ব্লু দলের পক্ষে পাকিস্তান ইণ্টারন্যাশন্যাল এয়ারওয়েজের বিরুদ্ধে তাঁর ১৮২ রান প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে সর্বোচ্চ স্কোর।

আহমেদ, ইমতিয়াজ (১৯২৮—) উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসাবে সেরা পাকিস্তানী এবং বিশ্বপর্যায়ের খেলোয়াড় ইমতিয়াজ আহমেদ ১৯৫৪-য় তাঁর প্রথম ইংলণ্ড সফরে সহস্রাধিক রান করেন এবং ৮৬ জনকে আউট করেন। ১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৩০০ রান তাঁর ব্যাটিং দক্ষতার পরিচায়ক। নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ১৯৫৫ সালে লাহোরে ২০৯ রান তাঁর সর্বোচ্চ টেস্ট স্কোর। উইকেট কিপিং-এ তাঁর নৈপুণ্যের নিদর্শন ১৯৬২র প্রথম টেস্ট। ঐ ম্যাচে ইংলণ্ড ৫ উইকেটে ৫৪৪ রান করে কিন্তু ইমতিয়াজের দক্ষতায় একটিও বাই রান সেই স্কোরে যুক্ত হয় নি। ১৯৬১-৬২র ইংলণ্ড সফরে তিনি জাতীয় দল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। টেস্টে তাঁর মোট সংগ্রহ ২০৭৯ রান ও ৭৯টি উইকেট।

আহমেদ, সয়ীদ (১৯৩৭—) দক্ষ পাকিস্তানী ব্যাটসম্যান। ঐ দেশে টেস্টে সংগৃহীত রানের সম্পদ তাঁর চেয়ে একমাত্র হানিফ মহম্মদেরই বেশি। ৪১টি টেস্টে তার মোট রান ২৯৯১ (গড় ৪০.৪১)। সয়ীদ আহমেদ ৩টি টেস্টে (১৯৬৮-৬৯-এ ইংলণ্ড সফরে) পাকিস্তানী দলের অধিনায়কত্ব করেন। লাহোরে একটি স্থানীয় প্রথম শ্রেণীর খেলায় ১০৫ ও ১০২ রান করেন। ঐ

সময়ে উপর্যুপরি চারটি ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেন। টেস্টে তাঁর সর্বাধিক স্কোর ১৭২। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬৪-৬৫তে চারটি টেস্টে ঐ রান সংগৃহীত হয়।

কারদার, আবদুল হাফিজ (১৯২৫—) পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক এইচ কারদার ভারতের পক্ষেও টেস্ট খেলেছেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য মনোনীত হয়েও শেষ পর্যন্ত অনিবার্য কারণে তাঁর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কারদার একজন প্রথম শ্রেণীর অলরাউণ্ডার। ন্যাটা নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান। লেগ স্পিনার আর চমৎকার ক্লোজ-ইন ফিল্ডার। জন্মেছেন লাহোরে। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অংশ নিয়েছেন ১৯ বছর বয়সে। সেই বছরেই রনজি ট্রফির সেমি-ফাইন্যালে কৃতিত্বপূর্ণ সেঞ্চুরি করেন। রনজি ট্রফির বিভিন্ন ম্যাচে ব্যাটিং ও বোলিং-এর নানা কৃতিত্বপূর্ণ নজির ছড়িয়ে রয়েছে। চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতাতেও তাঁর সাফল্যের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট ব্লু কারদার পাকিস্তানের পক্ষে ভারত ছাড়াও ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব পালন করেন। ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে মোট ২৬টি টেস্ট খেলেছেন। রান করেছেন মোট ৯২৭। সর্বোচ্চ রান ৯৩ করেন ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৫৫-য় করাচি টেস্টে। ময়দান থেকে অবসর নেবার পর পাকিস্তান ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের দীর্ঘদিনের কাণ্ডারী ছিলেন।

মহম্মদ, হানিফ (১৯৩৪—) উনিশ বছর বয়সে পা দেবার আগেই মহম্মদ পাকিস্তানের সংগঠিত ক্রিকেট দলের ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে অপরিহার্য হয়ে ওঠেন। তাঁরা পাঁচ ভাই-ই ক্রিকেটের আসরে পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। হানিফ তাঁদের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত ঘটান। ১৯৫২ সালে প্রথম পাকিস্তানী সফরে ভারতে তিনি বিশেষ সফল হন। প্রথম ম্যাচেই উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে ১২১ ও অপরাজিত ১০৯ রান করেন। ষষ্ঠ খেলায় অপরাজিত ২০৩ করেন। তাঁর মত ধৈর্য ও মনঃসংযোগ খুব কম খেলোয়াড়ের মধ্যেই দেখা যায়। লর্ডস মাঠে ১৯৬৭ সালের টেস্টে ৩ ঘণ্টা ২ মিনিটে সংগৃহীত অপরাজিত ১৮৭ এমনি ধৈর্যশীল ক্রীড়াধারার একটি নিদর্শন। বারবাডোজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৫৭-৫৮-য় ১৬ ঘণ্টা ১০ মিনিট ব্যাপী তাঁর দীর্ঘ ইনিংস টেস্টের ইতিহাসে অনন্য রেকর্ড। ঐ ইনিংসে তিনি ৩৩৭ রান করেন। পরের বছরে করাচিতে কায়েদ আজম জিন্না ট্রফিতে করাচির পক্ষে

ভাওয়ালপুরের বিরুদ্ধে ৪৯৯ রানের বিশ্ব রেকর্ড করেন। এটি আজও অম্লান। তিনিই প্রথম পাকিস্তানী ক্রিকেটার যিনি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে ১০,০০০ রান করেন। হানিফ মহম্মদ মোট ৫৫টি টেস্ট খেলেছেন। তাঁর মোট রান ৩৯১৫ (গড় ৪৩.৯৮)। ১৯৬১-৬২ তে ঢাকা টেস্ট ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি সহ (১১১ ও ১০৪) মোট ১২টি শত রান করেন। ১১টি টেস্টে পাকিস্তান দলের নেতৃত্ব দেন।

মহম্মদ, মুস্তাক (১৯৪৩—) ক্রিকেটের জগতে বিখ্যাত মহম্মদ পরিবারের সদস্য ও হানিফ মহম্মদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুস্তাক মহম্মদ পৃথিবীর অন্যতম সেরা অলরাউণ্ডার। ক্রিকেটে মুস্তাকের সহজাত প্রতিভা। মাত্র ১৩ বছর ১ মাস বয়সে করাচি (হোয়াইট) বনাম হায়দরাবাদ ম্যাচে করাচির পক্ষে খেলতে নামেন। সেটাই তাঁর প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে আবির্ভাব। মুস্তাক ঐ খেলায় ৮৭ রানে ৫ উইকেট দখল করে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে ১৯৫৯-৬০-এ দিল্লী টেস্টে প্রথম সেঞ্চুরি করেন। টেস্ট ক্রিকেটে ঐ বয়সে সেঞ্চুরি করবার দ্বিতীয় নজির নেই। মুস্তাক মহম্মদ ডানহাতি ব্যাটসম্যান ও লেগব্রেক গুগলি বোলার। তাঁর সেরা স্কোর অপরাজিত ৩০৩; করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ঐ রান করেন করাচি ব্লু দলের পক্ষে ১৯৬৭-৬৮ সালে। বোলিং-এর সেরা নজির ১৯৭৪এ ইংলণ্ড সফরকালে লর্ডস মাঠে ৫৯ রানে মিডলসেক্স দলের ৭টি উইকেট দখল। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৭২-৭৩-এ এক ইনিংসে ২০১ রান ও ৪৯ রানের বিনিময়ে ৫টি উইকেট দখল তাঁর যুগপৎ ব্যাটিং-বোলিং-এর কৃতিত্বের নজির। তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান দল ভারতের বিরুদ্ধে (১৯৭৮) প্রথম রাবার জয় করেন। ১৯৬৪ সালে ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে নর্দাম্পটনশায়ার দলের পক্ষে খেলা শুরু করেন। ১৯৬৯-এ তিনি ব্যাটিং ও বোলিং-এ শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

মামুদ, ফজল (১৯২৭—) অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য পাকিস্তানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পেস বোলার ফজল মামুদও ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু অপরিহার্য কারণে যেতে পারেন নি। ফজল মামুদ পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা সফল বোলার। তাঁর অসীম শক্তি ও পেসের তারতম্য ঘটানোর নিপুণ ক্ষমতা ছিল। ভারত সফরের পর ১৯৫৪-য় ইংলণ্ড সফরে তিনি ছিলেন দলের সহকারী অধিনায়ক। তিনি ২০টি টেস্টে জাতীয় দলের নেতৃত্বও করেছিলেন। প্রথম ইংলণ্ড সফরে তিনি ইংলণ্ডের ধ্বস নামিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ সফরে গড় ১৭.৩৫ রানের বিনিময়ে তার ঝুলিতে জমেছিল ৭৭টি উইকেট। ওভাল টেস্টের দু'ইনিংসে তিনি যথাক্রমে ৫৩ ও ৪৬ রানের বিনিময়ে ৬টি করে উইকেট দখল করেছিলেন

ক্রিকেট ও ক্রিকেটার : নিউজিল্যাণ্ড

টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় নিউজিল্যাণ্ডের আবির্ভাব খুব বেশিদিনের ঘটনা নয়। কিন্তু সে দেশের মাঠে-ময়দানে ক্রিকেটের পত্তন ঘটেছিল অনেক আগেই।

ব্রিটেনের এক কলোনি হিসেবে নিউজিল্যাণ্ড স্বীকৃতি পায় ১৮৪০ খ্রী। নতুন কলোনির টানে খাস ব্রিটেন থেকে জাহাজ চড়ে যারা সাগরপারের নতুন দেশে আসতে থাকেন বসতি বাঁধার সংকল্পে, তাঁরা সঙ্গে ব্যাট-বলও আনতে ভোলেন নি। ক্রিকেট হ'ল ইংরাজের জাতীয় খেলা। ইংরাজ যখন যেখানে গিয়েছে তখনই সঙ্গে নিয়েছে জাতীয় খেলাটিকে। হলই বা নতুন দেশ। বাস করতে হলে সে দেশেও তো কাজের ফাঁকে অবসর যাপন করতে হবে। অবসর বিনোদনে ক্রিকেট যে আনন্দ দিতে পারে, অন্য কোনো অনুষ্ঠান তা পারে না। এই উপলব্ধিই ইংরাজের কাছে সত্য। তাই ইংরাজ যখন যে দেশে তার সাময়িক আবাস গড়েছে সেই দেশেই ক্রিকেট তার আসর জাঁকিয়ে বসেছে।

নিউজিল্যাণ্ডের আদিবাসী হ'ল মাওরি সম্প্রদায়। নতুন খেলার টানে তারা কোনোদিনই ক্রিকেট মাঠের দিকে এগিয়ে আসতে চায় নি। তাই গোড়ার পর্বে নিউজিল্যাণ্ড মাঠে ক্রিকেট খেলা সীমায়িত ছিল ইংলণ্ড থেকে আসা মানুষগুলির মধ্যেই। কালক্রমে আমদানীকারী ব্রিটিশদের সংখ্যা শাখায় প্রশাখায় প্রসারিত হয়ে গোটা দেশটাকেই ছেয়ে ফেললে, ক্রিকেট খেলাটিও একান্তভাবে তাদেরই খেলা বলে পরিগণিত হয়। ব্রিটিশদের দেখে মাওরিরা রাগবী খেলার দিকে ঝোঁকে। রাগবীতে তারা অসাধারণ দক্ষতাও অর্জন করে। কিন্তু ক্রিকেট সম্পর্কে তাদের অনুরাগ কোনোদিনই পড়ে নি। নতুন কলোনি প্রতিষ্ঠার লগ্নেও নয়। পরবর্তী প্রায় একশ চল্লিশ বছরেও নয়।

নতুন কলোনির ছত্রছায়ায় মাথা গোঁজার উদ্দেশ্যে যারা এসেছিল ইংলণ্ড থেকে তাদেরই চেষ্টায় ১৮৪২ খ্রী ওয়েলিংটন ক্লাবের উদ্যোগে নিউজিল্যাণ্ডের মাঠে একটি বহুল প্রচারিত ক্রিকেট খেলা হয়। বড়দিনের সময় উৎসবের মেজাজে আয়োজিত এই খেলা ঘিরে গোটা নিউজিল্যাণ্ডেই বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বলতে পারা যায় যে ওয়েলিংটন ক্লাবের ব্লু বনাম রেড দলের সেই

খেলাটিই নিউজিল্যাণ্ডে ক্রিকেটের আবেদন ছড়াতে ও আকর্ষণ বাড়াতে মস্ত দায়িত্ব পালন করে। ওয়েলিংটন ক্লাবের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে অন্যেরাও অনুরূপ খেলার ব্যবস্থা করতে এগোয় এবং ওয়েলিংটনের দেখাদেখি অন্যান্য শহর ও জেলায় ক্রিকেট খেলা শুরু হয়ে যায়। এইসব ক্লাবের আগ্রহ ও তৎপরতার সূত্রে ক্রিকেট খেলাটি নিউজিল্যাণ্ডের মাটিতে এমনভাবে মিশে যাবার সুবিধে পায় যে উভয় পর্যায়ে ক্রিকেটই গ্রীষ্মের সর্বপ্রধান ক্রীড়ানুষ্ঠানের মর্যাদাভিষিক্ত হয়।

নতুন কলোনির মাটির নিচে ক্রিকেট যাতে তার শিকড় নামিয়ে দিতে পারে, তার জন্যে ব্রিটিশদের চেষ্টা, পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার অন্ত ছিল না। ব্রিটেন থেকে নিউজিল্যাণ্ড দল পাঠানো হয়েছে বারেবারে। প্রাক্-টেস্ট যুগে খাস ইংলণ্ড থেকে নামী খেলোয়াড় সমৃদ্ধ দল এসে ক্রিকেট সম্পর্কে নিউজিল্যাণ্ডের আগ্রহ অফুরান বাড়িয়ে দিয়ে গেছে।

ইংলণ্ড থেকে বাছাই দলের নিউজিল্যাণ্ড সফরের সূচনা হয় ১৮৬৪ সালে। পারের নেতৃত্বে অল ইংলণ্ড দল সেবার ভিক্টোরিয়া সফর সেরে দেশে ফেরার মুখে নিউজিল্যাণ্ডেও ঘুরে আসে।

১৮৭৭ সালে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার আনুষ্ঠানিক টেস্ট ম্যাচ আরম্ভ হয়। জেমস লিলি হোয়াইটের পরিচালনাধীনে ইংলণ্ড সেবার অস্ট্রেলিয়ায় গেলে আনুষ্ঠানিক টেস্টম্যাচের উদ্বোধন ঘটে। অস্ট্রেলিয়ায় খেলা হলে লিলি হোয়াইটের দল পাশেই অবস্থিত নতুন কলোনিটাও ঘুরে যান।

ইংলণ্ডের দেখাদেখি অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররাও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নিউজিল্যাণ্ডের দিকে পা বাড়াতে উৎসাহিত হন। শতাব্দীর মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই অর্থাৎ ১৮৭৮ এবং ১৮৮১ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে বাছাই দল নিউজিল্যাণ্ডে এসে ক্রিকেট খেলে যায়। বিদেশ থেকে এক-একটি দল আসার সূত্রে নিউজিল্যাণ্ডে ক্রিকেট সম্পর্কে উৎসাহ, অনুরাগ ক্রমশই বাড়তে থাকায় ক্রাইস্টচার্চ, ওয়েলিংটন, ওটাগো, ক্যাণ্টারবারি প্রভৃতি অঞ্চলে এক এক করে ক্রিকেট ক্লাবও গজিয়ে উঠতে থাকে। স্বদেশের মাটিতে ক্রিকেট দৃঢ়মূল হয়ে উঠছে দেখে নিউজিল্যাণ্ডের সংগঠকরা এর পর বিদেশ থেকে কোচ আনিয়ে ক্রিকেট প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিতে থাকেন।

১৮৯৪ খ্রী নিউজিল্যাণ্ডে জাতীয় ভিত্তিতে ক্রিকেট কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের সদর দপ্তর খোলা হয় ক্রাইস্টচার্চ শহরে। ১৯০৬-০৭

মরশুমে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড প্লাকনেট ক্রিকেটে উৎসাহ বাড়াবার সংকল্পে একটি শীল্ড উপহার দিলে ওই স্মারক ঘিরে যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয় উভয়কালে তাই নিউজিল্যাণ্ডের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পরিগণিত হয়েছে।

নিউজিল্যাণ্ড টেস্ট ক্রিকেট সংসারে জায়গা পায় বিশ-ত্রিশের দশকের সন্ধিক্ষণে। ১৯২৯-৩০ মরশুমে আর্থার গিলিগ্যানের নেতৃত্বে এম সি সি সফরে এলে নিউজিল্যাণ্ড দল সর্বপ্রথম টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনায় আত্মপ্রকাশ ঘটায়। ভারতীয় সামন্ত রাজ্য নবনগরের রাজকুমার দিলীপ সিংজী সেবার সফরকারী এম সি সি দলের খেলোয়াড় ছিলেন। অকল্যাণ্ডে তৃতীয় টেস্টে তিনি সেঞ্চুরিও করেন। পরের বছরই নিউজিল্যাণ্ড দল সব প্রথম বিদেশ পরিক্রমণে পা বাড়ায়। তারা যায় ইংলণ্ডে টি সি কাউরির নেতৃত্বে।

১৯২৯-৩০ মরশুমে দক্ষিণ-আফ্রিকা নিউজিল্যাণ্ডে এলে দু দেশের মধ্যে টেস্ট খেলা হয়। তবে পঞ্চাশের দশকের আগে একবার দক্ষিণ-আফ্রিকার সঙ্গে এবং বারকয়েক ইংলণ্ডের সঙ্গে ছাড়া নিউজিল্যাণ্ড আর কোনো দেশের সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেট খেলে নি। ঘরের পাশেই অস্ট্রেলিয়া। তবু অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট খেলা আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে ১৯৪৬-এর আগে আরম্ভ হয় নি। এবং উভয়পর্বে দু দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক টেস্টও কদাচিৎ খেলা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অন্যান্য শরিকদের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট খেলা আরম্ভ হয় ১৯৫১-৫২ মরশুমে, ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৫৫-৫৬ মরশুমে।

নিউজিল্যাণ্ডের ক্রিকেটারকুলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে টি সি লাউরি, ওয়াল্টার হ্যাড্‌লি, জন রিড, বার্ট সাটক্লিফ, রবার্ট টেলর, জুনিয়ার হ্যাডলি, সি এস ডেম্পস্টার, বিভান কংডন, মার্টিন ডনোলী, এম বার্জেস, গ্লেন টার্নার প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

টেস্ট ক্রিকেটে নিউজিল্যাণ্ডের প্রাধান্য তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও কালে কালান্তরে বিশ্ববিশ্রুত অনেক ক্রিকেটার ওই দেশ ঘুরে এসেছেন। ইংলণ্ডের ওয়ালি হ্যামণ্ড ১৯৩২-৩৩ মরশুমে নিউজিল্যাণ্ডের মাঠেই ৩৩৬ রান করে ব্যক্তিগত বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন। ইংলণ্ডের অবিস্মরণীয় খেলোয়াড় হ্যারল্ড লারউড, স্ট্যাথাম, টাইসন, ডেক্সটার, লেন হাটন, পিটার

মে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওরেল, উইকস, ওয়ালকট, রামাধিন, ভ্যালেণ্টাইন, সোবার্স এবং অস্ট্রেলিয়ার স্পফোর্থ, ট্রাম্পার, পন্সফোর্ড, গ্রিমেট, লিণ্ডওয়াল, মিলারের মতো জগদ্বিখ্যাত খেলোয়াড়রা কোনো না কোনো সময়ে নিউজিল্যাণ্ডে খেলেছেন।

বিখ্যাত স্পিনার ক্লারি গ্রিমেটের জন্মস্থানই হল নিউজিল্যাণ্ড। তবে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসবাস করার সুযোগেই ক্রিকেটে তাঁর দক্ষতা বাড়ে এবং পেস থেকে স্পিন বোলারে রূপান্তরিত হতেই তাঁর মুন্সিয়ানা প্রকাশ পায়।

অবিস্মরণীয় অস্ট্রেলীয় ভিক্টর ট্রাম্পার ১৯১৪ সালে ক্যাণ্টারবারিতে যে ইনিংস খেলেছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে তার বিবরণ সোনার অক্ষরে লেখা আছে। ভিক্টর সেঞ্চুরি করেন ৭৩ মিনিটে, ডাবল সেঞ্চুরি ১৩১ মিনিটে। ১৮০ মিনিটের পর তিনি যখন ক্রিজ ছেড়ে চলে যান তখন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ ২৯৩এ গিয়ে পৌছেছিল।

ভিক্টরের ওই দিনের খেলার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখছি।

জে এইচ বেনেট তখন নিউজিল্যাণ্ডের এক নামী বোলার। ভিক্টরকে রুখতে তিনি বেশ সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে ফিল্ডিং সাজিয়ে বোলিং আরম্ভ করলেন। প্রথম বলেই ড্রাইভ মেরে ভিক্টর বাউণ্ডারি হাঁকালেন। বেনেট এবার একজন ফিল্ডসম্যানকে সরিয়ে নিয়ে এলেন সেই জায়গায় যেখান দিয়ে বল বাউণ্ডারির দিকে ছুটেছিল। কিন্তু যে অঞ্চল থেকে ফিল্ডসম্যানকে সরানো হল দ্বিতীয় বলটিকে ঠিক সেই ফাঁকা জায়গায় গলিয়ে ভিক্টর আবার বাউণ্ডারি করলেন। পরের বলেও তাই। বেনেট যতো ফিল্ডিং সাজান, যতোই ফিল্ডসম্যান সরান, ততোই ভিক্টর পর পর বাউণ্ডারি মারতে থাকেন। শেষ বলটিকে ব্যাটের ঘায়ে আবার বাউণ্ডারিতে পাঠাবার পর হাতের দস্তানা খুলে ভিক্টর বেনেটের উদ্দেশ্যে বলেন, চলুন, এবার চা পানে যাওয়া যাক্। ফিরে আবার খেলা শুরু করা যাবে।

বেচারি বেনেট কী বলেছিলেন তা শুনে লিপিবদ্ধ করায় সেদিন আর কেউ উৎসাহ বোধ করেনি।

ক্রিকেটার: সংক্ষিপ্ত পরিচয়

কংডন, বিভান আর্নেস্ট (**১৯৩৮—**) জি. টি. ডাউলিং-এর কাছ থেকে নিউজিল্যাণ্ড দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৭১-৭২-এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ থেকেই তিনি অধিনায়ক হন। তিনি নিউজিল্যাণ্ডের অন্যতম সেরা চৌখস ক্রিকেট খেলোয়াড়। সকল পরিস্থিতিতেই ব্যাট করার মত কৌশল ও মানসিক ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাঁর সংগ্রহে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে রানের সংখ্যা ১১,০০০-এর অধিক। তিনি ডান-হাতি পেস বোলার ছিলেন। গড় ৩১ রানের বিনিময়ে ১৬০টি উইকেট দখল করেন। ১৯৭১-৭২এর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর তাঁর জীবনে সর্বাধিক সাফল্য এনেছিল। সেবাবে ১৬টি প্রথম শ্রেণীর ইনিংস খেলে তাঁর রানের গড় দাঁড়িয়েছিল ৮২·৬৬ রান। অবশ্য ১৯৭৩ সালের ট্রেন্টব্রীজ টেস্টে তাঁর ১৭৬ রানের ইনিংসটিও স্মরণীয়। ঐ ম্যাচে জয়েব মুখোমুখি এসেও তা' নিউজিল্যাণ্ডের হাতছাড়া হয়ে যায়।

টার্নার, গ্লেন সয়েটল্যাণ্ড (**১৯৪৭—**) নিউজিল্যাণ্ডের ধৈর্যশীল ওপেনিং ব্যাটসম্যান। হাতে সুন্দর এবং জোরালো মার আছে। দু'বার নিউজি-ল্যাণ্ডের ইনিংসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেলে গেছেন। ১৯৭১-৭২এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফবে চারটি ডবল সেঞ্চুরি করেন, তার ভেতর দু'টি টেস্ট খেলায়। ওয়ারসেস্টারশায়ার দলের পক্ষে খেলার সময়ে ১৯৭০এ তিনি একবছরে ১০টি সেঞ্চুরি করেন। এটি একটি রেকর্ড। ১৯৭৩ সালে টার্নার নিউজিল্যাণ্ড দলের সহ-অধিনায়করূপে ইংলণ্ড সফর করেন। ঐ গ্রীষ্মে মে মাসের ক্যালেণ্ডারেব পাতা ছেঁড়বার আগেই তিনি ১০০০ রান পূর্ণ করেন; ১৯৩৮ সালের পব আর কেউ এই গৌরব স্পর্শ করতে পারে নি। ১৯৭৬ সালে নিউজিল্যাণ্ড দলের অধিনায়ক হন।

টেলর, ব্রুস রিচার্ড (**১৯৪৩ —**) শতাধিক (১১১) টেস্ট উইকেটের অধিকারী টেলর নিউজিল্যাণ্ডের একজন কৃতী বোলার। তিনি ৩০টি টেস্টে গড় ২৬ বানের বিনিময়ে উক্ত সংখ্যক উইকেট দখল করেন। তিনি টেস্টে প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করেন (১০৫)। ভারতের বিরুদ্ধে কলকাতা

টেস্টে ১৯৬৫ সালের ঐ খেলায় তিনি ৮৬ রানে ৫টি উইকেট দখল করেন। বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান টেলরের হাতে বিভিন্ন ধরনের মার ছিল। তিনি বেশ জোরে মেরে খেলতেন। ডান হাতে মিডিয়াম পেস বল করতেন। ১৯৬৪ সালে ক্যাণ্টারবেরিতে প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন। ১৯৭০ সালে ওয়েলিংটনে চলে যান। ১৯৭১-৭২এর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে মোট ৪৬টি উইকেট পান, তন্মধ্যে ২৭টি টেস্ট উইকেট। ব্রিজটাউনের তৃতীয় টেস্টে ১৮২ রানে ৯টি উইকেট দখল করেন।

বার্ট, সাটক্লিফ (১৯২৩ —) নিউজিল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান এবং যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীর অন্যতম সেরা বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান। ১৯৪২-৬৬ সাল পর্যন্ত ক্রিকেট খেলেছেন এবং ঐ সময়ের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাটিং-এর অনেক রেকর্ড ভেঙেছেন—গড়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় ম্যাচেই ১৪৬ রানের একটি ইনিংস উপহার দেন। যুদ্ধের পর যে ইংলণ্ড দল নিউজিল্যাণ্ড সফরে যায় তিনি তার বিরুদ্ধে ওটাগোর খেলায় উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করেন (১৯৭ ও ১২৮)। ১৯৪৯ সালে ইংলণ্ড সফরে তাঁর খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পায়। ঐ সফরে তিনি মোট ২,৬২৭ (গড় ৫৯'৭০) রান করেন। ইংলণ্ড সফরকারী খেলোয়াড়দের মধ্যে কেবলমাত্র ডন ব্র্যাডম্যানই ঐ রানসংখ্যা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। সেই সফরে এসেক্সের বিরুদ্ধে দু'ইনিংসে সেঞ্চুরি (২৪৩ ও অপরাজিত ১০০) করেন। জীবনে চারটি ম্যাচে তিনি উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করার গৌরব লাভ করেন, ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে তাঁর দু দফা দ্বিশতাধিক রানের কৃতিত্ব রয়েছে। ওটাগোর পক্ষে তিনি একটি ম্যাচে ৩৮৫ রান করেন ক্যাণ্টারবেরির বিরুদ্ধে। অকল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও তিনি ৩৫৫ রান করেন।

রীড, জন রিচার্ড (১৯২৮ —) নিউজিল্যাণ্ডের ক্রিকেট ইতিহাসে জন রীডের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তিনি দীর্ঘ ২০ বছরকাল ঐ দলের অন্যতম প্রধান খেলোয়াড় হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। বস্তুত তাঁরই কৃতিত্বে ১৯৬২ তে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ২টি টেস্ট জয় ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৬৫তে একটি টেস্টে জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল। মোট ৫৮টি টেস্টে স্বদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, তার ভেতর ৩৪ বার অধিনায়ক হিসাবে। ওয়েলিংটনে প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে ১৯৪৭-৪৮এ খেলতে শুরু করে পরবর্তী কালে ওটাগো চলে যান। ১৯৫৪-৫৫ সালে ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিভাগেই সেরা খেলোয়াড় বিবেচিত হন ও রেডপাথ কাপ ও উইণ্ডসর কাপ জয় করে

নিউজিল্যাণ্ডে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। ১৯৪৯ সালে ইংলণ্ড সফর কালে প্রথম টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২-৫৫ পর্যন্ত ইংলণ্ডে লীগ ক্রিকেটে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে তাঁর নেতৃত্বে নিউজিল্যাণ্ড দল ইংলণ্ড সফরে আসে।

তিনি সেই সফরে সমারসেটের বিরুদ্ধে ১১১, সাসেক্সের বিরুদ্ধে ১১৮ ও নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে ১১৪ রান করেন। ১৯৬৫তে যখন তিনি আবার ঐ দেশে সফরে আসেন তখন তাঁর হাঁটুতে চোট থাকায় সেরা খেলা প্রদর্শন করতে পারেন নি। তবু কেণ্টের বিরুদ্ধে ১৬৫ রান তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষ্য দেয়। ১৯৬২-৬৩তে ওয়েলিংটনের হয়ে নর্দার্ন ডিস্ট্রিক্টের বিপক্ষে শিহরণ সৃষ্টিকারী ২৯৭ রানের ইনিংসটি তাঁর একটি স্মরণীয় খেলা। ঐ ইনিংসে তিনি ১৫টি ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন।

নরা.

ক্রিকেট ও ক্রিকেটার : দক্ষিণ আফ্রিকা

ইংরাজ যে দেশে গেছে সেই দেশে ব্যাট-বল সঙ্গে নিয়ে যেতে ভোলে নি। কাজকর্মের ফাঁকে অবসর বিনোদনের পরিকল্পনায় ব্যাট-বল হাতে নিয়ে মাঠে নেমেছে। মনের আনন্দে খেলেছে। আর এই আনন্দোচ্ছল ছবি দেখতে দেখতে দেশীয় লোকেরাও মাঠের দিকে ঝুঁকেছে। এমনি করেই ইংরাজ দেশ-দেশান্তরে ক্রিকেটের আকর্ষণ ছড়িয়ে দিয়েছে। এক-একটি অঞ্চলে ক্রিকেটের শেকড় মাটির মূলে গভীরে নেমে যাওয়ার কালে কালান্তরে ক্রিকেট যেন সেই দেশের জাতীয় ক্রীড়ার মর্যাদামণ্ডিত আসনে থিতু হয়ে গেছে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায়।

ইতিহাস বলে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রিকেট খেলার সূচনা ঘটিয়েছিল ব্রিটিশ সৈন্যরা। দক্ষিণ আফ্রিকার অঞ্চল বিশেষ নিজেদের অধিকারে এনে ফেলার পর ব্রিটিশ সেনারা ১৭৯৫ ও ১৮০২র অন্তর্বর্তীকালে নিজেদের ছাউনি-সংলগ্ন জমিতে ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা করেছিল। তবে এইসব খেলার প্রামাণিক বিবরণ বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় নি।

প্রামাণিক দলিল হিসেবে উল্লেখ করা যায় ১৮০৮ সালে কেপ টাউনে অনুষ্ঠিত একটি ক্রিকেট ম্যাচের নজিরকে যেটি প্রকাশিত হয়েছিল সেকালের দক্ষিণ আফ্রিকার একমাত্র সংবাদপত্র দ্য কেপ টাউন গেজেট অ্যাণ্ড আফ্রিকান অ্যাডভারটাইজারে প্রকাশিত সংবাদে :

১৮০৮ সালের ৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার আর্টিলারি মেসের অফিসারদের সঙ্গে কলোনির অফিসারদের একটি ক্রিকেট খেলা হবে। বিরাট অনুষ্ঠান। হারজিতের প্রশ্নে একহাজার গিনি বাজীর ব্যবস্থা থাকবে এই উপলক্ষে।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় গোড়ার পর্বে ইংলণ্ড আগত প্রবাসীরাই নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলত, কালে দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ী বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গরাও ব্যাট-বল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকলে ১৮৪০ সাল নাগাদ কেপ টাউন, পোর্ট এলিজাবেথ, পিটারমরিসবার্জে ক্রিকেটের প্রচলন ঘটে। প্রথম ক্লাব প্রতিষ্ঠিত পোর্ট এলিজাবেথ ক্রিকেট ক্লাব নামে। এই ক্লাবের উদ্যোগেই ১৮৭৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্বপ্রথম ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আসর বসে।

কালক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে ক্রিকেট সফরও বিনিময় আরম্ভ হয়ে যায়। প্রথমে বেসরকারি স্তরে। ১৮৯৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই কিন্তু ইংলণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট খেলার রেওয়াজ চালু হয়ে যায়। দু পক্ষে প্রথম টেস্ট খেলা হয়েছিল ১৮৮৮-৮৯ মরশুমের মার্চ মাসে। অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া-ইংলণ্ডে আনুষ্ঠানিক টেস্ট ক্রিকেট আরম্ভের প্রায় এগারো বছরের মধ্যেই।

১৯০২ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে এলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রিকেটের প্রসার ও প্রচার বাড়ার পথ আরও প্রশস্ত হয়। সেই বছরেই স্বদেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা সর্বপ্রথম টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার মোকাবিলার সুযোগ পায়। নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট খেলা শুরু হয় ১৯৩১-৩২ মরশুমে।

এক কথায় বলা যেতে পারে যে ১৮৮৮-৮৯ থেকে ১৯৬৯-৭০ মরশুম পর্যন্ত টানা একাশি বছর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। তারপরই ছন্দপতন। দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় বর্ণবৈষম্যের মোহ ত্যাগ করতে না পারায় নীতিগত কারণেই নানা দেশের সঙ্গে তাদের মতপার্থক্য ঘটতে থাকায় সত্তরের দশকের মুখে দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্রব ছিন্ন করে। আনুষ্ঠানিক টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনের সদস্যপদেরই মধ্যে। কাজেই সম্মেলনের সদস্যপদ ছেড়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকাকে টেস্ট ক্রিকেটের সংসারের বাইরে চলে যেতে হয়।

ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কোনদিন টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয় নি। শ্বেতাঙ্গ-শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকা স্বদেশের খেলার মাঠেও বর্ণবৈষম্য আঁকড়ে ধরে থাকার প্রতিবাদে ভারত, পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলায় আগ্রহ প্রকাশ করে নি।

বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি দক্ষিণ আফ্রিকার এক কলঙ্ক। সে দেশে জাতীয় ক্রিকেট দল চিরদিনই শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে গঠিত হয়ে এসেছে। ক্রীড়াগত দক্ষতার বদলে খেলোয়াড়দের গাত্রবর্ণই জাতীয় ক্রীড়ায় দলভুক্তির ব্যাপারে যোগ্যতার মাপকাঠি বলে বিবেচিত হয়েছে। এই নোংরা নীতির প্রতিবাদে দেশ-বিদেশ মুখর হয়েছে, কোথায়ও সক্রিয় আন্দোলনও গড়ে উঠেছে তবু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় তাদের অসুস্থ মনোভাব পরিবর্তন করতে পারে নি। এরই পরিণামে ক্রিকেট ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্রীড়ার দরজা দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শ্বেতাঙ্গদের অবিচার, কুবিচারের জবাব দিতে দক্ষিণ আফ্রিকার অশ্বেতকায় ক্রীড়ানুরাগীরা নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র একটি ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড স্থাপন করেছে ১৯৫০ সালে। এই সংস্থা জাতীয় দলে অশ্বেত-কায়দের প্রতিনিধিত্বের দাবিতে আন্দোলনও চালিয়ে যাচ্ছে। কেপ টাউনের গ্রীন-পার্কে, ডারবানের কুরিস ফাউণ্টেন, জোহানেসবার্গের নাবালসক্রুটে অশ্বেতকায় ক্রিকেট বোর্ডের নিজস্ব মাঠ আছে এবং সেইসব মাঠে নিয়মিত ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়। ১৯৬১-৬২ সাল থেকে এই সংস্থার উদ্যোগে অশ্বেতকায়দের মধ্যে আন্তঃ-প্রাদেশিক ক্রিকেট খেলাও চলে আসছে।

অশ্বেতকায়দের আন্তঃ-প্রাদেশিক প্রতিযোগিতা উপলক্ষে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যেও অনেক দক্ষ ও সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার আছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অভাবে তাঁদের নাম বহির্বিশ্বে প্রচারিত হতে পারে নি।

দক্ষিণ আফ্রিকার যেসব ক্রিকেটার বহির্বিশ্বে নাম কিনেছেন তাঁরা সবাই টেস্ট খেলোয়াড়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সর্বকালের নিরিখে বিশ্বের প্রথম সারির ক্রিকেটারদের দলে পড়েন। যথা সিনিয়ার ও এ ডি নোর্স, হার্বি টেলর, ব্রুস মিচেল, ক্যামেরন, ম্যাকগ্লু, হিউ টেফিল্ড এবং একালের ব্যারি রিচার্ডস, মাইক প্রোক্টর, ডোলিভায়েরা, এডি বার্লো প্রমুখেরা এবং ১৯০৭ সালের বিখ্যাত গুগলি বোলার স্কোয়ারজ ভগলার, ফকনার ও হোয়াইট। এই চারজন গুগলি বোলার সেবার ইংলণ্ড সফরে চাঞ্চল্যকর সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কোনও সফরকারী দলে একই সঙ্গে এতগুলি গুগলি বোলারের সমাবেশ কোনদিনই দেখা যায় নি। দক্ষিণ-আফ্রিকার বিশ্ববিশ্রুত ক্রিকেটারদের মধ্যে হার্বি টেলরকে ম্যাটিং উইকেটের সেরা ব্যাটসম্যান, ব্যারি রিচার্ডসকে সমকালীন দুনিয়ার সেরা ব্যাটসম্যান, হিউ টেফিল্ডকে বিশ্বের সেরা অফ স্পিনার বলে মনে করা হয়।

তাঁরা সত্যিই সবার সেরা ছিলেন কিনা তা নিয়ে হয়তো বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে তাঁদের দক্ষতা যে সুপ্রতিষ্ঠিত তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না।

এঁদের এবং আরও কজন যোগ্য ক্রিকেটারের সামর্থ্যে নির্ভর করে দক্ষিণ-আফ্রিকা টেস্ট ক্রিকেটে ইংলণ্ডের সঙ্গে খেলায় দুবার ১৯০৫ ও ১৯০৯-১০ সালে 'রাবার' পেয়েছে এবং ইংলণ্ডকে হারিয়েছে আঠারটি টেস্টে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ-আফ্রিকা জিতেছে এগারটি টেস্টে, রাবার পেয়েছে বার দুয়েক।

নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়েছে নটি টেস্টে ওবং তাদের সঙ্গে খেলায় প্রতিবার রাবার নিজের হাতে রেখে দিতে পেরেছে। নিউজিল্যাণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঁচ পর্যায়ে টেস্ট খেলা হয়েছে। সব মিলিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এ যাবৎ টেস্ট খেলেছে ১৭২টি। তার মধ্যে জিতেছে আটত্রিশটিতে, হেরেছে সাতাত্তরটি ম্যাচে এবং বাকি খেলাগুলি অমীমাংসিত থেকে যায়।

যে ১৭২টি টেস্ট ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা যোগ দিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে ১৯৩৮-৩৯ মরশুমে ডারবানে ইংলণ্ডের সঙ্গে অনুষ্ঠিত পঞ্চম টেস্টটি। স্থির ছিল যে মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত খেলাটি চলবে। তবু খেলার মীমাংসা হয় নি দশ দিন কেটে যাওয়ার পরও। দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে স্বদেশমুখী জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে যাওয়ায় দশ দিন পর খেলাটিকে অমীমাংসিত রেখে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের ফিরতি জাহাজে চেপে বসতে হয়। দশদিনেও একটি খেলার নিষ্পত্তি যে হবে না একথা আগে কেউ ভাবতেও পারে নি। এর পর অবশ্য এ যাবৎ আর অনন্তকালব্যাপী টেস্ট খেলার ব্যবস্থা হয় নি। উত্তরপবে সব খেলারই সময় নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। টাইমলেস টেস্টের ইতি এইখানেই।

ডারবানের ওই ম্যাচে দু পক্ষে মিলিয়ে রান উঠেছিল ১৯৮১। দশম দিনে পুরো সময় খেলা হতে পারে নি। জলঝড়ের জন্যে দিনের খেলার মেয়াদ কিছুটা কাটছাঁট হয়ে গিয়েছিল। দশম দিনে খেলা যখন অমীমাংসিত অবস্থায় পরিত্যক্ত হয় তখন ইংলণ্ডের জিততে দরকার আর একচল্লিশ এবং তাদের হাতে ছিল পাঁচ পাঁচটি উইকেট। একটি ম্যাচে পাঁচটি সেঞ্চুরি হয়েছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার পক্ষে শতরান করেন প্রথম ইনিংসে ভ্যাণ্ডারবিল, দ্বিতীয় ইনিংসে এলান মেলভিল। আর ইংলণ্ডের পক্ষে তিনটি সেঞ্চুরি হয় দ্বিতীয় ইনিংসেই—পল গিব, ওয়াল্টার হ্যামণ্ডের সাফল্যে এবং বিল এডরিচের ২১৯ রান করার দৌলতে। এই ঐতিহাসিক টেস্টে দক্ষিণ-আফ্রিকার অধিনায়ক এলান মেলভিল এবং ইংলণ্ডের ওয়াল্টার হ্যামণ্ড।

ক্রিকেটার : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

এডকক, নীল আসউইন স্ট্রেহার্ন (১৯৩১—) দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম সফল ডানহাতি ফাস্ট বোলার। কেপ টাউনে ছিল আদি নিবাস। ১৯৫২-৫৩ সালে ট্রান্সভালে খেলা শুরু করেন। অচিরে তাঁর খ্যাতি এদেশের ক্রীড়ামহলে ছড়িয়ে পড়ে, পরবর্তী বছরে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে নির্বাচিত হয়ে নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। পাচটি টেস্টে ২৪টি উইকেট লাভ করেন। ১৯৫৭-৫৮য় ডাবরানে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩য় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৪৩ রানে ৬টি উইকেট দখল করেন। ১৯৬০ সালের ইংলণ্ড সফরে ২৬টি টেস্ট উইকেট ঝুলিতে ভবেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট দখলের রেকর্ড। ১৯৫৫-য় এইচ. জে. টেফিল্ড সমসংখ্যক উইকেট দখল করেন। তাঁর সেরা খেলা ট্রান্সভালে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটের বিরুদ্ধে। ১৯৫৩-৫৪র ঐ ম্যাচে তিনি উভয় ইনিংসে মোট ৬৫ রানে ১৩টি উইকেট লাভ করেন।

এণ্ডিন, উইলিয়াম রাসেল (১৯২৪—) ১৯৪৫-৪৬এ প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে আত্মপ্রকাশ করেন। তবে নিয়মিত খেলা শুরু হয় ১৯৫০-য়ে ট্রান্সভাল দলের পক্ষে। ১৯৫২ সালে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা দলভুক্ত হয়ে ইংল্যাণ্ড সফরে যান, এবং একটি মাত্র টেস্টে অংশ গ্রহণ করেন। তখন তিনি দলের উইকেটরক্ষক ছিলেন এবং ব্যাটসম্যান হিসাবেও তাঁর দক্ষতা ছিল। পরবর্তী কালে জন ওয়াইট উইকেট রক্ষার কাজে আরও পারদর্শিতার পরিচয় দিলে তিনি সার্থক ব্যাটসম্যান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৫৫ সালের ইংলণ্ড সফরে তিনি সহস্রাধিক রান করেন তার মধ্যে টেস্ট সেঞ্চুরি সহ একাধিক শতরানের গৌরব ছিল। স্বদেশে ইংলণ্ড দলেব বিরুদ্ধে কেপ টাউনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় টেস্টে তিনি 'হ্যাণ্ডেল্ড দ্য বল' এই আইনের আওতায় পড়ে আউট হন। টেস্ট ম্যাচে এমন আউটের আর নজির নেই। অত্যন্ত দক্ষ ফিল্ডার ছিলেন এণ্ডিন। ২৮টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করে তিনি ৪১টি ক্যাচ ধরেন। এই কৃতিত্ব মাত্র আর দুজন দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড় এ পর্যন্ত অর্জন করতে পেরেছেন।

ওয়াইট, জন হেনরি বিকটোর্ড (১৯৩০—) দক্ষিণ আফ্রিকার সেরা এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান। তিনি টেস্টে ২৪০৫ রান করেছেন এবং ১৪১ জন ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়ানে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চাইতে বেশি উইকেট দখলের রেকর্ড আছে মাত্র নট, ইভান্স আর গ্রাউটের। তিনি ১৯৫৮ সালে ডারবানের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৩৪ রান করেন। ১৯৬১-৬২তে নিউজিল্যাণ্ডের সফরে তিনি ২৬টি উইকেট পতনের কারণ। এটি একটি বিশ্বরেকর্ড, এবং সিরিজে কোন উইকেটরক্ষক এতজন ব্যাটসম্যানকে আউট করার কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নি। ১৯৫১-এর ইংলণ্ড সফরে সহস্রাধিক রান করেন। ১৯৬০-এর ইংলণ্ড সফরে দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং-এর তালিকায় তিনি শীর্ষস্থানটি দখল করেন। ডারবানে ১৯৫৯-৬০-এর কুরি কাপের খেলায় ট্রান্সভালের পক্ষে নাটালের বিরুদ্ধে তিনি উভয় ইনিংসে অপরাজিত (১৫৯ ও ১৩৪) সেঞ্চুরির গৌরব অর্জন করেন।

ক্যামেরন, হোরেস ব্রাকেনরিজ (১৯০৫—১৯৩৫) জীবনের চরম উৎকর্ষ যখন তাঁর আয়ত্তে ঠিক তখনই মৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ইংলণ্ড সফরের শেষে স্বদেশে ফিরে এলে দঃ আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ উইকেটরক্ষক আন্ত্রিক জ্বরে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। শেষবার ইংলণ্ড সফরের সময়ে তিনি খ্যাতির শীর্ষে ওঠেন। তিনি যেমন স্টাম্প করতেন নির্ভুল, ঠিক তেমনি জোরালো ব্যাট চালাতেন। সেবারে লর্ডস মাঠে দঃ আফ্রিকার ৯৮ রানের মধ্যে ৪টি উইকেট পড়ে গেলে ক্যামেরন ব্যাট হাতে মাঠে নামেন। সেই জুটি ১২৬ রান করে। তার মধ্যে পৌনে দু ঘণ্টা ব্যাট করে ক্যামেরন ৯০ রান তুলে দঃ আফ্রিকাকে জয়ের পথে নিয়ে আসেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র দু'মাস আগে তাঁর জীবনের শেষ প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে জোরালো হুক কাট ও ড্রাইভের সাহায্যে ১৬০ রান তোলেন। ১৯২৪ সালে ক্যামেরন প্রথম খেলতে আসেন আর তার মাত্র তিন বছর বাদেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সালে ইংলণ্ড সফরে এসে প্রথম ম্যাচেই ওয়ারউইকশায়ারের বিরুদ্ধে ১০২ রান করেন। ১৯৩১-এ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে শেষ দুটি টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও তিনি দল পরিচালনা করেন। অধিনায়কের গুরু দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর খেলার মান নষ্ট হতে থাকে। তবু মোট ২৬টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করে তাঁর মোট রান

দাঁড়ায় ১২৩৯ (গড় ৩০·২২)। উইকেটরক্ষক হিসাবে তিনি ৫১ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেন।

গডার্ড, ট্রেভর লেসলী (১৯৩১—) দক্ষিণ আফ্রিকার গোড়াপত্তনকারী নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান গডার্ডও একজন কৃতী অলরাউণ্ডার। তিনি বাঁ-হাতি মিডিয়াম পেস বোলার এবং দক্ষ ফিল্ডস্ম্যান। তাঁর নির্ভরযোগ্যতার প্রমাণ: ১৯৫৭-৫৮য় কেপ টাউনে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে মাত্র ৯৯ রানে দঃ আফ্রিকার ইনিংস মুড়িয়ে যায়। পুরো ইনিংস ব্যাট করেও গডার্ড ৫৬ রানে অপরাজিত থাকেন। ১৯৫৫ সালে ইংলণ্ড সফরে তিনি নির্বাচিত হন এবং ঐ বারই প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেন। ঐ সিরিজের শেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসে তিনি ৩১ রানে ৫টি উইকেট লাভ করেন এবং ঐ সফরে গড় ২১·১২ রানের বিনিময়ে ২৫টি উইকেট পান। ১৯৫২-৫৩ সালে নাটাল দলের পক্ষে গডার্ড প্রথম শ্রেণীর খেলায় আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৬৬-৬৭তে উত্তর-পূর্ব ট্রান্সভাল বনাম পশ্চিম প্রদেশের খেলার তাঁর ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান ২২২। ১৯৫৯-৬০ এ বর্ডার দলের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেন। গডার্ড ১৩টি টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের নেতৃত্ব করেন।

চীথাম, জন আরস্কাইন (১৯২০—) দক্ষ ডানহাতি ব্যাটসম্যান চীথাম ১৫টি টেস্টে দক্ষিণ অফ্রিকা দলের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। টেস্ট ম্যাচে খেলেছেন মোট ২৪টি; রান করেছেন ৮৩৩ (গড় ২৩·৮৬)। ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীর খেলায় আত্মপ্রকাশ করেন। চীথাম পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার।

টেফিল্ড, হগ জোসেফ (১৯২৮—) ১৯৫৬-৫৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার এই অফব্রেক বোলারটি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে রবারের লড়াইয়ে ৩৭টি উইকেট দখল করে ৪৬ বছরের রেকর্ডটি ভেঙে দেন। ঐ সিরিজেই জোহান্সবার্গের টেস্টে তিনি এক ইনিংসে ১১৩ রানে ৯টি উইকেট দখল করে আরেকটি রেকর্ড করেন। ৩৭টি উইকেট দখল করতে গড়ে তাঁকে ১৭·১৮ রান ব্যয় করতে হয়। নাটাল দলের পক্ষে টেফিল্ড খেলা শুরু করেন ১৯৪৫-৪৬ এ। পরবর্তী কালে রোডেসিয়া এবং সর্বশেষে ট্রান্সভাল দলের পক্ষে তিনি খেলেন। টেস্টম্যাচ খেলেন ১৯৪৯এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। পরবর্তী কালে ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের

বিরুদ্ধে ৩৭টি টেস্টে খেলেছেন এবং মোট ১৭০টি টেস্ট উইকেট দখল করেছেন। টেফিল্ড ডানহাতি ব্যাটসম্যান। ১৯৪৯-৫০ সালে কেপটাউনে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর ৭৫ রান উল্লেখযোগ্য স্কোর।

টেলর, হার্বার্ট উইলফ্রেড (১৯৮৯—১৯৭৩) টেলর দক্ষিণ অফ্রিকা দলের নেতা, দৃঢ়চেতা ব্যাটসম্যান। তাঁর ব্যাটিং প্রতিভার খতিয়ান করতে হলে খেয়াল রাখতে হবে ১৯১৩-১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টে ৪৯টি উইকেট দখল করে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বোলার এস. এফ. বার্নেস যখন বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন তখন .টলরের গড় রান হয় ৫০'৮০। প্রথম টেস্টেই ডারবানে তিনি ১০৯ রান করেন। পরবর্তী সফরে ১৯২২-২৩-এ টেলর আবার ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে খেলেন। সেবারে পাঁচটি খেলায় তাঁর রানের গড় হয় ৬৪'৬৬ এবং এই সিরিজে জোহান্সবার্গের টেস্টে তাঁর সর্বাধিক টেস্ট স্কোর ১৭৫ রান সংগৃহীত হয়। ৫১টি টেস্ট খেলে টেলর মোট ২৯৩৬ রান করেন যার গড় হিসাব ৪০'৭৭। ১৯১৩ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত:উপর্যুপরি ১৮টি টেস্টে টেলর দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

নর্স, আর্থার ডাডলে (১৯০১—) ডানহাতি ব্যাটসম্যান, আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে খেলেন এবং পিতার চাইতে ব্যাটিংএ আরও বেশি সাফল্য লাভ করেন। টেস্ট ম্যাচে তাঁর মোট রান ২৯৬০, মিচেল ছাড়া অপর কোন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এত রান নেই। অবশ্য গড় রানে নর্স মিচেলের উপরে রয়েছেন। ১৯৪৭-এ ইংলণ্ড সফরে তিনি ছিলেন ব্যাটিং-এর শীর্ষস্থানে। পাঁচটি টেস্টে তাঁর রানের গড় ছিল ৬৯। নটিংহামে তাঁর সর্বাধিক রান ১৪৯। এটি ছিল তাঁর দ্বিতীয় ইংলণ্ড সফর। ১৯৩৫-এর সফরে টেস্টে তিনি খুব সফল হন নি। সেবারে কাউন্টি দলের বিরুদ্ধে বলা চলে অনেক রান করেছিলেন। পর পর তিনটি কাউন্টি ম্যাচে সেঞ্চুরিও করেছিলেন। ১৯৫১-র সফরে ব্যাটিং-এর গড়ে তিনি তিনি দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে নেমে যান। তাঁর রানের গড় হয় ৩৭'৬২। অবশ্য অনেকগুলি ম্যাচে সাহসী উজ্জ্বল ইনিংস খেলেন। ঐ ম্যাচে তিনি ২৩১ রান করেন। পরের বছরেই নাটালের পক্ষে ট্রান্সভালের বিরুদ্ধে ঐ মাঠে অপরাজিত ২৬০ রান করেন। ঐটি তাঁর সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান। ১৯৬৩ সালে তিনি যখন অবসর গ্রহণ করেন তখন কুরি কাপের খেলায় তাঁর রানের গড় ৬৫'৮৫। ঐ প্রতিযোগিতায়

ওটাই সর্বাধিক রেকর্ড গড়। এই প্রতিযোগিতায় একমাত্র তিনিই ৪৪৭৮ রান করবার গৌরব অর্জন করেছেন।

নর্স, আর্থার ডেভিড (**১৮৭৮—১৯৪৮**) দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁ-হাতি স্লো বোলার, বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান এবং শর্ট স্লিপের দুর্দান্ত ফিল্ডার, এক কথায় চৌখস ক্রিকেটার। জন্মসূত্রে ব্রিটিশ হলেও দঃ আফ্রিকার পক্ষে ৪৫টি টেস্ট খেলেছেন। তাঁর টেস্টে প্রথম আবির্ভাব ১৯০২-০৩-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। শেষবার টেস্ট খেলেছেন ইংলণ্ডের বিপক্ষে ১৯২৪ সালে। ১৮৯৫ সালে নাটালের পক্ষে ক্রিকেটের প্রথম শ্রেণীর আসরে প্রবেশ করার পর দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে ঐ খেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৫ সালে তাঁর ৫৭ বছর বয়সে ক্রিকেটের আসর থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯০২, ১৯১২ ও ১৯২৪ সালে ইংলণ্ড সফর করেন। দ্বিতীয় সফরে তাঁকে অলরাউণ্ডারের ভূমিকায় সবচেয়ে সফল হতে দেখা যায়। অবশ্য ৪৬ বছর বয়সে যখন শেষবার ইংলণ্ডে আসেন তখন তাঁর ব্যাটে বেশি রান ওঠে। ১৯১২ সালে হ্যামশায়ারের বিরুদ্ধে একটি খেলায় ২১৩ রানে অপরাজিত থাকেন। প্রথম উইকেট পতনের পর তিনি খেলতে আসেন এবং ৪৩২ রানের ইনিংসের শেষ পর্যন্ত খেলেন। ১৯১৯-২০ সালে নাটাল বনাম ট্রান্সভালের খেলায় তিনি অপরাজিত ৩০৪ রান করেন। এটিই তাঁর সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর। তবে ১৯০৫-০৬ সালের জোহান্সবার্গ টেস্টের ৯৩ (নট আউট) রানের মত আনন্দ বোধ হয় আর কোনও খেলায় পান নি কারণ ঐ ম্যাচেই দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম বারের মত ইংলণ্ড দলকে হারায়।

প্রোক্টর, মাইকেল জন (**১৯৪৬—**) দক্ষিণ আফ্রিকার একজন সফল অলরাউণ্ডার। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে টেস্ট খেলতে এসে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ২৭ রানে ৩টি ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৭১ রানে ৪টি উইকেট দখল করেন। টেস্টে তাঁর প্রথম শিকার ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আর. বি. সিম্পসন। মাত্র ৭টি টেস্টে তিনি ৪১টি উইকেট দখল করেন গড় ১৫·০২ রানের বিনিময়ে। টেস্ট ম্যাচ থেকে বাদ দেওয়া না হলে দক্ষিণ আফ্রিকার এই ফাস্ট বোলারটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কিছু রেকর্ড নিশ্চয় সৃষ্টি করতে পারতেন। তিনি লম্বা দৌড়ের পর বল করতেন এবং তাঁর বলের ডেলিভারি ছিল অস্বাভাবিক। আবার যখন ব্যাট করতেন তখন তাঁকে স্পিন বলের বিরুদ্ধে সেরা ব্যাটসম্যান বলা হত।

ফকনার, জর্জ আবরে (১৮৮১—১৯৩০) ইনিও একজন চমৎকার অলরাউণ্ডার। ব্যাট করতেন সুন্দর। স্লো মিডিয়াম পেস গুগলি বল করতেন, ফিল্ডিং করতেন নিখুঁত। পোর্ট এলিজাবেথে ফকনার জন্মেছিলেন, পরবর্তী কালে ইংলণ্ডের নাগরিক হন। এক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। মেলবোর্নে ১৯১০-১১ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০৪ রান করেন, তিনিই প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার যিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম দ্বিশতাধিক রান করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। ইংলণ্ডে বোলার হিসাবে তিনি বেশি সফল হন, ১৯০৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের সঙ্গে ইংলণ্ড সফর করেন। লীডস টেস্টে ৪টি মেডেন সহ মাত্র ১১ ওভারে ১৭ রানের বিনিময়ে ৬টি উইকেট দখল করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। সেই সিরিজে গড় ১৮·১৬ রানে তিনি ১২টি উইকেট তাঁর ঝুলিতে নিয়ে নেন। ১৯১২ সালের ত্রিদলীয় প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে একমাত্র তিনিই সেঞ্চুরি (নট আউট ১২২ রান) করেন। ম্যাঞ্চেস্টারে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর ঐ সাফল্য। সেই গ্রীষ্মে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ওভাল মাঠে অনুষ্ঠিত টেস্টে তিনি ৮৪ রানে ৭টি উইকেট দখল করেন। ১৯১২ সালের পরে ফকনার প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে খুব বেশি অংশ গ্রহণ করেন নি। আর একবার টেস্টের আসরে তাঁর ডাক পড়েছিল, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। মোট ২৫টি টেস্ট খেলায় তাঁর সাফল্যের খতিয়ান ১৭৫৪ রান (গড় ৪০·৭৯) ও ৮২ উইকেট (গড় ২৬·৫৮ রান)। ফকনার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে থেকে অবসর গ্রহণ করলেও ক্রিকেটকে তাঁর পেশা করে নিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি ক্রিকেট কোচ হিসাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

ভিলজোয়েন, কেনেথ জর্জ (১৯১০—১৯৭৪) দক্ষিণ আফ্রিকার এই ক্রিকেটারটির খেলোয়াড় জীবন ১৯২৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি গ্রীকুয়ালাণ্ড, ওরেঞ্জ ফ্রী টেস্ট ও ট্রান্সভালের পক্ষে খেলেছেন। ব্যাটিং-এ তাঁর রানের ছিল গড় ৫৯·০৬ কুরি কাপের খেলায়। মাত্র আধ ডজন ব্যাটসম্যানই এমন কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিং-এর স্বাক্ষর রেখেছেন ঐ প্রতিযোগিতায়। ভিলজোয়েন দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে ২৭টি টেস্টে অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯৩০ সালে জোহান্সবার্গে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন। শেষ টেস্ট খেলেন ১৯৪৯-এ পোর্ট এলিজাবেথের মাঠে—সে বারেও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। ১৯৪৭ সালের ইংলণ্ড সফরে ১৪৪১ রান করে ব্যাটিং-এ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সাসেক্স দলের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২০১ তাঁর খুবই উল্লেখযোগ্য স্কোর।

ভিলজোয়েন মাঝামাঝি সময়ে ব্যাট করতে আসতেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে সর্বোচ্চ রান ২১৫ করেন গ্রীকুয়াল্যাণ্ড ওয়েস্ট দলের পক্ষে। ১৯৩৫-এ ইংলণ্ডের বিপক্ষে ম্যানচেস্টার টেস্টে করেন ১২৪ রান। সেবারে তিনি ৩নং ব্যাটসম্যান হিসেবে মাঠে নামেন। খেলা থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি নানাভাবে খেলার জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের ম্যানেজার হিসাবে কয়েকবার বিদেশ সফর করেন। একবার দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিও নির্বাচিত হন।

মিচেল, ব্রুস (১৯০৯—) মিচেল দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনিং ব্যাটসম্যান এবং অন্যতম অলরাউণ্ডার। দীর্ঘদিন ধরে টেস্ট ক্রিকেট খেলেছেন। ১৯২৯-এ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলা শুরু করেছিলেন, শেষ খেলাও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৪৯ সালে। ১৯৪৩-এ ওভাল মাঠে পঞ্চম টেস্টে ১২০ ও অপরাজিত ১৮৯ রান করে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। ১৯৩০-৩০ সালে আই. জে. সিড্‌লের সহযোগিতায় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম উইকেটে ২৬০ রান করেন। এটি এখনও দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনিং জুটির রেকর্ড রান। মিচেল একজন স্লো বোলার। ১৯২৫-২৬এ তাঁর প্রথম ম্যাচে তাঁর দল ট্রান্সভালের পক্ষে খেলে বর্ডার দলের ১১টি উইকেট মাত্র ৯৫ রানের বিনিময়ে দখল করেন। ব্যাটিং-বোলিং ছাড়া ফিল্ডিং-এও তাঁর খ্যাতি ছিল। ১৯৩১-৩২-এ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্ন টেস্টে তিনি স্লিপ অঞ্চলে ফিল্ড করে ছটি ক্যাচ ধরেন, তার ভেতর দ্বিতীয় ইনিংসেই ৪টি। এটি আরেকজন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার ই. ই. ভোগলারের রেকর্ডের সমান। তিনি ১৯০৯-১০ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সমসংখ্যক ক্যাচ ধরেন।

ম্যাকগ্ল্যু, ডেরিক জন (১৯২৯—) ম্যাকগ্ল্যু দক্ষিণ আফ্রিকার নির্ভরশীল ওপেনার। ১৯৪৭-৪৮-এ প্রথম শ্রেণীর খেলা শুরু করেন এবং ১৯৫১-য় ইংলণ্ড সফরের জন্য জাতীয় দলে নির্বাচিত হন। তাঁর নির্বাচন দেশে খুব আলোড়ন সৃষ্টি করে। অবশ্য তিনি তাঁর যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করেন। গড় ব্যাটিং-এ তাঁর স্থান ছিল তিন নম্বরে। অবশ্য পরবর্তী সফরে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৯৫৫-র সে সফরে অপরাজিত ১০৪ এবং ১৩৩ রানের দুটি টেস্ট সেঞ্চুরি সহ পাঁচবার সর্বাধিক রান করেন। ম্যাকগ্ল্যুর রক্ষণভাগ ছিল দুর্ভেদ্য, ফলে রান আসত বড় ধীরে ধীরে। বেশি সময়ে সেঞ্চুরি করার রেকর্ডটি তাঁর। ঐ ম্যাচে ৫৪৫ মিনিটে তিনি শতরান পূর্ণ করেন। ১০৫ রান করতে সময়

লাগে ৫৭৫ মিনিট। ১৯৫২-৫৩-য় ওয়েলিংটনে একটি ইনিংসের আগাগোড়া খেলেন ৮-৩০ মিনিট ধরে এবং অপরাজিত ২৫৫ রান করেন; এটি তাঁর ব্যক্তিগত সর্বাধিক স্কোর।

রিচার্ডস, ব্যারি এণ্ডারসন (**১৯৪৫—**) হ্যামণ্ডের পরে ড্রাইভ মারের নিপুণ অধিকারী হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার এই খেলোয়াড়টির প্রতিষ্ঠা হয়। ইংলণ্ডে প্রথম কাউণ্টি ক্রিকেটে ১৯৬৮-তে খেলতে এসে মরসুমে ২৩৯৫ রান (গড় ৪৭·৯০) করেন তন্মধ্যে নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে ১৩০ ও ১০৪ (নট আউট) রানের দুটি ইনিংস ছিল। রানের গড়পড়তায় তিনিই শীর্ষস্থান অধিকার করেন। পরবর্তী বৎসরগুলিতেও তাঁর আসনটি হাতছাড়া হয় নি। ১৯৭৬ সালে হ্যাম্পশায়ারের পক্ষে সাতটি সেঞ্চুরি করেন। তার ভিতরে একটি ম্যাচেই দু ইনিংসে সেঞ্চুরি ছিল। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পার্থে ১৯৭০-৭১-এ তাঁর ৩৫৬ রান যুদ্ধোত্তর কালে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান। ১৯৬৩-৬৪-তে আর. বি. সিম্পসন নিউ সাউথ ওয়েলসের পক্ষে কুইন্সল্যাণ্ডের পক্ষে ৩৫৯ করেন।

রোয়ান, এরিক আলফ্রেড বুর্টাল (**১৯০৯—**) দক্ষিণ আফ্রিকা দলের গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসম্যান। নাটালের বিরুদ্ধে ট্রান্সভালের পক্ষে জোহান্সবার্গ মাঠে ১৯৩৯-৪০ সালে তিনি অপরাজিত ৩০৯ রান করেন—সেটা আজও দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যক্তিগত রানের সর্বোচ্চ স্কোর। ১৯৫০-৫১ সালে কুরি কাপের খেলায় তাঁর অপরাজিত ২৭৭ রানও আরেকটি রেকর্ড। ১৯২৯-৩০ সালে তিনি প্রথম ক্রিকেটের মাঠে নামেন এবং ১৯৩৫ সালে টেস্ট ক্রিকেট দলে নির্বাচিত হন। সেই বছরে ইংলণ্ড সফরে পাচটি টেস্টেই তিনি অংশ গ্রহণ করেন। টেস্টে খুব বেশি সফল না হলেও অন্যান্য ম্যাচে কৃতিত্বপূর্ণ ব্যাটিং করার গড় হিসাবে সফরের সবার উপরে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়। তিনি মোট রান করেন ১৯৪৮ (গড় ৪৪·২৭)। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৩৫-৩৬-এ তিনি টেস্টে অংশ গ্রহণের পর তাঁকে দল থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ড দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এলে আবার তাঁর ডাক পড়ে। তিনি দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৬ রান করে তাঁর অন্তর্ভুক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেন। যুদ্ধোত্তর কালে তিনি আরও ১৪টি টেস্ট খেলার সুযোগ পান। ১৯৫১ সালে সফরে পাচটি টেস্ট খেলে ব্যাটিং-এ আবার শীর্ষস্থান অধিকার করেন (গড় ৫৭·২২)। ঐ সফরে লীডস টেস্টে তাঁর অবিস্মরণীয় স্কোর ২৪৬ ও অপরাজিত ৬০ রান।

বিশ্ব-ক্রিকেটে অপ্রধান দেশসমূহ

স্কটল্যাণ্ড যদিও ১৭৮৫ সালেই স্কটল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলার রেকর্ড পাওয়া যায় তথাপি সেখানকার ক্রিকেটের মান আজও তত উন্নত নয়। স্কটিশ ক্রিকেট ইউনিয়ন গঠিত হয় ১৯০৮ সালে। অবশ্য ১৮৮৫ সাল থেকেই স্কটল্যাণ্ডের ক্রিকেটদল বিভিন্ন বিদেশী দলের বিপক্ষে বহুবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ করে। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিপক্ষে তারা নিয়মিত ক্রিকেট খেলে থাকে। স্কটল্যাণ্ডে বর্তমানে বেশ কিছু ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আয়ার্ল্যাণ্ড এ দেশেও ক্রিকেট খেলা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রধান শহরগুলিতে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ক্রিকেট ক্লাব। কয়েকটি ক্লাবের গায়ে শতাব্দীর ছোঁওয়াও লেগেছে। রেকর্ডে দেখা যায় যে ঐ দেশে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ডাবলিনের ফিনিক্স পার্কে ১৭৯২ সালে। আইরিশ ক্রিকেটদল ইংলণ্ড সফরও করে। তাঁদের প্রথম সফরটি ঘটে ১৮৭৯ সালে। পরে আরও কয়েকবার তারা বিদেশে সফর করে। লণ্ডনডেরিতে একটি ম্যাচে তারা ২৫ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ইনিংস খতম করে দেয়। আয়ার্ল্যাণ্ডে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে ক্রিকেট লীগের প্রবর্তন হয়েছে।

ওয়েলস ইংলণ্ডের মত ওয়েলসেও ক্রিকেট খেলার প্রচলন দীর্ঘদিনের। পূর্বে ইংলণ্ডের মাইনর কাউন্টি চাম্পিয়ানশিপে ওয়েলসের বিভিন্ন ক্রিকেটদল অংশ গ্রহণ করত, এখনও তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। নর্থ ওয়েলস ক্রিকেট এসোসিয়েশন ও দক্ষিণ ওয়েলস এসোসিয়েশনের পরিচালনায় ক্রিকেট লীগের নিয়মিত আয়োজন করা হয়ে থাকে।

আমেরিকা ১৭০৯ সালে ভার্জিনিয়ায় ক্রিকেটের মত এক ধরনের খেলা প্রচলিত ছিল। এবং আমেরিকা কানাডা দলের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় ১৮৪৪ সালে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের এটিই প্রথম খেলা ১৮৫৯ সালে ইংলণ্ড দল প্রথমবার উত্তর আমেরিকা সফরে আসে। অস্ট্রেলিয়া দল আসে ১৮৭৮ সালে। ১৮৮৪ সালে ফিলাডেলফিয়া থেকে একটি দল ইংলণ্ড সফরে যায়। ফিলাডেলফিয়ায় ক্রিকেট খেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে উন্নতমানের কিছু খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎ পাওয়া

যায়। জে. বি. কিং একজন উঁচু দরের ফাস্ট বোলার—ইংলণ্ড ও আমেরিকায় তিনি সাফল্যলাভ করেন। শিকাগো, নিউইয়র্ক, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতেও খেলাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯৬১ সালে আমেরিকায় ক্রিকেট এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৫ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সের সহযোগী সদস্য হিসাবে আমেরিকাকে মনোনীত করা হয়।

কানাডা আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে এ দেশে ক্রিকেট খেলার শুরু। গত শতাব্দীর ত্রিশের দশক থেকে কানাডায় স্বীকৃত ক্রিকেট ক্লাবের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮০ সালে কানাডা ক্রিকেট দল প্রথম ইংলণ্ড সফর করে, কিন্তু তার আগে বেশ কয়েকটি ইংলিশ ক্রিকেট টিম কানাডা সফর করে যায়। তবু মন্ট্রিল ও টোরাণ্টোতেই কিন্তু ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা সীমাবদ্ধ থাকে। ১৯৫৪ সালে কানাডা দল ইংলণ্ড সফর করে ও কতগুলি প্রথমশ্রেণীর ম্যাচে অংশ গ্রহণ করে। পঞ্চাশের দশক থেকে কানাডীয় ক্রিকেট এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে ও দেশের কয়েকটি ক্লাব ইংলণ্ড সফর করেছে। ১৯৬৮ সালে কানাডা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সে সহযোগী সদস্য হিসাবে যোগদান করেছে।

নেদারল্যাণ্ডস হল্যাণ্ডের মত ইয়োরোপের আর কোনও দেশে ক্রিকেটের এত প্রচলন নেই। অবশ্য ইংলণ্ডের কথা স্বতন্ত্র। গত শতকের মাঝামাঝি নেদারল্যাণ্ডে ক্রিকেট খেলার সূত্রপাত হয়। নেদারল্যাণ্ড ক্রিকেট বণ্ড (পরবর্তী কালে রয়্যাল) গঠিত হয় ১৮৮৩ সালে। ১৮৮৯ সালে ইংলণ্ড থেকে প্রথম কোচ আমদানি করা হয় ক্রিকেট শিক্ষণের উদ্দেশ্যে। ১৮৯২ সালে ডাচ ক্রিকেটদল ইংলণ্ড সফরে যায়। বিশিষ্ট ইংলিশ ক্রিকেট টিম এম. সি. সি. ও ফ্রি ফরেস্টার্স হল্যাণ্ড সফর করে। নেদারল্যাণ্ডে এখন ক্রিকেট বেশ জনপ্রিয় খেলা। প্রতি শনি ও রবিবারের ক্রিকেটে ২৫০-এর অধিক দল অংশ গ্রহণ করে।

ডেনমার্ক হল্যাণ্ডের পর ইয়োরোপে ক্রিকেট-প্রেমী দেশ হিসেবে ডেনমার্কের নাম মনে আসে। ১৮৬৬ সালে ও দেশে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট খেলার খবর পাওয়া যায়। পরে অনেক ক্রিকেট দল গড়ে ওঠে। ১৯২২ সালে এম. সি সি. ডেনমার্ক সফর করে। ১৯২৬ সালে ডেনমার্ক থেকে প্রথম দল জেন্টলমেন অব ডেনমার্ক ইংলণ্ড সফরে যায়। ডেনমার্ক একাদশ বনাম হল্যাণ্ড একাদশের খেলা হয় ১৯৪৭ সালে। দু'দেশের মধ্যে এখন নিয়মিত ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৫৩ সালে ডেনমার্ক ক্রিকেট ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৯৬৬ সালে নেদারল্যাণ্ডের মত ডেনমার্কও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহযোগী সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়েছে।

ফিজি দ্বীপপুঞ্জ ১৮৭০ সাল থেকে ঐ দেশে খালি-পায়ে ক্রিকেট খেলা শুরু হয়। ১৮৯৫ সালে ফিজি থেকে একটি ক্রিকেট দল নিউজিল্যাণ্ড সফরে যায়। ১৯৪৬ সালে ফিজি ক্রিকেট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ফিজি থেকে মাঝে মাঝে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে ক্রিকেট দল পাঠানো হয়ে থাকে। ফিজির ক্রিকেটের মান এখনও উন্নত নয়। বিদেশী দলও মাঝে মাঝে ফিজিতে খেলতে এসেছে।

আর্জেন্টিনা ক্রিকেট দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে আর্জেন্টিনায় সবচেয়ে বেশি পরিচিত। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাঝে এই দেশে ক্রিকেট খেলার বিস্তৃতি ঘটেছে। ১৯১১-১২ সালে প্রথম এম.সি.সি. দল এদেশ সফরে আসে। আর্জেন্টিনা ক্রিকেট এসোসিয়েশন গঠিত হয় ১৯১৩ সালে। অবশ্য বিভিন্ন নামে এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৯৯ সাল থেকেই সক্রিয় ছিল। ব্রেজিল, ফিজি প্রভৃতি দেশের সঙ্গে নিয়মিত 'ক্রিকেট-যুদ্ধ' চলে আসছে। ১৯৩২ সালে যে দক্ষিণ আমেরিকান দল ইংলণ্ড সফরে যায় সেই দলে আর্জেন্টিনার অনেক খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বারমুডা ১৮৪০ সাল থেকেই বারমুডায় ক্রিকেট খেলার প্রচলন হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পূর্বকালে ফিলাডেলফিয়ার সঙ্গে নিয়মিত ক্রিকেট খেলা হত। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দলও বারমুডা সফর করেছে। ১৯৬০ সাল থেকে বারমুডা ক্রিকেট দলও ইংলণ্ডে খেলতে গেছে। ১৯৬৬ সাল থেকে বারমুডা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সের সহযোগী সদস্য।

হংকং হংকং-এর প্রথম ক্রিকেট সংগঠন হংকং ক্রিকেট ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫১ সালে। তারপর থেকেই ওখানে ক্রিকেট খেলা চলে আসছে। ১৮৬৬ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত সাংহাই ও অন্যান্য পোতাশ্রয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে আসছে। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড দলও হংকংএ ক্রিকেট খেলে গেছে। হংকং ১৯৬৯ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সের সহযোগী সদস্য।

সিঙ্গাপুর বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এদেশে ক্রিকেট খেলা প্রচলন হয়। হংকং, সাংহাইয়ের সঙ্গে নিয়মিত খেলা হত। তৎকালীন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর লোকেরাই উৎসাহ নিয়ে এই সকল অঞ্চলে ক্রিকেটের সূত্রপাত

করেন। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণীর দল এখানে খেলে গেছে। ১৯৪৮ সালে সিঙ্গাপুরে ক্রিকেট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। তবে এই খেলা কিছু ক্রীড়ামোদীর মধ্যে এখনও সীমাবদ্ধ রয়েছে।

শ্রীলঙ্কা কলম্বো ক্রিকেট ক্লাব গঠিত হয় ১৮৩২ সালে। এটিও ব্রিটিশ সৈন্যদলের অবদান। স্কুলে-কলেজে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে নানা অঞ্চলে ক্রিকেট ক্লাব তৈরি হল। আইভো ব্লিগের দল ১৮৮২ সালে সিংহলে খেলে চলে যাবার পর থেকে অস্ট্রেলিয়া-গামী ইংলণ্ড দল বহুবার সিংহলে খেলে গেছে। সিংহল থেকেও ভারতবর্ষে ক্রিকেট দল পাঠানো হয়েছে। ১৯২২ সাল থেকে সিংহলে ঐ খেলার সুষ্ঠু পরিচালনভার ন্যস্ত হয়েছে সিংহল ক্রিকেট এসোসিয়েশন বোর্ড অব কন্ট্রোলের হাতে। ১৯৬৫ সালে সিংহল (শ্রীলঙ্কা) আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সের সহযোগী সদস্য মনোনীত হয়েছে। ১৯৭৯-এ শ্রীলঙ্কা বিশ্ব ক্রিকেট কাপের খেলায় অংশ নিয়ে ভারতীয় দলকে পরাজিত করে বিস্ময় উৎপাদন করেছে।

পূর্ব আফ্রিকা প্রথম যুদ্ধোত্তর কালে কেনিয়া, টাঙ্গানাইকা, উগাণ্ডার মধ্যে প্রথম ক্রিকেট খেলার সূত্রপাত হয়। ক্রমে পূর্ব-আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলেও ক্রিকেট খেলা শুরু হয়। নাইরোবিতে কেনিয়া কঙ্গোনিজ একটি প্রভাবশালী দল। ঐ দেশের প্রতিযোগিতা হয় অফিসার দল, স্থানীয় দল, ইউরোপীয়ান দল, এশিয়ান দল ইত্যাদিদের মধ্যে। ১৯৫১ সালে কেনিয়া ও টাঙ্গানাইকার মধ্যে প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। সে সময়েই পূর্ব-আফ্রিকার ক্রিকেট কনফারেন্স গঠিত হয়। ১৯৬৬ সালে পূর্ব আফ্রিকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কনফারেন্সের সহযোগী সদস্য হিসেবে যোগদান করে।

পশ্চিম আফ্রিকা যদিও নাইজিরিয়া, ঘানা, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে খেলা হচ্ছে তবু ক্রিকেট পশ্চিম আফ্রিকায় যথাযথ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। দক্ষিণ নাইজিরিয়া ১৯০৪ সালে ক্রিকেট খেললেও সেখানকার খেলার মান কিছুতেই উন্নত হতে পারে নি ফলে বিদেশী দলও কখনও পশ্চিম আফ্রিকা সফরে উৎসাহবোধ করে নি।

মহিলা ক্রিকেট

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই বর্তমানে মহিলাদের ক্রিকেটের প্রচলন হয়েছে। কয়েকটি দেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে টেস্ট ম্যাচও খেলছে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে এই খেলা তত বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি বরং ক্রিকেট ম্যাচে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ইংলণ্ডের মত দেশেও সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়েছিল। তবু এই খেলার প্রসার মহিলাদের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘটছিল। মহিলাদের ক্রিকেটের প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যতদূর জানা যায়, ১৭৪৫ সালের ২৯শে জুলাই। ইংলণ্ডে গিল্ডফোর্ডের নিকটে গসডেন কমনে ঐ খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী দল দুটি ছিল ব্রাসলি কুমারী একাদশ ও হ্যামব্লেডন কুমারী একাদশ। ঐ খেলায় হ্যামব্লেডন কুমারী একাদশ আট উইকেটে জয়লাভ করেছিল। উভয় পক্ষের ফিরতি খেলা হয়েছিল এগারো দিন পরে।

১৭৪৭ সালে মহিলাদের খেলা আরও প্রতিষ্ঠিত হল। তৎকালীন বিখ্যাত আর্টিলারি ময়দানে নিয়মিত মহিলা-ক্রিকেটের আসর বসতে লাগল। অবশ্য উচ্ছৃঙ্খল দর্শকের হামলায় একবার খেলা পণ্ড হয়েছিল এবং কয়েকজন খেলোয়াড় আহত হয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও মহিলা ক্রিকেটের আকর্ষণ দিনে দিনে বাড়তে লাগল। আঠারো শতকের শেষ দিকে নতুন নতুন মুখের দেখা পাওয়া যেতে লাগল। সম্ভবত ১৮১১ সালের ৩রা অক্টোবর মহিলাদের প্রথম কাউন্টি ক্রিকেট ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়। মিডলসেক্সের নিউইংটনে সারে বনাম হ্যাম্পশায়ারের ঐ খেলাটি তিনদিন চলার পরে মীমাংসা হয় এবং হ্যাম্পশায়ার দল ৫০০ গিনির পুরস্কারটি জিতে নেয়।

মহিলাদের প্রথম স্বীকৃত ক্রিকেট ক্লাব হোয়াইট হীদার ক্লাব স্থাপিত হয় ১৮৮৭ সালে। সেই ক্লাবটি দীর্ঘজীবী হয়েছিল। তবে যখন মহিলা ক্রিকেট আন্দোলন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তখন ১৯৫৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে মহিলাদের ক্রিকেট এসোসিয়েশন গঠিত হল। ততদিনে পুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতার ছত্রছায়াটুকুর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। মহিলারা ক্রিকেটের মাঠে নিজেদের কৃতিত্বের যথার্থ পরিচয় রাখতে শুরু

করেছেন। তাঁরা পুরুষদের মতই দক্ষতা দেখাচ্ছেন, ক্রীড়ামোদীরা এ কথা স্বীকার করলেন। মহিলা ক্রিকেট বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করল। নবগঠিত এসোসিয়েশনের পরিচালনায় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রথম খেলাটি অনুষ্ঠিত হল বেকেনহামে ১৯২৯-এর জুলাই মাসে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল লণ্ডন ও জেলা একাদশ বনাম অবশিষ্ট ইংলণ্ড একাদশ। ১৯৩৩-এ মহিলা ক্রিকেট আরও ব্যাপকতা লাভ করল। ঐ বছরে ইংলণ্ড একাদশ বনাম অবশিষ্ট দলের খেলা হল লিসেস্টার কাউন্টি মাঠে; ঐ দুটি দল আবার মিলিত হল ওল্ড ট্রাফোর্ডের রণাঙ্গনে। ঐ বছরই একটি মহিলা ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

এই শতাব্দীর শুরু থেকে অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেটের সূত্রপাত হয়। ১৯০৫ সালে ভিক্টোরিয়ার উইমেন ক্রিকেট এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হল। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন (১৯১৪-১৯) অস্থিরতায় সেই প্রতিষ্ঠানটি লুপ্ত হয়ে যায়। বিশের দশকে পুনরায় ক্রিকেটের আসরে প্রাণচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হল। উইমেন ক্রিকেট এসোসিয়েশন পুনর্গঠিত হয় ১৯৩১ সালে।

নিউজিল্যাণ্ডের মহিলারা ক্রিকেটের আসরে প্রথম আবির্ভূত হন ১৮৮৬ সালে নেলসনের মাঠে। নিউজিল্যাণ্ড মহিলা সমিতি গঠিত হয় ১৯৩৪-এ।

তিনদিনের টেস্ট ম্যাচ প্রথম খেলা হয় ১৯৩৪-৩৫-এ. ইংলণ্ড দলের সফর কালে। ব্রিসবেন ও সিডনিতে অনুষ্ঠিত প্রথম দুটি টেস্টে ইংলণ্ড দল জয়লাভ করে। মেলবোর্নের তৃতীয় টেস্টম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

পরবর্তী কালে ইংলণ্ডের মহিলা ক্রিকেট এসোসিয়েশনটি, এম. সি. সি. পর্যায়ে উন্নীত হয়। তখন তারা আন্তর্জাতিক সফরের আয়োজন করতে থাকে। দেশে দেশে নিয়মিত সফর শুরু হয়ে যায়। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এমনকি ভারতও আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেটের আসরে সামিল হয়। যে যে দেশে পুরুষদের মধ্যে ক্রিকেট খেলার প্রচলন ছিল তার প্রতিটিতেই মহিলা ক্রিকেট জাঁকিয়ে বসে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মহিলা ক্রিকেট দল গঠিত হল. ১৯৫২-য়. জ্যামাইকায়, ১৯৬৬-তে ত্রিনিদাদ ও টোবাগোয় ১৯৬৮ সালে।

দক্ষিণ আফ্রিকার মহিলা ক্রিকেট দল বিদেশ সফরে ইংলণ্ডে যায় ১৯৬০-৬১ সালে। সে সফরে তারা মোট চারটি টেস্ট খেলেছিল। ইংলণ্ডদল জ্যামাইকায় গেল ১৯৭০-এ। ১৯৭১-এ গেল বারমুডা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। অস্ট্রেলিয়া ও

নিউজিল্যাণ্ডে তারা ইতিমধ্যেই কয়েকটি সফর শেষ করেছে ১৯৪৮-৪৯, ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৬৮-৬৯-এ। অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দলও টুরে গেছে ইংলণ্ডে ও অন্যান্য দেশ।

১৯৭৩ সালে মহিলা ক্রিকেটে বিশ্বকাপের আয়োজন হল ইংলণ্ডে। সেই দল ছাড়াও ঐ প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জ্যামাইকা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো। ইংলণ্ড সেবারে বিশ্বকাপ জিতে নিয়েছিল।

ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে মহিলা দল প্রথম খেলেছিল ১৯৩৪ সালে। ওভাল মাঠে তাদের পদার্পণ ঘটল ১৯৩৫-এ। আর লর্ডস মাঠে ইংলণ্ড দল অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হল ১৯৭৬ সালের অগস্ট মাসে একদিনের একটি খেলায়।

১৯৪৯ সালে এম. সি. সি.র ক্রিকেট অনুসন্ধান কমিটিতে উইমেন ক্রিকেট এসোসিয়েশনের দু'জন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হল অর্থাৎ মহিলা ক্রিকেট আন্দোলন প্রকৃত মর্যাদায় ভূষিত হল। মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে এই ঘটনাটির তাৎপর্য অসীম। ১৯৫৮ সালে আন্তর্জাতিক মহিলা ক্রিকেট পর্ষদ গঠিত হল। পারস্পরিক মত বিনিময় এবং আলাপ-আলোচনার ভিত্তিভূমি রচিত হল।

মহিলাদের ক্রিকেটে অংশ গ্রহণ এখনও অপেশাদারী পর্যায়ে রয়েছে এবং এই নিষেধটি কঠোরভাবে মান্য করা হচ্ছে।

ভারতবর্ষেও ষাটের দশকের গোড়ার দিক থেকে মহিলা ক্রিকেটের আসর বসছে এবং ক্রমেই ঐ খেলা জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের খেলোয়াড়েরাও ঐ খেলায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করছে। আন্তঃ-রাজ্য প্রতিযোগিতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছে। বিদেশী দলও ভারত সফর করে গেছে, ভারতীয় দলও বিদেশ সফর করেছে।

মহিলাদের টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের কৃতিত্ব ইংলণ্ডে দলের বেটি স্নোবলের। তিনি ১৯৩৫ সালে নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে ক্রাইস্টচার্চে ১৮৯ রান করেন, ইংলণ্ডের ম্যারী ডুগান প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরি (অপরাজিত ১০১ রান) করেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৬৩ সালের ওভাল টেস্টে তাঁর শতরান পূর্ণ হয়। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রথম দ্বিশত রানের অধিকারী অস্ট্রেলিয়ার প্যাট হোমস। অস্ট্রেলিয়া দলের আরেকজন খেলোয়াড় বেটি উইলসন মহিলা টেস্টে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৮ সালের মেলবোর্ন টেস্টে তিনি অনুরূপ কৃতিত্ব দেখান।

বিশ্বকাপ (প্রুডেনশিয়াল কাপ)

১৯৭৫ সালে প্রথম এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ইংলণ্ডে। প্রতি চার বছর পর পর এ প্রতিযোগিতা হবার কথা। সে-অনুযায়ী ১৯৭৯ সালেও ইংল্যাণ্ডে এ প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল।

খেলার নিয়ম: নক-আউট প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগী দল দুটি প্রত্যেকে ৬০ ওভার করে খেলার সুযোগ পাবে। প্রতি ওভার হবে ছ'বলের। সাধারণত একদিনের মধ্যে খেলা সমাপ্ত হতে হবে। অবশ্য আবহাওয়া খারাপ হলে খেলা সবশুদ্ধ তিনদিন চলতে পারে। তাতেও উভয় দলের ৬০ ওভার শেষ না হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ওভার-সংখ্যা কমানো যেতে পারে তবে কোন অবস্থাতেই খেলা ৩০ ওভারের কম হলে চলবে না।

খেলার সময়সীমা: বেলা ১১'০০ মি থেকে ৭'৩০ মি পর্যন্ত। লর্ডস মাঠে অবশ্য খেলা হয় ১০'৪৫ মি থেকে ৭'১৫ মি পর্যন্ত। তৃতীয় দিনের ৫'০০ মি-এর সময়ের মধ্যে শেষ করতে হয়। আম্পায়ারদের ইচ্ছানুযায়ী ফল মীমাংসার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে অতিরিক্ত সময় খেলানো হতে পারে।

বিরতি: মধ্যাহ্ন-ভোজন ১'১৫ মি থেকে ১'৫৫ মি পর্যন্ত। উভয় ইনিংসের মধ্যে ১০ মিনিটের বিরতি গ্রাহ্য। ৪'৩০ মিনিটের সময় ২০ মিনিটের জন্য চা-পানের বিরতি। অথবা দ্বিতীয় দলের ২৫ ওভার খেলার পরেও বিরতি হতে পারে।

ওভার-সীমা: কোন বোলার এক ইনিংসে ১২ ওভারের বেশি বল করতে পারবেন না। সময়সীমা কোন কারণে কমে গেলে অর্থাৎ সমগ্র খেলার ওভার-সংখ্যা যদি কমে যায় তবে সে অনুপাতে একজন বোলারের বল করবার ওভার-সংখ্যা কমবে।

ওয়াইড বল: বোলার ইচ্ছে করে নেতিবাচক বল করলে অথবা ওয়াইড বল করলে আম্পায়ারগণ কঠোর হতে পারবেন।

পয়েন্ট বণ্টন: বিজয়ী হলে কোন দল ৪ পয়েন্ট পাবে। ফল অমীমাংসিত থাকলে উভয়দল ২ পয়েন্ট করে পাবে। সেমি-ফাইনালে প্রতিযোগী দল

দুটির সংগৃহীত পয়েণ্ট যদি সমান হয় তাহলে যে-দল আগেকার খেলাগুলোর মধ্যে বেশিবার জিতেছে সে দল ফাইনালে উঠার সুযোগ পাবে। তাতেও যদি দেখা যায় উভয় দল তুল্যমূল্য তখন যে-দল অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে রান করেছে সে-দল ফাইনালে উঠবে।

টাই হলে যে দল কম উইকেট হারিয়েছে তারা বিজয়ী বলে সাব্যস্ত হবে। উভয় দলের সকলে আউট হলে যে দল অপেক্ষাকৃত দ্রুত রান তুলেছে তারা বিজয়ী হবে। তাতেও যদি উভয় দল তুল্যমূল্য হয় তাহলে শেষ ৩০ ওভার বা ২০ ওভার বা ১০ ওভারে রান যারা অপেক্ষাকৃত দ্রুত তুলবে তারা বিজয়ী বলে পরিগণিত হবে।

অসমাপ্ত খেলা: তিনদিন পরও খেলা অসমাপ্ত থাকলে যে-দল তাদের ইনিংসে প্রতি ওভারে দ্রুত রান তুলেছে তারা বিজয়ী হবে। অবশ্য সেক্ষেত্রে যে-দল পরে ব্যাটিং করছে তাদের কমপক্ষে আগে ৩০ ওভার খেলা চাই। যদি কোন গ্রুপ ম্যাচে পরবর্তী ব্যাটিং দল ৩০ ওভার খেলার সুযোগ না পায় তাহলে ম্যাচটি 'অসমাপ্ত' বলে ঘোষিত হবে। কোন সেমি-ফাইনাল খেলা যদি তিনদিনের পরেও অমীমাংসিত থাকে তাহলে তার পূর্ববর্তী খেলাগুলোতে যারা অপেক্ষাকৃত দ্রুত রান করেছে তারা বিজয়ী বলে পরিগণিত হবে। অবশ্য তাতে আলোচ্য সেমি-ফাইনাল ম্যাচটিকে ধরা হবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত নিয়মগুলো নির্ধারিত হয়েছে ১৯৭৯ সালের প্রতিযোগিতার জন্য।

প্রতিযোগিতার পুরস্কার: নির্ধারিত ওভারের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রবর্তন ১৯৭৫ সালে। দ্য প্রুডেনশিয়াল অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড (The Prudential Assurance Co. Ltd) ছিলেন এর উদ্যোক্তা। উদ্যোক্তাগণ এ খেলায় উপার্জন করেছিলেন ২০০০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৩৬ লক্ষ টাকা)। প্রতিযোগী আটটি দেশের প্রত্যেককে ১৫,০০০ পাউণ্ড (প্রায় ২,৭০০০০ টাকা) দেওয়া হয়েছিল।

১৯৭৫ সালের চ্যাম্পিয়ন দলকে দেওয়া হয়েছিল একটি রূপোর কাপ এবং ৪০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৭২০০০ টাকা)। ১৯৭৯ সালে দেওয়া হয়েছে ১০০০০ পাউণ্ড (প্রায় ১৮০০০০ টাকা)। রানার্স আপ দল পেয়েছিলেন ১৯৭৫ সালে ২০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৩৬০০০ টাকা), ১৯৭৯ সালে ৪০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৭২০০০ টাকা)।

সেমি-ফাইনালে পরাজিত দল দুটি পেয়েছিলেন ১৯৭৫ সালে ১০০০ পাউণ্ড (প্রায় ১৮০০০ টাকা), ১৯৭৯ সালে ২০০০ পাউণ্ড (প্রায় ৩৬০০০ টাকা)।

প্রতি গ্রুপের বিজয়ী দলকে ১৯৭৯ সালে দেওয়া হয়েছে ৫০০ পাউণ্ড (প্রায় ৯০০০ টাকা)।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার : গ্রুপের প্রতি খেলায় ১৯৭৫ সালে ৫০ পাউণ্ড (প্রায় ৯০০ টাকা) করে। ১৯৭৯ সালে ১০০ পাউণ্ড (প্রায় ১৯০০ টাকা) করে।

সেমি-ফাইনালে ১৯৭৫ সালে ১০০ পাউণ্ড (১৮০০ টাকা) করে, ১৮৭৯ সালে ১০০ পাউণ্ড (৩৬০০ টাকা) করে।

ফাইনালে : ১৯৭৫ সালে ২০০ পাউণ্ড (৩৬০০ টাকা) করে ১৯৭৯ সালে ৩০০ পাউণ্ড (৫৪০০ টাকা) করে।

এ ছাড়াও অন্যান্য পুরস্কার ছিল।

বিশ্বকাপ (প্রুডেনশিয়াল কাপ)—১৯৭৫

ফলাফল ঃ একনজরে

তারিখ	বিজয়ী	বিজিত	ফল	স্থান	ম্যান অব দ্য ম্যাচ
জুন ৭	ইংল্যাণ্ড	ভারত	২০২ রানে বিজয়ী	লর্ডস	ডেনিস অ্যামিস (ইংল্যাণ্ড)
জুন ৭	নিউজিল্যাণ্ড	পূর্ব আফ্রিকা	১৮১ রানে বিজয়ী	এজবাস্টন	গ্লেন টার্নার (নিউজিল্যাণ্ড)
জুন ৭	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	শ্রীলঙ্কা	৯ উইকেটে বিজয়ী	ওল্ড ট্র্যাফোর্ড	বার্নার্ড জুলিয়েন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)
জুন ৭	অস্ট্রেলিয়া	পাকিস্তান	৭৩ রানে বিজয়ী	হেডিংলে	ডেনিস লিলি (অস্ট্রেলিয়া)
জুন ১১	ভারত	পূর্ব আফ্রিকা	১০ উইকেটে বিজয়ী	হেডিংলে	ফারুক ইঞ্জিনিয়ার (ভারত)
জুন ১১	ইংল্যাণ্ড	নিউজিল্যাণ্ড	৮০ রানে বিজয়ী	ট্রেন্ট ব্রিজ	কিথ ফ্লেচার (ইংল্যাণ্ড)
জুন ১১	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	পাকিস্তান	১ উইকেটে বিজয়ী	এজবাস্টন	সরফরাজ নওয়াজ (পাকিস্তান)
জুন ১১	অস্ট্রেলিয়া	শ্রীলঙ্কা	৫২ রানে বিজয়ী	ওভাল	অ্যালান টার্নার (অস্ট্রেলিয়া)
জুন ১৪	নিউজিল্যাণ্ড	ভারত	৪ উইকেটে বিজয়ী	ওল্ড ট্রাফোর্ড	গ্লেন টার্নার (অস্ট্রেলিয়া)
জুন ১৪	ইংল্যাণ্ড	পূর্ব আফ্রিকা	১৯৬ রানে বিজয়ী	এজবাস্টন	জন স্নো (ইংল্যাণ্ড)
জুন ১৪	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া	৭ উইকেটে বিজয়ী	ওভাল	আলভিন কালিচরণ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)
জুন ১৪	পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা	৪ উইকেটে বিজয়ী	ট্রেন্ট ব্রিজ	জাহির আব্বাস (পাকিস্তান)
জুন ১৮	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যাণ্ড	৪ উইকেটে বিজয়ী	হেডিংলে	গ্যারী গিলমোর (অস্ট্রেলিয়া)
জুন ১৮	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	নিউজিল্যাণ্ড	৫ উইকেটে বিজয়ী	ওভাল	আলভিন কালিচরণ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)
জুন ২১	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া	১৭ রানে বিজয়ী	লর্ডস্	ক্লাইভ লয়েড (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)

দলের সর্বোচ্চ স্কোর : ৩৩৪ (৪ উইকেটে) ইংল্যাণ্ড : ভারতের বিরুদ্ধে (লর্ডস্)

দলের সর্বনিম্ন স্কোর : ৮৬ শ্রীলঙ্কা : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে (ওল্ড ট্র্যাফোর্ড)

ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ স্কোর : ১৭১ নট আউট গ্লেন টার্নার (নিউজিল্যাণ্ড) : পূর্ব আফ্রিকার বিরুদ্ধে

সেরা বোলিং ঃ ১৪ রানে ৬ উইকেট গ্যারী গিলমোর (অস্ট্রেলিয়া) : ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে (হেডিংলে)

বিশেষ প্রবন্ধ

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

রাখাল ভট্টাচার্য (আরবি)

দুনিয়ার সবচেয়ে মহান খেলা, ইংরেজ জীবনে ভব্যতা ও সহবতের প্রতীক ক্রিকেট যুদ্ধোত্তর যুগে বিশ্বময় ছড়িয়ে তার জাত খুইয়েছে অন্যান্য দেশের রুচি ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুপ্রবেশের ফলে। একথা বলতে চাই না যে অন্যান্য জাতির ছোঁয়াচ লেগে ক্রিকেট চরিত্রের অধঃপতন হয়েছে, তবে ইংরেজ শুচিতা কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। যুদ্ধোত্তর যুগে ক্রিকেটের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে ইংরেজ নিজে। সাম্রাজ্য বিলোপের ফলে তাদের ক্রিকেটেরও ম্যাজেস্টি নষ্ট হয়েছে। সাবধানে ও হিসেব করে চতুরতা দিয়ে জাতির মানমর্যাদা রক্ষার যে প্রয়াস তাতে সাম্রাজ্যবিহীন দ্বীপরাজ্য ব্রিটেনের বর্তমান চরিত্র প্রভাবিত করেছে। সেই একই মনোভাব তাদের ক্রিকেটের কলজেকেও করে দিয়েছে দুর্বল; সাবধানী পদক্ষেপে যার অগ্রগতিতে সে যুগের মহত্ত্ব, বীরত্ব ও সাহসের চিহ্নটুকু খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাছাড়াও আজকের রাজনীতি-সর্বস্ব মনোভাবে ক্রিকেটকেও করা হচ্ছে রাজনীতির হাতিয়ার। খেলায় জেতা-হারাকে সমগ্র জাতির মর্যাদা-অমর্যাদার সঙ্গে এক করে দেখা হচ্ছে এবং ক্রিকেটকেও জাতীয় রাজনৈতিক মর্যাদার অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। যার ফলে ক্রিকেটের নিজস্ব মর্যাদা আজ আর নেই বললেই চলে।

ক্রিকেট যখন এই বিষময় পরিবেশে ধুঁকছে তখন অন্যসব বিচার-বিবেচনা তুচ্ছ করে ক্রিকেটকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে যে একজন ক্রিকেটসেবক প্রাণপণ প্রয়াস পেয়েছেন, ক্রিকেট দেবতার বেদীমূলে সেই সর্বশেষ ভক্তিপ্রাণ পূজারী ফ্র্যাঙ্ক ওরেল।

ওরেল যখন ক্রিকেট খেলতে শুরু করেন তখন পর্যন্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বীপভূমিতে সংখ্যাধিক কৃষ্ণাঙ্গ মানুষগুলোর পরিচয় ছিল শ্বেতাঙ্গ আবাদী মালিকদের মুক্ত ক্রীতদাস বংশধর। লীয়ারি কনস্টেনটাইন ও জর্জ হিড্‌লে ওদেশের শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত ক্রিকেটে সর্বপ্রথম কৃষ্ণাঙ্গদের ক্রিকেট দক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করেন। হিড্‌লে, কনস্টেনটাইন এমন কি তাঁদের উত্তরসূরি

এভারটন, উইকস ও ক্লাইভ ওয়ালকট এই কয়জন প্রথম শ্রেণীর কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটারের ক্রীড়াশৈলীতে ঐ দেশের বন্য সমারোহের প্রবল প্রাণশক্তি প্রকাশ পায়। ওয়ালকট ও ওরেল জুড়িতে যখন পাঁচশর ওপর রান করে দুনিয়াকে হকচকিয়ে দেন, তখন পর্যন্ত বয়ঃকনিষ্ঠ ওরেল মূলত হিড্‌লে, কন্‌স্টেনটাইনের ধারাই বহন করে চলেছেন। তবে ইংরেজ সমালোচকেরা স্বীকার করেছেন যে ওরেলের খেলার সূক্ষ্ম সুকুমার পদ্ধতি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্যান্য প্রধান কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটারদের খেলার ধারা থেকে স্বতন্ত্র।

১৯৫০-৫১তে যখন ওরেল সর্বপ্রথম ভারতে আসেন তখন তিনি লণ্ডনে অপটিক্স-এর ছাত্র; যৌবনের সর্বাঙ্গীন উদ্দামতায় ভরপুর। কিন্তু তাঁর মনটি যে খোলামেলায় ভরপুর ছিল তার আদ্য নামের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে তা এদেশের সকলেই অনুভব করেছিলেন।

খেলোয়াড় হিসেবে ওরেলের ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং সকলেরই প্রশংসা অর্জন করেছিল। ভারতে এসে ক্রিকেটে যে নূতন ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন তা অধিনায়ক হিসেবে। সেই সেবারকার কমনওয়েলথ দলের মূল অধিনায়ক ছিলেন লেসলি এমস্। কিন্তু প্রবীণ অধিনায়ক অনেক ক্ষেত্রেই এমন কি কয়েকটি বেসরকারী টেস্টেও দল পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তরুণ সহ-অধিনায়ক ওরেলের ওপর। সেই সুযোগেই ওরেল তাঁর দিলখোলা খেলার ধরনকে অধিনায়কতার দায়িত্ব-বোধে মণ্ডিত করলেন। সেবার তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটিং দেখবার ও উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেটের তিন প্রাণকেন্দ্র কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে বহুদূরে কানপুরের মানুষ (২২২ নট আউট)। অন্যান্য জায়গায় তাঁর খেলার দক্ষতা হয়ত বিশেষ প্রকাশ পায়নি কিন্তু যেটুকু সুযোগ হয়েছিল, তারই মধ্যে তিনি প্রকাশ করেছিলেন ক্রিকেট সম্পর্কে তাঁর মনোভাব। বর্তমান লেখকের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, একজন ক্রিকেটারের প্রধান ও মৌলিক দায়িত্ব হ'ল ক্রিকেটের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং তার নীতি ও মর্যাদাকে উচ্চে তুলে ধরা। দেশপ্রেম বা ঐ ধরনের অন্য কোন মহৎ মনোভাবের বেদীমূলে ক্রিকেটের নীতি ও মর্যাদাকে বলি দেওয়া একজন ক্রিকেটারের পক্ষে মহাপাপ। দুনিয়া জুড়ে নানা অজুহাতে যেভাবে ক্রিকেটকে ধর্ষণ ও তার ওপর বলাৎকার চলছে তাতে পরম বেদনা প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

তখনও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের সাংগঠনিক ও খেলার মাঠের নেতৃত্ব শ্বেতাঙ্গ কবলিত; ওরেল দলের অন্যান্য দশজনের মত একজন খেলোয়াড়। মাঠের ভেতরে ও বাইরে নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করেন অধিনায়ক, কৌশল প্রয়োগের নির্দেশও দেন তিনি; যা মেনে চলতে হয় দলের সকলকে এবং ওরেলকেও তা মেনে চলতে হয়েছে। কিন্তু সে দলে সাবধানী ক্রিকেটের সঙ্গে কূট বর্ণকৌশল যথেষ্ট প্রয়োগ করা হয়েছে বলে মনে হয় না। আর যদি করা হয়েও থাকে ব্যক্তিগতভাবে ওরেল ছিলেন উর্ধ্বে এমন কথা আমরা জেনেছি ওরেলের একান্ত শিষ্য সোবার্স-এর কাছ থেকে।

১৯৬১ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অস্ট্রেলিয়া সফরে ওরেল যখন কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে সর্বপ্রথম দায়িত্ব পেলেন অধিনায়কতার, সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্-ব্যবহার করলেন তিনি ক্রিকেটকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা দেবার আপ্রাণ প্রয়াস করে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে ততদিনে কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়েরাই সংখ্যাধিক। ওরেলের নেতৃত্বেই তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম দেখা গেল নিরেট দলগত সংহতি এবং প্রবল দায়িত্ববোধ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটে এটি ওরেলের সবশ্রেষ্ঠ দান বলে স্বীকৃতি পেল।

ততদিনে ক্রিকেটে আক্রমণের অস্ত্র হিসেবে বাম্পার প্রধান বলে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রবল শক্তি বাম্পার প্রয়োগে অস্ট্রেলিয়া ভীতিগ্রস্ত এবং তাদের সংযত রাখতে ওরেলের আপ্রাণ প্রয়াসকে অস্ট্রেলিয়ানরা শ্রদ্ধার চোখেই দেখেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ানরা যখন বাম্পার ছেড়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্য স্বদলের ব্যাটস্‌ম্যানেরা যখন প্রণোদিত করেছে তখন ওরেলের মনোভাব ছিল তাদের আইনগত অস্ত্রপ্রয়োগে প্রতিবাদ ক্রিকেট নীতি-বিরোধী।

সমগ্র ক্রিকেটের গৌরবময় ইতিহাসে সেবারকার অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সিরিজ অনন্য বলে স্বীকৃত এবং তার মূলেও ছিল ওরেলের মনোভাব। মহান গেম ক্রিকেটকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে খেলাই হল ক্রিকেটের নৈতিক ভিত্তি। কোন কূটনীতি, কোন কৌরবসুলভ রণকৌশল প্রয়োগের প্রয়াস অনুচিত— এই ছিল ওরেলের দৃষ্টিভঙ্গি। ওরেল নিজে স্বীকার করেছেন এ বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ানদের অধিনায়ক রিচি বেনো তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। ফলে প্রতিটি খেলা হয়েছিল প্রাণবন্ত, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা ধেয়ে প্রতি-দিনের খেলা প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের ক্রিকেট চরিত্র প্রকাশে উজ্জ্বল ছিল।

একটি খেলা টেস্ট ম্যাচের একমাত্র টাই টেস্ট হিসেবে যেটি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে সেটিও সম্ভব হয়েছিল ঐ মনোভাবের ফলে। সোজা পথে নীতিসঙ্গত খেলায় জিতবার আপ্রাণ সংকল্প নিয়ে, পরাজয় এড়াবার ভয়ে ছলনা, চাতুরি বা কূটকৌশল প্রয়োগের কথা চিন্তা করেনি কোন পক্ষ। শেষ পর্যন্ত হেরেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ঐ সিরিজে বিজয়ীর পুরস্কার নবপ্রবর্তিত ওরেল ট্রফি ওরেল স্বহস্তে তুলে দিয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বী রিচি বেনোর হাতে।

পরাজিত অধিনায়ক যখন অস্ট্রেলিয়া ছেড়েছিলেন পথের দুধারে কাতারে কাতারে জনসাধারণ যে অভিনন্দন তাকে জানিয়েছিল তা কোনো বিজয়ী অধিনায়ক পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। ব্রিটিশ সম্রাট বা তাঁর কোনো প্রতিভূ অস্ট্রেলিয়া সফরে এসে এত অভিনন্দন পাননি—এমন মন্তব্যও ঘোষিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ান সংবাদপত্রে।

মানুষ হিসেবে ওরেলের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তার তুলনা ক্রিকেটের জগতের বাইরেও দুর্লভ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গিয়ে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নরি কণ্ট্রাকটার যখন বাম্পার বল লেগে মাথায় আঘাত পান ওরেল তখন খেলোয়াড় নন, কিন্তু সেই দুর্ঘটনার জন্য তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন। আহত কণ্ট্রাকটারের চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তদানের জন্য তিনিই এগিয়ে গিয়েছিলেন সবার আগে। জামাইকা থেকে অপারেশনের জন্য সার্জেন আনাতে ভর্তি প্লেন থেকে যে কোন যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে ডাক্তারকে জায়গা করে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি এবং তার জন্য সরকারী বিমান প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বলেছিলেন, আপনি পাঠিয়ে দিন ডাক্তারকে, সব দায়িত্ব আমার, প্রধানমন্ত্রীকে আমিই বলব। কিন্তু এখন সঙ্কটমুহূর্তে বিচারের সময় নেই। সার্জেন ঠিকমত এসে পৌঁছে সময়মতো অপারেশন না করলে হয়ত চূড়ান্ত বিপদ ঘটত। সেই সফরে পরাজিত ভারতীয় দল যখন বিমানবন্দর থেকে শেষ বিদায় নেয়, বিমানটি আকাশে অদৃশ্য হতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ওরেল। এমন ঘটনাও ক্রিকেট ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

ক্রিকেটার ওরেল পরবর্তী কালে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে শিক্ষাবিদ্ হয়েছিলেন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন। সেই সুবাদেই ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আমন্ত্রণে ভারত সফর করেছিলেন তিনি। ১৯৬৭র নববর্ষের দিনে তিনি কলকাতায় পৌঁছেছিলেন, আর সেদিনই ইডেন গার্ডেনে ভারতের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ দাউ দাউ

করে জ্বলছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক, ম্যানেজার ও অন্যান্য সকলের দৃঢ় মনোভাব, পোড়া খেলা আর পুনরুজ্জীবিত হবে না। বেরি সর্বাধিকারী অনুরোধ করলেন ওরেলকে নিভৃতে, সঙ্গোপনে। ওরেল বললেন, আমি ত দলের কেউ নই, ক্রিকেট বোর্ডেও আমার স্থান নেই, আমি এই ব্যাপারে নাক গলাতে ও প্রভাব খাটাতে গেলে সবাই ক্ষুণ্ণ হবে। ছোট্ট দুটি কথা, কিন্তু ক্রিকেট সম্পর্কে তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য! এই বলে চলে এলেন বেরি। একদিন বাদে খেলাটি শুরু হ'ল, কোনোরকম শর্ত আরোপ না করে, নববর্ষের দিনে দুর্ঘটনার কোনো উল্লেখ না করে। ওরেল সেখানে উপস্থিত, সারাদিন হাসিখুশি মনে খেলা দেখলেন। হোটেল থেকে খবর পাওয়া গিয়েছিল. ওরেল ১লা জানুয়ারির সারারাত ঘুমোননি, তাঁকে দালানে পায়চারি করতে দেখা গিয়েছিল। বেরি সর্বাধিকারীকে ওরেল অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তোমার সঙ্গে আমার এই ম্যাচ সম্পর্কে যা কিছু কথা হয়েছে আমি বেঁচে থাকতে তা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়।

ভারতের টেস্ট ক্রিকেট আজও স্বগৌরবে জীবন্ত। কিন্তু ঐ ঘটনার তিন মাস পার হতে না হতে ওরেলের মৃত্যু ঘটে. তারপরেই বেরি সর্বাধিকারী প্রকাশ করে দেন কোন্ মহামুনির ক্রিকেটের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঞ্জীবনী মন্ত্রে ভারতের মৃত টেস্ট ক্রিকেট পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল।

ওরেল দার্শনিক, ওরেল কবি, ওরেল হয়ত যোগীও বটে। সোবার্স লিখেছেন. টস্ করবার আগেই টসের ফলাফল বলে দিতেন ওরেল. কদাচ তা ভুল হ'ত। কোনও ব্যাটস্‌ম্যান মাঠে নামবার সময় ওরেল বলে দিতেন সে কেমন খেলবে। সেই ভবিষ্যৎবাণীও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য হয়েছে।

বর্তমান লেখকের সঙ্গে ওরেলের প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৫০-এর জানুয়ারি মাসে। ৫ই জানুয়ারি হোটেলে তাঁর ঘরে এই লেখকের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাংলার অফস্পিন বোলার নীরোদ (পুঁটু) চৌধুরী। আরবির ওরেলের সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাৎ ১৯৬৭, ৩রা জানুয়ারি। ইতিমধ্যে তরুণ ওরেল বিশ্ব-বন্দিত স্যার ফ্র্যাঙ্ক ওরেল হয়েছেন। লক্ষ লক্ষ লোকের অভিনন্দন ও বন্দনা পেয়েছেন আর সেই সতের বছরের ব্যবধানে আরবির চেহারাও গিয়েছে বদলে। অথচ প্রথম দর্শনে আরবি আত্মপরিচয় না দিতেই ওরেল প্রশ্ন করলেন, ভাল কথা,সেই যে সেবারে তোমার সঙ্গে বাংলার অফ্ স্পিন বোলার এসেছিল, তার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না—তার খবর কি? বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল আরবি।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে এসে ওরেল যেদিন রবীন্দ্রভারতীতে যান সেদিন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঘরে তিনি পুষ্পস্তবক দেন, তারপর যান সংগ্রহশালা দেখতে। আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ পড়াচ্ছেন—সেই ছবিটির সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। উপাচার্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করে মুক্ত আকাশের নিচে ও গাছের ছায়ায় শিক্ষাদানের নীতি ও দর্শন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হলেন।

আর কী কী দেখলেন, কী কী করলেন তা কেউ নথিবদ্ধ করে রাখেনি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যে উইলটি পাওয়া গেল সেই অনুযায়ী তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আবিষ্কার করা গেল রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ। যার বিষয়বস্তু ছিল, মৃত্যু– মৃত্যুই যে জীবনের শেষ নয়. আত্মার অনন্ত যাত্রায় একটি পর্যায়েব শেসে ক্ষণেক বিরতিমাত্র। মৃত্যুর তিনমাস আগে কোলকাতা সফরের সময় কেউই অনুমান করেনি বা ভাবেনি মৃত্যু ওরেলের এত কাছে। তবু মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিচারটুকুই তাঁর মনে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল কেন? এই প্রশ্নের জবাবেই ওরেলের দার্শনিক মানসিকতা সম্পর্কে আমাদের নিশ্চিত বোধ জাগে।

ওরেল এ যুগের বেনিয়া ক্রিকেটকে শুদ্ধি করে তাকে তার আদি ব্রাহ্মণ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াসে ব্যর্থ হয়েছেন। বৈশ্য যুগের প্রবলপ্র ভাব তাঁর শত প্রয়াস সত্ত্বেও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবু বিশ্ব ক্রিকেটের বিরাট পটভূমিকায় ফ্র্যাঙ্ক ওরেল ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক ও সেবকরূপে প্রোজ্জ্বল মহিমায় বিরাজ করবেন চিরদিন। তার চেয়েও বড় কথা ক্রিকেটার ওরেলের চেয়েও অনেক বড় ছিলেন মানুষ ওরেল।

মানবতাবাদী অন্যান্য কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের মত ওরেল কিন্তু তাঁর পূর্ব-পুরুষদের মাতৃভূমি আফ্রিকা সম্বন্ধে কোন আবেগ বোধ করতেন না। পল রোবসন্ বলতেন আফ্রিকাই তাঁর দেশ। ওরেল কিন্তু তাঁকে আফ্রিকান বললে ক্ষুণ্ণ হতেন। ওরেল নিজেকে পরিচয় দিতেন 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ম্যান' বলে. 'ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান' নয়।

সি. কে. নায়ুডু

সৈয়দ মুস্তাক আলি

আমার দীর্ঘ জীবনে সারা দুনিয়ায় যে সব দিকপাল ক্রিকেটার বীরদর্পে ও চোখ-ধাঁধানো মহিমায় বিচরণ করেছেন তাঁদের মধ্যে ডন ব্র্যাডম্যানকে আমি খেলতে দেখিনি আর গারফিল্ড সোবার্স-এর সঙ্গে আমি খেলিনি। এরা দুজন ছাড়া আমার যুগের ক্রিকেটের রথী-মহারথী হবস্, সাটক্লিফ, মেকার্টনি, রাইডার, টেট্, ভোস্, অ্যালেন, জার্ডিন, ভেরিটি, হ্যামণ্ড, হ্যাসেট, মিলার, কনস্ট্যান্টাইন, হিড্‌লে, গডার্ড, স্টোলমেয়ার, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-এর তিন ডব্লু উইক্‌স্, ওয়ালকট, ওরেল—এঁদের সকলের সঙ্গে খেলবার সুযোগ আমার হয়েছে। তবুও আমি নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করব আমার অভিজ্ঞতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার সি. কে. নায়ুডু।

আমার ক্রিকেটের উপনয়ন তার হাতেই হয়েছিল বলে নয়, তারই অধিনায়কতায় আমি আমার দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে অধিকাংশ সময় খেলেছি বলেও নয়, ব্যাটিং-এ, বোলিং-এ, ফিল্ডিং-এ, অধিনায়কতায়, ব্যক্তিত্বে, চরিত্রে যেসব বহুগুণের সমাবেশ তার মধ্যে দেখেছি, তার তুলনা আমি কোথাও খুঁজে পাইনি।

রেকর্ড কেতাবে তার জমার হিসেবে কি আছে সেটা নিয়েও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই, রেকর্ডবইও স্কোরবোর্ডের অনুরূপ ভারবাহী গর্দভ মাত্র। তাছাড়া টেস্ট খেলবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি, ক্রিকেট হিসেবে যাকে যৌবন বলা যায় তা পার হয়ে। ভারতীয় ক্রিকেটের টেস্ট যুগ ও প্রাক্-টেস্ট যুগ, যাকে বলা যায় প্রাক্ ঐতিহাসিককাল, এই দুই যুগ জুড়ে নায়ুডুর ক্রিকেট-জীবন। প্রাক্-টেস্ট যুগে ভারতের প্রধানতম প্রতি-যোগিতা, বোম্বের কোয়াড্রাঙ্গুলার (চতুর্দলীয়) প্রতিযোগিতাতে নায়ুডুর খেলোয়াড় জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে। সেখানে অতিমানবের মত বীরদর্পে বিচরণ করেছেন তিনি।

ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথম সরকারী বিদেশ সফরে (১৯৩২) নায়ুডুই ছিলেন দলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রবীণ ও অভিজ্ঞ। সেখানে তাঁকে অধি-নায়ক করা হয়নি তখনকার ইংরেজ-পরিচালিত ব্যবস্থায়। কারণ সেই

ব্যবস্থামত সাধারণ ভারতীয় মাত্রই ভেড়ার পাল ; তাঁদের রাখালীর দায়িত্ব কোন ইংরেজ তাঁবেদার বা কোনো সামন্তপ্রভুর হাতে না দিলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছিলেন নায়ুড়ু। ইংল্যাণ্ডের তখনকার শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যান ন্যাটা খেলোয়াড় ফ্র্যাঙ্ক উলি ; নায়ুডু সেখানে অভিহিত হলেন ডান-হাতি উলি বলে। ক্রিকেটের মক্কা-বারানসী লর্ডস মাঠে প্রথম আবির্ভাবে নায়ুডু করলেন ১১৮ রান (ভারতীয় দলের মোট রান হয়েছিল ২২৮) আর বিপক্ষ এম. সি. সি. দলকে দুশো রানে নামিয়ে দিতে তিনি মাত্র ৩১ রানের বিনিময়ে চারজনকে আউট করেছিলেন। এরপর নায়ুডুর নাম এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল, রান যাই উঠুক না কেন, তার বীরত্বব্যঞ্জক ব্যাটিং দেখবার জন্য দলে দলে ছুটল ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট-পাগলেরা। ইংল্যাণ্ডে এই সময় ভারতের প্রথম দুটি সফরে (১৯৩২ ও ১৯৩৬) এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন নায়ুডু যে সেখানকার সমালোচকদের এবং সংবাদপত্রের মন্তব্য হ'ল : 'একই দিনে যদি ইংল্যাণ্ডের দুই ভিন্ন মাঠে নায়ুডু ও ব্র্যাডম্যান খেলতে থাকেন, নায়ুডুর খেলা দেখতেই লোক জমবে বেশি।' উইস্‌ডেন নায়ুডুকে সে বছরের (১৯৩২) পাঁচজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটারদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। আমার কাছে তার গুরুত্ব খুব বেশি নয়।

দুই সামন্ত, অধিনায়কও সহ-অধিনায়ক দুজনেরই সুবুদ্ধি হয়েছিল নিজেদের টেস্ট ম্যাচ খেলবার অযোগ্যতা সম্পর্কে অবহিত হবার, তাই নায়ুডুই অধিকার পেয়েছিলেন ভারতে সবপ্রথম টেস্টম্যাচে ইংল্যাণ্ড-এর মাটিতে দলের অধিনায়কতা করবার। নায়ুডুর তাতে মর্যাদা কতখানি বেড়েছিল সে প্রশ্ন গৌণ। টেস্ট ক্রিকেটের যাত্রা শুরু করতে নায়ুডুকে নেতা হিসেবে পাওয়াতে ভারতীয় ক্রিকেটেরই মর্যাদা সূচিত হয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস।

নায়ুডু দোহাত্তা মার মারতেন। একটি ইনিংসে ইংল্যাণ্ডে তখনকার (১৯২৫-১৯২৬) সেরা বোলারদের বিরুদ্ধে তার এগারটি ছয় এবং তেরটি চারের মার দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল ক্রিকেট জগৎ। কিন্তু নায়ুডুকে কেউ কখনো আনাড়ি পিটিয়ে ব'লে মনে করতে পারেনি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অসম্ভব দ্রুত পদচালনা ও সঠিক ব্যাটচালনার ফলে কোন বোলিংকেই তাঁর সমীহ করে চলতে হ'ত না। ক্যাচ ওঠার ভয়ে ব্র্যাড্‌ম্যান যেভাবে সব সময় মাটি কেটে বল পাঠাতেন সে বাতিকও ছিল না নায়ুডুর। তিনি বলতেন মাঠে মাত্র ন-জন ফিল্ডার (বোলার ও উইকেটকিপার বাদে),

কাজেই সব ফিল্ডারের নাগালের বাইরে দিয়ে উঁচু মারে বল বাউণ্ডারিতে পাঠানোর ফাঁকা জায়গা থাকে অঢেল। অথচ দোহাত্তা মারে বোলার এবং ফিল্ডারদের মনোবল গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া যায়।

এযুগের মতো উদ্দেশ্যমূলক বাম্পার দেওয়া সে যুগের রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু বাম্পার হোক্ বা না হোক্ ক্রিকেট মাঠে এমন ব্যক্তিত্ব আর কারো ছিল কি না সন্দেহ। বল লেগে কখনও আহত হননি এমন নয়, কিন্তু আঘাত পেলেই ব্যাট ছেড়ে দিয়ে বসে যেতে হবে এই মানসিকতাকে তীব্র ধিক্কার দিতেন তিনি। বল লেগে একটা দাঁত ছিটকে খসে পড়ে গেছে এমনও ঘটেছে নায়ুডুর জীবনে। অ্যাম্বুলেন্সের লোক ঔষধ, তুলা, ব্যাণ্ডেজ নিয়ে ছুটেছে মাঠের মধ্যে, তীব্র ইঙ্গিতে নায়ুডু তাদের বেরিয়ে যেতে বলেছেন। মুখের মধ্যে রুমাল চেপে দিয়ে ব্যাটিং চালিয়ে গেছেন সমান তেজে, এতটুকু সময় অপচয় না করে।

পেণ্টাঙ্গুলার (পঞ্চদলীয়) প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা প্রচণ্ড শক্তি-শালী হিন্দু দলের বিরুদ্ধে মুসলিম দলের। ব্যাটিং করতে গিয়ে আমার আঙুলের হাড় চিড়ে গেছে। এক্সরে-তে তা আবিষ্কার করে আঙুল প্লাস্টার করে দিয়েছিল ডাক্তার এবং ফিল্ডিং ও ব্যাটিং করতে বারণ করেছিলেন তিনি, যার ফলে আমাকে অবসর নিতে হয়েছিল।

চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করছে মুসলিম দল, আমি আহত ও অবসৃত, তবু দলগত সংহতির জোরে ধীর অথচ স্থির পদক্ষেপে মুসলিম দল এগিয়ে চলেছে জয়ের দিকে। লক্ষ্যে পৌঁছবার আগেই দলের সবার পতন হতে পারে এমন আশঙ্কাও রয়েছে। আমি প্যাভিলিয়ানে বসে খেলা দেখছি দুরু দুরু বুকে, শেষ পর্যন্ত জিততে পারব কি? বিশেষ করে আমি দলনেতা নিজে অক্ষম, ব্যাট করতে পারব না।

দর্শক হিসেবে প্যাভিলিয়ানে উপস্থিত সি. কে. নায়ুডু তাঁর স্বভাব-সুলভ ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন আমার দিকে। বললেন, মুস্তাক তুমি নামছ ব্যাটিং করতে? আমি তাঁকে প্লাস্টার করা আঙুল দেখাতে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে বললেন, তোমার দল জয়লাভের এত কাছাকাছি এসেছে, তুমি ব্যাটিং না করলে হয়ত জয়লাভ নাও হতে পারে, তার বদলে ঘটবে পরাজয়। এ অবস্থায় নিজের আঙুলের কথা চিন্তা করে কি বসে থাকবে তুমি? আমি তাঁকে বললাম, দেখা যাক্ কী হয়। আরও দুটো উইকেট

পড়ল, নির্ভরযোগ্য ব্যাটস্‌ম্যান আর কেউ নেই। নায়ুডু এবারে তিরস্কার করলেন আমাকে; এখনও কি তুমি ভেবে দেখবে? ব্যাট করতে তোমাকে যেতেই হবে। চাপ দিয়েই তিনি আমাকে প্যাড পরালেন, সেনাপতি যেমন সাধারণ সৈনিককে নির্দ্বিধায় যাওয়ার হুকুম দেন সেইমত এক সঙ্কট মুহূর্তে ব্যাট হাতে প্যাভিলিয়ান থেকে বেরিয়ে মাঠে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি। একহাতে ব্যাটিং করে বেশি রান আমি করতে পারিনি কিন্তু যে-কটি রান আমি যোগ করেছিলাম এবং যোগ হতে সাহায্য করেছিলাম তাতে তরণী অনেকখানি বিজয় রাজ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছেও গিয়েছিল। গম্ভীর হাসি হেসে সি. কে. বললেন, বলিনি আমি!

মার-মার খেলা নায়ুডু খেলতেন বটে কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কিভাবে মারের প্রবণতা এড়িয়ে উইকেট বাঁচিয়ে চলতে হয় তাতেও নায়ুডু ছিলেন যারপরনাই সচেতন। ১৯৩৩ ডিসেম্বরে ভারতের মাটিতে প্রথম টেস্ট খেলা। বোম্বাই-এর সেই খেলায় প্রথম আবির্ভাবে শতাধিক রান করে রাতারাতি জাতীয় বীর বলে প্রতিভাত হলেন অমরনাথ। কিন্তু তার সঙ্গে জুড়িতে খেলে আক্রমণের সবটুকু বিষ নীলকণ্ঠের মত গ্রহণ করলেন নায়ুডু এবং অমরনাথকে দিলেন মেরে খেলবার সুযোগ।

বাংলার সঙ্গে হোলকার খেলছেন ইডেন গার্ডেনে রন্‌জি ট্রফির প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে। প্রথম ইনিংসে হোলকার দল সামান্য রানে এগিয়ে থাকলেও দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলা দল রানের পাহাড় জমা করেছে। হোলকার দ্বিতীয় ইনিংসে যেভাবে খেলছে তাতে বাংলার মোট রানসংখ্যা অতিক্রম করা কোনমতেই সম্ভব নয়। হোলকারের শেষ ব্যাটসম্যান যখন মাঠে নামল তখনও তারা অনেক রানে পিছিয়ে আছে কিন্তু এক ঘণ্টার ওপর বাকী সময়টুকু টিকে থাকতে পারলে প্রথম ইনিংসের জোরে জিতে যায় হোলকার। আমি জানি শেষ জুড়ি হীরালাল গাইকোয়াড় এবং ধানোয়াড়-এর পক্ষে বাংলার তীব্র আক্রমণ ও নিরন্ধ্র ফিল্ডিং-এর বিরুদ্ধে এতক্ষণ টিকে থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়। অধিনায়ক নায়ুড়ু তাদের কী মন্ত্র দিলেন আমার জানা ছিল না। আমরা হেরে যাব এই স্থির বিশ্বাসে হোটেলে ফিরে গিয়ে নিরাশ হয়ে শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, ঘুম ভাঙতেই জানতে চাইলাম কত রানে হেরেছে আমাদের দল। কিন্তু যা জানলাম তা বিশ্বাস করতে আমার বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। শুনলাম গাইকোয়াড় ও ধানোয়াড় মাটি

কামড়ে দিবাবসান করে দিয়েছে, যার ফলে জিতেছে হোলকার প্রথম ইনিংসের ভিত্তিতে।

এরকম সংকট এড়িয়ে জয়লাভ ক্রিকেট ইতিহাসে বেশি ঘটেনি এবং এই জয়লাভ সম্ভব হয়েছিল সি. কে. নায়ুডুর নেতৃত্বের ফলে। বাম্পারের মোকাবিলা কি করে করতে হয় এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলতেন, মেরে সটান মাঠ পার করে দেবে। আর স্পিন খেলার কৌশল সম্পর্কেও তাঁর সহজ নির্দেশ ছিল, পিটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে, বলকে স্পিন্ নিতেই দেবে না।

সি কে নায়ুডু সাধারণ ঘরের ছেলে, খেলা শিখবার কোন জন্মগত বা বংশগত সুযোগ তিনি পাননি অথচ সহজাত মনীষার বলে ক্রিকেটের সব দিকে অসাধারণ উৎকর্ষ অর্জন করেছিলেন তিনি। বোলিং-এ তিনি অসাধারণ বুদ্ধি খাটাতেন, লেংথ ও ডিরেকশন খুশিমত নিয়ন্ত্রণ করবার তাঁর ছিল অসাধারণ দক্ষতা, যার জোরে ছটি বল ছাড়তেন ছ রকম করে। কভার ফিল্ডিং-এ তিনি প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, সেখান দিয়ে মেরে বল বাইরে পাঠান অনেকেরই পক্ষে সম্ভব হ'ত না।

অন্ধ্রজাতিসুলভ দীর্ঘ, সুঠাম, সবল দেহ, মৃদুভাষী অথচ প্রতিটি বক্তব্যে ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট। হাঁটায়, চলায়, দাঁড়ানোয়, বাহু ও অঙ্গুলি চালনে, নির্দেশদানে অনির্বচনীয় নেতৃত্বের মহিমা, যে মহিমাটি প্রকাশ হয় ইংরেজী শব্দ Majesty (মেজেস্টি) দিয়ে। শৃঙ্খলা রক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তিনি, strict disciplinarian. ঢিলেঢালা ভাব বিশেষ করে খেলার মাঠে। তিনি প্রত্যেককে তার ত্রুটি বুঝিয়ে দিতেন, সংশোধন করবার পথ বাতলিয়ে দিতেন আর সম্ভাবনাময় তরুণ খেলোয়াড়কে সম্ভাবনা বিকাশে প্রাণপণ সাহায্য করতেন। চরিত্রেও তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপ্রবণ।

ক্রিকেট ছাড়াও হকি খেলায় এবং অ্যাথলেটিক্স-এ তিনি সুদক্ষ ছিলেন। প্রথম অলিম্পিক হকি দল নির্বাচনের সময় তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয়েছিল, তবে নির্বাচিত হননি। ছ-ফুট হাইজাম্প করেছেন সেযুগে।

এই ছিলেন সি. কে. নায়ুডু। এক অসাধারণ মানুষ অতিমানবীয় মহিমায় প্রোজ্জ্বল। আমার সৌভাগ্য আমি তাঁর সুনজরে পড়েছিলাম একেবারে কৈশোরে এবং জীবনে যা কিছু করেছি এবং শিখেছি সবই তাঁর স্নেহে ও অনুগ্রহে লালিত হয়ে।

---

* মূল ইংরেজী থেকে আরবি কর্তৃক অনূদিত। আরবি জানাচ্ছেন, নামটিকে নায়ুডু বলে উচ্চারণ করতে সি. কে. তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

রণজিৎ সিংজী

শৈলশেখর মিত্র

দেশের লোকেরা বলতো রণজয়ী সিংহ—সাগর পারের লোকেরা বলতো রানগেট সিং। বলবেই তো—কে. এস. রণজিৎ সিংজীকে ওই নামেই তো বেশি মানায়। পরিচয় বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

এক সময় ক্রিকেটের জনক ডব্লিউ জি গ্রেসের পরিচয়ের চেয়ে তাঁরই স্বদেশে যে বিদেশীর পরিচয় বেশি গ্রেসফুল হয়ে উঠেছিল—সেই তো রণজয়ী সিংহ—ক্রিকেটের রান যোগাড় করার আসরে সেই তো রানগেট সিং।

বার্থ রাইটে রণজী ছিলেন ভারতীয় যুবরাজ; ক্রিকেটের দুনিয়াতে মেরিট-এ ছিলেন ব্ল্যাক প্রিন্স।

রণজীর ভারতীয় রক্তে ভানুমতীর খেল আর ভোজবাজীর ভেল্কি দেখানোর সহজাত প্রবৃত্তি বিদেশের হাজার হাজার দর্শককে এক সময় সম্মোহিত করেছে। দলে দলে দর্শক ছুটেছে খোলা-মেলা মেঠো পরিবেশে রণজির ব্যাটের জাদু দেখতে। ঘোরানো কব্জির চমক আর প্রচণ্ড মারের দমক দেখে তারা অবাক বিস্ময়ে ভেবেছে এর চেয়ে মেঠো পরিবেশে ভারতীয় দড়ির জাদু কী বেশি বিস্ময়কর!

দৌড়তে দৌড়তে ফাস্ট বোলার মাপা লেংথে লেগ স্টাম্পের ওপর গুগলির মতো বল ফেলে দেখেন—রণজি পেছিয়ে গেছেন—ব্যাটে বলে তখনো মোলাকাৎ হয়নি—এ বলে ব্যাট ছোঁয়ানোর সময় রণজি আর কখনোই পাবেন না—তাই রণজিকে ঠকিয়ে দেবার সাফল্যে বোলার আম্পায়ারের দিকে ঘুরে গলা ফাটিয়ে হা-উ-জ বলে চিৎকার করে দেখেন আম্পায়ার বাউণ্ডারির নির্দেশ দিচ্ছেন।

আনন্দে আত্মহারা বোলার ভুলেই গেছলেন যে রণজির বাজপাখি-চোখ অন্যদের অনেক আগে বল দেখে—বলের গতিবিধি শেষ পর্যন্ত বিচার করে নিয়ে অন্য ক্রিকেটারের অনেক পরে রণজি বল মারেন। তাই রণজির

সেই নয়নাভিরাম গ্ল্যান্স আম্পায়ারের দিকে মুখ ফেরানো বোলার আর অ্যাট-এ-গ্ল্যান্স দেখতে পেলেন না। স্ক্রিনের ধার ঘেঁষে ছুটে যাওয়া সেই বলের দিকে চেয়ে দর্শকদের সঙ্গে ফিল্ডাররাও ভাবতে থাকেন এও কী সম্ভব!

এই অসম্ভবকে সম্ভব করা খেলোয়াড় রণজি ছিলেন নওনগরের জামসাহেবের দত্তকপুত্র। সিংহাসনের ব্যাপারে তাঁর প্রাণনাশের সম্ভাবনা দেখা দিলে, চক্রান্তকারীদের নাগালের বাইরে রাখার জন্য তাঁকে কৈশোরে ইংল্যাণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইংল্যাণ্ডেই রণজির ক্রিকেটে হাতেখড়ি এবং ইংল্যাণ্ডেই তা পূর্ণ বিকশিত হয়েছে।

রণজির প্রতিভা সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট-পণ্ডিতদের দৃষ্টি প্রথম থেকেই সচেতন ছিল এরং অল্পদিন পরেই রণজির প্রতিভাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করা হয়েছিল।

নওনগরের মহারাজা জামসাহেব রণজিৎ সিংজী (১৮৭২—১৯৩৩) কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি এবং সাসেক্স-এর খেলোয়াড় ছিলেন। কেম্ব্রিজে আসার আগে ক্রিকেট সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল খুবই অল্প, পরে কেম্ব্রিজে থাকতে থাকতেই অসাধারণ খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন। ১৮৯০ খ্রী ব্যাটিং-এ বহু রেকর্ড করেন। ১৮৯৯ খ্রী তিনিই প্রথম ব্যাটসম্যান যিনি এক মরসুমে ৩০০০ রান পূর্ণ করেন। ১৮৯৬ খ্রী ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে তিনি একই দিনের খেলায় দু বার সেঞ্চুরি করেন। ১৮৯৯-১৯০৩ খ্রী পর্যন্ত সাসেক্স-এর অধিনায়ক হন। অস্ট্রেলিয়াতে গিয়েও তিনি অস্ট্রেলিয়ানদের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করেন।

রণজি প্রথম ভারতীয় টেস্ট খেলোয়াড়। তিনি টেস্ট খেলেছিলেন ইংল্যাণ্ডের হয়ে। এবং প্রথম টেস্টেই দুর্লভ সেঞ্চুরির স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য রণজির পর আরো দু'জন ভারতীয় ইংল্যাণ্ডের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় প্রথম আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করেছিলেন। একজন হলেন রণজীর ভ্রাতুষ্পুত্র কে. এম দলীপসিংজী এবং অপরজন হলেন পতৌদির নবাব ইফতিকার আলি (নবাব মনসুর আলি খানের পিতা)।

রণজির জীবনে তাঁর প্রথম টেস্ট খেলা বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। তাই রণজি সম্পর্কে লিখতে হলে সেই টেস্ট ম্যাচেরও কিছু বিবরণ আবশ্যক হয়ে পড়ে।

রণজির জীবনে প্রথম টেস্টে তাঁর দল ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়ার কাছে

পরাজিত হলেও রণজি কিন্তু সবদিক দিয়ে জয়ী হয়েছিলেন—একেবারে ভিনি, ভিডি, ভিসি।

টেস্টে রণজির আবির্ভাব আদৌ ঘটবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। রণজি জাত খেলোয়াড় হলেও তাঁর গায়ের চামড়া ছিল কালো তাই টেস্টের কৌলিন্য তাঁকে দেওয়া যায় কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে। যদিও টেস্টে আবির্ভাবের আগে থেকেই তিনি এতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে তাঁর সম্পর্কে সকৌতুকে যা লেখা হয় তার অনুবাদ হলো :

'রাজনৈতিক মতবাদে লিবারাল, মিঃ কে. এস. রণজিৎ সিংজী হাউজ অব কমন্স-এর নির্বাচনে দাঁড়াতে চান। যদি তিনি দাঁড়িয়ে নির্বাচিত হন, তবে কেউ বলতে পারে না যে, তিনি অল্পদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী হয়ে পড়বেন না—যুগটা যখন খেলার যুগ।'

রসিকতা হলেও এ উক্তি কি জনপ্রিয়তার এক আশ্চর্যজনক নিদর্শন নয়?

টেস্ট দলে রণজির আবির্ভাবে দলের আকর্ষণ, মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে জেনেও চামড়ায় কৃষ্ণবর্ণের ছাপ থাকায় লর্ড হ্যারিসের আপত্তিতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রমণকারী অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের হয়ে লর্ডস মাঠে প্রথম টেস্টে ভারতীয় লর্ডের স্থান হয়নি। তার ওপর লর্ডস মাঠে ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া দলকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করলে রণজির টেস্ট দলে স্থান পাওয়ার আশা ক্ষীণ হয়ে ওঠে।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড মাঠের নতুন নির্বাচকমণ্ডলী কিন্তু তাঁদের মনের কালিমা মুছে ফেলে ব্ল্যাক প্রিন্সকে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার নিমন্ত্রণ জানালেন।

প্রথম টেস্টে বাদ পড়বার অভিমান রণজির মনে দারুণ আঘাত হেনেছিল, তাই তিনি জানালেন তাঁর নির্বাচন যদি সর্বসম্মতিক্রমে হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়া দলের যদি কোন আপত্তি না থাকে তবেই তিনি খেলতে পারেন।

রণজির প্রশ্নে অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক উৎসাহিত হয়ে জানালেন তিনি ইংল্যাণ্ড দলে ভারতীয় রাজকুমারের উপস্থিতি দেখতে উৎসুক।

প্রথম টেস্টে অনায়াস সাফল্যের পর ইংল্যাণ্ড পর্যাপ্ত বোলার দলে নেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। নির্বাচকগণ ভুলেই গেলেন যে, বোলাররাই ম্যাচ জেতাতে পারে। তাঁদের ধারণা অস্ট্রেলিয়া আবার একটা দল—ওতে কি ধুরন্ধর ব্যাটস্‌ম্যান আছে যে একাধিক ঘোড়েল বোলার লাগবে? বুনো ওল বয়াতে জুটলে তবেই তো বাঘা তেঁতুলের সন্ধানে যেতে হয়।

শুরু হল দ্বিতীয় টেস্ট—রণজির প্রথম টেস্ট। অস্ট্রেলিয়া টসে জিতে ২০ হাজার দর্শকের সামনে ইংল্যাণ্ডের বোলিং তচনচ করে আট উইকেটে ৩৬৬ রান তুলল। দ্বিতীয় দিনে ৪১২ রান করে অস্ট্রেলিয়া অল আউট হয়ে গেল। আয়ারডেলের ধৈর্যের সাক্ষী হয়ে রইল তাঁর তিন সংখ্যার ১০৮ রান।

ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা ইংনিসের শুরুতেই শুরু করলো রানের পালা শেষ করে দে, শেষ করে দে রে—মাত্র ২৩ রানের মাথায় অধিনায়ক গ্রেস তাঁবুতে ফিরে এলেন। ২৩১ রানে ফুরিয়ে গেল প্রথম ইনিংস। প্রথম ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রান করলেন লিলি ৬৪, তারপরেই রণজি করলেন ৬২ রান।

ফলো অন করলো ইংল্যাণ্ড। দ্বিতীয়বারও সেই একই কাঁদুনি। ৩৩ রানের মাথায় আবার গ্রেস ডিসগ্রেস হয়ে ফিরে এলেন। সেদিনকার মতো ৪ উইকেট খুইয়ে ইংল্যাণ্ড করলো ১০৯ রান। ৪১ রানে অপরাজিত রইল রণজয়ী সিংহ।

তৃতীয় দিন খেলা দেখতে এলো মাত্র ৫ হাজার দর্শক। স্বদেশের হারে কে আর অংশ নিতে চায়। ইংল্যাণ্ড হারবে—হারবে। একমাত্র ছিঁচকাঁদুনে আবহাওয়া যদি একবার ফুঁপিয়ে ওঠে তবে সেই কান্নাই কেবল ইংল্যাণ্ডের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কিন্তু সেইদিন প্রয়োজনীয় বৃষ্টি উঁকিঝুঁকি মারল না। রণজিকেও খেলার শুরুতে শান্ত, সংযত থাকতে হল। দেড় ঘণ্টায় ৫০ রান করলেন। ওদিকে ইংল্যাণ্ডের অপর ব্যাটসম্যানদের অকাল মৃত্যু দেখে রণজি হাত খুললেন। মারের পর মার আর দৌড়ানোর পর দৌড়ানো। মাত্র ৪০ মিনিট হিংস্র শিকারী দ্বিতীয় ৫০ রান সংগ্রহ করে সেঞ্চুরির বুড়ি ছুঁলেন। রান শিকারের নেশা থেকে তখন আর তাঁকে ঠেকায় কে—তবু রণজিকে থামতে হলো, কারণ অপর সঙ্গীদের আয়ু তখন শেষ। অপরাজিত ১৫৪ রান করে রানগেট সিং তাঁবুতে ফিরে এলেন।

ব্যাট হাতে সেদিন তিনি যে প্রলয় নৃত্য করেছিলেন—দর্শকদের নাচিয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি।

শেষ অবধি ইংল্যাণ্ড তিন উইকেটে হেরে গেল। কিন্তু রণজির অনবদ্য ব্যাটিং সেদিন পরাজয়েও আনন্দের সোনার-কাঠি ছুঁইয়েছিল।

সেদিন পাঞ্চ পত্রিকা শিল্পী রণজীর ব্যাটিং দেখে পত্রিকায় যে কবিতা পাঞ্চ করে দিয়েছিলেন—তা হলো :

'Though the poets from Pentaour to Perach
From Homer to Austin would fail,
To picture in adequate tints, this sweet,
Boss of the bat-ball and bail.

তাঁর সূক্ষ্ম মারের যে মর্মর ধ্বনি যা 'a serene thing of beauty, a dream of delight an ideal art···' সেদিনের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের আকাশে বাতাসে যে গুঞ্জনের সুর তুলেছিল, তার স্বরলিপি আজও ক্রিকেট-রসিকরা যোগাড় করে উৎসাহের সঙ্গে ক্রিকেটের অর্কেস্ট্রায় যোগান দেন।

খেলার মাঠের বাইরেও রণজি ছিলেন আদর্শ স্পোর্টসম্যান। শান্তির দূত রণজি জামসাহেব হিসাবে নৃপতি সভার সভাপতি ছিলেন। যদিও বিরাট বংশে জন্মেছিলেন সহৃদয়, প্রজাবৎসল রণজি, কিন্তু তাঁর মন ছিল আরো বড়। পরিজন মহলে বন্ধুবৎসল রণজির পরিচয় ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজির পরিচয়ের চেয়ে কম ছিল না। কৃষ্ণবর্ণের জন্য খেলোয়াড় জীবনে তাঁকে বহু বাধা অতিক্রম করতে হয় কেম্ব্রিজের সাদা চামড়ার ছাত্র-বন্ধুরা তাঁকে অবজ্ঞা করেছেন। তিনি মর্মাহত হলেও কখনো প্রতিবাদ করেন নি। শরীরে রাজরক্ত থাকলেও তাঁর সহনশীলতা ছিল অদ্ভুত। তাঁর গুণমুগ্ধ ইংরাজ বন্ধুরাও তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য সিংহাসন সহজে তাঁর হাতে তুলে দিতে চান নি। তবু রণজি কোনদিন ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি, কোনদিন ধৈর্য হারান নি।

আমাদের কিন্তু একথা ভাবলে ক্ষোভ হয় যে, যে রণজি ছিলেন এত ধর্ম-ভীরু, প্রজাদের জন্য যিনি এত কিছু করেছেন, সেই রণজি কিন্তু নিজেকে ভারতীয় ক্রিকেটার হিসাবে স্বীকার করেন নি। ভারতের ক্রিকেটের উন্নতির জন্য তিনি কীই বা করেছেন? কত টাকাই বা খরচ করেছেন? অথচ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর দল সাসেক্স কাউন্টির অর্থাভাবের কথা জানতে পেরে এক হাজার পাউণ্ডের চেক পাঠিয়েছিলেন। আর চারজন পেশাদার খেলোয়াড়ের মরসুমে মাহিনা ও অন্যান্য খরচের ভার নেবেন বলেও জানিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ড তাঁকে ক্রিকেটার বানিয়েছে তাই তার গৌরবের অংশ ভারতবাসীদের দিতে রাজি হন নি। কিন্তু ভারত পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়কে তার যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছে—যা ইংল্যাণ্ড আদৌ দেয়নি। ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা রণজি ট্রফি তাঁরই নামে—কলকাতার আকাশচুম্বী রণজি স্টেডিয়ামও তাঁরই নামে। ভারতীয় ডাক বিভাগ তাঁর ছবি ছাপিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। আজ বেঁচে থাকলে মাইকেলের মতো রানগেট সিং-এর মনেও কী আশার ছলনায় কোন অনুশোচনা জাগত না!

সারদারঞ্জন রায়

অজয় বসু

অধ্যাপনা ও অধ্যয়নে আত্মনিমগ্ন শিক্ষাব্রতী সারদারঞ্জন খেলাধুলায় মনোনিবেশ করার প্রেরণা পেয়েছিলেন কোথা থেকে জানি না, তবে ঐ ঐতিহাসিক সত্যটুকু আমাদের জানা আছে যে, ক্রীড়াজগতে তাঁর আবির্ভাবে বাঙলাদেশের খেলাধুলার ক্ষেত্রে নতুন যুগের স্থচনা ঘটেছে।

বাঙলাদেশকে ইংরেজের জাতীয় ক্রীড়া ক্রিকেট খেলতে শিখিয়েছেন অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায়। সারদারঞ্জনের আগে যে বাঙলাদেশে ক্রিকেট খেলা হত না একথা ঠিক নয়। অল্পস্বল্প হলেও খেলা হত, খেলতেন সেকালের সাহেব-সুবোরা। কিন্তু সারদারঞ্জন বাঙালীকে ক্রিকেট খেলতে দীক্ষা দিয়েছেন তাই তাঁকে অভিহিত করা হয় বাঙলাদেশে ক্রিকেট খেলার জনকরূপে। সারদারঞ্জনকে শুধুমাত্র 'বাঙলার ক্রিকেটের জনক' বললে তাঁর সমগ্র পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ বাঙলার যুব-সম্প্রদায়কে ক্রিকেট খেলতে আহ্বান জানানোর আগেই আলিগড়ে অবস্থানকালে তিনি সেখানকার ছাত্রকুলকে ক্রিকেটে উৎসাহী করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। আলিগড়ে তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্ররা আসত এবং সারদারঞ্জনের কাছেই শিক্ষা করত ক্রিকেট খেলার কলা-কৌশলাদি।

সারদারঞ্জনের অধ্যাপক-জীবনের প্রথম পর্ব কেটেছে আলিগড়ে, সেখান থেকে আসেন বহরমপুরে ও ঢাকায়, আরও পরে তাঁকে দেখা যায় কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষরূপে। আলিগড়, বহরমপুর, ঢাকা—সারদারঞ্জন যখন যেখানে গিয়েছেন সেইখানেই চেষ্টা করেছেন ক্রিকেট সম্পর্কে ছেলেদের অনুরাগ বাড়াতে। তবে এই কলকাতায় টাউন ও বিদ্যা-সাগর কলেজ অ্যাথলেটিক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করায় এবং নাটোরের ক্রিকেট দল গড়ে তোলায় বাঙলার ক্রীড়াঙ্গনে ক্রিকেটকে কায়েমী করায় তাঁর সাধনা সফল হয়েছিল সর্বাধিক।

বাঙালী ক্রীড়াসংস্থাগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম ক্রিকেট খেলে টাউন ক্লাব। টাউন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৪ সালে। টাউন ক্লাবের আদিপর্বে সারদারঞ্জন এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মুখ্যত তাঁরই উৎসাহে সেকালের টাউন

ক্লাবের সদস্যরা ক্রিকেট খেলতে শুরু করেন এবং তাঁরই উদ্যমে এদেশের প্রাচীনতম ইংরাজ ক্রীড়াসংস্থা ক্যালকাটা ক্লাব ভারতীয় তথা বাঙালীদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে এগিয়ে আসে।

কথিত আছে যে, কলকাতার ময়দানে লাটপ্রাসাদের দক্ষিণ প্রান্তে ১৮০৪ সালের ১৮ ও ১৯ জানুয়ারি সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল (আর এক পক্ষের অভিমত যে, কলিকাতায় প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হয় ১৭৯৩ সালে)। এই অনুষ্ঠানে খেলোয়াড় ছিলেন সব ইংরেজ, প্রতিযোগী দল দুটির নাম ছিল ক্যালকাটা ও এটন। তবে প্রথম আনুষ্ঠানিক ম্যাচের সঙ্গে বাঙলাদেশের ক্রিকেট খেলার প্রসার ও অগ্রগতির ইতিবৃত্তের বিশেষ সম্পর্ক নেই। ১৮৮৯-৯০ সালে জি. এফ ভার্নন পরিচালিত, ১৮৯৩ সালে লর্ড হক পরিচালিত ইংরেজ ক্রীড়া প্রতিনিধিদলের এবং ১৮৯৬ সালে পাতিয়ালার মহারাজার দলের কলকাতা সফরের ফলে স্থানীয় ক্রীড়ানুরাগী মহলে ক্রিকেটের আদর বাড়তে থাকে। পাতিয়ালার মহারাজার পক্ষে এসেছিলেন অমর খেলোয়াড 'রণজি'। তাঁর অনুকরণীয় ক্রীড়াচাতুর্যে যুব-বাঙলাকে সেদিন রণজির নাম অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। সারদারঞ্জন ও তাঁর টাউনের সতীর্থরা এর আগেই ক্রিকেট খেলতে শুরু করে দিয়েছিলেন সত্যি, তবে রণজির আবির্ভাবে কলকাতায় যে নতুন উদ্দীপনা, উৎসাহের জোয়ার দেখা দেয়, সারদারঞ্জন সেই জোয়ারে ভাঁটা পড়তে দেননি। টাউন ক্লাব তো ছিলই, তাছাড়া নাটোর ও বিদ্যাসাগর কলেজ দল তিনি গড়ে তুললেন। দুটি-দলেই তখনকার দিনের সেরা খেলোয়াড়েরা খেলতেন, তাছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের পেশাদার ক্রীড়াবিদরাও কালক্রমে এসে নাটোর দলে যোগ দিয়েছিলেন।

সারদারঞ্জন নিজে ব্যাট-বল হাতে করেছিলেন কৈশোরে, কিশোরগঞ্জে মাইনর স্কুলে পড়ার সময়। পরিণত বয়সেও তাঁকে কখনো ব্যাট ও বল পরিত্যাগ করতে দেখা যায়নি। শোনা যায় যে, খেলোয়াড় হিসাবে ব্যাটিং অপেক্ষা বোলিং-য়েই তাঁর দক্ষতা ছিল বেশি। সাধারণত 'মিডিয়ম পেসে'ই তিনি বল করতেন।

ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করেই ঢাকা কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মি. বুথের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি ঢাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ: গণিতের অধ্যাপকরূপে ঢাকায় অবস্থানকালে একবার কলকাতায়

প্রেসিডেন্সি ও ঢাকা কলেজ দলের সঙ্গে একটি ম্যাচ খেলা হয়েছিল। ছাত্রদের সঙ্গে সারদারঞ্জন নিজে ও আরও কয়েকজন অধ্যাপক এই ম্যাচে অংশ নেন। খেলায় হেরে যাবার পর প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষ থেকে অধ্যাপকদের বাদ দিয়ে ছাত্রদের নিয়ে গঠিত দলের সঙ্গে আর একদিন খেলার প্রস্তাব করা হলে অধ্যক্ষ বুথ সম্মত হন এবং ঢাকার পক্ষে একমাত্র অধ্যাপক সারদারঞ্জনকে খেলতে অনুরোধ করেন। অধ্যাপকদের মধ্যে সারদারঞ্জনই ছিলেন একমাত্র ভারতীয়, বুথ সাহেব সম্ভবত তাঁকে ইউরোপীয় অধ্যাপকের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন নি। অধ্যক্ষ বুথের এই মনোভাব সারদারঞ্জনের আত্ম-মর্যাদাবোধে আঘাত করে এবং তিনি দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে অস্বীকার করেন, ফলে বুথের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য ঘটে। ঢাকায় ফিরে অধ্যক্ষ বুথ সারদারঞ্জনকে কটকে বদলি করে দেন। বুথ-সারদারঞ্জনের প্রসঙ্গটি এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে উঠেছিল। তিনি তখনই সারদারঞ্জনকে নিজের কলেজ, তদানীন্তন মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে গণিতের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। শ্রীযুক্ত এন. এন. ঘোষের পরলোক গমনের পর ১৯০৯ সালে সারদারঞ্জন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ হন এবং জীবনের শেষ দিন (১৯২৬) পর্যন্ত সেই পদে নিযুক্ত থাকেন।

অত্যন্ত স্বাধীন মতাবলম্বী, নির্ভীকচেতা পুরুষ ছিলেন সারদারঞ্জন। শরীরে বল ছিল অযুত, শ্মশ্রুমণ্ডিত দীর্ঘ গম্ভীর মূর্তিখানি অন্যের কথা দূরে থাক, একদা একদল ডাকাতের অন্তরেও ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।

শরীরের ওপর নজর নিতে, সোজা ব্যাটে খেলতে আর 'লেংথ' মেপে বল দিতে তিনি বরাবরই উপদেশ দিতেন। ক্লাসের পর প্রতিদিন কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রদের তিনি অনুশীলনে বাধ্য করতেন। কলেজের যেসব ছাত্রকে তিনি নিজের হাতে ক্রিকেট খেলা শিখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে শৈলেশ বসু, হেমাঙ্গ বসু, তুলসী দত্ত, গোষ্ঠ পাল, হাবলা মিত্র, কাঙ্গালী পাল, ডা. সুশান্ত ঘোষ, এস. আয়কতের নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তাঁর ভাইপোরা তো ছিলেনই। সারদারঞ্জনের চেষ্টাতেই কলকাতায় সর্বপ্রথম প্রতিনিধিমূলক ইংলিশ বনাম বেঙ্গলি স্কুল ম্যাচের প্রবর্তন হয় (১৯১৩-১৪ সালে)। চৌরঙ্গীর মোড়ে তাঁর নিজস্ব খেলাধুলার সাজসরঞ্জামের বিপণি ছিল বহুদিন। প্রতি বছর যে খেলোয়াড় ব্যাটিংয়ের গড় হিসাব তালিকায় শীর্ষস্থান পেতেন সারদারঞ্জন নিজে হাতে দোকান থেকে তুলে একখানি ব্যাট উপহার দিতেন তাঁকে।

সারদারঞ্জন ছিলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের সন্তান। আদি বাড়ি ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মসুয়া গ্রামে। কলকাতায় তিনি থাকতেন আমহার্স্ট স্ট্রীট ও আমহার্স্ট রো-এ। জন্ম সাল ১৮৫৯, মারা যান দেওঘরে, ৬৭ বছর বয়সে। সারদারঞ্জনের পর মসুয়ার রায়-পরিবারের একাধিক সন্তানকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট আসন অধিকার করতে দেখা গিয়েছে। সারদারঞ্জনের অনুজ মুক্তিদারঞ্জনও গণিতের অধ্যাপক ছিলেন এবং সাহিত্যিক ও শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর (কামদা) হাফটোন ব্লক প্রবর্তনে ভারতীয় মুদ্রণশিল্পে এনেছিলেন যুগান্তর। ভ্রাতুষ্পুত্র অনন্য সাহিত্যিক সুকুমার রায়, অধ্যাপক শৈলজা রায়, ভ্রাতুষ্পুত্রী অধ্যাপিকা লীলা মজুমদার ও পৌত্র শিল্পী সত্যজিৎ রায় বাঙলাদেশে সুপরিচিত।

'বাংলায় ক্রিকেট খেলার জনক' ছাড়া সারদারঞ্জনের আর এক নাম ছিল 'বাঙলার ডবলিউ. জি. গ্রেস'। ডবলিউ. জি. গ্রেস ছিলেন ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট ইতিহাসের যুগধারক, শ্মশ্রুমণ্ডিত দীর্ঘকায় ডবলিউ. জি. গ্রেসের সঙ্গে সারদারঞ্জনের আকৃতির সাদৃশ্য থাকায় সেকালের ইউরোপীয়ান মহলে সারদারঞ্জন 'বাঙলার গ্রেস' নামেই পরিচিত ছিলেন। শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্যের কথাই বা বলি কেন, এদেশে ক্রিকেট খেলার প্রসার ও উন্নয়নকল্পে সারদারঞ্জনের অবদানও কম নয়। ইংলণ্ডের ডবলিউ. জি. অবশ্য ব্যক্তিগত ক্রীড়ানিপুণতার প্রকাশে ছিলেন ভাস্বর, আর বাংলার ডবলিউ. জি হলেন এদেশে ক্রিকেটের পথিকৃৎ, এক হিসাবে ডবলিউ. জি-র এই যুগলমূর্তিকে ক্রিকেট খেলার উপাখ্যানবর্ণিত যুগপুরুষ বলে গণ্য করা যায়।

সারদারঞ্জনের ক্রীড়ানুরাগের প্রভাবেই রায় পরিবারের ও আত্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকেই উত্তরকালে খেলোয়াড় হিসাবে বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন। অনুজ মুক্তিদারঞ্জন, কুলদারঞ্জন, প্রমোদারঞ্জন, ভ্রাতুষ্পুত্র শৈলজা, হৈমজা, নীরোজা, ইন্দুজা, ক্ষীরোজা, নৃপজা, ভাগিনেয় হীতেন, নীতিন (চিত্র পরিচালক), গণেশ, কার্ত্তিক, বাপী, বাবু বসু, জে. দত্তরায়, এম. দত্তরায়, দৌহিত্র অখিল চৌধুরী ক্রীড়াজগতে সুপরিচিত।

অমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গম্ভীর প্রকৃতির পুরুষও যে কিভাবে খেলাধুলা নিয়ে মেতে থাকতেন সে কথা সারদারঞ্জনের ছাত্রদের সকলেরই স্মরণ আছে। প্রায় ষাটের কাছাকাছি যখন তাঁর বয়স তখন তিনি বিপুল উৎসাহভরে ছাত্রদলের সঙ্গে বারাণসী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে উত্তরপ্রদেশের এখানে-

ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে শৈলজারঞ্জনের ক্রিকেটে 'হাতে-খড়ি' হয় তার মূলেও রয়েছে প্রবীণ সারদারঞ্জনের কিশোর-সুলভ ক্রীড়ানুরাগ। শৈলজারঞ্জন তখন খুবই ছেলেমানুষ। বাড়ির বাইরে হবার তখন অনুমতি নেই। সারদারঞ্জনের উপস্থিতিতে বাড়ির অভ্যন্তরেও রা করবারও উপায় নেই কারুর। একদিন সারদারঞ্জনের অনুপস্থিতির সুযোগে শৈলজারঞ্জন আর তাঁর অন্য ভায়েরা বাড়ির উঠানে নিজেদের হাতে তৈরি কাঠের ব্যাট ও ন্যাকড়ার বলে ক্রিকেট খেলছেন, এমন সময় স্বয়ং সারদারঞ্জন ঘটনাস্থলে এসে হাজির। ছেলের দল তো পালাবার পথ পায় না. কিন্তু সারদারঞ্জন নিজে তাদের খেলা চালিয়ে যেতে বললেন। পরের দিন তিনিই আবার তদানীন্তন স্পোর্টিং ইউনিয়নের কর্ণধার দ্বিজেন সেনকে ডেকে শৈলজারঞ্জনকে ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। এইভাবেই শৈলজারঞ্জনের মার্কাস স্কোয়ার মাঠে আসার পথ পরিষ্কার হল। মার্কাস স্কোয়ার থেকে গড়ের মাঠ, হিল্লি-দিল্লি, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে খেলোয়াড় শৈলজারঞ্জনও উত্তরকালে বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন।

ভিনু মানকড়

(১৯১৭-৭৮)

মুকুল দত্ত

ভারতের এক ক্রিকেট পত্রিকায় মুলবন্তরায় হিম্মৎরায় মানকড় সম্পর্কে লেখা আছে : "জন্ম সৌরাষ্ট্রে জামনগরে, ১৯১৭ সালের ১২ই এপ্রিল। ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ চৌকস ক্রিকেটার এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর অন্যতম অগ্রগণ্য অল-রাউণ্ডার। ডান হাতের ওপেনিং ব্যাটসম্যান এবং বাঁ হাতের স্পিনার, মুখ্যত লেগব্রেকার। স্লিপ ও শর্টলেগের ফিল্ডার। সব চেয়ে কম টেস্ট খেলে হাজার রান ও শত উইকেট লাভে পৃথিবীর প্রথম পুরুষ। মাত্র তেইশটি টেস্ট খেলার পর এই কৃতিত্ব অর্জন করেন ১৯৫২ সালে। তারপর দু হাজার রান ও শত উইকেট দখল করে উইলফ্রেড রোডস ও কিথ মিলারের সঙ্গে নিজের নাম যুক্ত করেন। ১৯৫৫-৫৬ সিরিজে প্রথম উইকেট জুড়িতে বিশ্ব রেকর্ড করেন নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে ৪১৩ রান করে। সে রেকর্ড এখনও অম্লান। মানকড়ের নিজের রান ছিল ২৩১। টেস্টে এখন পর্যন্ত ভারতীয়র সর্বোচ্চ রান। ওই সিরিজেই বোম্বাই টেস্টে ২২৩ রান করে ভারতের একমাত্র খেলোয়াড় হিসাবে একই সিরিজে দুটি ডাবল সেঞ্চুরির অধিকারী হন। একমাত্র ভারতীয় যিনি বিদেশ সফরে হাজার ও শত উইকেট পেয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৬এ ইংলণ্ডে। করেছিলেন ১১২০ রান, পেয়েছিলেন ১২৯টি উইকেট। ১৯২৬এ লিয়ারি কনস্টানটাইনের পর বিদেশী খেলোয়াড়দের মধ্যে ভিনু এই কীর্তি করেন। পরের বছরে 'উইসডেনের' পাঁচ ক্রিকেটারের একজনের দুর্লভ সম্মান। রঞ্জি ট্রফিতে প্রথম খেলা ১৯৩৫-৩৬-এ পশ্চিম ভারত দলের পক্ষে, বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে। নবনগর দলে খেলেছেন ১৯৩৫-৩৬ থেকে ১৯৪১-৪২ পর্যন্ত; মহারাষ্ট্র দলে ১৯৪৩-৪৪এ; গুজরাটে ১৯৪৪-৪৫ থেকে ৫০-৫১ পর্যন্ত, এর মধ্যে শুধু এক বছর ৪৮-৪৯এ খেলেছেন বাংলায়; বোম্বাইয়ে ৫১-৫২, ৫৩-৫৪ ও ৫৫-৫৬ মরসুমে। রাজস্থানে ৫৬-৫৭, ৫৭-৫৮ ও ৫৮-৫৯এ। গুজরাটে খেলার সময় প্রতি বছরই দলের অধিনায়ক ছিলেন। রাজস্থানের অধিনায়ক ছিলেন শেষের দুই মরসুমে। টেস্ট খেলেছেন ৪৪টি। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ১১টি, অস্ট্রেলিয়ার

সঙ্গে ৮টি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে ১২টি, পাকিস্তানের সঙ্গে ৯টি ও নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে ৪টি। অধিনায়ক ৬টি টেস্টে—৫৪-৫৫য় পাকিস্তান সফরে। পাঁচ-টেস্ট সিরিজে এবং ৫৮-৫৯এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট। ৪৪ টেস্টে মোট রান ২১০৯, গড় ৩১·৪৭। সেঞ্চুরি ৫টি, সর্বোচ্চ রান ২৩১। উইকেট ১৬২। গড় ৩২·৩১। টেস্ট ক্যাচ ৩৩টি। ১৯৩৭-৩৮এ লর্ড টেনিসনের দল, ৪৫এ অস্ট্রেলিয়ান সারভিসেস দল, ৪৯-৫০এ প্রথম কমনওয়েলথ দল, ৫০-৫১য় দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দল এবং ৫৩-৫৪য় সিলভার জুবিলি ওভারসিস দলের বিরুদ্ধে বেসরকারী টেস্ট খেলেছেন ১৬টি। বেসরকারী টেস্টে মোট রান ১০২৩। পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেটে ৮৩১ (গড় ৪১·৫৫)। তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি সহ প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ২৬টি সেঞ্চুরি এবং ১১৪৮০ রান ও ৭৭৪ উইকেট। টেস্টে এক ইনিংসে দুবার ৮টি করে উইকেট পেয়েছেন, ৮ বার পেয়েছেন ৫টি বা তার বেশি উইকেট। শ্রেষ্ঠ বোলিং ১৯৫২য় দিল্লি টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৫২ রানে ৮ উইকেট। ইংল্যাণ্ডের ল্যাঙ্কাশায়ার লীগ এবং সেণ্ট্রাল ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে খেলেছেন ৪৭ থেকে ৬২ পর্যন্ত। টেস্ট সেঞ্চুরি ৭৪-৪৮এ মেলবোর্ণ মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১১৬ ও ১১১; ৫২য় লর্ডসে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৮৪, ৫৫-৫৬ মরসুমে বোম্বাইয়ে ও মাদ্রাজে ২২৩ ও ২৩১ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে।

উপরের এই সংখ্যাতথ্য থেকে মহান ক্রিকেটার মানকড়ের খেলোয়াড় জীবনের যথার্থ পরিচয় মিলবে না। পরিসংখ্যান বা রান থেকে খেলোয়াড়ের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মেলে না বলেই বিদগ্ধ ক্রিকেট লিখিয়ে নেভিল কার্ডাস স্কোর বোর্ডকে গাধা বলে গেছেন। ধোপার গাধা যেমন জানে না সে কত মূল্যের বস্ত্র বহন করছে, তেমন স্কোর বোর্ড বা পরিসংখ্যান থেকেও পাওয়া যায় না খেলোয়াড়ের প্রতিভার পরিচয়। সুতরাং ভিনু মানকড়ের সঠিক পরিচয় পাবার জন্য আমাদের স্মরণ করতে হবে প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড় ও সমালোচকদের সার কথাগুলি। তাছাড়া উপরের এই পরিসংখ্যানও মানকড়ের খেলোয়াড় জীবনের পূর্ণ পরিচয় নয়। অনেক কিছুরই উল্লেখ নেই। যেমন—ভারতের প্রথম টেস্ট জয়ের মূলে তার অবদান কী ছিল, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট জয়ে কী ভূমিকা নিয়েছিলেন, কার কাছ থেকে খেলা শিখেছিলেন, যে টেস্টটি তাঁর নামে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং স্মরণীয় টেস্টের অন্যতম হিসাবে আখ্যা পেয়েছে সে টেস্টে কী চমক দেখিয়েছিলেন ইত্যাদি।

হ্যাঁ, মুখ্যত ভিনুর কৃতিত্বেই ভারতের প্রথম টেস্ট জয়। ১৯৫১-৫২য় মাদ্রাজে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সে টেস্টে ভিনু পেয়েছিলেন ১২টি উইকেট—প্রথম ইনিংসে ৫৫ রানে ৮টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৩ রানে ৪টি। প্রথম ইনিংসের স্কোর বোর্ডে ইংল্যাণ্ডের তিন নম্বর থেকে দশ নম্বর, ৮ জন ব্যাটসম্যানের নামের পাশেই রয়েছে নিধনকারী বোলার মানকড়ের নাম। ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট জয়ের ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা মানকড়ের। ৫২য় দিল্লিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সে টেস্টে পেয়েছিলেন ১৩টি উইকেট--৫২ রানে ৮টি ও ৭৯ রানে ৫টি। উল্লেখ্য, ভারতের এই দুটি জয়ই ইনিংসে। এই দুই স্মরণীয় জয়ের মাঝে ভিনু কিন্তু আর বড় হয়ে উঠেছিলেন পরাজয়ের মাঝে। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে পরাজিত পক্ষের কোন খেলোয়াড় বোধ হয় মানকড়ের মত মর্যাদা পান নি। সম্ভবত অমন মহনীয় হয়েও ওঠেননি আর কেউ।

আমি ৫২ সিরিজের সেই লর্ডস টেস্টের কথা বলছি, যে টেস্টে ভিনু মানকড়ের শৌর্য ও সংগ্রাম ক্রিকেট সাহিত্যের সম্পদ হয়ে আছে। ব্যাট-বলের দ্বৈত কীর্তির সে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কি করেছিলেন ভিনু? প্রথম ইনিংসে চমৎকার ৭২ রান করার পর দলের সকলের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক ওভার (৭৭ ওভার) বল করে উইকেট পেলেন ১৯৬ রানে ৫টি। ইংলণ্ড সে ইনিংসে করে ৫৩৭ রান। তারপর ঘামভেজা দেহ নিয়ে শুরু করলেন দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং। বেড্সার, ট্রুম্যান, জেঙ্কিনস, লেকারের বল লেটকাট, স্কোয়ারকাট, ড্রাইভ, পুল, গ্লান্স করে করলেন চোখ-ঝলসানো ১৮৪ রান সাড়ে চার ঘণ্টায়। তাঁর দুই ইনিংসে ছিল দুটি রাজসিক ছয়ের মার। হাজারের সঙ্গে তৃতীয় উইকেট জুড়িতে করলেন ২১১ রানের রেকর্ড। এরপর ভেল্কি দেখালেন বলের লক্ষ্য ও নিশানায়। চতুর্থ দিনের শেষে জয়ের জন্য ইংলণ্ডের প্রয়োজন ছিল ৭৭ রান। সময় ছিল দেড় ঘণ্টা। ফ্লাইটের রকমফেরে এবং ঘূর্ণিবলের চাতুর্যে ওই সময়ের মধ্যে হাটন ও সিম্পসনকে বেঁধে রাখলেন ৪০ রানের মধ্যে মেডেনের পর মেডেন ওভার দিয়ে। শেষদিন ইংলণ্ড ৮ উইকেটে জেতা সত্ত্বেও টেস্টটি মানকড়ের টেস্ট নামে চিহ্নিত হয়ে গেল। কেউ বললেন খেলা হল মানকড় বনাম ইংলণ্ড।

এই একটি টেস্টে মানকড়ের ভূমিকা সম্বন্ধে বিখ্যাত ব্যক্তিদের উক্তি থেকেই প্রমাণ হয়ে গেছে তিনি কত বড় ক্রিকেটার ছিলেন। বেতারের আর্থার গিলিগান বললেন—"মানকড়ের স্মরণীয় সাফল্যে ক্রিকেট সমৃদ্ধতর হল।

১৯০২ সালের পর এটাই হল ক্রিকেটে সর্বশ্রেষ্ঠ চৌকস কীর্তি। সাবাস ভিনু, তোমার জন্য ক্রিকেট-পৃথিবী গৌরবান্বিত।'

সমালোচক চার্লস ব্রে লিখলেন—"শীতল আনন্দহীন ইংলণ্ডে শীতের মাঝে বসে আমি এখনো সেই ঝলসানো ব্যাট, ছুটন্ত বল এবং অহমিকাশূন্য শান্ত মানুষটির আক্রমণাত্মক খেলা দেখতে পাচ্ছি যার একমাত্র তুলনা ব্র্যাড-ম্যান তাঁর শ্রেষ্ঠরূপে।"

ব্রে আরও লিখলেন—"আমি অনেক বড় খেলোয়াড়ের খেলা দেখেছি। অস্ট্রেলিয়ার ব্র্যাডম্যান, ম্যাকেব, মিলার; ইংলণ্ডের হেনড্রেন, হ্যামণ্ড, চ্যাপম্যান. লেল্যাণ্ড; ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেডলি, ওরেল, উইকস প্রভৃতি কারো খেলাই দেখতে বাকি নেই। কিন্তু পেছনে তাকিয়ে একটি ইনিংসের কথাও মনে করতে পারছি না যা মানকড়ের এই মাদকতাময় ইনিংসকে ম্লান করতে পারে।"

রবার্টসন গ্লাসগোর কলমে উচ্ছ্বাসের বান—"সে যেন জ্যোতির্বিদদের আগে থেকে চেনা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। অগণিত দর্শক চোখকে চমকিত ও অভিভূত করে হঠাৎ যেন স্বর্গীয় আলোকোচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ল।"

জ্ঞানবৃদ্ধ বিখ্যাত আম্পায়ার ফ্রাঙ্ক চেস্টার বললেন—"দ্বিতীয় টেস্টে ভিনু মানকড়ের সর্বাত্মক কীর্তির চেয়ে বড় একক কীর্তি কখনো দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।"

অতীতের নামী উইকেট কিপার লেসলী এমস বললেন—"আমি মনে করতে পারছি না ব্র্যাডম্যানও এমন জনসংবর্ধনা পেয়েছেন কিনা, যে সংবর্ধনা পেয়েছেন দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করার পর ভিনু মানকড়।

অলরাউণ্ডার হিসাবে ভিনুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করে ব্র্যাডম্যান লিখেছেন—"ইংলণ্ডের বৃষ্টি-ভেজা উইকেটে ভিনু বেশী সফল সন্দেহ নেই, কিন্তু নিখুঁত উইকেটেও লেংথ ও ডাইরেকশনের উপর পূর্ণ অধিকার রেখে পেস ও ফ্লাইটের পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং রাউণ্ড দ্য উইকেট ও ওভার দ্য উইকেট বল করায় সমমাত্রায় দক্ষতা অর্জন সব সময়ই সম্ভ্রম আদায় করে।"

একেবারের গোড়ার কথায় আসি। ভিনুর প্রথম বেসরকারী টেস্ট খেলা ১৯৩৬এ লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে। খেলা দেখে টেনিসন মন্তব্য করে-ছিলেন—"পৃথিবীর ক্রিকেটে মানকড়ের অবতরণ ঘটল।" তাঁর বেশ কিছু আগেই কিন্তু ভিনুর কোচ বার্ট ওয়েন্সলি বলেছিলেন আর্থার গিলিগানের

কাছে—দেখে নিও কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের এক ছোকরাকে ক্রিকেট-পৃথিবী পাবে চিরগৌরবের মধ্যে। ছেলেটি বাঁ হাতে জোরে জোরে বল করত। আমি তাকে আস্তে বল করতে শিখিয়ে এসেছি। বার্ট ওয়েন্সলিই ভিনুর প্রথম শিক্ষাগুরু। পরে ব্যাটিংয়ের তালিম নিয়েছিলেন দলীপ সিংয়ের কাছ থেকেও।' তবে নিজের প্রতিভা ও পরিশ্রমের মিশ্রণেই বিশ্বে প্রতিষ্ঠা।

আগেই লিখেছি, নাম ছিল মূলবন্তরায় হিম্মৎরায় মানকড়। স্কুলবন্ধুরা ডাকত মিনু বলে—সম্ভবত মূলবন্তকে ছোট করেই মিনু। বার্ট ওয়েন্সলির কানে এই মিনু ঢুকেছিল ভিনু হয়ে। সেই থেকে ক্রিকেটে নাম হয়ে গেল ভিনু মানকড়। নামের অধিকারী পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও নামটি থাকবে ততদিন, যতদিন ক্রিকেট থাকবে এই পৃথিবীতে।

বাঙলার একমাত্র রণজি ট্রফি বিজয়

অজয় বসু

লাল হরফের দিন ২১ ফেব্রুয়ারি। সাল ১৯৩৯। বাংলার ক্রিকেট ক্যালেণ্ডারে তারিখটি এখনও জলজ্বল করছে। ওই দিনেই বাংলা দক্ষিণ পাঞ্জাবকে হারিয়ে জাতীয় ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নের পুরস্কার সোনায় মোড়া সুদৃশ্য স্মারক নিজের ঘরে তুলতে পেরেছিল। বিয়াল্লিশ বছরের দীর্ঘ রণজি ট্রফির ইতিহাসে বাংলার সাফল্যের আঁচড় বলতে নামমাত্র ওইটিই।

সেদিনের স্মৃতি ভোলবার নয়। কেনই বা ভুলবো? এমন সুখকর মুহূর্তের অস্তিত্ব বাংলার ক্রিকেটে আর যে নেই।

সেদিন সায়াহ্নে মাত্র তিন ঘণ্টার চেষ্টায় বাংলা দল দুর্ধর্ষ দক্ষিণ পাঞ্জাবের দ্বিতীয় ইনিংস মুড়িয়ে দিতেই প্রত্যাশামুখী দর্শকদের জয়ধ্বনি আকাশ কাঁপিয়ে তুলেছিল। প্যাভিলিয়নের ধারে উচ্ছ্বসিত জনতার ঠাস বুনোট। হাসিখুশি কলকণ্ঠে চারপাশ উচ্চকিত। আবেগ শিথিল। 'স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-অভিব্যক্তিতে পারিপার্শ্ব উদ্বেল।

প্যাভিলিয়নের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়ে দেখি, বিরাটদেহী স্ট্যানলি বেরহেণ্ড আরামকেদারায় গা এলিয়ে সজোরে হাঁকছেন, 'বেয়ারা, মোটাওয়ালা বোতল লেয়াও। আজ বহুৎ পিয়েগা।' খেলায় জিৎ হয়েছে। মানসিক চাপও শিথিল।

চারদিন ধরে অনেক ধকল পোয়াতে হয়েছে। এখন স্ফূর্তির দরকার। বেশ মোটাসোটা মানুষ ছিলেন এই বেরহেণ্ড। তেমনি আমুদে, দস্তুরমতো মোটাসোটা বোতল না হলে তাঁর চলবে কেন।

পাশের ঘরে শ্মশানের স্তব্ধতা। বিরস বদনে নিশ্চুপ বসে দক্ষিণ পাঞ্জাবের খেলোয়াড়েরা। গালে হাত দিয়ে আকাশপাতাল কী যেন ভাবছেন আমীর এলাহী। বেচারী আমীর। খেলা আরম্ভের মুখে টেবিলে সাজিয়ে রাখা সোনার স্মারক নিয়ে নাড়াচাড়া করার শখ হয়েছিল। যেই না হাত বাড়িয়ে ছুঁতে যাবেন, অমনি কে যেন কঠোর ভাষায় বলে উঠেছিল, 'ডোণ্ট টাচ ইট বিফোর ইউ উইন দ্য ফাইনাল।' শুনে তো আমীর থ।

তার পর চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, 'ইট্‌স অলরেডি ইন আওয়ার পকেট।'

কিন্তু হায়। সেকথা শুনে অন্তর্যামী হেসেছিলেন। কে জানে, সাজঘরে বসে আমীর এলাহী ওইসব কথা ভাবছিলেন কিনা। না, জেতার আগে জিতে গেছি বলে জাঁক করা ঠিক হয় নি। খেলাটি যে ক্রিকেট। অনিশ্চয়তাই তার পরম বৈশিষ্ট্য। এই খেলা কখন যে কাকে হাসায়, আবার কখন কাঁদায় আগেভাগে কেউ কী তার ঠাওর পায়।

তবে আমীর এলাহীর জাঁক করার মূলে যুক্তি যে ছিল না তাই বা বলি কী করে? ১৯৩৮-৩৯ মরশুমে দক্ষিণ পাঞ্জাব তো এক ডাকসাইটে দল। জাতীয় দলের ওয়াজির আলি, আমীর এলাহী এবং যাঁর নামোচ্চারণেই তখনকার দিনে ক্রিকেটমহল গমগমিয়ে উঠতো সেই লালা অমরনাথও ছলেন ওই দলে। সর্বকালের সেরা পেস বোলার মহম্মদ নিসার ও টেস্ট খেলোয়াড় নাজির আলিরও খেলার কথা ছিল। কিন্তু নিসার ও নাজির ফাইনালে খেলতে আসেন নি।

তা না আসুন, যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সম্মিলিত সামর্থ্যের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো সঙ্গতি বাংলার কোথায়? বাংলা দলে টেস্ট খেলোয়াড় বলতে একজনও নেই। যাঁরা ছিলেন তাঁরা দক্ষ, যোগ্য, সমর্থ। কিন্তু ওয়াজির, আমীর এলাহি, লালা অমরনাথের ঝলমলে প্রতিচ্ছবির পাশে মিনমিনে যেন। তবু চুলোচুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অল্পখ্যাত বাংলার খেলোয়াড়েরাই পালের হাওয়া উলটো মুখে বইয়ে দিতে পেরেছিলেন। কেমন করে? সেই কথাতেই আসছি।

ইডেনে চারদিনব্যাপী ফাইনাল খেলা হয় ১৮ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি। ওই কদিনে দর্শনী বাবদ হাজার পনেরো টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। পনেরো হাজার? টাকার পরিমাণ আজকের দিক থেকে হয়তো কিছুই না। কিন্তু তিরিশের দশকে ওই অঙ্কটিই ছিল ট্রফির এক নতুন নজির।

ইংরাজ আমলে বাংলার ক্রিকেটের প্রশাসনের মাথা ছিলেন তাঁরাই। খাস কলকাতায় খাস বিলাতী খেলোয়াড়ের ঘাটতি কম ছিল না। তাঁদেরই অন্যতম টম লংফিল্ডের ওপর বাংলা দল পরিচালনার ভার পড়ে। টম ছিলেন ইলংণ্ডের কেন্ট কাউন্টি ক্লাবের বিশিষ্ট প্রতিনিধি। অলরাউণ্ডার।

তবে বোলার হিসেবেই বিখ্যাত। অমন নিখাদ, সুন্দর ও অভিজাত বোলিং ভঙ্গী কলকাতায় কী আর কখনো দেখা গেছে।

ছজন সাহেব এবং পাঁচজন ভারতীয়—কার্তিক বসু, জিতেন ব্যানার্জি, কমল ভট্টাচার্য, তারা ভট্টাচার্য ও এ.জব্বরকে নিয়ে বাংলা দল গড়া হয়। উঠতি তরুণ নির্মল চ্যাটার্জির বরাতটাই মন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্যে নির্মল ওই ফাইনালে খেলতে পারেন নি।

খেলা তো আরম্ভ হলো। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং বাংলার। গোড়াপত্তন মন্দ নয়। মাঝপর্বে যখন কার্তিক বসু হাল ধরেন তখন অবস্থা আরও আশাপ্রদ। তখনকার কার্তিক বসু নিঃসন্দেহে বাংলার পুরোবর্তী ব্যাটসম্যান। ব্যাটিংয়ের বিন্যাস কেতাব-দুরস্ত। মারের হাত সহজ ও পরিচ্ছন্ন। তাঁর অন সাইড স্ট্রোক, হুক ও পুলের জুড়ি মেলা ভার। খোলা মেজাজে ব্যাট চালালেন। তরতরিয়ে রান উঠলো। অমরনাথের সিম, আমীর এলাহীর স্পিন বোলিং, কোনো কিছুই ভ্রূক্ষেপে নিলেন না। কিন্তু সাতাত্তর মিনিটে ৪৮ করে কার্তিক আউট হতেই বাংলার ইনিংসে ঢল নেমে এলো। অমরনাথ ও আমীর এতোক্ষণ কুঁকড়ে ছিলেন। এইবার বুক চিতিয়ে সিম-স্পিনের ফাঁদটি শত্রুপক্ষের গলায় গলিয়ে দিতেই চা-পানের কিছু পরে বাংলার খেল খতম হলো ২২২ রানে। আমীর পেলেন পাঁচটি, আর অমরনাথ চারটি উইকেট।

২২২ সংগ্রহ হিসেবে কেমন? জবাব দিলেন একা ওয়াজির আলিই। একার হাতেই তিনি ওই কটি রান তুলে নিয়ে বাংলার আশা-ভরসাকে যেন তছনচ করে দিলেন। পা পিছিয়ে, পা বাড়িয়ে ড্রাইভ, মাঝে মাঝে হুক, পুল ও কাট্ মেরে ওয়াজির সেদিন নিজেকে তুলে ধরেন সব ব্যাটসম্যানেরই স্বপ্ন রাজ্যে। রক্ষণব্যবস্থায় পরিপাটি। আবার আক্রমণে ক্ষমাহীন। মারে জোরই বা কতো। ছুটতে ছুটতে বলগুলি যেন ঘাসে ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল। ব্যাক ফুটে চোস্ত মার; বাহারি কারুকর্মের সূক্ষ্ম-চিকন রূপের জলুস দেখে দর্শকেরা স্তম্ভিত ও আনন্দিত হলেন। ওয়াজির দলপতি। গোটা দলকেই সেদিন তিনি নিজের কাঁধে তুলে ধরেছিলেন।

ওয়াজিরের কাঁধ যে রীতিমতো চওড়া তাতে আর সন্দেহ কী। দলের ৩২৮-এর মধ্যে তাঁর একারই সংগ্রহ ২২২।

এই ওয়াজির সম্পর্কে বাংলা দলের ভয়ই ছিল। সেই ভয় সত্যে পরিণত

হতে বাংলার শিবিরের তখন মুষড়ে পড়ার মতো অবস্থা। সবচেয়ে মর্মাহত প্যাট্ মিলার। পাঁচ রানের মাথায় মিলার ওয়াজিরকে 'জীবন' দিয়ে ফেলেছেন। সে আফশোষ রাখেন কোথায়। সেই থেকে মিলার আর বাক্যালাপ করেন নি। মনে মনে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে শুধু নিরুচ্চার অঙ্গীকার আউড়েছেন, দ্বিতীয় ইনিংসে শোধ তুলতেই হবে।

তা মিলার কথা রেখেছিলেন। দ্বিতীয় দিন খেলা ভাঙার কিছু আগে ব্যাট হাতে মাঠে নামেন। আর তাঁবুতে ফেরেন তৃতীয় দিনের পড়ন্ত বেলায়। প্রায় পুরো একটি দিন ধরে তিনি তাঁর স্থিতির শেকড় মাটির মূলে নামিয়ে রেখেছিলেন। সাহাবুদ্দিনের পেস বোলিংয়ের ভার, অমরনাথের সিম্-সুইংয়ের ধার বা আমীর এলাহীর লেগ স্পিন-গুগলির ফাঁদ, কোনো কিছুই তাঁকে ২৮৫ মিনিটের ফাঁকে নড়াতে, হটাতে, ঠকাতে পারে নি। মিলার যখন আউট হন তখন দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলার রান ছ উইকেটে ২৭৮। পালটা আক্রমণ শানাবার জমি অনেকটা তৈরি। যেহেতু এই ফাঁকে মিলারের পাশে দাঁড়িয়ে ভ্যাণ্ডারগুচও বেশ মোটা রান তুলে দিয়ে গেছেন।

এরপর এলেন ম্যালকম। এলেন এবং মিলারের তৈরি শক্ত জমিতে পা রেখে এমন জোরে ব্যাট হাঁকাতে লাগলেন যে রানের গতির সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে স্কোরাররা পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে গেলেন। তাঁরই চেষ্টায় মিনিট পিছু একটি করে রান উঠে তিনশর কোঠায় পৌঁছে গিয়েছিল।

চতুর্থ দিন সকালের যা কিছু নাটক তা জমে ওঠে বাংলার শেষ জুটি জব্বর ও জিতেন ব্যানার্জিকে ঘিরেই। ব্যানার্জি ব্যাটসম্যান হিসেবে একেবারেই অস্বীকৃত। খ্যাতিমান বোলার। অথচ ৯৭ মিনিট ধরে রুখে দাঁড়িয়ে জিতেন ব্যানার্জি জব্বরের (৫৮) সহযোগিতায় সর্বশেষ উইকেটে আরও ৮৯ রান জুড়ে দেন। নিজে ২৯-এ অপরাজিত থাকেন।

এবার দক্ষিণ পাঞ্জাবের দ্বিতীয় দফার ব্যাটিং। বাংলা ৩১০ রানে এগোতে পেরেছে দেখে গ্যালারিতে নতুন আশা সঞ্চারিত হয়েছে। সেই আশা উত্তেজনায় রূপান্তরিত হলো মধ্যাহ্ন ভোজনের আগেই দক্ষিণ পাঞ্জাব একটি উইকেট হারাতে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মোরাত হোসেন সজোরে পুল করতেই জব্বর একদিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কেন? ভয়ে জান্ বাঁচাতে গিয়ে নাকি? না ক্যাচ ধরার চেষ্টায়? প্রশ্নটি নিয়ে গ্যালারিতে যখন অঙ্ক কষা হচ্ছে, তখন

মাঝমাঠে জব্বর চেঁচাচ্ছেন, 'পাকাড় লিয়া' 'পাকাড় লিয়া' বলে। মোরাত আউট। জব্বর কী শক্ত ক্যাচই না ধরে ফেললেন।

নাটক জমছে। শিকারের গন্ধ পেয়ে বাংলাও যেন ফুঁসিয়ে উঠছে। দেখতে দেখতে লংফিল্ডের বলে প্রথমে আজমৎ হায়াতের এবং একটু পরে ওয়াজির আলির স্টাম্প ছিটকে গেল। প্রথম ইনিংসের অপরাজিত নায়ক ওয়াজির ফিরলেন মাত্র দশ করেই। এবং তিনি ফিরতেই দক্ষিণ পাঞ্জাবের আশা-ভরসা কমতে কমতে প্রায় শূন্যেই বিলীন হতে চললো।

তবু অমরনাথ ছিলেন। ছিলেন, রোশনলালও। সাধ্যমতো চেষ্টায় কামাই পড়লো না। কিন্তু নিষ্ঠা ও কর্মগুণে ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতা ততোক্ষণে যে দল আদায় করে নিতে পেরেছে তার পথ জুড়ে দাঁড়ায় এমন সাধ্য কার?

অনেকক্ষণ হাত গুটিয়ে রেখেছিলেন বেরহেগু—বাংলার পেস বোলার স্ট্যানলি বেরহেগু। এবার আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এসেই অমরনাথের স্ট্যাম্প গুঁড়িয়ে দিলেন। সে কী জীবন্ত দৃশ্য। বেল্ ছিটকে কোথায় পালিয়েছে। লালা আউট মানেই খেল খতম। বেলা সাড়ে চারটের মধ্যেই সব শেষ। বাংলার জিৎ ১৭৮ রানে। দক্ষিণ পাঞ্জাব তাদের দ্বিতীয় ইনিংসকে ১৭৫ মিনিটের বেশি টেনে নিয়ে যেতে পারে নি।

প্রথম ইনিংসে শতেক রানে এগিয়ে থেকেও হেরে গেল দক্ষিণ পাঞ্জাব। এই দুঃখ কী সহজে যাবার।

যাক গে সে কথা। সেবার রণজি ফাইনালে পিছিয়ে-থাকা বাংলা শেষ পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পেরেছিল দলগত সংহতির কল্যাণে। এগারটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়েই একটি দল। প্রয়োজনে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সংহত হতে পেরেছিল। প্রাণ ঢেলে ফিল্ডিং করেছিলেন তারা ভট্টাচার্য, জব্বর ও ভ্যাণ্ডারগুচ, যথা সময়ে শক্ত হাতে ব্যাটটিকে বাগিয়ে ধরতে কসুর করেন নি ম্যালকম, ভ্যাণ্ডারগুচ, মিলার, কার্তিক, জব্বর, জিতেন ব্যানার্জি এবং সিম্ সুইং ও স্পিনের ফাঁদে ও পক্ষকে জড়িয়ে ধরায় মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন লংফিল্ড ও কমল ভট্টাচার্য। লংফিল্ডের আউট সুইং, অফ্ কাটার এবং বিক্ষিপ্ত লেগব্রেক, কমল ভট্টাচার্যের আউট সুইংয়ের সঙ্গে মেশানো অফ-ব্রেক, একই ধরনের বলের ভিন্নধর্মী মেজাজের সামনে পড়ে কি না অস্বস্তি ভোগ করতে বাধ্য হয়েছেন। যখন যেমনটি দরকার ঠিক সেইটিই করে তুলতে

পেরেছিল বলেই বাংলা দল সেদিন দুঃসাধ্যকে সহজসাধ্য করে যে তুলতে পেরেছিল তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

সেই ফাইনালের সংক্ষিপ্ত স্কোর :

বাংলা : ২২২ (কার্তিক বসু ৪৮, বেরহেণ্ড ৩৯, ভ্যাণ্ডারগুচ ৩৫, ম্যালকম ৩০, স্কিনার ২২, লংফিল্ড ২২, আমীর এলাহী ৭৩ রানে ৫, লালা অমরনাথ ৪৪ রানে ৪) ও ৪১৮ (ম্যালকম ৯১, মিলার ৮৫, ভ্যাণ্ডারগুচ ৬৫, জব্বর ৫৮, জিতেন ব্যানার্জি অপরাজিত ২৯, মোরাত হোসেন ৯৭ রানে ৪, লালা অমরনাথ ৯৭ রানে ৩)।

দক্ষিণ পাঞ্জাব : ৩২৮ (ওয়াজির আলি ২২২ নট-আউট, আজমৎ হায়াৎ ২১, কমল ভট্টাচার্য ১০০ রানে ৫, জিতেন ব্যানার্জি ৪৯ রানে ২, লংফিল্ড ৬৮ রানে ১, বেরহেণ্ড ৩৬ রানে ১) ও ১৩৪ (অমরনাথ ৩৭, রোসনলাল ৩৫, সুরজিৎ সিং ১৫, লংফিল্ড ৪৮ রানে ৪, কমল ভট্টাচার্য ৫৭ রানে ৩, তারা ভট্টাচার্য, বেরহেণ্ড ও ম্যালকম একটি করে উইকেট।

টাই টেস্ট : ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ বনাম অস্ট্রেলিয়া

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

১৯৬০ সালের ৯ই ডিসেম্বর। ব্রিসবেন-মাঠ। হাজার দশেক দর্শক মাঠে হাজির। বাইশ জন খেলোয়াড়ের দু'টি দল ক্রিকেট খেলবে। সিরিজের প্রথম টেস্টম্যাচ—অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের মধ্যে।

৯ই ডিসেম্বর যারা খেলতে নামল, তাদের মধ্যে আছেন ওরেল—বহুযুদ্ধের সংগ্রামসিংহ, ছত্রিশ বছর বয়সেও ব্যাট ধরে রান করতে পারেন, বল দিলে পেয়ে যান উইকেট, প্রসন্ন ও প্রফুল্ল ব্যক্তিত্বে মাঠে থাকলেই যিনি মাঠের রাজকুমার। হাটনের সর্বোচ্চ টেস্ট-স্কোর ভঙ্গকারী সোবার্সকে দেখা গেল—যাঁর প্রথমদিকের ব্যর্থ খেলাগুলি তাঁর বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ান সমালোচকদের সংশয়-কুটিল ক'রে রেখেছিল। ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ২৫২ রানের (এবং অন্যত্র এই জাতীয় আরো-কিছু ইনিংসের) কানহাই নেমেছেন, যিনি অস্ট্রেলিয়ান-দের প্রশংসা পেলেও এখনো প্রত্যয় পাননি সম্পূর্ণ, কারণ এ-ধরনের হঠাৎ ঝলক টেস্টের আগে আরো অনেকের মধ্যে পূর্বে দেখা গেছে, যথা ভারতীয় অমরনাথ। বাকি ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আছেন সি হাণ্ট—ওপেনিং-ব্যাটসম্যানের পক্ষে বিস্ময়করভাবে স্বাধীন স্ট্রোক-প্লেয়ার; আলেকজাণ্ডার—উইকেটকীপার হলেও গণ্য ব্যাটসম্যান; রামাধীন—আগে আশ্চর্যজনক বল দিতেন, এখনো ভালো বল দেন মাঝে-মাঝে; ভ্যালেণ্টাইন—রীতিমাফিক স্পিনে অস্ট্রেলিয়ানদের যিনি দাবিয়ে রেখেছিলেন ১৯৫১-৫২ সিরিজে, এবারও এই প্রত্যাশায় তাঁকে আনা হয়েছে; এবং হল—

হল একটা বৃহৎ ব্যাপার। যেমন চেহারা, তেমনি বলের জোর। তেমনি মেজাজ। বুনো বোলিংয়ে ভয়ঙ্কর, সরল প্রাকৃতিক হাসিতে স্বচ্ছ হৃদয়। মেয়েদের কাছে জ্যান্ত আফ্রিকান লোকশিল্প। সে না থাকলে মাঠে মাতিয়ে রাখবে কে? সাঁ ক'রে উইকেট উড়িয়ে দেওয়ার মতো বীরকর্ম ছাড়াও কে ভঙ্গি ক'রে হাসাবে মাঠে—ব্যাট ধরতে না-জেনেও কে প্রচণ্ড ব্যাটিং ক'রে মাতাবে সকলকে?

সেই হল আছেন মাঠে। যে হল হয়তো কিছু এলোমেলো, কিন্তু যুদ্ধকালে এলোমেলো বোমাবর্ষণে ধূলিসাৎ ক'রে দিতে পারে জনপদ—সেই হল।

অস্ট্রেলিয়ান-শিবিরের কেন্দ্রে সেনাপতি বেনোড—মর্যাদায় ধীর, বুদ্ধিতে কুশাগ্র, বলে বিষম এবং অধিনায়কতায় উদ্দীপক। বেনোডই ইদানীং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেগব্রেক বোলার। তাঁর অধিনায়ককালে অস্ট্রেলিয়া কোন সিরিজ হারায় নি। এক কথায় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের নতুন যুদ্ধপরিষদে তিনি যোগ্য প্রধান সেনাপতি। বেনোডের পরেই আসছেন বেনোডের বন্ধু ডেভিডসন। বেনোড বলেন, আমার আগেই সে আছে।—'পৃথিবীতে এখন শ্রেষ্ঠ অল-রাউণ্ডার কে, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেকে আমি ও ডেভিডসন, এই দু'জনের নাম ক'রে থাকে, কিন্তু কথাটা মূল্যহীন, কারণ অ্যালানই যে শ্রেষ্ঠ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, থাকতে পারে না'—বেনোড লিখেছেন।

ডেভিডসনের বল এবং ব্যাট, গ্রাউটের উইকেটকীপিং, নতুন তারকা সিম্পসনের অনর্গল রানের সম্ভাবনা, ম্যাকডোনাল্ডের ধীর আত্মরক্ষা, ম্যাকে ও ফ্যাভেলের সময়মতো এগিয়ে আসা, এবং হার্ভে ও ও'নীলের প্রতিভা।

টসে জিতে ওরেল ব্যাট তুলে দিলেন হাণ্ট ও স্মিথের হাতে। দিনের শেষে ব্যাট হাতে ক'রে ফিরে এলেন আলেকজাণ্ডার এবং রামাধীন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করেছে ৭ উইকেটে ৩৫৯। ক্রিকেট এর থেকে আর কোন্ উঁচুতে উঠবে!

সাড়ে তিনশোর উপরে রান একদিনে, যেখানে তিনটে উইকেট পড়ে গিয়েছিল ৬৫ রানের মধ্যে। হাণ্ট এবং স্মিথ সূচনায় নেমে ব্যাটের নতুন প্রয়োগ-বিধি দেখিয়েছিলেন—ডেভিডসনের তৃতীয় বল বাউণ্ডারিতে গিয়েছিল হাণ্টের প্রচণ্ড তাড়নায়, তার পরের বলটিও, সহযোগী ক্যামি স্মিথও বাউণ্ডারির সন্ধানে পেছিয়ে ছিলেন না, আর পিছিয়ে ছিলেন না ডেভিডসন, মার খেয়ে তিনিও ফিরে মার দিলেন—হাণ্ট, স্মিথ এবং কানহাই তিনজনই ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে বিদায় নিলেন ডেভিডসনের ধাক্কায়।

দু'টো উইকেট পড়বার পরে সোবার্স নেমেছিলেন। তাঁর মরণারতি দেখা গেল ডেভিডসনের অফ-স্টাম্পের বাইরের বলে ব্যাট চালাবার বাসনা থেকে। বড় ব্যাটসম্যানের লক্ষণ সোবার্স এখনো দেখাননি, বেনোড তাঁর কাছে যেন খুবই দুর্জ্ঞেয়, বিপদের মুখে যথেষ্ট বিবেচক নন তিনি, কিন্তু—

৬৫ রানে তৃতীয় উইকেট পড়বার পরে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের চতুর্থ উইকেট পড়েছিল ২৩৯ রানে। সে উইকেট সোবার্সের।

সোবার্স—১৩২।

সোবার্স ছাড়া ভাল রান করেছিলেন প্রথম দিনে ওরেল—৬৫—গাম্ভীর্যে উন্নত যে-ইনিসংটির উপরে সোবার্সের পরমাশ্চর্য ১৩২ নির্মিত হয়েছিল; সলোমন—৬৫—প্রয়োজনীয় একটি রানসংখ্যা—নয়নমোহন না হলেও রীতি-সিদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং আলেকজাণ্ডার নট-আউট ২১—১০৫ মিনিটের ধৈর্যের সৃষ্টি। প্রথম দিনের মূল কথা, সোবার্স।

যে-ডেভিডসন এক ঘণ্টার মধ্যে মুঠোখানেক রানের বিনিময়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন স্মিথ, হাণ্ট এবং কানহাইকে, সেই ডেভিডসনের পরবর্তী উৎকৃষ্ট বলগুলি সোবার্সকে পরীক্ষা করবার ও পরীক্ষান্তে মূল্যবান ক'রে তুলবার কষ্টি-পাথর। বেনোডেরও সেই ভূমিকা।

বেনোডকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখছিলেন সোবার্স। এই লোকটা—এই লোকটাই আমাকে সিডনিতে বোল্ড ক'রে দিয়েছে—লোকটাকে আজ হাতের ব্যাট দিয়ে একবার মেপে দেখব—ওকে শেষ করবই—ব্যস্ততার দরকার কি, নির্বিকার সংহার করি না কেন—দেখি না লোকটার জারিজুরি কতখানি—সোবার্স ভেবে চলেন। বেনোডের দ্বিতীয় ওভার লক্ষ্য করার পর তৃতীয় ওভারের চার বলের তিনটি বল পাগলা-বেগে ছুটে গেল বাউণ্ডারিতে। তৃতীয় বাউণ্ডারির সঙ্গে-সঙ্গে সোবার্স পৌঁছে গেলেন ৫০ রানে—সময় ৫৭ মিনিট, তার মধ্যে ৮টি চার। সোবার্স-ওরেল জুটির ৫০ হল ৪১ মিনিটে—সোবার্স করেছেন ৪১, ওরেল ৯। লাঞ্চের সময়ে ১২০ মিনিটে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের ৩—১৩০।

লাঞ্চের পরে সোবার্স ৩১টি টেস্টে ৩০০০ রানে পৌঁছলেন, ৭৯ রান ক'রে। বেনোডকে সোজা বাউণ্ডারিতে পাঠালে জুটির ১০০ রান হল ৯০ মিনিটে, তার মধ্যে ওরেলের ৩৮, সোবার্সের ৬২। সোবার্স সেঞ্চুরি করলেন। ১২৫ মিনিট সময়, ১৫টি বাউণ্ডারি। তাঁর দশম টেস্ট-সেঞ্চুরি।

২০০ রান হওয়ায় নতুন বল এল। নতুন বল নতুন প্রেরণা দিল, বোলারদের নয়, ব্যাটসম্যানদের। সোবার্সের মারের চোটে জখম হাত বগলে পুরে ম্যাকডোনাল্ড নাচতে লাগলেন।

সোবার্স বিদায় নিলেন যাকে বলা হয়েছে, 'দিনের সবচেয়ে বাজে বলে।' সোবার্সের রান যখন ১৩২ (বাউণ্ডারিতে ৮৪), খেলেছেন ১৭৪ মিনিট, বোলারেরা যখন আকাশের দিকে হাত সুইং ক'রে গডকে ডাকছে বলে-বলে,

ঠিক তখনি লেগস্টাম্প থেকে অনেক দূরের একটি ওয়াইড ফুলটসকে ব্যাটের পিছন দিকে লাগিয়ে মিড অনে ক্লাইনের হাতে শ্রীযুক্ত সোবার্স তুলে দিলেন।

দ্বিতীয় দিনে আরও প্রায় একশো রান যোগ ক'রে ৪৫৩ রানে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হল। ৪৪৫ মিনিটে ৪৫৩ রান, ক্রিকেটের পরিভাষায়, ঘড়ির থেকে দ্রুত-গতি। প্রথম ইনিংস আরম্ভ ক'রে অস্ট্রেলিয়া তদুত্তরে দিনশেষে করল তিন উইকেটে ১৯৬।

দ্বিতীয় দিনে মোট রান উঠেছিল ২৯০। আধুনিক টেস্ট-ক্রিকেটের পক্ষে রীতিমত দ্রুত রান, কিন্তু ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার এই সিরিজের পক্ষে যথেষ্ট দ্রুত নয়। অস্ট্রেলিয়ার রান-গতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ ছিল, তার জন্য দায়ী করা হয়েছে ওরেলকে, যিনি 'টাইট' আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তা করেছিলেন বুদ্ধিমানের মতো। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে বেনোডের সমালোচনার কথা। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ সুমহান ক্রিকেট খেলে, দিনে সাড়ে তিনশো রান করে, কিন্তু তা করে একটু বেশি রকম দ্রুতগতিতে।

আলেকজাণ্ডার প্রথমদিনে ধীর গতিতে খেলে ১০৫ মিনিটে ২১ রান করলেও দ্বিতীয় দিনে অপেক্ষাকৃত দ্রুত রান তুলেছিলেন—৮৫ মিনিটে ৩৯—তাঁর ভূমিকা ছিল দলের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ—এসেছিলেন দলের ২৮৩ রানের সময়, গিয়েছিলেন ৪৫৩ রানের মাথায়—মোট রান করেছিলেন ৬০।

আলেকজাণ্ডারের মূল্যবান ইনিংসে ছিল সঞ্চয়ের সম্পদ, অপরদিকে দু' হাতে ঝড়ের 'ফল' কুড়িয়েছিলেন ওয়েসলি হল। রামাধীন আউট হবার পরে হল খেলতে নেমে দেখিয়ে দিলেন নিজের 'শেক্সপীরীয়' প্রতিভা, মধুসূদন দত্ত যেমন দেখিয়েছিলেন। হল মাঠে ব্যাট নিয়ে কৌতুক করেন, 'লাগে তুক না লাগে তাক' বলে ভীমের গদা চালান, কিন্তু ছোকরা বড় সিরিয়াস, বল ফসকে গেলে আর একবার বাড়তি ব্যাট চালিয়ে মাঠেই অনুশীলনকর্মটা সেরে নেন—দর্শকেরা তাদের হাসির কর্মটা সেরে নেয় সেই অবসরে। সেই হলই যখন ৬৯ মিনিটে নিজস্ব ৫০ রান করলেন, তখন ঐ রানসংখ্যার মধ্যে এমন কতকগুলি মার দিল, যা সমালোচকের মতে, তাঁর গুরু ওরেল নিজের ব্যাটে তুলে নিতে পারেন সানন্দে। নতুন বলে মেকিফকে তাঁর প্রথম ওভারে হল-আলেকজাণ্ডার ১৯ রানের মনোরম একটি ঠেঙানি দিলেন (মেকিফের তিন

ওভারে ৩৯ রান)—তা দেখে বিমুগ্ধ বেনোড লিখলেন—এও ক্রিকেট, সেও ক্রিকেট।

হল-আলেকজাণ্ডারের শেষ ৫০ হল ৩৫ মিনিটে।

হল এগিয়ে ওড়াতে গিয়ে স্টাম্পড হলেন।

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের রান-রণোৎসবের পরে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের মধ্যে দর্শকেরা কিছু দিলখুশ্ ভোজ পায়নি। তারা বিরক্ত হয়েছে নিজ দলের নেতিতে, কারণ তারা অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের নব নীতিতে।

অধিকন্তু বলা যায়, অস্ট্রেলিয়ান-ব্যাটিং শেষ পর্যন্ত রানসংখ্যায় নিন্দনীয় না হলেও (৩-১৯৬) ছেয়ে ছিল অবিশ্বাসে ও অস্বস্তিতে। ম্যাকডোনাল্ডের মোটামুটি ইনিংসটিকে বাদ দিলে হার্ভে, সিম্পসন বা ও'নীলের ইনিংসের মধ্যে প্রশংসাযোগ্য বস্তু প্রায় ছিল না। হার্ভের মধ্যে ৬৩ মিনিট ধরে হার্ভের কোনো এক প্রেত খেলা করছিল, যখন কেঁদে-কেঁদে তিনি ১৫টি রান যোগাড় করে-ছিলেন, এবং তাঁর আউট, বলতেই হবে, তাঁর মাঠলৌকিক মুক্তি।

৯২ রানের মাথায় বিদায়ী সিম্পসন সেঞ্চুরি না করতে পারায় টেস্ট-সেঞ্চুরির মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। প্রথম বাউণ্ডারি করবার আগে তাঁকে ১৪০ মিনিট সময় ক্রীজে কাটাতে হয়েছে। অনসাইডে তিনি যে-সহজ ক্যাচ তুলেছেন, তা তিনজন ফিল্ডসম্যানের মাঝখানে মাটিতে খসে পড়েছে; ৭৬ রানের মাথায় কট-বিহাইণ্ডের জোরালো আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে; ৮৮ রানের মাথায় সর্ট লেগে ওরেলের বলে স্মিথের হাতে তাঁর ধরা পড়া উচিত ছিল; এবং বেশ কয়েকবার নানা জনের বলে নেহাতই বেঁচেছে তাঁর স্টাম্প।

ও'নীলের অবস্থাও তথৈবচ। ও'নীলের যৌবনমধ্যাহ্নে হলের কৃষ্ণছায়া-পাত। হল বাম্পারে বাপ্ বলিয়ে ছেড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ানদের। বেল্টের নীচে এবং বেল্টের উপরে হলের হলাহল যখন আঘাত করতে লাগল, তখন অস্থির ও'নীল কটিবেদনায় সুনীল হয়ে গিয়েছিলেন। ৮৯ মিনিটে এমনিতে মারিয়ে ও'নীলের আটাশ রান—তাঁর টিকে-থাকার চেষ্টাকে দেখিয়ে দিয়েছে মাত্র। হলা-'হল' পান ক'রে টিকে থাকলে সত্যই মৃত্যুঞ্জয় হবার সম্ভাবনা।

তৃতীয় দিনের খেলা চিহ্নিত হোক দুই বীরের নামে—ও'নীল ও হল। ও'নীল অস্ট্রেলিয়ার রণতরীর পালে রানের বাতাস ভরে দিয়েছিলেন, ঝড়ের

গতিতে সে তরী যখন ছুটছিল, হলের হাতের গোলা দু'একটা পাল ফুটো ক'রে সে গতি ধর্তব্যের মধ্যে এনে দিল।

ও'নীল ১৮১ রান করেছিলেন।

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের ৪৫৩ রানের স্থূল ইনিংসকে অস্ট্রেলিয়া স্থূলতায় ছাড়িয়ে গেল ও'নীলের রান-মেদের কল্যাণে।

ও'নীলের সঙ্গে রানসংগ্রহে সহায়তা করেছিলেন ফ্যাভেল ও ডেভিডসন। ব্যাটিং-সৌকর্যে এঁরা কেউই এই ইনিংসে পেছিয়ে ছিলেন না ও'নীলের থেকে। ফ্যাভেল এক রান ক'রে নৈশ প্রহরী ছিলেন, বিশ্রাম-দিনের পরে উক্ত প্রহরী প্রহারকার্যের নমুনা দিলেন। হলকে তিনি একেবারেই শ্রদ্ধা করলেন না। অস্ট্রেলিয়ার সেই দিনের প্রথম ৫০ রান হল ৫৮ মিনিটে, ফ্যাভেল করলেন তার মধ্যে ২৮। এখানেও না-থেকে রানলোলুপ ফ্যাভেল ভ্যালেণ্টাইনের দু'টি বলকে পর-পর মিড-অফের উপর দিয়ে শূন্যমার্গে বেড়ার বাইরে বিদায় ক'রে দিলেন। টেস্ট-ক্রিকেটে পর-পর দু'টি ওভার-বাউণ্ডারি! দর্শনীয় ব্যাপার বটে। অর্ধশতের যখন পাঁচ রান কম, তখন ফ্যাভেল রান-আউট হয়ে বিদায় নিলেন।

ডেভিডসনের ৪৪ রান নিখুঁত ব্যাটিংয়ের সৃষ্টি। পৃথিবীর এক নম্বর অলরাউণ্ডার দেখিয়ে দিলেন—অলরাউণ্ডার মানে ব্যাটিং বা বোলিং যে-কোন একটি গুণে দলে স্থান পাবার যোগ্যতা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও'নীলই রান-ভাণ্ডারে প্রধান সঞ্চয় দিয়ে গেছেন। তাঁর ৪০১ মিনিট ব্যাপী জীবনের সংগ্রহ (১৮১ রান) তিনি অস্ট্রেলিয়ার কোষাগারে জমা দিলেও, সে বদান্যতা সত্ত্বেও, সকলেই বলতে বাধ্য হয়েছে—ঐ জীবনের প্রথম অংশ সন্দেহমুক্ত ও নির্মল ছিল না। অনির্দিষ্ট ভিত্তির উপর নির্মিত এক অসাধারণ ইনিংস খেলেছিলেন ও'নীল।

ভাগ্যের বেড়ায় রক্ষিত ছিল ও'নীলের এই ইনিংসের করুণ শৈশব। সে ভাগ্যের নমুনা :

ও'নীলের ৪৭ রান—ওরেলের বল—সেকেণ্ড স্লিপে সোবার্সের হাতে ক্যাচ—ভূপতিত।

ও'নীলের ৫২ রান—সোবার্সের বল—ও'নীলের পেটে লেগে বল ধাক্কা দিল লেগ স্টাম্পকে।—বেল অবিচলিত।

ও'নীলের ৫৪ রান—ভ্যালেন্টাইনের বল—একটি সোজা ক্যাচ ঢুকে গেল অভ্রান্তহস্ত আলেকজাণ্ডারের দুই গ্লাভসের মধ্যে।—বলের পুনশ্চ ভূমিলাভ।

বরাত এবং বরাত এবং বরাত। ত্রয়ী বরাত।

৫৮ রানের মাথায় ও'নীল খাপ খুললেন! প্রথম প্রাণবন্ত অফ-ড্রাইভ বেরিয়ে এল ব্যাট থেকে। যে ও'নীল ১৪৮ মিনিট নিয়েছিলেন প্রথম ৫০ রান করতে, যার মধ্যে বাউণ্ডারি ছিল মাত্র ৬টি, সেই ও'নীল তারপর বাউণ্ডারি ছড়াতে লাগলেন যথেচ্ছ। রামাধীনের এক ওভারে তিনটে বাউণ্ডারি করলেন, ৮০-এর কোঠায় দাঁড়িয়ে পর-পর চারটে বাউণ্ডারিতে প্রায় সেঞ্চুরিতে পৌঁছে গেলেন; ৭০ থেকে ১২০-এর মধ্যে ১১টি বাউণ্ডারি বেরুল; চায়ের আগের দু'ঘণ্টায় মিনিটে এক রান হতে লাগল অস্ট্রেলিয়ার।

অস্ট্রেলিয়ার এখন পাঁচ উইকেটে ৪৬৯ রান। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের রানসংখ্যা পেরিয়ে গেছে। হাতে পাঁচটি উইকেট। অস্ট্রেলিয়া মাথায় চড়ে আছে। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের কোনো ভরসা নেই। সকালে পাঁচ ওভারে ৩৭ রান দেবার পরে প্রাণহীন হলকে ওরেল বিদায় দিয়েছিলেন। বিকালে নতুন বল হাতে নিয়েও হল নিরুৎসাহ। তাঁর বাম্পারের মুখে দাঁড়িয়ে ডেভিডসন 'বিদ্যুচ্চার' মেরেছেন। হলকে সরিয়ে নেওয়া হবে নিশ্চিত, এই তাঁর শেষ ওভার—

৩৬ মিনিটের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার শেষ পাঁচটি উইকেট পড়ে গেল ৩৬ রানে—কার্যত সবই হলের কাণ্ডে। আগে হলের অ্যাভারেজ ছিল : ০—১২২। শেষ তিন ওভারে হল পেলেন ৪—১৮।

অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে, কিন্তু ৫২-এর বেশি রানে নয়।

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল চমৎকারভাবে, অর্থাৎ ওয়েস্ট-ইণ্ডিজভাবে। তাদের রানখাতার প্রথম সংখ্যা চার। তাদের প্রাথমিক রানগতির একটা হিসেব :

৩০ মিনিটে ৩০ : ৩৫ মিনিটে ৪১ : ৪৮ মিনিটে ৫০ : ৬০ মিনিটে ৭৫ : ৯৮ মিনিটে ১০০।

সকল সম্ভাবনাকে কার্যত নিকেশ ক'রে দিলেন ডেভিডসন, যখন ১২৭ রানে কানহাইয়ের চতুর্থ উইকেট পড়ে গেল। ওরেল বাঁধবার চেষ্টা করলেন। তাঁর ১৫১ মিনিটে ৬৫ রানের (প্রথম ইনিংসে ওরেলের একই রান—১৫৯ মিনিটে ৬৫) অতিমূল্য ইনিংস, কিংবা সলোমান বা আলেকজাণ্ডারের সুধৈর্য আত্মরক্ষা—কোনো কিছুই আসন্ন বিপদকে দূর করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

চতুর্থ দিনের শেষে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের—৯ উইকেটে ২৫৯ রান।

ব্রিসবেন টেস্টের পঞ্চম দিন।

খেলার বাঁশী এমন পঞ্চমে কখনো বাজেনি ইতিহাসে।

সাংবাদিক লিখেছেন—সেদিন কী খেলা হয়েছিল, তা কেউ নিজে না দেখলে তাকে মুখে বলে বিশ্বাস করানো যাবে না।

তিনি আরো লিখেছেন—দেখলেও বিশ্বাস হবে না। একি সত্য, না স্বপ্ন, না মায়া, না ভ্রম ?

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের উপর নির্ভর ক'রে আমি যে-বর্ণনা লিখছি তা পড়লেও কি বিশ্বাস করবেন পাঠক ?

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৬০ সাল। ৯ উইকেটে ১৫৯-করা ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ আরো ৪০ মিনিট ব্যাট ক রে ২৮৪ রানে ইনিংস শেষ করল। হল এবং ভ্যালেণ্টাইন ২৫ রান যোগ করলেন। মূল্যবান ২৫ রানের সঞ্চয় এবং মূল্যবান ৪০ মিনিটের ক্ষয়। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের মোট রান হয়েছে ৭৩৭। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৫০৫। ২৩৩ রান করলেই জিততে পারবে। হাতে আছে ৩১০ মিনিট সময় এবং এগারোজন ব্যাটসম্যান। পিচ খারাপ হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার জেতার খুবই সম্ভাবনা। ড্র আটকায় কে ? অস্ট্রেলিয়ার অবস্থা রীতিমত ভালো।

মোটেই ভালো নয়। লাঞ্চের সময় প্যাভিলিয়নের দিকে ফিরতে-ফিরতে ম্যাকডোনাল্ড এবং ও'নীল সেই কথাই ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হল উইকেটের সামনের দু'টি বৃহৎ 'জঞ্জাল' পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন। পাঁজরে প্যাড-লাগানো ম্যাকডোনাল্ড এখনো টিকে থাকলেও হলের দ্বিতীয় ওভারে সিম্পসনের থতমত ব্যাটের ক্যাচ স্কোয়ার-লেগ থেকে ধরেছেন 'অতিরিক্ত' গিবস, এবং পরবর্তী ওভারে নীল হার্ভের স্নিককে স্লিপ থেকে প্রথমে ঝাঁপ দিয়ে ওপরে ডিগবাজি খেয়ে, আঙুল ভেঙে, ধরে রেখেছেন সোবার্স। আঙুল ভেঙেছিল সোবার্সের, আসলে কপাল ভেঙেছিল অস্ট্রেলিয়ার।

অস্ট্রেলিয়া—২—৭। হল, প্রথম পাঁচ ওভারে—২—৬।

লাঞ্চের সময়ে :

৭০ মিনিটে অস্ট্রেলিয়া—২—২৮ ; ৭০ মিনিটে ম্যাকডোনাল্ড—১৪ ; ৪৪ মিনিটে ও'নীল—৮।

লাঞ্চের পরে অস্ট্রেলিয়া আরো নামতে লাগল। ও'নীল অবশ্য চমৎকার শুরু করেছিলেন।

তিনি ড্রাইভ করলেন, গ্লান্স করলেন, পর-পর দু'বার হলের বলে লেটকাট করে বাউণ্ডারি করলেন। ওরেল কোনো থার্ডম্যান দেননি। অনেকেই ওরেলের বোকামিতে রাগ করতে লাগল! ও'নীলের খুব আনন্দ, আবার কাট করতে গেলেন—এবার কাটলেন নিজেকে—আলেকজাণ্ডার ধরে নিয়েছেন তাঁকে।

হল—৮·৭ ওভার, ৩—৩৩ উইকেট।

ম্যাকডোনাল্ডের বিদায় তারপর। ওরেলের হাতে বোল্ড। ৯১ মিনিটের জন্য তাঁর দুঃখদৃশ্য অবস্থান, ১৬ রান, কোনো বাউণ্ডারি নেই।

ও'নীলের পর ফ্যাভেল এসেছিলেন। ওরেল লেগের দিকে সলোমনকে কিছুটা সরিয়ে দিলেন। হল অফ-স্টাম্পের বাইরে আলগা বল দিলেন, চমৎকার স্কোয়ার-কাট ক'রে বাউণ্ডারি করলেন ফ্যাভেল। দু' বল পরে আসল বলটি পড়ল—ফ্যাভেল লোভের অভ্যাসমত পা বাড়িয়ে ব্যাট চালালেন—এবারকার স্কোয়ার-কাট লেগ-সাইডে সলোমনের হাতে।

দুটো বেজে কুড়ি। অস্ট্রেলিয়া, ৫—৫৭। হল,—৪—৩৭, ১০·৩ ওভারে।

অস্ট্রেলিয়ার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন হল। ২০০ মিনিটে অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে ১৭৬ রান—শেষের পাঁচ জন ব্যাটসম্যানের দ্বারা।

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের হাতের মুঠোয়—জয়!

চা-পানের পূর্বে আরো একটা উইকেট পড়েছে—ম্যাকের। সে উইকেট পড়েছিল ৯২ রানে। রামাধীন ম্যাকেকে নিজস্ব ২৮ রানের মাথায় বোল্ড করলেন।

চা-পানের সময় অস্ট্রেলিয়ার হাতে চারটি উইকেট এবং ১২০ মিনিট সময়, জয়ের জন্য প্রয়োজন ১২৩ রান।

তার থেকে অনেক সহজ কাজ ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের—ঐ সময়ের ও ঐ রানের মধ্যে মাত্র চার উইকেটের লেজটি খসিয়ে দেওয়া।

ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান ড্রেসিংরুমে উৎফুল্ল মুখ, সহাস্য আগ্রহ এবং পুরু ঠোঁটে ক্যালিপসোর সুর।

সব বদলে গেল। হাসি শুকিয়ে গেল ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান ড্রেসিংরুম থেকে।

সুর গেল থেমে। অস্ট্রেলিয়ান-শিবিরে মেঘভাঙা সূর্য। সাড়ে পাঁচটা। দেড়ঘণ্টা কেটে গেছে, ইতিমধ্যে হল নতুন বল হাতে নিয়েছেন। ডেভিডসন ও বেনোড এখনো খেলছেন। অস্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ২০৬। খেলা শেষ হতে ৩০ মিনিট সময় বাকি। ২৭ রান করতে হবে। হাতে চারটে উইকেট। একটা ছেলেমানুষ বিধাতার হাতে এই খেলাটির ঘুঁটি। রাজার সঙ্গে প্রজার ভাগ্যবিনিময় হচ্ছে কল্পনাতীত খুশিতে যথেচ্ছ লীলায়।

অবস্থার পরিবর্তনের ইতিহাসটা উল্টে দেখা যাক।

৬ উইকেটে ১১০ রান নিয়ে চা-পান করতে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।

চা-পানের পরে ডেভিডসন স্ফূর্তিভরে খেলতে লাগলেন।

চারটে বেজে দশ—অস্ট্রেলিয়ার রান ১২৮—খেলা শেষ হতে ১০০ মিনিট বাকি আছে—জয়ের জন্য চাই ১০৬ রান। মুঠি আলগা হয়ে যাচ্ছে, ওরেল বুঝলেন।

চারটে চল্লিশ মিনিটের সময় নিজের হাতে বল নিলেন ওরেল। বেনোডের হাতে উৎকৃষ্ট বাউণ্ডারির চেহারা দেখলেন তখনি। অস্ট্রেলিয়ার ৬—১৫৩। ৭৫ মিনিট সময় বাকি।

ওরেল 'ঠাসা' বল দিয়ে গেলেও 'রহস্যময়' রামাধীন মার খেতে লাগলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ফলে—

অস্ট্রেলিয়া ৬—১৬৬। ৬৫ মিনিট বাকি। ৬৭ রান দরকার।

৫৪ রান করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে—এই অবস্থায় সোবার্স এলেন—বেনোডের হাতে চার-এর মার খেলেন—অস্ট্রেলিয়ার দরকার ৪৯ রান। সময় আছে ৪৮ মিনিট।

৪৫ রান দরকার ৪৬ মিনিটে—রামাধীনকে ডেভিডসন সোজা বাউণ্ডারিতে পাঠিয়েছেন।

আবার রামাধীনের বলে ডেভিডসনের বাউণ্ডারি। ডেভিড-বেনোড জুটির ১০০ রান—৯৫ মিনিটে। ডেভিডসন—৬০, বেনোড- ৪১।

বেনোড-ডেভিড অদ্ভুত দৌড়চ্ছেন উইকেটের মধ্যে। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের ফিল্ডিং নাড়া খাচ্ছে ভীষণভাবে। নার্ভ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বেহিসেবী চলাফেরা, এলোমেলো বল ছোঁড়া।

সাড়ে পাঁচটা বাজে।

ওরেল হলের হাতে নতুন বল তুলে দিলেন।

যাও বীর!

পাঁচটা তিরিশ থেকে ছ'টা। ক্রিকেটের ইতিহাস তার সমস্ত গতি ও তরঙ্গ নিয়ে ঐ তিরিশ মিনিটে ঘনীভূত। আমাদের জীবনে অগণ্য অকৃতার্থ যুগ। সৃষ্টির মুহূর্তবিন্দু মাত্র কয়েকটি।

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ হারবেই—সকলে জানে। ওরেলও জানেন। অস্ট্রেলিয়ার হাতে চারটে উইকেট। ২৭ রান মাত্র বাকি, জয়ের জন্য। ৩০ মিনিট সময়। তবু ওরেল কী একটা অনুভব করছিলেন, কোনো এক অদৃশ্য ইঙ্গিত।

অস্ট্রেলিয়ার দরকার ২৪ রান ২৫ মিনিটে।

একে-একে রান বাড়ল, একে-একে রানের ব্যবধান কমল। হলের বলে ডেভিডসনের হুক থেকে চার হল। কুড়ি রান বাকি। অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ সর্ট রান থামাতে না পেরে বিমর্ষ রইলেন হল। একটা সুনিশ্চিত রান-আউট—তাও হল না।

বেনোড পয়েণ্টে বল ঠেলে দিয়ে রান নিতে শুরু করলেন। ডেভিডসন 'না' বলে চেঁচিয়েও, বিচিত্র ব্যাপার, বেনোডের দিকে দৌড় দিলেন। ভ্যালেণ্টাইন এই গোলমালের মধ্যে বল ছুঁড়ে দিলেন বেনোডের প্রান্তে, যেখানে ডেভিডসন প্রায় পৌঁছে গেছেন। ডেভিডসন তখন তাঁর দীর্ঘ হতাশাজনক উল্টো-দৌড় শুরু করলেন, কিন্তু আলেকজাণ্ডার, ভ্যালেণ্টাইনের বল হাতে পেয়েও, ধড়পড় ক'রে, আপ্রাণ চেষ্টা করেও, অপর প্রান্তে হলের হাতে বল পৌঁছে দিতে পারলেন না। ডেভিডসন হুমড়ি খেয়ে ফিরে গেলেন। ভাগ্য! এমন পরিত্রাণ! ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা একেবারে মুষড়ে পড়ল। উত্তেজনায় ফেটে পড়ল সারা মাঠ।

অস্ট্রেলিয়ানরা এবার অদম্য, উচ্ছ্বসিত। সোবার্সের বলে পরমানন্দে রান বাড়িয়ে চলল তারা। ওভারের শেষে বেনোড খুচরো এক রান ক'রে নিজস্ব ৫০ রানে পৌঁছলেন, ১২৪ মিনিটে।

পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। খেলা শেষ হতে ১৫ মিনিট বাকি। অস্ট্রেলিয়ার ১০ রান চাই। হাতে ৪টি উইকেট।

আরো এক রান বাড়ল—৬টা বাজতে দশ মিনিট বাকি—অস্ট্রেলিয়ার দরকার মাত্র ৯ রান।

সোবার্সের পরের ওভার। পর-পর দুটো খুচরো রান নেওয়া হল।

অস্ট্রেলিয়ার দরকার ৭ রান। হাতে ৪টে উইকেট। অবধারিত জয়।

হঠাৎ একটা তার কেটে গেল। ডেভিডসন আউট।

বেনোড স্কোয়ার-লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে মারাত্মক শর্ট-রানের চেষ্টা করেছেন। ডেভিডসন পৌঁছেও পৌঁছতে পারলেন না। সলোমন কঠিনতম 'কোণ' থেকে বল ছুঁড়েছেন। তাঁর হাতে ছিল দৈব অভ্রান্ততা। ডেভিডসন আউট। ডেভিডসনের বিদায়। ৮০ রান করেছেন।

বেনোড সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন সলোমনের দিকে—ঐ জায়গা থেকে বল ছুঁড়ে উইকেটে মারা যায়? বেনোডের সঙ্গে সমস্ত মাঠ সেই চিন্তায় ও বিস্ময়ে ব্যাপৃত রইল, ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছেন গ্রাউট।

অস্ট্রেলিয়ার ৭ রান চাই—সময় ৬ মিনিট।

সোবার্সের এই ওভারের বাকি ৪ বল ছাড়া হলের ৮ বলের আর একটি ওভার খেলা হতে পারে। মোট ১২টি বল।

সপ্তম বলে গ্রাউট একটি রান নিলেন। আর মাত্র ৬ রান দরকার। তবু সারা মাঠ হায়-হায় ক'রে উঠল—গ্রাউট করল কি—পরের ওভার যে হলের। রান দরকার, কিন্তু তবু গ্রাউটের এক রানের বাহাদুরির দরকার ছিল না।

সোবার্সের অষ্টম বল। ঐ বলে বেনোড রান নেবেনই। ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ানরা তা কিছুতে ঘটতে দেবে না।

বেনোড রান নিতে পারলেন না।

হলের শেষ ওভার। আট বলের একটি ওভার। হাতে ৩টি উইকেট। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ৬ রান দরকার। খেলা শেষ হতে ৪ মিনিট সময় বাকি সময়ের হিসেব আর করতে হবে না। ওভার শুরু হলে শেষ করতে হবেই। এখন বলের হিসেব। এক—দুই—তিন—চার…আটটি বল।

হল তার চিহ্নের উপর গিয়ে থামল—শেষ আঘাতের জন্য—বিশাল টানে বাতাসে ভরে নিল ফুসফুস্। দু'পায়ের ভর ঠিক ক'রে নিয়ে, শুরু করল দৌড়—দুই হাত এবং পা ছড়িয়ে তার ধেয়ে আসা—অপর প্রান্তের গ্রাউটের পক্ষে ভয়াবহ দৃশ্য। প্রচণ্ড গতির একটি ঠিক লেংথের বল—গ্রাউটের তলপেটে লাগল। অন্য অবস্থায় গ্রাউট মাটিতে লুটিয়ে পড়ত। এ-ক্ষেত্রেও পড়ে যাচ্ছে—সেই অবস্থায় দেখল বেনোড তার দিকে ধেয়ে আসছে। বেনোড ডাক

দেয়নি—ডাকলে ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ানরা সতর্ক হয়ে পড়ত। সুতরাং বলটি যখন তিনজন ফিল্ডসম্যানের নাকের সামনে পড়ে আছে, তখন বেনোড একটি রান নিয়ে নিলেন—যেটাতে আধখানা রানও ছিল না।

"জয়ের জন্য পাঁচ রান। বল বাকি সাতটি।"

হল একটি ভয়াবহ বাউন্সার ছাড়লেন।

সারা মাঠ লাফিয়ে উঠল। বেনোড বল ছুঁয়েছেন। উইকেট-কীপারের মাথায় বল। বলটি লুফে আবার উপরে ছুঁড়ে দিয়ে দু'হাত ছড়িয়ে আকাশ-লোকের দিকে কৃতজ্ঞতা জানালেন আলেকজাণ্ডার।

১৩৬ মিনিটে ৫২ রানের একটি অধিনায়কের ইনিংস খেলার পরে বিদায় নিলেন বেনোড।

জয়ের জন্য ৫ রান। বাকি আছে ৬টি বল। হাতে দু'টি উইকেট।

যন্ত্রণার—আবেগের—উৎকণ্ঠার লাভা গড়িয়ে পড়েছে মাঠে। ওরেল আবার বললেন—শান্ত থাকো। মেকিফ ব্যাট নিয়ে বেরুচ্ছেন—ড্রেসিংরুমে টেবিলের এক প্রান্তে বসে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছেন ক্লাইন।

নিজের হাত-পা ঠিক আছে কিনা দেখতে-দেখতে মেকিফ নামলেন। হলের তৃতীয় বল ব্যাটের মাঝখান দিয়ে আটকালেন। চতুর্থ বল—টেস্টম্যাচের ইতিহাসে একটি অসাধারণ খুচরো রান দেখা গেল।

হলের চতুর্থ বল (মেকিফের কাছে দ্বিতীয়) মেকিফ সম্পূর্ণ ফসকালেন। বল উইকেটকীপার আলেকজাণ্ডারের হাতে ঢুকে পড়েছে। গ্রাউট তারই মধ্যে ডাক দিয়ে দৌড় দিয়েছেন এবং অপর প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। হল এগিয়ে এসেছিলেন টগ্‌বগ্ করতে করতে। আলেকজাণ্ডার বলটি তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলেন, হল সেটি ধরে ছুঁড়ে দিলেন নিজ প্রান্তের উইকেটে।

মিড অন থেকে ভ্যালেণ্টাইন লাফ দিয়ে কোনোক্রমে বলটি ধরে ফেলে 'ওভার-থো' বাউণ্ডারি বাঁচালেন। ব্যালকনিতে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠেছে ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়রা।

সুতরাং আরও এক রান হল। ৪ রান বাকি জয়ের জন্য। চার বল বাকি, তা করবার জন্য।

হলের পঞ্চম বল।

পাগলামির ঝড় বয়ে গেল মাঠের উপর দিয়ে। গ্রাউট আউট! গ্রাউট

আউট? লেগ-মিড-এর উপর বল উঠে পড়েছে উঁচু হয়ে। ক্যাচ ধরতে কানহাই হাত পেতে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন—সহজ ক্যাচটি তিনিই ধরবেন। বল নেমে আসছে কানহাইয়ের হাতে—

হঠাৎ বিরাট লাফ দিয়ে কানহাইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন হল।

বল মাটিতে—গ্রাউটের অব্যাহতি।

স্তম্ভিত ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়ানরা দাঁড়িয়ে থাকে। ক্যাচের সুযোগে এক রান হয়ে গেছে।

জয়ের জন্য ৩ রান। বাকি ৩ বল। হাতে দু'টো উইকেট।

হলের ষষ্ঠ বল। অপর প্রান্তে মেকিফ। হল যথাসাধ্য বল দিলেন। মেকিফ প্রাণপণে ব্যাট চালালেন লেগের দিকে। বল উঁচু হয়ে স্কোয়ার-লেগের দিকে ছুটে চলল। কোনো লোক নেই সেখানে। সুনিশ্চিত বাউণ্ডারি। অস্ট্রেলিয়ার সুনিশ্চিত জয়! জয়! জয়! জয়!

বেতারে-বেতারে তরঙ্গিত হল সে-বার্তা। অস্ট্রেলিয়া জিতেছে। সারা মাঠ দাঁড়িয়ে উঠল উত্তেজনায়। ক্ষেপে গিয়েছে সকলে। বল ছুটেছে বাউণ্ডারির দিকে। মেকিফ ও গ্রাউট ছোটাছুটি ক'রে রান নিচ্ছেন।

এক রান……দুই রান ……

মাঠের একজন খেলোয়াড় কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জয়কে সুনিশ্চিত বলে বিশ্বাস করেননি। তাঁর নাম কনরাড হাণ্ট। রকেটের গতিতে তিনি বলটির দিকে ধাবিত। কোনো কারণে বলের গতি শ্লথ হয়ে এল।

দুই রান সমাপ্ত……তিন রান নিচ্ছেন তাঁরা ……

হাণ্ট বাউণ্ডারি লাইন থেকে বল ছুঁড়লেন।

একলব্যও এমন লক্ষ্যভেদ করতে পারে না—হাণ্ট যা করলেন। অভ্রান্ত রেখায় বিদ্যুতের গতিতে বল ছুটে এল আলেকজাণ্ডারের হাতে—আলেকজাণ্ডার বল-হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন উইকেটে—ব্যাট-হাতে গ্রাউট ঝাঁপিয়ে পড়লেন লাইনের উপর।

আলেকজাণ্ডার আগে ঝাঁপিয়েছিলেন। গ্রাউট এবার সত্যিই আউট।

অস্ট্রেলিয়া ২ রান পেয়েছে দৌড় থেকে। অস্ট্রেলিয়ার মোট রান ৭৩৭। ওয়েস্ট-ইণ্ডিজেরও তাই। দু'দল একেবারে সমান।

দু'টি বল বাকি। হাতে একটি উইকেট। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে এক রান।

হলের সপ্তম বল।

ক্লাইন বলটিকে লেগের দিকে ঠেলে দৌড় দিতে শুরু করলেন। ১২ গজ দূরে লেগের দিকে উইকেটের সমরেখায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সলোমন। নীচু হয়ে এক হাতে বল ধরেই ছুঁড়ে দিলেন তাঁর নিকট দৃশ্যমান একটিমাত্র স্টাম্পের দিকে।

সলোমনের নিক্ষেপ উইকেট ভেঙে দিল। মেকিফ আউট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দু'ইনিংসে ৭৩৭। অস্ট্রেলিয়াও সব খুইয়ে ৭৩৭। টেস্টের প্রথম 'টাই'।

স্কোর কার্ড

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
সি সি হাণ্ট ক বেনোড ব ডেভিডসন	২৪	ক সিম্পসন ব ম্যাকে	৩৯
সি স্মিথ ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	৭	ক ও'নীল ব ডেভিডসন	৬
আর কানহাই ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	১৫	ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	৫৪
জি সোবার্স ক ক্লাইন ব মেকিফ	১৩২	ব ডেভিডসন	১৪
এফ এম ওরেল ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	৬৫	ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	৬৫
জে সলোমন হিট-উইকেট ব সিম্পসন	৬৫	এল-বি ব ডেভিডসন	৪৭
পি ল্যাসলি ক গ্রাউট ব ক্লাইন	১৯	ব ডেভিডসন	০
আলেকজাণ্ডার ক ডেভিডসন ব ক্লাইন	৬০	ব বেনোড	৫
এস রামাধীন ক হার্ভে ব ডেভিডসন	১২	ক হার্ভে ব সিম্পসন	৬
ডবলিউ হল স্টাঃ গ্রাউট ব ক্লাইন	৫০	ব ডেভিডসন	১৮
এ এল ভ্যালেণ্টাইন নট-আউট	০	নট-আউট	৭
অতিরিক্ত	৪	অতিরিক্ত	২৩
	৪৫৩		২৮৪

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
সি সি ম্যাকডোনাল্ড ক হাণ্ট ব সোবার্স	৫৭	ব ওরেল	১৬
আর বি সিম্পসন ব রামাধীন	৯২	ক অতিরিক্ত ব হল	০
আর এন হার্ভে ব ভ্যালেণ্টাইন	১৫	ক সোবার্স ব হল	৫
এন সি ও'নীল ক ভ্যালেণ্টাইন ব হল	১৮১	ক আলেকজাণ্ডার ব হল	২৬
এল ফ্যাভেল রান-আউট	৪৫	ক সলোমন ব হল	৭
কে ডি ম্যাকে ব সোবার্স	৩৫	ব রামাধীন	২৮
এ কে ডেভিডসন ক আলেকজাণ্ডার ব হল	৪৪	রান-আউট	৮০
আর বেনোড এল-বি ব হল	১০	ক আলেকজাণ্ডার ব হল	৫২
এ ডবলিউটি গ্রাউট এল-বি ব হল	৪	রান আউট	২
আই মেকিফ রান-আউট	৪	রান আউট	২
এল এফ ক্লাইন নট-আউট	৩	নট-আউট	০
অতিরিক্ত	১৫	অতিরিক্ত	১৪
	৫০৫		২৩২

টেস্ট ক্রিকেটে বিশ্ব রেকর্ড

দলগত সর্বাধিক রান : এক ইনিংসে

প্রথম ইনিংসে

৯০৩ (৭ উইকেটে ডিক্লে:) : ইংল্যাণ্ড (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), ওভাল, ১৯৩৮

চতুর্থ ইনিংসে

৬৫৪ (৫ উইকেটে) : ইংল্যাণ্ড (বিপক্ষে দ: আফ্রিকা), ডার্বান ১৯৩৮-৩৯

দলগত সর্বনিম্ন রান : এক ইনিংসে

২৬ (১০ উইকেটে) : নিউজিল্যাণ্ড (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড), অকল্যাণ্ড, ১৯৫৪-৫৫

সর্বাধিক মোট রান : একটি খেলায়

(দুই দলের রানের সমষ্টি)

১৯৮১ (৩৫ উইকেটে) : ইংল্যাণ্ড বনাম দ: আফ্রিকা, ডার্বান (৫ম টেস্ট) ১৯৩৮-৩৯ দ: আফ্রিকা : ৫৩০ ও ৪৮১ ইংল্যাণ্ড : ৩১৬ ও ৬৫৪ (৫ উইকেটে)

(এক দলের পক্ষে)

১১২১ (১৯ উইকেটে) : ইংল্যাণ্ড (৮৪৯ ও ২৭২-৯ উইকেটে ডিক্লে:) বিপক্ষে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ, কিংস্টন, ১৯২৯-৩০

সর্বনিম্ন মোট রান : একটি খেলায়

২৯১ (৪০ উইকেটে) : ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া, লর্ডস, ১৮৮৮

ইংল্যাণ্ড : ৫৩ ও ৬২

অস্ট্রেলিয়া : ১১৬ ও ৬০

এক দলের পক্ষে)

৮১ (২০ উইকেটে) : দ: আফ্রিকা (৩৬ ও ৪৫ রান), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, মেলবোর্ন, ৫ম টেস্ট, ১৯৩১-৩২

সর্বাধিক রান : একদিনের খেলায়

(দুই দলের রান)

৫৮৮ (৬ উইকেটে) : ইংল্যাণ্ড (৩৯৮ রান ৬ উইকেটে) বনাম ভারত (১৯০ রান বিনা উইকেটে), ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৩৬ (দ্বিতীয় দিনের খেলায়)

সর্বাধিক রান : একদিনের খেলায়

(এক দলের রান)

৫০৩ (২ উইকেটে) : ইংল্যাণ্ড (বিপক্ষে দ: আফ্রিকা), লর্ডস, ১৯২৪ (দ্বিতীয় দিনের খেলায়)

সর্বনিম্ন রান : একদিনের খেলায়

৯৫ (১২ উইকেটে) : অস্ট্রেলিয়া (৮০ রান ১০ উইকেটে) এবং পাকিস্তান (১৫ রান ২ উইকেটে), করাচি, ১৯৫৬-৫৭ (প্রথম দিনের খেলায়)

দুই ইনিংস শেষ : একদিনে একদলের

৬৫ রান ও ৭২ রান (ফেব্রুয়ারী ৪, ১৮৯৫)—ইংল্যাণ্ড (বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া, সিডনি, ৪র্থ টেস্ট)। অষ্ট্রেলিয়া এই খেলায় এক ইনিংস ও ১৪৭ রানে জয়ী হয়।

৫৮ রান ও ৮২ রান (জুলাই ১৯, ১৯৫২) ভারত (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ম্যাঞ্চেস্টার)। ইংল্যাণ্ড এই খেলায় এক ইনিংস ও ২০৭ রানে জয়ী হয়।

ব্যক্তিগত টেস্ট রেকর্ড

ব্যাটিং রেকর্ড

সর্বাধিক রান : এক ইনিংসে

৩৬৫ নট আউট : গ্যারী সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বিপক্ষে পাকিস্তান। কিংস্টন (৩য় টেস্ট), ১৯৫৭ ৫৮

সর্বাধিক রান : একটি খেলায়

৩৮০ (২৪৭ ও ১৩৩) : গ্রেগ চ্যাপেল (অষ্ট্রেলিয়া) বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন, ১৯৭৩-৭৪।

সর্বাধিক মোট রান : এক সিরিজে

৯৭৪ (গড় ১৩৯.১৪) : স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৩০। টেস্ট ৫, ইনিংস ৭, নটআউট ০, এক ইনিংসে সর্বাধিক রান ৩৩৪ এবং সেঞ্চুরি ৪।

সর্বাধিক মোট রান : খেলোয়াড়-জীবনে

৮০৩২ (গড় ৫৭.৭৮) : স্যার গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) টেস্ট ৯৩, ইনিংস ১৬০, নট আউট ২১ বার, এক ইনিংসে সর্বাধিক রান ৩৬৫ নটআউট, সেঞ্চুরি ২৬ এবং অর্ধ সেঞ্চুরি ৩০

সর্বাধিক সেঞ্চুরি : খেলোয়াড়-জীবনে

২৯টি (৫২টি টেস্টে) : স্যার ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যান (অষ্ট্রেলিয়া)— বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড ১৯, দক্ষিণ আফ্রিকা ৪, ভারত ৪ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২।

উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি : একই খেলায়

(দু'বার)

হার্বার্ট সাটক্লিফ (ইংল্যাণ্ড)

১৭৬ ও ১২৭ (বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়া মেলবোর্ন, ১৯২৪-২৫)।

১০৪ ও ১০৯* (বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা, ওভাল, ১৯২৯)

জর্জ হেডলি (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)

১১৪ ও ১১২ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, জর্জটাউন, ১৯২৯-৩০)

১০৬ ও ১০৭ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লর্ডস, ১৯৩৯)

ক্লাইভ ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)

১২৬ ও ১১০ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ত্রিনিদাদ, ১৯৫৪-৫৫)

১৫৫ ও ১১০ (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, কিংস্টন, ১৯৫৪-৫৫)

গ্রেগ চ্যাপেল (অস্ট্রেলিয়া)

২৪৭* ও ১৩৩ (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন, ১৯৭৩-৭৪)

১২৩ ও ১০৯* (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রিসবেন, ১৯৭৫ ৭৬)

সুনীল গাভাসকর (ভারত)

১২৪ ও ২২০ (বিপক্ষে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ, ত্রিনিদাদ, ১৯৭০-৭১)

১১১ ও ১৩৭ (বিপক্ষে পাকিস্তান, করাচি, ১৯৭৮)

১০৭ ও ১৮২* (বিপক্ষে ওঃ ইণ্ডিজ কলকাতা, ১৯৭৮-৭৯)

দ্রষ্টব্য : গাভাসকর মোট তিনবার একই টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করে সর্বাধিকবার একটি টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করার বিশ্ব রেকর্ড করেন।

একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও ডবল সেঞ্চুরি

ডগলাস ওয়ালটার্স (অস্ট্রেলিয়া)

২৪২ ও ১০৩ (বি. ওঃ ইণ্ডিজ, সিডনি, ১৯৬৮-৬৯)

সুনীল গাভাসকর (ভারত)

১২৪ ও ২২০ (বি. ওঃ ইণ্ডিজ, ত্রিনিদাদ, ১৯৭০-৭১)

লরেন্স রো* (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)

২১৪ ও ১১০* (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, কিংস্টন, ১৯৭১-৭২)

গ্রেগ চ্যাপেল (অস্ট্রেলিয়া)

২৪৭* ও ১৩৩ (বি. নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন, ১৯৭৩-৭৪)

* জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরি ও ডাবল সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেছেন একমাত্র ওঃ ইণ্ডিজের লরেন্স রো।

উপর্যুপরি পাঁচটি ইনিংসে সেঞ্চুরি

এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ১৪১ রান (কিংস্টন), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯৪৭-৪৮ ; ১২৮ রান (নিউ দিল্লী), ১৯৪ রান (বোম্বাই), ১৬২ ও ১০১ রান (কলকাতা) বিপক্ষে ভারত ১৯৪৮-৪৯

ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান : এক ইনিংসে

(প্রতি দেশের পক্ষে)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : ৩৬৫* গারফিল্ড সোবার্স (বিপক্ষে পাকিস্তান), কিংস্টন, ১৯৫৭-৫৮

ইংল্যাণ্ড : ৩৬৪ লেন হাটন বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া), ওভাল, ১৯৩৮

পাকিস্তান : ৩৩৭ হানিফ মহম্মদ (বি. ওঃ ইণ্ডিজ), ব্রিজটাউন, ১৯৫৭-৫৮

অস্ট্রেলিয়া : ৩৩৪ ডন ব্র্যাডম্যান (বি. ইংল্যাণ্ড), লিডস, ১৯৩০

দঃ আফ্রিকা : ২৭৪ গ্রিমি পোলক (বি. অস্ট্রেলিয়া) ডার্বান, ১৯৬৯-৭০

নিউজিল্যাণ্ড : ২৫৯ গ্লিন টার্নার (বি. ওঃ ইণ্ডিজ), জর্জটাউন, ১৯৭১-৭২

ভারত : ২৩১ ভিনু মানকড় (বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড), মাদ্রাজ, ১৯৫৫-৫৬

দুই ভাইয়ের সেঞ্চুরি : একই ইনিংসে

১১৮ ইয়ান চ্যাপেল ও ১১৩ গ্রেগ চ্যাপেল (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ওভাল, ১৯৭২

১৪৫ ইয়ান চ্যাপেল ও ২৪৭ গ্রেগ চ্যাপেল (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন, ১৯৭৩-৭৪ (১ম ইনিংস)

১২১ ইয়ান চ্যাপেল ও ১৩৩ গ্রেগ চ্যাপেল (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন, ১৯৭৩-৭৪ (২য় ইনিংস)

১০৩ সাদিক মহম্মদ ও ১০১ মুস্তাক মহম্মদ (পাকিস্তান), বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, হায়দরাবাদ, ১৯৭৬-৭৭

দলের অধিনায়ক হিসাবে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে একই খেলার উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন একমাত্র অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক গ্রেগ চ্যাপেল —১২৩ ও ১০৯ (অপরাজিত), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রিসবেন, ১৯৭৫-৭৬।

সর্বাধিক সেঞ্চুরি : এক ইনিংসে

(এক দলের পক্ষে)

৫টি—অস্ট্রেলিয়া (বিপক্ষে ওঃ ইণ্ডিজ), কিংস্টন, ১৯৫৪-৫৫। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সেঞ্চুরি করেন : সি সি ম্যাকডোনাল্ড ১২৭, নীল হার্ভে ২০৪, কিথ মিলার ১০৯, রন আর্চার ১২৮ এবং রিচি বেনো ১২১। অস্ট্রেলিয়ার এই ইনিংসের রান ছিল ৭৫৮ (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড)। অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৮২ রানে জিতেছিল।

সর্বাধিক সেঞ্চুরি ; একটি খেলায়

(দুই দলের সেঞ্চুরি নিয়ে)

৭টি—ইংল্যাণ্ড (৪টি) বনাম অস্ট্রেলিয়া (৩টি), নটিংহাম, ১৯৩৮

৭টি—অস্ট্রেলিয়া (৫টি) বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (২টি), কিংস্টন, ১৯৫৪-৫৫

সর্বাধিক সেঞ্চুরি : এক সিরিজে
(এক দলের পক্ষে)

১২টি—অস্ট্রেলিয়া (বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), ১৯৫৪-৫৫

সর্বাধিক সেঞ্চুরি : এক সিরিজে
(দুই দলের সেঞ্চুরি নিয়ে)

২১টি—অস্ট্রেলিয়া (১২টি) বনাম ওঃ ইণ্ডিজ (৯টি), ১৯৫৪-৫৫

সর্বাধিক সেঞ্চুরি : এক সিরিজে

৫টি—ক্লাইড ওয়ালকট (ওঃ ইণ্ডিজ), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ১৯৫৪-৫৫

একদিনে সর্বাধিক রান

৩০৯ নট আউট—ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লিডস, ১৯৩০

প্রথম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে ৪৫৮ রানের মধ্যে ব্র্যাডম্যান একাই নটআউট ৩০৯ রান করেন—লাঞ্চের আগে ১০৫, চা-পানের আগে ২২০ এবং খেলা ভাঙার সময় অপরাজিত ৩০৯ রান। দ্বিতীয় দিনে ব্র্যাডম্যান ৩৩৪ রান করে আউট হন।

সর্বাধিক বাউণ্ডারি : এক ইনিংসে

৫৭টি (বাউণ্ডারি ৫২ ও ওভার-বাউণ্ডারি ৫)—জন এডরিচ (ইংল্যাণ্ড) বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, লিডস, ১৯৬৫। এই ইনিংসে এডরিচ ৩১০ রানে অপরাজিত ছিলেন।

সর্বাধিক ওভার বাউণ্ডারি :
এক ইনিংসে

১০টি (নটআউট ৩৩৬ রানে)—ওয়াল্টার হ্যামণ্ড (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, অকল্যাণ্ড, ১৯৩২-৩৩।

বোলিং রেকর্ড

সর্বাধিক উইকেট : এক ইনিংসে

১০টি (৫৩ রানে)—জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬।

সর্বাধিক উইকেট : একটি খেলায়

১৯টি (৩৭ রানে ৯ ও ৫৩ রানে ১০)—জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড) বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬।

সর্বাধিক উইকেট : এক সিরিজে

৪৯টি (গড় ১০.৯৩)—সিডনি বার্নেশ (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে দঃ আফ্রিকা, ১৯১৩-১৪ (চারটি টেস্ট খেলায় ১৩৫৬ বল খেলে)

সর্বাধিক উইকেট :
খেলোয়াড়-জীবনে

৩০৯টি (গড় ২৯.০৯। ৭৯টি টেস্টে)—ল্যান্স গিবস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)

সর্বাধিক উইকেট : একদিনে

১৫টি (২৮ রানে)—জন ব্রিগস (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা

কেপটাউন, ১৮৮৮-৮৯। ব্রিগস ১ম ইনিংসে ১৭ রানে ৭ উইকেট এবং ২য় ইনিংসে ১১ রানে ৮ উইকেট পান। তাঁর বলে ১৫ জন বোল্ড আউট এবং ১ জন এল-বি-ডবলিউ হয়েছিলেন।

পরপর ৫ বলে ৪ উইকেট

মরিস অ্যালম (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ক্রাইস্টচার্চ, ১৯২৯-৩০ (জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে অ্যালম উপর্যুপরি পাঁচ বলে 'হ্যাটট্রিক'সহ চারটি উইকেট পান)

ক্রিস ওল্ড (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে পাকিস্তান, বার্মিংহাম, ১৯৭৮

সর্বাধিকবার হ্যাটট্রিক : খেলোয়াড়-জীবনে

২ বার : হ্যাগ ট্রাম্বল (অস্ট্রেলিয়া) বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, মেলবোর্ন, ১৯০১-০২ এবং বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, মেলবোর্ন, ১৯০৩-০৪

২ বার : টি জে ম্যাথুজ (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯১২ (খেলার উভয় ইনিংসে)

সর্বাধিক বল : এক ইনিংসে

৫৮৮ বল (৯৮ ওভারে)—সনি রামাধীন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, বার্মিংহাম, ১৯৫৭

সর্বাধিক বল : একটি খেলায়

৭৭৪ বল (১২৯ ওভারে) সনি রামাধীন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, বার্মিংহাম, ১৯৫৭

ফিল্ডিং রেকর্ড

সর্বাধিক ক্যাচ : এক ইনিংসে

৫টি : ভিক্টর রিচার্ডসন (অস্ট্রেলিয়া) বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ডার্বান, ১৯৩৫-৩৬

৫টি : যজুবেন্দ্র সিং (ভারত), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, বাঙ্গালোর, ১৯৭৬-৭৭

সর্বাধিক ক্যাচ : একটি খেলায়

৭টি (৩ ও ৪) : গ্রেগ চ্যাপেল (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, পার্থ, ১৯৭৪-৭৫

৭টি (৫ ও ২) : যজুবেন্দ্র সিং (ভারত), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, বাঙ্গালোর, ১৯৭৬-৭৭

দ্রষ্টব্য : যজুবেন্দ্র সিং (ভারত) তাঁর খেলোয়াড়-জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় উপরের দুটি বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেন।

সর্বাধিক ক্যাচ : এক সিরিজে

১৫টি : জ্যাক গ্রেগরী (অস্ট্রেলিয়া) বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, ১৯২০-২১

সর্বাধিক ক্যাচ : খেলোয়াড়-জীবনে

১২০টি (১১৪টি টেস্টে) : কলিন কাউড্রে (ইংল্যাণ্ড)

উইকেট-কিপিং রেকর্ড

সর্বাধিক শিকার : এক ইনিংসে

৭টি (সবই ক্যাচ) : ওয়াসিম বারি (পাকিস্তান), বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, অকল্যাণ্ড ; ১৯৭৯

সর্বাধিক ডিসমিস্যাল : একটি খেলায়

৯টি (ক্যাচ ৮ ও স্টাম্পিং ১) : গিল ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, লর্ডস, ১৯৫৬

১১টি : ওয়াসিম বারি ৭ এবং মজিদ খাঁ ৪, বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কিংস্টন, ১৯৭৬-৭৭

দ্রষ্টব্য : ওয়াসিম বারি আহত থাকায় মজিদ ২য় ইনিংসে উইকেট-কিপিং করে ৪ জনকে আউট করেন।

সর্বাধিক ডিসমিস্যাল : এক সিরিজে

২৬টি (সবই ক্যাচ) : রডনি মার্শ (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, টেস্ট ৬টি, ১৯৭৫-৭৬

২৬টি (ক্যাচ ২৩ ও স্টাম্পিং ৩) : জন ওয়েট (দ: আফ্রিকা), বিপক্ষে নিউজিল্যাণ্ড, ১৯৬১-৬২

সর্বাধিক ডিসমিস্যাল : খেলোয়াড়-জীবনে

২৫২টি ৮৯ টেস্টে—(ক্যাচ ২৩৩ ও স্টাম্পিং ১৯): অ্যালান নট (ইংল্যাণ্ড)

সর্বাধিক ক্যাচ : খেলোয়াড়-জীবনে

২৩৩টি (৮৯টি টেস্টে)—অ্যালান নট (ইংল্যাণ্ড)

সর্বাধিক স্টাম্পিং : খেলোয়াড়-জীবনে

৫২টি (৫৪টি টেস্টে)— উইলিয়াম ওল্ডফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া)

অল-রাউণ্ড ক্রিকেটার

একই টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি ও এক ইনিংসে ৫ উইকেট

ডেনিস অ্যাটকিনসন (ও: ইণ্ডিজ)

২১৯ রান ও ৫ উইকেট ৫৬ রানে, বি. অস্ট্রেলিয়া ব্রিজটাউন, ১৯৫৪-৫৫

মুস্তাক মহম্মদ (পাকিস্তান)

২০১ রান ও ৫ উইকেট ৪৯ রানে, বি. নিউজিল্যাণ্ড, ডুনেদিন, ১৯৭২-৭৩

একই টেস্টে

সেঞ্চুরি ও এক ইনিংসে ৮ উইকেট

১০৮ রান ও ৮ উইকেট ৩৪ রানে
—ইয়ান বোথাম (ইংল্যাণ্ড), বিপক্ষে
পাকিস্তান, লর্ডস, ১৯৭৮

সেঞ্চুরি ও হ্যাটট্রিক

জন ব্রিগস (ইংল্যাণ্ড)
১২১ রান (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া),
মেলবোর্ন, ১৮৮৪-৮৫
হ্যাটট্রিক (বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া),
সিডনি, ১৮৯১-৯২

একই টেস্টে

১০০ রান ও ১০ উইকেট

১২৪ রান (৪৪ ও ৮০) ও ১১ উইকেট
২২২ রানে (৫ উইকেট ১৩৫ রানে ও
৬ উইকেট ৮৭ রানে)
অ্যালেন কিথ ডেভিডসন (অস্ট্রেলিয়া),
বিপক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ব্রিসবেন,
১৯৬০-৬১

ভারতীয় টেস্ট : সম্পূর্ণ স্কোরকার্ড

১৯৩২ : ভারত বনাম ইংলণ্ড

ভারতীয় ক্রিকেট দল প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে ১৯৩২-এ ইংলণ্ড দলের বিরুদ্ধে। ঐ সালের ২৫, ২৭, ২৮শে জুন লর্ডসের মাঠে কর্নেল সি. কে. নাইডুর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় একাদশের মুখোমুখি হয় ইংলণ্ড একাদশ। অধিনায়ক ডগলাস জার্ডিন ছাড়াও এই দলে ছিলেন হারবার্ট সাটক্লিফ, ফ্র্যাঙ্ক উলি আর ওয়ালি হ্যামণ্ড প্রভৃতি নামী ব্যাটসম্যানেরা।

সেই ম্যাচে বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড় মিস্ত্রী, ডাঃ কাঙ্গা, মেহেরমজি ও অধ্যাপক দেওধরের অংশ গ্রহণ সম্ভব হয়নি। এমন কি পতৌদির নবাবও (বড়) এই ম্যাচে খেলেন নি, অস্ট্রেলিয়াগামী ইংলণ্ডদলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তথাপি ভারতীয় দল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ক্যাচগুলি না ফস্‌কালে ভারতীয় দল ১৫৮ রানে পরাজিত হত না। ফলাফল বিপরীতমুখী হওয়াও অসম্ভব ছিল না।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

হারবার্ট সাটক্লিফ ব নিসার	৩
পার্সি হোমস ব নিসার	৬
ফ্রাঙ্ক উলি রান আউট	৯
ওয়ালি হ্যামণ্ড ব অমর সিং	৩৫
ডগলাস জারডিন ক নাভলে ব সি. কে. নাইডু	৭৯
এডি পেইনটার এল. বি. ডব্লু ব. সি. কে. নাইডু	১৪
লেসলী এমস্ ব নিসার	৬৫
ওয়ান্টার রবিনস্ ব নিসার	২১
ফ্রেডি ব্রাউন ক অমর সিং ব নিসার	১
বিল ভোস নট আউট	৪
বিল বাওয়েস ক নিসার ব অমর সিং	৭
অতিরিক্ত (বাই ৩, লেগ-বাই ৯, নো-বল ৩)	১৫
মোট-	২৬৯

উইকেট পতন : ৮ (সাটক্লিফ), ১১ (হোমস) ১৯ (উলি), ১০১ (হ্যামণ্ড) ১৪৯ (পেইণ্টার), ১৬৬ (জারডিন) ২২৯ (রবিনসন), ২৩১ (ব্রাউন), ২৫২ (এমস), ২৫৯ (বাওয়েস) ।

বোলিং : নিসার ২৬-৩-৯৩-৫, অমর সিং ৩১১-১০-৭৫-২, সি. কে. নাইডু ২৪-৮-৪০-১, জাহাঙ্গীর খান ১৭-৭-২৬-০, পি. ই. পালিয়া ৪-৩-২-০, যে নাওমল ৩-০-৮-০ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

জে· জি. নাভলে ব বাওয়েস	১২
জিওল নাওমল এল. বি. ডব্লু ব রবিন্স	৩৩
সয়ীদ উজির আলি এল. বি. ডব্লু ব ব্রাউন	১৩
সি. কে. নাইডু ক রবিনস্ ব. ভোস	৪০
এস. এইচ. এম কোলাহ্ ক রবিনস্ ব বাওয়েস	২২
সয়ীদ নাজির আলি ব বাওয়েস	১৩
পি. ই. পালিয়া ব ভোস	১
লাল সিং ক জারডিন ব বাওয়েস	১৫
এস জাহাঙ্গীর খান ব রবিনস্	১
এল অমর সিং ক রবিনস ব ভোস	৫
মহম্মদ নিসার নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই-৫, লেগ বাই ৭, ওয়াইড ১ নো-বল ২)	১৫
মোট—	১৮৯

উইকেট পতন : ৩৯ (নাভলে) ৬৩ (নাওমল) ১১০ (উজির আলি) ১৩৯ (নাইডু) ১৬০ (কোলাহ) ১৬৫ (নাজির আলি) ১৮১ (লাল সিং) ১৮২ (জাহাঙ্গীর খান) ১৮৮ (অমর সিং) ১৮৯ (পালিয়া) ।

বোলিং : বাওয়েস ৩০-১৩-৪৯-৪, ভোস ১৭-৬-২৩-৩, ব্রাউন ২৫-৭-৪৮-১, রবিনস্ ১৭-৪ ৩৯-২, হ্যামণ্ড ৪-০-১৫-০ ।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস

হারবার্ট সাটক্লিফ ক নাইডু ব অমর সিংহ	১৯
পার্সি হোমস্ ব জাহাঙ্গীর খান	১১
ফ্রাঙ্ক উলি ক কোলাহ্ ব জাহাঙ্গীর খান	২১
ওয়ালি হ্যামণ্ড ব জাহাঙ্গীর খান	১২
ডগলাস জারডিন নট আউট	৮৫
এডি পেইনটার ব জাহাঙ্গীর খান	৫৪
লেসলি এমস ব অমর সিং	৬
ওয়াল্টার রবিনস ক জাহাঙ্গীর খান ব নিসার	৩০
ফ্রেডি ব্রাউনক কোলাহ্ ব নাওমল	২৯
বিল ভোস নট আউট	০
বিল বাওয়েস ব্যাট করেন নি	—
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ বাই ৬)	৮
মোট ৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড	২৭৫

উইকেট পতন : ৩০ (সাটক্লিফ), ৩৮ (হোমস), ৫৪ (হ্যামণ্ড), ৬৭ (উলি), ১৫৬ (পেইণ্টার) ১৬৯ (এমস), ২২২ (রবিনস্), ২৭১ (ব্রাউন)।

বোলিং : নিসার ১৮-৫-৪২-১, অমর সিং ৪১-১৩-৮৪-২, জাহাঙ্গীর খান ৩০-১২-৬০-৪, নাওমল ৮-০-৪০-১, নাইডু ৯-০-২১-০, পালিয়া ৩-০-১-০, উজির আলি ১-০-৯-০।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

জে. জি. নাভলে এল. বি. ডব্লু ব রবিনস	১৩
জিওমল নাওমল ব ব্রাউন	২৫
সয়ীদ উজির আলি ক হ্যামণ্ড ব ভোস	৩৯
সি. কে. নাইডু ব বাওয়েস	১০
এস. এইচ. এস. কোলাহ ব ব্রাউন	৪
সয়ীদ নাজির আলি ক জারডিন ব বাওয়েস	৬
লাল সিং ব হ্যামণ্ড	২৯

এস জাহাঙ্গীর খান ব ভোস	০
এল. অমর সিং ক ও ব হ্যামণ্ড	৫১
মহম্মদ নিসার ব হ্যামণ্ড	০
পি. ই. পালিয়া নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগ বাই ২, নো বল ২)	৯
মোট	১৮৭

উইকেট পতন : ৪১ (নাভলে), ৪১ (নাওমল) ৫২ (নাইডু) ৬৫ (কোলাহ) ৮৩ (নাজির আলি) ১০৮ (উজির আলি) ১০৮ (জাহাঙ্গীর খান) ১৮২ (লাল সিং) ১৮২ (নিসার) ১৮৭ (অমর সিং)।

বোলিং : বাওয়েস ১৪-৫-৩০-২, ভোস ১২-৩-২৮-২, ব্রাউন ১৪-১-৫৪-১, রবিনস ১৪-৫-৫৭-১, হ্যামণ্ড ৫.৩-৩-৯-৩।

১৯৩৩-৩৪ : ভারত বনাম ইংলণ্ড

১৯৩২ সালের একটি মাত্র টেস্ট ম্যাচে ভারত পরাজিত হলেও তাদের ক্রীড়াশৈলী ক্রিকেটের জন্মভূমি ইংলণ্ডে যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিল। ফলে পরবর্তী বছরেই ডগলাস জার্ডিনের নেতৃত্বে একটি প্রথম শ্রেণীর দল ভারত সফরে আসে। ১৯৩২-এ ভারতকে পরাজিত করার পরে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়াকে হারায় তার স্বদেশে। নিজেদের মাঠে হারায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মত বাঘা দলকে। তাই ১৯৩৩-৩৪ সালের ইংলণ্ড দলকে তৎকালীন বিশ্বের সেরা দল বললেও ভুল বলা হয় না। অবশ্য ভারত-সফরকারী দলে হ্যারল্ড লারয়ুডের মত ভয়ঙ্কর ফাস্ট বোলার ছিলেন না, ছিলেন না হার্বার্ট সাটক্লিফ কিংবা ওয়ালি হ্যামণ্ডের মত প্রতিষ্ঠিত ব্যাট।

এ সিরিজের তিনটি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে দুটিতে ভারত পরাজিত হল। তবুও এই সিরিজেই আবিষ্কৃত হল লালা অমরনাথ, বিজয় মার্চেন্ট কি মুস্তাক আলির মত ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। লালা অমরনাথ এই সিরিজে বোম্বাই টেস্টে তাঁর প্রথম আবির্ভাবেই টেস্ট সেঞ্চুরির গৌরব লাভ করেছিলেন। ভারতের পক্ষে না খেললেও ইতিপূর্বে টেস্ট আবির্ভাবে সেঞ্চুরির গৌরব যেসব ভারতীয় অর্জন করেছিলেন তাঁরা হলেন রণজিৎ সিংজী (রণজি), দলীপ সিং ও পতৌদির নবাব (বড়)। এঁরা প্রত্যেকেই ইংলণ্ডের পক্ষে খেলেছিলেন।

ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন কর্নেল সি. কে. নাইডু। প্রথম টেস্ট খেলা হয়েছিল বোম্বাইতে ১৯৩৩-এর ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ ডিসেম্বর।

প্রথম টেস্ট : ফল—ইংলণ্ড ৯ উইকেটে বিজয়ী।

ভারত : প্রথম ইনিংস

সয়ীদ উজির আলি এল. বি. ডব্লু ব নিকল্‌স	৩৬
জে. জি. নাভলে ক নিকলস্‌ ব ভেরেটি	১৩
লালা অমরনাথ এল. বি. ডব্লু ব ল্যাঙরিজ	৩৮
সি. কে. নাইডু এল. বি. ডব্লু. ব ক্লার্ক	২৮
এল. পি. জয় ক মিচেল ব ল্যাঙ্‌রিজ	১৯
বিজয় মার্চেন্ট এল. বি. ডব্লু ব নিকলস্‌	২৩
এস. এইচ্‌. এস কোলাহ্‌ ক এলিয়ট ব নিকলস্‌	৩১
এল অমর সিং স্ট্যা এলিয়ট ব ল্যাঙরিজ	০
মহম্মদ নিসার ক মিচেল ব ভেরেটি	১৩
এল. রামজি ব ভেরেটি	১
আর. জে. ডি. জামসেদজী নট আউট	৪
অতিরিক্ত (বাই ২, লেগ বাই ৫, নো বল ৬)	১৩
মোট—	২১৯

উইকেট পতন : ৪৪ (নাভলে), ৭১ (উজির আলি), ১১৭ (অমরনাথ), ১৩৫ (নাইডু), ১৪৮ (জয়), ১৭৫ (মার্চেন্ট), ১৮৬ (অমর সিং), ২০৯ (নিসার), ২১২ (রামজি), ২১৯ (কোলাহ্‌)।

বোলিং : নিকল্‌স ২৩·২-৮-৫৩-৩। ক্লার্ক ১৩-৩-৪১-১। বারনেট ২-১-১-০। ভেরেটি ২৭-১১-৪৪-৩। ল্যাঙরিজ ১৭-৪-৪২-৩। টাউন্সেণ্ড ৯-২-২৫-০।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

এ. মিচেল ব নিসার	৫
সি. এফ. ওয়ান্টার্স ক মার্চেন্ট ব অমর সিং	৭৮
সি. জে. বারনেট ক ও ব জামসেদজি	৩৩
জেমস ল্যাঙরিজ এল. বি. ডব্লু. ব নিসার	৩১

ডগলাস জার্ডিন ব নিসার	৬০
বি. এইচ. ভ্যালেন্টাইন ক মার্চেন্ট ব জামসেদজি	১৩৬
এল. এফ. টাউনসেণ্ড ক ও ব জামসেদজি	১৫
এস. এস. নিকলস্ রান আউট	২
হেডলি ভেরেটি ক রামজি ব নিসার	২৪
এইচ এলিয়ট নট আউট	৩৭
নবি ক্লার্ক ব নিসার	১
অতিরিক্ত (বাই ৭, লেগ বাই ৯)	১৬
মোট	৪৩৮

উইকেট পতন : ১২ (মিচেল), ৬৭ (বারনেট), ১৪৩ (ল্যাঙরিজ), ১৬৪ (ওয়্যাণ্টার্স), ৩০৯ (জার্ডিন), ৩৬২ (ভ্যালাণ্টাইন), ৩৭১ (টাউন্সেণ্ড), ৩৭৩ (নিকল্‌স), ৪৩১ (ভেরেটি) ৪৩৮ (ক্লার্ক)।

বোলিং : নিসার ৩৩.৫-৩-৯০-৫, রামজি ২৩-৫-৬৪-০, অমর সিং ৩৬-৫-১১৯-১, জামসেদজি ৩৫-৪-১৩৭-৩, নাইডু ৭-২-১০-১, অমরনাথ ২-১-২-০।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

সয়ীদ উজির আলি. ক নিকলস্ ব ক্লার্ক	৫
জে. জি. নাভলে ক এলিয়ট ব ক্লার্ক	৪
লালা অমরনাথ ক নিকলস্ ব ক্লার্ক	১১৮
সি. কে. নাইডু ক ভ্যালাণ্টাইন ব নিকলস্	৬৭
এল. পি. জয় ক জারডিন ব নিকলস্	০
বিজয় মার্চেন্ট ক এলিয়ট ব ল্যাঙরিজ	৩০
এল. অমর সিং ব ভেরেটি	১
এস. এইচ. এস. কোলাহু ক এলিয়ট ব নিকলস্	১২
মহম্মদ নিসার এল. বি. ডব্লু ব নিকলস্	১
আর. জে. ডি. জামসেদজি নট আউট	১

এল. রামজি এল. বি. ডব্লু ব নিকলস্ ০

অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগবাই ৬, ওয়াইড ১, নো বল ৮) ১৯

মোট ২৫৮

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস

এ মিচেল এল. বি. ডব্লু ব অমর সিং ৯

সি. এফ. ওয়াল্টার্স নট আউট ১৪

সি. জে. বারনেট নট আউট ১৭

১ উইকেটে ৪০

উইকেট পতন : ৯ (নাভলে), ২১ (উজিরআলি) ২০৭ (অমরনাথ), ২০৮ (নাইডু) ২০৮ (জয়) ২১৪ (অমর সিং), ২৪৮ (কোলাহ্), ২৪৯ (নিসার), ২৫৮ (মার্চেন্ট), ২৫৮ (রামজি)।

বোলিং : নিকলস্ ২৩'৫-৭-৫৫-৫ ক্লার্ক ১৯-২-৬৯-৩ ভেরেটি ২০-৯-৫০-১ ল্যাঙরিজ ১৬-৭-৩২-১, টাউনসেণ্ড ১২-৫-৩৩-০।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস উইকেট পতন : ১৫ (মিচেল)।

বোলিং নিসার ৫-১-২৫-০ অমর সিং ৩'২-১-১২-১।

দ্বিতীয় টেস্ট : কলকাতা : জানুয়ারি ৫, ৬, ৭, ৮, ১৯৩৪।

ফল : ড্র

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

সি. এফ ওয়ালটার্স ক গোপালন ব অমর সিং ২৯

এ. মিচেল ক গোপালন ব সি. কে. নাইডু ৪৭

চার্লি বারনেট এল. বি. ডব্লু ব অমর সিং ৮

জেমস ল্যাঙরিজ ক নিসার ব গোপালন ৭০

ডগলাস জার্ডিন ক সি. এস. নাইডু ব মুস্তাক আলি ৬১

বি. এইচ. ভ্যালাণ্টাইন এল. বি. ডব্লু. সি. কে. নাইডু	৪০
ডব্লু. এইচ. ভি. লেভেট ব সি. কে. নাইডু	৫
এস. এস. নিকলস্ এল. বি. ডব্লু. ব নিসার	১৩
এল. এফ. টাউনসেণ্ড ক দিলওয়ার হুসেন ব অমর সিং	৪০
হেডলি ভেরেটি নট আউট	৫৫
নবি ক্লার্ক ক মার্চেণ্ট ব অমর সিং	১০
অতিরিক্ত (বাই ১৩, লেগ বাই ১০, নো বল ২)	২৫
মোট	৪০৩

উইকেট পতন—৪৫ (ওয়ালটার্স), ৫৫ (বারনেট), ১৩৫ (মিচেল), ১৮৫ (ল্যাঙরিজ), ২১৬ (ভ্যালাণ্টাইন), ২৮১ (জারডিন), ২৮১ (লেভেট), ৩০১ (নিকলস্), ৩৭১ (টাউনসেণ্ড , ৪০৩ (ক্লার্ক) ।

বোলিং—নিসার ৩৪-৬-১১২-১, অমর সিং ৫৪.৫-১৩-১০৬-৪, গোপালন ১৯-৭-৩৯-১, মুস্তাক আলি ১৯-৫-৪৫-১, অমরনাথ ২-০-১০-০, সি. এস. নাইডু ৮-১-২৬-০, সি কে নাইডু ২৩-৭-৪০-৩ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

জিওসল নাওমল ক জারডিন ব নিকলস্	২
দিলওয়ার হুসেন ক জারডিন ব ক্লার্ক	৫৯
সয়ীদ উজির আলি ক নিকলস্ ব ভেরেটি	৩৯
সি. কে. নাইডু ব ক্লার্ক	৫
লালা অমরনাথ ক জারডিন ব ক্লার্ক	০
বিজয় মার্চেণ্ট ব ভেরেটি	৫৪
সয়ীদ মুস্তাক আলি এল. বি. ডব্লু ব নিকলস্	৯
সি. এস. নাইডু ক ভেরেটি ব নিকলস্	৩৬
এল অমর সিং ক নিকলস্ ব ভেরেটি	১০
মহম্মদ নিসার ক ওয়াণ্টার্স ব ভেরেটি	২
এস. জে. গোপালন নট আউট	১০
অতিরিক্ত (বাই-৫, লেগ বাই ৫, নো বল ১০)	২০
মোট	২৪৭

উইকেট পতন : ১২ (নাওমল), ২৩ (সি. কে. নাইডু), ২৭ (অমরনাথ), ৯০ (উজির আলি), ১৩১ (মুস্তাক আলি), ১৫৮ (মার্চেণ্ট), ২১১ (সি. এস. নাইডু), ২২৩ (অমর সিং), ২৩৬ (দিলওয়ার হুসেন), ২৪৭ (নিসার)।

বোলিং : ক্লার্ক ২৬-৮-৩৯-৩, নিকলস্ ২৮-৬-৭৮-৩, ভেরেটি ২৩'৪-১৩-৬৪-৪, ল্যাঙ্‌রিজ ১৭-৭-২৭-০, টাউনসেণ্ড ৮-৪-১৯-০।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

এস. মুস্তাক আলি ক বার্নেট ব নিকলস্	১৮
জিওমল নাওমল ক লেভেট ব টাউন্সেণ্ড	৪৩
এস. উজির আলি ক নিকলস্ ব ভেরেটি	০
সি. কে. নাইডু ক নিকলস্ ব ভেরেটি	৩৮
লালা অমরনাথ ক লেভেট ব ক্লার্ক	৯
বিজয় মার্চেণ্ট ক জারডিন ব ভেরেটি	১৭
দিলওয়ার হুসেন ব ক্লার্ক	৫৭
সি. এস. নাইডু এল. বি. ডব্লু ব ভেরেটি	১৫
এল. অমর সিং ক জারডিন ব টাউন্সেণ্ড	১৮
মহম্মদ নিসার নট আউট	০
এস. জে. গোপালন ক লেভেট ব ক্লার্ক	৭
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগ বাই ৪, নো বল-১)	১৫
মোট	২৩৭

উইকেট পতন : ৫৭ (মুস্তাক আলি) ৫৮ (উজির আলি) ৭৬ (নাওমল) ৮৮ (অমরনাথ) ১২৯ (মার্চেণ্ট) ১৪৯ (সি. কে. নাইডু) ২০১ (সি. এস. নাইডু) ২১৪ (দিলওয়ার) ২৩০ (অমর সিং) ২৩৭ (গোপালন)।

বোলিং : ক্লার্ক ১৯'৩-৪-৫০-৩, নিকলস্ ২০-৬-৪৮-১, ভেরেটি ৩১-১২-৭৬-৪, ল্যাঙ্‌রিজ ১০-৪-১৯-০, টাউনসেণ্ড ৮-৩-২২-২, বারনেট ২-০-৭-০।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস

সি. এফ. ওয়ান্টার্স নট আউট	২
চার্লি বারনেট ক গোপালন ব নিসার	০
বি. এইচ. ভ্যালান্টাইন স্টা দিলওয়ার হুসেন ব নাওমল	৩
ডব্লু এইচ ভি লেভেট নট আউট	২
মোট ২ উইকেটে	৭

উইকেট পতন : ০ (বারনেট), ৫ (ভ্যালাণ্টাইন)।

বোলিং : নিসার ২-১-২-১, অমর সিং ২-১-১-০, নাওমল ১-০-৪-১।

তৃতীয় টেস্ট : মাদ্রাজ : ফেব্রুয়ারি ১০, ১১, ১২, ১৩ ॥ ১৯৩৪

ফল : ইংলণ্ড ২০২ রানে

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

এ. এইচ. বেকওয়েল ক সি. এস. নাইডু ব অমরনাথ	৮৫
সি. এফ. ওয়ান্টার্স এল. বি. ডব্লু ব অমর সিং	৫৯
এ. মিচেল এল. বি. ডব্লু ব অমরনাথ	২৫
জেমস ল্যাঙরিজ এল. বি. ডব্লু ব অমর সিং	১
ডগলাস জারডিন ক উজির আলি ব অমর সিং	৬৫
চার্লি বারনেট ক পাতিয়ালা ব অমর সিং	৪
এস. এস. নিকল্‌স ব অমর সিং	১
এল. এফ. টাউনসেণ্ড ব অমর সিং	১০
হেডলি ভেরেটি এল. বি. ডব্লু ব মুস্তাক আলি	৪২
এইচ. এলিয়ট ক মুস্তাক আলি ব অমর সিং	১৪
নবি ক্লার্ক নট আউট	৪
অতিরিক্ত (বাই ২২, লেগ বাই ২, নো বল ১)	২৫
মোট	৩৩৫

উইকেট পতন : ১১১ (ওয়াল্টার্স) ১৬৭ (মিচেল) ১৭০ (বেকওয়েল) ১৭৪ (ল্যাঙরিজ) ১৭৮ (বারনেট) ১৮২ (নিকল্স) ২০৮ (টাউনসেণ্ড) ৩০৫ (ভেরেটি) ৩১৭ (জার্ডিন) ৩৩৫ (এলিয়ট)।

বোলিং : অমর সিং ৪৪'৪-১৩-৮৬-৭, সি. কে. নাইডু ১১-১-৩২-০, অমরনাথ ৩১-২৪-৬৯-২, মুস্তাক আলি ২৫-৩-৬৪-১। সি. এস. নাইডু ১৩-১-৪৩-০, নাওমল ৬-০-১৬-০, উজির আলি ১-১-০-০।

ভারত : প্রথম ইনিংস

দিলাওয়ার হুসেন ক বারনেট ব ভেরেটি	১৩
জিওমল নাওমল আহত অবসৃত	
এস. উজির আলি ব নিকলস্	
সি. কে. নাইডু ব ভেরেটি	২০
লালা অমরনাথ ক এলিয়ট ব ল্যাঙরিজ	১২
বিজয় মার্চেন্ট ব ভেরেটি	১৬
পাতিয়ালার যুবরাজ ব ভেরেটি	২৪
এস নাজির আলি ক মিচেল ব ভেরেটি	৩
সি. এস নাইডু ক নিকলস্ ব ভেরেটি	১১
এস. মুস্তাক আলি নট আউট	৭
এল. অমর সিং ক বারনেট ব ভেরেটি	১৬
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগ বাই ৩ নো বল ২)	৬
মোট	১৪৫

উইকেট পতন : ১৫ (উজির আলি) ৩৯ (দিলওয়ার হুসেন) ৪২ (সি. কে. নাইডু) ৬৬ (অমরনাথ) ৯৯ (মার্চেন্ট) ১০৭ (নাজির আলি) ১২২ (পাতিয়ালা) ১২৭ (সি. এস. নাইডু) ১৪৫ (অমর সিং)।

বোলিং : ক্লার্ক ১৫-৪ ৭১-০। নিকলস্ ১২-৩-৩০-১। ভেরেটি ২৩'৫-১০-৪৯-৭। ল্যাঙরিজ ৬-১-৯-১। টাউনসেণ্ড ৩-০-১৪-০।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস

এ. এইচ. বেকওয়েল ক পাতিয়ালা ব অমর সিং	৪
সি. এফ. ওয়াল্টার্স ক পরিবর্ত ব অমরনাথ	১০২
চার্লি বারনেট ক মুস্তাক আলি ব নাজির আলি	২৬
এল. এফ. টাউনসেণ্ড ক সি. কে. নাইডু নাজির আলি	৮
এস. এফ. নিকলস্ ক দিলওয়ার হুসেন ব নাজির আলি	৮
জেমস ল্যাঙরিজ ক দিলওয়ার হুসেন ব নাজির আলি	৪৬
ডগলাস জারডিন নট আউট	৩৫
এ মিচেল ক ও ব অমরনাথ	২৮
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগবাই ৩)	৪

মোট ৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড ২৬১

উইকেট পতন : ১০ (বেকওয়েল) ৭৬ (বারনেট) ৯০ (টাউনসেণ্ড) ১০২ (নিকলস্) ১৮৪ (ওয়াল্টার্স) ২০৯ (ল্যাঙরিজ) ২৬১ (মিচেল:)।

বোলিং : অমর সিং ২৩-৬-৫৫-১২ সি. কে. নাইডু ৯-০ ৩৮-০। নাজির আলি ২৩-০-৮৩ ৪। অমরনাথ ১১'৫-৩-৩২-২। মুস্তাক আলি ৪-০- ১৬-০। সি. এস. নাইডু ২-০-১৭-০। উজির আলি ৩-০-১৬-০।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

দিলওয়ার হুসেন ব ল্যাঙরিজ	৩৬
এস. মুস্তাক আলি ক মিচেল ব ভেরেটি	৮
এস. উজির আলি ক মিচেল ব ভেরেটি	২১
এল. অমর সিং ক বারনেট ব ল্যাঙরিজ	৪৮
সি. কে. নাইডু স্ট্যা. এলিয়ট ব ল্যাঙরিজ	২
বিজয় মার্চেণ্ট ক ও ব ভেরেটি	২৮
পাতিয়ালার যুবরাজ ক এলিয়ট ব ল্যাঙরিজ	৬০
লালা অমরনাথ নট আউট	২৬
এস. নাজির আলি ক নিকলস্ ব ল্যাঙরিজ	৮

সি. এস. নাইডু স্ট্যা এলিয়ট ব ভেরেটি
জিওমল নাওমল আহত ; ব্যাট করেননি
অতিরিক্ত (বাই ১০, লেগবাই ১, নো বল ১) ১২

মোট ২৪৯

উইকেট পতন : ১৬ (মুস্তাক আলি) ৪৫ (উজির আলি) ১১৯ (অমর সিং) ১২০ (দিলওয়ার হুসেন) ১২৫ (সি. কে. নাইডু) ২০৯ (মার্চেন্ট) ২৩৭ (পাতিয়ালা) ২৪৮ (নাজির আলি) ২৪৯ (সি. এস. নাইডু)।

বোলিং : ক্লার্ক ৮—২—২৭—০। নিকলস্ ৬—১—২৩—০। ভেরেটি ২৭.২—৬—১০৪—৪। ল্যাঙরিজ ২৪—৫—৬৩—৫। টাউনসেণ্ড ৩—০—১৯—০। বারনেট ১—০—১—০।

১৯৩৬ : ভারত বনাম ইংলণ্ড

১৯৩৩-৩৪ সালে ইংলণ্ড দলের ভারত সফরের পর ভারতীয় দল ১৯৩৬-এ ইংলণ্ডে যান। সফরকারী দলের অধিনায়ক ছিলেন বিজয়নগরের মহারাজকুমার (ভিজি)। আর ইংলণ্ড দলের নেতৃত্ব করেন গ্যাবি এলেন।

এই সফরে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সফর চলাকালীন দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার লালা অমরনাথকে অশোভন আচরণের জন্য স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়।

১৯৩৬-এর সিরিজে তিনটি টেস্টের মধ্যে দুটিতে ভারত পরাজিত হয় ; দ্বিতীয় টেস্টটি অমীমাংসিত থাকে। ব্যাটে-বলে ভারতের প্রতিরোধ ফিল্ডিংয়ের পূর্বের মত চরম ব্যর্থতা ম্যাচ জয়ের বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথম টেস্ট ॥ লর্ডস ॥ জুন, ২৭. ২৯. ৩০ ॥ ১৯৩৬

ফল : ইংলণ্ড ৯ উইকেটে বিজয়ী

ভারত : প্রথম ইনিংস

বিজয় মার্চেন্ট ব অ্যালেন ৩৫
ডি. ডি. হিণ্ডেলকার ব রবিনস ২৬
এস. মুস্তাক আলি ক ল্যাঙরিজ ব অ্যালেন

সি. কে. নাইডু এল. বি. ডব্লু ব অ্যালেন	১
এস. উজির আলি ব অ্যালেন	১১
এল অমর সিং ক ল্যাঙরিজ ব রবিনস	১২
পি. ই. পালিয়া ক মিচেল ব ভেরেটি	১১
এস. জাহাঙ্গীর খান ব অ্যালেন	১৩
বিজয়নগরের মহারাজকুমার নট আউট	১৯
সি. এস. নাইডু ক উইয়াট ব রবিনস	৬
মহম্মদ নিসার স্ট্যা ডাকওয়ার্থ ব ভেরেটি	৯
অতিরিক্ত (বাই ৪)	৪
মোট	১৪৭

উইকেট পতন : ৬২ (মার্চেন্ট) ৬২ (মুস্তাক) ৬৪ (সি. কে. নাইডু) ৬৬ (হিণ্ডেলকার) ৮৫ (উজির আলি) ৯৭ (অমর সিং) ১০৭ (পালিয়া) ১১৯ (জাহাঙ্গীর খান) ১৩৭ (সি. এস. নাইডু) ১৪৭ (নিসার)।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

এ. মিচেল ব অমর সিং	১৪
এইচ. গিলমেট ক মুস্তাক আলি ব অমর সিং	১১
এস. জে টার্নবুল ব অমর সিং	০
মরিস লেল্যাণ্ড এল. বি. ডব্লু ব অমর সিং	৬০
আর. ই. এস. উইয়াট ক জাহাঙ্গীর খান ব অমর সিং	০
জো হাউস্টাফ ব নিসার	২
জেমস ল্যাঙরিজ জাহাঙ্গীর খান ব সি. কে. নাইডু	১৯
গ্যাবি অ্যালেন ক জাহাঙ্গীর খান ব অমর সিং	১৩
জর্জ ডাকওয়ার্থ ক ভি. জি. ব নিসার	২
ওয়াল্টার রবিনস্ ক সি. কে. নাইডু ব নিসার	০
হেডলি ভেরেটি নট আউট	২
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগ বাই ৪, নো বল ৩)	১১
মোট	১৩২

উইকেট পতন : ১৬ (গিলমেট) ১৬ (টার্নবুল) ৩০ (মিচেল) ৩৪ (উইয়াট) ৪১ (হাউস্টাফ) ৯৬ (লেল্যাণ্ড) ১২৯ (ল্যাঙরিজ) ১৩২ (ডাকওয়ার্থ) ১৩২ (রবিনস) ৩৪১(অ্যালেন) ।

বোলিং : নিসার ১৭-৫-৬৬-৩, অমর সিং ২৫·১-১১-৩৫-৬, জাহাঙ্গীর খান ৯-০-২৭-০, সি. কে নাইডু ৭-২ ১৭-১, সি. এস. নাইডু ৩-০-৮-০ ।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

বিজয় মার্চেণ্ট ক ডাকওয়ার্থ ব অ্যালেন ০

ভি. ডি. হিণ্ডলকার এল. বি. ডব্লু ব রবিনস ১৭

এস. মুস্তাক আলি এল. বি. ডব্লু ব অ্যালেন ৮

এস. উজির আলি ক ভেরেটি ব অ্যালেন ৪

এন. অমর সিং এল. বি. ডব্লু ব ভেরেটি ৭

পি. ই. পালিয়া ক লেল্যাণ্ড ব ভেরেটি ১৬

এস. জাহাঙ্গীর খান ক ডাকওয়ার্থ ব ভেরেটি ১৩

বিজয়নগরের মহারাজকুমার ক মিচেল ব ভেরেটি ৬

সি. এস নাইডু ক হাউস্টাফ ব অ্যালেন ৯

মহম্মদ নিসার নট আউট ২

অতিরিক্ত (বাই ৪, লেগবাই ৩, নো বল ১) ৮

মোট— ৯·

উইকেট পতন :—০ (মার্চেণ্ট) ১৮ (মুস্তাক) ২২ (সি. কে. নাইডু) ২৮ (উজির আলি) ৩৯ (হিণ্ডলকার) ৪৫ (অমর সিং) ৩৪ (জাহাঙ্গীর খান) ৮০ (ভিজি) ৯০ (পালিয়া) ৯৩ (সি. এস. নাইডু) ।

বোলিং :—অ্যালেন ১৮-১-৪৩-৫, উইয়াট ৭-৪-৮-০, ভেরেটি ১৬-৮-১৭-৪, রবিনস ৫-১-১৭-১ ।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস

এ মিচেল ক মার্চেণ্ট ব নিসার ০

এইচ গিলমেট নট আউট ৬৭

এস. জে টার্নবুল নট আউট	৩৭
অতিরিক্ত (বাই ৪)	৪
মোট ১ উইকেটে	১০৮

উইকেট পতন : ০ (মিচেল)

বোলিং : নিসার ৬-৩-২৬-১, অমর সিং ১৬-৩-৬-৩৬-০। জাহাঙ্গীর সাব ১০-৩-২০-০ সি. কে নাইডু ৭-২-২২-০

দ্বিতীয় টেস্ট। ম্যানচেস্টার। জুলাই ২৫, ২৭, ২৮ ১৯৩৬
ভারত : প্রথম ইনিংস

বিজয় মার্চেন্ট ক হ্যামণ্ড ব ভেরেটি	৩৩
এস. মুস্তাক আলি রান আউট	১৩
এল. অমর সিং ক ডাকওয়ার্থ ব ওয়ার্দিংটন	২৭
সি. কে. নাইডু এল বি ডব্লু ব অ্যালেন	১
এস. উজির আলি ক ওয়ার্দিংটন ব ভেরেটি	৪২
সি. রামস্বামী ব ভেরেটি	৪০
এস. জাহাঙ্গীর খান ক ডাকওয়ার্থ ব অ্যালেন	২৬
সি. এস. নাইডু ব ভেরেটি	১০
ডিজি ব রবিনস	৬
কে আর মেহের নট আউট	০
মহম্মদ নিসার ক হাউটাক ব রবিনস	১৩
অতিরিক্ত (বাই ১)	১
মোট	২০৩

উইকেট পতন : ১৮ (মুস্তাক) ৬৭ (মার্চেন্ট) ৭৩ (অমর সিং) ১০০ (সি. কে. নাইডু) ১৬১ (উজির আলি) ১৬৪ (জাহাঙ্গীর খান) ১৮১ সি. এস. নাইডু ১৮৮ (ডি. জি.) ১৯০ (রামস্বামী) ২০৩ (নিসার)।

বোলিং : অ্যালেন ১৪-৬-৩৯-২। গোভার ১৫-২-৩৯-৯। হ্যামণ্ড ৯-২-৩৪-০। রবিনস ৯'১-১-৩৪-২ ভেরেটি ১৭-৫-৪১-৪। ওয়ার্দিংটন ৪-০-১৫-১।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

এইচ. গিমবেট ব নিসার	৯
এ. ই. ফ্যাগ এল বি ডব্লু ব মুস্তাক আলি	৩৯
ডব্লু. আর হ্যামণ্ড ব সি. কে. নাইডু	১৬৭
টি. এস. ওয়ার্দিংটন ক সি কে নাইডু ব সি. এস. নাইডু	৮৭
এল. বি. ফিসলক ব সি. কে নাইডু	৬
জে. হার্ডস্টাফ ক ও ব অমর সিং	৯৪
জি. ও. অ্যালেন ক মেহের হোমজি ব নিসার	১৬
এইচ. ভেরিটি নট আউট	৬৬
জি. ডাকওয়ার্থ নট আউট	০
৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড	৫৭১

উইকেট-পতন : ১২ (গিমবেট) ১৪৬ (ফ্যাগ) ২৭৩ (হ্যামণ্ড) ২৮১ (ফিসলক) ৩৭৫ (ওয়ার্দিংটন) ৩৭৬ (অ্যালেন) ৪০৯ (হার্ডস্টাফ) ৫৬৭ (রবিনস)।

বোলিং : নিসার ২৮-৫-১২৫-৩। অমর সিং ৪১-৮-১২১-২। সি. এস. নাইডু ১৭-১-৮৭-১। সি. কে. নাইডু ২২-১-৮৪-২। জাহাঙ্গীর খান ১৮-৫-৫৭-০। মুস্তাক আলি ১৩-১-৬৪-১। মার্চেন্ট ৩-০-১৭-০।

তৃতীয় টেস্ট। ওভাল। অগস্ট ১৫, ১৭, ১৮, ১৯৩৬

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

সি. জে. বার্নেট এল বি ডব্লু সি. কে নাইডু	৪৩
এ. ই. ফ্যাগ ক দিলওয়ার হোসেন ব অমর সিং	৮
ডব্লু. আর হ্যামণ্ড ব নিসার	২১৭
এম. লেল্যাণ্ড ব নিসার	২৬
টস ওয়ার্দিংটন ব নিসার	১২৮
এল. বি. ফিসলক নট আউট	১৯
গ্যাবি অ্যালেন ক দিলওয়ার হুসেন ব নিসার	১৩

হেডলি ভেরেটি ক. দিলাওয়ার হুসেন ব. নিসার	৪
জে. সিমস্ এল. বি. ডব্লু ব অমর সিং	১
বিল ভোসে নট আউট	১
জর্জ ডার্কওয়ার্থ ব্যাট করেন নি	
অতিরিক্ত (লেগবাই-১০, নো বল-১)	১১
মোট আট উইকেটে ঘোষিত	৪৭১

উইকেট পতন : ১৯ (ফ্যাগ), ৯৩ (বারনেট) ১৫৬ (লেল্যাণ্ড) ৪২২ (হ্যামণ্ড) ৪৩৭ (ওয়ার্দিংটন) ৪৫৫ (অ্যালেন) ৪৬৩ (ভেরেটি) ৪৬৮ (সিমস)।

বোলিং : নিসার ২৬-২-১২০-৫, অমর সিং ৩৯-৮-১০২-২ বাকা জিলানী ১৫-৪-৫৫-০ সি. কে নাইডু ২৪-১-৮২-১, জাহাঙ্গীর খান ১৭-১-৬৫-০, মার্চেন্ট ৬-০-২৩-০, মুস্তাক আলি ২-০-১৩-০ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

বিজয় মার্চেন্ট ব অ্যালেন	৫২
এস. মুস্তাক আলি ষ্ট্যাঃ ডাকওয়ার্থ ব ভেরেটি	৫২
দিলওয়ার হুসেন স্ট্যা ডাকওয়ার্থ ব ভেরেটি	৩৫
সি. কে. নাইডু ব অ্যালেন ব ভোস	৫
সি. রামস্বামী ব. সিমস্	২৯
এস. উজির আলি এল. বি. ডব্লু ব সিমস	২
এল. অমর সিং ব ভেরেটি	৫
এস. জাহাঙ্গীর খান ক ফ্যাগ ব সিমস	৯
ভিজি ব সিমস	১
এস বাকা জিলানী নট আউট	৪
মহম্মদ নিসার ক ওয়ার্দিংটন ব সিমস	১৪
অতিরিক্ত (বাই-৮, লেগবাই ৬)	১৪
	২২২

উইকেট পতন : ৮১ (মুস্তাক আলি) ১২৫ (মার্চেণ্ট) ১৩০ (সি. কে. নাইডু) ১৮৫ (রামস্বামী) ১৯৫ (অমর সিং) ১৯৫ (দিলওয়ার হুসেন) ২০৩ (ভিজ্জি) ২০৬ (জাহাঙ্গীর খান) ২২২ (নিসার)।

বোলিং : ভোসে ২০-৫-৪৬-১ অ্যালেন ১২-৩-৩৭-১ হ্যামণ্ড ৮-২-১৭-০ ভেরেটি ২৫-১২-৩০-৩ সিমস ১৮.৫-১-৭৩-৫ লেল্যাণ্ড ২-০-৫-০।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

বিজয় মার্চেণ্ট ব ওয়ার্দিংটন ব অ্যালেন	৪৮
মুস্তাক আলি ব হ্যামণ্ড ব অ্যালেন	১৭
দিলওয়ার হুসেন এল. বি. ডব্লু ব সিমস্	৫৪
এল অমর সিং ক সিমস ব ভেরেটি	৪৪
এস বাকা জিলানী ক ফ্যাগ ব অ্যালেন	১২
সি. কে নাইডু ব অ্যালেন	৮১
এস. উজির আলি ব ডাকওয়ার্থ ব অ্যালেন	১
• সি. রামস্বামী নট আউট	৪১
এস. জাহাঙ্গীর খান ব ভোসে ব অ্যালেন	১
ভি জি ব অ্যালেন	১
মহম্মদ নিসার ক ভোসে ব সিমস্	০
অতিরিক্ত (বাই-৩ লেগ-বাই-৭ নো বল-২)	১২
মোট	৩১২

উইকেট পতন : ৬৪ (মুস্তাক আলি) ৭১ (মার্চেণ্ট) ১২২ (অমর সিং) ১৫৯ (বাকা জিলানী) ২১২ (দিলওয়ার হুসেন) ২২২ (উজির আলি) ২৯৫ (সি. কে. নাইডু) ৩০৭ (জাহাঙ্গীর খান) ৩০৯ (ভি জি) ৩১২ (নিসার)।

বোলিং : ভোসে ২০-৫-৪০-০, অ্যালেন ২০-৬-৮০-৭, হ্যামণ্ড ৭-০-২৪-১ ভেরেটি ১৬-৬-৩২-১ সিমস ২৫-২-৯৫-২ লেল্যাণ্ড ৩-০-১৯-০, ওয়ার্দিংটন ২-০-১০-০।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস

ব্র. ফ্যাগ ক অমর সিং ব নিসার	২২
চার্লি বারনেট নট আউট	৩২
ওয়ালি হ্যামণ্ড নট আউট	৫
অতিরিক্ত (বাই-৪ নোবল-১)	৫
মোট	৬৪

উইকেট পতন : ৪৮ (ফ্যাগ)

বোলিং : নিসার ৭-০-৩৬-১ অমর সিং ৬-০-২৩-০

ফলাফল : ইংলণ্ড ৯ উইকেটে জয়ী

১৯৪৬ : ভারত বনাম ইংলণ্ড

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ইংলণ্ড নতুন করে ক্রিকেটের আসর পাতা হচ্ছে তখনই পতৌদির নবাবের (বড়) নেতৃত্বে একটি ভারতীয় দল ইংলণ্ড সফরে যায়। পতৌদি ইতিপূর্বে ইংলণ্ড দলের পক্ষে অস্ট্রেলিয়া সফর করেন এবং তাঁর প্রথম টেস্ট আবির্ভাবেই সেঞ্চুরি করেন। এবারের সফরকারী ভারতীয় দলে পতৌদি ছাড়া আরো কয়েকজন ছিলেন যাঁদের ইতিপূর্বে ইংলণ্ডের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতা ছিল - মার্চেন্ট, মুস্তাক আলি, অমরনাথ, হিন্দালকার, শুটে ব্যানার্জী, আব্দুল হাফিজ। আর ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন ওয়ালি হ্যামণ্ড।

সিরিজের তিনটি টেস্টের মধ্যে প্রথমটিতে ইংলণ্ড জয়লাভ করে, অপর দুটি ম্যাচ ড্র হয়। শেষ ম্যাচটি প্রবল বর্ষণে বিঘ্নিত না হলে এ ম্যাচে ভারতের জয়লাভের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রথম টেস্ট। লর্ডস্। জুন, ২২, ২৪ ও ২৫, ১৯৪৬

ভারত : প্রথম ইনিংস

বিজয় মার্চেন্ট ক গিব ব বেডসার	১২
বিনু মানকড় ব রাইট	১৪

লালা অমর নাথ এল বি ডব্লু ব বেডসার	০
বিজয় হাজারে ব বেডসার	৩১
রুসি মোদী নট আউট	৫৭
পতৌদি (বড়) ক. আইকন ব বেডসার	৯
গুল মহম্মদ ব রাইট	১
আব্দুল হাফিজ ব বাওয়েস	৪৩
ডি. ডি. হিন্দলকার এল বি ডব্লু ব বেডসার	৩
সি. এস. নাইডু স্ট্যা গিব ব বেডসার	৪
এস. জি. সিন্ধে ব বেডসার	১০
অতিরিক্ত (বাই—১০, লেগবাই—৬)	১৬
	মোট—২০০

উইকেট পতন : ১৫ (মার্চেণ্ট) ১৫ (অমরনাথ) ৪৪ (মানকড়) ৭৪ (হাজারে) ৮৬ (পতৌদি) ৮৭ (গুল মহম্মদ) ১৪৪ (হাফিজ) ১৪৭ (হিন্দেলকার) ১৫৭ (নাইডু), ২০০ (সিন্ধে)।

বোলিং : বাওয়েস ২৫-৭-৬৪-১। বেডসার ২৯-১-১১-৪৯-৭ স্মাইলস-৫-১-১৮-০। রাইট ১৭-৪-৫৩-২।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

লেন হাটন ক নাইডু ব অমর নাথ	৭
সিরিল ওয়াস ব্রুক ক মানকড় ব অমরনাথ	২
ডেনিস কম্পটন ব অমরনাথ	০
ওয়ালি হ্যামণ্ড ব অমরনাথ	৩৩
জো হার্ডষ্টাফ নট আউট	২০৫
পল গিব ক হাজারে ব মানকড়	৬০
জ্যাক আইকিন ক হিন্দেলকার ব সিন্ধে	১৬
টি. এফ. স্মাইলস ক মানকড় ব অমরনাথ	২০
আলেক বেডসার ব হাজারে	৩০

ডগ রাইট ব মানকড়	৩
বিল বাওয়েস এল বি. ডব্লু ব হাজারে	২
অতিরিক্ত (বাই ১১ লেগবাই ৮ নো বল)	২০
মোট	৪২৮

উইকেট পতন : ১৬ (হাটন), ১৬ কম্পটন ৬১ (ওয়াসব্রুক), ৭০ (হ্যামণ্ড) ৫, (গিব) ২৮৪ (আইকিন) ৩৪৪ (স্মাইলস) ৪১৬ (বেডসার) ৪২১ (রাইট) ৪২৮ (বাওয়েস)।

বোলিং : হাজারে ৩৪·৪-৪-১০০-২, অমরনাথ ৩৭-১৮-১১৮-৫ গুল মহম্মদ ২-০-২-০, মানকড় ৪৮-১১-১০৭-২, সিন্ধে ২৩-২-৬৬-১। নাইডু ৫-১-১৫-০।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

বিজয় মার্চেন্ট এল. বি. ডব্লু ব আইকিন	৭
বিনু মানকড় ক হ্যামণ্ড ব স্মাইলস	৬৩
রুসি মোদী এল. বি. ডব্লু ব স্মাইলস	১
আবুল হাফিজ ব বেডসার	০
বিজয় হাজারে ক হ্যামণ্ড ব বেডসার	৩৪
পাতৌদি (বড়) ব রাইট	২২
গুল মহম্মদ এল. বি. ডব্লু ব রাইট	৯
লালা অমরনাথ ব স্মাইলস	৫০
ডি. ডি হিন্দেলকার ক আইকিন ব বেডসার	১৭
সি. এস. নাইডু ক বেডসার	১৩
এস. জি. সিন্ধে নট আউট	৪
অতিরিক্ত (বাই—১০, লেগবাই—২, নো-বল—৩)	১৫
মোট	২৭৫

উইকেট পতন : ৬৭ (মার্চেন্ট) ১১৭ (মানকড়) ১২৬ (হাফিজ) ১২৯ (মোদি) ১৭৪ (পতৌদি) ১৮৫ (হাজারে) ১৯০ (গুল মহম্মদ) ৪২৯ (হিন্দেলকার) ২৬৩ (অমরনাথ) ২৭৫ (নাইডু)।

বোলিং : বাওয়েস ৪-১-৯-০, বেডসার ৩২·১-৩-৯৬-৪ স্মাইলস ১৫-২-৪৪-৩, রাইট-২০-৩-৬৮-২, আইকিন ১০-১-৪৩-১।

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস

সিরিল ওয়াসব্রুক নট আউট	২৪
লেন হাটন নট আউট	২২
অতিরিক্ত (লেগবাই—১, ওয়াইড—১)	২
মোট বিনা উইকেটে	৪৮

বোলিং : হাজারে ৪-২-৭-০, অমরনাথ ৪-০-১৫-০, মাঁকড় ৪·৫-১-১১-০, নাইডু ৪-০-১৩-০।

ফলাফল : ইংলণ্ড ১০ উইকেটে জয়ী

দ্বিতীয় টেস্ট। ম্যানচেস্টার। জুলাই ২০, ২২, ২৩, ১৯৪৬

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

লেন হাটন ক মুস্তাক আলি ব মানকড়	৬৭
সিরিল ওয়াসব্রুক ক হিন্দেলকার ব মানকড়	৫২
ডেনিস কম্পটন এল বি ডব্লু ব অমরনাথ	৫১
ওয়ালি হ্যামণ্ড ব অমরনাথ	৬৯
জো হাউস্টাফ ক মার্চেন্ট ব অমরনাথ	৫
পল গিব ব মানকড়	২৪
জ্যাক আইকিন ক মানকড় ব অমরনাথ	২

বিল ভোসে ব মানকড়	০
আর পলার্ড নট আউট	১০
আলেক বেডসার এল বি ডব্লু ব অমরনাথ	৮
ডগ রাইট এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	০
অতিরিক্ত (বাই-২ লেগ-বাই-৪)	৬
মোট	২৯৪

উইকেট পতন : ৮১ (ওয়াসব্রুক) ১৫৬ (কম্পটন) ১৮৬ (হাটন) ১৯৪ (হার্ডস্টাফ) ২৫০ (গিব) ২৬৫ (আইকিন) ২৭০ (ভোসে) ২৭৪ (হ্যামণ্ড) ২৮৭ (বেডসার) ২৯৪ (রাইট)

বোলিং : সোহনি ১১-১-৩১-০ অমরনাথ ৫১-১৭-৯৬-৫ হাজারে ১৪-২-৪৮-০ মানকড় ৪৬-১৫-১০১-৫ সারভাতে ৭-০-১২-০।

ভারত : প্রথম ইনিংস

বিজয় মার্চেন্ট ক বেডসার ব পলার্ড	৭৮
এস মুস্তাক আলি ব পলার্ড	৪৬
আব্দুল হাফিজ ক ও ব পলার্ড	১
বিনু মানকড় ব পলার্ড	০
বিজয় হাজারে ব ভোসে	৩
রুসি মোদী ক আইকন ব বেডসার	২
পতৌদি (বড়) ব পলার্ড	১১
লালা অমরনাথ ব বেডসার	৮
এস. ডব্লু সোহানী ক ও ব বেডসার	৩
সি. টি. সারভাতে ক আইকন ব বেডসার	০
অতিরিক্ত (বাই-১০ লেগবাই ৫ নোবল ২)	১৭
মোট	১৭০

উইকেট পতন : ১২৪ (মুস্তাক আলি) ১৩০ (হাফিজ) ১৩০ (মানকড়) ১৪১ (মার্চেন্ট) ১৪১ (হাজারে) ১৪৬ (মোদি) ১৫৬ (অমরনাথ) ১৬৮ (সোহনী) ১৬৯ (সারভাতে) ১৭০ (পতৌদি)।

বোলিং : ভোসে-২০-৩-৪৪-১ বেডসার-২৯-৯-৪১-৪ পলার্ড ২৭-১৬-২৪-৫ রাইট ১-০-১২-০ কম্পটন ৪২০-১৮-০ আইকিন ২-০-১১-০ হ্যামণ্ড ১-০-৩-০॥

ইংলণ্ড : দ্বিতীয় ইনিংস

লেন হাটন ব হিন্দেলকার ব অমরনাথ	২
সিরিল ওয়াসব্রুক এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	২৬
ডেনিস কম্পটন নট আউট	৭১
ওয়ালি হ্যামণ্ড ক হাফিজ ব মানকড়	৮
জো হার্ডস্টাফ ব অমরনাথ	
পল গিব ক মোদি ব অমরনাথ	
জ্যাক আইকিন নট আউট	২৯
অতিরিক্ত (বাই-৬, লেগবাই ১০, ওয়াইড ১)	১৭
মোট ৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড	১৫৩

উইকেট পতন : ৭ (হাটন) ৪৮ (ওয়াসব্রুক) ৬৮ (হ্যামণ্ড) ৬৮ (হার্ডস্টাফ) ৮৪ (গিব) ।

বোলিং : অমরনাথ ৩০-৯-৭১-৩ ; হাজারে ১০-৩-২০-০ ; মানকড় ২১-৬-৪৪-২ ।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

বিজয় মার্চেন্ট ক আইকিন ব পলার্ড	
এস মুস্তাক আলি ব পলার্ড	১
পতৌদি (বড়) ব বেডসার	৪
বিজয় হাজারে ব বেডসার	৪৪
রুসি মোদি ব বেডসার	৩০
বিনু মানকড় ক পলার্ড ব বেডসার	৫
আব্দুল হাফিজ ক ও ব বেডসার	৩৫
লালা অমরনাথ ব বেডসার	৩
এস. ডব্লু সোহানী নট আউট	১১

সি. টি. সারভাতে ব গিব ব বেডসার	২
ডি ডি হিন্দেলকার নট আউট	৪
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগবাই ৮)	১৩
মোট ৯ উইকেটে	১৫২

উইকেট পতন : ০ (মার্চেন্ট) ৩ (মুস্তাক আলি) ৫ (পতৌদি) ৭৯ (মোদি) ৮৪ (মানকড়) ৮৭ (হাজারে) ১১৩ (অমরনাথ) ১২২ (হাফিজ) ১৩৮ (সারভাতে)।

বোলিং : ভোসে ৬-৫-২-০ বেডসার ২৫-৪-৫২-৭ ; পলার্ড ২৫-১০-৭৩-২ ; রা:ট ২-০-১৭-০ কম্পটন—৩-১-৫-০ ।

ফলাফল : ড্র

তৃতীয় টেস্ট। ওভাল। অগাস্ট ১৭, ১৯, ২০, ১৯৪৬

ভারত : প্রথম ইনিংস

বিজয় মার্চেন্ট রান আউট	১২৮
এস. মুস্তাক আলি রান আউট	৫৯
পতৌদি (বড়) ব এডরিচ	৯
লালা অমরনাথ ব এডরিচ	৮
বিজয় হাজারে ক কম্পটন ব গোভার	১১
রুসি মোদি ব স্মিথ	৭২
আব্দুল হাফিজ ব এডরিচ	১
বিনু মানকড় ব বেডসার	২২
এস ডব্লু সোহনি আউট	২৯
সি. এস. নাইডু ক ওয়াস ব্রুক ব বেডসার	৪
ডি. ডি. হিন্ডেলকার এল. বি. ডব্লু ব এডরিচ	৩
অতিরিক্ত (বাই-১, লেগ-বাই ৫, নো-বল-৪)	১০
মোট	৩৩১

উইকেট পতন : ৯৪ (মুস্তাক আলি) ১২৪ (পতৌদি) ১২৪ (অমরনাথ) ১৬২ (হাজারে) ২২৫ (সোহনি) ২২৬ (হাফিজ) ২৭২ (মার্চেন্ট) ৩২৫ (নাইডু) ৩৩১ (হিন্দেলকার)।

বোলিং : গোভার ২১-৩-৫৬-১ বেডসার ৩২-৬-৬০-২ স্মিথ ২১-৪-৫৮-১ এডরিচ ১৯.২-৪-৬৮-৪ ল্যাংরিজ ২৯-৯-৬৪-০ কম্পটন ৫-০-১৫-০

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

লেন হাটন এল বি ডব্লু ব মানকড়	২৫
সিরিল ওয়াসব্রুক ক. মুস্তাক আলি ব মানকড়	১৭
এস. বি ফিসলক ব মার্চেন্ট ব নাইডু	৮
ডেনিস কম্পটন নট আউট	২৪
ওয়ালি হ্যামণ্ড নট আউট	৯
* বিল এডরিচ ব্যাট করেন নি	—
জেমস ল্যাডরিজ ব্যাট করেননি	—
টি. বি. পি. স্মিথ ব্যাট করেন নি	—
গডফ্রে ইভান্স ব্যাট করেন নি	—
অ্যালেক বেডসার ব্যাট করেন নি	—
অ্যালক গোভার ব্যাট করেন নি	১২
অতিরিক্ত (বাই-১১ লেগ-বাই-১	——
মোট তিন উইকেটে	৯৫

উইকেট : ৪৮ (ওয়াইসব্রুক) ৫৫ (হাটন) ৬৬ (ফিসলক)।

বোলিং : অমরনাথ ১৫-৬-৫০-০ সোহনি-৪-৩-২-০ হাজারে ২-১-৪-০ মানকড় ?-৭-২৮-২ নাইডু ৯-২-১৯-১।

ফলাফল ড্র

১৯৪৭-৪৮ : ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

ইংলণ্ড সফরের পরের বছরে ভারতীয় দল গেল অস্ট্রেলিয়া। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে এবং নতুন রাষ্ট্র হিসাবে জন্ম নিয়েছে পাকিস্তান। অবশ্য

পাকিস্তানী জাতীয় দল তখনও তৈরি না হওয়ায় ওদের ভারতের পক্ষে খেলায় কোন বাধানিষেধ ছিল না। দলে নির্বাচিত খেলোয়াড় ফজল মামুদ অবশ্য অন্য কারণে সফরে যান নি।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল ছিল তখন পৃথিবীর সেরা। দলপতি ডন ব্র্যাডম্যান ছাড়াও ছিলেন লিণ্ডসে হ্যাসেট, বিল ব্রাউন, আর্থার মরিস, কীথ মিলার, নীল হার্ভে, রে লিণ্ডওয়াল, জনসন, জনষ্টন সিডনি বার্নস, ম্যাককুল প্রভৃতি দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়েরা। তাঁরা সহজেই হারিয়েছেন ইংলণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মত দলকে।

তবু এই দলের বিরুদ্ধে তৎকালীন সেরা খেলোয়াড়ে ভারতীয় দলকে সমৃদ্ধ করা হয়নি। দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন লালা অমরনাথ। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে ফজল মামুদ ছাড়াও যাননি বিজয় মার্চেন্ট, রুসি মোদী, মুস্তাক আলি। এতদসত্বেও ভারতীয় দল যথেষ্ট সাফল্য দেখাতে পারত যদি ক্যাচ ধরার ক্ষেত্রে আরেকটু তৎপর হতে পারতেন, গ্রাউণ্ড ফিল্ডিং এ পারদর্শিতা দেখাতে পারতেন। প্রথম ভারতীয় হিসাবে বিজয়হাজারে এক টেস্টের (৪র্থ টেস্ট) দুটি ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছিলেন।

এবারের সিরিজে পাঁচটি টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রতি ম্যাচ ছিল ছ দিনের। আট বলের ওভারও ছিল অস্ট্রেলিয়ায় খেলার বৈশিষ্ট্য। ভারত চারটি টেস্টে পরাজিত হয় এবং একটির ফলাফল অমীমাংসিত ছিল, যদিও সে খেলায় ভারতীয় দলের প্রাধান্য ছিল অবিসংবাদিত এবং বৃষ্টির জন্য যে ম্যাচ বিঘ্নিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিল।

প্রথম টেস্ট : ব্রিসবেন : নভেম্বর ২৮, ২৯। ডিসেম্বর ১, ২, ৩, ৪ ১৯৪৭

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস

বিল ব্রাউন ক ইরানি ব অমরনাথ	১১
আর্থার মরিস হিট উইকেট ব সারভাতে	৪৭
ডন ব্র্যাডম্যান হিট উইকেট ব অমরনাথ	১৮৫
লিণ্ডসে হ্যাসেট ক গুল মহম্মদ ব মানকড়	৪৮
কীথ মিলার ব মানকড় ব অমরনাথ	৫৮
কলিন ম্যাককুল স্টা সোহনি ব অমরনাথ	১০

লে লিণ্ডওয়াল ও ইরানি ব মানকড়	৭
ডন ট্যালন নট আউট	৩
ইয়ান জনসন ব রঙ্গনেকার ব মানকড়	৬
আর্নি টসাক নট আউট	০
বিল জনস্টন ব্যাট করেন নি	—
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগ বাই ১ ওয়াইড ১)	৭
মোট আট উইকেটে	৩৮২

উইকেট পতন : ৩৮ (ব্রাউন) ৯৭ (মরিস) ১৯৮ (হ্যাসেট) ৩১৮ (মিলার) ৩৪৪ (ম্যাককুল) ৩৭৩ (লিণ্ডওয়াল) ৩৮০ (ব্রাডম্যান) ৩৮০ (জনসন)।

বোলিং : সোহনি ২৩-৪-৮১-০, অমরনাথ—৩৯-১০-৮৪-৪ মানকড় ৩৪-৩-১১৩-৩ সারভাতে ৫-১-১৬-১ হাজারে ১১-১-৬৩-০ নাইডু ৩-০-১৮-০।

ভারত : প্রথম ইনিংস

বিনু মানকড় ব ট্যালন ব লিণ্ডওয়াল	৯
সি. টি. সারভাতে ক জনস্টন ব মিলার	১২
গুল মহম্মদ ব লিণ্ডওয়াল	০
হেমু অধিকারী ক ম্যাককুল	৮
জি. কিষেনচাঁদ ব ট্যালন ব জনস্টন	১
বিজয় হাজারে ক ব্রাউন ব টসাক	১০
লালা অমরনাথ ব্রাডম্যান ব টসাক	২২
কে. এস রঙ্গনেকার ক মিলার ব টসাক	১
এস. ডব্লু. সোহনি ক মিলার ব টসাক	২
সি. এস. নাইডু নট আউট	০
জে. কে. ইরানি ব হ্যাসেট ব টসাক	০
অতিরিক্ত (বাই-১ লেগ বাই ১)	২
মোট	৫৮

উইকেট পতন : ০ (মানকড়) ০ (গুলমহম্মদ) ১৯ (অধিকারী) ২৩ (কিষেন চাঁদ) ২৩ (সারভাতে) ৫৩ (হাজারে) ৫৬ (রঙ্গনেকার) ৫৮ (সোহনি) ৫৮ (ইরানি)।

বোলিং : লিণ্ডওয়াল ৫-২-১১-২. জনস্টন ৮-৪-১৭-২. মিলার ৬-১-২৬-১ টসাক ২-৩-১-২-৫

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

বিনু মানকড় ব লিণ্ডওয়াল	৭
সি. টি. সারভাতে ব জনষ্টন	২৬
গুল মহম্মদ ব টসাক	১৩
হেমু অধিকারী এল. বি. ডব্লু ব টসাক	১৩
জি. কিষেন চাঁদ ক ব্রাডম্যান ব টসাক	০
বিজয় হাজারে ক মরিস ব টসাক	১৮
লালা অমরনাথ ব টসাক	৫
কে. এম. রঙ্গনেকার ক হ্যাসেট ব টসাক	০
এস. ডব্লু. সোহনি ব ব্রাউন ব মিলার	৪
সি. এস. নাইডু ক হ্যাসেট ব লিণ্ডওয়াল	৬
জে. কে. ইরানী নট আউট	২
অতিরিক্ত (বাই-৩, নো-বল ৩)	৪
মোট —	৯৮

উইকেট পতন : ১৪ (মানকড়) ২৭ (গুল মহম্মদ) ৪১ (অধিকারী) ৪১ (কিষেন চাঁদ) ৭২ (হাজারে) ৮০ (রঙ্গনেকার ৮৯ (সোহনি) ৯৪ (সারভাতে) ৯৮ (নাইডু)।

বোলিং : লিণ্ডওয়াল ১০-৭-২-১৯-২ জনস্টন ৯-৬-১১-১-মিলার ১০-২-৩০-১ টসাক ১৭-৬-২৯-৬ জনসন ৩-১-৫-০।

ফলাফল : অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ২২৬ রানে জয়ী

দ্বিতীয় টেস্ট । সিডনি ॥ ডিসেম্বর ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯৪৭

ভারত : প্রথম ইনিংস

বিনু মানকড় ব লিণ্ডওয়াল	৫
সি. টি. সারভাতে ব জনস্টন	•
গুল মহম্মদ ব ব্রাউন ব মিলার	২৯
বিজয় হাজারে ব মিলার	১৬
লালা অমরনাথ ব জনসন	২৫
জি. কিষেনচাঁদ ব জনসন	৪৪
হেমু অধিকারী এল. বি. ডব্লু ব জনস্টন	০
দাত্তু ফাদকার ক মিলার ব ম্যাককুল	৫১
সি. এস. নাইডু ক ও ব ম্যাক্কুল	৬
আমীর ইলাহি ক মিলার ব ম্যাক্কুল	৪
জে. কে. ইরানী নট আউট	:
অতিরিক্ত	৭
মোট	১৮৮

উইকেট পতন : ২ (সারভাতে), ১৬ (মানকড়), ৫২ (গুল মহম্মদ), ৫৭ (হাজারে), ৯৪ (অমরনাথ) ৯৫ (অধিকারী) ১৬৫ (কিষেনচাঁদ) ১৭৪ (সি. এস. নাইডু) ১৮২ (আমীর ইলাহী) ১৮৮ (ফাদকার)।

বোলিং : লিণ্ডওয়াল ১২-৩-৩০-১। জনস্টন ১৭-৪-৩৩-২। মিলার ৯-৩-২৫-২। ম্যাক্কুল ১৮-২-৭১-৩। জনসন ১৪-৩-২২-২।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস

ব্রাউন রান আউট	১৮
মরিস এল. বি. ডব্লু ব অমরনাথ	১০
ডন ব্রাডম্যান ব হাজারে	১৩
হ্যাসেট ক অধিকারী ব হাজারে	৬
কিথ মিলার এল. বি. ডব্লু ব ফাদকার	১৭
হ্যামেন্স ক অধিকারী ব মানকড়	২৫

জনসন এল. বি. উব্লু ব ফাদকার	১
ম্যাক্‌কুল ব ফাদকার	৯
লিণ্ডওয়াল ব হাজারে	০
ট্যালন ক ইরানী ব হাজারে	৬
জনস্টন নট আউট	০
অতিরিক্ত	২
মোট—	১০৭

উইকেট পতন: ২৫ (ব্রাউন) ৩০ (মরিস) ৪৩ হ্যাসেট) ৪৮ ব্রাডম্যান ৮৬ (মিলার) ৯২ (হ্যামেন্স) ৯২ (জনসন) ৯৭ (লিণ্ডওয়াল) ১০৫ (ম্যাককুল) ১০৭ (ট্যালন)।

বোলিং: ফাদকার ১০-২-১৪-৩। অমরনাথ ১৪-৪-৩১-১। মানকড় ৯-০-৩১-১। হাজারে ১৩·২-৩-২৯-৪।

ভারত: দ্বিতীয় ইনিংস

বিনু মানকড় ব লিণ্ডওয়াল	৫
আমীর ইলাহী ক মিলার ব জনস্টন	১৩
জি. কিষেনচাঁদ ক ম্যাক্‌কুল ব জনস্টন	.
গুল মহম্মদ ক ব্র্যাডম্যান ব জনসন	৫
সি.টি. সারভাতে ক জনসন ব জনস্টন	৩
দাত্তু ফাদকার ক ট্যালন ব মিলার	২
লালা অমরনাথ ক মরিস ব জনসন	১৪
বিজয় হাজারে নট আউট	১০
হেমু অধিকারী নট আউট	০
অতিরিক্ত	৬
মোট ৭ উইকেটে	৬৪

উইকেট পতন: ১৭ (মানকড়) ১৯ (কিষেনচাঁদ) ২৬ (আমীর ইলাহি) ২৯ (সারভাতে) ৩৪ (গুল মহম্মদ) ৮৩ (ফাদকার) ৫৫ (অমরনাথ)

বোলিং: লিণ্ডওয়াল ৫-১-১৩-১। জনস্টন ১৩-৫-১৫-৩। মিলার ৬-২-৩-১। জনসন ১৩-৭-২২-২।

ফলাফল: ড্র

তৃতীয় টেস্ট । মেলবোর্ন । জানুয়ারি ১, ২, ৩, ৫, ১৯৪৮

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস

বার্নস ব মানকড়	১২
মরিস ব অমরনাথ	৪৫
ব্র্যাডম্যান এল. বি. ডব্লু ব ফাদকার	১৩২
হ্যাসেট এল বি. ডব্লু ব মানকড়	৮০
মিলার এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	২৯
হ্যামেন্স স্ট্যা সেন ব অমরনাথ	২৫
লিণ্ডওয়াল ব অমরনাথ	২৬
ট্যালন ক মানকড় ব অমরনাথ	১
ডুল্যাণ্ড নট আউট	২১
জনসন এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	১৬
জনস্টন রান আউট	৫
অতিরিক্ত (বাই ১)	১
মোট	৩৯৪

উইকেট পতন : ২৯ (বার্নস) ৯৯ (মরিস) ২৬৮ (হ্যাসেট) ২৮৯ (ব্র্যাডম্যান) ৩০২ (মিলার) ৩৩৯ (লিণ্ডওয়াল) ৩৪১ (ট্যালন) ৩৫২ (হ্যামেন্স) ৩৮৭ (জনসন) ৩৯৪ (জনস্টন)।

বোলিং : ফাদকার ১৫-১-৮০-১। অমরনাথ ২১-৩-৭৮-৪। হাজারে ১৬·১-০-৬২-০। মানকড় ৩৭-৪-১৩৫-৪। সারভাতে ৩-০-১৬-০। সি. এস. নাইডু ২-০-২২-০।

ভারত : প্রথম ইনিংস

বিনু মানকড় ক ট্যালন ব জনস্টন	১১৬
সি. টি. সারভাতে ক ট্যালন ব জনস্টন	৩৬
গুল মহম্মদ ক ও ব ডুল্যাণ্ড	১২
বিজয় হাজারে ক ট্যালন ব বার্নস	১৭

লালা অমরনাথ এল. বি. ডব্লু ব বার্নস	০
দাত্তু ফাদকার নট আউট	৫৫
হেমু অধিকারী স্ট্যা ট্যালন ব জনসন	২৬
রায় সিংহ ক বার্নস ব জনসন	২
রঙ্গনেকার ক ও ব জনসন	৬
পি. সেন ব জনসন	৪
সি. এস. নাইডু নট আউট	৪
অতিরিক্ত (বাই ৯ লেগ বাই ৪ নো বল ১)	১৩
মোট নয় উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড	২৯১

উইকেট-পতন : ১২৪ (সারভাতে), ১৪৫ (গুল মহম্মদ), ১৮৮ (হাজারে) ১৮৮ (অমরনাথ), ১৯৮ (মানকড়), ২৬০ (অধিকারী), ২৬৪ (রায়সিং), ২৮০ (রঙ্গনেকার), ২৮৪ (পি সেন) ।

বোলিং : লিণ্ডওয়াল ১২-০-৪৭-০ । মিলার ১৩-২-৪৬-০ । জনস্টন ১২-০-৩৩-২ । জনসন ১৪-১-৫৯-৪ । ডুল্যাণ্ড ১২-০-৬৮-১ । বার্নস ৬-১-২৫-২ ।

অস্ট্রেলিয়া : দ্বিতীয় ইনিংস

জনসন ক হাজারে ব অমরনাথ	০
জনস্টন এল. বি. ডব্লু ব অমরনাথ	৩
ডুল্যাণ্ড এল. বি. ডব্লু ব ফাদকর	৬
বার্নস ক সেন ব অমরনাথ	১৫
মরিস নট আউট	১০০
ডন ব্র্যাডম্যান নট আউট	১২৭
অতিরিক্ত (বাই ৩ নো বল ১)	৪
মোট চার উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড	২৫৫

উইকেট-পতন : ১ (জনসন), ১১ (জনস্টন), ১৩ (ডুল্যাণ্ড), ৩২ (বার্নস) ।

বোলিং : ফাদকার ১০-১-২৮-১ । অমরনাথ-২০-৩-৫২-৩ । হাজারে ১১-১-৫৫-০ মানকড় ১৮-৪-৭৪-০ । সারভাতে ৫-০-৪১-০ । গুল মহম্মদ ১-০-১-০ ।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

সি. টি. সারভাতে ব জনস্টন	১
রায় সিংহ ক ট্যালন ব জনস্টন	২৪
বিনু মানকড় ব জনস্টন	১৩
দাত্তু ফাদকার ক বার্নস ব জনস্টন	১৩
বিজয় হাজারে ক বার্নস ব মিলার	১০
লালা অমরনাথ ব লিণ্ডওয়াল	৮
গুল মহম্মদ ক মরিস ব জনসন	২৮
হেমু অধিকারী ক লিণ্ডওয়াল ব জনসন	১
রঙ্গনেকার ক হ্যামন্স ব জনসন	১৮
পি. সেন ক হ্যাসেট ব জনসন	২
সি. এস. নাইডু নট আউট	
অতিরিক্ত (বাই ৬ লেগ বাই ১)	
মোট	১২৫

উইকেট-পতন : ১০ (সারভাতে), ২৭ (রায় সিং), ৪৪ (মানকড়), ৬০ (হাজারে), ৬০ (ফাদকার), ৬৯ (অমরনাথ), ১০০ (অধিকারী), ১০৭ (গুল মহম্মদ), ১২৯ (রঙ্গনেকার), ১২৫ (পি সেন)।

বোলিং : লিণ্ডওয়াল ৩-০-১০-১। মিলার ৭-০-২৯-১। জনস্টন ১০-১-৪৪-৪। জনসন ৫.৭-০-৩৫-৪।

ফলাফল : অস্ট্রেলিয়া ২৩৩ রানে বিজয়ী

চতুর্থ টেস্ট। এডিলেড। জানুয়ারি ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ১৯৪৮

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস

বার্নস এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	১২
মরিস ব ফাদকার	৭
ডন ব্র্যাডম্যান ব হাজারে	২০১

হ্যাসেট নট আউট	১৯৮
কীথ মিলার ব রঙ্গচারী	৬৭
নীল হার্ভে এল. বি. ডব্লু ব রঙ্গচারী	১৩
ম্যাক্‌কুল ব ফাদকার	২৭
জনসন ব রঙ্গচারী	২২
রে. লিণ্ডওয়াল ব রঙ্গচারী	২
ট্যালন এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	১
টোসাক এল. বি. ডব্লু ব হাজারে	৮
অতিরিক্ত (বাই ৮ লেগ বাই ৬ নো বল ২)	১৬
মোট—	৬৭৪

উইকেট-পতন : ২০ (মরিস), ২৩৬ (বার্নস), ৩৬১ (ব্র্যাডম্যান), ৫০৩ (মিলার), ৫২৩ (হার্ভে), ৫৭৬ (ম্যাককুল), ৬৩৪ (জনসন), ৬৪০ (লিণ্ডওয়াল), ৬৪১ (ট্যালন), ৬৭৪ (টসাক)।

বোলিং : ফাদকার ১৫-০-৭৪-২। অমরনাথ ৯-০-৪২-০। রঙ্গচারী ৪১-৫-১৪১-৪। মানকড় ৪২-৮-১৭০-২। সারভাতে ৩২-১-১২১-০। হাজারে ২১.৩-১-১১০-১

ভারত : প্রথম ইনিংস

বিনু মানকড় ব ম্যাককুল
সি. টি. সারভাতে ব মিলার
পি. সেন ব মিলার
লালা অমরনাথ ক ব্র্যাডম্যান ব জনসন
বিজয় হাজারে এল. বি. ডব্লু ব জনসন
গুল মহম্মদ স্ট্যা ট্যালন ব জনসন
দাত্তু ফাদকার এল. বি. ডব্লু ব টোসাক
জি. কিষেনচাঁদ ব লিণ্ডওয়াল
হেমু অধিকারী রান আউট

রঙ্গনেকার স্ট্যা ট্যালন ব জনসন	৮
রঙ্গচারী নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ১১ লেগ বাই ৮ নো বল ৩	২২
মোট	৩৮১

উইকেট-পতন : ৬ (সারভাতে), ৬ (প্রবীর সেন), ৬৯ (অমরনাথ), ১২৪ মানকড়), ১৩৩ (গুল মহম্মদ), ৩২১ (হাজারে), ৩৫৩ (কিষেনচাঁদ), ৩৫৯ অধিকারী), ৩৭৫ (ফাদকার), ৩৮১ (রঙ্গনেকার)।

বোলিং : লিণ্ডওয়াল ২১-৬-৬১-১। মিলার ৯-১-৩৯-২। ম্যাক্‌কুল ২৮-২-১০২-: জনসন ২৩'১-৫-৬৪-৪। টোসক ১৮-২-৬৬-১। বার্নস ৯-০-২৩-০। ব্র্যাডম্যান -০-৪-০

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

বিনু মানকড় ক ট্যালন ব লিণ্ডওয়াল	০
সি. টি সারভাতে ব টোসক	১১
লালা অমরনাথ ব লিণ্ডওয়াল	০
বিজয় হাজারে ব লিণ্ডওয়াল	১৪৫
গুল মহম্মদ ব বার্নস	৩৪
ফাদকার এল. বি. ডব্লু ব লিণ্ডওয়াল	১৪
জি. কিষনচাঁদ ব লিণ্ডওয়াল	০
হেমু অধিকারী এল. বি. ডব্লু ব মিলার	৫১
রঙ্গনেকার ব লিণ্ডওয়াল	০
রঙ্গচারী ক ম্যাক্‌কুল ব লিণ্ডওয়াল	০
পি. সেন নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ১৮ লেগ বাই ৩ নো বল ১)	২২
মোট	২৭৭

উইকেট-পতন : ০ (মানকড়), ০ (অমরনাথ), ৩৩ (সারভাতে), ৯৯ (গুল

হম্মদ ১৩৯ (ফাদকার), ১৩৯ (কিষেনচাঁদ), ২৭১ (অধিকারী), ২৭৩ (রঙ্গনেকার), ২৭৩ (রঙ্গচারী), ২৭৭ (হাজারে)।

বোলিং : লিণ্ডওয়াল ১৬'৫-৪-৩৮-৭। মিলার ৯-৩-১৩-১। ম্যাক্‌কুল ৪-০-২৬-০। জনসন ২০-৪-৫৪-০। টোসাক ২৫-৮-৭৩-১। বার্নস ১৮-৪-৫১-১।

ফলাফল : অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ১৬ রানে জয়ী।

পঞ্চম টেস্ট । মেলবোর্ন । ফেব্রুয়ারি ৬, ৭, ৯, ১০, ১৯৪৮

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস

বার্নস রান আউট	৩৩
ব্রাউন রান আউট	৯৯
ডন ব্র্যাডম্যান আহত ও অবসৃত	৫৭
কীথ মিলার ক সেন ব ফাদকার	১৪
নীল হার্ভে ক সেন ব মানকড়	১৫৩
ল্যাক্সটন ক সেন ব অমরনাথ	৮০
রে লিণ্ডওয়াল ক ফাদকার ব মানকড়	৩৫
ট্যালন ক সেন ব সারভাতে	৩৭
জনসন নট আউট	২৫
রিং ক কিষেনচাঁদ ব হাজারে	১১
জনস্টন নট আউট	২৩
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগ বাই ৪)	৮
আট উইকেটে .ডিক্লেয়ার্ড	৫৭৫

উইকেট-পতন : ৪৮ (বার্নস), ১৮২ (ব্রাউন), ২১৯ (মিলার), ৩৭৮ (লক্সটন), ৪৫৭ (লিণ্ডওয়াল), ৪৯৭ (হার্ভে), ৫২৭ (ট্যালন), ৫৫৪ (রিং)।

বোলিং : ফাদকার ৯-০-৫৮-১। অমরনাথ ২৩-১-৭৯-১। রঙ্গচারী ১৭-১-৯৭-০। হাজারে ১৪-১-৬৩-১। মানকড় ৩৩-২-১০৭-২। সারভাতে ১৮-১-৮২২। নাইডু ১৩-০-৭৭-০। অধিকারী ১-০-৪-০।

ভারত : প্রথম ইনিংস

বিনু মানকড় ক ট্যালন ব ল্যাক্সটন	১১১
সি. টি. সারভাতে ব লিণ্ডওয়াল	০
হেমু অধিকারী ক ট্যালন ব ল্যাক্সটন	৩৮
বিজয় হাজারে এল. বি. ডব্লু ব লিণ্ডওয়াল	৭৪
লালা অমরনাথ ক বার্নস ব রিং	১২
দাত্তু ফাদকার নট আউট	৫৬
গুল মহম্মদ ক লিণ্ডওয়াল ব জনসন	১
জি. কিষেনচাঁদ ব রিং	১৪
সি. এস. নাইডু ক ব্র্যাডম্যান ব রিং	২
পি. সেন ব জনসন	১৩
রঙ্গচারী ব জনসন	
অতিরিক্ত (বাই ৬ লেগ বাই ২ নো বল ২)	
মোট	৩৩১

উইকেট-পতন : ৩ (সারভাতে), ১২৭ (অধিকারী), ২০৬ (মানকড়), ২৩১ (অমরনাথ), ২৫৭ (হাজারে), ২৬০ (গুল মহম্মদ), ২৮৪ (কিষেনচাঁদ) ২৮৬ (নাইডু), ৩৩১ (প্রবীর সেন), ৩৩১ (রঙ্গচারী)।

বোলিং : লিণ্ডওয়াল ২৫-৫-৬৬-২। জনসন ৩০-৮-৬৬-৩। ল্যাক্সটন ১৯-৬১-১-২। জনস্টন ৮-৪-১৪-০। রিং ৩৬-৮-১০৩-৩। মিলার ৩-০-১০-০। বার্নস ২-১-১-০।

ভারত : দ্বিতীয় ইনিংস

বিনু মানকড় ক ট্যালন ব লিণ্ডওয়াল	
সি. টি. সারভাতে এল. বি. ডব্লু ব জনসন	১০
হেমু অধিকারী ক ব্র্যাডম্যান ব লক্সটন	১৭
বিজয় হাজারে ক ও ব জনসন	১০

লালা অমরনাথ ক জনসন ব রিং

দাত্তু ফাদকার এল. বি. ডব্লু ব জনস্টন

গুল মহম্মদ ক বার্নস ব রিং

জি. কিষেনচাঁদ ক বার্নস ব জনসন

সি. এস. নাইডু ক ব্রাউন ব রিং

পি. সেন ব জনস্টন

রঙ্গচারী নট আউট

অতিরিক্ত (বাই ৬ লেগ বাই ১ নো বল ১)

মোট ৬৭

উইকেট-পতন : ০ (মানকড), ২২ (সারভাতে), ২৮ (অধিকারী), ৩৫ (ফাদকার), ৫১ (অমরনাথ), ৫১ (হাজারে), ৫৬ (কিষেনচাঁদ), ৫৬ (নাইডু), ৬৬ (গুল মহম্মদ) ৬৭ (প্রবীর সেন)।

বোলিং : লিণ্ডওয়াল ৩-০-৯-১। জনসন ৫.২-২-৮-৩। ল্যাক্সটন ৪-১-১০-১। জনস্টন ৭---১৫-২। রিং ৫-১-১৭-৩।

ফল : অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ১৭৭ রানে বিজয়ী

১৯৪৮-৪৯ : ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

অস্ট্রেলিয়ার মাঠে পর্যুদস্ত হয়ে ভারত ফিরল, তারপরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এলো ভারত সফরে। ভারতীয় দলের সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই প্রথম মুখোমুখি দেখা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে কালো-সাদা দু-তরফের মানুষই ক্রিকেটের অংশীদার এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমায় ছড়ানো এই দেশ একমাত্র ক্রিকেটের সূত্রে ঐক্যবন্ধনে বাঁধা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সে বছরে স্বদেশে ইংলণ্ডকে বিপুলভাবে পরাজিত করে তবু ভারতে পাঁচটি টেষ্টের মধ্যে একটি মাত্র টেস্টে জয়লাভ করেছিল। নেহাৎ দৈবদুর্বিপাক না ঘটলে ভারতের পক্ষে ঐ সিরিজের শেষ ম্যাচে প্রথম টেস্ট জয়ের গৌরব অর্জন করা অসম্ভব ছিল না। শেষ দিনে নানা কারণে আধঘণ্টা মত খেলা স্থগিত রাখতে হয়েছিল। তাছাড়া দু'মিনিট বাকী থাকতেই এবং ওভার শেষ না হলেও খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করেন আম্পায়ার,

যখন জয়লাভের জন্যে ভারতের প্রয়োজন ছিল মাত্র ছয় রান এবং হাতে ছিল ৬টি উইকেট। এই সিরিজে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন লালা অমরনাথ। সিরিজের শেষ ম্যাচে দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত খেলোয়াড় শুঁটে ব্যানার্জি প্রথম ও শেষবারের মত টেস্ট খেলার সুযোগ পান।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ছিলেন জন গডার্ড। পাঁচটি ম্যাচের একটিতে জয় লাভের সূত্রে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রাবার জিতে নেয়।

প্রথম টেস্ট। নিউ দিল্লি। ১০-১৪ নভেম্বর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

এ. এফ. রে ক সেন ব রঙ্গচারী	৮
জে. বি. স্টোলমেয়ার এল. বি. ডবলিউ ব রঙ্গচারী	১৩
জি. এ. হেডলি ব রঙ্গচারী	২
সি. এল. ওয়ালকট রান আউট	১৫২
জি. ই. গোমেজ স্টাম্পড সেন ব অমরনাথ	১০১
জে. ডি. গডার্ড ব মানকড়	৪৪
ই. ডি. উইকস ক হাজারে ব মানকড়	১২৮
আর. জে. খ্রীষ্টিয়ানি ক হাজারে ব রঙ্গচারী	১০৭
এফ. জে. ক্যামেরন এল. বি. ডবলিউ ব সারভাতে	২
ডি. অ্যাটকিনসন স্টাম্পড সেন ব রঙ্গচারী	৪৫
পি. জোনস নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ২০ লেগ বাই ৮)	২৮
মোট	৬৩১

উইকেট-পতন : ১৫ (রে), ২২ (স্টোলমেয়ার), ২৭ (হেডলি), ২৯৪ (ওয়ালকট), ৩০২ (গোমেজ) ৪০৩ (গডার্ড), ৫২১ (উইকস), ৫২৪ (ক্যামেরন), ৬৩০ (অ্যাটকিনসন), ৬৩১ (খ্রীষ্টিয়ানি)।

বোলিং : ফাদকার ১৮-১-৬১-০ ; অমরনাথ ২৫-৩-৭৩-১ ; রঙ্গচারী ২৯-৪-৪-১০৭-৫ ; মানকড় ৫৯-১০-১৭৬-২ , তারাপুর ১৯-৩-৭১-০ ; হাজারে ১৭-১-৬২-০ ; সারভাতে ১৬-০-৫২-১ ।

ভারত: প্রথম ইনিংস

ভি. মানকড় এল. বি. ডবলিউ ব জোনস	৫
কে. সি. ইব্রাহিম এল. বি. ডবলিউ ব গোমেজ	৫
আর. এস. মোদি ক রে ব ক্যামেরন	৬৩
এল. অমরনাথ ক খ্রীষ্টিয়ানি ব জোনস	৬২
ভি. এস. হাজারে ক অ্যাটকিনসন ব গোমেজ	১৮
ডি. জি. ফাদকার ক উইকস ব স্টোলমেয়ার	৪১
এইচ. আর. অধিকারী নট আউট	১১৪
সি. টি. সারভাতে স্টাম্পড ওয়ালকট ব স্টোলমেয়ার	৪১
পি. সেন ক ওয়ালকট ব ক্যামেরন	২২
সি. আর. রঙ্গচারী ক ও ব গডার্ড	০
কে. তারাপুরে ক ওয়ালকট ব জোনস	৯
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগ বাই ৩ নো বল ১)	৫
মোট	৪৫৪

দ্বিতীয় ইনিংস

ভি. মানকড় ব গডার্ড	১৭
কে. সি. ইব্রাহিম রান আউট	৪৪
আর. এস. মোদি ব খ্রীষ্টিয়ানি	৩৬
এল. অমরনাথ ব ক্যামেরন	৩৬
ভি. এস হাজারে ব খ্রীষ্টিয়ানি	৭
ডি. জি. ফাদকার ক এবং ব খ্রীষ্টিয়ানি	৫
এইচ. আর. অধিকারী নট আউট	২৯
সি. টি. সারভাতে নট আউট	৩৫
অতিরিক্ত (বাই ৮ লেগ বাই ৩)	১১
মোট (৬ উইকেট)	২২০

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস : ৮ (মানকড়), ১২৯ (মোদি), ১৮১ (ইব্রাহিম), ২২৩ (অমরনাথ), ২৪৯ (হাজারে), ৩০৯ (ফাদকার), ৩৮৮ (সারভাতে), ৪১৯ (সেন), ৪৩৮ (ব্রহ্মচারী), ৪৫৪ (তারাপোর)।

দ্বিতীয় ইনিংস : ৪৪ (মানকড়), ১০২ (ইব্রাহিম), ১১১ (মোদি), ১২১ (হাজারে), ১৪২ (ফাদকার), ১৬২ (অমরনাথ)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস জোনস ২৮.৪-৫-৯০-৩ ; গোমেজ ৩৯-৩৪-৭৫-২ , অ্যাটকিনসন ১৩-৩-২৭-০ , হেডলি ২-০-১৩-০ ; ক্যামেরন ২৭-৩-৭৪-২ ; স্টোলমেয়ার ১৫-০-৮০-২ ; গডার্ড ১৩-৭ ৮৩-১ ; খ্রীষ্টিয়ানি ৪-০-৬-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস জোনস ১০-২-৩২-০ ; গোমেজ ১০-০-১৭-০ ; অ্যাটকিনসন ৫-০-১১-০ ; হেডলি ১-০-৫-০ , ক্যামেরন ২৭-১০-৪৯-১ ; স্টোলমেয়ার ১০-০-২৩-০ ; গডার্ড ১৫-৭-১৮-১ , খ্রীষ্টিয়ানি ২৩-০-৫২-৩ ; উইকস ১-০-২-০ ।

অধিনায়ক : ভারত—এল. অমরনাথ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—জে. ডি. গডার্ড

খেলা অমীমাংসিত

দ্বিতীয় টেস্ট। বোম্বাই। ৯-১৩ ডিসেম্বর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস

এ. এফ. রে ক এবং ব ফাদকার	১০৪
জে. বি. স্টোলমেয়ার ব মানকড়	৬৬
সি. এল. ওয়ালকট রান আউট	৬৮
ই. ডি. উইকস ক সেন ব মানকড়	১৯৪
জি. ই. গোমেজ ক সেন ব হাজারে	৭
আর. জে. খ্রীষ্টিয়ানি এল বি ডব্লিউ ব মানকড়	০৪
এফ. জে. ক্যামেরন নট আউট	৭৫
ডি. অ্যাটকিনসন নট আউট	২৩
অতিরিক্ত (বাই ৯ লেগবাই ৫ নো বল ৪)	১৮
মোট (৬ উইকেটে)	৬২৯

জে. ডি. গডার্ড, পি. জোনস, এবং ডবলিউ ফারগুসন ব্যাট করেন নি।

উইকেট-পতন: ১৩৪ (স্টোলমেয়ার), ২০৬ (রে), ২৯৫ (ওয়ালকট), ৩১১ (গোমেজ) ৪৮১ (খ্রীষ্টিয়ানি) ৫৭৪ (উইকস)।

বোলিং: ফাদকার ১৬-৫-৩৫-১; রঙ্গচারী ৩৪-১-১৪৮-০; হাজারে ৪২-১২-৭৪-১, উমরিগড় ১৫-২-৫১-০; মানকড় ৭৬-১৬-২০২-৩; সিন্ধে ১৬-০-৬৮-০; অমরনাথ ৮-১-৩৩-০।

ভারত

ভি. মানকড় রান আউট	২১
কে. সি. ইব্রাহিম রান আউট	৯
আর. এস. মোদি ক অ্যাটকিনসন ব ফারগুসন	১
ভি. এস. হাজারে এল বি ডবলিউ ব অ্যাটকিনসন	২৬
এইচ. আর. অধিকারী এল বি ডবলিউ ব ফারগুসন	৩৪
ডি. জি. ফাদকার ক জোনস ব গোমেজ	২৪
এল. অমরনাথ ক এবং ব ফারগুসন	২৭
পি. আর. উমরিগড় ক গডার্ড ব ফারগুসন	৩০
পি. সেন এল বি ডবলিউ ব গডার্ড	১৯
এস. জি. সিন্ধে স্টাম্পড ওয়ালকট ব গোমেজ	১৩
সি. আর. রঙ্গচারী নট আউট	৮
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগবাই ৫ নো ৮)	১৪
মোট	২৭৩

দ্বিতীয় ইনিংস

ভি. মানকড ক ফারগুসন ব গোমেজ	১৬
কে. সি. ইব্রাহিম ক গুডার্ড ব জোনস	০
আর. এস. মোদি ক গোমেজ ব ফারগুসন	১১২
ভি. এস হাজারে নট আউট	১৩৪
এল. অমরনাথ নট আউট	৫৮
অতিরিক্ত (বাই ১১ লেগবাই ১ নো বল ১)	১৩
মোট (৩ উইকেট)	৩৩৩

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ২৭ (মানকড়) ২৮ (মোদি), ৩২ (ইব্রাহিম), ৮২ (অধিকারী), ১১৬ (হাজারে), ১৫০ (অমরনাথ), ২২৯ (উমরিগড়), ২৩৩ (ফাদকার), ২৬১ (সিন্ধে), ২৭৩ (সেন)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১ (ইব্রাহিম) ৩৩ (মানকড়), ১৮৯ (মোদি)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস জোনস ২১-৭-৩৪-০ ; গোমেজ ২৪-৯-৩২-২ ; অ্যাটকিনসন ১৫-৫-২১-১ ; ফারগুসন ৫৭-৮-১২৬-৬ ; গডার্ড ১২.২-৭-১৯-১ ; ক্যামেরন ১০-৩-৯-০ ; স্টোলমেয়ার ৪-০-১৮-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস জোনস ১২-২-৫২-১ ; গোমেজ ২৮-১২-৩৭-১ ; অ্যাটকিনসন ১৩-৪-২৬-০ , ফারগুসন ৩৯-১৪-১০৫-১ ; গডার্ড ৩-১-৬-০ ; ক্যামেরন ২৭-৯-৫২-০ ; স্টোলমেয়ার ৪-০-১২-০ ; খ্রীষ্টিয়ানি ৬-০-৩০-০ ।

অধিনায়ক : ভারত—এল. অমরনাথ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—জে. ডি. গডার্ড

খেলা অমীমাংসিত

তৃতীয় টেস্ট। কলকাতা। ৩১ ডিসেম্বর, ১-৪ জানুয়ারি

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস

এ. এফ. রে এল বি ডবলিউ ব ব্যানার্জি	১৫
ডি. অ্যাটকিনসন ব ব্যানার্জি	০
সি. এল. ওয়ালকট ক ব্যানার্জি ব আহমেদ	৫৪
ই. ডি. উইকস ক এবং ব গোলাম আহমেদ	১৬২
জি. ই. গোমেজ ব মানকড়	২৬
জি. এ. ক্যারি এল বি ডবলিউ ব মানকড়	১১
জে. ডি. গডার্ড নট আউট	৩৯
আর. জে. খ্রীষ্টিয়ানি ক এবং ব ব্যানার্জি	২৩
এফ. ক্যামেরন ক মুস্তাক আলি ব ব্যানার্জি	২৩
ডবলিউ ফারগুসন ব গোলাম আহমেদ	২
পি. জোনস ব গোলাম আহমেদ	৬
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগ বাই ৪)	৫
মোট	৩৬৬

দ্বিতীয় ইনিংস

এ. এফ. রে রান আউট	৩৪
জি. এ. ক্যারি ব ব্যানার্জি	৯
ডবলিউ ফারগুসন এল বি ডবলিউ ব মানকড়	৬
ই. ডি. উইকস ক এবং ব আহমেদ	১০১
জে. ডি. গডার্ড ক ব্যানার্জি ব অমরনাথ	৯
জি. ই. গোমেজ ব আহমেদ	২৯
সি. এল. ওয়ালকট ক অমরনাথ ব মানকড়	১০৮
আর. জে. খ্রীষ্টিয়ানি ব অমরনাথ	২১
এফ. ক্যামেরন ক এবং ব মানকড়	২
ডি. অ্যাটকিনসন নট আউট	৫
অতিরিক্ত (বাই ৬ লেগ বাই ১ ওয়াইড নো বল ৩)	১১
মোট (৯ উইকেট)	৩৩৬

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস : ১ (অ্যাটকিনসন), ২৪ (রে), ১০৯ (ওয়ালকট), ১৮৮ (গোমেজ), ২৩৮ (ক্যারি), ২৮৪ (ক্রীষ্টিয়ানি), ৩০৯ (উইকস), ৩৪০ (ক্যামেরন), ৩৪২ (ফারগুসন), ৩৬৬ (জোনস) ।

দ্বিতীয় ইনিংস : ১৩ (ক্যারি), ৩২ (ফারগুসন), ১০৪ (রে), ১৩০ (গডার্ড), ১৮১ (গোমেজ), ২৪৪ (উইকস), ৩০৪ (ক্রীষ্টিয়ানি), ৩১১ (ক্যামেরন), ৩৬৬ (ওয়ালকট) ।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ব্যানার্জি ৩০-৩-১২০-৪ ; অমরনাথ ২০-৬-৩৪-০ , হাজারে ৫-০-৩৩-০ ; গুলাম আহমেদ ৩৫·২-৫-৯৪-৪ ; মানকড় ২৩-৫-৭৪-২ ; সারভাতে ২-০-৬-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ব্যানার্জি ২১-০-৬১-১ ; অমরনাথ ২৩-৪-৭৫-২ , হাজারে ১৩ ৩ ৩৩-০ ; গুলাম আহমেদ ২৫-০-৮৭-২ ; মানকড় ২৪·৩-৬-৭৮-৩ ; সারভাতে ১ - ১-০ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

মুস্তাক আলি ক রে ব গডার্ড	৫৪
কে. সি. ইব্রাহিম ব গোমেজ	১
আর. এস. মোদি ব জোনস	৮০

ভি. এস. হাজারে ব গোমেজ	৫৯
এল. অমরনাথ ক খ্রীষ্টিয়ানি ব গোমেজ	৩
ভি. মানকড় ক ফারগুসন ব গডার্ড	২৯
এইচ. আর. অধিকারী নট আউট	৩১
সি. টি. সারভাতে ব গডার্ড	●
পি. সেন এল. বি. ডবলিউ ব ফারগুসন	১
গুলাম আহমেদ স্টাম্পড খ্রীষ্টিয়ানি ব ফারগুসন	●
সুধাংশু ব্যানার্জি স্টাম্পড খ্রীষ্টিয়ানি ব ফারগুসন	০
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগবাই ৬ নো বল ৩)	১৪
মোট	২৭২

দ্বিতীয় ইনিংস

মুস্তাক আলি এল. বি. ডবলিউ ব অ্যাটকিনসন	১০৬
কে. সি. ইব্রাহিম ক অ্যাটকিনসন ব গোমেজ	২৫
আর. এস. মোদি ক খ্রীষ্টিয়ানি ব গডার্ড	৮৭
ভি. এস. হাজারে নট আউট	৫৮
এল. অমরনাথ নট আউট	৩৪
অতিরিক্ত (বাই ১২ নো বল ৩)	১৫
মোট (৩ উইকেট)	৩২৫

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস : ১২ (ইব্রাহিম), ৭৭ (মুস্তাক আলি), ২০৬ (মোদি), ২০৬ (হাজারে), ২১০ (অমরনাথ), ২৬৭ (মানকড়), ২৬৭ (সারভাতে), ২৬৮ (সেন), ২৬৯ (গোলাম আমেদ), ২৭২ (মন্টু ব্যানার্জি)।

দ্বিতীয় ইনিংস : ৮৪ (ইব্রাহিম), ১৫৪ (মুস্তাক আলি), ২৬২ (মোদি)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস জোনস ১৭-৩-৪৮-১ ; গোমেজ ৩২-১০-৬৫-৩ ; ফারগুসন ২৯-৮-৬৬-৩ ; গডার্ড ১৩-৩-৩৪-৩ ; ক্যামেরন ৭-২-১২-০ ; অ্যাটকিনসন ৯-০-২৭-০ ; খ্রীষ্টিয়ানি ২-০-৬-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস জোনস ২২-৫-৪৯-০ ; গোমেজ ২৯-১০-৪৭-১ ; ফারগুসন ৯-০-৩৭-০ ; গডার্ড ২৩-১১-৪১-১ ; ক্যামেরন ৩০-৭-৬৭-০ ; অ্যাটকিনসন ১৪-৩-২২-১ ; খ্রীষ্টিয়ানি ৩-০-১২-০ ; ক্যারি ৩-২-২-০ ; ওয়ালকট ৩-০-১২-০ ; উইকস ১-০-৩-০ ।

অধিনায়ক : ভারত—এল. অমরনাথ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—জে. ডি. গডার্ড

খেলা অমীমাংসিত

চতুর্থ টেস্ট। মাদ্রাজ। ২৭-২৯, ৩১ জানুয়ারি ও ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস

এ. এফ. রে ক রেগ ব ফাদকার	১০৯
জে. বি. স্টোলমেয়ার ক সেন ব চৌধুরী	১৬০
সি. এল. ওয়ালকট এল. বি. ডবলিউ ব ফাদকার	৪৩
ই. ডি. উইকস রান আউট	৯০
আর. জে. খ্রীষ্টিয়ানি ক মোদি ব ফাদকার	১৮
জে. ডি. গডার্ড ক সেন ব ফাদকার	২৮
জি. ই. গোমেজ ক মানকড় ব ফাদকার	৫
এফ. জে. ক্যামেরন ক হাজারে ব ফাদকার	৪৮
পি. জোনস ক আহমেদ ব মানকড়	১০
জে. ট্রিম ক সেন ব ফাদকার	৯
ডবলিউ. ফারগুসন নট আউট	২
অতিরিক্ত (বাই ১০ লেগ বাই ৭ নো বল ২)	১৯
মোট	৫৮২

উইকেট-পতন : ২৩৯ (রে), ৩১৯ (ওয়ালকট), ৩১৯ (স্টোলমেয়ার), ৩৩৯ (খ্রীষ্টিয়ানি), ৪২০ (গডার্ড), ৪৭২ (উইকস), ৫৩২ (গোমেজ), ৫৫১ (জোনস), ৫৬৫ (ট্রিম), ৫৮২ (ক্যামেরন)।

বোলিং : ফাদকার ৪৫.৩-১০-১৫৯-৭ ; হাজারে ১২-১-৪৪-০ ; অমরনাথ-১৬-৪-৩৯-০ ; এন. চৌধুরী ৩৭-৬-১৩০-১ ; মানকড় ৩৩-৪-৯৩-১ ; গুলাম আহমেদ ৩২-৩-৮৮-০ ; অধিকারী ১-০-১০-০ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

মুস্তাক আলি এল. বি. ডবলিউ ব ট্রিম	৩২
এম. আর. রেগ ব জে	১৫
আর. এস. মোদি ব ফারগুসন	৫৬
ভি. এস. হাজারে ক গডার্ড ব ফারগুসন	২৭
এল. অমরনাথ হিট উইকেট ব ট্রিম	১৩
এইচ. আর অধিকারী ক স্টোলমেয়ার ব জোনস	৩২
ডি. জি. ফাদকার ক জোনস ব গডার্ড	৪৮
ভি. মানকড় ব ট্রিম	১
পি. সেন ক স্টোলমেয়ার ব গোমেজ	২
গুলাম আহমেদ ব ট্রিম	৫
এন. চৌধুরী নট আউট	৩
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগ বাই ১ নো বল ৫)	১১
মোট	২৪৫

দ্বিতীয় ইনিংস

মুস্তাক আলি ক ওয়ালকট ব জোনস	১৪
এম. আর. রেগ ক ওয়ালকট ব জোনস	০
আর. এস. মোদি ব গোমেজ	৬
ভি. এস. হাজারে ক স্টোলমেয়ার ব ট্রিম	৫২
এল. অমরনাথ ব জোনস	৬
এইচ. আর. অধিকারী ক ওয়ালকট ব জোনস	১
ডি. জি. ফাদকার ক রে ব ট্রিম	১০
ভি. মানকড় ব ট্রিম	২১
পি. সেন নট আউট	১৯
গোলাম আহমেদ ব গোমেজ	১১
এন. চৌধুরী ক রে ব গোমেজ	০
অতিরিক্ত (বাই ২ নো বল ২)	৪
মোট	১৪৪

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ৪১ (রেগে), ৫২ (মুস্তাক আলি), ১১৬ (হাজারে), ১৩৬ (অমরনাথ), ১৫৮ (মোদি), ২২০ (অধিকারী), ২২৫ (মানকড়), ২২৮ (সেন), ২৩৩ (গোলাম আমেদ), ২৪৫ (ফাদকার)।

দ্বিতীয় ইনিংস ০(রেগে), ৭ (মোদি), ২৯ (মুস্তাক আলি), ৪২ (অমরনাথ), ৪৪ (অধিকারী), ৬১ (ফাদকার), ১০৬ (মানকড়), ১১৯ (হাজারে), ১৩২ (গোলাম আমেদ), ১৪৪ (চৌধুরী)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস জোনস ১৬-৫-২৮-২ ; গোমেজ ২৮-১০-৬০-১, ট্রিম ২৭-৭-৪৮-৪ ; ফারগুসন ২০-২-৭২-২ ; গডার্ড ৮-১-২৬-১।

দ্বিতীয় ইনিংস জোনস ১০-৩-৩০-৪ ; গোমেজ ২০-৩-১২-৩৫-৩ ; ট্রিম ১৬-৫-২৮-৩ ফারগুসন ১১-১-৩৯-০ ; গডার্ড ৬-৩-৭-০।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ১৯৩ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—এল. অমরনাথ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—জে. ডি. গডার্ড

পঞ্চম টেস্ট। বোম্বাই। ৪-৮ ফেব্রুয়ারি

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস

এ. এফ. রে ক মুস্তাক আলি ব ফাদকার	৭
জে. বি. স্টোলমেয়ার ক মানকড় ব আহমেদ	৮৫
সি. এল. ওয়ালকট ব ফাদকার	১১
ই. ডি. উইকস ক মানকড় ব আহমেদ	৫৬
জি. ই. গোমেজ ক মোদি ব মানকড়	১৯
আর. জে. ক্রীষ্টিয়ানি ব ব্যানার্জি	৪০
জে. ডি. গডার্ড ক অমরনাথ ব মানকড়	৪১
এফ. জে. ক্যামেরন ক অমরনাথ ব ফাদকার	০
ডি. অ্যাটকিনসন ক অমরনাথ ব মানকড়	০

পি. জোনস এল. বি. ডবলিউ ব ফাদকার ৩
জে. ট্রিম নট আউট ০
অতিরিক্ত (বাই ১০ লেগ বাই ৫ নো বল ৩) ১৮

মোট ২৮৬

দ্বিতীয় ইনিংস

এ. এফ. রে ক মানকড় ব ফাদকার	২৭
জে. বি. স্টোলমেয়ার ব মানকড়	১৮
সি. এল. ওয়ালকট ব ফাদকার	১৬
ই. ডি. উইকস ব হাজারে	৪৮
ডি. অ্যাটকিনসন ক অমরনাথ ব ব্যানার্জি	০
আর. জে. খ্রীষ্টিয়ানি এল. বি. ডবলিউ ব মানকড়	১০
জি. ই. গোমেজ ক এবং ব মানকড়	২৪
জে. ডি. গডার্ড নট আউট	৩৩
এফ. জে. ক্যামেরন এল. বি. ডবলিউ ব ব্যানার্জি	৯
পি. জোনস ক অমরনাথ ব ব্যানার্জি	১
জে. ট্রিম এল. বি. ডবলিউ ব ব্যানার্জি	১২
অতিরিক্ত (বাই ৪ নো বল ৩)	৭
মোট	২৬৭

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ১১ (রে) ২৭ (ওয়ালকট) ১৩৭ (উইকস) ১৭৬ (স্টোলমেয়ার) ১৯০ (গোমেজ) ২৪৮ (ক্রীস্টিয়ানি) ২৫৩ (ক্যামেরন) ২৮১ (অ্যাটকিনসন) ২৮৪ (গডার্ড) ২৮৬ (জোনস)।

দ্বিতীয় ইনিংস : ৪৭ (স্টোলমেয়ার) ৬৮ (ওয়ালকট) ১৪৮ (উইকস) ১৫২ (অ্যাটকিনসন) ১৬৬ (ক্রীস্টিয়ানি) ১৯২ (গোমেজ) ২২৮ (রে) ২৩০ (ক্যামেরন) ২৪০ (জোনস) ২৬৭ (ট্রিম)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস শুটে ব্যানার্জি ২১-২-৭৩-১ ; ফাদকার ২৯.২-৮-৭৪-৪ ; অমরনাথ ৪-২-৯-০ ; গুলাম আহমেদ ২৩-৪-৫৮-২ ; মানকড় ২৬-৪-৫৪-৩ ; হাজারে ১-১-০-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস শুটে ব্যানার্জি ২৪·৩-৬-৫৪-৪ ; ফাদকার ৩১-৭-৮২-২ ; গুলাম আহমেদ ১৪-৩-৩৪-০ ; মানকড় ৩২-৮-৭৭-৩ ; হাজারে ৬-১-১৩-১।

ভারত : প্রথম ইনিংস

মুস্তাক আলি ক অ্যাটকিনসন ব গোমেজ	২৮
কে. সি. ইব্রাহিম ক অ্যাটকিনসন ব গোমেজ	৪
আর. এস. মোদি ক ট্রিম ব অ্যাটকিনসন	৩৩
ভি. এস. হাজারে ক খ্রীষ্টিয়ানি ব অ্যাটকিনসন	৪০
এইচ. আর. অধিকারী ক ওয়ালকট ব ট্রিম	৫
ডি. জি. ফাদকার ব ট্রিম	২৫
এল. অমরনাথ ব ট্রিম	১৯
ভি. মানকড় রান আউট	১৯
শুটে ব্যানার্জি ব জোনস	৫
গোলাম আহমেদ নট আউট	৬
পি. সেন আহত	০
অতিরিক্ত (বাই ৬ লেগ বাই ১ নোবল ২)	৯
মোট	১৯৩

দ্বিতীয় ইনিংস

মুস্তাক আলি ক ওয়ালকট ব জোনস	৬
কে. সি. ইব্রাহিম ব গোমেজ	১
আর. এস. মোদি ক ওয়ালকট ক গডার্ড	৮৬
এল. অমরনাথ ব অ্যাটকিনসন	৩৯
ভি. এস. হাজারে ব জোনস	১২২
ভি. মানকড় ক ওয়ালকট ব জোনস	১৪
ডি. জি. ফাদকার নট আউট	৩৭

এইচ. আর. অধিকারী ক ট্রিম ব জোনস ৮

গুটে ব্যানার্জি ব জোনস ৮

গোলাম আহমেদ নট আউট ৯

অতিরিক্ত বাই ১৩ লেগ ১ নো বল ১১ ২৫

মোট (৮ উইকেট) . ৩৫৫

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ১০ (ইব্রাহিম) ৩৭ (মুস্তাক আলি) ১০৯ (মোদি) ১১২ (হাজারে) ১২২ (অধিকারী) ১৪৬ (অমরনাথ) ১৮০ (মানকড়) ১৮১ (ফাদকার) ১৯৩ (গুটে ব্যানার্জি) ।

দ্বিতীয় ইনিংস ২ (ইব্রাহিম) ৯ মুস্তাক আলি) ৮১ (অমরনাথ) ২২০ (মোদি) ২৭৫ (মানকড়) ২৮৫ (হাজারে) ৩০৩ (অধিকারী) ৩২১ (গুটে ব্যানার্জি) ।

বোলিং : প্রথম ইনিংস জোনস ১৪'৪-৪-৩১-১ ; গোমেজ ২১-৮-৩০-২ ; ট্রিম ৩০-৩-৬৯-৩; অ্যাটকিনসন ২৩-২-৫৪-২ ।

দ্বিতীয় ইনিংস জোনস ৪১-৮-৮৫-৫ ; গোমেজ ২৬-৫-৫৫-১ ; ট্রিম ৭-০-৪৩-০ ; অ্যাটকিনসন ৩-০-১৬-১ ; ক্যামেরন ৮-০-১৫-০ ; গডার্ড ২৭-১-১১১-১ ।

অধিনায়ক : ভারত—এল. অমরনাথ
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—জে. ডি. গডার্ড

১৯৫১-৫২—ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড

১৯৫১-৫২ সালের সিরিজ নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রায় কুড়ি বছর পর ইংল্যাণ্ড ভারতে এল সরকারী টেস্ট সহ অন্যান্য খেলার জন্য। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক হলেন নাইজেল হাওয়ার্ড (সম্প্রতি লোকান্তরিত) এবং ভারতের অধিনায়ক হলেন বিজয় হাজারে। নাইজেল হাওয়ার্ডের অধিনায়ক মনোনীত হওয়া নিয়ে ক্রীড়ামোদীদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছিল। কেননা তিনি তখন এমন কিছু নামী খেলোয়াড় ছিলেন না। ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়বৃন্দ লেন হাটন, ডেনিস কম্পটন, সিম্পসন, ইভান্স, বেডসার সফরে আসেন নি, এজন্য ইংল্যাণ্ডের এ দলটিকে অনেকেই প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দিতে চান নি। কিন্তু এ দলটিই একটি টেস্টসহ ছয়টি খেলায় জিতেছিল, একটি টেস্টসহ সাতটি খেলায় হেরেছিল, দশটি খেলা ড্র হয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ওয়াটকিন্স টেস্ট খেলায় সবচাইতে বেশি রান করেছিলেন [মোট রানসংখ্যা ৪৫১, গড় ৬৪·৪২]। বোলারদের মধ্যে হিল্টন ১১টি উইকেট [গড় ১৭·০০], টাটারসল ২১টি উইকেট [গড় ২৮·৩৩] এবং স্ট্যাথাম ৮টি উইকেট [গড় ৩৬·৬২] পেয়েছিলেন।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বিজয় হাজারে সবচাইতে বেশি রান করেছিলেন [মোট রানসংখ্যা ৩৪৭, গড় ৫৭·৮৩]। পরবর্তী সফল ব্যাটসম্যান হলেন পঙ্কজ রায় [মোট রানসংখ্যা ৩৮৭, গড় ৫৫·২৮]। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এ সিরিজেই পঙ্কজ রায় প্রথম টেস্টে আবির্ভূত হন। বোলারদের মধ্যে সফলতম ছিলেন বিনু মানকড়। তিনি পেয়েছিলেন ৩৪টি উইকেট [গড় ১৬·৭৯]। মূলত বিনু মানকড়ের বোলিংয়ের জন্যই টেস্টে ইংল্যাণ্ড ধ্বসে গিয়েছিল।

এ সিরিজে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক লালা অমরনাথও খেলেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলেন নি। বিজয় মার্চেন্ট এ সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলে ক্রিকেট থেকে বিদায় নিলেন। জীবনের শেষ টেস্টে তিনি একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। অর্থাৎ খেলার কুশলতা হারাবার আগেই তিনি খেলা থেকে সরে গিয়েছিলেন।

প্রথম টেস্ট। নিউ দিল্লি। ২-৪, ৬-৭ নভেম্বর

ইংল্যাণ্ড : প্রথম ইনিংস

জে. ডি. রবার্টসন এল. বি. ডবলিউ ব সিন্ধে	৫০
এফ. এ. লোসন এল. বি ডবলিউ ব ফাদকার	৪
ডি. জে. কেনিয়ন ব সিন্ধে	৩৫
ডি. বি. কার ক যোশী ব সিন্ধে	১৪
এ. জে. ওয়াটকিনস ক যোশী ক মানকড়	৪০
আর. টি. স্পুনার হিট উইকেট ব সিন্ধে	১১
এন. ডি. হাওয়ার্ড স্টাম্পড যোশী ব মানকড়	১৩
ডি. শ্যাকলটন স্টাম্পড যোশী ব মানকড়	১০
জে. বি, স্ট্যাথাম ব সিন্ধে	৪

আর. টাটারসল নট আউট	৪
এফ. রিজওয়ে ব সিন্ধে	১৫
অতিরিক্ত (লেগ বাই ৩)	৩
মোট	২০৩

দ্বিতীয় ইনিংস

জে. ডি. রবার্টসন ক ফাদকার ব মানকড়	২২
এফ. এ. লোসন ক ফাদকার ব মানকড়	৬৮
ডি. জে. কেনিয়ন ক রায় ব সিন্ধে	৬
ডি. বি. কার ক উমরিগড় ব সিন্ধে	৭৬
এ. জে. ওয়াটকিনস নট আউট	১৩৮
আর. টি. স্পুনার ব মানকড়	১
এন. ডি হাওয়ার্ড এল. বি. ডবলিউ ব মানকড়	৯
ডি. শ্যাকলটন নট আউট	২০
অতিরিক্ত	২৮
মোট (৬ উইকেট)	৩৬৮

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৯ (লোসন) ৭৯ (কেনিয়ন) ১০২ (কার) ১১১ (রবার্টসন) ১৫৩ (স্পুনার) ১৬১ (ওয়াটকিন্স) ১৭৫ (শ্যাকলটন) ১৮৪ (স্ট্যাথাম) ১৮৪ (হাওয়ার্ড) ২০৩ (রিজওয়ে)

দ্বিতীয় ইনিংস ৬১ (রবার্টসন) ৭৮ (কেনিয়ন) ১১৬ (লোসন) ২৭৪ (কার) ২৭৫ (স্পুনার) ৩০৯ (হাওয়ার্ড)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ১১-৪-২৬-১ ; চৌধুরী ১৮-৫-৩০-০ ; হাজারে ৫-৫-০-০ ; মানকড় ৩৩-১৫-৩-৩ ; সিন্ধে ৩৫-৩-৯-৯১-৬।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ১৪-৩-২৮-০ ; চৌধুরী ৩১-১০-৪৬-০ ; হাজারে ১২-৪-২৪-০ ; মানকড় ৭৬-৪৭-৫৮-৪ ; সিন্ধে ৭৩-২৬-১৬২-২ ; উমরিগড় ৬-১-৮-০ ; মোদি ৫-১-১৩-০ ; রায় ৪-৩-১-০।

ভারত

ভি. এম. মার্চেন্ট ব স্ট্যাথাম	১৫৪
পি. রায় এল. বি. ডবলিউ ব শ্যাকলটন	১২
পি. আর. উমরিগড় রান আউট	২১
ভি. এস. হাজারে নট আউট	১৬৪
ডি. জি. ফাদকার রান আউট	৩
ভি. মানকড় ক স্পুনার ব টাটারসল	৪
আর. এস. মোদি এল. বি. ডবলিউ ব টাটারসল	৭
এইচ. আর. অধিকারী নট আউট	৩৮
অতিরিক্ত (বাই ১২ লেগ বাই ২ নো বল ১)	১৫
মোট (৬ উইকেট)	৪১৮

এস. জি. সিন্ধে, পি. জি. যোশী এবং
এন. চৌধুরী ব্যাট করেন নি।

উইকেট পতন : ১৮ (রায়) ৬৪ (উমরিগড়) ২৭৫ (মার্চেন্ট) ২৭৮ (ফাদকার) ২৯২ (মানকড়) ৩২৮ (মোদি)।

বোলিং : স্ট্যাথাম ২১-৪-৪৯-১ ; রিজওয়ে ২০-১-৫৫-০ ; ওয়াটকিনস ৩১-৭-৬০-০ ; শ্যাকলটন ২৯-৭-৭৬-১ ; টাটারসল ৬৩-১৭-৯৫-২ ; কার ১৬-৪-৫৬-০ ; রবার্টসন ৫-১-১২-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ভারত—ভি. এস. হাজারে
ইংল্যাণ্ড—এন. ডি. হাওয়ার্ড

দ্বিতীয় টেস্ট। বোম্বাই। ১৪-১৬, ১৮-১৯ ডিসেম্বর

ভারত : প্রথম ইনিংস

এম. কে. মন্ত্রী ক স্পুনার ব স্ট্যাথাম	৩৯
পি. রায় ক কেনিয়ণ ব স্ট্যাথাম	১৪০
পি. আর উমরিগড় এল. বি. ডব্লু ব লীডবিটার	

ভি. এস. হাজারে রান আউট	১৫৫
এল. অমরনাথ ক হাওয়ার্ড ব টাটারসল	৩২
সি. টি. সারভাতে ব টাটারসল	১৮
এইচ. আর. অধিকারী ক স্পুনার ব টাটারসল	২৫
সি. ডি. গোপীনাথ নট আউট	৫০
এস. ডবলিউ. সোহনি ক রবার্টসন ব স্ট্যাথাম	৬
ভি. মানকড় ব স্ট্যাথাম	০
এস. জি. সিন্ধে নট আউট	৮
অতিরিক্ত (লেগ বাই ৪)	৪
মোট (৯ উইকেট:)	৪৮৫

দ্বিতীয় ইনিংস

এম. কে. মন্ত্রী ক স্পুনার ব রিজওয়ে	
পি. রায় এল. বি ডব্লু ব রিজওয়ে	
পি. আর. উমরিগড় ক ওয়াটকিনস ব স্ট্র্যাথাম	৩৮
ভি. এস. হাজারে ক ব ওয়াটকিনস	৬
এল. অমরনাথ ক হাওয়ার্ড ব ওয়াটকিনস	৪
সি. টি. সারভাতে রান আউট	১৬
এইচ. আর. অধিকারী ক হাওয়ার্ড ব টাটারসল	১৫
সি. ডি. গোপীনাথ ক লীডবিটার ব টাটারসল	৪২
এস. ডবলিউ. সোহনি রান আউট	২৮
ভি. মানকড় ব ওয়াটকিনস	৪১
এস. জি. সিন্ধে নট আউট	৩
অতিরিক্ত	
মোট	২০৮

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৭৫ (মন্ত্রী) ৯৯ (উমরিগড়) ২৮৬ (পঙ্কজ রায়)

৩৬৮ (অমরনাথ) ৩৮৮ (হাজারে) ৯৯৭ (সারভাতে) ৪৬০ (অধিকারী) ৪৭১ (সোহনি) ৪৭১ (মানকড়)।

দ্বিতীয় ইনিংস ২ (রায়) ১৩ (মন্ত্রী) ২৪ (হাজারে) ৩৪ (অমরনাথ) ৭২ (উমরিগড়) ৭৭ (সারভাতে) ৮৮ (অধিকারী) ১৫৯ (গোপীনাথ) ১৭৭ (মানকড়) ২০৮ (সোহনি)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস রিজওয়ে ৩২-৫-১৩৭-০ ; স্ট্যাথাম ২৯-৫-৯৬-৪ ; ওয়াটকিনস ৩২-২-৯৭-০ ; লীডবিটার ১১-২-৩৮-১ ; টাটারসল ৩৪-৮-১১২-৩ ; রবার্টসন ১-০-১-০।

দ্বিতীয় ইনিংস রিজওয়ে ১৬-৩-৩৩-২ ; স্ট্যাথাম ২০-১১-৩০-১ ; ওয়াটকিনস ১৩-৪-২০-৩ ; লীডবিটার ১৪.১-৪-৬২-০ ; টাটারসল ২০-৬-৫৫-২।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

এফ. এ. লোসন ক মন্ত্রী ব সোহনি	৫
জে. ডি. রবার্টসন ক অমরনাথ ব মানকড়	৪৪
টি. ডবলিউ. গ্রেভনি ক অধিকারী ব সিন্ধে	১৭৫
আর. জে. স্পুনার এল. বি ডব্লু ব হাজারে	৪৬
ডি. জি. কেনিয়ন এল. বি. ডব্লু ব অমরনাথ	২১
এ. জে. ওয়াটকিনস ক এবং ব মানকড়	৮০
এন. ডি. হাওয়ার্ড ক উমরিগড় ব মানকড়	২০
ই. লীডবিটার এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	২
জে. বি. স্ট্যাথাম ক মানকড় ব অমরনাথ	২৭
আর. টাটারসল নট আউট	১০
এফ. রিজওয়ে ক এবং ব অমরনাথ	৫
অতিরিক্ত (বাই ১০ লেগ বাই ১১)	২১
মোট	৪৫৬

দ্বিতীয় ইনিংস

এফ. এ. লোসন ক সোহনি ব গোপীনাথ	১২
টি. ডবলিউ গ্রেভনি নট আউট	২৫
আর. টি. স্পুনার এল. বি. ডব্লু নট আউট	৫
ডি. জে. কেনিয়ন এল. বি. ডব্লু ব সোহনি	২
অতিরিক্ত (লেগ বাই ১)	১
মোট (২ উইকেট)	৫৫

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ১৮ (লোসন) ৭৯ (রবার্টসন) ১৬৬ (স্পুনার) ২৩৩ (কেনিয়ন) ৩৮১ (ওয়াটকিন্স) ৩৮৯ (গ্রেভনি) ৪০৭ (লিডবিটার) ৪০৮ (হাওয়ার্ড) ৪৪৮ (স্ট্যাথাম) ৪৫৬ (রিজওয়ে ।

দ্বিতীয় ইনিংস ৩ (কেনিয়ন) ৪৩ (লোসন) ।

বোলিং : প্রথম ইনিংস সোহনি ৩০-৭-৭২-১ ; অমরনাথ ৩৪'১-৯-৬১-৩ ; সিন্ধে ৫৩-১৩-১৫১-১ ; মানকড় ৫৭-২২-৯১-৪ , সারভাতে ১৩-২-২৭-০ ; হাজারে ১৭-৫-৩ -১ ; উমরিগড় ৩-১-৩-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস সোহনি ১৩-৫-১৬-১ ; অমরনাথ ৫-১-৬-০ ; সিন্ধে ৫-০-১১-০ ; মানকড় ৫-১-১০-০ ; গোপীনাথ ৮-২-১১-১ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ভারত—ভি. এস. হাজারে

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—এন. ডি. হাওয়ার্ড

তৃতীয় টেস্ট । কলকাতা । ৩০-৩১ ডিসেম্বর, ১, ৩, ৪ জানুয়ারি

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

জে. ডি. রবার্টসন ক ফাদকার ব ডিভেচা	১৩
আর. টি. স্পুনার ক সেন ব মানকড	৭১
টি. ডবলিউ গ্র্যাভেনি ক অমরনাথ ব ডিভেচা	২৪
এ. জে. ওয়াটকিনস ক সেন ব ফাদকার	৬৮

ডি. জে. কেনিয়ন ক মঞ্জরেকর ব মানকড়	৩
সি. জে. পুল ক ডিভেচা ব ফাদকার	৫৫
এন. ডি. হাওয়ার্ড ক অমরনাথ ব মানকড়	২৩
জে. বি. স্ট্যাথাম ব ফাদকার	১
ই. লীডবিটার রান আউট	৩৮
এফ. রিজওয়ে স্ট্যাম্পড সেন ব মানকড়	২৪
আর. টাটারসল নট আউট	৫
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগ বাই ১ নো বল ১১ ওয়াইড ১)	১৭
মোট	৩৩১

দ্বিতীয় ইনিংস

জে. ডি. রবার্টসন স্ট্যাম্পড সেন ব মানকড়	২২
আর. টি. স্পুনার ব মানকড়	৯২
টি. ডবলিউ গ্র্যাভেনি ক সেন ব ডিভেচা	২১
এ. জে. ওয়াটকিনস ব ডিভেচা	২
ডি. জে. কেনিয়ণ ব ফাদকার	০
সি. জে. পুল নট আউট	৬৯
এন. ডি. হাওয়ার্ড নট আউট	২০
অতিরিক্ত (বাই ১৩ লেগ বাই ৫ নো বল ৬ ওয়াইড ২)	২৬
মোট (৫ উইকেট)	২৫২

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ২২ (রবার্টসন) ৭৬ (গ্রেভনি) ১৩৩ স্পুনার ১৩৯ (কেনিয়ন ২৪৬ (ওয়াটকিন্স) ২৪৭ (পুল) ২৫৯ (স্ট্যাথাম (২৯০ (হাওয়ার্ড) ৩৩২ (লীডবিটার) ৩৪২ (রিজওয়ে) ।

দ্বিতীয় ইনিংস ৫২ (রবার্টসন) ৯৩ (গ্রেভনি) ৯৯ (ওয়াটকিন্স) ১০২ (কেনিয়ন) ১৮৪ স্পুনার) ।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ডিভেচা ৩৩-৯-৬০-২ ; ফাদকার ৩৮-১১-৮৯-৩ ; অমরনাথ ৩১-৫-৩৫-০ ; মানকড় ৫২'৫-১৬-৮৯-৪ ; গুপ্তে ১৩-০-৪৩-০ ; হাজারে ৩-০-৯-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ডিভেচা ২৫-৭-৫৫-২ ; ফাদকার ৩০-৭-২৭-১ ; অমরনাথ ২২-৫-৪৩-০ ; মানকড় ৩৫-১৩-৬৪-২ ; গুপ্তে ৫-০-১৪-০ ; হাজারে ৯-৪-১১-০ ; উমরিগড় ৪-১-১২-০ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় ক স্পুনার ব রিজওয়ে	৪২
ভি. মানকড় ক টাটারসল ব লীডবিটার	৫৯
পি. আর. উমরিগড় ক হাওয়ার্ড ব রিজওয়ে	১০
ভি. এস. হাজারে ব টাটারসল	২
এল. অমরনাথ ব টাটারসল	০
ডি. জি. ফাদকার ক লীডবিটার ব রিজওয়ে	১১৫
ভি. এল. মঞ্জরেকর ব টাটারসল	৪৮
সি. ডি. গোপীনাথ ক রবার্টসন ব রিজওয়ে	১৯
আর. ভি. ডিভেচা ক ওয়াটকিনস ব টাটারসল	২০
এস. পি. গুপ্তে ক লীডবিটার ব স্ট্র্যাথাম	০
পি সেন নট আউট	৭
অতিরিক্ত (বাই ৩ লেগ বাই ৯ ওয়াইড ১ নো বল ৩)	১৬
মোট	৩৪৪

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় নট আউট	৩১
ভি. মানকড় নট আউট	৭১
অতিরিক্ত (বাই ১)	১
মোট (বিনা উইকেটে)	১০৩

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৭২ (পঙ্কজ রায়) ৯০ (উমরিগড়) ৯৩ (হাজারে) ৯৩ (অমরনাথ) ১৪৪ (মানকড়) ২২০ (মঞ্জরেকার) ২৭২ (গোপীনাথ) ৩২০ (দিভেচা) ৩২৭ (আপ্তে) ৩৪৪ (ফাদকার)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস স্ট্যাথাম ২৭-১০-৪৬-১ ; রিজওয়ে ৩৮·১-১০-৮৩-৪ ; টাটারসল ৪৮-১৩-১০৪-৪ ; লীডবিটার ১৫-২-৬৪-১ ; ওয়াটকিনস ৩১-৯-৩১-০।

দ্বিতীয় ইনিংস স্ট্যাথাম ৩-০-৪-০ ; রিজওয়ে ২-১-৮-০ ; টাটারসল ৫-২-৮-০ ; লীডবিটার ৮-০-৫৪-০ ; ওয়াটকিনস ৫-১-৯-০ ; পুল ৫-১-৯-০ ; রবার্টসন ১-০-৫-০।

ফলাফল : ড্র

অধিনায়ক : ভারত—ভি. এস. হাজারে
ইংলণ্ড—এন. ডি. হাওয়ার্ড

চতুর্থ টেস্ট। কানপুর। ১২-১৪ জানুয়ারি

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় ব টাটারসল	৩৭
ভি. মানকড় ব টাটারসল	১৯
পি. আর. উমরিগড় ব টাটারসল	০
ভি. এস. হাজারে ক রিজওয়ে ব টাটারসল	০
ডি. জি. ফাদকার ব টাটারসল	৯৮
এইচ. আর. অধিকারী ব হিলটন	৬
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক গ্রেভনি ব হিলটন	৬
সি. এস. নাইডু ক স্পুনার ব হিলটন	২১
পি. জি. যোশী ব টাটারসল	৪
এস. জি. সিন্ধে নট আউট	৫
গুলাম আহমেদ ক পুল ব হিলটন	৬
অতিরিক্ত (বাই ৮ লেগ বাই ১)	৯
মোট	১২১

দ্বিতীয় ইনিংস

ভি. মানকড় ক স্ট্যাথাম ব হিলটন	৭
পি. রায়. ক রিজওয়ে ব হিলটন	১৪

ভি. এল মঞ্জরেকার ক রিজওয়ে ব হিলটন	২০
ভি. এস. হাজারে ব হিলটন	০
ডি. জি. ফাদকার এল. বি. ডব্লু ব হিলটন	২
পি. আর. উমরিগড় ক স্পুনার ব রবার্টসন	৩৬
এইচ. আর. অধিকারী ক লোসন ব টাটারসল	৬০
সি. এস. নাইডু ব রবার্টসন	০
এস. জি. সিন্ধে ক লাউসন ব টাটারসল	১৪
পি. জি. যোশী রান আউট	০
গোলাম আহমেদ নট আউট	২
অতিরিক্ত	২
মোট	১৫৭

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ১-৩৯ (মানকড়); ২-৩৯ (উমরিগড়); ৩-৩৯ (হাজারে) ; ৪-৪৯ (ফাদকার) ; ৫-৬৬ (পঙ্কজ রায়) ; ৬-৭৬ (অধিকারী) ; ৭-১০১ (মঞ্জরেকার); ৮-১০৬ যোশী) ; ৯-১১০ (নাইডু) ; ১০-১২১ (গোলাম আহমেদ)।

দ্বিতীয় ইনিংস : ১-৭ (মানকড) ; ২-৩৭ (পঙ্কজ রায়) ; ৩-৩৭ (হাজারে) ; ৪-৪২ (ফাদকার) ; ৫-৪৪ (মঞ্জরেকর) ; ৬-১০২ (উমরিগড়) , ৭-১০২ (নাইডু) ; ৮-১৪২ (সিন্ধে) ; ৯-১৪৩ (যোশী) ; ১০-১৫৭ (অধিকারী)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস স্ট্যাথাম ৬-৩-১০-০ ; রিজওয়ে ৭-১-১৬-০ ; ওয়াটকিনস ৫-৩-৬-০ ; হিলটন ২২'৫-১০-৩২-৪ ; টাটারসল ২১-৩-৪৮-৬।

দ্বিতীয় ইনিংস হিলটন ৩২-১১-৬১-৫ ; টাটারসল ২৭'৫-৭-৭৭-২ ; রবার্টসন ১-১-১৭-২।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

এফ. এ. লোসন হিট উইকেট ব মানকড়	২৬
আর. টি. স্পুনার ব সিন্ধে	২১
টি. ডবলিউ গ্রেভনি ব মানকড়	
জে. ডি. রবার্টসন এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	

এ. জে. ওয়াটকিনস ক যোশী ব আহমেদ	৬৬
এম. জে. হলটন স্টাম্পড যোশী ব আহমেদ	০১
সি. জে. পুল ব আহমেদ	১৯
এন. ডি. হাওয়ার্ড ব মানকড়	১
জে. ডি. স্ট্যাথাম নট আউট	১২
এফ. রিজওয়ে ব আহমেদ	৫
আর. টাটারসল স্ট্যাম্পড যোশী ব আহমেদ	২
অতিরিক্ত বাই ১৩, লেগ বাই ১	১৪
মোট	২০৩

দ্বিতীয় ইনিংস

এফ. এ. লোসন ক অধিকারী ব আহমেদ	১২
আর. টি. স্পুনার ব মানকড	০
টি. ডবলিউ গ্রেভনি নট আউট	৪৮
জে. ডি. রবার্টসন নট আউট	৫
অতিরিক্ত (বাই ১১)	১১
মোট (২ উইকেট	৭৫

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ১-৪৬ (স্পুনার); ২-৫৭ (লোসন); ৩-৬০ (গ্রেভনি); ১০৩ (রবার্টসন); ৫-১১৪ (হিলটন), ৬-১৭৪ (পুল); ৭-১৮১ (হাওয়ার্ড); ৮-১৮১ ওয়াটকিন্স); ৯-১৯৭ রিজওয়ে); ১০-২০৩ (টাটারসল)।

দ্বিতীয় ইনিংস : ১ (স্পুনার); ২-৫৭ (লোসন)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ২-২-০-০ ; হাজারে ২-০-৫-০ ; গুলাম আহমেদ ৩৭'১-১৪-৭০-৫ ; মাঁকড় ৩৫-১৩-৫৪-৪ ; শিণ্ডে ১৭-৪-৪৬-১ ; নাইডু ২-০-১৪-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ২-০-১১-০ , গুলাম আহমেদ ১০-১-১০-১ : মানকড় ৭'২-০-৪৪-১ ।

ইংলণ্ড ৮ উইকেটে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—ভি. এস. হাজারে

ইংলণ্ড—এন. ডি. হাওয়ার্ড

ভারত বনাম ইংল্যাণ্ড (১৯৫১-৫২)

পঞ্চম টেস্ট। মাদ্রাজ। ৬, ৮-১০ ফেব্রুয়ারি

ইংল্যাণ্ড : প্রথম ইনিংস

এফ. এ. লোসন ব ফাদকার	১
আর. টি স্পুনার ক ফাদকার ব হাজারে	৬৬
টি. ডবলিউ গ্রেভনি স্টাম্পড সেন ব মানকড়	৩৯
জে. ডি রবার্টসন ক এবং ব মানকড়	৭৭
এ. জে. ওয়াটকিনস ক গোপীনাথ ব মানকড়	৯
সি. জে. পুল ব মানকড়	১৫
ডি. বি. কার স্টাম্পড সেন ব মানকড়	৪০
এম. জে হিলটন স্টাম্পড সেন ব মানকড়	৬
জে. বি. স্ট্যাথাম স্টাম্পড সেন ব মানকড়	০
এফ. রিজওয়ে এল বি ডবলিউ ব মানকড়	০
আর. টাটারসল নট আউট	২
অতিরিক্ত	১১
মোট	২৬৬

দ্বিতীয় ইনিংস

এফ. এ. লোসন ক মানকড় ব ফাদকার	৭
আর. টি. স্পুনার এল বি ডবলিউ ব ডিভেচা	৬
টি. ডবলিউ. গ্রেভনি ক ডিভেচা ব আমেদ	২৫
জে. ডি. রবার্টসন এল বি ডবলিউ ব আমেদ	৫৬
এ. জে. ওয়াটকিনস ক এবং ব মানকড়	৪৮
সি. জে. পুল ক ডিভেচা ব আমেদ	৩
ডি. বি. কার ক মানকড় ব আমেদ	৫
এম. জে. হিলটন স্টাম্পড সেন ব মানকড়	১৫
জে. বি. স্ট্যাথাম ক গোপীনাথ ব মানকড়	৯

এফ. রিজওয়ে ব মানকড়	০
আর. টাটারসল নট আউট	০
অতিরিক্ত	৯
মোট	১৮৩

উইকেট পতন: প্রথম ইনিংস ৩ (লোসন) ৭১ (গ্রেভনি) ১৩১ (স্পুনার) ১৭৪ (ওয়াটকিন্স) ১৯৭ (পুল) ২৪৪ (রবার্টসন) ২৫২ (হিলটন) ২৬১ (স্ট্যাথাম) ২৬১ (রিজওয়ে) ২৬৬ (কার)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১৩ (স্পুনার) ১৫ (লোসন) ৬৮ (গ্রেভনি) ১১৭ (রবার্টসন) ১৩৫ (পুল) ১৫৯ (কার) ১৫৯ (ওয়াটকিন্স) ১৭৮ (হিলটন) ১৭৮ (রিজওয়ে) ১৮৬ (স্ট্যাথাম)।

বোলিং: প্রথম ইনিংস ফাদকার ১৬-২-৪৯-১; ডিভেচা ১২-২-২৭-০; অমরনাথ ২৭-৬-৫৬-০; মানকড় ৩৮'৫-১৫-৫৫-৮; গোলাম আমেদ ১৮-৫-৫৩-০; হাজারে ১০-৫-১৫-১।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ৯-২-১৭-১; ডিভেচা ৭-১-২১-১; অমরনাথ ৩-০-৬-০; মানকড় ৩০'৪-৯-৫৩-৪; গোলাম আমেদ ২৬-৫-৭৭-৪।

ভারত এক ইনিংস ও আট রানে জয়ী

১৯৫২—ভারত বনাম ইংলণ্ড

গত সিরিজের শেষ টেস্টে ভারতের জয় এ সিরিজের সফর সম্পর্কে বিরাট প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু সাধারণভাবে কাউণ্টি খেলায় ভারতের ফল ভাল হলেও টেস্টের ফল হল অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। চারটে টেস্টের মধ্যে ভারত হারল তিনটিতে, একটিতে কোন ক্রমে ড্র হল। সফরে প্রথম দিকে বিনু মানকড়কে পাওয়া যায় নি। প্রথম টেস্টে শোচনীয় পরাজয়ের পর বিনুকে ডাকা হল। তিনি ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে খেলছিলেন।

টেস্টে ধারাবাহিক ভাল ব্যাট করলেন অধিনায়ক বিজয় হাজারে। তাঁকে প্রথম টেস্টে সাহায্য করলেন তরুণ ব্যাটসম্যান বিজয় মঞ্জরেকর। হাজারে টেস্টে মোট রান করলেন ৩৩৩ (গড় ৫৫.৫০)। দ্বিতীয় টেস্টে মানকড় অনবদ্য খেললেন। ব্যাট বল ও ফিল্ডিংএ এমন সর্বাত্মক সাফল্য আর কোন ভারতের খেলোয়াড় এর আগে আর দেখাতে পারেন নি। যার জন্য দ্বিতীয় টেস্টটি অভিহিত হল বিনু মানকড়ের টেস্ট বলে। ব্যাটিংয়ে সবচাইতে নিরাশ করলেন উদীয়মান পঙ্কজ রায় এবং নির্ভরযোগ্য পলি উমড়িগড়। পঙ্কজ চারটি টেস্টে পাঁচটি শূন্য করলেন।

ভারতীয়দের এ বিপর্যয়ের মূলে মুখ্য কারিগরের ভূমিকা নিলেন টেস্টে নবাগত বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যান। জীবনের প্রথম টেস্ট সিরিজে (চার টেস্টের সিরিজ) তিনি ৩৮৬ রান দিয়ে ২৯ টি উইকেট পেলেন (গড় ১৩.৩১), নতুন খেলোয়াড়ের পক্ষে অসাধারণ বোলিং। তাঁকে সাহায্য করলেন প্রতিষ্ঠিত বোলার আলেক বেডসার। তিনি পেলেন ২৭৯ রান দিয়ে ২০টি উইকেট (গড় ১৩.৯৫)। ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফাস্ট বোলার ভীতির ট্র্যাডিশন সুরু হল।

ইংল্যাণ্ডের ব্যাটিংয়ে শীর্ষস্থান পেলেন অধিনায়ক লেন হাটন। তাঁর মোট রানসংখ্যা ৩৯৯ (গড় ৭৮.৮০)

ভারতীয়দের এ বিপর্যয়ে সমালোচনা হল ভারতীয়রা পাঁচদিনের টেস্টে খেলার অযোগ্য।

প্রথম টেস্ট। লীডস। ৫-৭, ৯ জুন

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় স্টাম্পড ইভানস ব জেনকিনস	১৯
ডি. কে. গাইকোয়াড় ব বেডসার	৯
পি. আর. উমরিগড় ক ইভানস ব ট্রুম্যান	৮
ভি. এস. হাজারে ক ইভানস ব বেডসার	৮৯
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক ওয়াটকিনস ব ট্রুম্যান	১৩৩
ডি. জি. ফাদকার ক ওয়াটকিনস ব লেকার	১২

সি. ডি. গোপীনাথ ব ট্রুম্যান	০
এম. কে. মন্ত্রী নট আউট	১৩
জি. এস. রামচাঁদ ক ওয়াটকিনস ব লেকার	০
এস. জি. সিন্ধে ক মে ব লেকার	২
গোলাম আমেদ ব লেকার	০
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগবাই ৭)	৮
মোট	২৯৩

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় ক কম্পটন ব ট্রুম্যান	০
ডি. কে. গাইকোয়াড় ক লেকার ব বেডসার	০
পি. আর. উমরিগড় ক এবং ব জেনকিনস	৯
ভি. এস. হাজারে ব ট্রুম্যান	৫৬
ভি. এল. মঞ্জরেকর ব ট্রুম্যান	০
ডি. জি. ফাদকার ব বেডসার	৬৪
সি. ডি. গোপীনাথ এল বি ডবলিউ ব জেনকিনস	৮
এম. কে. মন্ত্রী ব ট্রুম্যান	০
জি. এস. রামচাঁদ স্টাম্পড ইভানস ব জেনকিনস	০
এস. জি. সিন্ধে নট আউট	৭
গোলাম আমেদ স্টাম্পড ইভানস ব জেনকিনস	১৪
অতিরিক্ত (বাই ৫ ওয়াইড ১ নো-বল ১)	৭
মোট	১৬৫

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ১৮ (গায়কোয়াড়) ৪০ (পঙ্কজ রায়) ৪২ (উমরিগড়) ২৬৪ (হাজারে) ২৬৪ (মঞ্জরেকর) ২৬৪ (গোপীনাথ) ২৯১ (ফাদকার) ২৯১ (রামচাঁদ) ২৯৩ (সিন্ধে) ২৯৩ (গোলাম আমেদ)

দ্বিতীয় ইনিংস ০ (পঙ্কজ রায়) ০ (গায়কোয়াড়) ০ (মন্ত্রী) ০ (মঞ্জরেকর)

১৩১ (হাজারে) ১৪৩ (গোপীনাথ) ১৪৩ (রামচাঁদ) ১৪৩ (ফাদকার) ১৬৫ (গোলাম আমেদ)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস বেডসার ৩৩-১৩-৩৮-২ ; ট্রুম্যান ২৬-৬-৮৯-৩ ; লেকার ২২'৩-৯-৩৯-৪ ; ওয়াটকিনস ১১-১-২১-০ ; জেনকিনস ২৭-৬-৭৮-১ ; কম্পটন ৭-১-২০-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস বেডসার ২১-৯-৩২-২ ; ট্রুম্যান ৯-১-২৭-৪ ; লেকার ১৩-৪-১৭-০ , ওয়াটকিনস ১১-২-৩২-০ ; জেনকিনস ১৩-২-৫০-০ ।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

এল. হাটন ক রামচাঁদ ব আমেদ	১০
আর. টি. সিম্পসন ক রামচাঁদ ব আমেদ	২৩
পি. বি. এইচ. মে ব সিন্ধে	১৬
ডি. সি. এস. কম্পটন ক রামচাঁদ ব আমেদ	১৪
টি. ডবলিউ. গ্রেভনি ব আমেদ	৭১
এ. জে. ওয়াটকিনস এল বি ডব্লু ব আমেদ	৪৮
টি. জি. ইভানস এল বি ডবলিউ ব হাজারে	৬৬
আর. ও. জেনকিনস ক মন্ত্রী ব রামচাঁদ	৩৮
জে. সি. লেকার ব ফাদকার	১৫
এ. ভি. বেডসার ব রামচাঁদ	৭
এফ. এস. ট্রুম্যান নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ১৫ লেগ বাই ১১)	২৬
মোট	৩৩৪

দ্বিতীয় ইনিংস

এল. হাটন ব ফাদকার	[illegible]
আর. টি. সিম্পসন ক মন্ত্রী ব আমেদ	৫১
পি. বি. এইচ. মে ক ফাদকার ব আমেদ	৪

ডি. সি. এস. কম্পটন নট আউট	৩৫
টি. ডবলিউ. গ্রেভনি নট আউট	২০
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগবাই ৩ নো-বল ১)	৮
মোট (৩ উইকেট)	১২৮

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ২১ (হাটন) ৪৮ (সিম্পসন) ৬২ (কম্পটন) ৯২ (মে) ১৮২ (ওয়াটকিন্স) ২১১ (গ্রেভনি) ২৯০ (জেনকিন্স) ৩২৫ (শেকার) ৩২৯ (ইভান্স) ৩৩৪ (বেডসার)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১৬ (হাটন) ৪২ (মে) ৮৯ (সিমসন)

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ২৪-৭-৫৪-১ ; রামচাঁদ ৩৬.২-১১-৬১-২ ; গোলাম আমেদ ৬৩-২৪-১০০-৫ ; হাজারে ২০-৭-২২-১ ; সিন্ধে ২২-৫-৭১-১ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ১১-২-২১-১ ; রামচাঁদ ১৭-৩-৪৩-০ ; গোলাম আমেদ ২২-৮-৩৭-২ ; হাজারে ৩-০-১১-০ ; সিন্ধে ২-০-৮-০ ।

ইংলণ্ড সাত উইকেটে জয়ী

অধিনায়ক : ইংল্যাণ্ড—এল. হাটন
ভারত—ভি. এস. হাজারে

দ্বিতীয় টেস্ট। লর্ডস। ১৯, ২১, ২৩, ২৪ জুন

ভারত : প্রথম ইনিংস

ভি. মানকড় ক ওয়াটকিনস ব ট্রুম্যান	৭২
পি. রায়. ক এবং ব বেডসার	৩৫
পি. আর. উমরিগড় ব ট্রুম্যান	৫
ভি. এস. হাজারে নট আউট	৬৯
ভি. এল. মঞ্জরেকর এল বি ডবলিউ ব বেডসার	৫
ডি. জি. ফাদকার ব ওয়াটকিনস	৮
জি. এস. রামচাঁদ ব ট্রুম্যান	১৮
এইচ. আর. অধিকারী এল বি ডব্লু ব ওয়াটকিনস	০

এম. কে. মন্ত্রী ব ট্রুম্যান	১
এস. জি. সিন্ধে স্টাম্পড ইভানস ব ওয়াটকিনস	৫
গোলাম আমেদ ব জেনকিনস	০
অতিরিক্ত (বাই ৭ নো-বল ১০)	১৭
মোট	২৩৫

দ্বিতীয় ইনিংস

ভি. মানকড় ব লেকার	১৮৪
পি. রায় ব বেডসার	০
পি. আর. উমরিগড় ব ট্রুম্যান	১৪
ভি. এস. হাজারে ক লেকার ব বেডসার	৪৯
ভি. এল. মঞ্জরেকর ব লেকার	১
ডি. জি. ফাদকার ব লেকার	১৬
জি. এস. রামচাঁদ ব ট্রুম্যান	৪২
এইচ. আর. অধিকারী ব ট্রুম্যান	১৬
এম. কে. মন্ত্রী ক কম্পটন ব লেকার	৫
এস. জি. সিন্ধে ক হাটন ব ট্রুম্যান	১৪
গোলাম আমেদ নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ২৯ লেগ বাই ৩ নো-বল ৪)	৩৬
মোট	৩৭৮

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ১০৬ (মানকড়) ১১৬ (পঙ্কজ রায়) ১১৮ (উমরিগড়) ১২৬ (মঞ্জরেকর) ১৩৫ (ফাদকার) ১৩৯ (অধিকারী) ১৬৭ (রামচাঁদ) ১৮০ (মন্ত্রী) ২২১ (সিন্ধে) ২৩৫ (গোলাম আমেদ)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৭ (পঙ্কজ রায়) ৫৯ (অধিকারী) ২৭০ (মানকড়) ২৭২ (হাজারে) ২৮৯ (মঞ্জরেকর) ৩১২ (ফাদকার) ৩১৪ (উমরিগড়) ৩২৩ (মন্ত্রী) ৩৩৭ (সিন্ধে) ৩৭৮ (রামচাঁদ)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস বেডসার ৩৩-৮-৬২-২ ; ট্রুম্যান ২৫-৩-৭২-৪ ; জেনকিনস ৭·৩-১-২৬-১ ; ওয়াটকিনস ১৭-৭-৩৭-৩ ; লেকার ১২-৫-২১-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস বেডসার ৩৬-১৩-৬০-২ ; ট্রুম্যান ২৭-৪-১১০-৪ ; জেনকিনস ১০-১-৪০-০ ; ওয়াটকিনস ৮-০-২০-০ ; লেকার ৩৯-১৫-১০২-৪ ; কম্পটন ২-০-১০-০ ।

ইংলণ্ড : প্রথম ইনিংস

এল. হাটন ক মন্ত্রী ব হাজারে	১৫০
আর. টি. সিম্পসন ব মানকড়	৫৩
পি. বি. এইচ. মে ক মন্ত্রী ব মানকড়	৭৪
ডি. সি. এস. কম্পটন এল বি ডব্লু ব হাজারে	৬
টি. ডব্লু. গ্রেভনি ক মন্ত্রী ব আমেদ	৭৩
এ. জে. ওয়াটকিনস ব মানকড়	০
টি. জি. ইভানস ক এবং ব আমেদ	১০৪
আর. ও. জেনকিনস স্টাম্পড মন্ত্রী ব মানকড়	২১
জে. সি. লেকার নট আউট	২৩
এ. ভি. বেডসার ক রামচাঁদ ব মানকড়	৩
এফ. এস. ট্রুম্যান ব আমেদ	১৭
অতিরিক্ত (বাই ৮ লেগ বাই ৫)	১৩
মোট	৫৩৭

দ্বিতীয় ইনিংস

এল. হাটন নট আউট	৩৯
আর. টি. সিম্পসন রান আউট	২
পি. বি. এইচ. মে ক রায় ব আমেদ	২৬
ডি. সি. এস. কম্পটন নট আউট	৪
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগ বাই ৪)	৮
মোট (২ উইকেট)	৭৯

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ১০৬ (সিম্পসন) ২৬৪ (হাটন) ২৭২ (কম্পটন)

২৯২ (মে) ২৯২ (ওয়াটকিন্স) ৪১৫ (গ্রেভনি) ৪৬৮ (ইভান্স) ৫০৬ (জেনকিন্স) ৫১৪ (বেডসার) ৫৩৭ (ট্রুম্যান)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৮ (সিম্পসন) ৭১ (মে)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ২৭-৮-৪৪-০ ; রামচাঁদ ২৯-৮-৬৭-০ ; হাজারে ২৪-৪-৫৩-২ ; মানকড় ৭৩-২৪-১৯৬-৫ ; গোলাম আমেদ ৪৩.৪-১২-১০৬-৩ ; সিন্ধে ৬-০-৪৩-০ ; উমরিগড় ৪-০-১৫-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস রামচাঁদ ১-০-৫-০ ; হাজারে ১-১-০-০ ; মানকড় ২৪ ১২-৩৫-০ ; গোলাম আমেদ ২৩.২-৯-৩১-১ ।

ইংলণ্ড আট উইকেটে জয়ী

অধিনায়ক : ইংল্যাণ্ড—এল. হাটন

ভারত—ভি. এস. হাজারে

তৃতীয় টেস্ট। ম্যানচেস্টার। ১৭-১৯ জুলাই

ইংলণ্ড

এল. হাটন ক সেন ব ডিভেচা	১০৪
ডি. এস. শেপার্ড এল বি ডবলিউ বং রামচাঁদ	৩৪
জে. টি আইকিন ক ডিভেচা ব আমেদ	২৯
পি. বি. এইচ. মে ক সেন ব মানকড়	৬৯
টি. ডবলিউ গ্রেভনি এল বি ডবলিউ ব ডিভেচা	১৪
এ. জে. ওয়াটকিনস ক ফাদকার ব মানকড়	৪
টি. জি. ইভানস ক এবং ব আমেদ	৭১
জে. সি লেকার ক সেন ব ডিভেচা	০
এ. ভি. বেডসার ক ফাদকার ব আমেদ	১৭
জি. এ. আর লক নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ২ লেগ বাই ২)	৪
মোট (৯ উইকেট ডি.)	৩৪৭

এফ. এস. ট্রুম্যান ব্যাট করেননি।

উইকেট-পতন: ৭৮ (শেপার্ড) ১৩৩ (আইকিন) ২১৪ (হাটন) ২৪৮ (মে) ২৫২ (ওয়াটকিনস) ২৮৪ (গ্রেভনি) ২৯২ (লেকার) ৩৩৬ (বেডসার) ৩৪৭ (ইভান্স)

বোলিং: ফাদকার ২২-১০-৩০-০; ডি'ভেচা ৪৫-১২-১০২-৩; রামচাঁদ ৩৩-৭ ৭৮-১; মানকড় ২৮-৯-৬৭-২; গোলাম আমেদ ৯-৩-৪৩-৩; হাজারে ৭-৩-২৩-০।

ভারত: প্রথম ইনিংস

ভি. মানকড় ক লক ব বেডসার	৪
পি. রায় ক হাটন ব ট্রুম্যান	০
এইচ. আর. অধিকারী ক গ্রেভনি ব ট্রুম্যান	০
ভি. এস. হাজারে ব বেডসার	১৬
পি. আর উমরিগড় ব ট্রুম্যান	৪
ডি. জি. ফাদকার ক শেপার্ড ব ট্রুম্যান	০
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক আইকিন ব ট্রুম্যান	২২
আর. ভি. ডি'ভেচা ব ট্রুম্যান	৪
জি. এস. রামচাঁদ ক গ্রেভনি ব ট্রুম্যান	২
পি. সেন ক লক ব ট্রুম্যান	৪
গোলাম আমেদ নট আউট	১
অতিরিক্ত (লেগ বাই ১)	১
মোট	৫৮

দ্বিতীয় ইনিংস

ভি. মানকড় এল বি ডবলিউ ব বেডসার	৬
পি. রায় ক লেকার ব ট্রুম্যান	০
এইচ. আর. অধিকারী ক মে ব লক	২৭
ভি. এস. হাজারে ক আইকিন ব লক	১৬
পি. আর. উমরিগড় ক ওয়াটকিনস ব বেডসার	৩
ডি. জি. ফাদকার ব বেডসার	৫

ভি. এল. মঞ্জরেকর ক ইভানস ব বেডসার ০
আর. ভি. ডিভেচা ব বেডসার ২
জি. এস. রামচাঁদ ক ওয়াটকিনস ব লক ১
পি. সেন নট আউট ১৩
গোলাম আমেদ ক আইকিন ব লক ০
অতিরিক্ত (বাই ৮ নো-বল ১) ৯

মোট ৮২

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৪ (মানকড়) ৭ (পঙ্কজ রায়) ৫ (অধিকারী) ১৭ (উমরিগড়) ১৭ (ফাদকার) ৪৫ (হাজারে) ৫১ (দিভেচা) ৫৩ (রামচাঁদ) ৫৩ (মঞ্জরেকর) ৫৮ (প্রবীর সেন)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৭ (পঙ্কজ রায়) ৭ (মানকড়) ৫৫ (হাজারে) ৫৯ (উমরিগড়) ৬৬ (ফাদকার) ৬৬ (মঞ্জরেকর) ৬৬ (অধিকারী) ৬৭ (রামচাঁদ) ৭৭ (দিভেচা) ৮২ (গোলাম আমেদ)

বোলিং : প্রথম ইনিংস বেডসার ১১-৪-১৯-২ ; টুম্যান ৮·৪-২-৩১-৮ ; লেকার ২-০-৭-০।

দ্বিতীয় ইনিংস বেডসার ১৫-৬-২৭-৫ ; টুম্যান ৮-৫-৯-১ ; ওয়াটকিনস ৪-৩-১ -০ ; লক ৯·৩-২-৩৬-৪।

ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ২০৭ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ইংলণ্ড—এল. হাটন
ভারত—ভি. এস. হাজারে

চতুর্থ টেস্ট। ওভাল। ১৪-১৬, ১৮-১৯ অগস্ট

ইংলণ্ড

এল. হাটন ক ফাদকার ব রামচাঁদ ৮৬
ডি. এস. শেপার্ড এল বি ডবলিউ ব ডিভেচা ১১৯
জে. টি. আইকিন ক সেন ব ফাদকার ৫৩
পি. বি. এইচ মে ক মঞ্জরেকর ব মানকড় ১৭

টি. ডবলিউ. গ্রেভনি ক ভিভেচা ব আমেদ	১৩
ডবলিউ. ওয়াটসন নট আউট	১৮
টি. জি. ইভানস ক ফাদকার ব মানকড়	১
জে. সি. লেকার নট আউট	৬
অতিরিক্ত (বাই ১০ লেগবাই ২ নো বল ১)	১৩
মোট (৬ উইকেট ডি.)	৩২৬

এ. ভি. বেডসার, জি. এ. আর লক এবং এফ. এস. ট্রুম্যান ব্যাট করেন নি।

উইকেট পতন : ১৪৩ (হাটন) ২৬১ (শেপার্ড) ২৭৩ (আইকিন) ২৯৩ (মে) ৩০৪ (ইভান্স) ৩০৭ (গ্রেভনি)

বোলিং : ভিভেচা ৩৩-৯-৬০-১ ; ফাদকার ৩২-৮-৬১-১ ; রামচাঁদ ১৪-২-৫০-১ ; মানকড় ৪৮-২৮-৮৮-২ ; গোলাম আমেদ ২৪-১-৫৪-১ ; হাজারে ৩-৩-০-০ ।

ভারত

ভি. মানকড় ক ইভানস ব ট্রুম্যান	৫
পি. রায় ক লক ব ট্রুম্যান	০
এইচ. আর. অধিকারী ক ট্রুম্যান ব বেডসার	০
ভি. এস. হাজারে ক মে ব ট্রুম্যান	৩৮
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক আইকিন ব বেডসার	১
পি. আর উমরিগড় ব বেডসার	০
ডি. জি. ফাদকার ব ট্রুম্যান	১৭
আর. ভি. ভিভেচা ব বেডসার	১৬
জি. এস. রামচাঁদ ক হাটন ব বেডসার	৫
পি. সেন ব ট্রুম্যান	৯
গোলাম আমেদ নট আউট	২
অতিরিক্ত (লেগবাই ৩ নো বল ২)	৫
মোট	৯৮

উইকেট পতন : ০ (পঙ্কজ রায়) ৫ (অধিকারী) ৫ (মানকড়) ৬ (মঞ্জরেকর) ৬ (উমরিগড়) ৩৪ (ফাদকার) ৭১ (হাজারে) ৭৮ (রামচাঁদ) ৯৪ (প্রবীর সেন) ৯৮ (দিভেচা)।

বোলিং : বেডসার ১৪'৫-৪-৪১-৫; ট্রুম্যান ১৬-৪-৪৮-৫; লক ৬-২-১-০; লেকার ২-০-৩-০।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ইংলণ্ড—এল. হাটন

ভারত—ভি. এস. হাজারে

১৯৫২—ভারত বনাম পাকিস্তান

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অগস্ট ভারত বিভক্ত হল। তার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হল নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। তাই পাকিস্তানের ক্রিকেট-ঐতিহ্য ভারতের সঙ্গে যুক্ত। নতুন রাষ্ট্র থেকে ক্রিকেট দল এই প্রথম বিদেশ সফরে এল। অধিনায়ক হয়ে এলেন আবতুল হাফিজ কারদার। ইনি এর আগে অবিভক্ত ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেছেন। অন্যতম বোলার আমির ইলাহিও ভারতের হয়ে টেস্ট খেলেছিলেন। তাছাড়া বিখ্যাত মিডিয়ম পেস বোলার ফজল মামুদ ভারতের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েও নানা কারণে খেলতে পারেন নি। পাকিস্তানের আক্রমণের প্রধান স্তম্ভ হয়ে এলেন তিনি। আর এলেন বিস্ময়-বালক হানিফ মহম্মদ বিশ্বের ক্রীড়ামোদীরা যার দিকে আগ্রহভরে তাকিয়ে ছিলেন।

ভারতীয়দের প্রত্যাশা ছিল পাকিস্তান দল ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবে না। সে প্রত্যাশা সফল করে প্রথম টেস্টে ভারত জিতল ইনিংসে, প্রধানত বিনু মানকড়ের বোলিংয়ের সাহায্যে। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তান আঘাত হানল ভারতকে ইনিংসে হারিয়ে। তৃতীয় টেস্টে জয়ের সুবাদে ভারত সিরিজ জিতল ২-১ খেলায়। এই প্রথম ভারত টেস্টে রাবার পেল।

এ সিরিজের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল বিনু মানকড়ের টেস্ট ডাবল। তৃতীয় টেস্টে মানকড় এ কৃতিত্ব অর্জন করলেন। মাত্র ২৩টি টেস্ট খেলে ১০০০ রান ও ১০০টি উইকেট পাওয়া কম কথা নয়। এটি বিশ্ব রেকর্ড। সম্প্রতি ইংলণ্ডের বথাম এটি ভেঙেছেন।

দ্বিতীয় টেস্টে পাকিস্তানের ওপেনিং ব্যাটসম্যান নজর মহম্মদ ইনিংসের সূচনা করতে এসে শেষ অব্দি নট আউট রইলেন। নবাগত ব্যাটসম্যানের পক্ষে এটি অসাধারণ কৃতিত্ব।

পঞ্চম টেস্টে ভারতীয় ব্যাটসম্যান দীপক শোধন প্রথম আবির্ভাবে সেঞ্চুরি করলেন। প্রায় উনিশ বছর আগে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে এ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন লালা অমরনাথ। দীপক শোধন ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান যিনি এ গৌরবের অধিকারী হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য লালা অমরনাথ এ সিরিজে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন। ঘটনাচক্রে এ সিরিজের পঞ্চম টেস্টই অমরনাথের শেষ টেস্ট হল।

প্রথম টেস্ট। নিউ দিল্লি। ১৬-১৮ অক্টোবর

ভারত

ভি. মানকড় ব খান মহম্মদ	১১
পি. রায় ব খান মহম্মদ	৭
ভি. এস. হাজারে ব আমির ইলাহি	৭৬
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক নজর মহম্মদ ব ইলাহি	২৩
এল. অমরনাথ ক খান মহম্মদ ব ফজল মামুদ	৯
পি. আর. উমরিগড় এল বি ডব্লু ব কারদার	২৫
গুল মহম্মদ ক হানিফ ব ইলাহি	২৪
এইচ. আর. অধিকারী নট আউট	৮১
জি. এস. রামচাঁদ ক ইমতিয়াজ ব ফজল মামুদ	১৩
পি. সেন. ক নজর মহম্মদ ব কারদার	২৫
গোলাম আমেদ ব ইলাহি	৫০
অতিরিক্ত (বাই ২৮)	২৮
মোট	৩৭২

উইকেট পতন : ১৯ (মানকড়) ২৬ (পঙ্কজ রায়) ৬৭ (মঞ্জরেকর) ৭৬ (অমরনাথ) ১১০ (উমরিগড়) ১৮০ (হাজারে) ১৯৫ (গুল মহম্মদ) ২২৯ (রামচাঁদ) ২৬৩ (প্রবীর সেন) ৩৭২ (গোলাম আমেদ)।

বোলিং : খান মহম্মদ ২০-৩-৫২-২ ; মকসুদ আমেদ ৬-১-১৩-০ , ফজল মামুদ ৪০-১৩-৯২-২ ; আমির ইলাহি ৩৯·৪-৪-১৩৪-৪ ; এ. এইচ. কারদার ৩৪-১২-৫৩-২ ।

পাকিস্তান : প্রথম ইনিংস

নজর মহম্মদ রান আউট	২৭
হানিফ মহম্মদ ক রামচাঁদ ব মানকড়	৫১
ইসরার আলি ব মানকড়	১
ইমতিয়াজ আমেদ এল বি ডব্লু ব মানকড়	০
মকসুদ আমেদ ক রায় ব মানকড়	১৫
এ. এইচ. কারদার ক রায় ব মানকড়	৪
আনোয়ার হোসেন ক এবং ব মানকড়	৪
ওয়াকার হাসান এল বি ডব্লু ব মানকড়	৮
ফজল মামুদ নট আউট	২১
খান মহম্মদ ক রামচাঁদ ব মনেকড়	০
আমির ইলাহি ক গুল মহম্মদ ব আমেদ	৯
অতিরিক্ত (বাই ৯ লেগবাই ১)	১০
মোট	১৫০

দ্বিতীয় ইনিংস

নজর মহম্মদ ব মানকড়	৭
হানিফ মহম্মদ ব অমরনাথ	১
ইসরার আলি এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	৯
ইমতিয়াজ আমেদ এল. বি. ডব্লু ব আমেদ	৪১
মকসুদ আমেদ ক অধিকারী ব মানকড়	৫
এ. এইচ. কারদার নট আউট	৪৩
আনোয়ার হোসেন এল. বি. ডব্লু ব আমেদ	৪

ওয়াকার হাসান ক গুল মাহমেদ ব আমেদ	৫
ফজল মামুদ ক এবং ব আমেদ	২৭
খান মহম্মদ স্টাম্পড সেন ব মানকড়	৫
আমির ইলাহি ক রামচাঁদ ব মানকড়	০
অতিরিক্ত (বাই ৫)	৫
মোট	১৫২

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৬৪ (নজর মহম্মদ) ৬৫ (ইসরার আলি) ৬৫ (ইমতিয়াজ) ৯৭ (মকসুদ) ১০২ (কারদার) ১১১ (আনওয়ার হোসেন) ১১২ (হানিফ) ১২৯ (ওয়াকার হাসান) ১২৯ (খান মহম্মদ) ১৫০ (আমির ইলাহি)।

দ্বিতীয় ইনিংস ২ (হানিফ) ১৭ (ইসরার আলি) ৪২ (নজর মহম্মদ) ৪৮ (মকসুদ) ৭৩ (ইমতিয়াজ) ৭৯ (আনওয়ার হোসেন) ৮৭ (ওয়াকার হাসান) ১২১ (ফজল) ১৫২ (খান মহম্মদ) ১৫২ (আমির ইলাহি)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস রামচাঁদ ১৪-৭-২৪-০ ; অমরনাথ ১৩-৯-১০-০ ; মানকড় ৪৭-২৭-৫২-৮ ; গোলাম আমেদ ২৭·৩-৬-৫১-১ ; হাজারে ৮-৫-৩-০ , গুল মহম্মদ ৩-৩-০-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস রামচাঁদ ৬-১-২১-০ ; অমরনাথ ৫-২-১২-১ ; মানকড় ২৪·২-৩-৭৯-৫ ; গোলাম আমেদ ২৩-৭-৩৫-৪ ।

ভারত ১ ইনিংস ও ৭০ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—এল. অমরনাথ
পাকিস্তান—এ. এইচ. কারদার

দ্বিতীয় টেস্ট। লখনউ। ২৩-২৬ অক্টোবর

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় এল. বি. ডব্লু ব ফজল মামুদ	৩০
ডি. কে. গায়কোয়াড় ক মকসুদ আমেদ	৯
গুল মহম্মদ এল. বি. ডব্লু ব মকসুদ আমেদ	০

ভি. এল. মঞ্জরেকর ব ফজল মামুদ ৩

জি. কিষেনচাঁদ এল. বি. ডব্লু ব ফজল মামুদ ০

পি. আর উমরিগড় ব মামুদ হোসেন ১৫

এল. অমরনাথ ক জুলফিকার ব মামুদ হোসেন ১০

পি. জি. যোশী ব মামুদ হোসেন ৯

এইচ. জি. গায়কোয়াড় ব ফজল মামুদ ১৪

এস. নিয়ালচাঁদ নট আউট ৬

গোলাম আমেদ ক হানিফ ব ফজল মামুদ ৮

অতিরিক্ত (বাই ৫) ৫

মোট ১০৬

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় ক ইমতিয়াজ ব মামুদ হোসেন ২

ডি. কে. গায়কোয়াড় ক নজর ব ফজল মামুদ ৩২

গুল মহম্মদ এল. বি. ডব্লু ব ফজল মামুদ ২

ভি. এল. মঞ্জরেকর এল. বি. ডব্লু ব ফজল মামুদ ৩

জি. কিষেনচাঁদ ক নজর ব ফজল মামুদ ২০

পি. আর. উমরিগড় এল. বি. ডব্লু ব ফজল মামুদ ৩২

এল. অমরনাথ নট আউট ৬১

পি. জি. যোশী ব আমির ইলাহি ১৫

এইচ. জি. গায়কোয়াড় ব ফজল মামুদ ৮

এস. নিয়ালচাঁদ এল. বি. ডব্লু ব ফজল মামুদ ১

গোলাম আমেদ ক ইসরার আলি ব আমির ইলাহি ০

অতিরিক্ত (বাই ৫ নো বল ১) ৬

মোট ১৮২

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ১৭ (গায়কোয়াড়) ১৭ (গুল মহম্মদ) ২০

বিশ্ব—৬

(মঞ্জরেকর) ২২ (কিষেনচাঁদ) ৫৫ (পঙ্কজ রায়) ৬৫ (উমরিগড়) ৬৮ (অমরনাথ) ৮৪ (যোশি) ৯৩ (এইচ. গায়কোয়াড়) ১০৬ (গোলাম আমেদ)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৪ (পঙ্কজ রায়) ২৭ (কিষেনচাঁদ) ৪৩ (মঞ্জরেকর) ৭৩ (গায়কোয়াড়) ৭৭ (গুল মহম্মদ) ১০৩ (উমরিগড়) ১১৫ (এইচ গায়কোয়াড়) ১৭০ (যোশি) ১৭০ (গোলাম আমেদ) ১৮২ (নিয়ালচাঁদ)

বোলিং : প্রথম ইনিংস মামুদ হোসেন ২৩-৭-৩৫-৩ ; এ. এইচ. কারদার ৩-২-২-০ ; ফজল মামুদ ২৪'১-৮-৫২-৫ ; মকসুদ আমেদ ৫-১-১২-২ ।

দ্বিতীয় ইনিংস মামুদ হোসেন ১৯-৫-৫৭-১ ; কারদার ১৩-৫-১৫-০ ; ফজল মামুদ ২৭'৩-১১-৪২-৭ ; মকসুদ আমেদ ৫-০-২৫-০ ; আমির ইলাহি ৭-১-২০-২ ; জুলফিকার আমেদ ৫-১১-৭-০ ।

পাকিস্তান

নজর মহম্মদ নট আউট	১২৪
হানিফ মহম্মদ ক উমরিগড় ব আমেদ	৩৪
ওয়াকার হাসান এল. বি. ডব্লু ব অমরনাথ	২৩
ইমতিয়াজ আমেদ এল. বি. ডব্লু ব অমরনাথ	০
মকসুদ আমেদ এল. বি. ডব্লু ব নিয়ালচাঁদ	৪১
এ. এইচ. কারদার ক আমেদ ব নিয়ালচাঁদ	১৬
আনোয়ার হোসেন ব নিয়ালচাঁদ	৫
ফজল মামুদ ক যোশী ব গুল মহম্মদ	২৯
জুলফিকার আমেদ এল. বি. ডব্লু ব আমেদ	৩৪
মামুদ হোসেন ব আমেদ	১৩
আমির ইলাহি ব গুল মহম্মদ	৪
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগ বাই ৩ নো-বল ১)	৮
মোট	৩৩১

উইকেট-পতন : ৬৩ (হানিফ) ১১৮ (ওয়াকার) ১২০ (ইমতিয়াজ) ১৬৭ (মকসুদ) ১৯৪ (কারদার) ২০১ (আনওয়ার) ২৩৯ (ফজল মামুদ) ৩০২ (জুলফিকার) ৩১৮ (মামুদ হোসেন) ৩৩১ (আমির ইলাহি)।

বোলিং : অমরনাথ ৪০-১৮-৭৪-২; উমরিগড় ১-০-১-০; নিয়ালচাঁদ ৬৪-৩৩-৯৭-৩; এইচ. জি. গাইকোয়াড় ৩৭-৩১-৪৭-০; গোলাম আমেদ ৪৫-১৯-৮৩-৩; গুল মহম্মদ ৭৩-৩-২১-২।

পাকিস্তান এক ইনিংস ও ৪৩ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—এল. অমরনাথ

পাকিস্তান—এ. এইচ কারদার

তৃতীয় টেস্ট। বোম্বাই। ১৩-১৬ নভেম্বর

পাকিস্তান : প্রথম ইনিংস

নজর মহম্মদ ব অমরনাথ	৪
হানিফ মহম্মদ ব মানকড়	১৫
এ. এইচ. কারদার ক দানি ব অমরনাথ	২০
ইমতিয়াজ আমেদ ব অমরনাথ	০
মকসুদ আমেদ ক উমরিগড় ব অমরনাথ	৬
ওয়াজির মহম্মদ ক এবং ব মানকড়	৮
ওয়াকার হাসান স্টাম্পড রাজিন্দরনাথ ব মানকড়	৮১
ফজল মামুদ ক অমরনাথ ব হাজারে	৩৩
ইসরার আলি ব গুপ্তে	১০
মামুদ হোসেন ক রাজিন্দরনাথ ব গুপ্তে	২
আমির ইলাহি নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগবাই ২)	৭
মোট	১৮৬

দ্বিতীয় ইনিংস

নজর মহম্মদ ক উমরিগড় ব দানি	০
হানিফ মহম্মদ ক রামচাঁদ (বদলি) ব মানকড়	৯৬
এ. এইচ. কারদার এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	৩
ইমতিয়াজ আমেদ ক অধিকারী ব গুপ্তে	২৮
মকসুদ আমেদ ক হাজারে ব মানকড়	৯
ওয়াজির মহম্মদ এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	৪
ওয়াকার হাসান ক হাজারে ব মানকড়	৬৫
ফজল মামুদ স্টাম্পড রাজিন্দরনাথ ব গুপ্তে	০
ইসরার আলি স্টাম্পড রাজিন্দরনাথ ব গুপ্তে	৫
মামুদ হোসেন নট আউট	২১
আমির ইলাহি রান আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগবাই ৬)	১০
মোট	২৪২

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ১০ (নজর মহম্মদ) ৪০ (কারদার) ৪০ (ইমতিয়াজ) ৪৪ (হানিফ) ৫৮ (মকসুদ) ৬০ (উজির মহম্মদ) ১৪৭ (ফজল) ১৭৪ (ইসরার আলি) ১৮২ (মামুদ হোসেন) ১৮৬ (ওয়াকার)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১ (নজর মহম্মদ) ১৬৬ (ওয়াকার) ১৭১ (হানিফ) ১৮৩ (মকসুদ) ২০১ (কারদার) ২১৫ (ইমতিয়াজ) ২১৫ (ফজল) ২১৫ (উজির মহম্মদ) ২৩২ (আমির ইলাহি) ২৪২ (ইসরার আলি)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস অমরনাথ ২১-১০-৪০-৪ ; দানি ৪-২-১০-০ ; হাজারে ৭-১-২১-১ ; মানকড় ২৫-১১-৫২-৩ ; গোলাম আমেদ ৭-১-১৪-০ ; গুপ্তে ৯-১-৪২-২ ।

দ্বিতীয় ইনিংস অমরনাথ ১৮-৯-২৫-০ ; দানি ৬-৩-৯-১ ; হাজারে ৬-২-১৩-০ ; মানকড় ৬৫-৩১-৭২-৫ ; গোলাম আমেদ ২১-৮-৩৬-০ ; গুপ্তে ৩৩.২-১০-৭৭-৩ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

ভি. মানকড় ক নজর মহম্মদ ক কারদার	৪১
এম. এল. আপ্তে ক ইমতিয়াজ ব মামুদ হোসেন	৩০
আর. এস. মোদি ব মামুদ হোসেন	৩২
ভি. এস. হাজারে নট আউট	১৪৬
পি. আর. উমরিগড় ব মামুদ হোসেন	১০২
এইচ. আর. অধিকারী নট আউট	৩১
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগবাই ৪)	৫
মোট (৪ উইকেটে ডি.)	৩৮৭

দ্বিতীয় ইনিংস

ভি. মানকড় নট আউট	৩৫
এম. এল. আপ্তে নট আউট	১০
অতিরিক্ত	০
মোট (বিনা উইকেট)	৪৫

উইকেট-পতন : ৫৫ (মানকড়) ১০৩ (আপ্তে) ১২২ (মোদি) ৩০৫ (উমরিগড়)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস মামুদ হোসেন ৩৫-৫-১২১-৩ ; ফজল মামুদ ৩০-১০-১১১-০ ; মকসুদ আমেদ ৭-২-২০-০ ; কারদার ১৪-২-৫৪-১ ; আমির ইলাহি ১৪-০-৬৫-০ ; ইসরার আলি ৩-১-১১-০।

দ্বিতীয় ইনিংস মামুদ হোসেন ৬-২-২১-০ ; ফজল মামুদ ৭.২-২-২২-০ ; ইসরার আলি ২-১-২-০।

ভারত ১০ উইকেটে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—এল. অমরনাথ

পাকিস্তান—এ. এইচ. কারদার

চতুর্থ টেস্ট। মাদ্রাজ। ২৮—৩০ নভেম্বর, ১ ডিসেম্বর

পাকিস্তান

নজর মহম্মদ রান আউট	১৩
হানিফ মহম্মদ এল বি ডবলিউ ব ডিভেচা	২২
ওয়াকার হাসান স্টাম্পড মাকা ব মানকড়	৪৯
ইমতিয়াজ আমেদ ক মাকা ব ডিভেচা	৬
এ এইচ কারদার ব রামচাঁদ	৭৯
মকসুদ আমেদ ক বদলি ব মানকড়	১
আনোয়ার হোসেন রান আউট	১৭
ফজল মামুদ ক মাকা ব ফাদকার	৩০
জুলফিকার আমেদ রান আউট	৬৩
মামুদ হোসেন ব ফাদকার	০
আমির ইলাহি ব অমরনাথ	৪৭
অতিরিক্ত (বাই ৯ লেগবাই ৭ নোবল ১)	১৭
মোট	৩২৪

উইকেট পতন : ২৬ (নজর মহম্মদ) ৪৬ (হানিফ) ৭৩ (ইমতিয়াজ) ১১১ (ওয়াকার) ১১৫ (মকসুদ) ১৯৫ (আনওয়ার) ১৯৫ (কারদার) ২৪০ (ফজল) ২৪০ (মামুদ হোসেন) ৩৪৪ (আমির ইলাহি)।

বোলিং : ফাদকার ১৯-৩-৬১-২ ; ডিভেচা ১৯-৪-৩৬-২ ; রামচাঁদ ২০-৩-৬৬-১ ; অমরনাথ ৬'৫-৩-৯-১ ; মানকড় ৩৫-৩-১১৩-২ ; গুপ্তে ৫-২-১৪-০ ; হাজারে ৬-০-২৮-০ ।

ভারত

ভি. মানকড় ব ফজল মামুদ	৭
এম. এল. আপ্তে ক মকসুদ আমেদ ব কারদার	৪২
ভি. এস. হাজারে ক জুলফিকার ব মামুদ হোসেন	১
সি. ডি. গোপীনাথ ক নজর মহম্মদ ব মামুদ হোসেন	০

পি. আর. উমরিগড় ক নজর মহম্মদ ব ফজল মামুদ	৬২
এল. অমরনাথ ক ইমতিয়াজ ব কারদার	১৪
ডি. জি. ফাদকার নট আউট	১৮
জি. এস. রামচাঁদ নট আউট	২৫
অতিরিক্ত (বাই ৪ নো বল ২)	৬
মোট (৬ উইকেট)	১৭৫

উইকেট পতন : ২১ (মানকড়) ২৮ (হাজারে) ৩০ (গোপীনাথ) ১০৪ (আপ্তে) ১৩২ (উমরিগড়) ১৩৪ (অমরনাথ)।

বোলিং : মামুদ হোসেন ২২-৪-৭০-২ ; ফজল মামুদ ২৭-১১-৫২-২ ; মকসুদ আমেদ ৪-১-১০-০ ; এ. এইচ. কারদার ২৩-৭-৩-৭-২ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ভারত—এল. অমরনাথ

পাকিস্তান—এ. এইচ. কারদার

পঞ্চম টেস্ট। কলকাতা। ১২-১৫ ডিসেম্বর

পাকিস্তান : প্রথম ইনিংস

নজর মহম্মদ ক অমরনাথ ব আমেদ	৫৫
হানিফ মহম্মদ ক রামচাঁদ ব ফাদকার	৫৬
ওয়াকার হাসান এল. বি. ডবলিউ ব ফাদকার	২৯
এ. এইচ. কারদার ব ফাদকার	৭
মকসুদ আমেদ ক মঞ্জরেকর ব অমরনাথ	১৭
ইমতিয়াজ আমেজ ক গাইকোয়াড় ব ফাদকার	৫৭
আনোয়ার হোসেন এল. বি ডব্লু ব ফাদকার	৯
ফজল মামুদ ক মানকড় ব রামচাঁদ	৫

জুলফিকার আমেদ নট আউট	৬
মামুদ হোসেন স্টাম্পড সেন ব রামচাঁদ	৫
আমির ইলাহি ক সেন ব রামচাঁদ	৪
অতিরিক্ত—(বাই ৩ লেগ বাই ৩ নো বল)	৭
মোট	২৫৭

দ্বিতীয় ইনিংস

নজর মহম্মদ এল বি ডব্লু ব মানকড়	৪৭
হানিফ মহম্মদ ব রামচাঁদ	১২
ওয়াকার হাসান ব রামচাঁদ	৯৭
এ. এইচ. কারদার ক রামচাঁদ ব আমেদ	১
মকসুদ আমেদ ক শোধন ব আমেদ	৮
ইমতিয়াজ আমেদ ব মানকড়	১৩
আনোয়ার হোসেন ক মানকড় ব আমেদ	৩
ফজল মামুদ নট আউট	২৮
জুলফিকার আলি নট আউট	৫
অতিরিক্ত (বাই ১৪ লেগ বাই ৬ নো বল ২)	২২
মোট (৭ উইকেট ডি.)	২৩৬

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৯৪ (হানিফ) ১২৮ (নজর মহম্মদ) ১৬৯ (ওয়াকার) ১৮৫ (কারদার) ২১৫ (মকসুদ) ২৩৩ (ইমতিয়াজ) ২৪০ (আনওয়ার) ২৪২ (ফজল) ২৫৩ (মামুদ হোসেন) ২৫৭ (আমির ইলাহি)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১৮ (হানিফ) ৯৬ (নজর মহম্মদ) ১২৬ (ইমতিয়াজ) ১৩১ (কারদার) ১৪১ (মকসুদ) ১৫২ (আনওয়ার) ২১৬ (ওয়াকার)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ৩২-১০-৭২-৫ ; রামচাঁদ ১৩-৬-২০-৩ ; অমরনাথ ২১-৭-৩১-১ ; মানকড় ২৮-৭-৭৮-০ ; গোলাম আমেদ ২২-৬-৪৯-১ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ২১-৮-৩১-০ ; রামচাঁদ ১৬-৩-৪২-২ ; অমরনাথ ৩-২-১-০ ; মানকড় ৪১·১৮-৬৮-২ ! গোলাম আমেদ ৩৩-১১-৫৬-৩, শোধন ২-১-৬-০ ; রায় ২-১-৪-০ , মঞ্জরেকর ২-০-৬-০ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় ক জুলফিকার ব ইলাহি	২৯
ডি. কে. গাইকোয়াড় ব মামুদ হোসেন	২১
ভি. মানকড় এল বি ডবলিউ ব ফজল মামুদ	৩৫
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক ফজল মামুদ ব মামুদ হোসেন	২৯
পি. আর. উমরিগড় ক কারদার ব ফজল মামুদ	২২
ডি. জি. ফাদকার ক ইমতিয়াজ ব কারদার	৫৭
এল. অমরনাথ ক মকসুদ ব ফজল মামুদ	১১
ডি. এইচ. শোধন ক ইমতিয়াজ ব ফজল মামুদ	১১০
জি. এস. রামচাঁদ ব মামুদ হোসেন	২৫
পি. সেন ব আনোয়ার হোসেন	১৩
গোলাম আমেদ নট আউট	২০
অতিরিক্ত (বাই ৭ লেগ বাই ১৬ নো বল ২)	২৫
মোট	৩৯৭

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় নট আউট	৮
ডি. কে. গাইকোয়াড় নট আউট	২০
অতিরিক্ত	০
মোট (বিনা উইকেটে)	২৮

উইকেট পতন: প্রথম ইনিংস ৩৭ (গায়কোয়াড়) ৮৭ (পঙ্কজ রায়) ৯৯ (মানকড়) ১৩৫ (মঞ্জরেকর) ১৫৭ (উমরিগড়) ১৭৯ (অমরনাথ) ২৬৫ (ফাদকার) ৩১৯ (রামচাঁদ) ৩৫৭ (প্রবীর সেন) ৩৯৭ (শোধন)

বোলিং: প্রথম ইনিংস ৪৬-১১-১১৪-৩ ; ফজল মামুদ ৬৪-১৯-১৪১-৪ ; মাকসুদ আমেদ ৮-২-২০-০ ; আমির ইলাহি ৬-০-২৯-১ ; এ. এইচ কারদার ১৫-৩-৪৩-১ ;

দ্বিতীয় ইনিংস আনোয়ার হোসেন ১-০-৪-০ ; নজর মহম্মদ ২-১-১০-০ ; হানিফ মহম্মদ ২-০-১০-০ ; ওয়াকার হাসান ২-১-৪-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক: ভারত—এল. অমরনাথ

পাকিস্তান—এ. এইচ. কারদার

১৯৫৩—ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

ভারত এই প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গেল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তখন বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল। কেননা সে দলে ছিলেন বিশ্ববন্দিত ব্যাটসম্যান তিন ডব্লু—ওরেল, উইকস, ওয়ালকট এবং দুই বিস্ময় বোলার রামাধীন ও ভ্যালেন্টাইন। তাই অনেকে ভাবলেন বিগত ইংল্যাণ্ড সফরের মত এবারেও ভারত বিপর্যস্ত হবে। কিন্তু ক্রিকেটের মহা অনিশ্চয়তাকে প্রকাশ করে ভারত ভাল খেলল। পাঁচটি টেস্টের মধ্যে চারটি ড্র হল। ভারত হারল দ্বিতীয় টেস্টে। প্রথমে মনে হয়েছিল এ টেস্টে বিজয়ী হবে বুঝি ভারতই। কিন্তু রামাধীনের অসাধারণ বোলিংয়ে ভারতীয় দ্বিতীয় ইনিংস ধ্বসে গেল অল্প রানে।

এ সিরিজে ধারাবাহিক ভাল ব্যাটিং করলেন উমরিগড়। পঙ্কজ রায়ও উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখালেন। অসাধারণ ভাল বল করলেন সুভাষ গুপ্তে। তাকে উপযুক্ত সাহায্য করলেন ফাদকার ও অন্যান্য বোলাররা।

এ সিরিজে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল পঞ্চম টেস্টে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিন ডব্লু পঞ্চম টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেন। তার মধ্যে ওরেল করলেন ডবল সেঞ্চুরি। কিংবদন্তীর তিন নায়ক একই ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন ওই একবারই।

প্রথম টেস্ট। পোর্ট অব স্পেন। ২১-২৪, ২৭-২৮ জানুয়ারি

ভারত : প্রথম ইনিংস

ভি. মানকড় এল বি ডবলিউ ব কিং	২
এম. এল. আপ্তে ক বিনস ব স্টোলমেয়ার	৬৪
জি. এস. রামচাঁদ ক স্টোলমেয়ার ব রামাধিন	৬১
ভি. এস. হাজারে ক ওরেল ব ভ্যালেন্টাইন	২৯
পি. আর. উমরিগড় ক বিনস ব ভ্যালেন্টাইন	১৩০
ডি. জি. ফাদকার ব গোমজ	৩০
ডি. কে. গাইকোয়াড় ক ওরেল ব স্টোলমেয়ার	৪৩
ডি. এইচ. শোধন ক ওরেল ব গোমেজ	৪৫
সি. ভি. গাদকারি ক ওয়ালকট ব গোমেজ	৭
পি. জি. যোশী ক বিনস ব কিং	৩
এস. পি. গুপ্তে নট আউট	০
অতিরিক্ত (লেগবাই ২,নো বল ১)	৩
মোট	৪১৭

দ্বিতীয় ইনিংস

এম. এল. আপ্তে ব ভ্যালেন্টাইন	৫২
পি. জি. যোশী রান আউট	৩২
জি. এস. রামচাঁদ ক বিনস ব ওয়ালকট	১৭
ভি. এস. হাজারে ক এবং ব ওয়ালকট	০
পি. আর উমরিগড় ব ওরেল	৬৯
ডি. জি. ফাদকার ক ওয়ালকট ব ওরেল	৬৫
ভি. মানকড় ব রামাধিন	১০

ডি. কে. গাইকোয়াড এল বি ডব্লু ব কিং	২৪
ডি. এইচ. শোধন ব রামাধিন	১১
সি. ডি. গাদকারি নট আউট	১১
এস. পি. গুপ্তে ক ব্রে ব রামাধিন	১
অতিরিক্ত (লেগ বাই ১ নো বল ১)	২
মোট	২৯৪

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ১৬ (মানকড়) ১১০ (আপ্তে) ১৫৭ (রামচাঁদ) ১৫৮ (হাজারে) ২১০ (ফাদকার) ৩২৮ (গায়কোয়াড়) ৩৭৯ (উমরিগড়) ৪১২ (গাদকারি) ৪১৭ (জোশি) ৪১৭ (শোধন)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৫৫ (জোশি) ৯০ (রামচাঁদ) ৯০ (হাজারে) ১০৬ (আপ্তে) ২৩৭ (উমরিগড়) ২৩৮ (ফাদকার) ২৫৭ (মানকড়) ২৭৩ (শোধন) ২৯১ (গায়কোয়াড়) ২৯৪ (গুপ্তে) ।

বোলিং : প্রথম ইনিংস কিং ৪১'১-১০-৭৫-২ ; গোমেজ ৪২-১২-৮৪-৩ ; রামাধিন ৩৭-১৩-১০৭-১ ; ভ্যালেণ্টাইন ৫৬-২৮-৯২-২ ; স্টোলমেয়ার ১৬-২-৫২-২ ।

দ্বিতীয় ইনিংস কিং ২৪-১২-৩৫-১ ; গোমেজ ১৮-৫-৫১-০ ; রামাধিন ২৪'৫-৭-৫০-৩ ; ভ্যালেণ্টাইন ২৮-১৩-৪৭-১ ; স্টোলমেয়ার ১১-১-৪৭-০ ; ওরেল ২০-৪-৩২-২ ; ওয়ালকট ১৬-১০-১২-২ ; উইকস ২-০-১০-০ ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস

জে. বি. স্টোলমেয়ার ক ফাদকার ব গুপ্তে	৩৩
এফ. এম. ওরেল ব গুপ্তে	১৮
ই. ডি. উইকস ক গাদকারি ব গুপ্তে	২০৭
সি. এল. ওয়ালকট ক রামচাঁদ ব মানকড়	৪৭
বি. পেরেছ স্টাম্পড যোশী ব গুপ্তে	১১৫
জি. ই. গোমেজ ক মানকড় ব গুপ্তে	০
এ. পি. বিনস রান আউট	২

এফ. কিং এল বি ডবলিউ ব গুপ্তে ০

এস. রামাধিন নট আউট ৫

এ. এল. ভ্যালেন্টাইন স্টাম্পড যোশী ব গুপ্তে ০

অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগবাই ১ ওয়াইড ২ নো বল ২) ১০

মোট ৪৩৮

দ্বিতীয় ইনিংস

এ. এফ. রে নট আউট ৬৩

জে. বি. স্টোলমেয়ার নট আউট ৭৬

অতিরিক্ত (বাই ২ ওয়াইড ১) ৩

মোট (বিনা উইকেট) ১৪২

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৩ (রে) ৩৬ (ওরেল) ৮৯ (স্টোলমেয়ার) ১৯০ (ওয়ালকট) ৪০৯ (উইকস) ৪০৯ (গোমেজ) ৪১৩ (বিনস) ৪১৯ (কিং) ৪৩৮ (পেরেদু) ৪৩৮ (ভ্যালেণ্টাইন)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ১৩-৪-৩৮-০ ; রামচাঁদ ২২-৭-৫৬-১ ; গুপ্তে ৬৬-১৫-১৬২-৭ ; মানকড় ৬৩-১৬-১২৯-১ ; হাজারে ১২-১-৩০-০ ; ১-০-১-০ ; গাদকারি ৫-০-১২-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ৯-৪-১২-০ ; রামচাঁদ ১৩-২-৩১-০ ; গুপ্তে ২-১-২-০ ; মানকড় ১২-১-৩২-০ ; শোধন ৭-২-১৯-০ ; গাদকারি ৯-৩-২৫-০ ; উমরিগড় ২-০-১৪-০ ; গাইকোয়াড় ১-০-৪-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—জে. বি. [illegible]

ভারত—ভি. এস. হাজারে।

দ্বিতীয় টেস্ট। ব্রিজটাউন। ৭, ৯-১৩ ফেব্রুয়ারি

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ: প্রথম ইনিংস

বি. পেরাড্ক যোশী ব হাজারে	৪৩
জে. বি. স্টোলমেয়ার ক মানকড় ব গুপ্তে	৩২
এফ. এম. ওরেল এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	২৪
ই. ডি. উইকস ক যোশী ব হাজারে	৪৭
পি. এল. ওয়ালকট এল. বি. ডব্লু ব ফাদকার	৯৮
আর. জে. খ্রীষ্টিয়ানি স্টাম্পড যোশী ব গুপ্তে	৪
জি. ই. গোমেজ ক গাইকোয়াড় ব গুপ্তে	০
আর. লেগাল ক রামচাঁদ ব মানকড়	২৩
এফ. কিং এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	০
এস. রামাধিন নট আউট	১৬
এ. এল. ভ্যালেণ্টাইন ব ফাদকার	৬
অতিরিক্ত (লেগ্‌ বাই ৩)	৩
মোট	২৬৯

দ্বিতীয় ইনিংস

বি. পেরাড্ক এল. বি. ডব্লু ব ফাদকার	০
জে. বি. স্টোলমেয়ার ক গুপ্তে ব মানকড়	৫৪
এফ. এম. ওরেল ব ফাদকার	৭
ই. ডি. উইকস ব মানকড়	১৫
সি. এল. ওয়ালকট ব ফাদকার	৩৪
আর. জে. খ্রীষ্টিয়ানি স্টাম্পড যোশী ব গুপ্তে	৩৩
জি. ই. গোমেজ এল. বি. ডব্লু ব ফাদকার	৩৫
আর. লেগাল ব গুপ্তে	১
এফ. কিং ক মঞ্জরেকর ব রামচাঁদ	১৯

এস. রামাধিন ব ফাদকার ১২

এ. এল. ভ্যালেন্টাইন নট আউট ০

অতিরিক্ত (বাই ৬ লেগ বাই ১১ নো বল ১) ১৮

মোট ২২৮

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ৫২ (স্টোলমেয়ার) ৮১ (ওরেল) ১২৩ (পেরাড়ু) ১৬৮ (উইকস) ১৭৩ (ক্রিষ্টিয়ানি) ১৭৭ (গোমেজ) ২২২ (কিং) ২৮০ (ওয়ালকট) ২৯৬ (ভ্যালেন্টাইন)।

দ্বিতীয় ইনিংস : ০ (পেরাড়ু) ২৫ (ওরেল) ৪৭ (উইকস) ১০৫ (গোমেজ) ১৭৫ (স্টোলমেয়ার) ১৯০ (ওয়ালকট) ১০৫ (লিগাল) ২২৮ (ক্রীষ্টিয়ানি) ২২৮ (রামাধিন)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ১১·৪-২-২৪-২ ; রামচাঁদ ৯-১-৩২-১৩-২ ; গুপ্তে ৪১-১০-৯৯-৩ ; মানকড় ৪৬-১৫-২৫-১২৫-৩ ; হাজারে ৯-২-১৩-২।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ২৯·৩-৪-৬৪-৫ ; রামচাঁদ ৪-১-৯-১ ; গুপ্তে ৩৬-১২-৮২-২ ; মানকড় ১৯-৩-৫৪-২ ; হাজারে ২-১-১-০।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় ক ওরেল ব কিং ১

এম. এল. আপ্তে ক ওরেল ব ভ্যালেন্টাইন ৬৪

ভি. এল. মঞ্জরেকর এল. বি. ডব্লু ব রামধানি ২৫

ভি. এন. হাজারে ক উইকস ব কিং ৬৩

পি. আর. উমরিগড় ক খ্রীষ্টিয়ানি ব ভ্যালেন্টাইন ৫৬

জি. এস. রামচাঁদ ব রামাধিন ১৭

ডি. কে. গাইকোয়াড় ক এবং ব ভ্যালেন্টাইন ০

ডি. জি. ফাদকার ব ওরেল ১৭

পি. জি. যোশী ক ওরেল ব ভ্যালেন্টাইন ০

এস. পি. গুপ্তে রান আউট	২
ভি. মানকড় নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ২ লেগ বাই ৫ নো বল ১)	৮
মোট	২৫৩

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় ক লেগাল ব ভ্যালেণ্টাইন	২২
এম. এল. আপ্তে ব কিং	৯
ভি. এল. মঞ্জরেকর নট আউট	৩২
ভি. এস. হাজারে ব রামাধিন	০
পি. আর. উমরিগড় ব রামাধিন	৬
জি. এস. রামচাঁদ ব রামাধিন	৩৪
ডি. কে. গাইকোয়াড় আহত অবসৃত	০
ডি. জি. ফাদকার ক ভ্যালেণ্টাইন ব রামাধিন	৮
পি. জি. যোশী ক ওরেল ব ভ্যালেণ্টাইন	০
এস. পি. গুপ্তে এল. বি. ডব্লু ব রামাধিন	৫
ভি. মানকড় ব গোমেজ	৩
অতিরিক্ত (বাই ৮ লেগ বাই ২)	১০
মোট	১২৯

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ৬ (পঙ্কজ রায়) ৪৪ (মঞ্জরেকর) ১৫৬ (আপ্তে) ১৬৪ (রামচাঁদ) ২০৫ (গায়কোয়াড়) ২৪২ (ফাদকার) ২৪৩ (যোশি) ২৫০ (গুপ্তে) ২৫৩ (উমরিগড়)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৯ (মানকড়) ১৩ (আপ্তে) ৭০ (রামচাঁদ) ৭২ (হাজারে) ৮৯ (উমরিগড়) ৮৯ (পঙ্কজ রায়) ১০৭ (ফাদকার) ১১০ (যোশী) ১২৯ (গুপ্তে)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস কিং ৩৮-৭-৬৬-২ ; গোমেজ ১৭-৯-২৭-০ ; রামাধিন ৩০-১৩-৫৯-২ ; ওরেল ১৩-৪-২৫-১ ; ভ্যালেন্টাইন ৪১-২১-৫৮-৪ ; স্টোলমেয়ার ৫-২-১০-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস কিং ৯-৩-১৮-১ , গোমেজ ৫-২-৯-১ ; রামাধিন ২৪'৫-১১-২৬-৫ ; ওরেল ৬-০-১৩-০ ; ভ্যালেন্টাইন ৩৫-১৬-৫৩-২ ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১৪২ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—স্টোলমেয়ার

ভারত—ভি. এস. হাজারে

তৃতীয় টেস্ট। পোর্ট অব স্পেন। ১৯-২১, ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় ক উইকস ব ওরেল	৪৯
এম. এল. আপ্টে ব গোমেজ	০
জি. এস. রামচাঁদ ক লেগাল ব কিং	৬২
ভি. এস. হাজারে ক রে ব ওরেল	১১
পি. আর. উমরিগড় ক গোমেজ ব কিং	৬১
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক উইকস ব কিং	৩
ভি. মানকড় এল. বি. ডব্লু ব কিং	১৭
ডি. জি. ফাদকার ক পেরাদু ব কিং	১৩
জে. এম. ঘোরপাড়ে ক ওয়ালকট ব ভ্যালেন্টাইন	৩৫
ই. এস. মাকা আহত ও অবসৃত	২
এস. পি গুপ্তে নট আউট	১৭
অতিরিক্ত (লেগ বাই ৫ ওয়াইড ২ নো-বল ২)	৯
মোট	২৭৯

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় ক বদলি ব গোমেজ	০
এম. এল. আপ্তে নট আউট	১৬৩
জি. এস. রামচাঁদ ক উইকস ব কিং	১
ভি. এস. হাজারে এল. বি. ডব্লু ব ওরেল	২৪
পি. আর. উমরিগড় স্টাম্পড লেগাল ব ভ্যালেণ্টাইন	৬৭
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক লেগাল ব ওরেল	২
ভি. মানকড় রান আউট	৯৬
জে. এম. ঘোরপাড়ে রান আউট	০
অতিরিক্ত (লেগ বাই ৪ ওয়াইড ৩ নো-বল ২)	৯
মোট (৭ উইকেটে ডি.)	৩৬২

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ৬ (আপ্তে) ৮৭ (রামচাঁদ) ১১৭ (পঙ্কজ রায়) ১২৪ (হাজারে) ১৩৬ (মঞ্জরেকর) ১৭৭ (মানকড়) ২১১ (ফাদকার) ২২৫ (উমরিগড়) ২৭৯ (ঘোরপাড়ে)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১ (পঙ্কজ রায়) ৪ (রামচাঁদ) ১০ (মঞ্জরেকর) ১৪৫ (উমরিগড়) ২০৯ (হাজারে) ২০৯ (ঘোরপাড়ে) ৩৬২ (মানকড়)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস কিং ৩১-৯-৭৪-৫ ; গোমেজ ১৬-৫-২৬-১ ; রামাধিন ২১-৭-৬১-০ ; ওরেল ২৬-৯-৪৭-২ ; ভ্যালেণ্টাইন ৩৭.২-১৮-৬২-১।

দ্বিতীয় ইনিংস কিং ২২-৯-২৯-১ ; গোমেজ ৪৬.১-২০-৪২-১ ; রামাধিন ২৮-১৩-৪৭-০ ; ওরেল ৩১-৭-৬২-২ ; ভ্যালেণ্টাইন ৫০-১৭-১০৫-১ ; স্টোলমেয়ার ১৫-৩-৫৪-০ ; ওয়ালকট ৭-২-১৩-০ ; উইকস ১-০-১-০।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস

এ. এফ. রে ক গাদকারি (বদলি) ব গুপ্তে	১৫
বি. পেরাদু ব রামচাঁদ	৮
সি. এল. ওয়ালকট স্টাম্পড মঞ্জরেকর ব গুপ্তে	৩০
ই. ডি. উইকস রান আউট	১৬১

এফ. এম. ওরেল ব গুপ্তে	৩১
জি. ই. গোমেজ ক হাজারে ব ফাদকার	১৫
আর. লেগাল রান আউট	১৭
জে. বি. স্টোলমেয়ার অপরাজিত	২০
এফ. কিং ক বদলি ব গুপ্তে	১২
এস. রামাধিন ক মঞ্জরেকর ব ফাদকার	১
এ. এল. ভ্যালেন্টাইন ক ঘোরপাড়ে ব গুপ্তে	০
অতিরিক্ত (বাই ৩ ওয়াইড ২)	৫
মোট	৩১৫

দ্বিতীয় ইনিংস

জে. বি. স্টোলমেয়ার নট আউট	১০৪
বি. পেরাদু ক ঘোরপাড়ে ব গুপ্তে	২৯
এফ. এম. ওরেল ক মঞ্জরেকর ব রামচাঁদ	২
ই. ডি. উইকস নট আউট	৫৫
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগ বাই ১)	২
মোট (২ উইকেটে)	১৯২

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ১২ (পেরাদু) ৪১ (রে) ৮২ (ওয়ালকট) ১৭৮ (ওরেল) ২১৫ (গোমেজ) ২৮১ (উইকস) ২৮৬ (লেগাল) ২৯৯ (কিং) ৩০৪ (রামাধিন) ৩১৫ (ভ্যালেন্টাইন)

দ্বিতীয় ইনিংস ৪৭ (পেরাদু) ৬৫ (ওরেল)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ৪৩-১৪-৮৫-২ ; রামচাঁদ ১৫-৩-৪৮-১ ; গুপ্তে ৪৮-১৪-১০৭-৫ ; ঘোরপাড়ে ৫-০-১৭-০ ; মানকড় ৩৩-১৬-৪৭-০ ; হাজারে ২-০-৬-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ৭-৫-৭-০ ; রামচাঁদ ২০-৩-৬১-১ ; গুপ্তে ৭-০-১৯-১ ; ঘোরপাড়ে ১১-০-৫৩-০ ; হাজারে ২-০-১২-০ ; আপ্তে ১-০-৮-০ ; রায় ৬-০-৩৫-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—জে. বি. স্টোলমেয়ার

ভারত—ভি. এস. হাজারে

। জর্জটাউন। ১১-১৪, ১৬, ১৭ মার্চ

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় এল. বি ডব্লু ব ভ্যালেণ্টাইন	২৮
এম. এল. আপ্তে এল. বি. ডব্লু ব রামাধিন	৩০
জি. এস. রামচাঁদ রান আউট	
ভি. এল. মঞ্জরেকর রান আউট	
পি. আর উমরিগড় ক ওয়ালকট ব ভ্যালেণ্টাইন	১
ভি. এস. হাজারে ক ওয়ালকট ব ভ্যালেণ্টাইন	৩০
ভি. মানকড় ক লেগাল ব ভ্যালেণ্টাইন	৬৬
ডি. জি. ফাদকার ক লেগাল ব ভ্যালেণ্টাইন	৩০
সি. ভি. গাদকারি নট আউট	৫০
পি. জি. যোশী এল. বি. ডব্লু ব রামাধিন	৭
এস. পি. গুপ্তে রান আউট	১২
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগ বাই ২ নো-বল ২)	৮
মোট	২৬২

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় ক ওরেল ব ভ্যালেণ্টাইন	৪৮
এম. এল. আপ্তে হিট উইকেট ব স্টোলমেয়ার	৩০

জি. এস. রামচাঁদ ব ভ্যালেণ্টাইন	২
ভি. এল. মঞ্জরেকর ব ভ্যালেণ্টাইন	৩১
পি. আর. উমরিগড় নট আউট	৪০
ভি. এস. হাজারে এল. বি. ডব্লু ব কিং	৯
ভি. মানকড় নট আউট	২০
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগ বাই ৫ নো-বল ১)	১০
মোট (৫ উইকেটে)	১৯০

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ৪৭ (পঙ্কজ রায়) ৪৭ (রামচাঁদ) ৫৬ (মঞ্জরেকর) ৬২ (উমরিগড়) ৬৪ (আপ্তে) ১২০ (হাজারে) ১৮৩ (মানকড়) ২১১ (ফাদকার) ২৩৬ (যোশী) ২৬২ (গুপ্তে)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৬৬ (আপ্তে) ৭২ (রামচাঁদ) ৯১ (হাজারে) ১১৭ (পঙ্কজ রায়) ১৬১ (মঞ্জরেকর)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস কিং ৬-৩-৪-০ ; মিলার ১৩-৮-২৮-০ ; ভ্যালেণ্টাইন ৫৩.৫-২০-১২৭-৫ ; রামাধিন ৪১-১৮-৭৪-২ ; স্টোলমেয়ার ১-০-১-০ ; ওয়ালকট ৩-০-৮-০ ; ওরেল ৪-১-১২-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস কিং ১৭-৬-৩২-১ ; ভ্যালেণ্টাইন ৩৪-১৪-৭১-৩ ; রামাধিন ২৬-১৪-৩৯-০ ; স্টোলমেয়ার ৮-২-১৫-১ ; ওরেল ১৩-২-২৩-০ ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

বি. পেয়ার্স ব রামচাঁদ	২
জে. বি. স্টোলমেয়ার এল বি ডব্লু ব মানকড়	১৩
এফ. এম. ওরেল ব মানকড়	৫৬
ই. ডি. উইকস এল বি ডব্লু ব রামচাঁদ	৮৬
সি. এল. ওয়ালকট এল বি ডব্লু ব হাজারে	১২৫
এল. ওয়াইট ব মানকড়	২১
আর. লেগাল এল. বি ডব্লু ব গুপ্তে	৮
আর. মিলার ক আপ্তে ব গুপ্তে	২৩

এফ. কিং ব গুপ্তে	২
এস. রামাধিন নট আউট	৬
এ. এল. ভ্যালেণ্টাইন ক হাজারে ব গুপ্তে	১৩
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগ বাই ৪ ওয়াইড ১)	৯
মোট	৩৬৪

উইকেট পতন : ২ (পেরাডু) ৪৪ (স্টোলমেয়ার) ১০১ (ওরেল) ২৩১ (উইক্স) ৩০২ (ওয়াইট) ৩১১ (লেগাল) ৩৪৩ (ওয়ালকট) ৩৪৫ (মিলার) ৩৪৫ (কিং) ৩৬৪ (ভ্যালেণ্টাইন)।

বোলিং : রামচাঁদ ১৭-৪-৪৮-২ ; হাজারে ১২-৩-২২-১ ; গাদকারি ৩-১-৮-০ ; গুপ্তে ৫৬২-১৯-১২২-৪ ; মানকড় ৬৩-২৩-১৫৫-৩।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—জে. বি. স্টোলমেয়ার

ভারত—ভি. এস. হাজারে

পঞ্চম টেস্ট। কিংস্টন। ২৮, ৩০, ৩১ মার্চ, ১, ২, ৪ এপ্রিল

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায়. ক লেগাল ব কিং	৮৫
এম. এল. আপ্তে রান আউট	১৫
জি. এস. রামচাঁদ এল বি ডব্লু ব ভ্যালেণ্টাইন	২২
ভি. এস. হাজারে ক ভ্যালেণ্টাইন ব কিং	১৬
পি. আর. উমরিগড় ব ভ্যালেণ্টাইন	১১৭
ভি এল. মঞ্জরেকর ক উইকস ব ভ্যালেণ্টাইন	৪৩
ভি. মানকড় এল বি ডব্লু ব ভ্যালেণ্টাইন	৬
সি. ভি. গাদকারি ক লেগাল ব ভ্যালেণ্টাইন	০
জে. এম. ঘোরপাড়ে ক লেগাল ব গোমেজ	!

এস. পি. গুপ্তে নট আউট	০
ডি. এইচ. শোধন (ব্যাট করেন নি)	...
অতিরিক্ত (বাই ১ ওয়াইড ৩)	৪
মোট (৯ উইকেট ডি.)	৩১২

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় এল বি ডব্লু ব ভ্যালেণ্টাইন	১৫০
এম. এল. আপ্তে এল বি ডব্লু ব ভ্যালেণ্টাইন	৩৩
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক উইকস ব গোমেজ	১১৮
পি. আর. উমরিগড় ক উইকস ব কিং	১৩
ভি. এস. হাজারে ক উইকস ব ভ্যালেণ্টাইন	১২
ভি. মানকড় ক উইকস ব গোমেজ	৯
সি. ভি. গাদকারি ক স্টোলমেয়ার ব গোমেজ	
জি. এস. রামচাঁদ ক পেরাড়ু ব ভ্যালেণ্টাইন	৩৩
জে. এম. ঘোরপাড়ে ব কিং	২৪
এস. পি. গুপ্তে ব গোমেজ	৮
ডি. এইচ. শোধন নট আউট	১৫
অতিরিক্ত (বাই ১৮ লেগবাই ১০ ওয়াইড ১)	২৯
মোট	৪৪৪

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৩০ (আপ্তে) ৫৭ (রামচাঁদ) ৮০ (হাজারে) ২৩০ (পঙ্কজ রায়) ২৭৭ (উমরিগড়) ২৯৫ (মানকড়) ৩১২ (গাদকারি) ৩১২ (ঘোরপাড়ে) ৩১২ (মঞ্জরেকর)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৮০ (আপ্তে) ৩১৭ (মঞ্জরেকর) ৩২৭ (পঙ্কজ রায়) ৩৪৬ (উমরিগড়) ৩৬০ (হাজারে) ৩৬০ (গাদকারি) ৩৬৮ (মানকড়) ৪০৮ (রামচাঁদ) ৪২১ (ঘোরপাড়ে) ৪৪৪ (গুপ্তে)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস কিং ৩৪-১৩-৬৪-২ ; গোমেজ ২৮-৩১-৪০-১ ; ওরেল

১৬-৬-৩১-০ ; স্কট ৩১-৭-৮৮-০ ; ভ্যালেণ্টাইন ২৭-৯-৬৪-৫ , স্টোলমেয়ার ৪-০-২০-০ ; ওয়ালকট ১-০-১-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস কিং ২৬-৬-৮৩-২ ; গোমেজ ৪৭-২৫-৭২-৪ ; ওরেল ৬-২-১৭-০ ; স্কট ১৩-২-৫২-০ ; ভ্যালেণ্টাইন ৬৭-২২-১৪৯-৪ ; স্টোলমেয়ার ১৩-৩-২৮-০ ; ওয়ালকট ৮-২-১৪-০ ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস

বি. পেরাডু ব গুপ্তে	৫৮
জে. বি. স্টোলমেয়ার ব মানকড়	১৩
এফ. এম. ওরেল ক হাজারে ব মানকড়	২৩৭
ই. ডি. উইকস ক গাদকারি ব গুপ্তে	১০৯
সি. এল. ওয়ালকট ক গাদকারি ব মানকড়	১১৮
আর. জে. খ্রীষ্টিয়ানি এল বি ডব্লু ব মানকড়	৪
জি. ই. গোমেজ ক হাজারে ব মানকড়	১২
আর. লেগাল ক বিকল্প ব গুপ্তে	১
এফ. কিং স্টাম্পড মঞ্জরেকর ব গুপ্তে	০
এ. স্কট ক এবং ব গুপ্তে	৫
এ. এল. ভ্যালেণ্টাইন নট আউট	৪
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগবাই ৭ ওয়াইড ৪)	১৫
মোট	৫৭৬

দ্বিতীয় ইনিংস

বি. পেরাডু রান আউট	২
জে. বি. স্টোলমেয়ার ব রামচাঁদ	৯
এফ. এম. ওরেল ক গুপ্তে ব মানকড়	২৩
ই. ডি. উইকস ক ঘোরপাড়ে ব রামচাঁদ	৩৬

সি. এল. ওয়ালকট নট আউট ৫

আর. জে. খ্রীষ্টিয়ানি নট আউট ১

(বাই ১৫ ওয়াইড ১) ১৬

মোট (৪ উইকেট) ৯২

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৩৬ (স্টোলমেয়ার) ১৩৩ (পেরাদু) ৩৩০ (উইকস) ৫৪৩ (ওরেল) ৫৫৪ (ওয়ালকট) ৫৫৪ (খ্রীষ্টিয়ানি) ৫৬৭ (লেগাল) ৫৬৭ (কিং) ৫৬৯ (গোমেজ) ৫৭৬ (স্কট)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১১ (পেরাদু) ১৫ (স্টোলমেয়ার) ৮১ (ওরেল) ৯১ (উইকস)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস রামচাঁদ ৩৬-৯-৮৪-০ ; হাজারে ১৭-২-৪৭-০ ; গুপ্তে ৬৫.১-১৪-১৮০-৫ ; মানকড় ৮২-১৭-২২৮-৫ ; ঘোরপাড়ে ৬-১-২২-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস রামচাঁদ ১৪-৬-৩৩-২ ; হাজারে ২-১-১-০ ; গুপ্তে ৮-২-১৬-০ ; মানকড় ২২-১৬-১৬-১ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—জে. বি. স্টোলমেয়ার

ভারত—ভি. এস. হাজারে

১৯৫৪-৫৫—ভারত বনাম পাকিস্তান

ভারতের এই প্রথম পাকিস্তান সফর। এ সিরিজ থেকে শুরু হল এক অবিশ্বাস্য একঘেয়ে নিষ্ফল প্রতিযোগিতার ইতিহাস। উভয় পক্ষই খেলার চাইতে হারজিতকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রতিযোগিতাকে একটি জাতীয় সম্মানের প্রশ্ন করে তুলল। ফলে খেলার স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিনষ্ট হল। পাঁচটি টেস্টই ড্র হল। কোন দলই ঝুঁকি নিতে চাইল না।

উভয় দলের কোন খেলোয়াড়ই এমন কিছু ব্যক্তিগত কৃতিত্ব দেখাতে পারলেন যা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। অবশ্য এই প্রথম দলের অধিনায়ক হবার সৌভাগ্য অর্জন করলেন চৌকস খেলোয়াড় বিনু মানকড়। কিন্তু তাঁর দল পরিচালনায় যেন পেশাদারী সাবধানতা লক্ষ্য করা গেল।

পাকিস্তানের আপ্যায়ারিংয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন তুললেন ভারতীয় দলের ম্যানেজার লালা অমরনাথ।

প্রথম টেস্ট। ঢাকা। ১-৪ জানুয়ারি

পাকিস্তান: প্রথম ইনিংস

হানিফ মহম্মদ ক তামানে ব আমেদ	৪১
আলিমউদ্দিন ক ফাদকার ব আমেদ	৭
ওয়াকার হাসান ক এবং ব আমেদ	৫২
মকসুদ আমেদ ক তামানে ব আমেদ	১১
ওয়াজির মহম্মদ ক ফাদকার ব গুপ্তে	২৩
ইমতিয়াজ আমেদ ব ফাদকার	৫৪
এ. এইচ. কারদার ব রামচাঁদ	২৯
সুজাউদ্দিন স্টাম্পড তামানে ব মানকড়	২৫
ফজল মামুদ ক তামানে ব রামচাঁদ	০
মামুদ হোসেন ব আমেদ	৯
খান মহম্মদ নট আউট	৪
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগ বাই ১)	২
মোট	২৫৭

দ্বিতীয় ইনিংস

হানিফ মহম্মদ ক উমরিগড় ব ফাদকার	১৪
আলিমউদ্দিন ক বিকল্প ব গুপ্তে	৫১
ওয়াকার হাসান স্টাম্পড তামানে ব গুপ্তে	৫১
মকসুদ আমেদ ক মন্ত্রী ব গুপ্তে	১৬
ওয়াজির মহম্মদ রান আউট	০
ইমতিয়াজ আমেদ ক উমরিগড় ব গুপ্তে	৫
এ. এইচ. কারদার ক মন্ত্রী ব ফাদকার	৩
সুজাউদ্দিন রান আউট	১
ফজল মামুদ নট আউট	১৫

মামুদ হোসেন ক পাঞ্জাবী ব গুপ্তে ০
খান মহম্মদ রান আউট ০
অতিরিক্ত (লেগবাই ২) ২

১৫৮

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ২১ (আলিমুদ্দিন) ৭৪ (হানিফ) ৮৮ (ওয়াকার) ১২৫ (মকসুদ) ১৫৭ (উজির) ২০৭ (ইমতিয়াজ) ২২৭ (কারদার) ২২৭ (ফজল) ২৪০ (মামুদ হোসেন) ২৫৭ (সুজাউদ্দিন)।

দ্বিতীয় ইনিংস ২৪ (হানিফ) ১১৬ (ওয়াকার) ১২২ (আলিমুদ্দিন) ১৩৯ (সুজাউদ্দিন) ১৪০ (উজির) ১৬০ (মকসুদ) ১৪৮ (কারদার) ১৫৬ (মামুদ হোসেন) ১৫৮ (খান মহম্মদ)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ১৮-১১-২৪-১ ; রামচাঁদ ১৫-৭-১৯-২ , গোলাম আমেদ ৪৫-৮-১০৯-৫ : গুপ্তে ৪৬-১৪-৭৯-১ ; মানকড় ১২.২-৩-২৪-১।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ২৮.২-১১-৫৭-২ ; রামচাঁদ ১৯-১০-৩১-০ ; গুপ্তে ৬-০-১৭-৫ , মানকড় ১৮-৬-৩৪-০ ; উমরিগড় ১৫-৮-১৭০ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় ব হুসেন ০
পি. এল. পাঞ্জাবী ব খান মহম্মদ ২৬
এম. কে. মন্ত্রী ব হুসেন ০
ভি. এল. মঞ্জরেকর ব খান মহম্মদ ১৮
পি. আর উমরিগড় ক কারদার ব হুসেন ৩২
জি. এস. রামচাঁদ ক ইমতিয়াজ ব হুসেন ৩৭
ডি. জি. ফাদকার ক ইমতিয়াজ ব হুসেন ১১
ভি. মানকড় ক ইমতিয়াজ ব হুসেন ২
এন. এস. তামানে ব খান মহম্মদ ৫
গোলাম আমেদ ব খান মহম্মদ ২
এস. পি. গুপ্তে নট আউট ১
অতিরিক্ত (বাই ১২ নো বল ২) ১৪

মোট ১৪৮

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় নট আউট	৬৭
পি. এল. পাঞ্জাবী এল বি ডব্লু ব খান মহম্মদ	৩
এম. কে. মন্ত্রী ক ইমতিয়াজ ব খান মহম্মদ	২
ভি. এল. মঞ্জরেকর নট আউট	৭৪
অতিরিক্ত	০
মোট (২ উইকেট)	১৪৬

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ১০ (পঙ্কজ রায়) ১৯ (মন্ত্রী) ৪৫ (পাঞ্জাবী) ৫৬ (মঞ্জরেকর) ১১৫ (রামচাঁদ) ১২৯ (উমরিগড়) ১৩১ (মানকড়) ১৪৩ (ফাদকার) ১৪৫ (তামানে) ১৪৮ (গোলাম আমেদ)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১৫ (পাঞ্জাবী) ১৭ (মন্ত্রী)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফজল মামুদ ২৫-১৯-১৮-০ ; মামুদ হোসেন ২৭-৬-৬৭-৬ ; খান মহম্মদ ২৬'৫-১২-৪২-৪ ; সুজাউদ্দিন ৪-২-৭-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস : ফজল মামুদ ২৩-১১-৩৪-০ ; মামুদ হোসেন ৭-২-২১-০ ; খান মহম্মদ ১২-৫-১৮-২ ; সুজাউদ্দিন ১৪-৬-২৫-০ ; মকসুদ আমেদ ৩-১-৪-০ ; কারদার ১২-৪-১৭-০ ; হানিফ মহম্মদ ৫-১-১৪-০ ; আলিমউদ্দিন ৫-০-১৩-০ ; ইমতিয়াজ আমেদ ১-১-০-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : পাকিস্তান—এ. এইচ. কারদার

ভারত—ভি. মানকড়

দ্বিতীয় টেস্ট। ভাওয়ালপুর। ১৫-১৮ জানুয়ারি

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় ব ফজল মামুদ	০
পি. এল. পাঞ্জাবী ব খান মহম্মদ	১৮
ভি. মানকড় ক ইমতিয়াজ ব ফজল মামুদ	৬
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক হুসেন ব খান মহম্মদ	৫০

পি. আর উমরিগড় ব খান মহম্মদ	২০
জি. এস. রামচাঁদ ব হুসেন	৫৩
সি. ডি. গাদকারি এল. বি. ডব্লু ব খান মহম্মদ	২
সি. ডি. গোপীনাথ ক ওয়াকার ব ফজল মামুদ	০
এন. এস. তামানে নট আউট	৫৪
এস. পি. গুপ্তে ব খান মহম্মদ	১৫
গোলাম আমেদ ব ফজল মামুদ	৮
অতিরিক্ত (লেগবাই ৪ নো-বল ৫)	৯
মোট	২৩৫

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় ক কারদার ব খান মহম্মদ	৭৭
পি. এল. পাঞ্জাবী ক মকসুদ আমেদ ব হুসেন	৩৩
ভি. মানকড় ক ইমতিয়াজ ব ফজল মামুদ	১
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক ইমতিয়াজ ব ফজল মামুদ	৫৯
সি. ডি. গোপীনাথ ক মকসুদ ব খান মহম্মদ	৮
সি. ডি. গাদকারি নট আউট	৮
এন. এস. তামানে নট আউট	৯
অতিরিক্ত (বাই ১২ লেগ বাই ১ নো বল ১)	১৪
মোট (৫ উইকেট)	২০৯

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ০ (পঙ্কজ রায়) ১৬ (মানকড়) ৬১ (পাঞ্জাবী) ৯৩ (মঞ্জরেকর) ৯৫ (উমরিগড়) ১০০ (গাদকারি) ১০১ (গোপীনাথ) ১৮৯ (রামচাঁদ) ২০৫ (গুপ্তে) ২৩৫ (গোলাম আমেদ)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৫৮ (পাঞ্জাবী) ৬২ (মানকড়) ১৮৫ (মঞ্জরেকর) ১৮৯ (পঙ্কজ রায়) ১৯৩ (গোপীনাথ)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফজল মামুদ ৬২'৫-২৩-৮৬-৪ ; মামুদ হোসেন ২৫-৮-৫৬-১ ; খান মহম্মদ ৩৩-৭-৭৪-৫ ; সুজাউদ্দিন ৯-৪-১০-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ফজল মামুদ ২৮-৬-৫৮-২ ; মামুদ হোসেন ১৭-৩-৪৭-১ ; খান মহম্মদ ২২-৬-৫০-০ ; সুজাউদ্দিন ৮-৬-২-০ ; মকসুদ আমেদ ৭-৩-১৯-০ ; কারদার ৭-০-১৯-০ ।

পাকিস্তান

হানিফ মহম্মদ ক গাদকারি ব উমরিগড়	১৪২
আলিমউদ্দিন ব আমেদ	৬৪
ওয়াকার হুসেন ক গুপ্তে ব উমরিগড়	৪৮
মকসুদ আমেদ ক গাদকারি ব উমরিগড়	১০
ইমতিয়াজ আমেদ স্টাম্পড তামানে ব গুপ্তে	৩
এ. এইচ. কারদার ক পাঞ্জাবী ব উমরিগড়	১৩
ফজল মামুদ ব উমরিগড়	৯
মামুদ হুসেন ক গাদকারি ব উমরিগড়	০
সুজাউদ্দিন রান আউট	৭
ওয়াজির মহম্মদ নট আউট	৪
খান মহম্মদ নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ৬ লেগ বাই ৫)	১১
মোট (৯ উইকেট ডি.)	৩১২

উইকেট-পতন : ১২৭ (আলিমুদ্দিন) ২০০ (ওয়াকার) ২২৬ (মকসুদ) ২৫৮ (কারদার) ২৮৬ (ফজল) ২৮৬ (মামুদ হোসেন) ৩০১ (সুজাউদ্দিন) ৩১২ (হানিফ) ।

বোলিং : রামচাঁদ ১৩-৫-২৬-০ ; উমরিগড় ৫৯-২৫-৭৪-৬ ; গুপ্তে ১৭-৮-৪৯-১ ; গোলাম আমেদ ৩৬-৪-৬৩-১ ; মানকড় ৪০-১৯-৮৯-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : পাকিস্তান—এ. এইচ. কারদার

ভারত—ভি. মানকড়

তৃতীয় টেস্ট। লাহোর। ২৯-৩১ জানুয়ারি, ১ ফেব্রুয়ারি

পাকিস্তান : প্রথম ইনিংস

হানিফ মহম্মদ ক তামানে ব গুপ্তে	১২
আলিমউদ্দিন রান আউট	৩৮
ওয়াকার হাসান ক মানকড় ব গুপ্তে	৯
মকসুদ আমেদ স্টাম্পড তামানে ব গুপ্তে	৯৯
এ. এইচ. কারদার ক রামচাঁদ ব মানকড়	৪৪
ওয়াজির মহম্মদ এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	৫৫
ইমতিয়াজ আমেদ রান আউট	৫৫
সুজাউদ্দিন ক মানকড় ব আমেদ	৩
ফজল মামুদ স্টাম্পড তামানে ব গুপ্তে	১২
মামুদ হুসেন ব গুপ্তে	০
মিরান বক্স নট আউট	১
মোট	৩২৮

দ্বিতীয় ইনিংস

হানিফ মহম্মদ নট আউট	০
আলিমউদ্দিন ব মানকড়	৫৮
ওয়াকার হাসান ক তামানে ব মানকড়	১২
মকসুদ আমেদ ক পাঞ্জাবী ব মানকড়	১৫
ইমতিয়াজ আমেদ ক তামানে ব গুপ্তে	৯
সুজাউদ্দিন ক বিকল্প ব গুপ্তে	৪০
অতিরিক্ত (বাই ২)	২
মোট (৫ উইকেট ডি.)	১৩৬

উইকেট-পতন: প্রথম ইনিংস ৩২ (হানিফ) ৫৫ (ওয়াকার) ৬২ (আলিম-উদ্দিন) ১৯৮ (মকসুদ) ২০২ (কারদার) ২৮৬ (ইমতিয়াজ) ৩০২ (সুজাউদ্দিন) ৩২৭ (উজির) ৩২৭ (ফজল) ৩২৮ (মামুদ হোসেন)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৮৩ (সুজাউদ্দিন) ১০৯ (ওয়াকার) ১১২ (আলিমউদ্দিন) ১৩৫ (মকসুদ) ১৩৬ (ইমতিয়াজ)

বোলিং: প্রথম ইনিংস উমরিগড় ১৪-৪-২৩-০; রামচাঁদ ১০-৫-১২-০; গুপ্তে ৭৩.৫-৩২-১৩৩-৫, গোলাম আমেদ ৪৬-১১-৯৫-১, মানকড় ৪৪-২৫-৬৫-২।

দ্বিতীয় ইনিংস: রামচাঁদ ৬-১-২০-০; গুপ্তে ৩৬.৩-১১-৩৪-২; গোলাম আমেদ ১৪-২-৪৭-০, মানকড় ২৮-১৭-৩৩-৩।

ভারত: প্রথম ইনিংস

পি. রায় ব হুসেন	২৩
পি. এল. পাঞ্জাবী ব মিরান বক্স	২৭
সি. ভি. গাদকারি ব ফজল মামুদ	১৩
ভি. এল. মঞ্জরেকর ব মিরান বক্স	০
পি. আর. উমরিগড় ক হানিফ ব হুসেন	৭৮
জি. এস. রামচাঁদ ক মকসুদ ব ফজল মামুদ	১২
সি. ডি. গোপীনাথ ক ফজল ব সুজাউদ্দিন	৪১
ভি. মানকড় ক ইমতিয়াজ ব হুসেন	৩৩
এন. এস. তামানে ক ইমতিয়াজ ব হুসেন	০
গোলাম আমেদ ক ইমতিয়াজ ব ফজল মামুদ	০
এস. পি. গুপ্তে নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ১২ লেগবাই ১০ নো বল ২)	২৪
মোট	২৫১

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় ক ইমতিয়াজ ব কারদার	২৩
পি. এল. পাঞ্জাবী ক মকসুদ ব কারদার	১
সি. ভি. গাদকারি নট আউট	২৬
ভি. এল. মঞ্জরেকর নট আউট	২৩
অতিরিক্ত (নো বল ১)	১
মোট (২ উইকেট)	৭৪

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ৫২ (পঙ্কজ রায়) ৫৬ (পাঞ্জাবী) ৫৮ (মঞ্জরেকর) ৯১ (গাদকারি) ১১৭ (রামচাঁদ) ১৭৯ (গোপীনাথ) ২৪৩ (মানকড়) ২৪৩ (তামানে) ২৫১ (গোলাম আমেদ) ২৫১ (উমরিগড়)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৩ (পাঞ্জাবী) ৪০ (পঙ্কজ রায়) ।

বোলিং : প্রথম ইনিংস মামুদ হোসেন ২৬·১-৬-৭০-৪ ; ফজল মামুদ ৪৭ ২৪-৬২-৩ ; মিয়ানবক্স ৪৮-২০-৮২-২ ; সুজাউদ্দিন ৭-২-১৩-১ ।

দ্বিতীয় ইনিংস মামুদ হোসেন ১-০-১-০ ; ফজল মামুদ ১-০-২-০ ; সুজাউদ্দিন ৬-১-২০-২ ; আলিমউদ্দিন ৩-০-১২-০ ; হানিফ মহম্মদ ৩-০-৯-০ ; ওয়াজির মহম্মদ ২-০-৫-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : পাকিস্তান—এ. এইচ. কারদার

ভারত—ভি. মানকড়

চতুর্থ টেস্ট। পেশোয়ার। ১২-১৫ ফেব্রুয়ারি

পাকিস্তান : প্রথম ইনিংস

হানিফ মহম্মদ ক ফাদকার ব গুপ্তে	১৩
আলিমউদ্দিন ব রামচাঁদ	০
ওয়াকার হুসেন ক এবং ব গুপ্তে	৪৩
মকসুদ আমেদ ক পাঞ্জাবী ব ফাদকার	৩১

ইমতিয়াজ আমেদ ব ফাদকার	০
ওয়াজির মহম্মদ ব মানকড়	৩৪
এ. এইচ. কারদার ব গুপ্তে	১১
সুজাউদ্দিন ক তামানে ব গুপ্তে	৩৭
খান মহম্মদ ক মানকড় ব গোলাম	৪
মামুদ হোসেন নট আউট	৫
মিরান বক্স এল. বি. ডব্লু ব গুপ্তে	০
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগবাই ৪ নো বল ১)	১০
মোট	১৮৮

দ্বিতীয় ইনিংস

হানিফ ক এবং ব মানকড়	২১
আলিমউদ্দিন এল. বি. ডব্লু ব আমেদ	৪
ওয়াকার হুসেন এল. বি. ডব্লু ব গুপ্তে	১৬
মকসুদ আমেদ ক এবং ব মানকড়	৪৪
ইমতিয়াজ আমেদ ক পাঞ্জাবী ব মানকড়	৬৯
ওয়াজির মহম্মদ ব মানকড়	০
এ. এইচ. কারদার ব ফাদকার	০
সুজাউদ্দিন রান আউট	১১
খান মহম্মদ ক বিকল্প ব মানকড়	৩
মামুদ হোসেন স্টাম্পড তামানে ব ফাদকার	২
মিরান বক্স নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ৮ লেগবাই ৪)	১২
মোট	১৮২

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ২ (আলিমুদ্দিন) ৩১ (হানিফ) ৮১ (মকসুদ) ৮১ (ইমতিয়াজ) ৯৬ (ওয়াকার) ১১১ (কারদার) ১৭১ (উজির) ১৭৬ (খান মহম্মদ) ১৮৮ (সুজাউদ্দিন) ১৮৮ (মিরান বক্স)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১০ (আলিমুদ্দিন) ৫০ (ওয়াকার) ৬৮ (হানিফ) ৭০ (উজির) ৮৩ (মকসুদ) ১৫৬ (কারদার) ১৭৬ (সুজাউদ্দিন) ১৭৭ (ইমতিয়াজ) ১৮২ মামুদ হোসেন) ১৮২ (খান মহম্মদ) ।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ২৪-১৪-১৯-২ ; রামচাঁদ ৭-২-১৩-১ ; গুপ্তে ১'৩-২২-৬৩-৫ ; মানকড় ৬১-৩৪-৭১-১ ; গোলাম আমেদ ১৩-৭-১২-১ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ১৮-২-৪২-২ ; রামচাঁদ ২-১-৩-০ ; গুপ্তে ৩৫-১৬-৫২-১ ; নকড় ৫৪'১-২৬-৬৪-৫ ; গোলাম আমেদ ১৩-৯-৯-১ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় রান আউট	১৬
পি. এল. পাঞ্জাবী ব খান মহম্মদ	১৬
পি. আর. উমরিগড় রান আউট	১০৮
ভি. এল. মঞ্জরেকর রান আউট	৩২
সি. ভি. গাদকারি ক মকসুদ ব হুসেন	১৫
জি. এস. রামচাঁদ ক সুজা ব খান	১৮
ভি. মানকড় নট আউট	৩
এন. এস. তামানে রান আউট	০
ডি. জি. ফাদকার ব খান মহম্মদ	১৩
এস. পি. গুপ্তে ক ওয়াকার ব হুসেন	২
গোলাম আমেদ ব খান মহম্মদ	৮
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগবাই ৪ ওয়াইড ১ নো বল ৪)	১৪
মোট	২৪৫

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় নট আউট	১৩
পি. এল. পাঞ্জাবী ব হানিফ মহম্মদ	৬
পি. আর. উমরিগড়	৩
অতিরিক্ত (নো-বল ১)	১
মোট (১ উইকেট)	২৩

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ৩০ (পঙ্কজ রায়) ৪৪ (পাঞ্জাবী) ১৩৫ (মঞ্জরেকর) ১৮২ (গাদকারি) ২১০ (উমরিগড়) ২১৮ (রামচাঁদ) ২১৯ (তামানে) ২৩২ (ফাদকার ২৩৫ (গুপ্তে) ২৪৫ (গোলাম আমেদ)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১৯ (পাঞ্জাবী)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস খান মহম্মদ ৬৬-১৪-৭৯-৪ ; মামুদ হোসেন ৩৮-১১-৭৮-২ ; মিরান বক্স ৮-২-৩০-০ ; কারদার ১৯-৬-৩৪-০ ; মকসুদ আমেদ ৭-৩-১০-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস খান মহম্মদ ৪-১০-০-০ ; মামুদ হোসেন ২-১-২-০ ; মিরান বক্স ২-০-৩-০ ; কারদার ১-১-০-০ ; হানিফ মহম্মদ ৪-৩-১-১ ; মকসুদ আমেদ ৬-২-৬-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : পাকিস্তান—এ. এইচ. কারদার

ভারত—ভি. মানকড়

পঞ্চম টেস্ট। করাচী। ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১ মার্চ

পাকিস্তান : প্রথম ইনিংস

হানিফ মহম্মদ ক তামানে ব ফাদকার	২
আলিমউদ্দিন ক তামানে ব রামচাঁদ	৭
ওয়াকার হাসান ক উমরিগড় ব রামচাঁদ	১২
মকসুদ আমেদ ক তামানে ব রামচাঁদ	২২
ইমতিয়াজ আমেদ ক রামচাঁদ ব প্যাটেল	৩৭
ওয়াজির মহম্মদ ক ফাদকার ব প্যাটেল	২৩
এ. এইচ. কারদার ক তামানে ব রামচাঁদ	১৪
সুজাউদ্দিন ক মানকড় ব রামচাঁদ	০
ফজল মামুদ এল. বি. ডব্লু ব প্যাটেল	৩
খান মহম্মদ নট আউট	১৫
মামুদ হোসেন ক ফাদকার ব রামচাঁদ	১৪
অতিরিক্ত (বাই ১০ নো-বল ৩)	১৩
মোট	১৬২

দ্বিতীয় ইনিংস

আলিমউদ্দিন নট আউট	১০৩
সুজাউদ্দিন ব রামচাঁদ	৮
হানিফ মহম্মদ ক তামানে ব ফাদকার	২৮
মকসুদ আমেদ ক ভাণ্ডারী ব উমরিগড়	২
ইমতিয়াজ আমেদ রান আউট	১
এ. এইচ. কারদার স্টাম্পড তামানে ব গুপ্তে	৯৩
ওয়াকার হাসান নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগবাই ৩ নো-বল ১)	৫
মোট (৫ উইকেট)	২৪১

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ২ (হানিফ) ১৯ (ওয়াকার) ৩৭ (আলিমউদ্দিন) ৬৬ (মকসুদ) ৮৮ (ইমতিয়াজ) ১১৯ (কারদার) ১২২ (সুজাউদ্দিন) ১৩৬ (উজির) ১৩৫ (ফজল) ১৬২ (মামুদ হোসেন)।

দ্বিতীয় ইনিংস ২৫ (সুজাউদ্দিন) ৬৯ (হানিফ) ৭৭ (মকসুদ) ৮১ (ইমতিয়াজ) ২৩৬ (কারদার)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস রামচাঁদ ২৮-৯-৪৯-৬ ; ফাদকার ১০-৬-৭-১ ; প্যাটেল ৩৩-১২-৪৯-৩ ; গুপ্তে ১৫-৩-২৪-০ ; মানকড় ৫-০-১৬-০ ; উমরিগড় ৫-৩-৪-০।

দ্বিতীয় ইনিংস রামচাঁদ ১১-৪-২৭-১ ; ফাদকার ৩৪-৬-৯৪-০ ; প্যাটেল ৭-১-২২-০ ; গুপ্তে ৬-০-২৪-১ ; মানকড় ১-০-৩-০ ; উমরিগড় ২৮-৩-৬৬-২।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় ক কারদার ব খান মহম্মদ	৩৭
পি. এল. পাঞ্জাবী এল. বি. ডব্লু ব খান মহম্মদ	১২
পি. আর. উমরিগড় ব ফজল মামুদ	১৬
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক কারদার ব খান মহম্মদ	১৪
ভি. মানকড় ক মকসুদ ব ফজল মামুদ	৬
জি. এস. রামচাঁদ ক হানিফ ব ফজল মামুদ	১৫

এন. এস. তাম্হানে ব ফজল মামুদ	৯
পি. ভাণ্ডারী ব খান মহম্মদ	১৯
ডি. জি. ফাদকার নট আউট	৬
জে. প্যাটেল এল. বি. ডব্লু ব খান মহম্মদ	০
এস. পি. গুপ্তে ক সুজা ব ফজল মামুদ	১
অতিরিক্ত (লেগবাই ৭ নো-বল ৩)	১০
মোট	১৪৫

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় এল. বি. ডব্লু ব মকসুদ	১৬
পি. এল. পাঞ্জাবী ক ইমতিয়াজ ব ফজল	২২
পি. আর. উমরিগড় নট আউট	১৪
জি. এস. রামচাঁদ নট আউট	১২
অতিরিক্ত (লেগবাই ২ নো-বল ৩)	৫
মোট (২ উইকেট)	৬৯

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ২২ (পাঞ্জাবী) ৪৫ (উমরিগড়) ৬৮ (মঞ্জরেকর) ৮৯ (মানকড়) ৯৫ (পঙ্কজ রায়) ১১০ (তাম্হানে) ১৩১ (রামচাঁদ) ১৪৪ (ভাণ্ডারী) ১৪৪ (প্যাটেল) ১৪৫ (গুপ্তে)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৩৪ (পাঞ্জাবী) ৪৯ (পঙ্কজ রায়)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস খান মহম্মদ ৩০-৫-৭২-৫ ; মামুদ হোসেন ৭-০-১৪-০ ; ফজল মামুদ ২৭.৩-৬-৪৯-৫।

দ্বিতীয় ইনিংস খান মহম্মদ ৭-৫-৪-০ ; মামুদ হোসেন ৩-০-১৬-০ ; ফজল মামুদ ৯-৪-২২-১, হানিফ মহম্মদ ৬-১-১৭-০, মকসুদ আমেদ ৫-২-৫-১।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : পাকিস্তান—এ. এইচ. কারদার

ভারত—ভি. মানকড়

১৯৫৫-৫৬ : ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ড

নিউজিল্যাণ্ড এই প্রথম ভারতে সফরে এল। বস্তুত এই প্রথম ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট খেলা হল। এবং এই প্রথম ভারত ২—০ ম্যাচে টেস্ট সিরিজে জিতল। ভারতের পক্ষে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য দেখালেন বিনু মানকড। এক সিরিজে তিনি দুটি ডাবল সেঞ্চুরি করলেন। মানকড়ের আগে কোন ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যান টেস্টে ডাবল সেঞ্চুরি করতে পারেন নি। তাছাড়া পঙ্কজ রায়ের সহযোগিতায় মানকড় আরেকটি বিশ্ব রেকর্ড করলেন। পঞ্চম টেস্টের প্রথম ইনিংসে উভয় ব্যাটস্‌ম্যান প্রথম উইকেটে করলেন ৪১৩ রান। এ রেকর্ড এখনও অম্লান আছে। উমরিগড়ও একটি ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। এক সিরিজে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি ভারতীয় ব্যাটম্যানেরা আর কখনো করতে পারেন নি। বোলিংয়ে সব চাইতে সফল হলেন সুভাষ গুপ্তে।

নিউজিল্যাণ্ড হেরে গেলেও লড়াই করতে ছাড়ে নি। অধিনায়ক রীড এবং সাটক্লিফ ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য দেখালেন। ভারতীয়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাটক্লিফ একটি ডাবল সেঞ্চুরিও করলেন। বোলিংয়ে অবশ্য উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্য কেউ দেখাতে পারেন নি।

প্রথম টেস্ট। হায়দরাবাদ। ২০-২৪ নভেম্বর

ভারত

ভি. মানকড় ক অ্যালাবাস্টার ব ম্যাকগিবন	৩০
পি. রায় ক পেট্রি ব হেইস	০
পি. আর. উমরিগড় ক পেট্রি ব ম্যাকগিবন	২২৩
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক ম্যাকগিবন ব হেইস	১১৮
এ. জি. কৃপাল সিং নট আউট	১০০
জি. এস. রামচাঁদ নট আউট	১২
অতিরিক্ত (বাই ৮ লেগবাই ৪ নো-বল ৩)	১৫
মোট (৪ উইকেট ডি.)	৪৯৮

গুলাম আমেদ, এন. এস. তামানে, এস. পি. গুপ্তে,
ডি. জি. ফাদকার এবং ভি. এন. স্বামী ব্যাট করেন নি।

উইকেট-পতন: ১ (পঙ্কজ রায়) ৪৮ (মানকড়) ২৮৬ (মঞ্জরেকর) ৪৫৭ (উমরিগড়)।

বোলিং: হেইস ২৬-৫-৯১-৩ ; ম্যাকগিবন ৪৩'১-১৫-১০-১ ; রীড ১৬-২-৬৩-০ ; কেভ ৪১-২০-৫৯-০ ; অ্যালাবাস্টার ৩০-৫-৯৪-০ ; পুওর ৯-২-৩৬-০ ; সাটক্লিফ ১০-১-৬৮-০।

নিউজিল্যাণ্ড: প্রথম ইনিংস

বি. সাটক্লিফ ক উমরিগড় ব গুপ্তে	১৭
ই. সি. পেট্রি ব গুপ্তে	১৫
জে. ডবলিউ. গাই ক আমেদ ব মানকড়	১০২
জে. আর. রীড এল. বি. ডব্লু ব রামচাঁদ	৫৪
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর স্টাম্পড তামানে ব গুপ্তে	১৯
এন. এস. হারফোর্ড এল. বি. ডব্লু ব গুপ্তে	৪
এ. আর. ম্যাকগিবন ক কৃপাল সিং ব আমেদ	৫৯
এম. বি. পুওর এল. বি. ডব্লু ব গুপ্তে	২৩
এইচ. বি. কেভ স্টাম্পড তামানে ব গুপ্তে	১৪
জে. সি. অ্যালাবাস্টার এল বি. ডব্লু ব গুপ্তে	১১
জে. এ. হেইস নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ২ লেগবাই ৫)	৭
মোট	৩২৬

দ্বিতীয় ইনিংস

বি. সাটক্লিফ নট আউট	১৩৭
ই. সি. পেট্রি এল. বি. ডব্লু ব গুপ্তে	৪
জে. ডব্লু. গাই ক আমেদ ব মানকড়	২১
জে. আর. রীড নট আউট	৪৫
অতিরিক্ত (বাই ২ লেগ বাই ২ নো বল ১)	৫
মোট (২ উইকেট)	২১২

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ২১ (সাটক্লিফ) ৩৬ (পেট্রি) ১১৯ (রীড) ১৫৪ (ম্যাকগ্রেগর) ১০৬ (হারফোর্ড) ২৫৩ (গাই) ২৯২ (পুওর) ৩০৫ (ম্যাকগিবন) ৩২৫ (কেভ) ৩২৬ (অ্যালাবাস্টার)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৪২ (পেট্রি) ১০৪ (গাই)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ২৫-১১-৩৩-০ ; স্বামী ৮-২-১৫-০ ; গুপ্তে ৭৬'৪-৩৫-১২৮-৭ ; গোলাম আমেদ ৩৯-১৫-৫৬-১ ; মানকড় ৩৬-১৬-৪৮-১ ; রামচাঁদ ২০-১২-৩৩-১ ; কৃপাল সিং ১-০-৫-০ ; উমরিগড় ৪-৪-০-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ১২-৫-২৫-০ ; স্বামী ১০-২-৩৫-০ ; গুপ্তে ১৮-৭-২৮-১ ; গোলাম আমেদ ১৩-২-৩৬-০ ; ভি. মানকড় ২৫-৭-৭৪-১ ; রামচাঁদ ১৪-৭-১৪-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ভারত—গোলাম আমেদ

নিউজিল্যাণ্ড—এইচ. বি. কেভ

দ্বিতীয় টেস্ট। বোম্বাই। ৩-৭ ডিসেম্বর

ভারত

ভি. মানকড় ক বিকল্প ব পুওর	২২৩
ভি. মেহরা ক হ্যারিস ব হেইস	১০
পি. আর. উমরিগড় ব কেভ	১৫
ভি. এল. মঞ্জরেকর ব অ্যালাবাস্টার ব কেভ	০
এ. জি. কৃপাল সিং ব কেভ	৬৩
জি. এস. রামচাঁদ ব ম্যাকগিবন	২২
এন. জে. কন্ট্রাক্টর ক পেট্রি ব ম্যাকগিবন	১৬
ডি. জি. ফাদকার নট আউট	৩৮
এন. এস. তামানে ব পুওর	১০
এস. আর. পাতিল নট আউট	১৪
অতিরিক্ত (লেগ বাই ৩ নো-বল ৮)	১১
মোট (৮ উইকেট ডি.)	৪২১

এস. পি. গুপ্তে ব্যাট করেননি।

উইকেট পতন: ৩৬ (মেহরা) ৬১ (উমরিগড়) ৬৩ (মঞ্জরেকর) ২৩০ (কৃপাল সিং) ২৮১ (রামচাঁদ) ৩৪৭ (কনট্রাক্টর) ৩৬৫ (মানকড়) ৩৭৭ (তামানে)।

বোলিং: হেইস ২৬-৪-৭৯-১; ম্যাকগিবন ২৩-৬-৫৬-২; কেভ ৪০-২৩-৭৭-৩; রীড ৩-১-৬-০; অ্যালাবাস্টার ১৫-৪-৮৩-০; ময়ের ১২-২-৫১-০; পুওর ১৯-৩-৪৯-২; সাটক্লিফ ২-০-৯-০।

নিউজিল্যাণ্ড: প্রথম ইনিংস

বি. সাটক্লিফ ক গুপ্তে ব রামচাঁদ	৭০
ই. সি. পেট্রি এল বি ডব্লু ব গুপ্তে	৪
জে. ডব্লু. গাই ক গুপ্তে ব রামচাঁদ	২৩
জে. আর. রীড এল বি ডব্লু ব পাতিল	৩৯
পি. জি. জেড হ্যারিস এল বি ডব্লু ব গুপ্তে	১৯
এ. আর ম্যাকগিবন ক মানকড় ব ফাদকার	৫৬
এম. বি. পুওর ক উমরিগড় ব ফাদকার	১৭
এইচ. বি. কেভ রান আউট	১২
এ. এম. ময়ের এল বি ডব্লু ব গুপ্তে	০
জে. সি. অ্যালাবাস্টার ব মানকড়	১৬
জে. এ. হেইস নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ৩ লেগ বাই ২ ওয়াইড ৪)	৯
মোট	২৫৮

দ্বিতীয় ইনিংস

বি. সাটক্লিফ ক মানকড় ব গুপ্তে	৩৭
ই. সি. পেট্রি ক গুপ্তে ব ফাদকার	৪
জে. ডব্লু. গাই এল বি ডব্লু ব গুপ্তে	২
জে. আর. রীড ক ফাদকার ব পাতিল	৪
পি. জি. জেড. হ্যারিস ক তামানে ব মানকড়	৭

এ. আর. ম্যাকগিবন ক পাতিল ব গুপ্তে	২৫
এম. বি. পুওর ব মানকড়	১০
এইচ. বি. কেভ ক উমরিগড় ব মানকড়	১১
এ. এম. ময়ের ক মঞ্জরেকর ব গুপ্তে	২৮
জে. সি. অ্যালাবাস্টার ব গুপ্তে	৪
জে. এ. হেইস নট আউট	০
অতিরিক্ত	৫
মোট	১৩৬

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ২১ (পেট্রি) ৯৪ (সাটক্লিফ) ১৩৩ (গাই) ১৫৬ (রীড) ১৬৬ (হ্যারিস) ২১৮ (ম্যাকগিবন) ২৩১ (পুওর) ২৩২ (ময়ের) ২৫৮ (কেভ) ২৫৮ (অ্যালাবাস্টার)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১৩ (পেট্রি) ২২ (গাই) ৩৩ (রীড) ৪৫ (হ্যারিস) ৬৭ (সাটক্লিফ) ৬৮ (পুওর) ৮৬ (ম্যাকগিবন) ১১৭ (কেভ) ১৩৬ (ময়ের) ১৩৬ (অ্যালাবাস্টার)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ২৮-১০-৫৩-২ ; এস. আর. পাতিল ১৪-৩-৩৬-১ ; গুপ্তে ৫১-২৬-৮৩-৩৫ ; রামচাঁদ ৩১-১৫-৪৮-২ ; মানকড় ১০'১-৩-২৯-১।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ৬-৪-৫-১ ; পাতিল ৯ ৪-১৫-১ ; গুপ্তে ৩২-১৯-৪৫-৫ ; রামচাঁদ ৬-৪-৯-০ ; মানকড় ২৪-৮-৫৭-৩।

ভারত এক ইনিংস ও ২৭ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—পি. আর. উমরিগড়

নিউজিল্যাণ্ড—এইচ. বি. কেভ

তৃতীয় টেস্ট। নিউ দিল্লি। ১৬-২১ ডিসেম্বর

নিউজিল্যাণ্ড : প্রথম ইনিংস

জে. জি. লেগাট ক মঞ্জরেকর ব গুপ্তে	৩৭
বি. সাটক্লিফ নট আউট	২৩০

জে. ডবলিউ. গাই ক মেহরা ব সুন্দরম	৫২
জে. আর. রীড নট আউট	১১৯
অতিরিক্ত (বাই ৭ লেগ বাই ৫)	১২
মোট (২ উইকেট ডি.)	৪৫০

দ্বিতীয় ইনিংস

জে. জি. লেগাট নট আউট	৫০
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর ক ভাণ্ডারী ব মঞ্জরেকর	৪৯
জে. ডবলিউ. গাই নট আউট	১০
অতিরিক্ত (বাই ৩)	৩
মোট (১ উইকেট)	১১২

এস. এন. ম্যাকগ্রেগর, এ. আর. ম্যাকগিবন, এম. বি. পুওর, এইচ. বি. কেভ, জে. সি. অ্যালাবাস্টার, টি. জি. ম্যাকমেহন এবং জে. এ. হেইস ব্যাট করেননি।

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৯৮ (লেগাট) ২২৮ (গাই)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১০১ (ম্যাকগ্রেগর)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস সুন্দরম ৩৯-৫-৯৯-১ ; রামচাঁদ ৩৮-১১-৮২-০ ; গুপ্তে ৩৯-১০-৯৮-১ ; নাদকার্নি ৫৪-১৩-১৩২-০ ; ভাণ্ডারী ৬-০-২৭-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস সুন্দরম ৩-০-৬-০ ; রামচাঁদ ৩-০-১১-০ ; গুপ্তে ৬-১-২২-০ ; ভাণ্ডারী ৭-২-১২-০ ; মঞ্জরেকর ২০-১৩-১৫-১ ; কৃপাল সিং ৭-৩-১০-০ ; কন্ট্রাক্টর ৬-১-১৯-০ ; মেহরা ৩-০-৩-০ ; নাদকার্নি ৩-১-১১-০ ।

ভারত

বিজয় মেহরা ক ম্যাকমেহন ব হেইস	৩২
এন. জে. কন্ট্রাক্টর ব রীড	৬২
পি. আর. উমরিগড় ব ম্যাকগিবন	১৮
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক ম্যাকমেহন ব কেভ	১৭৭

এ. জি. কৃপাল সিং ব হেইস	৩৬
জি. এস. রামচাঁদ স্টাম্পড ম্যাকমেহন ব পুওর	৭২
আর. জি. নাদকার্নি নট আউট	৬৮
পি. ভাণ্ডারী ব ম্যাকগিবন	৩৯
অতিরিক্ত (বাই ১৬ লেগ বাই ৪ নো বল ৭)	২৭
মোট (৭ উইকেট ডি.)	৫৩১

সুন্দরম, এন. এস. তাম্হানে, এস. পি. গুপ্তে ব্যাট করেন নি।

উইকেট-পতন : ৬৮ (মেহরা) ১১২ (উমরিগড়) ১১৯ (কনট্রাকটর) ২০৮ (কৃপাল সিং) ৩৩৫ (রামচাঁদ) ৪৫৮ (মঞ্জরেকর) ৫৩১ (ভাণ্ডারী)।

বোলিং : ম্যাকগিবন ৬৫-১৬-১২২-২ ; কেভ ৫১-২৯-৬৭-১ ; হেইস ৪৪-৯-১০৫-২ ; রীড ৪১-১৪-৮৬-১ ; অ্যালাবাস্টার ২৪-৯-৯০-০ ; পুওর ১৫-৪-২৯-১ ; সাটক্লিফ ৩-০-৯-০।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ভারত—পি. আর. উমরিগড়

নিউজিল্যাণ্ড—এইচ. বি. কেভ।

চতুর্থ টেস্ট। কলকাতা। ২৮, ২৯, ৩১ ডিসেম্বর, ১, ২ জানুয়ারি

ভারত : প্রথম ইনিংস

ভি. ম্যানকড় ক ম্যাকমেহন ব রীড	২৫
এন. জে. কণ্ট্রাক্টর ব হেইস	৬
পি. রায়. ব হেইস	২৮
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক রীড ব কেভ	১
পি. আর. উমরিগড় রান আউট	১
জি. এস. রামচাঁদ রান আউট	১
জে. এম. ঘোরপাড়ে ব অ্যালাবাস্টার	৩৯

ডি. জি. ফাদকার রান আউট	০
সি. টি. পতঙ্কর ব রীড	১৩
জি. সুন্দরম নট আউট	৩
এস. পি. গুপ্তে ব অ্যালাবাস্টার	৪
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগবাই ২ নো-বল ৫)	১১
মোট	১৩২

দ্বিতীয় ইনিংস

ভি. মানকড় ক ম্যাকগিবন ব রীড	১৭
এন. জে. কন্ট্রাক্টর ব হেইস	৬১
পি. রায় এল. বি. ডব্লু ব কেভ	১০০
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক ম্যাকগিবন ব রীড	৯০
পি. আর. উমরিগড় ব ম্যাকগিবন	১৫
জি. এস. রামচাঁদ নট আউট	১০৬
জে. এম. ঘোরপাড়ে ক সাটক্লিফ ব কেভ	৪
ডি. জি. ফাদকার ব হেইস	১৭
সি. টি. পতঙ্কর নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ৯ লেগ বাই ১০ নো বল ৮)	২৭
মোট (৭ উইকেট ডি.)	৪৩৮

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ১৩ (কনট্রাকটর) ৪১ (মানকড়) ৪২ (মঞ্জরেকর) ৪৭ (উমরিগড়) ৪৯ (রামচাঁদ) ৮৬ (পঙ্কজ রায়) ৮৮ (ফাদকার) ১২৫ (পতঙ্কর) ১২৫ (ঘোরপাড়ে) ১৩২ (গুপ্তে)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৪০ (মানকড়) ১১৯ (কনট্রাকটর) ২৬৩ (পঙ্কজ রায়) ২৮৭ (উমরিগড়) ৩৩১ (মঞ্জরেকর) ৩৭০ (ঘোরপাড়ে) ৪২৪ (ফাদকার)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস জে. এ. হেইস ১৪-৬-৩৮-২ ; ম্যাকগিবন ১৩-৩-২৭-০ ;

এইচ. বি. কেভ ১৪-৬-২৯-১ ; জে. আর. রীড ১৬-৯-১৯-৩ ; জে. সি. অ্যালাবাস্টার ২.৩-০-৮-২।

দ্বিতীয় ইনিংস জে. এ. হেইস ৩০-৪-৬৭-২ ; ম্যাকগিবন ৪৩-১৬-৯২-১ ; এইচ. বি. কেভ ৫৭-২৪-৮৫-২ ; জে. আর. রীড ৪৫-২১-৮৭-২ ; জে. সি. অ্যালাবাস্টার ২৭-৭-৫২-০ ; বি. সাটক্লিফ ৭-০-২৮-০।

নিউজিল্যাণ্ড : প্রথম ইনিংস

জে. জি. লেগাট ক পতঙ্কর ব সুন্দরম	১
বি. সাটক্লিফ ক পতঙ্কর ব রামচাঁদ	২৫
জে. ডবলিউ. গাই এল. বি. ডব্লু ব গুপ্তে	৯১
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর ব গুপ্তে	৬
জে. আর রীড ব সুন্দরম	১২০
এ. আর. ম্যাকগিবন স্টাম্পড পতঙ্কর ব গুপ্তে	২৩
এইচ. বি. কেভ ক উমরিগড় ব গুপ্তে	৫
এন. এস. হারফোর্ড ক মানকড় ব রামচাঁদ	২৫
জে. সি. অ্যালাবাস্টার ক পতঙ্কর ব গুপ্তে	১৮
জে. এ. হেইস ব গুপ্তে	১
টি. জি. ম্যাকমেহন নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ৮ লেগবাই ২ নো-বল ৩)	১৩
মোট	৩৩৬

দ্বিতীয় ইনিংস

জে. জি. লেগাট ক মানকড়	৭
বি. সাটক্লিফ এল. বি. ডব্লু ব গুপ্তে	৫
জে. ডবলিউ গাই ব ফাদকার	০
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর ব মানকড়	২০

জে. আর. রীড ব মানকড়	৫
এ. আর. ম্যাকগিবন নট আউট	২১
এইচ. বি. কেভ নট আউট	৪
এন. এস. হারফোর্ড ক ফাদকার ব গুপ্তে	১
অতিরিক্ত (বাই ১ নো-বল ১)	২
মোট (৬ উইকেট)	৭৪

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ২৫ (লেগাট) ৫৫ (সাটক্লিফ) ২৩৯ (গাই) ২৫৫ (ম্যাকগ্রেগর) ২৮২ (রীড) ৩০০ (ম্যাকগিবন) ৩১০ (কেভ) ৩১৮ (হারফোর্ড) ৩৩৩ (হেইস) ৩৩৬ (অ্যালাবাস্টার)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৮ (লেগাট) ৯ (গাই) ৩৭ (ম্যাকগ্রেগর) ৪২ (সাটক্লিফ) ৪৭ (রীড) ৫৫ (হারফোর্ড)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ডি. জি. ফাদকার ৩৫-৯-৭৬-০ ; জি. সুন্দরম ২১-৬-৪৬-২ ; এস.পি. গুপ্তে ৩৩.৫-৭-৯০-৬ ; জি.এস. রামচাঁদ ৩৭-১৫-৬৪-২, ভি মানকড় ১-০-৯-০ ; ঘোরপাড়ে ১-০-১৭-০ ; পি. আর উমরিগড় ১৭-৭-২১-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ডি জি. ফাদকার ৫-১-১১-২ ; জি. সুন্দরম ৩-১-১৩-০ ; এস. পি. গুপ্তে ১৪-৮-৩০-০ ; জি. এস রামচাঁদ ১-০-৪-০ ; ভি. মানকড় ১৩-৮-১৪-২ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ভারত—পি. আর. উমরিগড়

নিউজিল্যাণ্ড—এইচ. বি. কেভ

পঞ্চম টেস্ট। মাদ্রাজ। ৬-৮, ১০-১১ জানুয়ারি

ভারত

ভি. মানকড় ক কেভ ব ময়ের	২৩১
পি. রায় ব পুওর	১৭৩
পি. আর উমরিগড় নট আউট	৭৯

জি. এস. রামচাঁদ এল. বি. ডব্লু ব ম্যাকগিবন	২১
ভি. এল. মঞ্জরেকর নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ১৮ লেগবাই ১১ নো বল ৪)	৩৩
মোট (তিন উইকেট ডি.)	৫৩৭

এ. জি. কৃপাল সিং, এন. জে. কনট্রাকটর, এস. পি. গুপ্তে, এন. এস. তামানে, জাসু প্যাটেল, ডি. জি. ফাদকার ব্যাট করেন নি।

উইকেট-পতন : ৪১৩ (পঙ্কজ রায়) ৪৪৯ (মানকড়) ৫৩৭ (রামচাঁদ)।

বোলিং : হেইস ৩১-২-৯৪-০ ; ম্যাকগিবন ৩৮-৯-৯৭-১ ; কেভ ৪৪-১৬-৯৫-০ ; রীড ৭-৩-১০-০ ; ময়ের ২৬-১-১১৪-১ , পুওর ৩১-৫-৯৫-১।

নিউজিল্যাণ্ড : প্রথম ইনিংস

জে. সি. লেগাট এল. বি. ডব্লু ব ফাদকার	৩১
বি. সাটক্লিফ ক উমরিগড় ব প্যাটেল	৪৭
জে. আর. রীড ব প্যাটেল	৪৪
জে. ডবলিউ. গাই ক উমরিগড় ব গুপ্তে	৩
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর ক ফাদকার ব গুপ্তে	১০
এ. আর. ম্যাকগিবন ক ফাদকার ব গুপ্তে	০
এম. বি. পুওর এল. বি. ডব্লু ব গুপ্তে	১৫
এ. এম. ময়ের ক উমরিগড় ব প্যাটেল	৩০
এইচ. বি. কেভ ক রায় ব গুপ্তে	৯
টি. এস. ম্যাকমেহন নট আউট	৪
জে. এ. হেইস অনুপস্থিত	০
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগবাই ১০ নো-বল ২)	১৬
মোট	২০৯

দ্বিতীয় ইনিংস

জে. সি. লেগাট ক তামানে ব মানকড়	৬১
বি. সাটক্লিফ ক এবং ব গুপ্তে	৪০

জে. আর. রীড ক উমরিগড় ব গুপ্তে	৬৩
জে. ডবলিউ. গাই স্টাম্পড তামানে ব গুপ্তে	৯
এস. এন. ম্যাকগ্রেগর ক গুপ্তে ব মানকড়	১২
এ. আর. ম্যাকগিবন এল. বি. ডব্লু ব প্যাটেল	০
এম. বি. পুওর ব মানকড়	১
এ. এম. ময়ের ক রামচাঁদ ব মানকড়	১
এইচ. বি. কেভ নট আউট	২২
টি. এস. ম্যাকমেহন ব গুপ্তে	০
জে. এ. হেইস অনুপস্থিত	০
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগবাই ৮ নো-বল ১)	১০
মোট	২০৯

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ৭৫ (লেগাট) ১০৯ (সাটক্লিফ) ১২১ (গাই) ১৪১ (ম্যাকগ্রেগর) ১৪৪ (ম্যাকগিবন) ১৪৫ (রীড) ১৯০ (পুওর) ২০১ (ময়ের) ২০৯ (কেভ)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৮৯ (সাটক্লিফ) ১১৪ (গাই) ১১৬ (লেগাট) ১১৭ (ম্যাকগিবন) ১৪৭ (ম্যাকগ্রেগর) ১৪৮ (পুওর) ১৫১ (ময়ের) ২১৯ (রীড) ২১৯ (ম্যাকমেহন)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ফাদকার ১৪-৪-২৫-১ ; রামচাঁদ ৪-৩-১-০ ; গুপ্তে ৪৯-২৬-৭২-৫ ; মানকড় ১৯-১০-৩২-০ ; জাসু প্যাটেল ৪৫-২৩-৬৩-৩।

দ্বিতীয় ইনিংস ফাদকার ২৮-১৩-৩৩-০ ; রামচাঁদ ৮-৫-১০-০ ; গুপ্তে ৩৬·৩-১৪-৭৩-৪ ; মানকড় ৪০-১৪-৬৫-৪ ; জাসু প্যাটেল ১৮-৭-২৮-১।

ভারত এক ইনিংস ও ১০৯ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—পি. আর. উমরিগড়

নিউজিল্যাণ্ড—এইচ. বি. কেভ

১৯৫৬— ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

আগের সিরিজে নানারকম রেকর্ড করে নিউজিল্যাণ্ডকে বিধ্বস্ত করেছিল ভারত। তাই অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরার পথে যখন তিন টেস্টের সিরিজ খেলবার জন্য

ভারতে এস, ক্রিকেট অনুরাগীরা ভেবেছিলেন ভারত জোর লড়বে। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার মনোবল তখন পাতালে গিয়ে ঠেকেছে। কেননা ইংল্যাণ্ডে তাঁরা লক-লেকারের বলে নাজেহাল হয়ে হেরে এসেছেন। এদলের বিরুদ্ধে লেকার একটি টেস্টে পেয়েছেন ১৯টি উইকেট। স্পিন বলে অস্ট্রেলিয়ার বিপর্যয় দেখে ভাবা গিয়েছিল স্পিন-কুশলী ভারতও তাঁদের নাচাবে। ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরার পথে পাকিস্তানেও হেরে এসেছেন তাঁরা। অথচ খেলার মাঠে দেখা গেল অন্য চেহারা। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংস থেকেই ভারত হেরে যাওয়ার মনোভঙ্গী নিয়ে খেলতে লাগল। তিনটি খেলায় এমন একবারও আসেনি কখন মনে মনে হয়েছে অস্ট্রেলিয়া সামান্য কোনঠাসা হয়েছে। অধিনায়ক উমরিগড়ের নেতিবাচক মনোভাব এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যর্থতাকে এর জন্য দায়ী করা যায়।

প্রথম টেস্ট। মাদ্রাজ। ১৯-২০, ২২-২৪ অক্টোবর

ভারত : প্রথম ইনিংস

ভি. মানকড় ক ম্যাকডোনাল্ড ব বেনো	২৭
পি. রায় ক হারভে ব বেনো	১৩
পি. আর. উমরিগড় ক ক্রেগ ব বেনো	৩১
ভি. এল. মঞ্জরেকর এল. বি. ডব্লু ব বেনো	৪১
জি. এস. রামচাঁদ ব ক্রফোর্ড	
এইচ. আর. অধিকারী ক বার্ক ব ক্রফোর্ড	৫
এ. জি. কৃপাল সিং ক হারভে ব ক্রফোর্ড	১৩
এন. এস. তামানে নট আউট	৯
জে. প্যাটেল ক জনসন ব বেনো	৩
গোলাম আমেদ ক হারভে ব বেনো	১১
এস. পি. গুপ্তে ক ম্যাকডোনাল্ড ব বেনো	৪
অতিরিক্ত (লেগবাই ৪)	৪
মোট	১৬১

দ্বিতীয় ইনিংস

ভি. মানকড় ক ল্যাংলি ব লিণ্ডওয়াল	১১
পি. রায় ক হারভে.ব লিণ্ডওয়াল	৯
পি. আর. উমরিগড় ব ল্যাংলি ব লিণ্ডওয়াল	২৫
ভি. এল. মঞ্জরেকর ব ক্রফোর্ড	১৬
জি. এস. রামচাঁদ এল. বি. ডব্লু ব জনসন	২৮
এইচ. আর. অধিকারী এল. বি. ডব্লু ব লিণ্ডওয়াল	০
এ. জি. কৃপাল সিং নট আউট	২০
এন. এস. তামানে ক ক্রফোর্ড ব বেনো	৫
জে. প্যাটেল ব লিণ্ডওয়াল	১
গোলাম আমেদ ক বার্জ ব লিণ্ডওয়াল	১৩
এস. পি. গুপ্তে ব লিণ্ডওয়াল	৮
অতিরিক্ত (বাই ১০ লেগবাই ৫ নো-বল ৩)	১৮
মোট	১৫৩

উইকেট-পতন: প্রথম ইনিংস ৪১ (মানকড়) ৪৪ (পঙ্কজ রায়) ৯৭ (উমরিগড়) ৯৮ (রামচাঁদ) ১০৬ (অধিকারী) ১৩৪ (মঞ্জরেকর) ১৩৪ (কৃপাল সিং) ১৩৭ (প্যাটেল) ১৫১ (গোলাম আমেদ) ১৬১ (গুপ্তে)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১৮ (পঙ্কজ রায়) ২২ (মানকড়) ৩৯ (মঞ্জরেকর) ৬৩ (উমরিগড়) ৯৯ (রামচাঁদ) ১০০ (অধিকারী) ১১৩ (তামানে) ১১৯ (প্যাটেল) ১৪৩ (গোলাম আমেদ) ১৫৩ (গুপ্তে)।

বোলিং: প্রথম ইনিংস লিণ্ডওয়াল ৯-১-১৫-০ ; ক্রফোর্ড ৫৬-৮-৩২-৩ ; ম্যাকাই ২০-৯-২৫-০ ; জনসন ১৫-১০-১৩-০ ; বেনো ২৯·৩-১০-৭২-৭।

দ্বিতীয় ইনিংস লিণ্ডওয়াল ২২·৫-৯-৪৩-৭ ; ক্রফোর্ড ১২-৬-১৮-১ ; বেনো ২০-৫-৫৯-১ ; জনসন ৯-৫-১৫-১।

অস্ট্রেলিয়া

সি. সি. ম্যাকডোনাল্ড স্টাম্পড তামানে ব মানকড়	২৯
জে. বার্ক ক তামানে ব গুপ্তে	১০
এন. হারভে ব মানকড়	৩৭

আই. ক্রেগ ক রামচাঁদ ব মানকড়	৪০
পি. বার্জ এল. বি. ডব্লু ব প্যাটেল	৩৫
কে. ম্যাকাই ক তামানে ব আমেদ	২৯
আর. বেনো ব আমেদ	৬
আর. লিণ্ডওয়াল ক অধিকারী ব গুপ্তে	৮
আই. জনসন ক রায় ব গুপ্তে	৭৩
পি. ক্রফোর্ড স্টাম্পড তামানে ব মানকড়	৩৪
জি. ল্যাংলি নট আউট	১০
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগবাই ৩)	৮
মোট	৩১৯

উইকেট-পতন : ১২ (বার্ক) ৫৮ (ম্যাকডোনাল্ড) ৯৭ (হার্ভে) ১৫২ (ক্রেগ) ১৮৬ (বার্জ) ১৮৬ (ম্যাকাই) ১৯৮ (লিণ্ডওয়াল) ২০০ (বেনো) ২৮৭ (ক্রফোর্ড) ৩১৯ (জনসন)।

বোলিং : রামচাঁদ ৫-১-১২-০ ; উমরিগড় ৪-০-১৭-০ ; গুপ্তে ২৮·৩-৬-৮৯-৩ ; গোলাম আমেদ ৩৮-১৭-৬৭-২ ; মানকড় ৪৫-১৫-৯০-৪ ; প্যাটেল ১৪-৭-৩৬-১ ।

অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৫ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—পি. আর. উমরিগড়

অস্ট্রেলিয়া—আই. জনসন

দ্বিতীয় টেস্ট। বোম্বাই। ২৬-২৭, ২৯-৩১ অক্টোবর

ভারত : প্রথম ইনিংস

ভি. মানকড় ক বার্জ ব লিণ্ডওয়াল	০
পি. রায় ক বার্জ ব ক্রফোর্ড	৩১
পি. আর. উমরিগড় ব ক্রফোর্ড	৮
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক হারভে ব বেনো	৫৫
জে. এম. ঘোরপাড়ে ব ক্রফোর্ড	০

জি. এস. রামচাঁদ ক বিকল্প ব ম্যাকাই	১০৯
ডি. জি. ফাদকার ক ম্যাডকস ব বেনো	১
এইচ. আর. অধিকারী ক ডেভিডসন ব ম্যাকাই	৩৩
এন. এস. তামানে ক হারভে ব ডেভিডসন	৫
জে. প্যাটেল ক ম্যাডকস ব ম্যাকাই	৬
এস. পি. গুপ্তে নট আউট	০
অতিরিক্ত (লেগবাই ১ নো-বল ২)	৩
মোট	২৫১

দ্বিতীয় ইনিংস

ভি. মানকড় ক বার্ক ব বেনো	১৬
পি. রায় ক ম্যাডকস ব বেনো	৭৯
পি. আর. উমরিগড় ক এবং ব লিণ্ডওয়াল	৭৮
ভি. এল. মঞ্জরেকর ব রাদারফোর্ড	৩০
জে. এম. ঘোরপাড়ে ক ম্যাডকস ব উইলসন	১৬
জি. এস. রামচাঁদ নট আউট	৩
ডি. জি. ফাদকার নট আউট	২২
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগবাই ১ নো বল ৪)	৬
মোট (৫ উইকেট)	২৫০

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ০ (মানকড়) ১৮ (উমরিগড়) ৭৪ (পঙ্কজ রায়) ৭৪ (ঘোরপারে) ১৩০ (মঞ্জরেকর) ১৪০ (ফাদকার) ২৩৫ (অধিকারী) ২৪০ (তামানে) ২৫১ (রামচাঁদ) ২৫১ (প্যাটেল)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৩১ (মানকড়) ১২১ (পঙ্কজ রায়) ১৯১ (মঞ্জরেকর) ২১৭ (উমরিগড়) ২৪২ (রামচাঁদ)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস লিণ্ডওয়াল ২২-৭-৬০-১ ; ক্রফোর্ড ২-৩-২৮-৩ ; ডেভিডসন ২৯-২-২৪-১ ; বেনো ২৫-৭-৫৪-২ ; ম্যাকাই ১৪·২-৫-২৭-৩ ; উইলসন ১৫-৬-৩৯-০ ; বার্ক ২-০-১২-০ ; রাদারফোর্ড ১-০-৪-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস লিণ্ডওয়াল ২৩-৯-৪০-১ ; ডেভিডসন ১৪-৯-১৮-০ ; ম্যাকাই ১৭-৬-২২-০ ; বেনো ৪২-১৫-৯৮-২ ; উইলসন ২১-১১-২৫-১ ; রাদারফোর্ড ৫-২-১১-১ ; ক্রফোর্ড ১৩ ৪-২৪-১ ; বার্ক ২-০-৬-০ ।

অস্ট্রেলিয়া

জে. বার্ক ক উমরিগড় ব মানকড	১৬১
জে. রাদারফোর্ড ক তামানে ব গুপ্তে	৩০
এন. হারভে ক বদলি ব প্যাটেল	১৪০
পি. বার্জ ক প্যাটেল ব গুপ্তে	৮৩
কে. ম্যাকাই ক রায় ব প্যাটেল	২৬
এ. ডেভিডসন এল. বি. ডব্লু ব রামচাঁদ	১৬
আর. বেনো ক বদলি ব গুপ্তে	২
আর লিণ্ডওয়াল নট আউট	৪৮
এল. ম্যাডকস নট আউট	৮
অতিরিক্ত	৯
মোট (৭ উইকেট ডি.)	৫২৩

জে. উইলসন এবং পি. ক্রফোর্ড ব্যাট করেন নি।

উইকেট-পতন : ৫৭ (রাদারফোর্ড) ২৬১ (হার্ভে) ৩৯৮ (বার্ক) ৪৩২ (বার্জ) ৪৬৯ (ডেভিডসন) ৪৬২ (বেনো) ৪৭০ (ম্যাকাই) ।

বোলিং : ফাদকার ৩৯-৯-৯২-০ ; রামচাঁদ ১৮-২-৭৮-১ ; প্যাটেল ৩৯-১০-১১১-২ ; গুপ্তে ৩৮-১৩-১১৫-৩ ; মানকড় ৪৬-৯-১১৮-১ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ভারত—পি. আর. উমরিগড়

অস্ট্রেলিয়া—পি. আর. লিণ্ডওয়াল

তৃতীয় টেস্ট। কলকাতা। ২-৩,৫-৬ নভেম্বর

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস

সি. সি. ম্যাকডোনাল্ড ব আমেদ	৩
জে. বার্ক ক মঞ্জরেকর ব আমেদ	১০
আর. এন. হারভে ক তামানে ব আমেদ	৭
আই. ডি. ক্রেগ ক তামানে ব গুপ্তে	৩৬
পি. বার্জ ক রামচাঁদ ব আমেদ	৫৮
কে. ম্যাকাই এল. বি. ডব্লু ব মানকড়	৫
আর. বেনো ব আমেদ	২৪
আর. আর. লিগুওয়াল ব আমেদ	৮
আই. ডবলিউ. জনসন ক আমেদ ব মানকড়	১
পি. ক্রফোর্ড ক কন্ট্রাক্টর ব আমেদ	১৮
জি. আর. ল্যাংলি নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ৬)	৬
মোট	১৭৭

দ্বিতীয় ইনিংস

সি. সি. ম্যাকডোনাল্ড এল. বি. ডব্লু ব রামচাঁদ	০
জে. বার্ক ক কনট্রাকটর ব আমেদ	২
আর. এন. হারভে ক উমরিগড় ব মানকড়	৬৯
আই. ডি. ক্রেগ ব আমেদ	৬
পি. বার্জ ক রামচাঁদ ব আমেদ	২২
কে. ম্যাকাই হিট উইকেট ব মানকড়	২৭
আর. বেনো ব গুপ্তে	২১
আর. আর. লিগুওয়াল ক তামানে ব মানকড়	২৮
আই. ডবলিউ. জনসন স্টাম্পড তামানে ব মানকড়	৫
পি. ক্রফোর্ড নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ৬ লেগবাই ২)	৮
মোট (৯ উইকেট ডি.)	১৮৯

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ৬ (ম্যাকডোনাল্ড) ২২ (হার্ভে) ২৫ (বার্ক) ৯৩ (ক্রেগ) ১০৬ (ম্যাকাই) ১৪১ (বেনো) ১৫২ (লিণ্ডওয়াল) ১৫৮ (জনসন) ১৬৩ (বার্জ) ১৭৭ (ক্রফোর্ড)।

দ্বিতীয় ইনিংস ০ (ম্যাকডোনাল্ড) ৯ (বার্ক) ২৭ (ক্রেগ) ৫৯ (বার্জ) ১২২ (ম্যাকাই) ১৪৯ (বেনো) ১৫৯ (হার্ভে) ১৮৮ (জনসন) ১৮৯ (লিণ্ডওয়াল)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস রামচাঁদ ২-১-১-০ ; উমরিগড় ১৬-৩-৩০-০ ; গোলাম আমেদ ২০'৩-৬-৪৯-৭ ; গুপ্তে ২৩-১১-৩৫-১ ; মানকড় ২৫-৪-৫৬-২ ।

দ্বিতীয় ইনিংস রামচাঁদ ২-১-৬-১ ; উমরিগড় ২৯-৯-২১-০ , গোলাম আমেদ ২৯-৫-৮১-৩ ; গুপ্তে ৭-১-২৪-১, মানকড় ৯'৪-১-৪৯-৪ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পি. রায় ব লিণ্ডওয়াল	১৩
এন. জে. কনট্রাক্টর এল বি ডব্লু ব বেনো	২২
পি. আর. উমরিগড় ক বার্জ ব জনসন	৫
ভি. এল. মঞ্জরেকর ক হারভে ব বেনো	৩৩
ভি. মানকড়. এল বি ডব্লু ব বেনো	৪
জি. এস. রামচাঁদ স্টাম্পড ল্যাংলি ব বেনো	২
এ. জি. কৃপাল সিং ক ম্যাকাই ব বেনো	১৪
পি. ভাণ্ডারী এল বি ডব্লু ব লিণ্ডওয়াল	১৭
এন. এস. তামানে হিট উইকেট ব বেনো	৫
গোলাম আমেদ ক ম্যাকাই ব লিণ্ডওয়াল	১০
এস. পি. গুপ্তে নট আউট	১
অতিরিক্ত (বাই ৭ লেগবাই ১ নো বল ২)	১০
মোট	১৩৬

দ্বিতীয় ইনিংস

পি. রায় এল বি ডব্লু ব বার্ক	২৪
এন. জে. কনট্রাক্টর ব জনসন	২০
পি. আর. উমরিগড় ক বার্ক ব বেনো	২৮

ভি. এল. মঞ্জরেকর ক হারভে ব বেনো	২২
ভি. মানকড় ক হারভে ব বেনো	২৫
জি. এস. রামচাঁদ ব বার্ক	৩০
এ. জি. কৃপাল সিং ব বেনো	০
পি. ভাণ্ডারী ক হারভে ব বার্ক	২
এন. এস. তামানে ব বেনো	০
গোলাম আমেদ ব বার্ক	০
এস. পি. গুপ্তে নট আউট	০
অতিরিক্ত : (বাই ৫ লেগবাই ৫ নো বল ৩)	১৩
মোট	১৩৬

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ১৫ (পঙ্কজ রায়) ২০ (উমরিগড়) ৭৬ (কনট্রাক্টর) ৮০ (মানকড়) ৮২ (রামচাঁদ) ৯৮ (মঞ্জরেকর) ৯৯ (কৃপাল সিং) ১১৫ (তামানে) ১৩৫ (গোলাম আমেদ) ১৩৬ (ভাণ্ডারী)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৪৪ (কনট্রাক্টর) ৫০ (পঙ্কজ রায়) ৯৪ (উমরিগড়) ৯৯ (রামচাঁদ) ১০২ (কৃপাল সিং) ১২১ (মঞ্জরেকর) ১৩৪ (ভাণ্ডারী) ১৩৬ (মানকড়) ১৩৬ (গোলাম আমেদ) ১৩৬ (তামানে)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস লিণ্ডওয়াল ২৫'২-১২-৩২-৩ ; ক্রফোর্ড ৩-৩-০-০ ; জনসন ১২-২-২৭-১ ; বেনো ২৯-১০-৫২-৬ ; হারভে ১-১-০-০ ; বার্ক ৮-৩-১৫-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস লিণ্ডওয়াল ১২-৭-৯-০ ; ক্রফোর্ড ২-১-১-০ ; বেনো ১৪'২-৬-৫৩-৫ ; জনসন ১৪-৫-২৩-১ ; বার্ক ১৭-৪-৩৭-৪ ।

অষ্ট্রেলিয়া ৯৪ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—পি. আর. উমরিগড়

অস্ট্রেলিয়া—আই. ডব্লু. জনসন

১৯৫৮-৫৯ : ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

দু বছর পরে টেস্ট ক্রিকেটের আসর বসল ভারতে। ভারত শুরুও করল চমৎকার ভাবে। হাণ্ট-সোবার্স-কানহাই-বুচার-আলেকজাণ্ডারের মত ব্যাটসম্যানে সমৃদ্ধ দলকে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে মাত্র ২২৭ রানে ধ্বসিয়ে দিয়ে সমর্থকদের মনে বিরাট প্রত্যাশা

জাগিয়ে তুলল। প্রথম টেস্ট ড্র হল এবং খেলা দেখে কেউ ভাবেন নি পরবর্তী টেস্ট গুলোতে ভারত অমন নাজেহাল হয়ে হারবে। অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যথার্থই শক্তিশালী দল ছিল। উপরোক্ত নামী ব্যাটসম্যান ছাড়াও দলে ছিলেন হল-গিলক্রিস্টের মত দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার। আর কে না জানে ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে খেলবার বিষয়ে ভারতীয়দের দুর্বলতা। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সুবিধে করতে পারে নি। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে সর্বকালের সেরা অলরাউণ্ডার সোবার্স দলের বিপর্যয়ের সময় ব্যাট করতে নেমে ১৯৮ রান করে আউট হলেন। খেলার ধারা পালটে গেল। ভারত কোণঠাসা হয়ে হারল।

অবশ্য এজন্য খেলোয়াড়দের শুধু দোষ দিয়ে লাভ নেই। পাঁচটি টেস্টে চারজন অধিনায়ক নিযুক্ত করে নির্বাচকমণ্ডলী আশ্চর্য খামখেয়ালীপনার পরিচয় দিলেন। এ হেন অবস্থায় কোন দলের পক্ষেই সংহতি বজায় রেখে ভাল খেলা কঠিন। ফল যা হবার হল। তবু এর মধ্যেও ভারতীয় ক্রিকেটে আবির্ভূত হলেন অলরাউণ্ডার চান্দু বোরদে এবং রঘুনাথ নাদকার্নি। পরবর্তী এক দশকের বেশ এঁরা দুজনেই ভারতীয় ক্রিকেটে অপরিহার্য হয়ে থাকবেন। এ সিরিজের পঞ্চম টেস্টকে তো বোরদের টেস্টই বলা যেতে পারে। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৬ রান তাকে অসাধারণ মর্যাদায় ভূষিত করল। বস্তুত তাঁর জন্যই পঞ্চম টেস্ট ড্র হতে পেরেছিল।

এ সিরিজে শেষবারের মত খেললেন মানকড়, অধিকারী, ফাদকার ও গোলাম আমেদ। এঁদের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেটের একটি বিশেষ যুগ শেষ হয়ে গেল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে সোবার্স ছাড়াও অসাধারণ খেললেন কানহাই। কলকাতার টেস্টে তাঁর অনবদ্য ২৫৬ এখনও অনেক অনুরাগী প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করে থাকেন। কানহাইয়ের এ রান এখনও ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় সর্বোচ্চ রান।

ভারত সম্পর্কে গিলক্রিস্টের তিক্ত মনোভাবের শুরুও এ সিরিজ থেকে।

প্রথম টেস্ট। বোম্বাই

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস

জে. কে. হোল্ট ক তামানে ব রামচাঁদ	১৬
কনরাড হান্ট ক গার্ড ব রামচাঁদ	০
গ্যারি সোবার্স ক ও ব গার্ড	২৫

রোহন কানহাই এল বি ডব্লু ব হার্দিকার	৬৬
কোলি স্মিথ ক রামচাঁদ ব নাদকার্নি	৬৩
ব্যাসিল বুচার এল বি ডব্লু ব গুপ্তে	২৮
গেরি আলেকজাণ্ডার স্টাম্পড তামানে ব গুপ্তে	৫
এরিক অ্যাটকিনসন ব গুপ্তে	১
সোনি রামাধীন ক নাদকার্নি ব গুপ্তে	৯
ওয়েস হল নট আউট	১২
রয় গিলক্রিস্ট ব নাদকার্নি	১
অতিরিক্ত (নো বল ১)	১
মোট	২২৭

দ্বিতীয় ইনিংস

কনরাড হাণ্ট ক নাদকার্নি ব গার্ড	১০
জে. কে. হোল্ট ক হার্দিকার ব গার্ড	২৪
গ্যারি সোবার্স নট আউট	১৪২
রোহন কানহাই ক পঙ্কজ রায় ব গুপ্তে	২২
কোলি স্মিথ ক পঙ্কজ রায় ব গুপ্তে	৫৮
ব্যাসিল বুচার নট আউট	৬৪
অতিরিক্ত (লেগ বাই ৩)	৩
মোট (৪ উইকেট ডি.)	৩২৩

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ২ (হাণ্ট) ৩৬ (হোল্ট) ৫০ (সোবার্স) ১১৮ (কানহাই) ১৭২ (স্মিথ) ২০০ (আলেকজাণ্ডার) ২০২ (অ্যাটকিনসন) ২০৬ (বুচার) ২২৬ (রামাধীন) ২২৭ (গিলক্রিস্ট)।

দ্বিতীয় ইনিংস ২৭ (হাণ্ট) ৩৭ (হোল্ট) ৭০ (কানহাই) ১৮৯ (স্মিথ)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস গার্ড ১৫-৭-১৯-১ ; রামচাঁদ ১২-২-৩১-২ ; উমরিগড় ৬-০-১২-০ ; গুপ্তে ৩৩-৯-৮৬-৪ ; বোরদে ১০-১-২৯-০ ; নাদকার্নি ২১.১-৭-৪০-২ ; হার্দিকার ৭-৫-৯-১।

দ্বিতীয় ইনিংস গার্ড ১৭-২-৬৯-২ ; রামচাঁদ ১০-৩-২২-০ ; উমরিগড় ৯-০-২২-০ ; গুপ্তে ৩৫-৪-১১১-২ ; বোরদে ১৬-৩-৩১-০ ; নাদকার্নি ১৫-৩-২০-১ ; হার্দিকার ১০-২-৩৬-০ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পঙ্কজ রায় ব হল	১৮
নরিম্যান কনট্রাক্টর ক অ্যাটকিনসন ব হল	০
পলি উমরিগড় ব গিলক্রিস্ট	৫৫
বিজয় মঞ্জরেকর ক সোবার্স ব হল	০
রঘুনাথ নাদকার্নি ব অ্যাটকিনসন	২
জি. এস. রামচাঁদ ক আলেকজাণ্ডার ব অ্যাটকিনসন	৪৮
মনোহর হার্দিকার এল বি ডব্লু ব গিলক্রিস্ট	০
চান্দু বোরদে রান আউট	৭
নরেন তামানে নট আউট	৯
গুলাম গার্ড ব গিলক্রিস্ট	৪
সুভাষ গুপ্তে ক সোবার্স ব গিলক্রিস্ট	১
অতিরিক্ত (বাই ৩ লেগ বাই ৫)	৮
মোট	১৫২

দ্বিতীয় ইনিংস

পঙ্কজ রায় ক ও ব হল	৯০
নরি কনট্রাক্টর রান আউট	৬
পলি উমরিগড় ব গিলক্রিস্ট	৩৬
বিজয় মঞ্জরেকর ক কানহাই ব গিলক্রিস্ট	২৩
রঘুনাথ নাদকার্নি ক কানহাই ব অ্যাটকিনসন	৭

জি. এস. রামচাঁদ নট আউট	৬৭
মনোহর হার্দিকার নট আউট	৩২
অতিরিক্ত (বাই ১৯ লেগবাই ২ নো-বল ৭)	২৮
মোট (৫ উইকেট)	২০৯

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ০ (কনট্রাকটর) ৩৭ (পঙ্কজ রায়) ৩৭ (মঞ্জরেকর) ৪০ (নাদকার্নি) ১২০ (উমরিগড়) ১২০ (হার্দিকার) ১৩২ (বোরদে) ১৩৮ (রামচাঁদ) ১৪৮ (গার্ড) ১৫২ (গুপ্তে) ।

দ্বিতীয় ইনিংস ২৭ (কনট্রাক্টর) ৮৮ (উমরিগড়) ১৩৬ (মঞ্জরেকর) ১৫৯ (নাদকার্নি) ২০৪ (পঙ্কজ রায়) ।

বোলিং : প্রথম ইনিংস গিলক্রিস্ট ২৩.২-৮-৩৯-৪ ; হল ১৪-৪-৩৫-৩ ; অ্যাটকিনসন ১৯-১০-২১-২ ; রামাধীন ৯-০-৩০-০ ; সোবার্স ৩-০-১৯-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস গিলক্রিস্ট ৪১-১৩-৭৫-২ ; হল ৩০-১০-৭২-১ ; অ্যাটকিনসন ২৯-১১-৫৬-১ ; রামাধীন ১১-৪-২০-০ ; স্মিথ ১৮-৪-৩০-০ ; সোবার্স ৩-০-৮-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ভারত—পলি উমরিগড়

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—গেরি আলেকজাণ্ডার

দ্বিতীয় টেস্ট। কানপুর। ১২-১৪, ১৬-১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৮

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস

জে. কে. হোল্ট এল বি ডব্লু ব গুপ্তে	৩১
কনরাড হাণ্ট ক বোরদে ব গুপ্তে	২৯
গ্যারি সোবার্স ক হার্দিকার ব গুপ্তে	৪
রোহন কানহাই হিট উইকেট ব গুপ্তে	০
কোলি স্মিথ ক এবং ব গুপ্তে	২০
ব্যাসিল বুচার ব গুপ্তে	২
জো সলোমন এল বি ডব্লু ব গুপ্তে	৪৫

গেরি আলেকজাণ্ডার ক হার্দিকার ব গুপ্তে	৭০
ল্যান্স গিবস ব রঞ্জানে	১৬
ওয়েস হল ক তামানে ব গুপ্তে	০
জ্যাসউইক টেলর নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগবাই ২ নো বল ২)	৫
মোট	২২২

দ্বিতীয় ইনিংস

কনরাড হান্ট ক এবং ব উমরিগড়	০
জে. কে. হোল্ট ক বোরদে ব রামচাঁদ	০
গ্যারি সোবার্স রান আউট	১৯৮
রোহন কানহাই ক তামানে ব গুপ্তে	৪১
কোলি স্মিথ রান আউট	৭
ব্যাসিল বুচার ক তামানে ব রামচাঁদ	৬০
জো সলোমন রান আউট	৮৬
গেরি আলেকজাণ্ডার নট আউট	৪৫
অতিরিক্ত (লেগ বাই ৬)	৬
মোট (৭ উইকেট ডি.)	৪৪৩

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৫৫ (হান্ট) ৬৩ (সোবার্স) ৬৫ (কানহাই) ৭৪ (হোল্ট) ৭৬ (বুচার) ৮৮ (স্মিথ) ১৮৮ (সলোমন) ২২০ (গিবস) ২২২ (আলেকজাণ্ডার) ২২২ (হল)।

দ্বিতীয় ইনিংস ০ (হান্ট) ০ (হোল্ট) ৭৩ (কানহাই) ৮৩ (স্মিথ) ১৯৭ (বুচার) ৩৬০ (সোবার্স) ৪৪৩ (সলোমন)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস রঞ্জানে ১৮-৬-৩৫-১ ; রামচাঁদ ১০-৩-২২-০ ; গুপ্তে ৩৪.৩-১১-১০২-৯ ; গোলাম আমেদ ১০-৩-২৯-০ ; বোরদে ১৩-৪-২৯-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস রামচাঁদ ৪০-৬-১১৪-২ ; উমরিগড় ২৮-৪-৯৬-১ ; গুপ্তে ২৩-২-১২১-১ ; গোলাম আমেদ ৩০-৮-৮১-০ ; বোরদে ৫-০-১৫-০ ; হার্দিকার ১-০-১০-০ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পঙ্কজ রায় এল বি ডব্লু ব গোবার্স	৪৬
নরি কনট্রাকটর এল বি ডব্লু ব গোবার্স	৪১
পলি উমরিগড় ক হোল্ট ব হল	৫৭
বিজয় মঞ্জরেকর এল বি ডব্লু ব টেলর	৩০
বোরদে ক আলেকজাণ্ডার ব হল	০
জি. এস. রামচাঁদ ক আলেকজাণ্ডার ব হল	৪
মনোহর হার্দিকার ব হল	১৩
নরেন তামানে ক হোল্ট ব হল	০
বসন্ত রঞ্জানে ব টেলর	৩
গোলাম আমেদ নট আউট	০
সুভাষ গুপ্তে ব হল	০
অতিরিক্ত (লেগবাই ১১ নো বল ১৭)	২৮
মোট	২২২

দ্বিতীয় ইনিংস

নরি কনট্রাক্টর ব টেলর	৫০
পঙ্কজ রায় রান আউট	৪৫
পলি উমরিগড় ক স্মিথ ব হল	৩৪
বিজয় মঞ্জরেকর রান আউট	৩১
বোরদে ক আলেকজাণ্ডার ব টেলর	১৩
জি. এস. রামচাঁদ ব হল	০
মনোহর হার্দিকার ব হল	১১
নরেন তামানে ক সলোমন ব হল	২০
বসন্ত রঞ্জানে ব টেলর	১২
গোলাম আমেদ ব হল	০
সুভাষ গুপ্তে নট আউট	৮
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগবাই ১ নো বল ১১)	১৬
মোট	২৪০

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৯৩ (কনট্রাক্টর) ১১৮ (পঙ্কজ রায়) ১৮২ (উমরিগড়) ১৮৪ (বোরদে) ১৯১ (রামচাঁদ) ২১০ (মঞ্জরেকর) ২১১ (তামানে) ২২২ (রঙ্গানে) ২২২ (হার্দিকার) ২২২ (গুপ্তে)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৯৯ (কনট্রাক্টর) ১০৭ (পঙ্কজ রায়) ১৭৩ (মঞ্জরেকর) ১৭৮ (উমরিগড়) ১৮২ (রামচাঁদ) ১৯৪ (বোরদে) ২০৪ (হার্দিকার) ২২৭ (তামানে) ২২৭ (গোলাম আমেদ) ২৪০ (রঙ্গানে)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস হল ২৮'৪-৪-৫০-৬; টেলর ১৮-৭-৩৮-২ ; গিবস ২১-৮-২৮-০ ; সোবার্স ২৪-৪-৬২-২ ; স্মিথ ৮-১-১৪-০ ; সলোমন ২-১-২-০।

দ্বিতীয় ইনিংস হল ৩২-১২-৭৬-৫ ; টেলর ৩০'১-১১-৬৮-৩ ; গিবস ৯-৪-৩৩-০ ; সোবার্স ২১-১০-২৯-০ ; স্মিথ ৬-০-১২-০ ; সলোমন ৩-২-৬-০।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২০৩ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—গোলাম আমেদ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—গেরি আলেকজাণ্ডার

তৃতীয় টেস্ট। কলকাতা। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৫৮, ১, ৩, ৪ জানুয়ারি, ১৯৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

জে. কে. হোল্ট ক কনট্রাক্টর ব সুরেন্দ্রনাথ	৫
কনরাড হান্ট ক সুরেন্দ্রনাথ ব গুপ্তে	২৩
রোহন কানহাই ক উমরিগড় ব সুরেন্দ্রনাথ	২৫৬
কোলি স্মিথ ব উমরিগড়	৩৪
ব্যাসিল বুচার এল বি ডব্লু ব গোলাম আমেদ	১০৩
গ্যারি সোবার্স নট আউট	১০৬
জো সলোমন নট আউট	৬৯
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগ বাই ১৩ নো বল ১)	১৮
মোট (৫ উইকেট ডি.)	৬১৪

গেরি আলেকজাণ্ডার, সোনি রামাধীন, রয় গিলক্রিস্ট এবং ওয়েস হল ব্যাট করেন নি।

উইকেট পতন : ১৩ (হোল্ট) ৭৩ (হান্ট) ১৮০ (স্মিথ) ৩৯৭ (বুচার) ৪৫৪ (কানহাই)।

বোলিং : ফাদকার ৪৩-৬-১৭৩-০ ; সুরেন্দ্রনাথ ৪৬-৮-১৬৮-২ ; গুপ্তে ৩৯-৮-১১৯-১ ; গোলাম আমেদ ১৬.১-১-৫২-১ ; উমরিগড় ১৬-১-৬২-১ ; ঘোরপাড়ে ২-০-২২-০ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পঙ্কজ রায় ক সলোমন ব গিলক্রিস্ট	১১
নরি কনট্রাক্টর এল বি ডব্লু ব রামাধীন	৪
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে ক আলেকজাণ্ডার ব গিলক্রিস্ট	৭
রামনাথ কেনি ক আলেকজাণ্ডার ব হল	১৬
পলি উমরিগড় নট আউট	৪৪
বিজয় মঞ্জরেকর ব হল	০
দাত্তু ফাদকার ক সোবার্স ব গিলক্রিস্ট	৩
নরেন তামানে ক সোবার্স ব হল	০
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ রান আউট	৮
গোলাম আমেদ এল বি ডব্লু ব সোবার্স	৪
সুভাষ গুপ্তে ব রামাধীন	১২
অতিরিক্ত (বাই ২ লেগ বাই ৮ নো বল ৪ ওয়াইড ১)	১৫
মোট	১২৪

দ্বিতীয় ইনিংস

পঙ্কজ রায় ক আলেকজাণ্ডার ব হল	০
নরি কনট্রাকটর ব গিলক্রিস্ট	৬
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে ব সোবার্স	১৬
রামনাথ কেনি ব হল	০
পলি উমরিগড় ক আলেকজাণ্ডার ব হল	২
বিজয় মঞ্জরেকর নট আউট	৫৮

দাত্তু ফাদকার ব গিলক্রিস্ট	৩৫
নরেন তামানে ব গিলক্রিস্ট	০
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ ক আলেকজাণ্ডার ব গিলক্রিস্ট	৩
গোলাম আমেদ ব গিলক্রিস্ট	০
সুভাষ গুপ্তে ব গিলক্রিস্ট	১৫
অতিরিক্ত (বাই ৩ নো বল ১৬)	১৯
মোট	১৫৪

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ২৪ (পঙ্কজ রায়) ২৩ (কনট্রাকটর) ৫২ (ঘোরপাড়ে) ৫২ (কেনি) ৫২ (মঞ্জরেকর) ৫৭ (ফাদকার) ৫৮ (তামানে) ৮৯ (সুরেন্দ্রনাথ) ৯৯ (গোলাম আমেদ) ১২৪ (গুপ্তে)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৫ (পঙ্কজ রায়) ৭ (কনট্রাকটর) ১০ (কেনি) ১৭ (উমরিগড়) ৪৪ (ঘোরপাড়ে) ১১৫ (ফাদকার) ১৩১ (সুরেন্দ্রনাথ) ১৩১ (তামানে) ১৩১ (গোলাম আমেদ) ১৫৪ (গুপ্তে)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস গিলক্রিস্ট ২৫-১৩-১৮-৩ ; হল ১৫-৬-৩১-৩ ; রামাধীন ১৬'৫-৮-২৭-২ ; স্মিথ ২-১-১-০ ; সোবার্স ৬-০-৩২-১।

দ্বিতীয় ইনিংস গিলক্রিস্ট ২১-৭-৫৫-৬ ; হল ১৮-৩-৫৫-৩ ; রামাধীন ৮-৩-১৪-০ ; সোবার্স ২-০-১১-১।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—গোলাম আমেদ

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—গেরি আলেকজাণ্ডার

চতুর্থ টেস্ট । মাদ্রাজ। ২১-২২, ২৪-২৬ জানুয়ারি, ১৯৫৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস

কনরাড হান্ট ব মানকড়	৩২
জে. কে. হোল্ট এল বি ডব্লু ব গুপ্তে	৬৩
রোহন কানহাই রান আউট	৯৯

গ্যারি সোবার্স ক গুপ্তে ব মানকড়	২৯
কোলি স্মিথ ব মানকড়	০
ব্যাসিল বুচার ব রামচাঁদ	১৪২
জো সলোমন এল বি ডব্লু ব বোরদে	৪৩
গেরি আলেকজাণ্ডার রান আউট	১১
এরিক অ্যাটকিনসন নট আউট	২৯
ওয়েস হল এল বি ডব্লু ব মানকড়	২৫
রয় গিলক্রিস্ট ক পঙ্কজ রায় ব মানকড়	৭
অতিরিক্ত (বাই ৮ লেগবাই ১১ নো বল ১)	২০
মোট	৫০০

দ্বিতীয় ইনিংস

জে. কে. হোল্ট নট আউট	৮১
কনরাড হাণ্ট ক সুরেন্দ্রনাথ ব গুপ্তে	৩০
রোহন কানহাই এল বি ডব্লু ব গুপ্তে	১৪
গ্যারি সোবার্স ক জোশি ব বোরদে	৯
কোলি স্মিথ ক জোশি ব গুপ্তে	৫
ব্যাসিল বুচার এল বি ডব্লু ব গুপ্তে	১৬
জো সলোমন নট আউট	৮
অতিরিক্ত (বাই ৫)	৫
মোট (৫ উইকেট ডি.)	১৬৮

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৬১ (হাণ্ট) ১৫২ (হোল্ট) ২০৬ (সোবার্স) ২০৬ (স্মিথ) ২৪৮ (কানহাই) ৩৪৯ (সলোমন) ৩৮৪ (আলেকজাণ্ডার) ৪৫৩ (বুচার) ৪৮৯ (হল) ৫০০ (গিলক্রিস্ট)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৭০ (হাণ্ট) ১০৮ (কানহাই) ১২৩ (সোবার্স) ১৩০ (স্মিথ) ১৫০ (বুচার)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস রামচাঁদ ২২-৫-৪৫-১ ; সুরেন্দ্রনাথ ২৬-৫-৭৭-০ ;

উমরিগড় ৮-২-১৬-০ ; গুপ্তে ৫৮-১৫-১৬৬-১ ; মানকড় ৩৮-৬-৯৫-৪ ; বোরদে ২৭-২-৮০-২ ; কৃপাল সিং ২-১-১-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস রামচাঁদ ৬-২-১৩-০ ; সুরেন্দ্রনাথ ৭-৩-১৩-০ ; উমরিগড় ১১-৩-২৫-০ ; গুপ্তে ৩০-৬-৭৮-৪ ; বোরদে ২২-১১-৩৪-১ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পঙ্কজ রায় ব সোবার্স	৪৯
অরুণ সেনগুপ্ত ক সোবার্স ব হল	১
পি. জি. জোশি ক আলেকজাণ্ডার ব গিলক্রিস্ট	১৭
নরি কনট্রাক্টর রান আউট	২২
পলি উমরিগড় ক আলেকজাণ্ডার ব হল	৪
জি. এস. রামচাঁদ ক গিলক্রিস্ট ব অ্যাটকিনসন	৩০
কৃপাল সিং ক হল ব সোবার্স	৫৩
বিনু মানকড় ব গিলক্রিস্ট	৪
চান্দু বোরদে ক স্মিথ ব সোবার্স	০
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ এল বি ডব্লু ব সোবার্স	০
সুভাষ গুপ্তে নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ১৪ লেগ বাই ৫ নো বল ২৩)	৪২
	২২২

দ্বিতীয় ইনিংস

পঙ্কজ রায় ক কানহাই ব হল	১৬
অরুণ সেনগুপ্ত ক আলেকজাণ্ডার ব গিলক্রিস্ট	৮
নরি কনট্রাক্টর ক আলেকজাণ্ডার ব গিলক্রিস্ট	৩
পলি উমরিগড় ব সোবার্স	২৯
চান্দু বোরদে ক বুচার ব সোবার্স	৫৬
জি. এস. রামচাঁদ ব গিলক্রিস্ট	১
কৃপাল সিং ক আলেকজাণ্ডার ব হল	৯

পি. জি. জোশি ক আলেকজাণ্ডার ব হল	৩
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ ক হাণ্ট ব স্মিথ	৮
সুভাষ গুপ্তে নট আউট	২
বিনু মানকড় অসুস্থ, ব্যাট করেন নি	—
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগ বাই ৫ নো বল ৭)	১৬
মোট	১৫১

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ১১ (সেনগুপ্ত) ৬০ (জোশি) ১০২ (কনট্রাকটর) ১২১ (উমরিগড়) ১৩১ (পঙ্কজ রায়) ১৩৫ (মানকড়) ১৪৭ (বোরদে) ২২১ (কৃপাল সিং) ২২২ (রামচাঁদ) ২২২ (সুরেন্দ্রনাথ)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১১ (সেনগুপ্ত) ১৯ (কনট্রাকটর) ৪৫ (পঙ্কজ রায়) ৯৭ (উমরিগড়) ৯৮ (রামচাঁদ) ১১৪ (কৃপাল সিং) ১১৮ (জোশি) ১৪৯ (সুরেন্দ্রনাথ) ১৫১ (বোরদে)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস গিলক্রিস্ট ১৮-৯-৪৪-২ ; হল ২২-৭-৫৭-২ , অ্যাটকিনসন ১৫-৬-৩১-১ ; সোবার্স ১৮·১-৮-২৬-৪ ; স্মিথ ৫-০-২২-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস হল ২৩-৮-৪৯-৩ ; গিলক্রিস্ট ১৭-৯-৩৬-৩ ; অ্যাটকিনসন ৯-৫-৭-০ ; সোবার্স ১৮-৮-৩৯-২ ; স্মিথ ৩-১-৪-১ ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৯৫ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ভারত—বিনু মানকড়

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—গেরি আলেকজাণ্ডার

পঞ্চম টেস্ট। নিউ দিল্লি। ৬-৮, ১০-১১ নভেম্বর, ১৯৫৯

ভারত : প্রথম ইনিংস

পঙ্কজ রায় ক সলোমন ব গিলক্রিস্ট	১
নরি কন্ট্রাক্টর এল. বি. ডব্লু ব হল	৯২
পলি উমরিগড় ব হল	৭৬
বিজয় মঞ্জরেকর ক আলেকজাণ্ডার ব হল	৬

চান্দু বোরদে ক আলেকজাণ্ডার ব স্মিথ	১০৯
দাত্তু গায়কোয়াড় ক হোল্ট ব গিলক্রিস্ট	৬
হেমু অধিকারী ক আলেকজাণ্ডার ব স্মিথ	৬৩
বিনু মানকড় ক বিকল্প ব গিলক্রিস্ট	২১
নরেন তামানে ক গিলক্রিস্ট ব স্মিথ	৬
সুভাষ গুপ্তে ব হল	৫
রমাকান্ত দেশাই নট আউট	২
অতিরিক্ত (বাই ৬ লেগবাই ১৫ নো বল ১০)	৩১
মোট	৪১৫

দ্বিতীয় ইনিংস

নরি কনট্রাক্টর রান আউট	৫
পঙ্কজ রায় ক হোল্ট ব স্মিথ	৫৮
দাত্তু গায়কোয়াড় ক হান্ট ব স্মিথ	৫২
চান্দু বোরদে হিট উইকেট ব গিলক্রিস্ট	৯৬
হেমু অধিকারী ক বিকল্প ব স্মিথ	৪০
বিনু মানকড় ব স্মিথ	০
নরেন তামানে হিট উইকেট ব স্মিথ	৫
সুভাষ গুপ্তে ব গিলক্রিস্ট	০
রমাকান্ত দেশাই ব গিলক্রিস্ট	৫
বিজয় মঞ্জরেকর নট আউট	০
পলি উমরিগড় আহত ; ব্যাট করেন নি	০
অতিরিক্ত	১৫
মোট	২৭৫

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৬ (পঙ্কজ রায়) ১৪৩ (উমরিগড়) ১৭০ (মঞ্জরেকর) ২০৮ (কন্ট্রাক্টর) ২৪২ (গায়কোয়াড়) ৩৭৬ (বোরদে) ৩৯৯ (অধিকারী) ৪০৭ (তামানে) ৪১৩ (গুপ্তে) ৪১৫ (মানকড়)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৫ (কনট্রাক্টর) ৯৮ (পঙ্কজ রায়) ১৩৫ (গায়কোয়াড়) ২৪৩ (অধিকারী) ২৪৭ (মানকড়) ২৬০ (তামানে) ২৬৪ (গুপ্তে) ২৭৪ (দেশাই) ২৭৫ (বোরদে)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস গিলক্রিস্ট ৩০·৩-৮-৯০-৩ ; হল ২৬-৪-৬৬-৪ ; অ্যাটকিনসন ১৪-৪-৪৪-০ ; স্মিথ ৪০-৭-৯৪-৩ ; সোবার্স ২৪-৩-৬৬-০ ; সলোমন ৭-২-২৪-০ ।

দ্বিতীয় ইনিংস গিলক্রিস্ট ২৪·২-৬-৬২-৩ ; হল ১৩-৫-৩৯-০ ; অ্যাটকিনসন ১-০-৪-০ ; স্মিথ ৪২-১৯-৯০-৫ ; সলোমন ২১-৯-৪৪-০ ; বুচার ৬-১-১৭-০ ; হাণ্ট ৪-২-৪-০ ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : প্রথম ইনিংস

কনরাড হাণ্ট এল. বি. ডব্লু ব অধিকারী	৯২
জে. কে. হোল্ট ক পঙ্কজ রায় ব দেশাই	১২৩
রোহন কানহাই এল. বি. ডব্লু ব দেশাই	৪০
ব্যাসিল বুচার এল. বি. ডব্লু ব অধিকারী	৭১
কোলি স্মিথ ক তামানে ব দেশাই	১০০
জো সলোমন নট আউট	১০০
গ্যারি সোবার্স ক তামানে ব দেশাই	৪৪
গেরি আলেকজাণ্ডার রান আউট	২৫
এরিক অ্যাটকিনসন ক এবং ব অধিকারী	৩৭
ওয়েস হল নট আউট	০
রয় গিলক্রিস্ট ব্যাট করেন নি	—
অতিরিক্ত (বাই ২ লেগবাই ৮ ওয়াইড ১ নো বল ১)	১২
মোট (৮ উইকেট ডি.)	৬৪৪

উইকেট পতন : ১৫৯ (হাণ্ট) ২৪৪ (কানহাই) ২৬৩ (হোল্ট) ৩৯০ (বুচার) ৪৫৫ (স্মিথ) ৫২৪ (সোবার্স) ৫৬৫ (আলেকজাণ্ডার) ৬৩৫ (অ্যাটকিনসন)।

বোলিং : দেশাই ৪৯-১০-১৬৯-৪; মানকড় ৫৫-১২-১৬৭-০ ; গুপ্তে ৬০-১৬-১৪৪-০ ; অধিকারী ২৬-২-৬৮-৩ ; কনট্রাক্টর ৪-১-১১-০ ; বোরদে ১৭-৩-৫৩-০ ; পঙ্কজ রায় ২-০-১২-০ ; গায়কোয়াড় ১-০-৮-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ভারত—হেমু অধিকারী

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—গেরি আলেকজাণ্ডার

১৯৫৯ : ইংল্যাণ্ড বনাম ভারত

এ সিরিজে ভারতীয়দের সম্পর্কে সম্ভবত অতি বড় অনুরাগীদেরও বিশেষ প্রত্যাশা ছিল না। এর কিছু আগেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে খেলায় দারুণভাবে হেরে দলের মনোবল বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর দল গঠনে এমন খামখেয়ালির পরিচয় দিলেন নির্বাচকমণ্ডলী, যার তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন দাত্তু গায়কোয়াড়। খেলোয়াড় হিসেবে তিনি কোনদিনই এমন কিছু উঁচু দরের ছিলেন না। ইংল্যাণ্ড যাবার সময় তাঁর ফর্মই ছিল না। এমনিতে তাঁর দলে আসারই কথা নয়। তবু তিনিই অধিনায়ক হলেন। ফল যা হবার হল। সিরিজের পাঁচটি টেস্টেই হেরে গেল ভারত। এই প্রথম কোন সিরিজের সবগুলো টেস্টে ভারত হারল। অবশ্য ১৯৩২ সালের সিরিজেও ভারত হেরেছিল কিন্তু সেবার মাত্র একটি খেলাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

অথচ এমনভাবে হারবার কারণ ছিল না। বিশেষত দ্বিতীয় টেস্টে লর্ডস মাঠে ভারত প্রথম দিকে ইংল্যাণ্ডকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। কিন্তু ফিল্ডিংয়ের ত্রুটি, ব্যাটসম্যানদের বিস্ময়কর ব্যর্থতা এবং সম্ভবত প্রাদেশিকতা জয়কে করায়ত্ত হতে দিল না। প্রধানত উল্লেখযোগ্য, গায়কোয়াড় অসুস্থ থাকায় এ টেস্টে অধিনায়কত্ব করেছিলেন পঙ্কজ রায়।

চতুর্থ টেস্টে ডাকা হল ইংল্যাণ্ডের কাউন্টি ক্লাবের খেলোয়াড় আব্বাস আলি বেগকে। ৫২ সালেও এভাবে আহ্বান করা হয়েছিল বিনু মানকড়কে। বিনুর মত বেগও দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে অসাধারণ খেললেন। প্রথম আবির্ভাবে বেগ টেস্ট খেলায় করলেন

রাজসিক সেঞ্চুরি। তবু পরাজয় রোধ করা গেল না। কারণ ভারত ত হেরে ছিল অনেক আগেই।

তবু এর মধ্যেও আশা জাগালেন খুদে ফাস্ট বোলার রমাকান্ত দেশাই এবং তাঁর সঙ্গী সুরেন্দ্রনাথ। পরবর্তী কয়েক বছর এঁরা ভারতীয় দলে অপরিহার্য হয়ে রইলেন। বলতে কি, এঁদের পর এমন সফল ফাস্ট বোলার জুটি ভারতীয় দলে আর দেখা যায়নি।

ভারতীয় দলের ব্যর্থতায় বিদেশী সমালোচকদের অনেকেই, বললেন ভারতকে পাঁচদিনের টেস্ট খেলার অধিকার দেওয়া উচিত নয়।

প্রথম টেস্ট। ট্রেন্টব্রিজ, নটিংহাম। ৪-৬, ৮ জুন ১৯৫৯

ইংল্যাণ্ড

আর্থার মিলটন ব সুরেন্দ্রনাথ	৯
কেন টেলর এল. বি. ডব্লু ব গুপ্তে	২৪
কলিন কাউড্রে ক বোরদে ব সুরেন্দ্রনাথ	৫
পিটার মে ক জোশি ব গুপ্তে	১০৬
কেন ব্যারিংটন ব নাদকার্নি	৫৬
মাইক হরটন ক নাদকার্নি ব দেশাই	৫৮
গডফ্রে ইভান্স ক উমরিগড় ব নাদকার্নি	৭৩
ফ্রেডি টুম্যান ব বোরদে	২৮
ব্রায়ান স্ট্যাথাম নট আউট	২৯
টি. গ্রীনহাফ ক গায়কোয়াড় ব গুপ্তে	০
এ. ই. মস ক পঙ্কজ রায় ব গুপ্তে	১১
অতিরিক্ত (বাই ১৫ লেগবাই ৭ ওয়াইড ১)	২৩
মোট	৪২২

উইকেট পতন : ১৭ (মিলটন) ২৯ (কাউড্রে) ৬০ (টেলর) ১৮৫ (ব্যারিংটন) ২২১ (মে) ৩২৭ (ইভান্স) ৩৫৮ (হরটন) ৩৮৯ (টুম্যান) ৩৯০ (গ্রীনহাফ) ৪২২ (মস)।

বোলিং : দেশাই ৩৩-৭-১২৭-১ ; স্বরেন্দ্রনাথ ২৪-৮-৫৯-২ ; গুপ্তে ৩৮·১-১১-১০২-৪ ; নাদকার্নি ২৮-১৬-৪৮-২ ; বোরদে ২০-৪-৬৩-১ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পঙ্কজ রায় ব স্ট্যাথাম	৫৪
নরি কনট্রাক্টর ক ব্যারিংটন ব গ্রীনহাফ	১৫
পলি উমরিগড় ব ট্রুম্যান	২১
বিজয় মঞ্জরেকর এল. বি. ডব্লু. ব ট্রুম্যান	১৭
চান্দু বোরদে আহত ; অবস্থত	১৫
দাত্তু গায়কোয়াড় ক ইভান্স ব স্ট্যাথাম	৩৩
রঘুনাথ নাদকার্নি এল. বি. ডব্লু. ব ট্রুম্যান	১৫
পি. জি. জোশি এল. বি. ডব্লু. ব মস	২১
স্থভাষ গুপ্তে ক টেলর ব মস	২
আর. বি. স্থরেন্দ্রনাথ নট আউট	৪
রমাকান্ত দেশাই ব স্ট্যাথাম	
অতিরিক্ত (বাই ৫ নো বল ৪)	
মোট	২০৬

দ্বিতীয় ইনিংস

পঙ্কজ রায় ক ট্রুম্যান ব গ্রীনহাফ	৪৯
নরি কনট্রাক্টর ক কাউড্রে ব স্ট্যাথাম	০
পলি উমরিগড় ব স্ট্যাথাম	২০
বিজয় মঞ্জরেকর এল. বি. ডব্লু. ব গ্রীনহাফ	৪৪
চান্দু বোরদে আহত ; অনুপস্থিত	—
দাত্তু গায়কোয়াড় ক হরটন ব স্ট্যাথাম	৩১
রঘুনাথ নাদকার্নি ব স্ট্যাথাম	১
পি. জি. জোশি এল. বি. ডব্লু. ব ট্রুম্যান	১

সুভাষ গুপ্তে ক মে ব স্ট্যাথাম	৮
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ নট আউট	২
রমাকান্ত দেশাই এল. বি. ডব্লু. ব ট্রুম্যান	১
অতিরিক্ত (নো বল ১)	১
মোট	১৫৭

উইকেট-পতন : প্রথম ইংনিংস ৩৪ (কনট্রাক্টর) ৮৫ (উমরিগড়) ৯৫ (পঙ্কজ রায়) ১২৬ (মঞ্জরেকর) ১৫৮ (নাদকার্নি) ১৯০ (গায়কোয়াড়) ১৯৮ (গুপ্তে) ২০৬ (জোশি) ২০৬ (দেশাই)।

দ্বিতীয় ইংনিস ৮ (কনট্রাক্টর) ৫২ (উমরিগড়) ৮৫ (পঙ্কজ রায়) ১২৪ (মঞ্জরেকর) ১৪০ (নাদকার্নি) ১৪৩ (জোশি) ১৪৭ (গায়কোয়াড়) ১৫৬ (গুপ্তে) ১৫৭ (দেশাই)।

বোলিং : প্রথম ইংনিস স্ট্যাথাম ২৩'৫-১১-৪৬-২ ; ট্রুম্যান ২৪-৯-৪৫-৪ ; মস ২৪-১১-৩৩-২ ; গ্রীনহাফ ২৬-৭-৫৮-১ ; হরটন ৫-০-১৫-০।

দ্বিতীয় ইংনিস স্ট্যাথাম ২১-১০-৩১-৫ ; ট্রুম্যান ২২'৩-১০-৪৪-২ ; মস ১২-৭-১৩-০ ; গ্রীনহাফ ২৩-৫-৪৮-২ ; হরটন ১৯-১১-২০-০।

ইংল্যাণ্ড এক ইংনিস ও ৫৯ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ইংল্যাণ্ড—পিটার মে

ভারত—দাত্তু গায়কোয়াড়

দ্বিতীয় টেস্ট। লর্ডস। ১৮-২০ জুন, ১৯৫৯

ভারত : প্রথম ইনিংস

পঙ্কজ রায় ক ইভান্স ব স্টাথাম	১৫
নরি কনট্রাক্টর ব গ্রীনহাফ	৮১
পলি উমরিগড় ব স্ট্যাথাম	১
বিজয় মঞ্জরেকর এল. বি. ডব্লু ব ট্রুম্যান	১২
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে এল. বি. ডব্লু ব গ্রীনহাফ	৪১

এ. জি. কৃপাল সিং ব গ্রীনহাফ	০
এম. এল. জয়সীমা এল. বি. ডব্লু ব গ্রীনহাফ	১
পি. জি. জোশি ব হরটন	৪
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ ব গ্রীনহাফ	০
সুভাষ গুপ্তে ক মে ব হরটন	০
রমাকান্ত দেশাই নট আউট	১
অতিরিক্ত (লেগ বাই ১১)	১১
মোট	১৬৮

দ্বিতীয় ইংনিস

পঙ্কজ রায় ক মে ব ট্রুম্যান	০
এম. এল. জয়সীমা এল. বি. ডব্লু ব মস	৮
পলি উমরিগড় ক হরটন ব ট্রুম্যান	০
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে ক ইভান্স ব স্ট্যাথাম	২২
বিজয় মঞ্জরেকর এল. বি. ডব্লু ব স্ট্যাথাম	৬১
এ. জি. কৃপাল সিং ব স্ট্যাথাম	৪১
পি. জি. জোশি ব মস	৬
নরি কনট্রাক্টর নট আউট	১১
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ রান আউট	০
সুভাষ গুপ্তে স্টাম্পড ইভান্স ব গ্রীনহাফ	৭
রমাকান্ত দেশাই ব গ্রীনহাফ	৫
অতিরিক্ত (লেগ বাই ৪)	৪
মোট	১৬৫

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৩২ (পঙ্কজ রায়) ৪০ (উমরিগড়) ৬১ (মঞ্জরেকর) ১৪৪ (ঘোরপাড়ে) ১৫২ (কৃপাল সিং) ১৫৮ (জয়সীমা) ১৬৩ (কনট্রাকটর) ১৬৩ (সুরেন্দ্রনাথ) ১৬৪ (গুপ্তে) ১৬৮ (জোশি)।

দ্বিতীয় ইনিংস : ০ (পঙ্কজ রায়) ০ (উমরিগড়) ২২ (জয়সীমা) ৪২

(ঘোরপাড়ে) ১৩১ (মঞ্জরেকর) ১৪০ (কৃপাল সিং) ১৪৭ (জোশি) ১৪৭ (সুরেন্দ্রনাথ) ১৫৯ (গুপ্তে) ১৬৫ (দেশাই)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ট্রুম্যান ১৬-৪-৪০-১ ; স্ট্যাথাম ১৬-৬-২৭-২ ; মস ১৪-৫-৩১-০ ; গ্রীনহাফ ১৬-৪-৩৫-৫ ; হরটন ১৫.৪-৭-২৪-২ ।

দ্বিতীয় ইনিংস ট্রুম্যান ২১-৩-৫৫-২ ; স্ট্যাথাম ১৭-৭-৪৫-৩ ; মস ২৩-১০-৩০-২ ; গ্রীনহাফ ১৮-৮-৩১-২ ।

ইংল্যাণ্ড : প্রথম ইনিংস

আর্থার মিলটন ক সুরেন্দ্রনাথ ব দেশাই	১৪
কেন টেলর ক গুপ্তে ব দেশাই	৬
কলিন কাউড্রে ক জোশি ব দেশাই	৩৪
পিটার মে ব সুরেন্দ্রনাথ	৩৫
কেন ব্যারিংটন ক বদলি ব দেশাই	৮০
মাইক হরটন ব দেশাই	২
গডফ্রে ইভান্স ব সুরেন্দ্রনাথ	০
ফ্রেডি ট্রুম্যান এল. বি. ডব্লু ব গুপ্তে	৭
ব্রায়ান স্ট্যাথাম ক সুরেন্দ্রনাথ ব গুপ্তে	৩৮
এ. ই. মস ব সুরেন্দ্রনাথ	২৬
টি. গ্রীনহাফ নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগবাই ৪ ওয়াইড ১)	১০
মোট	২২৬

দ্বিতীয় ইনিংস

কেন টেলর এল. বি. ডব্লু ব সুরেন্দ্রনাথ	৩
আর্থার মিলটন ক জোশি ব দেশাই	৩
কলিন কাউড্রে নট আউট	৬৩
পিটার মে নট আউট	৩৩
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগবাই ১)	৬
মোট (২ উইকেট)	১০৮

উইকেট পতন : প্রথম ইনিংস ৯ (টেলর) ২৬ (মিলটন) ৩৫ (মে) ৬১ (কাউড্রে) ৭৯ (হরটন) ৮০ (ইভান্স) ১০০ (ট্রুম্যান) ১৮৪ (স্ট্যাথাম) ২২৩ (মস) ২২৬ (ব্যারিংটন)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৮ (মিলটন) ১২ (টেলর)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস দেশাই ৩১'৪-৮-৮৯-৫, সুরেন্দ্রনাথ ৩০-১৭-৪৬-৩; উমরিগড় ১-১-০-০; গুপ্তে ১৯-২-৬২-২; কৃপাল সিং ৩-০-১৯-০।

দ্বিতীয় ইনিংস দেশাই ৭-১-২৯-১; সুরেন্দ্রনাথ ১১-২-৩২-১; উমরিগড় ১-০-৮-০; জয়সীমা ১-০-৮-০; গুপ্তে ৬-২-২১-০; কৃপাল সিং ১-১-০-০; পঙ্কজ রায় ০'২-০-৪-০।

ইংল্যাণ্ড ৮ উইকেটে জয়ী

অধিনায়ক : ইংল্যাণ্ড—পিটার মে

ভারত—পঙ্কজ রায়

তৃতীয় টেস্ট। হেডিংলে, লিড্‌স। ২-৪ জুলাই, ১৯৫৯

ভারত : প্রথম ইনিংস

পঙ্কজ রায় ক স্যুয়েটম্যান ব রোডস	২
অরবিন্দ আপ্তে ব মস	৮
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে ক স্যুয়েটম্যান ব ট্রুম্যান	৮
চান্দু বোরদে ক স্যুয়েটম্যান ব রোডস	০
পলি উমরিগড় ক ট্রুম্যান ব মস	২৯
দাত্তু গায়কোয়াড় ক কাউড্রে ব রোডস	২৫
রঘুনাথ নাদকার্নি ক পার্কহাউস ব রোডস	২৭
নরেন তামানে ক মস ব ট্রুম্যান	২০
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ ক ক্লোজ ব ট্রুম্যান	৫
সুভাষ গুপ্তে ক স্যুয়েটম্যান ব ক্লোজ	২১
রমাকান্ত দেশাই নট আউট	৭
অতিরিক্ত (বাই ৪ নো-বল ৫)	৯
মোট	১৬১

দ্বিতীয় ইনিংস

পঙ্কজ রায় ক হুয়েটম্যান ব ট্রুম্যান	২০
অরবিন্দ-আপ্তে ক ক্লোজ ব মস	৭
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে এল বি ডব্লু ব ট্রুম্যান	০
চান্দু বোরদে ক মে ব ক্লোজ	৪১
পলি উমরিগড় ক ট্রুম্যান ব মর্টিমোর	৩৯
দাত্তু গায়কোয়াড় ক ও ব ক্লোজ	৮
রঘুনাথ নাদকার্নি ক ব্যারিংটন ব ক্লোজ	১১
নরেন তামানে নট আউট	৯
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ ক কাউড্রে ব মর্টিমোর	১
সুভাষ গুপ্তে ক ও ব ক্লোজ	১
রমাকান্ত দেশাই ক কাউড্রে ব মর্টিমোর	৮
অতিরিক্ত (লেগ বাই ৪)	৪
মোট	১৪৯

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ১০ (পঙ্কজ রায়) ১০ (আপ্তে) ১১ (বোরদে) ২৩ (ঘোরপাড়ে) ৭৫ (গায়কোয়াড়) ৭৫ (উমরিগড়) ১০৩ (তামানে) ১১২ (সুরেন্দ্রনাথ) ১৪১ (গুপ্তে) ১৬১ (নাদকার্নি)।

দ্বিতীয় ইনিংস ১৬ (আপ্তে) ১৯ (ঘোরপাড়ে) ৩৮ (পঙ্কজ রায়) ১০৭ (বোরদে) ১১৫ (গায়কোয়াড়) ১২১ (উমরিগড়) ১৩৮ (নাদকার্নি) ১৩৯ (সুরেন্দ্রনাথ) ১৪০ (গুপ্তে) ১৪৯ (দেশাই)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ট্রুম্যান ১৫-৬-৩০-৩; মস ২২-১১-৩০-২; রোডস ১৮.৫-৩-৫০-৪; মর্টিমোর ৮-৩-২৪-০; ক্লোজ ৫-১-১৮-১।

দ্বিতীয় ইনিংস ট্রুম্যান ১০-১-২৯-২; রোডস ১০-২-৩৫-২; মস ৬-৩-১০-১; মর্টিমোর ১৮.৪-৬-৩৬-৩; ক্লোজ ১১-০-৩৫-৪।

ইংল্যাণ্ড

পার্কহাউস ক তামানে ব দেশাই	৭৮
জিওফ পুলার ক বোরদে ব নাদকার্নি	৭৫
কলিন কাউড্রে ক ঘোরপাড়ে ব গুপ্তে	১৬০

পিটার মে ব দেশাই	২
কেন ব্যারিংটন ক তামানে ব নাদকার্নি	৮০
ব্রায়ান ক্লোজ ব গুপ্তে	২৭
জন মর্টিমোর ব গুপ্তে	৭
রয় সুয়েটম্যান নট আউট	১৯
ফ্রেডি ট্রুম্যান ক দেশাই ব গুপ্তে	১৭
অতিরিক্ত (বাই ১৩ লেগবাই ৫)	১৮
মোট (আট উইকেট ডি.)	৪৮৩

উইকেট-পতন : ১৪৬ (পুলার) ১৮০ (পার্কহাউস) ১৮৬ (মে) ৩৭৯ (ব্যারিংটন) ৪৩২ (কাউড্রে) ৪৩৯ (মর্টিমোর) ৪৫৩ (ক্লোজ) ৪৮৩ (ট্রুম্যান)।

বোলিং : দেশাই ৩৮-১০-১১১-২ ; সুরেন্দ্রনাথ ৩২-১১-৮৪-০ ; গুপ্তে ৪৪·৩-১৩-১১১-৪ ; উমরিগড় ২৪-৮-৪৪-০ ; বোরদে ১৪-১-৫১-০ ; নাদকার্নি ২২-২-৬৪-২ ।

ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ১৭৩ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ইংল্যাণ্ড—পিটার মে

ভারত—দাত্তু গায়কোয়াড

চতুর্থ টেস্ট। ওল্ড ট্র্যাফোর্ড, ম্যানচেস্টার। ২৩-২৫, ২৭-২৮ জুলাই, ১৯৫৯

ইংল্যাণ্ড : প্রথম ইনিংস

পার্কহাউস ক পঙ্কজ রায় ব সুরেন্দ্রনাথ	১৭
জিওফ পুলার ক জোশি ব সুরেন্দ্রনাথ	১৩১
কলিন কাউড্রে ক জোশি ব নাদকার্নি	৬৭
মাইক স্মিথ ক দেশাই ব বোরদে	১০০
কেন ব্যারিংটন এল বি ডব্লু ব সুরেন্দ্রনাথ	৮৭
টেড ডেক্সটার ক পঙ্কজ রায় ব সুরেন্দ্রনাথ	১৩
রে ইলিংওয়ার্থ ক গায়কোয়াড় ব দেশাই	২১

বিশ্ব—১১

জন মর্টিমোর ক কনট্রাক্টর ব গুপ্তে	২৯
রয় সুয়েটম্যান ক জোশি ব গুপ্তে	৯
ফ্রেডি ট্রুম্যান ব সুরেন্দ্রনাথ	০
হ্যারল্ড রোডস নট আউট	০
অতিরিক্ত (বাই ৭ লেগবাই ৭ ওয়াইড ২)	১৬
মোট	৪৯০

দ্বিতীয় ইনিংস

জিওফ পুলার ক জোশি ব গুপ্তে	১৪
পার্কহাউস ক কনট্রাক্টর ব নাদকার্নি	৪৯
টেড ডেক্সটার ক উমরিগড় ব গুপ্তে	৪৫
কলিন কাউড্রে ক বোরদে ব গুপ্তে	৯
মাইক স্মিথ ক দেশাই ব গুপ্তে	৯
কেন ব্যারিংটন এল বি ডব্লু ব নাদকার্নি	৪৬
জন মর্টিমোর ক নাদকার্নি ব বোরদে	৭
রে ইলিঙওয়ার্থ নট আউট	৪৭
ফ্রেডি ট্রুম্যান ক বেগ ব বোরদে	৮
রয় সুয়েটম্যান নট আউট	২১
অতিরিক্ত (বাই ৯ লেগবাই ১)	১০
মোট (৮ উইকেট ডি.)	২৬৫

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ৩৩ (পার্কহাউস) ১৬৪ (কাউড্রে) ২২২ (পুলার) ৩৭১ (ব্যারিংটন) ৪১৭ (ডেক্সটার) ৪৪০ (স্মিথ) ৪৫৪ (ইলিংওয়ার্থ) ৪৯০ :(মর্টিমোর) ৪৯০ (সুয়েটম্যান) ৪৯০ (ট্রুম্যান)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৪৪ (পুলার) ১০০ (ডেক্সটার) ১১৭ (কাউড্রে) ১৩২ (স্মিথ) ১৩৬ (পার্কহাউস) ১৯৬ (মর্টিমোর) ২০৯ (ব্যারিংটন) ২১৯ (ট্রুম্যান)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস দেশাই ৩৯-৭-১২৯-২ ; সুরেন্দ্রনাথ ৪৭·১-১৭-১১৫-৫ ; উমরিগড় ১৯-৩-৪৭-০ ; গুপ্তে ২৮-৮-৯৮-২ ; নাদকার্নি ২৮-১৪-৪৭-১ ; বোরদে ১৩-১-৩৮-১ ।

দ্বিতীয় ইনিংস সুরেন্দ্রনাথ ৮-৫-১৫-০ ; দেশাই ৮-২-১৪-০ ; উমরিগড় ৭-৩-৪-০ ; গুপ্তে ২৬-৬-৭৬-৪ ; নাদকার্নি ৩০-৬-৯৩-২ ; বোরদে ১১-১-৫৩-২ ।

ভারত : প্রথম ইনিংস

পঙ্কজ রায় ক স্মিথ ব রোডস	১৫
নরি কনট্রাক্টর ক সুয়েটম্যান ব রোডস	২৩
আব্বাস আলি বেগ ক কাউড্রে ব ইলিংওয়ার্থ	২৬
দাত্তু গায়কোয়াড় এল বি ডব্লু ব ট্রুম্যান	৫
পলি উমরিগড় ব রোডস	২
চান্দু বোরদে ক ও ব ব্যারিংটন	৭৫
রঘুনাথ নাদকার্নি ব ব্যারিংটন	৩১
পি. জি. জোশি রান আউট	৫
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ ব ইলিংওয়ার্থ	১১
সুভাষ গুপ্তে নট আউট	৪
রমাকান্ত দেশাই ব ব্যারিংটন	৫
অতিরিক্ত (লেগবাই ৪ নো বল ১ ওয়াইড ১)	৬
মোট	২০৮

দ্বিতীয় ইনিংস

নরি কনট্রাক্টর ক ব্যারিংটন ব রোডস	৫৬
পঙ্কজ রায় ক ইলিংওয়ার্থ ব ডেক্সটার	২১
আব্বাস আলি বেগ রান আউট	১১২
দাত্তু গায়কোয়াড় ক ইলিংওয়ার্থ ব রোডস	০
পলি উমরিগড় ক ইলিংওয়ার্থ ব ব্যারিংটন	১১৮
চান্দু বোরদে ক সুয়েটম্যান ব মর্টিমোর	৩
রঘুনাথ নাদকার্নি এল বি ডব্লু ব ট্রুম্যান	২৫
পি. জি. জোশি ব ইলিংওয়ার্থ	৫

আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ ক ট্রুম্যান ব ব্যারিংটন	৪
সুভাষ গুপ্তে ব ট্রুম্যান	৮
রমাকান্ত দেশাই নট আউট	৭
অতিরিক্ত (বাই ৮ লেগবাই ৫ নো-বল ১)	১৪
মোট	৩৭৬

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ২৩ (পঙ্কজ রায়) ৫৪ (কনট্রাকটর) ৭০ (বেগ) ৭২ (গায়কোয়াড়) ৭৮ (উমরিগড়) ১২৪ (নাদকার্নি) ১৫৪ (জোশি) ১৯৯ (সুরেন্দ্রনাথ) ১৯৯ (বোরদে) ২০৮ (দেশাই)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৩৫ (পঙ্কজ রায়) ১৪৪ (কনট্রাকটর) ১৪৬ (গায়কোয়াড়) ১৮০ (বোরদে) ২৪৩ (নাদকার্নি) ৩২১ (বেগ) ৩৩৪ (জোশি) ৩৫৮ (উমরিগড়) ৩৬১ (সুরেন্দ্রনাথ) ৩৭৬ (দেশাই)।

বোলিং : প্রথম ইনিংস ট্রুম্যান ১৫-৪-২৯-১ ; রোডস ১৮-৩-৭২-৩ ; ডেক্সটার ৩-০-৩-০ ; ইলিংওয়ার্থ ১৬-১০-১৬-২ ; মর্টিমোর ১৩-৬-৪৬-০ ; ব্যারিংটন ১৪-৩-৩৬-৩।

দ্বিতীয় ইনিংস ট্রুম্যান ২৩.১-৬-৭৫-২ ; রোডস ২৮-২-৮৭-২ ; ডেক্সটার ১২-২-৩৩-১ ; ইলিংওয়ার্থ ৩৯-১৩-৬৩-১ ; মর্টিমোর ১৬-৬-২৯-১ ; ব্যারিংটন ২৭-৪-৭৫-২।

ইংল্যাণ্ড ১৭১ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ইংল্যাণ্ড—কলিন কাউড্রে

ভারত—দাত্তু গায়কোয়াড়

পঞ্চম টেস্ট। ওভাল। ২০-২২, ২৪ অগাস্ট, ১৯৫৯

ভারত : প্রথম ইনিংস

পঙ্কজ রায় ব স্ট্যাথাম	৩
নরি কনট্রাকটর ক ইলিংওয়ার্থ ব ডেক্সটার	২২
আব্বাস আলি বেগ ক কাউড্রে ব ট্রুম্যান	২৬
রঘুনাথ নাদকার্নি ক সুয়েটম্যান ব ট্রুম্যান	৬
চান্দু বোরদে ব গ্রীনহাফ	০

দাত্তু গায়কোয়াড় ক ব্যারিংটন ব ডেক্সটার	১১
জয়ন্ত ঘোরপাড়ে ব গ্রীনহাফ	৫
নরেন তামানে ক স্যুয়েটম্যান ব স্ট্যাথাম	৩২
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ ক ইলিংওয়ার্থ ব ট্রুম্যান	২৭
সুভাষ গুপ্তে ব ট্রুম্যান	২
রমাকান্ত দেশাই নট আউট	৩
অতিরিক্ত (বাই ১ লেগবাই ৪ নো-বল ১)	৬
মোট	১৪০

দ্বিতীয় ইনিংস

নরি কনট্রাকটর ক ট্রুম্যান ব স্ট্যাথাম	২৫
পঙ্কজ রায় এল. বি. ডব্লু. ব স্ট্যাথাম	০
আব্বাস আলি বেগ ক কাউড্রে ব স্ট্যাথাম	৪
রঘুনাথ নাদকার্নি এল. বি. ডব্লু. ব ইলিংওয়ার্থ	৭৬
চান্দু বোরদে রান আউট	৬
দাত্তু গায়কোয়াড় ক স্যুয়েটম্যান ব গ্রীনহাফ	১৫
জয়সিংরাও ঘোরপাড়ে ব গ্রীনহাফ	২৪
নরেন তামানে ব ট্রুম্যান	৯
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ নট আউট	১৭
সুভাষ গুপ্তে ক গ্রীনহাফ ব ট্রুম্যান	৫
রমাকান্ত দেশাই ক স্যুয়েটম্যান ব ট্রুম্যান	০
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগবাই ৬ নো-বল ৩)	১৩
মোট	১৯৪

উইকেট-পতন : প্রথম ইনিংস ১২ (পঙ্কজ রায়) ৪৩ (বেগ) ৪৯ (নাদকার্নি) ৫০ (বোরদে) ৬৭ (গায়কোয়াড়) ৭২ (ঘোরপাড়ে) ৭৪ (কনট্রাকটর) ১৩২ (সুরেন্দ্রনাথ) ১৩৪ (গুপ্তে) ১৪০ (তামানে)।

দ্বিতীয় ইনিংস ৫ (পঙ্কজ রায়) ১৭ (বেগ) ৪৪ (কনট্রাকটর) ৭০ (বোরদে) ১০৬ (গায়কোয়াড়) ১৫৯ (ঘোরপাড়ে) ১৬৩ (নাদকার্নি) ১৭৩ (তামানে) ১৮৬ (গুপ্তে) ১৯৪ (দেশাই)।

ইংল্যাণ্ড : প্রথম ইনিংস

জিওফ পুলার ক তামানে ব সুরেন্দ্রনাথ	২২
রমন সুব্বারাও ক তামানে ব দেশাই	৯৪
কলিন কাউড্রে ক বোরদে ব সুরেন্দ্রনাথ	৬
মাইক স্মিথ ব দেশাই	৯৮
কেন ব্যারিংটন ক বদলি ব গুপ্তে	৮
টেড ডেক্সটার ক তামানে ব সুরেন্দ্রনাথ	০
রে ইলিংওয়ার্থ ক গায়কোয়াড় ব নাদকার্নি	৫০
রয় সুয়েটম্যান ক বেগ ব সুরেন্দ্রনাথ	৬৫
ফ্রেডি টুম্যান স্টাম্পড তামানে ব নাদকার্নি	১
ব্রায়ান স্ট্যাথাম নট আউট	৩
টি. গ্রীনহাফ ক কনট্রাকটর ব সুরেন্দ্রনাথ	২
অতিরিক্ত (বাই ৩ লেগবাই ৮ ওয়াইড ১)	১২
মোট	৩৬১

উইকেট পতন : ৩৮ (পুলার) ৫২ (কাউড্রে) ২২১ (স্মিথ) ২৩২ (সুব্বারাও) ২৩৩ (ডেক্সটার) ২৩৫ (ব্যারিংটন) ৩৩৭ (ইলিংওয়ার্থ) ৩৪৭ (টুম্যান) ৩৫৮ (সুয়েটম্যান) ৩৬১ (গ্রীনহাফ)।

বোলিং : দেশাই ৩৩-৫-১০৩-২ ; সুরেন্দ্রনাথ ৫১'৩-২৫-৭৫-৫ ; গুপ্তে ৩৮-৯-১১৯-১ ; নাদকার্নি ২৬-১১-৫২-২ ।

ইংল্যাণ্ড এক ইনিংস ও ২৭ রানে জয়ী

অধিনায়ক : ইংল্যাণ্ড—কলিন কাউড্রে

ভারত—দাত্তু গায়কোয়াড়

১৯৫৯-৬০ : ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

ইংল্যাণ্ড থেকে বিধ্বস্ত হয়ে ভারত ফিরল। ভারতীয় ক্রিকেটারদের মনোবল তখন অতলে পৌঁছেছে। এ অবস্থায় ভারত সফরে এল শক্তিশালী অস্ট্রেলীয়া দল। অধিনায়ক রিচি বেনো, যুদ্ধোত্তর অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম কুশলী অধিনায়ক। নিজে ভাল

চৌকস খেলোয়াড়। দলে আছেন হার্ভে, ও'নীল, ডেভিডসন প্রভৃতি সমকালীন বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়েরা। এ দল এর আগে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়ে এসেছে। তাই সবাই ভাবে ভারত লড়তেই পারবে না। কিন্তু ক্রিকেটের মহা-অনিশ্চয়তাকে সার্থক করে ভারত শুধু লড়লই না, একটি খেলাতে জিতলও। এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়। এ জয় সম্ভব হয়েছিল নতুন অধিনায়ক রামচাঁদের কৌশলে, ভাল ফিল্ডিংয়ে এবং অবশ্যই জাসু প্যাটেলের প্রায় অলৌকিক বোলিংয়ে। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া সিরিজে জিতলেও ভারত সর্বদাই লড়াইয়ের ভেতর ছিল। অন্তত খেলার আগেই হেরে বসে ছিল না। এ সিরিজ তাই ভারতীয় ক্রিকেটের মর্যাদা কিছু বাড়িয়েছিল।

প্রথম টেস্ট। দিল্লি। ১২, ১৩, ১৪, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৯

ভারত

প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
পঙ্কজ রায় ব ডেভিডসন	০	ক বেনো ব ক্লাইন	৯৯
নরি কন্ট্রাকটর ব ডেভিডসন	৪১	ক ফ্যাভেল ব বেনো	৩৪
পলি উমরিগড় ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	০	ক ফ্যাভেল ব ক্লাইন	৩২
আব্বাস আলি বেগ ব রোরকে	৯	রান আউট	৫
চাঁদু বোরদে ক গ্রাউট ব মেকিফ	১৪	ক ডেভিডসন ব বেনো	০
জি. এস. রামচাঁদ ক গ্রাউট ব ক্লাইন	২০	ক ডেভিডসন ব ক্লাইন	৬
রঘুনাথ নাদকার্নি ব রোরকে	১	এল. বি. ডব্লু ব বেনো	৭
সি. জি. জোশি ব বেনো	১৫	ক ডেভিডসন ব ক্লাইন	৮
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ অপরাজিত	২৪	ক ডেভিডসন ব বেনো	০
সুদিয়া এল. বি. ডব্লু ব বেনো	০	অপরাজিত	০
রমাকান্ত দেশাই ক ওনীল ব বেনো	০	ক মেকিফ ব বেনো	০
অতিরিক্ত (বাই ৬ লেগবাই ২ নোবল ৩)	১১	(বাই ৮ লেগ বাই ৫ নোবল ২)	১৫
মোট	১৩৫	মোট	২০৬

বোলিং : ডেভিডসন ১৮-১০-৩০-৩ ; ১৩-৫-১৭-০। মেকিফ ১৩-৩-৪৪-১ ; ১৪-৪-৩২-০। রোরকে ১৪-৫-১০-২ ; ৭-৪-৫-০। ক্লাইন ৯-৩-১৫-১ ; ২২-১২-৪২-৪। বেনো ৩.৪-৩-০-৩ ; ৪৫-১৯-৭৬-৫। ম্যাকে ১-০-১-০ ; — — — —। ওনীল ১-০-৪-০ ; ৫-০-১৯-০। হার্ভে — — — — ; ১-১-০-০।

উইকেট পতন : ১ম ইনিংস ৪ (পঙ্কজ রায়) ৮ (উমরিগড়) ৩২ (বেগ) ৬৬ (বোরদে) ৫৯ (কন্ট্রাক্টর) ৭০ (নাদকার্নি) ১০০ (রামচাঁদ) ১৩১ (জোশি) ১৩৫ (মুদিয়া) ১৩৫ (দেশাই)। ২য় ইনিংস ১২১ (কনট্রাকটর) ১৩২ (বেগ) ১৩২ (বোরদে) ১৭২ (উমরিগড়) ১৮৭ (রামচাঁদ) ১৯২ (পঙ্কজ রায়) ২০২ (নাদকার্নি) ২০৬ (জোশি) ২০৬ (সুরেন্দ্রনাথ) ২০৬ (দেশাই)।

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস

ম্যাকডোনাল্ড ব সুরেন্দ্রনাথ	১৯
ফ্যাভেল ব সুরেন্দ্রনাথ	৪০
হার্ভে এল. বি. ডব্লু ব নাদকার্নি	১১৪
ওনীল রান আউট	৩৯
ম্যাকে ক জোশি ব উমরিগড়	৭৮
ডেভিডসন ক বেগ ব দেশাই	২৫
বেনো ক বোরদে ব উমরিগড়	২০
গ্রাউট ক ও ব উমরিগড়	৪২
মেকিফ অপরাজিত	৪৫
ক্লাইন ক ও ব রামচাঁদ	১৪
রোরকে ক বদলি (কুন্দরন) ব উমরিগড়	৭
অতিরিক্ত (বাই ১৫, লেগবাই ৯ নো বল ১)	২৫
মোট	৪৬৮

উইকেট পতন : ৫৩ (ম্যাকডোনাল্ড) ৬৪ (ফ্যাভেল) ১৪৩ (ওনীল) ২৭৫ (হার্ভে) ৩১৮ (ডেভিডসন) ৩৫৩ (বেনো) ৩৯৮ (ম্যাকে) ৪০২ (গ্রাউট) ৪৪৩ (ক্লাইন) ৪৬৮ (রোরকে)।

বোলিং : দেশাই ৩৩·৩-৩-১২৪-১, সুরেন্দ্রনাথ ৩৮-৮-১০১-২ ; বোরদে ১৭-৪-৪৮-০ ; মুদিয়া ১২-৩-৩০-০ ; নাদকার্নি ২০-৬-৬২-১ ; রামচাঁদ ৭-১-২৭-১ ; উমরিগড় ১৫·৪-১-৪৯-৪ ।

ভারত ১ ইনিংস ও ১২৭ রানে পরাজিত

অধিনায়ক : ভারত—জি. এস. রামচাঁদ

অস্ট্রেলিয়া—আর. বেনো

দ্বিতীয় টেস্ট। কানপুর। ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫৯

ভারত

প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
পঙ্কজ রায় ক হার্ভে ব বেনো	১৭	ক বেনো ব ডেভিডসন	৮
নরি কন্ট্রাকটর ক জারমান ব বেনো	২৪	ক হার্ভে ব ডেভিডসন	৭৪
পলি উমরিগড় ক ডেভিডসন ব ক্লাইন	৬	ক মেরকে ব ডেভিডসন	১৪
আব্বাস আলি বেগ ব ডেভিডসন	১৯	ক হার্ভে ব বেনো	৩৬
চান্দু বোরদে ক ক্লাইন ব ডেভিডসন	২০	ক ওনীল ব মেকিফ	৪৪
জি. এস. রামচাঁদ ক ম্যাকে ব বেনো	২৪	ব হার্ভে	৫
আর. বি. কেনী ব ডেভিডসন	০	ক জারমান ব ডেভিডসন	৫১
রঘুনাথ নাদকার্নি ক হার্ভে ব ডেভিডসন	২৫	এল. বি. ডব্লু ব ডেভিডসন	৪৬
নরেন তামানে ব বেনো	১	ক হার্ভে ব ডেভিডসন	০
জাসু প্যাটেল ক ক্লাইন ব ডেভিডসন	৪	ব ডেভিডসন	০
আর. বি. সুরেন্দ্রনাথ অপরাজিত	৮	অপরাজিত	৪
অতিরিক্ত (লেগবাই ২ নো বল ২)	৪	(বাই ৭, লেগবাই ২)	৯
মোট	১৫২	মোট	২৯১

উইকেট পতন : ১ম ইনিংস ৩৮ (কন্ট্রাকটর) ৪৭ (উমরিগড়) ৫১ (পঙ্কজ রায়) ৭৭ (বেগ) ১১২ (বোরদে) ১১২ (কেনী) ১২৬ (রামচাঁদ) ১২৮ (তামানে) ১৪১ (প্যাটেল) ১৫২ (নাদকার্নি)। ২য় ইনিংস ৩১ (পঙ্কজ রায়) ৭২ (উমরিগড়)

১২১ (বেগ) ১৪৭ (কনট্রাকটর) ১৫৩ (রামচাঁদ) ২১৭ (বোরদে) ২৮৬ (কেনী) ২৮৬ (তামানে) ২৯১ (নাদকার্নি) ২৯১ (প্যাটেল) ।

বোলিং : ডেভিডসন ২০.১-৭-১৩-৫ ; ৫৭.৩-২৭-৯৩-৭ । মেকিফ ৮-২-১৫-০ ; ১৮-৪-৩৭-১ । বেনো ২৫-৮- ৩-৪ ; ৩৮-১৫-৮১-১ । রোরকে ২-১-৩-০ ; ৭-৩-১৪-০ । ক্লাইন ১৫-৭-৩৬ ১ ; — — — — । ম্যাকে — — — — ; ১০-৫-১৪-০ । হার্ভে — — — — ; ১২-৩-৩১-১ । ওনীল — — — — ; ২-০-১২-০ ।

অস্ট্রেলিয়া

প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
ম্যাকডোনাল্ড ব প্যাটেল	৫৩	স্ট্যাম্পড তামানে ব প্যাটেল	৩৪
স্টিভেন্স ক ও ব প্যাটেল	২৫	ক কেনী ব প্যাটেল	৭
হার্ভে ব প্যাটেল	৫১	ক নাদকার্নি ব উমরিগড়	২৫
ওনীল ব বোরদে	১৭	ক নাদকার্নি ব উমরিগড়	৫
ম্যাকে এল. বি. ডব্লু ব প্যাটেল	০	এল. বি. ডব্লু ব উমরিগড়	০
ডেভিডসন ব প্যাটেল	৪১	ব প্যাটেল	৮
বেনো ব প্যাটেল	৭	ক রামচাঁদ ব প্যাটেল	০
আরমান এল. বি. ডব্লু ব প্যাটেল	১	ব উমরিগড়	০
ক্লাইন ব প্যাটেল	৮	ব প্যাটেল	০
মেকিফ অপরাজিত	১	অপরাজিত	১৪
রোরকে ক বেগ ব প্যাটেল	০	ব্যাট করেন নি	—
অতিরিক্ত (বাই ৯ লেগবাই ২ নো বল ৪)	১৫	(বাই ৮ লেগবাই ৪)	১২
মোট	২১৯	মোট	১০৫

উইকেট পতন : ১ম ইনিংস ৭১ (স্টিভেন্স) ১২৮ (ম্যাকডোনাল্ড) ১৪৯ (হার্ভে) ১৫৯ (ম্যাকে) ১৫৯ (ওনীল) ১৭৪ (বেনো) ১৮৬ (আরমান) ২১৬ (ক্লাইন) ২১৯ (ডেভিডসন) ২১৯ (রোরকে) । ২য় ইনিংস ১২ (স্টিভেন্স) ৪৯ (হার্ভে)

৫৯ (ওনীল) ৬১ (ম্যা কে) ৭৮ (ডেভিডসন) ৭৮ (বেনো) ৭৯ (জারমান) ৮৪ (ম্যাকডোনাল্ড) ১০৫ (ক্লাইন) ।

বোলিং : সুরেন্দ্রনাথ ৪-০-১৩-০ ; ৪-২-৪-০ । রামচাঁদ ৬-৩-১৪-০ ; ৩-০-৭-০ । প্যাটেল ৩৬.৫-১৬-৬৯-৯ ; ২৪.৪-৭-৫৫-৫ । উমরিগড় ১৫-১-৪০-০ ; ২৫-১১-২৭-৪ । বোরদে ১৫-১-৬১-১ ; — — — — । নাদকানি ২-০-৭-০ ; — — — — ।

ভারত ১১৯ রানে বিজয়ী

অধিনায়ক : ভারত—জি. এস. রামচাঁদ

অস্ট্রেলিয়া—আর বেনো

তৃতীয় টেস্ট । বোম্বাই । ১, ২, ৩, ৫, ৬ জানুয়ারি ১৯৬০

ভারত

প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
পঙ্কজ রায় ব ডেভিডসন	৬	ব মেকিফ	৫৭
নরি কনট্রাকটর ক বেনো ব মেকিফ	১০৮	ব ডেভিডসন	৪৩
পলি উমরিগড় ক হার্ভে ব ডেভিডসন	০		—
আব্বাস আলি বেগ ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	৫০	ক ম্যাকে ব লিণ্ডওয়াল	৫৮
চান্দু বোরদে ব মেকিফ	২৬	ব মেকিফ	১
জি. এস. রামচাঁদ এল. বি. ডব্লু ব মেকিফ	০		—
আর. বি. কেনী ব মেকিফ	২০	অপরাজিত	৫৫
রঘুনাথ নাদকার্নি অপরাজিত	১৮	অপরাজিত	১
কুন্দরন এল. বি. ডব্লু ব লিণ্ডওয়াল	১৯	হিট উইকেট ব মেকিফ	২
সেলিম দুরানি ক স্টিভেন্স ব বেনো	১৮		—
গোলাম গার্ড ক বেনো ব ডেভিডসন	৭		—
অতিরিক্ত (বাই ৯ লেগবাই ৪ নো বল ৪)	১৭	(লেগবাই ৯)	৯
মোট	২৮৯	মোট (৫ উইকেটে ডি.)	২২৬

উইকেট পতন : ১ম ইনিংস ২১ (পঙ্কজ রায়) ২১ (উমরিগড়) ১৫৪ (বেগ) ১৭৭ (বোরদে) ১৭৭ (রামচাঁদ) ২০৩ (কনট্রাকটর) ২২৯ (কেনী) ২৪৬ (কুন্দরন) ২৭২ (দুরানি) ২৮৯ (গার্ড)। ২য় ইনিংস ৭৫ (পঙ্কজ রায়) ৭৭ (কুন্দরন) ১১১ (কনট্রাকটর) ১১২ (বোরদে) ২২১ (বেগ)।

বোলিং : ডেভিডসন ৩৪.৫-৯-৬২-৪ ; ১৪-৪-২৫-০। লিণ্ডওয়াল ২৩-৭-৫৬-১ ; ২৩-৭-৫৬-২। ম্যাকে ৬-৩-১১-০ ; ৬-৪-৬-০। মেকিফ ৩৮-১২-৭৯-৪ ; ২৮-৫-৬৭-৩। বেনো ৪১-২৪-৬৪-১ ; ২৪-১০-৩৬-০। হারভে — — — — ; ৩-১-১১-০। ওনীল — — — — ; ৩-১-১৬-০।

অস্ট্রেলিয়া

প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
ম্যাকডোনাল্ড ব নাদকার্নি	৩৬		
স্টিভেন্স ব নাদকার্নি	২২		
হার্ভে ব নাদকার্নি	১০২		
ওনীল ক বদলি (সুদ) ব বোরদে	১৬৩		
ফ্যাভেল ব নাদকার্নি	১		
গ্রাউট ব নাদকার্নি	৩১	অপরাজিত	২৩
বেনো এল. বি. ডব্লু ব নাদকার্নি	১৪	অপরাজিত	১২
ম্যাকে ব বোরদে	১		
ডেভিডসন অপরাজিত	৯		
লিণ্ডওয়াল অপরাজিত	১		
মেকিফ ব্যাট করেন নি	—	ব পঙ্কজ রায়	০
অতিরিক্ত (বাই ৪ লেগ বাই ৩)	৭	অতিরিক্ত	০
মোট (আট উইকেটে ডি.)	৩৮৭	মোট (এক উইকেটে)	৩৪

উইকেট পতন : ১ম ইনিংস ৬০ (স্টিভেন্স) ৬৩ (ম্যাকডোনাল্ড) ২৭০ (হার্ভে) ২৮২ (ফ্যাভেল) ৩৫৮ (গ্রাউট) ৩৭৬ (ওনীল) ৩৭৭ (ম্যাকে) ৩৮০ বেনো। ২য় ইনিংস ৪ (মেকিফ)।

বোলিং : গোলাম গার্ড ৩৩-৭-৯৩-০ ; ১-০-১-০ । রামচাঁদ ৩৫-১৩-৮৫-০ ; — — — — । উমরিগড় ৮-২-১৯-০ ; — — — — । নাদকার্নি ৫১-১১-১০৫-৬ ; — — — — । বোরদে ১৩-১-৭৮-২ ; — — — — । পঙ্কজ রায় — — — — ; ২-০-৬-১ । বেগ — — — — ; ২-০-১৩-০ । কনট্রাকটর — — — — ; ২-১-৫-০ । দুরানী— — — — ; ১-০-৯-০ ।

খেলা অমীমাংসিত

অধিনায়ক : ভারত—জি. এস. রামচাঁদ
অস্ট্রেলিয়া—আর বেনো

চতুর্থ টেস্ট। মাদ্রাজ। ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ জানুয়ারি ১৯৬০

অস্ট্রেলিয়া : প্রথম ইনিংস

ম্যাকডোনাল্ড ব প্যাটেল	১৬
ফ্যাভেল স্ট্যা কুন্দরন ব নাদকার্নি	১০১
হার্ভে ব দেশাই	১৮
ওনীল ব দেশাই	৪০
বার্জ ব দেশাই	৩৫
ম্যাকে স্ট্যা কুন্দরন ব প্যাটেল	৮৯
ডেভিডসন এল. বি. ডব্লু ব নাদকার্নি	৬
গ্রাউট ক মিলখা সিং ব নাদকার্নি	২
বেনো ব বোরদে	২৫
মেকিফ ক রায় ব দেশাই	৮
ক্লাইন অপরাজিত	০
অতিরিক্ত (বাই ৫, লেগবাই ৩ নো-বল ১)	৯
মোট	৪২৬

উইকেট পতন : ৫৮ (ম্যাকডোনাল্ড) ৭৭ (হার্ভে) ১৪৭ (ওনীল) ১৯৭ (ফ্যাভেল) ২১৬ (বার্জ) ২৩৮ (ডেভিডসন) ২৪৯ (গ্রাউট) ৩০৮ (বেনো) ৩২৯ (মেকিফ) ৩৪২ (ম্যাকে)।

বোলিং : দেশাই ৪১-১০-৯৩-৪ ; রামচাঁদ ১৫-৬-২৬-০ ; নাদকার্নি ৪৪-১৫-৭৫-৩ ; প্যাটেল ৩৭-১২-৮৪-২ ; বোরদে ১৬-১-৫৫-১।

ভারত

প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
পঙ্কজ রায় ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	১	ক ওনীল মেকিফ	৩
কুন্দরন ব বেনো	৭১	ব বেনো	৩৩
আর. বি. কেনী ব ম্যাকে	৩৩	ক গ্রাউট ব মেকিফ	১
নরি কনট্রাকটর ক ক্লাইন ব বেনো	৭	ক মেকিফ ব ক্লাইন	৪১
চান্দু বোরদে ক গ্রাউট ব ক্লাইন	৩	ক ডেভিডসন ব বেনো	১
জি. এস. রামচাঁদ ক হার্ভে ব বেনো	১৩	স্ট্যা গ্রাউট ব বেনো	২২
মিলখা সিং ব ডেভিডসন	১৬	ব হার্ভে	৯
রঘুনাথ নাদকার্নি ক ক্লাইন ব বেনো	৩	রান আউট	১৮
সুদ স্ট্যা গ্রাউট ব ডেভিডসন	০	ব ডেভিডসন	৩
রামু প্যাটেল অপরাজিত	০	ক ক্লাইন ব ডেভিডসন	০
রমাকান্ত দেশাই ক ম্যাকডোনাল্ড ব বেনো	০	অপরাজিত	০
অতিরিক্ত (বাই ১ নো বল ১)	২	(বাই ৪ লেগবাই ২ নো বল ১)	৭
মোট	১৪৯	মোট	১৩৮

উইকেট পতন : ১ম ইনিংস ২০ (পঙ্কজ রায়) ৯৫ (কেনী) ১১১ (কুন্দরন) ১১৪ (বোরদে) ১৩০ (কনট্রাকটর) ১৩০ (রামচাঁদ) ১৪৫ (নাদকার্নি) ১৪৮ (সুদ) ১৪৯ (মিলখা সিং) ১৪৯ (দেশাই)। ২য় ইনিংস ৭ (পঙ্কজ রায়) ১১ (কেনী) ৫৪ (কুন্দরন) ৬২ (বোরদে) ৭৮ (রামচাঁদ) ১০০ (মিলখা সিং) ১২৭ (কনট্রাকটর) ১৩৮ (নাদকার্নি) ১৩৮ (সুদ) ১৩৮ (প্যাটেল)।

বোলিং : ডেভিডসন ১৯-০-৩৬-৩ ; ১৯-৭-৩৩-২ । মেকিফ ৭-৪-২১-০ ; ২২-১০-৩৩-২ । বেনো ৩২'১-১৪-৪৩-৫ ; ৩৫-১৯-৪৩-৩ । ক্লাইন ১৫-৮-২১-১ ; ১২-৫-১৩-১ । হার্ভে ১-০-৯-০ ; ১৩-৭-৮-১ ; ম্যাকে ৩-১-১৭-১ ; ৪-৩-১-০ ।

অস্ট্রেলিয়া ১ ইনিংস ও ৫৫ রানে বিজয়ী

অধিনায়ক : ভারত—জি. এস. রামচাঁদ

অস্ট্রেলিয়া—আর বেনো

পঞ্চম টেস্ট । কলকাতা । ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮ জানুয়ারি ১৯৬০

ভারত

প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
কুন্দরন ব ম্যাকে	১২	ব ডেভিডসন	
নরি কনট্রাকটর ব বেনো	৩৬	ক ডেভিডসন ব বেনো	৩০
পঙ্কজ রায় ক গ্রাউট ব ডেভিডসন	৩৩	এল. বি. ডব্লু ব বেনো	৩৯
রঘুনাথ নাদকার্নি ক ডেভিডসন ব লিণ্ডওয়াল	২	ক গ্রাউট ব লিণ্ডওয়াল	২৯
আর. বি. কেনী ক গ্রাউট ব লিণ্ডওয়াল	৭	ক গ্রাউট ব ম্যাকে	৬২
সি. ডি. গোপীনাথ ব বেনো	৩৯	ক গ্রাউট ব বেনো	০
চান্দু বোরদে ব বেনো	৬	ব মেকিফ	৫০
জি. এস. রামচাঁদ ব ডেভিডসন	১২	ব বেনো	৯
এম. এল. জয়সীমা অপরাজিত	২০	ব ম্যাকে	৭৪
রমাকান্ত দেশাই এল. বি. ডব্লু ব ডেভিডসন	১৭	অপরাজিত	১৭
জ্যাসু প্যাটেল রান আউট	০	ক বেনো ব ডেভিডসন	১২
অতিরিক্ত (বাই ৫ লেগ বাই ১ নো বল ৩ ওয়াইড ১)	১০	(বাই ১১ লেগবাই ৪ নো বল ২)	১৭
মোট	১৯৪	মোট	৩৩৯

উইকেট পতন : ১ম ইনিংস ৩০ (কুন্দরন) ৫৯ (কনট্রাকটর) ৭১ (নাদকার্নি) ৫৩ (কেনী) ১১২ (পঙ্কজ রায়) ১৩১ (বোরদে) ১৪২ (গোপীনাথ) [illegible]

(রামচাঁদ) ১৯৪ (দেশাই) ১৯৪ (প্যাটেল)। ২য় ইনিংস ০ (কুন্দরন) ৬৭ (কনট্রাকটর) ৭৮ (পঙ্কজ রায়) ৭৮ (গোপীনাথ) ১২৩ (নাদকার্নি) ২০৬ (বোরদে) ২৮৯ (জয়সীমা) ২৯৫ (কেনী) ৩১৬ (রামচাঁদ) ৩৩৯ (প্যাটেল)।

বোলিং

ডেভিডসন ১৬ ২-৩৭-৩ , ৩৬'২-১৩-৭৬-২। মেকিফ ১৭-৪-২৮-০ ; ৩২-২-৪১-১। লিণ্ডওয়াল ১৬-৫-৪৪-২ ; ২০-৩-৬৬-১। ম্যাকে ১১-৫-১৬-১ ; ২১-৭-৩৬-০-২। বেনো ৩৯'৩-১২-৫৯-৩ ; ৪৮-২৩-১০৩-৪।

অস্ট্রেলিয়া

প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
ক্যাম্ভেল ব দেশাই	২৬	অপরাজিত	৬২
গ্রাউট ব প্যাটেল	৫০		
হারভে ক জয়সীমা ব প্যাটেল	১৭	ক ও ব কনট্রাকটর	৩৬
ওনীল ক কুন্দরন ব দেশাই	১১৩		
বার্জ ব দেশাই	৬০		
ম্যাকডোনাল্ড এল. বি ডব্লু ব বোরদে	২৭	রান আউট	৬
ম্যাকে ব প্যাটেল	১৮		
লিণ্ডওয়াল ক কুন্দরন ব দেশাই	১০		
ডেভিডসন ব বোরদে	৪		
বেনো ক ও ব বোরদে	৩	অপরাজিত	১০
মেকিফ অপরাজিত	০		
অতিরিক্ত (লেগ বাই ৩)	৩	(বাই ১ লেগ বাই ৪ নো-বল ১)	৬
মোট	৩৩১	মোট (দুই উইকেট)	১২১

উইকেট পতন : ১ম ইনিংস ৭৬ (ক্যাম্ভেল) ৭৬ (গ্রাউট) ১১৬ (হারভে) ২৩৬ (ওনীল) ২৭৩ (বার্জ) ২৯৯ (ম্যাকে) ৩২৩ (লিণ্ডওয়াল) ৩২৫ (ম্যাকডোনাল্ড) ৩২৮ (ডেভিডসন) ৩৩১ (বেনো)। ২য় ইনিংস ২০ (ম্যাকডোনাল্ড) ১৩৪ (হারভে)।